বান্ধব।

মাসিক প্রবন্ধ ও সমালোচন।

তৃতীয় খণ্ড।

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

ঢাকা-গিরিশযন্ত্র।

মুন্সি মওলাবক্স প্রিণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৮৩।

মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা।

বান্ধব।

মাসিক প্রবন্ধ ও সমালোচন।

৩য় খণ্ড।] বৈশাখ। ১২৮৩। জ্যৈষ্ঠ। [১ম ও ২য় সংখ্যা।

বৃটিশ ইণ্ডিয়া।

"পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিনমধুনা তত্র সরিতাং
বিপর্য্যাসং যাতো ঘনবিরলভাবঃ ক্ষিতিরুহাম্।
বহোর্দ্দৃষ্টং কালাদপরমিব মন্যে বনমিদং
নিবেশঃ শৈলানাং তদিদমিতি বুদ্ধিং দ্রঢ়য়তি ॥

যখন দুর্ব্বারপরাক্রম জুলিয়স সিজর, খৃষ্টের ৫৫ বৎসর পূর্ব্বে, কতিপয় অর্ণবপোত এবং কএক সহস্র সৈনিক লইয়া ব্রটেনিয়ার উপকূলে প্রথম উপনীত হইলেন, তখন ইহা দেখিয়াই তাঁহার নিরতিশয় ক্ষোভ ও দুঃখ হইল যে, তিনি যাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছেন, তাহারা অর্দ্ধ মনুষ্য, অর্দ্ধ পশু। অপক্ক মাংস তাহাদিগের আহার; ভূগর্ত্ত কিংবা ভূগর্ত্তের ন্যায় মৃণ্ময় কুটীর তাহাদিগের আবাসগৃহ; তরুশাখা তাহাদিগের বিনোদ-ক্ষেত্র; তাহাদিগের শরীর নীল, পীত, লোহিত প্রভৃতি নানা বর্ণে চিত্রিত; মুখচ্ছবি অদ্ভুত, অদৃষ্টপূর্ব্ব এবং হাস্যরসের উদ্দীপক; এবং ভাষা মুখচ্ছবি হইতেও অধিকতর অদ্ভুত, শ্রবণ-কঠোর এবং শাখা-মৃগের ভাষার ন্যায় সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যের অবোধ্য। আর, যখন বীরচূড়ামণি সেকন্দর সাহ, জুলিয়স সিজরেরও প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে, পারস্যাদি যবনরাজ্য পদতলে দলন

করিয়া, দিগ্বিজয়-বাসনার চরিতার্থতাহেতু ভারতের প্রান্তদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন ইহা দেখিয়াই তিনি এবং তাঁহার সহচরবর্গ বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন যে, তাঁহারা দেশে থাকিয়া যাহাদিগকে এক প্রকার অসভ্য মনে করিতেন, তাহারা সভ্যতা বিষয়ে গ্রীকদিগেরও শিক্ষাগুরু। তাহারা রূপে অতুল, নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি সুকুমারগুণে গন্ধর্ব্বসদৃশ, তাহাদিগের সৌধসমাকীর্ণ নগররাজী ইন্দ্রের অমরাবতী, আচার ব্যবহার সর্ব্বথা পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জ্জিত, পরিচ্ছদ ও বেশবিন্যাস সুরলোকের উপযুক্ত, প্রকৃতি কাঠিন্য ও কোমলতা এবং দয়াদাক্ষিণ্য ও অভিমানাদি সমস্ত পৌরুষগুণে বিভূষিত, এবং তাহাদিগের ভাষা মন্দাকিনীর তরঙ্গ-ভঙ্গি-জন্য কলনাদের ন্যায় যার পর নাই শ্রুতিমধুর ও মনোমদ।

বস্তুতঃ, খৃষ্টের আবির্ভাবসময়ে ভারতবর্ষ যে অবস্থায় ছিল, যদি তাহার সহিত বৃটিশ দ্বীপের তদানীন্তন অবস্থার তুলনা করা যায়, তবে এই উভয় স্থলের অধিবাসীরা যে একজাতীয় জীব, একই উপকরণে গঠিত, এবং একরূপ স্বভাববিশিষ্ট এই বিষয়েই মনে গভীর সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। যখন ভারতবাসী, শান্তির প্রিয়নিকেতন স্বরূপ রমণীয় তপোবনে অথবা কোন প্রশস্তহৃদয়া তটিনীর মনোহর পুলিনে যোগাসনে সমাসীন হইয়া, সৃষ্টির প্রাণরূপিণী পরমাশক্তির স্বরূপচিন্তায় নিমগ্ন হইতেন, অথবা তদীয় আরাধনার জন্য স্বর্গস্থ দেবতাদিগের ন্যায় জলদগম্ভীর মধুরস্বরে সামগান করিতেন, তখন বৃটেনিয়ার অধিবাসীরা ড্রুইডদিগের ভূত-ভয়েই সতত অধীর থাকিত, এবং আপনাদিগের মনোবৃত্তির অনুরূপ নানাবিধ ভয়ঙ্কর ও বীভৎস মূর্ত্তির নিকট জীবিত মনুষ্যকেও অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দিত। যখন ভারতীয় আর্য্যসন্তান, ব্যাসবাল্মীকির হৃদয়কন্দর-নিঃসৃত নিরুপম কাব্যসুধা আকণ্ঠ পান করিয়া, অভিজ্ঞানশকুন্তলের মত কবিত্বের অলৌকিক-মহিমাময় লোকমোহন নাটকাদির অভিনয়দর্শনের জন্য হীরক-হার-শোভিত সুসজ্জিত সভাস্থলে আসিয়া উপবিষ্ট হইতেন, এবং সংগীতের অমৃতস্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে আনন্দার্ণবে ভাসিয়া যাইতেন, তখন বৃটিশবাসীরা বানরের ন্যায় লম্ফ ঝম্ফ প্রদান করিতে পারিলেই আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিত, এবং বিকটস্বরে চীৎকার করিতে পারিলেই সংগীতের পরাকাষ্ঠা হইল এইরূপ ভাবিয়া পরিতৃপ্ত রহিত। যখন বীরবিনোদিনী ভারত-ললনা মণিমুক্তা প্রবালাদি অমূল্য বস্তুনিচয়কেও অনুপযুক্ত আভরণ বিবেচনায় অঙ্গে ধারণ করিতে লজ্জিত হইতেন, এবং প্রীতি ও কবিতায় বিলসিত হইয়া আপনারাই সর্ব্বত্র মূর্ত্তিমতী প্রীতি এবং মূর্ত্তিমতী পবিত্রতার ন্যায় শোভা পাইতেন, তখন বৃটিশ-কামিনীরা পশুচর্ম্মে অর্দ্ধ আবৃত হইয়া যার তার সহিত ভোগ্যাভাবে যথেচ্ছ বিচরণ করিত,

এবং যে আসিয়া কোনরূপ ভয় প্রদর্শন কি বিড়ম্বনা করিতে পারিত, তাহাকেই তৎকালে পতিজ্ঞান করিয়া তাহার সহিত চলিয়া যাইত। সংক্ষেপতঃ ইহা বলিলেই হয়, যখন ভারতে, দর্শন, ধর্ম্মতত্ত্ব, নীতিবিজ্ঞান এবং রাজনীতি প্রভৃতি শাস্ত্র চরমোৎকর্ষ পাইয়াছে, জ্যোতিষের আবিষ্কার হইয়াছে, শিল্প-বিদ্যা শত শাখায় সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়াছে, চন্দ্রসূর্য্যবংশীয় শূরশ্রেষ্ঠ মহাযোধদিগের অসাধারণ বীর-কীর্ত্তিতে দশদিগ্ বাজিয়া উঠিয়াছে, শাক্যসিংহ ও শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি সাধুপুরুষদিগের দেববাণী-সদৃশী উপদেশ-কথা সর্ব্বত্র ছাঁইয়া পড়িয়াছে, পাণিনি ও পতঞ্জলাদি মুণিগণের ভাষাবিজ্ঞান পৃথিবীতে ভারতীয় বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছে, জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহাদি সম্পর্কিত অনুষ্ঠানসমূহ শোধনের পর পুনঃশোধনে যতদূর সম্ভব বিশুদ্ধকান্তি ও উন্নতি দেখাইয়াছে, এবং জগতে অদ্যাপি যে সকল সামাজিক প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই, আর্য্যসমাজ তত্তাবৎ কূট সমস্যার মীমাংসা করিয়া সাম্য ও বৈষম্যের মিশ্রণজনিত সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে, বৃটিশ দ্বীপ তখনও অন্ধকার ও অজ্ঞানতিমিরাবৃত, এবং তথাকার অধিবাসীরা তখন পর্য্যন্তও সর্ব্বতোভাবে মনুষ্যগণনার বহিঃস্থিত।

কিন্তু কালের কি অপরূপ লীলা! সংসারের কি বিচিত্র গতি! আজি সেই বৃটেনিয়া 'রাজরাজেশ্বরী' এবং আজি সেই ভারতভূমি 'বৃটিশ ইণ্ডিয়া'।

"কোথায় ভারতবর্ষ,--কোথায় বৃটন,
অলঙ্ঘ্য পর্ব্বতশ্রেণী, অনন্ত সাগর,
অগণিত রাজ্য, উপরাজ্য অগণন,
অর্দ্ধেক পৃথিবী মধ্যে ব্যাপি কলেবর;
ইংলণ্ডের চন্দ্রসূর্য্য দেখে না ভারত,
ভারতের চন্দ্রসূর্য্য দেখে না বৃটন;
পবনের গতি কিম্বা কল্পনার রথ
কোন কালে এত দূর করে নি গমন
আকাশ কুসুম কিম্বা মন্দার যেমন,
জানিত ভারতবাসী ইংলণ্ড তেমন।
* * *
সেই সে ইংলণ্ড আজি হইল উদয়
ভারত-অদৃষ্টাকাশে স্বপনের মত,
এই রবি শীঘ্র অস্ত হইবার নয়,
কখনও হইবে কি না জানে ভবিষ্যত।"

পৃথিবীর অন্তস্তলে যে সকল ভৌতিকশক্তি নিহিত রহিয়াছে, তাহার পরস্পর সংঘর্ষে কখনও বহুজনাকীর্ণ গ্রাম জনপদ অতলজলে ডুবিয়া গিয়াছে, এবং কখনও জলময়ী নিম্নভূমি উর্দ্ধে উন্নমিত হইয়া কালসহকারে অপূর্ব্ব এক নগরে পরিণত হইয়াছে;—নদ নদী মনুষ্যের বাসযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে, এবং মনুষ্যের আবাসস্থল মকর কুম্ভীরের বিহারস্থল হইয়া পড়িয়াছে;—এমন কি, যেখানে মেঘমণ্ডিত পর্ব্বতমালা তাপসবেশে দণ্ডায়মান থাকিত, সমুদ্রের তরঙ্গ আসিয়া সেখানে ক্রীড়া করিতেছে, এবং যেখানে এক সময়ে সমু-

ত্রের অনন্তপ্রসারিত নিবিড় নীলিমা সেই এক ভয়ঙ্কর শোভায় শোভিত রহিত, সেই স্থান ইদানীং পার্ব্বত্য-পশুপক্ষীর কণ্ঠনাদে অহোরাত্র নিনাদিত হইতেছে। সময়ের আবর্ত্তনে, ভারত আর বৃটেনিয়ায় যেরূপ অবস্থাগত বিপ্লব ঘটিয়াছে, আমাদিগের বিবেচনায় তাহা কোন অংশেই উল্লিখিত-প্রকার পার্থিব বিপ্লব অপেক্ষা হীনতর বা অল্প বিস্ময়কর নহে। ভারত কি ছিল, এইক্ষণ কি হইয়াছে, আর বৃটিশ দ্বীপই বা কি ছিল, এইক্ষণ কি হইয়াছে! আজি যদি বৃটিশ দ্বীপের ভূতপূর্ব্ব ভূপতি কেসিভিলনাস স্বকীয় সমাধিমন্দির হইতে পুনরুত্থিত হইয়া ইংলণ্ডের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পাদচারণা করেন, তাহা হইলে এই ইংলণ্ডই যে সেই ইংলণ্ড ইহা কি কোন প্রকারেই তাঁহার প্রতীতি হইবে? আর, আজি যদি বীরকুলের চিরকীর্ত্তি মহারথী ভীষ্ম কুরুক্ষেত্রের শর-শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া একবার এই ভারত সাম্রাজ্যের চতুঃসীমায় পরিভ্রমণ করেন, তাহা হইলে এই দেশই যে সেই পুরাতন আর্য্যাবর্ত্ত, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ, কেহ সহস্রবার শপথ করিয়া কহিলেও কি একথায় তাঁহার বিশ্বাস জন্মিবে?

আজি এজগতে ইংলণ্ডের তুলনা কোথায়? স্বপ্ন যাহা দূর হইতে দর্শন করিতে পায় নাই, দুরাশাও যেখানে পঁহুচিতে সমর্থ হয় নাই, আজি ইংলণ্ডের সৌভাগ্যলক্ষ্মী তাহারও উর্দ্ধদেশে বিরাজ করিতেছেন। যে ইংলণ্ডের কুটীর-পংক্তি দেখিয়া রোমান ও ডেন নরমানেরা পরিহাস করিত, আজি সেই ইংলণ্ডের প্রাসাদ-পংক্তি স্বর্গ-শোভাকেও পরিহাস করিয়া দিগ্‌দিগন্তরবাসী পরিব্রাজকদিগের বিস্ময় জন্মাইতেছে;—এবং যে ইংলণ্ডের বিকট বুলি এক সময়ে যার পর নাই অশ্রাব্য ছিল, আজি তাহা সকল ভাষার রসাকর্ষণ করিয়া, সকল জাতীয় কাব্য এবং কাব্যের সকল প্রকার মধু ও মদিরায় পরিপুষ্ট হইয়া, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ও চরিতাখ্যান প্রভৃতি অনন্তশাস্ত্রের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে বল ও বেগবত্তা পাইয়া, ওয়াসিংটন নগর হইতে চায়না ও জাপানের শেষ সীমা পর্য্যন্ত শত কোটি মনুষ্যের জিহ্বায় জিহ্বায় লীলা করিয়া বেড়াইতেছে। ইংলণ্ডের ধন-বৈভব এত বাড়িয়াছে যে, তত্রত্য সমৃদ্ধ ব্যক্তিরা স্বর্ণ কি রজত বস্তু স্পর্শ করিতেও ভালবাসেন না; ইংলণ্ডের বিক্রম, ক্ষুধা ও জনবৈভবও এত বাড়িয়াছে যে, সমগ্র মেদিনী করায়ত্ত হইলেও ইংলণ্ডের এইক্ষণ আর পরিতৃপ্তি হয় না। ভৃত্য যেমন প্রভুর পদাঙ্করাজি দর্শন করিলেই পুলকে পূর্ণ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হয়, আজি সপ্তসাগরের উর্ম্মিমালাও বৃটিশ বৈজয়ন্তী দর্শনে সেইরূপ পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া প্রেমোচ্ছ্বাস প্রদর্শন করিতেছে, এবং গিরিশৃঙ্গের অতি দুর্গম স্থানেও সেই বৈজয়ন্তীই দর্পভরে দোলায়িত হইতেছে। পৃথিবীর যেখানে যাও সেখা-

সেই বৃটিশ স্পর্দ্ধা, বৃটিশ সভ্যতা, বৃটিশ হুঙ্কার, বৃটিশ চাতুরী, বৃটনের প্রতাপ ও স্পর্দ্ধা এবং বৃটেনিয়ার নাম-মুদ্রা।

" নব আবিষ্কৃত আমেরিকা দেশে,
কিম্বা আফ্রিকার মৃগ-তৃষ্ণিকায়,
ঐশ্বর্য্য-শালিনী পুরব প্রদেশে,
ইংলণ্ডের কীর্ত্তি না আছে কোথায় ?
পুরব পশ্চিম গায় সমুদয়।
জয় জয় জয় বৃটিশের জয়।

এদিকে ভারত ? ভারত ভূমির প্রতিও একবার ফিরিয়া চাও। যে রাজ্য কোন দিন অবনীর ললাটমণি ছিল—যাহার কমনীয়জ্যোতিঃ প্রাতঃসূর্য্যের কিরণমালার ন্যায় জগৎকে আশ্বস্ত ও আলোকিত করিয়াছিল, আজি তাহার কি দশা ঘটিয়াছে, তাহাও একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখ। ভারতভূমি কোথায় ?—সমীরণ যে গভীর নিশীথে এই দিগন্ত-বিস্তারিত মহাশ্মশানের উপর দিয়া হাঁ হাঁ শব্দে প্রবাহিত হয়, উহাও বিলাপিয়া বিলাপিয়া ইহাই পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করে,—ভারত! তুমি কোথায় ? পৃথিবীর মানচিত্রে কোন দেশকে এইক্ষণ ভারতবর্ষ বলে ? ভারতে যুগান্তর ঘটিয়াছে। উত্তরে হিমাদ্রি, পশ্চিমে বিন্ধ্যাচল এবং পূর্ব্বে চন্দ্রনাথ প্রভৃতি পর্ব্বতপংক্তি ভিন্ন ভারতের সমস্তই প্রলয়পয়োধির জলোচ্ছ্বাসে ধৌত হইয়া গিয়াছে। ভারতের নাম পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হইয়াছে। যাহা দেখিতেছ, অথবা গ্রন্থপত্রে যাহার বিবরণ পাঠ করিতেছ, তাহার নাম ' বৃটিশ ইণ্ডিয়া '। নূতন সৃষ্টি, নূতন রাজ্য, এবং সর্ব্বত্রই নূতন শক্তির সঞ্চার-চিহ্ন !

এই নূতন ভারতের অস্থি, মজ্জা, রক্ত, মাংস সমস্তই এইক্ষণ বৃটেনিয়ার। এখানে ভারতবাসী নিজবাসগৃহে, নিজ বাস্তভূমিতেও পরপ্রত্যাশী, প্রবাসী ; এবং বৃটন প্রবাসী হইয়াও সর্ব্বেসর্ব্বা ও গৃহস্বামী। বৃটিশ জাতীয়ের মধ্যে যাঁহাদিগের মস্তিষ্কে বুদ্ধি, বাহুতে বল, এবং সমাজে আধিপত্য আছে, যাঁহারা পুরুষমণ্ডলে পরিগণ্য ব্যক্তি, তাঁহাদিগের কথা আর অনর্থক কেন উল্লেখ করিব ? যে বৃটন স্বদেশে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও দিনান্তে মুষ্টিমিত উচ্ছিষ্টান্ন সংগ্রহ করিতে পারে না, স্বদেশীয় আঢ্য লোকদিগের পদাঘাতেও যাহার অপমান বোধ হয় না, আপনার উদরান্ন সংস্থানের জন্য ভার্য্যা বিক্রয়েও যাহার লজ্জা কি ঘৃণা জন্মে না, সেও একলম্ফে সমুদ্র পার হইয়া ভারতীয় মৃত্তিকায় পদক্ষেপ করিতে পারিলেই রাজাধিরাজ রাজচক্রবর্ত্তী। তখন তাহার মুখচ্ছবি হইতে অগ্নিবৃষ্টি হয়, দৃষ্টি সকলকেই যেন 'দূরে রহ' বলিয়া আদেশ করে, বাক্যে রাজা এবং রাজসিংহাসনও বিনষ্ট কি বিচূর্ণিত হইয়া যায়—এবং মেদিনী যেন প্রতিপদ-নিক্ষেপেই থর থর কাঁপিয়া উঠে। সে যত কেন নিঃসম্বল হউক না, এখানে পহুঁছিলেই ব্রহ্মাণ্ড তাহার ; কারণ লক্ষ্মী এখানে দাসীর ন্যায় তাহার পরিচর্য্যা ক-

রেন,সৌভাগ্য আপনি গিয়া তাহার শোভা সম্পাদনে রত হন,এবং মান ও সম্পদ এখানে বিনা আহ্বানেও তাহার চরণতলে লুটাইয়া পড়েন। আর, সে যত কেন দুরন্ত, দুশ্চরিত্র ও কলঙ্কিত হউক না, এখানে সমাগমমাত্রই সে 'শুদ্ধ-স্ফটিক-সঙ্কাশ' নির্ম্মল পুরুষ; কারণ চন্দ্রেও কলঙ্করেখা সম্ভবে, তথাপি এই ভারতরাজ্যে বৃটিশ-চরিত্রে কখনও কলঙ্ক সম্ভবে না। যদি সে প্রমত্ত ব্যাঘ্র ভল্লুকের মত নরমুণ্ড লইয়া খেলা করে, এখানে তাহার নাম বারুণী-মদ-মত্ততা, যদি সে পরস্ব লুণ্ঠন করে, এখানে তাহা প্রমোদ-ক্রীড়া এবং যদি সে ক্লাইবের সাধু দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া কপটলেখ্য প্রস্তুত করে, এখানে তাহার পরিচয় অকল্পিত-পূর্ব্ব প্রতিভা। নিয়ম তাহারই অধীন, সে নিয়মের অধীন নহে। যে তাহার প্রহার সহিতে না পারে,সে অশিষ্ট, সে উদ্ধত; যে তাহাকে ভোগ্য বস্তু সংহরণ করিয়া দিতে না পারে, সে শঠ, সে ধূর্ত্ত; এবং যে পঞ্চমুখে তাহার স্তুতিগীত গাইতে না পারে, সে অজ্ঞ,সে মিথ্যাবাদী। তাহার ইচ্ছায় বিধি, তাহার অভিসম্পাতে বিপদ, এবং তাহার সন্দেহ কি চিত্তবিকার জন্মিলে, নিতান্ত অসম্ভব্য স্থলেও সর্ব্বনাশ কি ঘোরতর বিপ্লব। ভারতাগত বৃটনদিগের সকলই যে এইরূপ, এমন বলা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। আমরা গুণে কি জ্ঞানে যেকলে নহি। সুতরাং একজন কি একশত জনের চরিত্র দেখিয়াও একটি সমগ্রজাতির চরিত্র সম্বন্ধে কোন রূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বসিতে আমাদিগের সাহস হয় না। আমরা জানি যে, বৃটিশ দ্বীপ হইতে এদেশে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের অনেককে দেবতা বলিয়া পূজা করিতেও লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে, তাঁহাদিগের সংস্পর্শেও মনুষ্য কৃতার্থ হয়। কিন্তু বৃটিশ বংশীয় অপদেবতাও যে এখানে আসিয়া উপরোক্তরূপে দেবতা এবং অনাহূত অধিপতি হইয়া বসে, কে এ কথার অপলাপ করিবে ?

এদেশে বৃটনের বাহ্যপ্রতাপ যদি এইরূপ বিস্ময়জনক, বৃটনের অভ্যন্তরীণ প্রতাপ তাহা অপেক্ষাও অধিকতর বিস্ময়জনক। জাতিবিশেষের উপর জাতিবিশেষের বাহ্য প্রভুতায় শরীর ও সম্পত্তিমাত্র স্পৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু অভ্যন্তরীণ প্রভুতায় সমাজের আত্মা এবং প্রাণ পর্য্যন্ত আহত হয়। জর্ম্মণ এবং ফরাশি এই দুই জাতিতে বহুকাল ব্যাপিয়া বিরোধ যাইতেছে। কখনও ফরাশি বীর বর্লিন নগরে জয় ভেরী বাজাইয়াছে এবং কখনও জর্ম্মণ পঙ্গপাল পারিশ নগরে প্রবিষ্ট হইয়া পৈতৃক ঋণ পরিশোধ করিয়াছে। আলশেষ আর লোরেন, তন্তুবায়ের করধৃত তুরি-যন্ত্রের ন্যায়, একবার ফ্রান্সে গিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে এবং একবার জর্ম্মণীর করতলস্থ হইতেছে। কিন্তু আজি পর্য্যন্তও ফ্রান্স জর্ম্মণী হয় নাই, কিংবা জর্ম্মণী ফ্রান্স হইয়া যায় নাই। বৃটনের সংস্পর্শে

ভারতসমাজে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব ঘটিয়াছে,—বৃটনের পরাক্রম কেবল বাহিরেই পর্য্যবসিত না হইয়া একবারে সমাজের মূল পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। ভারতে যেখানে বেদ ও উপনিষদাদির পঠন পাঠনা হইত, সেখানে এইক্ষণ বাইবল; যেখানে মন্বত্রি যাজ্ঞবল্ক্যাদি শাস্ত্রপ্রবর্ত্তকদিগের পূজা হইত, সেখানে এইক্ষণ ব্লাকষ্টোন, বেন্থাম এবং ষ্টিফেন; ভারতের বধূ এইক্ষণ বিবি, ভারতের বৈকুণ্ঠ এইক্ষণ বিলাত, এবং ভারতবাসীর কৈবল্যলাভ এইক্ষণ বৃটিশ-বৃষের প্রসন্ন। ভক্ত যেমন ভববন্ধন মোচনের জন্য বরদার আরাধনা করে, বর্ত্তমান ভারতও সেইরূপ ভবভয় হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য বৃটেনিয়ার আরাধনা করিতেছে;—কখনও উর্দ্ধনেত্র, কখনও অবাঙ্মুখ, কখনও উত্তানশায় এবং কখনও বা একপদে দণ্ডায়মান হইয়া ঐ একই মূর্ত্তির ধ্যান ধারণায় নিমগ্ন রহিয়াছে। এদেশে কবি কাব্য লিখিবেন, তাহার বিষয় এলবার্ট কি এডওয়ার্ড, এবং আদর্শ মিল্টন কি বাইরণ;—সমাজ-সংস্কারক নির্জ্জীব হিন্দুসমাজে তাড়িত-বল প্রয়োগ করিয়া পুনরায় উহাকে সজীব করিবেন, তাঁহার অশ্রুপাত ব্রিষ্টল নগরে কি বার্মিংহমে; এদেশে বিবাহ পদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত তাহার ব্যবস্থাদাতা মোক্ষমূলর; বেদাঙ্গ ও ব্যাকরণাদি শাস্ত্রের ভাষ্যকার গোল্‌ডষ্টুকর; অভিধানকর্ত্তা উইলিয়ম কি উইলসন; পরিধেয় বস্ত্র মানচেষ্টরে লবণ লিভরপুলে; এবং এদেশের জীবন, মৃত্যু, উত্থান ও পতন এবং শুভাশুভ যত কিছু কল্পিত হইতে পারে, তাহার বিধিলিপি বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টে।

ভারতে পাপ পুণ্য এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের সূক্ষ্ম পার্থক্যও এইক্ষণ প্রক্ষালিত হইয়া গিয়াছে, নীতি শাস্ত্র সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, এবং ভজনা ও আরাধনা রূপান্তর লাভ করিয়াছে। ধর্ম্ম কি আর পুণ্য কিসে এই কথা লইয়া পুরাতন দার্শনিকগণ কতই শাস্ত্র মন্থন ও বিচার বিতর্ক করিয়াছেন। ভারতবাসীর ধর্ম্ম এবং পুণ্য, ইহকাল এবং পরকাল সমস্তই এইক্ষণ বৃটবের সেবকজন-বাঞ্ছিত পদপঙ্কজে! গোপনে কি স্বজাতীয় সমাজের জ্ঞান-গোচরে কোন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে এইক্ষণ আর ভারতবাসীর আত্মা পরিতৃপ্ত হয় না। যে অনুষ্ঠান বৃটিশ ঢক্কায় বিঘোষিত না হইল, তাহা অনুষ্ঠান নহে, এবং যে কার্য্যের যশোধ্বনি পর্ব্বত ও সাগর লঙ্ঘন করিয়া বৃটেনিয়ার উপকূলে গিয়া না ঠেকিল,তাহাও কোনরূপ কার্য্য মধ্যে গণনীয় নহে। যাহা বৃটিশ চক্ষে প্রীতিপ্রদ তাহাই পবিত্র এবং মঙ্গলকর; এবং যাহা বৃটিশ চক্ষে অপ্রিয়, সহস্র অনুশাসন থাকিলেও তাহা অপবিত্র এবং অমঙ্গলের নিদান। ভাবগদ্গদ ধর্ম্মোপদেশকগণ বৃটনিয়াকে অতিক্রম করিয়া ইষ্টনাম জপ করিতেও এইক্ষণ ভালবাসেন না, অথবা মনে উৎসাহ পান না। সুতরাং

এদেশে প্রার্থনা এবং ভুক্ত্ স্তির জন্য অনুতাপাদিও ইদানীং বিজেতৃ-ভাষাতেই অহরহঃ পরিব্যক্ত হইয়া থাকে। যেন ব্রটন আগে না শুনিলে বিধাতাও শুনিতে পান না, এবং ব্রটিশ হৃদয় বিগলিত না হইলে দয়ার সেই অনন্ত প্রস্রবণও বিগলিত হয় না। অহো লজ্জা! অহো লাঞ্ছনা! অহো বিড়ম্বনা! পৃথিবীতে জেতা এবং পরাজিত, অথবা আশ্রয় এবং আশ্রিতের মধ্যে কোন দেশেও কি কস্মিন্‌কালে এইরূপ উপাস্য উপাসকের সম্বন্ধ ঘটিয়াছে? আজি সেই জয়মাল্যভূষিত জগদ্দাণ্ডক আর্য্যজাতির ক্রীড়াকাননরূপিণী ভারত ভূমি আহারে ব্যবহারে, শিক্ষায় ও দীক্ষায়, ভাষায় ও বেশ বিন্যাস-ভঙ্গিমায়, আমোদে উৎসবে, এবং লৌকিক ও অলৌকিক সর্ব্ববিধ ব্যাপারে যেরূপ 'ব্রটিশ ইণ্ডিয়া' হইয়াছে, ভেকভুজঙ্গভাবাপন্ন অন্য কোন দুই জাতিতেই কি কখনও এইরূপ দেখা গিয়াছে?

এই অচিন্তিত-পুর্ব্ব অবস্থান্তর পর্য্যালোচনা করিয়া, সকলেই ইহা জিজ্ঞাসা করিবেন ;—এইরূপ কেন হইল? আমাদিগেরও ইহাই প্রধান জিজ্ঞাসা,—এইরূপ কেন হইল? আজি ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্রতর ব্রটিশ দ্বীপের ইতিহাস জগতে কেন এইরূপ গৌরবের ছটায় শোভা পাইল, এবং আজি ভারতবর্ষের ইতিহাসও কেন অতল কলঙ্কসাগরে ডুবিয়া গেল? এ প্রশ্ন পরিহাসের নহে। যদিও পণ্ডিতেরা উপদেশ করিয়াছেন যে, "কৃতস্য করণংনাস্তি গতস্যানাস্তি সূচনা", অর্থাৎ যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা আর ফিরিবার নহে এবং গত বিষয়ের অনুসূচনা বৃথা, কিন্তু একথায় আমাদিগের মন প্রবোধ মানে না। আমাদিগের এইরূপ বিশ্বাস যে, যাহা অতীত তাহাই ভবিষ্যতের আলোকবর্ত্তিকা। অতএব অতীত কথার মর্ম্মোদ্ধার করিয়াই ভবিষ্যতের অর্থগ্রহ করিতে হইবে। বালক পদস্খলন-বেদনা হইতেই ভবিষ্যতে পাদচারণা করিতে শিক্ষা পাইয়া থাকে, এবং যেসকল জাতি অধঃপাতে গিয়াছে তাহারাও ঐ অধঃপাতের দুর্ভোগ হইতেই পুনরুত্থানের উপায় দর্শন করে। ভারতবর্ষ একবারে অধঃপাতে গিয়াছে। যদি উহার পুনরুত্থানের সম্ভাবনা থাকে, তবে তাহার অবলম্বনযষ্টি ঐ অধঃপাতে। বৃথা চীৎকার করিলে হইবে না, বৃথা আস্ফালন করিলেও হইবে না। কিন্তু অতি স্থিরভাবে, অতি প্রশান্তবুদ্ধিতে, অতীব গাম্ভীর্য্যসহকারে ব্রটন আর ভারতীয়-আর্য্য এই উভয় জাতির অভ্যুদয় এবং অধোগমনের মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে।

ভারতে কি বীরত্বের অভাব? যিনি ভারত-সন্তানকে নির্ব্বীর্য্য কাপুরুষ বলেন, তিনি মনুষ্য-প্রকৃতি বিষয়ে অদ্যাপি অনভিজ্ঞ। রামায়ণ যে দেশের আদি কাব্য, মহাভারতের বীররসবিলাসিনী প্রমাদিনী বর্ণনায় যে দেশের স্বাভাবিক চিত্র, এবং ভারবি ও মাঘ যে দেশের শেষ সময়ের কবি, সে দেশ যে কোন সময়েও পুরুষ-

কারের মোহন-মাধুরি বিষয়ে অন্ধ ছিল, এমন কথা মনে করাও নিষ্ঠুরতা। এই যে সে দিনও রাজপুত জাতি ভারতীয় রঙ্গভূমিতে ক্রীড়া করিয়াছে, ইহাদিগের ক্রিয়াকলাপও কি পুরাবৃত্তশাস্ত্র বিস্মৃত হইবে? স্বদেশীয়েরাই বরং স্বদেশবাৎসল্যে মোহিত হইয়া একে আর কল্পনা করিতে পারেন। কিন্তু বিদেশীয়ের আর তাহা হয় না। বিদেশীয় কর্ণেল টড রাজপুতচরিত্রের গরিমা ও বীর্য্যবত্তা সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া কাহার চক্ষু না অশ্রুজলে পরিপ্লুত হয়? কোন্ নিরুৎসাহ হৃদয় না অভিমানে স্ফীত ও স্ফীত হইয়া উঠে? তিনি বলিয়াছেন,—" রাজস্থানের যেখানে যাও, সেখানেই থর্ম্মপোলী, যে রাজ্যে প্রবিষ্ট হও, সেই রাজ্যেই লিয়নিডাস "। মনে রাখিও,—থর্ম্মপোলী আর লিয়নিডাস সামান্য নাম নহে। ইতিহাসের আদরের ধন পুরাতন গ্রীসদেশে যদি কোন পুণ্যপুঞ্জময় মহাতীর্থ থাকে, সেই তীর্থ থর্ম্মপোলী;—আর, স্বর্গস্থ বীরেন্দ্রসমাজে যদি কোন প্রাতঃস্মরণীয় বীর দেশানুরাগ এবং অদীনপরাক্রমের জন্য সকলের প্রাণগত শ্রদ্ধা এবং প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি পাইতে অধিকারী হইয়া থাকেন, সেই বীর লিয়নিডাস। ঐতিহাসিকের পক্ষপাতশূন্য কঠোর লেখনী যে দেশের অধিকাংশ যোদ্ধৃপুরুষকেই লিয়নিডাস এবং অধিকাংশ যুদ্ধস্থলকেই থর্ম্মপোলী বলিয়া অভিবাদন করিয়াছে, সেই দেশও কি বীরত্বশূন্য? পণ্ডিতবর ডফ এবং অন্যান্য পুরাবৃত্তলেখকগণ মহারাষ্ট্রীয়দিগের যে বিবরণী দিয়াছেন, তাহাও ভারতের অযশস্কর নহে। ফলতঃ রাজপুত যদি মদগর্ব্বে সিংহ, মহারাষ্ট্রী তবে শার্দ্দূল, এবং নেপালী ও পঞ্জাবী প্রভৃতি অন্যান্য জাতীয়েরাও অনেক গুণেই ইহাদিগেরই অনুরূপ। মুসলমান সম্রাট্‌গণ ইহাদিগেরই কোন না কোন জাতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রাজ্যশাসন করিয়াছেন; ভারতে বৃটিশ পতাকাও ইহাদিগেরই কোন না কোন জাতির বাহুবলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ইহাদিগের আকস্মিক ক্রোধস্বরূপ যে ভয়ানক ভূকম্পে বৃটিশসিংহাসন টলমল হইয়াছিল, তাহাও পুনরায় ইহাদিগেরই কোন না কোন জাতির প্রভুপরায়ণতায় রক্ষা পাইয়াছে; এবং চীন, তাতার, আফগান ও বর্ম্মী প্রভৃতি বিদ্বেষপর প্রতিবেশীরাও ইহাদিগেরই গর্জ্জনধ্বনিতে বৃটনের নিকট নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। ভারত, চিরকালই এইরূপ বীরতার বিহারক্ষেত্র। কিন্তু তথাপি উহা পরের নিকট আত্মবিক্রয় করিতে বাধ্য কিংবা প্ররোচিত হইল কেন?

ভগবদ্ভক্ত বৃদ্ধ বলিবেন, ' ইহা ললাটের লেখা '। ললাটে যাহা লিখিত থাকে, কিছুতেই তাহার খণ্ডন হয় না; সূর্য্য চন্দ্র কক্ষভ্রষ্ট হইলেও ললাট-লিপির অন্যথা ঘটে না। আবার, পাশ্চাত্য-প্রবাদভক্ত ধর্ম্মানুরত নব্যযুবা বলিবেন, ইহা বিধাতার ' বিশেষ বিধান '। কিন্তু এই নিয়মতন্ত্র লৌহযুগে এই উভয় সিদ্ধান্তই

অযৌক্তিক ও অবলাজনযোগ্য বলিয়া উপেক্ষণীয়, এবং আশাশূন্য ও সর্ব্বপ্রকার উদ্যমের অন্তরায় স্বরূপ বলিয়া বুদ্ধিমানের পরিত্যজ্য। যাহা পাপ, যাহা প্রতারণা, যাহাতে ছলনা, বঞ্চনা, এবং নির্ম্মম নিষ্ঠুর ব্যবহারের পরিসীমা নাই, রাজনীতির সেই কূটলীলাও কি ললাটলিপি এবং বিধাতারই 'বিশেষবিধি' ? আর,আজি এই ললাটলিপি এবং দৈবনির্দ্দিষ্ট 'বিশেষ বিধির' অনুশাসনেই কি ভারত পৃথিবীর জাতীয়সভার আসনচ্যুত, অস্তিত্বহীন, নিস্পন্দ ও নীরব ? যাঁহারা, পার্থিব পক্ষের অস্পৃশ্য, অচিন্ত্য-প্রকৃতি বিধাতৃপুরুষে, এইরূপ লোকাচারের কলঙ্কারোপণ করেন, তাঁহারা যার পর নাই সরলমতি হইতে পারেন, কিন্তু কখনও মনুষ্যমণ্ডলীর অধিনায়কতার উপযুক্ত নহেন। তাঁহাদিগের দ্বারা লূতাতন্তুসদৃশ দর্শনশাস্ত্রের পুষ্টিসাধন হইতে পারে, কিন্তু কখনও স্বজাতির কোন উপকার দর্শে না।

পক্ষান্তরে, যাঁহারা সংসারের নিয়মাবলী এবং সংসারের ঘটনানিচয় পাঠ করিয়াই সাংসারিক ব্যাপারের কার্য্যকারণ নিরূপণ এবং নীতিসূত্র নির্ব্বাচন করেন,—ঐহিক কথার মীমাংসায় ঐহিক শাস্ত্রেরই সাহায্য লন, উল্লিখিত বিষয়ে তাঁহাদিগের ধারণা অন্যরূপ। তাঁহারা বলেন যে, বৃটন আর ভারতবাসীর প্রকৃতিগত প্রভেদ এবং অতি প্রাচীন কাল হইতে সেই প্রভেদের ক্রমিক বিকাশই এই উভয়ের অধুনাতন অবস্থাগত প্রভেদের একমাত্র কারণ। বৃটিশ জাতি যে মন্ত্রের সাধনা করিয়াছে, তাহার সেই মন্ত্রে সিদ্ধি হইয়াছে ; আর ভারতবাসীও যে মন্ত্রের জপনা দ্বারা ইহলোকেই লোকান্তরীয় অনন্ত নিদ্রার কামনা করিয়াছে, তাহারও সেই মন্ত্রে ঠিক সেই ফলই ফলিয়াছে।

বৃটিশের মূলমন্ত্র অতৃপ্তি, অসন্তোষ ; ভারতবাসীর মূলমন্ত্র তৃপ্তি আর লয়। বৃটিশ নিত্যক্রিয়ান্বিত, নিরালস্য এবং নিদ্রাহীন ;—ভারতবাসী ক্রিয়াশূন্য, আলস্যময় এবং স্বভাবতঃ চিরনিদ্রাভিভূত। বৃটিশের সকল কার্য্যই সংযোগে ;—অভ্যন্তরে শত সহস্র বিরোধ থাকিলেও তাহার সংযুক্ত হইবার ক্ষমতা আছে। সুতরাং একতাতেই তাহার বল, একতাতেই তাহার বৃদ্ধি ও বৈভব, এবং একতাতেই তাহার সুখ। ভারতবাসীর সকল কার্য্যই বিয়োগে ;—কেহ সংযোজন করিয়া দিলেও সে আপনা হইতে পুনরায় বিযুক্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং অনৈক্যেই তাহার দুর্ব্বলতা, অনৈক্যেই তাহার ক্ষয় ও পরাভব এবং অনৈক্যেই তাহার দুঃখ। বৃটিশের চক্ষু, বিজ্ঞান এবং ইতিহাস ; ভারতের চক্ষু, দর্শন এবং কাব্য। ইহাও উভয়ের প্রকৃতিগত বিরোধেরই ফল। বৃটিশের ধর্ম্মনীতি 'লাভ' ; ভারতবাসীর ধর্ম্মনীতি 'দান'। বৃটিশের রাজনীতি 'অবিশ্বাস' ; ভারতবাসীর রাজনীতি 'বিশ্বাস'। এই শেষোক্ত কথা শাস্ত্র

দ্বারা সপ্রমাণ না হইলেও শত সহস্র কার্য্য দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে। বৃটিশের সকল তত্ত্বের সারতত্ত্ব 'স্বত্ব'; স্বত্বরক্ষা এবং স্বত্ববিস্তারের জন্য সে সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সকল কার্য্যই সম্পাদন করিতে পারে। তখন অগ্নি তাহার ভয় জন্মায় না, সাগর তাহাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখে না, এবং স্নেহ মমতা প্রভৃতি কোন বন্ধনীই তাহাকে বন্ধন করিতে অথবা অনাহার, অনিদ্রা, অনাশ্রয় পর্য্যটন, কারাবাস, অপমান, ও মৃত্যুযন্ত্রনা প্রভৃতি কোন বিভীষিকাই প্রতিবন্ধকরূপে তাহার সম্মুখীন হইতে সমর্থ হয় না। ভারতবাসীর সকল তত্ত্বের সারতত্ত্ব শাস্ত্রসাশিত নিরুপদ্রব 'সুখ'। সে এই অকণ্টক সুখের তুলনায় কোন স্বত্বকেই স্বত্ব বলিয়া মানে না, কোন নিগ্রহকেই নিগ্রহ বলিয়া গণনায় আনে না, এবং যদি সৃষ্টি মস্তকের উপর দিয়া বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়, তথাপি সে আপনি তাহার সেই 'সুখ' লইয়া অক্ষুণ্ণ ও অক্ষত রহিলে তৎপ্রতি ফিরিয়া চায় না। এই জন্যই বৃটেনিয়ায় মেগনাচার্টার দুর্ভেদ্য বর্ম্ম, এবং এই জন্যই ভারতে দণ্ডশাস্ত্রের দৃঢ় নিগড়। সার্থকজন্মা বৃটন এই সমস্ত হেতুতেই দ্বিতীয় বিশ্বকর্ম্মার ন্যায় ভূতলে স্বর্গ নির্ম্মান করিয়াছে, আর ভারতবাসীও এই সমস্ত হেতুতেই ভূতলস্থ ব্যাপারে বীতস্পৃহ ও ক্ষমতাহীন হইয়া সশরীরে স্বর্গবাসী হইতেছে!

ভারতের এইক্ষণ যদি কিছু আশা থাকে, সেই আশাও, বোধ হয়, ঐ বৃটনে! ইচ্ছায় হউক, আর অনিচ্ছায় হউক, সুখে হউক, আর দুঃখে হউক, বৃটনের স্বার্থেই ভারতের পুনর্জ্জীবন-সম্ভাবনা। বৃটন দয়ার অনুরোধে যাহা না করিয়াছে, কর্ত্তব্য-বুদ্ধি ও কৃতজ্ঞতার শাসনেও যাহা না করিতে পারিয়াছে, সম্ভবতঃ এইক্ষণ স্বার্থের অনুরোধে তাহা করিবে, এবং ইউরোপে আপনার শক্তি, সম্পদ, ও সম্মান বৃদ্ধির জন্যই ভারতের মৃতকল্প দেহে ধীরে ধীরে বৈদ্যুত-বল চালনা করিতে তৎপর হইবে। অতএব ইহা সকলেরই প্রার্থনীয়, অন্ততঃ প্রয়োজনের জন্যও বাঞ্ছনীয়, যে, এই দুইয়ের বর্ত্তমান সম্বন্ধ দীর্ঘস্থায়ী হইয়া উত্তরোত্তর অধিকতর জড়িত হউক, এবং উহা বিদ্বেষশূন্য ও শঠতাবর্জ্জিত হইয়া অতঃপর দুইয়েরই মঙ্গল সাধন করুক। আমেরিকা যেমন ইংলণ্ডের এক অক্ষয় কীর্ত্তি, হইতে পারে এই বৃটিশ ইণ্ডিয়াও কালে বৃটনজাতির তেমন কি ততোধিক উজ্জ্বল আর এক কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ দণ্ডায়মান হইবে, এবং কালে যে সকলই সংঘটিত হইতে পারে প্রমাণের উপর পুনরায় ইহার প্রমাণ দিয়া ভবিষ্যবংশীয়গণকে আনন্দিত করিবে।

রামায়ণ।

বৈদেশিক পণ্ডিতদিগের মত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমি পূর্ব্বে রামায়ণ হইতে দুটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, রামচন্দ্র ও বাল্মীকি একসময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, সুতরাং রামের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহা ঠিক বাল্মীকিতেও প্রযোজিত হইতে পারে। এইক্ষণে সূক্ষ্মরূপে বাল্মীকি ও রাম এই দুইয়ের অন্যতরের সময় নিরূপণ করিতে পারিলেই রামায়ণের প্রাচীনত্ব কতদূরে সীমাবদ্ধ তাহা অনায়াসে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। কিন্তু এইরূপ সূক্ষ্মতা সহকারে ঈদৃশ বিষয়ের সময়নিরূপণ নিরতিশয় দুরূহ ব্যাপার। এই দুরূহত্ব কেবল বাল্মীকির রামায়ণেই পর্য্যবসিত হয় নাই, হোমরের মহাকাব্যেও ইহা আবদ্ধ হইয়া সাধারণকে দিশাহারা করিয়া তুলিতেছে।

যাহা হউক, আমি সমুদয় পৌরাণিক যুগ অতিক্রম করিয়া রামায়ণের প্রাচীনত্ব নিরূপণে প্রবৃত্ত হইতেছি। সুপ্রসিদ্ধ পুরাণতত্ত্বজ্ঞ উইলসন্ ও বর্ণুকের মতে পুরাণসমূহ রামায়ণ অপেক্ষা আধুনিক সময়ে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং রামায়ণের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে পৌরাণিক যুগ বিষয়ক অবান্তর তর্কের অবতারণার কোনও আবশ্যকতা দৃষ্ট হইতেছে না। এতন্নিবন্ধন উক্ত সময় পরিগণনা-বহির্ভূত করিয়া আমি খ্রীষ্টীয় অব্দের সপ্তাধিক পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী সুপ্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্যের সময়ে উপনীত হইতেছি। এই সময়ে রামায়ণ-বর্ণিত অতি বিস্তৃত ঘটনার সংক্ষিপ্ত ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক একখানি মহাকাব্য প্রণীত হয়; এই মহাকাব্যকারের নাম কালিদাস, মহাকাব্যের নাম রঘুবংশ। যদি ইহার সংক্ষিপ্ততা রামায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তিতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ না হয়, যদি ইহার শিল্পকুশলা কল্পনার ব্রীড়াময়ী কবিতাদ্বারা রামায়ণের সারল্যময়ী ও স্বভাবশোভিনী কবিতার পূর্ব্ববর্ত্তিতা প্রমিত না হয়, তাহা হইলেও কেবল একমাত্র কালিদাসের উক্তি দ্বারাই রামায়ণকে তৎপ্রণীত রঘুবংশের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। কালিদাস রঘুবংশের প্রারম্ভে পূর্ব্বতনপণ্ডিতদিগকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় মহাকাব্য নিবন্ধনের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

" অথবা কৃত বাগ্দ্বারে বংশেঽস্মিন্
পূর্ব্বসূরিভিঃ।

মনো বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি
মে গতিঃ ॥,,

পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ এই রঘুবংশীয় ইতিবৃত্তের কবাট উদ্ঘাটন করিয়াছেন, সুতরাং হীরকচ্ছিন্ন মণির অভ্যন্তরে সূত্রের ন্যায় ইহাতেও আমার প্রবেশ পথ লক্ষিত হইতেছে। যে সমস্ত ভারতীয় কাব্যে রামচরিত বিবৃত হইয়াছে, বাল্মীকিই তৎসমুদয়ের আদি ও অদ্বিতীয় প্রস্রবণ, সুতরাং আমার বিবেচনায় কালিদাসলিখিত পূর্ব্বতন পণ্ডিতসম্প্রদায়ের মধ্যে বাল্মীকির নাম সহজেই নিবেশিত হইয়া উঠিতেছে।

কালিদাসের সময় পরিত্যাগ করিয়া আরও উর্দ্ধে অগ্রসর হইলে আমার সমক্ষে হিমালয়-ভূধরমালার ন্যায় অনন্তউচ্চতাশোভি গম্ভীর-দৃশ্য মহাকাব্য-স্তম্ভ পরিদৃষ্ট হয়। ভারতীয় কিম্বদন্তী ইহাকে অতি প্রাচীন বলিয়া নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বেদবিভাগকর্ত্তা ব্যাসের কৃতিত্বে নিবেশিত করিয়া থাকে। এই উত্তুঙ্গ কাব্যস্তম্ভ মহাভারত নামে আখ্যাত। আমি এই মহাকাব্যরূপ বিরাট মূর্ত্তির নিকট মস্তক অবনত করিতেছি। প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে এই মহাকাব্য আমার মতে নিঃসন্দেহ রামায়ণ অপেক্ষা আধুনিক। কোন সাহিত্যগ্রন্থের বিশেষতঃ মহাকাব্যের প্রাচীনত্ব নির্দ্ধারণ করিতে হইলে তাহার প্রত্যেক সূক্ষ্মাংশের তারতম্য করা বিধেয়। কাব্যের এই সমস্ত সূক্ষ্মাংশ সমধিক প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে, কিন্তু কাব্য মধ্যে এই গুলির সমন্বয় ও শৃঙ্খলা বিধানে স্থলবিশেষে প্রাচীনত্বের ইতর বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। এই জন্যই আমি মহাভারতে ঈদৃশ অংশ সমূহের শৃঙ্খলা বিধান রামায়ণ অপেক্ষা আধুনিক বলিতেছি। রামায়ণ যে মহাভারত অপেক্ষা প্রাচীন তাহা মহাভারতের লিখনভঙ্গীতেই প্রতিপন্ন হইতে পারে। মহাভারতের একস্থলে উল্লিখিত আছে, বাল্মীকি একসময়ে ঋষিশ্রেষ্ঠ নারদ কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া সমগ্র রাম-চরিত গান করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। এতদ্ব্যতীত মহাভারতে বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। রামায়ণের প্রাচীনত্ব পরিপোষক এই প্রমাণদ্বয় ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ চরিতের উল্লেখ করা যাইতে পারে। মহাভারতের কৃষ্ণচরিত্র (যদিও গীত গোবিন্দ বর্ণিত কৃষ্ণ চরিতের সহিত ইহার কোনও সামঞ্জস্য নাই) রামায়ণে পরিদৃষ্ট হয় না, রামায়ণ মহাভারতের পরবর্ত্তী হইলে বাল্মীকি কখনও শ্রীকৃষ্ণের দেবভাবের বিষয় উল্লেখ করিতে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিতেন না। এতদ্দ্বারা রামায়ণের প্রাচীনত্ব সম্যক্ পরিস্ফুট হইতেছে।

আমি রামায়ণের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যে যে যুক্তির উল্লেখ করিলাম, তদ্বিরুদ্ধে একটি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। আমি স্বীয় মত অক্ষুণ্ণ রাখিবার আশয়ে যথাসাধ্য উক্ত আপত্তির খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইতেছি। ভারতীয় কিম্বদন্তী মহাভার-

তকে ব্যাসের কৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করে। যদি এই ব্যাস বেদবিভাগকর্ত্তা ব্যাসের সহিত অভিন্ন হয়েন তাহা হইলে ইহার আবির্ভাব সময় বৈদিক সময়ের মধ্যে নিবেশিত হইয়া উঠে। কোল্‌ব্রুকের মতে বেদ খ্রীঃ পূঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে প্রণীত হইয়াছিল। সুতরাং এই সময় রামায়ণের সময় অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, ভারতীয় তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতগণ ভারতীয় ব্যাসকে একজন অনিশ্চিত পুরুষের মধ্যে পরিগণনা করিতে পরস্পর ঐকমত্য অবলম্বন করিবেন। বস্তুতঃ আমার মতে ব্যাস ভারতীয় কল্পনার পোষ্যপুত্র ও বেদবিভাগের আরোপিতমূর্ত্তী ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে। সুতরাং ঈদৃশ ব্যক্তি যে কোন সময়েই হউক না কেন, বেদ, মহাভারত ও পুরাণের সংগ্রহকর্ত্তা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

রামায়ণের অবতারণিকায় শ্লোকের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে কিম্বদন্তী উল্লিখিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা রামায়ণের প্রাচীনত্ব অপেক্ষাকৃত দৃঢ়তর হইতেছে। এই কিম্বদন্তী নির্দ্দেশ করিয়া থাকে যে, একদা কামমোহিত ক্রৌঞ্চমিথুনের অন্যতরকে নিষাদশরে বিদ্ধ দেখাতে বাল্মীকির রসনা হইতে অতর্কিত ভাবে এই অনুষ্টুভ্‌ছন্দের শ্লোক বিনির্গত হয়:—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেক মবধীঃ কামমোহিতং" ॥

রে নিষাদ তুমি যখন কামমোহিত ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে হত্যা করিলে, তখন জগতে কখনও তোমার প্রতিষ্ঠা লাভ হইবে না।

রঘুনাথ বাচস্পতি নামক জনৈক উত্তরাঞ্চলীয় টীকাকার এই শ্লোকটি রূপকালঙ্কারের মধ্যে পরিগণিত করিয়া অন্যরূপ অর্থে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তদীয় মতে শ্লোকোক্ত নিষাদ শব্দ রাবণের প্রতি এবং ক্রৌঞ্চমিথুন রাম ও সীতার প্রতি আরোপিত হইয়াছে। অর্থাৎ রাবণ নির্দ্দয় নিষাদের ন্যায় ক্রৌঞ্চমিথুন-সদৃশ সরল-দাম্পত্য-প্রেমে আবদ্ধ রাম ও সীতার সুখ বিনষ্ট করিয়াছিল। রঘুনাথ বাচস্পতিকৃত এই ব্যাখ্যা নিরবচ্ছিন্ন অন্তঃসার শূন্য; এতন্নিবন্ধন আমি ইহাতে কিছুমাত্র আস্থাবান্ না হইয়া শ্লোকের উৎপত্তি বিষয়ক কিম্বদন্তীর সম্বন্ধেই আর দুই একটি কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। ঋগ্বেদে শ্লোকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা।

"মনীহি শ্লোকমাস্যে পর্জন্য ইবততনঃ।*"

উক্ত বেদের কবিতা এই শ্লোকের অনুরূপ ছন্দেও গ্রথিত হইয়াছে:—

"ইন্দ্রাহি সোম ইন্দ্রদে ব্রহ্মা চকার বর্দ্ধনং।
শবিষ্ঠ বজ্রিন্নোজসা পৃথিব্যা নিশশা অহিং॥" †

* ঋগ্বেদ সংহিতা। ৩৮।

† ঋগ্বেদসংহিতা। ৮।

একণে বাল্মীকিই যদি সর্ব্বাদৌ অনুষ্টুভ্ ছন্দাত্মক শ্লোক রামায়ণে নিবেশিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বেদে কিরূপে তাহা প্রবেশিত হইতে পারে ? বেদ অবশ্যই রামায়ণ অপেক্ষা প্রাচীন, রামায়ণে যখন বেদের বিশেষ উল্লেখ আছে, তখন এবিষয়ে আর কোনও সন্দেহ জন্মিতে পারে না। যাহা হউক এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধমতের সামঞ্জস্য রক্ষার্থ কোনও কূট তর্কের আশ্রয়গ্রাহী হইবার আবশ্যকতা নাই। বোধহয় ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, বেদের সমুদয় অংশ সমান প্রাচীন নয়। কোন কোন অংশ অতি প্রাচীন এবং কোন কোন অংশ অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে বিরচিত হইয়া বৈদিক গ্রন্থে স্থান পরিগ্রহ করিয়াছে। সুতরাং বাল্মীকির উদ্ভাবিত ছন্দে যে সমস্ত কবিতা গ্রথিত হইয়া বেদে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তৎসমুদয় রামায়ণ অপেক্ষা আধুনিক হওয়া অসম্ভাবিত নহে। উপরে ঋগ্বেদ হইতে অনুষ্টুভ্ ছন্দাত্মক যে কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা এই সম্ভাবনা অনুসারে রামায়ণ অপেক্ষা অপ্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে; কিন্তু আমি কেবল ঈদৃশ অনুমানমূলক সম্ভাবনার উপর নির্ভর না করিয়া অন্ধকারময় ইতিহাসপট আলোকিত করিতে অন্যবিধ আলোকবর্ত্তিকার সাহায্য প্রার্থী হইতে বাধ্য হইতেছি।

সুপ্রসিদ্ধ কাশ্মীর ইতিহাস রাজতরঙ্গিনীতে রামায়ণের উল্লেখ আছে। কতিপয় বেদ-নিষ্ণাত ব্রাহ্মণ কোন কারণ বিশেষে ক্রুদ্ধ হইয়া কাশ্মীররাজ দ্বিতীয় দামোদরকে অভিশাপ প্রদান করেন, পরিশেষে প্রসাদিত হইয়া শাপ বিমোচনার্থ এই আদেশ করেন যে, যদি রাজা একদিনে সমগ্র রামায়ণ শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার এই অভিশাপের শান্তি হইবে :—

" অশেষ মেকেনৈবাহ্না শ্রুত্বা রামায়ণং তব।
শাপস্য শান্তির্ভবিতেত্যূচিরে তে প্রসাদিতাঃ ॥" *

একণে কাশ্মীরের বংশাবলী অনুসারে এই দ্বিতীয় দামোদরের পরবর্ত্তী পাঁচজন রাজার রাজত্বের পর তৃতীয় গোনর্দ্দ কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েন। রাজতরঙ্গিনীর মহাপ্রজ্ঞ অনুবাদক ট্রয়ার সাহেবের গণনা অনুসারে তৃতীয় গোনর্দ্দ খ্রীঃ পূঃ ১১৮২ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন †। একণে যদি দ্বিতীয় দামোদর ও তৃতীয় গোনর্দ্দের মধ্যবর্ত্তী পূর্ব্বোক্ত পাঁচজন রাজার রাজত্বকাল গড়ে ২৪ বৎসর ‡ ধরিয়া দ্বিতীয় দামোদরের আবির্ভাব সময়ে উপস্থিত হই, তাহা হইলে আমাদিগকে খ্রীঃ পূঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উপনীত হইতে হয়। আমি এই সমস্ত সময় নিরূপণ

* রাজতরঙ্গিণী। ১। ১৬১।

† ট্রয়ার প্রকাশিত রাজতরঙ্গিনী। ২য়খণ্ড। ৩৭১ পৃষ্ঠা।

‡ ঐ।

সম্বন্ধীয় গণনা বিশিষ্ট সূক্ষ্ম ও অবশ্য বিশ্বাস্য বলিতে প্রস্তুত নহি, কিম্বা আমি গৌরব প্রয়াসী হইয়া রামায়ণের ঠিক সময় নির্দ্ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, উপরে রাজতরঙ্গিনী হইতে যে বাক্যটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তদ্দারা রামায়ণের অতি প্রাচীনত্ব বিশিষ্ট রূপে প্রতিপন্ন হইবে। যে সমস্ত কিম্বদন্তী ভারতবর্ষের ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে তৎসমুদয়ও এই প্রাচীনত্বের দৃঢ়তা সম্পাদন করিতেছে। যেমন প্রকাণ্ড তরুশ্রেষ্ঠের স্কন্ধদেশ হইতে বিবিধ ক্ষুদ্র গুল্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তদ্রূপ রামায়ণ হইতে বিবিধ কিম্বদন্তী উদ্ভুত হইয়া ভারতবর্ষ পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই রামায়ণোদ্ভব কিম্বদন্তীতে ভারতশরীর ওতপ্রোত। উদ্ভুত বিষয়গুলি যখন এত প্রাচীন সময় হইতে আপনাদের গতি প্রসারিত করিয়াছে, তখন উদ্ভব-ক্ষেত্র যে তাহা অপেক্ষা প্রাচীন হইবে, তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। যদিও রামায়ণের প্রাচীনত্ব সূক্ষ্মরূপে নিরূপিত না হউক, তথাপি এই সমস্ত যুক্তি অনুসারে উহা অতি প্রাচীন কালীন অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে বোধ হয় আমি ভ্রান্ত বলিয়া পরিগণিত হইব না।

তাম্রপর্ণী ও পালীসিমন্ত সিংহল দ্বীপের দুটি প্রাচীন নাম। এই সংজ্ঞাদ্বয় খ্রীষ্টীয় কতিপয় শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু রামায়ণে এই সংজ্ঞাদ্বয়ের একটিরও উল্লেখ নাই। সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধনৃপতি অশোকের কএক শতাব্দী পূর্ব্ববর্ত্তী মহারাজ বিজয়ের উপনিবেশ স্থাপন উপলক্ষে যে সিংহল* নামের উৎপত্তি হইয়াছে, রামায়ণে তাহারও কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। সিংহল-দ্বীপ রামায়ণে প্রাচীন লঙ্কা নামেই উক্ত হইয়াছে। এরূপ পুরাতন নামের সমাবেশও রামায়ণের প্রাচীনত্বের একটি বলবৎ প্রমাণ।

রামায়ণের সাধারণ ধর্ম্ম।

অযোধ্যাধিপতি সূর্য্যবংশপ্রভব রামচন্দ্র সিংহলের দুর্ব্বৃত্ত ও অসভ্য অধিবাসিদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগকে সমূলে বিধ্বস্ত করেন, এই বিষয়ই রামায়ণের সর্ব্ব প্রধান ঘটনা। এই সাম-

*। এরূপ প্রবাদ আছে, বিজয় স্বয়ং সিংহের সন্তান ছিলেন বলিয়া লঙ্কা অধিকারের পর তিনি উহার ‘ সিংহল ’ নাম রাখিয়াছিলেন। এই কিম্বদন্তী ‘ পেহজাইসি ’ নামক চীন দেশীয় গ্রন্থে ও রাজাবলীতে সবিস্তর বিবৃত হইয়াছে।

অধ্যাপক লাসেনের মতে বিজয় লঙ্কা জয়ের পর উক্ত স্থান ক্ষত্রিয় অর্থাৎ যোদ্ধৃজাতির আবাসভূমি হইল বলিয়া ‘ সিংহল ’ নাম অর্পণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক ; এই বিজয় কর্ত্তৃক লঙ্কা অধিকার যে খ্রীষ্টীয় কএক শতাব্দীর পূর্ব্বে সম্পন্ন হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে মতভেদ নাই।

রিক ঘটনাই বাল্মীকির রসময়ী কবিতায় বিবৃত হইয়া রামায়ণে উপগীত হইয়াছে। রামচন্দ্র যে সমস্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে এই লোকপ্রসিদ্ধ অভিযানে প্রবৃত্ত হয়েন, তৎসমুদয় বিন্ধ্যপর্ব্বতশোভী প্রদেশ হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু রামায়ণে এই সৈন্যব্যূহ বানর জাতিতে পরিগণিত হইয়া বানরীবৃত্তিতে পরিণত হইয়াছে। বোধ হয়, তাহারা অসভ্যপ্রকৃতি ও সংস্কৃতভাষী আর্য্যজাতির সহিত সংস্রবশূন্য ছিল বলিয়া বাল্মীকি তাহাদিগকে এইরূপ পাশবভাবে পরিকীর্ত্তিত করিয়াছেন। রামচন্দ্র যে জাতির বিরুদ্ধে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহারাও উৎপত্তি, সভ্যতা ও ধর্ম্মভাব বিষয়ে আর্য্যজাতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্নলক্ষণাক্রান্ত। কিন্তু হোমার যেমন ট্রোজান ভূমিতে গ্রীসদেশের সামাজিক আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, রামায়ণের কবিও সেইরূপ বিধর্ম্মীর অধ্যুষিত লঙ্কায় সংস্কৃতভাষী আর্য্যজাতির ব্যবহার ও ধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়াকলাপ প্রবর্ত্তিত করিতে ক্রটি করেন নাই। এইজন্যই তদানীন্তন সময়ে উপগীয়মান বেদের পবিত্র ধ্বনি ও আর্য্যজাতির অনুষ্ঠিত পবিত্র আচার পদ্ধতিতে লঙ্কা পরিপূত হইয়াছিল। রামের এই প্রতিদ্বন্দ্বীগণ রামায়ণে রাক্ষস নামে অভিহিত হইয়াছে। ভারতীয় আর্য্যসম্প্রদায়ের মতে রাক্ষসগণ নিরতিশয় হিংস্র, ভয়ানক ও বেদানুমোদিত ক্রিয়াকলাপের সম্পূর্ণ বিরোধী। এই জন্যই বোধ হয়, রামায়ণ-কবি স্বভাবসিদ্ধ ঘৃণার বশবর্ত্তী হইয়া এই আচার-ভ্রষ্ট জাতিকে রাক্ষসিক ভাবে চিত্রিত করিয়া সাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন। 'রাক্ষস' এটি ঐতিহাসিক সত্যোদ্ভূত কোন নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা নহে। সুতরাং রাক্ষস নামে কোন বিশেষ প্রাকৃতিক জাতির অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া পূর্ব্বোক্ত কল্পনার আশ্রয়গ্রাহী হওয়াই সর্ব্বথা সঙ্গত। রাজাবলি নামক সিংহলদ্বীপস্থ রাজবংশের সময়নিরূপণ গ্রন্থে লিখিত আছে, খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিজয় সংস্কৃতভাষী আর্য্যসম্প্রদায়ের অধিনায়ক হইয়া কলিঙ্গপত্তন হইতে সিংহলে আগমন পূর্ব্বক তথায় উপনিবেশ ও স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করেন। এই উপনিবেশ স্থাপনের প্রাক্কালে সিংহল দ্বীপে বিগত ১৮৪৫ বৎসর হইতে দৈত্যদিগের অধিবাস ছিল। এই দৈত্যগণই সম্ভবতঃ লঙ্কার আদিম অসভ্যজাতি, এবং এই আদিম অসভ্যজাতিই রামায়ণে রাক্ষস রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপে রামায়ণের মহাসমর দুটি বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন প্রকৃতির ও বিভিন্নধর্ম্মপদ্ধতির সম্প্রদায়ের বিরাট-মিশ্রণে সমুদ্ভূত হইয়াছিল। ঈদৃশ বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত বিষয়দ্বয়ের সমাবেশে উত্তম ও অধমতার চিত্র সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়াছে। এরূপ বিভিন্ন বর্ণের চিত্র প্রদর্শন করিয়া অপরের হৃদয়ে তাহার স্বভাব প্রতিফলিত করা প্রাচ্য প্রতিভার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

আমি পূর্ব্বে রামায়ণের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে স্বীয় মত সবিস্তরে বিবৃত করিয়াছি। এই প্রাচীনত্বমূলক বিচারে রামায়ণ আমার নিকট খ্রীঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর গ্রন্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু রামায়ণকে এইরূপ প্রাচীন বলিলেও উহা বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের নিকট তথাবিধ পুরাতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া উপস্থিত হয় নাই। কালান্তরাগত বিপ্লব পরম্পরায় ইহার অংশবিশেষও বিপ্লাবিত, প্রক্ষিপ্ত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমি প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় প্রদর্শন করিয়াছি যে, রামায়ণের গৌরদেশ উত্তর ভারতবর্ষপ্রচলিত পাঠের সহিত পরস্পর একতা দৃষ্ট হয় না। ইহাতেই প্রতিপন্ন হইবে যে, সময়ের পরিবর্ত্তনের সহিত রামায়ণের পাঠও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

ভারতীয় রামায়ণের সহিত হোমাররচিত গ্রীক্ মহাকাব্যের অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। উভয়ই ভুবন-মোহিনী কল্পনার কোমল করে সমান বিকশিত, উভয়ই প্রকৃতি-সুলভ কোমলতা, নবীকৃততা, জাতীয় কিম্বদন্তী প্রিয়তা, সংক্ষেপতঃ আদিম অবস্থার সমুদয় কবিত্ব সম্পত্তিতে সমান পরিস্ফুট। গ্রীক্ ও ভারতীয় কবিতা এরূপ সমান গুণশালিনী হইলেও জাতিগত স্বভাব ও প্রতিভার বৈপরীত্য নিবন্ধন পরস্পর বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত। গ্রীসের স্বভাব ও প্রতিভার ফল—মানবের সহিত প্রকৃতির সামঞ্জস্য, ভারতের স্বভাব ও প্রতিভার ফল—মানবের সহিত প্রকৃতির প্রতিদ্বন্দ্বীতা। একদিকে এই সামঞ্জস্য আদিম গ্রীক্ মহাকাব্যে, অন্যদিকে এই প্রতিদ্বন্দ্বীতা আদিম ভারতীয় মহাকাব্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

রামায়ণের কবিতা সাধারণতঃ অতি গভীর, অতি মর্ম্মস্পর্শিনী ও অতি গৌরবে বিভূষিত হইলেও বর্ণনাবহুল ও অতি বিস্তৃত। ইহা অসীমতায় বিলীন হইয়াছে। হোমারের কবিতা অতি উদগ্র ও অতি সজীব হইলেও গাম্ভীর্য্য ও কমনীয়তায় সংযত। হোমারে প্রত্যেক মানবচরিত্র বিশিষ্ট সূক্ষ্মরূপে চিত্রিত হইয়াছে—তাহার ক্ষমতা ও শক্তি অতি সজীবতা সহকারে প্রতিফলিত হইয়াছে। বাল্মীকিতে এই মানব চরিত্র প্রকৃতির বিরুদ্ধে নীয়মান হইয়া সমুদয় বিষয়ে যেন রজ্জুবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাহার কার্য্য, শক্তি কিছুতেই পরিস্ফুট হইয়া অপরের হৃদয়ে প্রতিফলিত হইতেছে না। অধিক কি, রামায়ণের নায়ক রামচন্দ্র যদিও গাম্ভীর্য্য ও ঔদার্য্যে অটল, তথাপি তাঁহার চরিত্র যেন স্থলবিশেষে প্রকৃতির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়া মহাসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

রামায়ণের কবিতা অনন্ত সময়ের অনন্ত কার্য্যের অনন্ত কিম্বদন্তী অনন্ত ভাব ও অনন্ত কথাতে পরিপূর্ণা, হোমারের কবিতা সঙ্কীর্ণ বিষয়ের সঙ্কীর্ণ সীমায় সংযতা। যদিও ইলিয়াদ অপেক্ষা ওদিসির দৃশ্য অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত করা হইয়াছে,

তথাপি ভারতীয় মহাকাব্যের তুলনায় উহা সঙ্কীর্ণতার সীমা উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় নাই।

ভাষা বিষয়ে গ্রীক ও ভারতীয় মহাকাব্য উভয়ই সরল,স্বাভাবিক ও কষ্টকল্পনার বহির্ভূত। কিন্তু বাল্মীকির ভাষাসম্বন্ধিনী রীতি হোমার অপেক্ষা অটল ও সুব্যবস্থিত। যাহা হউক সংক্ষেপতঃ রামায়ণ ও হোমারের মহাকাব্য দুটি বিভিন্ন জাতির প্রতিভাশালী কবির দুটি অতি মহৎ কীর্ত্তিস্তম্ভ। শেষটি প্রকৃতির সহিত অতি সমঞ্জসীভূত ও শিল্পকুশলা কল্পনার তুলিকায় অতিচিত্রিত; প্রথমটি প্রতিভার উচ্চভাবে অতি বিস্তৃত ও অতি গৌরবান্বিত। শেষটি রণস্থলবর্ত্তিনী সংহার মূর্ত্তির ন্যায় বিরাট ভাবে অবস্থান করিতেছে, প্রথমটি নিরীহস্বভাব সংযতমনা তপস্বিশ্রেষ্ঠের ন্যায় পবিত্র ভাবে ভাসমান রহিয়াছে।

ইতি প্রথম প্রস্তাব।

ক্রমশঃ। র—

রণরঘুর প্রলাপ

শোক শয্যা; জ্ঞান ও মোহ।

বসন্তকুমারের এমন অবস্থা! এই তিন দিন মাত্র হইল, তাহাকে দেখিয়া আসিয়াছি, তাহার সঙ্গে স্বরাস্বর, স্বর-স্বরা, বিদ্যা-অবিদ্যা, ক্ষোভ-আশা, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, আকাঙ্ক্ষা-তৃপ্তি, বিলাস-ভিক্ষা প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গের আলাপ করিয়া আসিয়াছি;—আর আজি তাহার এই দশা! সে দিন আমোদ প্রমোদে কালকে ফাঁকি দিয়াছিলাম, অদ্য কাল আমাকে ফাঁকি দিয়াছে। বুঝি আর বসন্তকুমারের নিকট বিদায় লওয়াও হয় না,বুঝি বসন্ত এ জন্মের মত 'আসি' বলিয়াও আমার প্রণয়ের পরিশোধ দিতে, প্রাণের এ নিদারুণ জ্বালা নিবারণ করিতে পারিবে না, পাইবে না! বিধাতঃ তোমার মনে কি ইহাই আছে?

বিধাতঃ! আমি জানি না,লোকে বলে তুমি নির্ব্বিকার; তাই বলিয়া কি তুমি আমার সুখ দুঃখ বুঝিবে না? এই বিভীষিকাময় সংসারে আমাকে একক করিতে তুমি ব্যথিত হইবে না? বিষম সংসারাবর্ত্তে এই তৃণকণাকে বিঘূর্ণমান দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইবে? অলক্ষযোগ্য এই রণরঘুকে তোমার ক্রীড়াকন্দুক করিয়া বালকতা করিবে? তাহা হইলে তোমার যে তাহাই বিকার? নির্গুণে যে গুণাশ্রয় হইবে! গুণধাম, তোমার দয়াময় নাম যে লোপ

পাইবে! প্রভো! আত্মবিস্মৃত হইও না; বিকার প্রাপ্ত হইও না, মায়াগুণকে আশ্রয় দিও না, আমাকে পর করিও না। পরাৎপর! আমি আপন বলিতে পারি, এমন আমার একমাত্র আছে, সেই—বসন্তকুমারকে আত্মগত করিও না! যে বীজ তোমারই রোপিত, তুমিই তাহাকে উৎপাটিত করিও না। হায়! বিধাতা অতীন্দ্রিয়, আমার কথা তিনি বুঝিবেন না, আমি তাঁহাকে বুঝাইতে পারিব না। নহিলে, বসন্তকুমারের আজি এমন দশা হয়?

বসন্ত! কেন তুমি কুটীরবাসী হও নাই? তোমার ত্রিতল হর্ম্মোর সোপানশ্রেণী আমাকে যুগপরিমের পথের ব্যবধানে রাখিতেছে; এখন মূহুর্ত্তে যুগ, এ বিলম্বের বিড়ম্বনা কি সহা যায়? তুমি দাস দাসী পরিবৃত কেন? এখন কি দৃষ্টিপথে অবরোধ সহ্য করিতে পারি? আর এমন সময়েও এ উৎক্ষিপ্ত প্রাণকে অধিকতর উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া বসন্তকুমারকে দেখিতে দিবে না, তুমি কে?

তুমি কে? সুরসুন্দরী বিনিন্দিত রূপ; কিন্তু রূপে আভা নাই, তুমি কে? বিদ্যুৎখনিলোচন, কিন্তু লোচনে জ্যোতিঃ নাই, কটাক্ষ নাই; আনন্দধাম ওষ্ঠাধর, কিন্তু যন্ত্রণা বিকুঞ্চিত, তুমি কে? পাষাণমূর্ত্তী, কিন্তু অবিরল নীরব অশ্রুপ্লাবিতা, তুমি কে? চপলা, কিন্তু স্পন্দন রহিতা, তুমি কে? মৌনব্রতধারিণী বাগ্দেবী, তুমি কে? রুগ্নশয্যা হইতে অন্তরে কিন্তু শয্যাশায়ীকে হৃদয়ের হৃদয়ে রাখিয়া অনিমিষে নিরীক্ষণ করিতেছ, তুমি কে? কুসুম কুমারী! অবোধ বালিকে! করতলে এমন করিয়া ললাটগণ্ড স্থাপন করিয়া বসিতে হয় না, উহা যে অশুভ লক্ষণ। ছি ছি! এ সুন্দর অলক্তক-নিস্যন্দন করতল ভূমিতে পাতিয়া থাকিতে হয় না। ইহা যে অমঙ্গল চিহ্ন। তুমি যাও, গৃহান্তরে যাও, কর্ম্মান্তরে ব্যাপৃত থাক গিয়া। তুমি আদরের সামগ্রী, মাথার মণি, সুখের সঙ্গিনী, এ তোমার স্থান নয়, আজি তোমার দিন নয়। তুমি বিলাসের বস্তু, এই দীপ-নির্ব্বাণ সময়ে এখানে কেন? বাদ্যভাণ্ডের হুলাহুলি করিয়া গৃহলক্ষ্মী বলিয়া সজ্জা সমারোহে তুমি আনীত, এখন তুমি এখানে কেন?

এসকল কথা আমার মনে উদিত হইলে কি হইবে? কুসুম কুমারী এস্থান হইতে সরিবে না। বঙ্গের সর্ব্বস্বান্ত হইবে, সতী থাকিবেই; বঙ্গের শ্মশানের সঙ্গে এই সুষমা চিরজড়িতা। আমার বসন্ত, বসন্তের কুসুম— এবিচিত্র মিলন, সকলে ইহার গূঢ়তা অনুভব করিতে পারিবে না।

বসন্ত আমার কেহ নয়; এই সংসারে কেহইত কাহারও নয়। তথাপি বসন্ত আমার সর্ব্বস্ব, কারণ বসন্তকে আমি ভাল বাসি। দাদা একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—বসন্তকুমারের সহিত আমার প্রণয় কেন?—বধূকে জিজ্ঞাসা ক-

রিয়াছিলেন, আমি অন্তরালে থাকিয়া শুনিয়াছিলাম, তখন কিছু বলি নাই; কিন্তু বলিতে হইলে বলিতাম—কল-বাহিনী গঙ্গা সাগরে মিশায় কেন? এই সংসাররূপ স্বার্থমরুভূমে প্রেমশষ্প সমাচ্ছাদিত একটু বিরামস্থান থাকিলে হানি কি? আমি বসন্তকুমারকে ভাল বাসিলে ক্ষতি কি? বধূ ভাবেন, বলেনও যে ক্ষতি আছে। তবে আমি করিব কি? দাদা বলেন, আমার বিবাহ করা উচিত। এ সকল কথাই অন্তরাল হইতে শুনিয়াছি।

অন্তরালে পরের মন্ত্রণা শুনিতে আমার ন্যায়গুরু একদা নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি এ নিষেধের তাৎপর্য্য বুঝি না। স্বার্থ, আর কপটতা, আর লোকলজ্জা বাহ্যজগতের নির্ম্মাণোপাদান—কয় জনে মুখ ফুটিয়া মনের কথা বলে? তবে কি অন্তর্জ্জগতের পরিচয় লইতে হইবে না? তবে কি সংসারবিষয়ে পাদপরিমাণ জ্ঞানেই সন্তুষ্ট হইতে হইবে? যেখানে বিশ্বাস, সেই খানেই সর্ব্বনাশ; যেখানে প্রণয়, সেই খানেই মিত্রদ্রোহ; যেখানে শান্তি সেই খানেই বিপ্লব; যেখানে দেবতা, সেই খানেই অসুর; এই সকল তত্ত্ব কালস্রোতে ভাসিয়া যাইবে, আর আমি তীরে বসিয়া থাকিব, অথচ দেখিব না? আমি তাহা পারিব না; অন্তরালে থাকিয়া গুপ্ত কথা শুনিয়াছি, যত দিন বাঁচিব, সুযোগ পাইলেই আবার শুনিব। সংসারকে চিনিতেই হইবে, কাব্য পাঠ করিতেই হইবে।

আমি বসন্তকুমারকে ভাল বাসি, বধূ বলেন ইহাতে ক্ষতি আছে, দাদা বলেন, আমার বিবাহ করা উচিত। কি প্রকারে এই উপপত্তি হয়, তাহা আমি বুঝিতে পারি না; এই সকল কথায় কি কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ আছে, তাহা আমি দেখিতে পাই না। আমার বিবাহ! চমৎকার কথা! পণ্ডিতগণের বিচারে শুনিয়াছি, বিবাহ না করিলে দুইটি দোষ ঘটে, প্রথম, বংশলোপ হয়; দ্বিতীয়, চরিত্র নষ্ট হয়। আমার বংশলোপ জন্য শঙ্কা নাই; আমি আর্য্য-কুলকলঙ্ক, কুক্কুরাধম বঙ্গসন্তান, পরপ্রসাদ প্রত্যাশায় অজ্ঞাতকুলশীল আগন্তুকের পদলেহন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ ভাবিয়া থাকি; আমার এবংশ কি থাকিলেও রাখিতে আছে?

তবে, চরিত্র নষ্ট হইবার কথা;—আমি দাসী-পুত্রের দাস, আমার আবার চরিত্র কোথায় যে নষ্ট হইবে? যাহা কিছু সৎ, যাহা কিছু মহৎ, যাহাতে সার আছে, যাহাতে গৌরব আছে, সে সকলই বিসর্জ্জন দিয়া নীচতা, ভীরুতা, প্রবঞ্চনাকে জীবনের সর্ব্বস্ব করিয়াছি, আমার কি আছে যে নষ্ট হইবে? আমার বলিতে কেবল আমি আছি; আমি আছি বলিয়াই, বঙ্গমাতার এ দুর্গতি; নহিলে, বঙ্গভূমি কি এই স্থাবরদশাপন্না হইয়া, পূর্ব্বতন অপূর্ব্ব রূপগরিমার রাশি কলঙ্ক-সাগরে

ডুবাইয়া আমার মা বলিয়া পরিচয় দিয়া বেড়ায়? আমারই জন্য মাতার এত বিড়ম্বনা; এখন আমার ধ্বংশ হইলেই মাতার দুঃখাবসান হয়। বস্তুতঃ আমার নির্ব্বংশ হওয়াই উচিত; আমার চরিত্র অক্ষুন্ন রাখিবার কথা আকাশকুসুম তুল্য অলীক।

আবার গুরুভাবনা পরিত্যাগ করিয়া লঘু দৃষ্টিতেও কি বিবাহের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে কেহ (দাদা ও বধূঠাকুরাণী ব্যতীত) পরামর্শ দিতে পারেন? বঙ্গক্ষেত্রে আজ্‌কালি কএটি কুসুমকুমারী পাইবে? বৃদ্ধা জননী প্রত্যূষে উঠিয়া প্রাঙ্গন-পরিষ্করণাবধি পাক-পরিবেশন সম্পন্ন করিয়া পুত্রবধূকে আহারার্থ আহ্বান করিবেন, আর বধূর কারুকার্য্য বা কাব্যপাঠের ব্যাঘাত হইল বলিয়া তিরস্কার সহিবেন; পুরা গুরু স্বামি সহধর্ম্মিণীসমীপে ধর্ম্মোপদেশের পাঠ লইবেন, আর প্রণয়চ্ছলে ভক্তি প্রদর্শন জন্য প্রণয়িণীর পাদুকাধূলি মার্জ্জন করিবেন, এদৃশ্য দেখিতে যাহার নিতান্ত সাধ সে বিবাহ করুক। আমি লক্ষ্মীছাড়া, আমার এ গৃহলক্ষ্মীতে কাজ নাই। দেবতা আমাকে বিবাহ হইতে রক্ষা করুন!

অতএব আমি বিবাহ করিব না। দাদার সম্মানরক্ষা আমা হইতে হইল না; বধূর অবাধ্য আমাকে বাধ্য হইয়া, দায়ে পড়িয়া হইতে হইল। শুদ্ধ বিবাহ করিব না, তাহা নয়; বসন্তকুমারকে ছাড়িব না। আজি হয় ত শেষ দেখা, আজি কি বধূর কথা শুনিয়া, দাদার কথা মানিয়া বসন্তকুমারকে দেখিতে না আসিয়া থাকিতে পারিতাম? থাকিতে পারিলে আসিব কেন?

সুরাপানে যদি পাপ হয়, তবে আমার বসন্ত পাপী। আজি বসন্ত সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে; আজি কি কাহারও নিষেধ পালন করিয়া, এখানে না আসা আমার সম্ভবে? বসন্ত দেবতা নয়, মানুষ; সুতরাং তাহার সহস্র দোষ থাকিতে পারে, তাই বলিয়া আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না।

আজি যে দৃশ্য দেখিলাম, চিরদিন তাহা আমার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিবে; গুরুজনের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া যে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইয়াছি, এখানে তদধিক জ্ঞানলাভ করিলাম। সংসারের বৈচিত্র এই স্থলে আজি একত্র দেখিলাম। স্বর্গে, নরকে, বিলাসভবনে, শ্মশানে, জ্ঞানে, মোহে মিলিলে যাহা হয়, তাহা অদ্য প্রত্যক্ষ করিলাম। বসন্ত-কুসুমের আজিকার এই ভাবের সমাবেশ চূড়ান্ত কাব্য!

বসন্তকে দেখিতে আসিয়াছি, কিন্তু কথা কহিবার চেষ্টা করি নাই। বসন্ত বড়ই কাতর; কথা কহিতে কি পারিবে? সকলেই নীরব, সেই জন্য আমি বসন্তকুমারের নাম ধরিয়া এখন পর্য্যন্ত—এই কি জনমের শোধ?—সম্বোধন করিতেও সাহস পাই নাই। বসন্ত কি পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে পারিবে? বসন্ত কি আমার পানে চাহিয়া দেখিতে পারিবে? দেখিলে কি

বসন্ত আজি আমাকে চিনিতে পারিবে?

কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না, আমাকেও কেহ কোনও কথা বলিল না; অপেক্ষা করিয়াই রহিলাম। ক্রমে গৃহ পরিষ্কৃত হইল, কি ভাবিয়া বলিতে পারি না, একে একে, ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে সকলেই চলিয়া গেল। সকলেই?— না। আমি রহিলাম, বসন্ত অবশ্যই রহিল, আর রহিল কুসুমকুমারী।

চিকিৎসক ঔষধ রাখিয়া গিয়াছিল, পানপাত্রে ঔষধের মাত্রা পরিমাণ জন্য কুসুমকুমারী গবাক্ষদ্বার উদ্ঘাটিত করিল, মন্দীভূত রবিকিরণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, বসন্তের ম্লান পাণ্ডুর মুখে পড়িল, বসন্ত মুখ ফিরাইল;—সে মুখ দেখিয়া আমিই তাহাকে ভাল মত চিনিতে পারিলাম না, বসন্ত আমাকে চিনিবে কি? কুসুমকুমারী ঔষধ সেবন করাইল, পুনরপি পূর্ব্বস্থানে গিয়া পূর্ব্ববৎ বসিয়া রহিল; আমি যেখানকার সেইখানেই।

আরও একটু বেলা গেল। বসন্ত মৃদুজড়িতস্বরে কথা কহিল; আমি উৎকর্ণ হইলাম। কাহাকে উদ্দেশ করিয়া বসন্ত কথা কহিতে লাগিল বুঝিতে পারিলাম না। একবার কুসুমকুমারীর মুখ পানে চাহিলাম, তাহার অশ্রুবেগ দ্বিগুণিত হইল, কিন্তু মুখে শব্দ নাই।

বসন্ত বলিতে লাগিল:—

"আজিকার সম্বাদ কি? প্রুশিয়ার এ বীরপণা সহিবে না, রহিবে না। নাপোলিয়ন বন্দী? ফ্রান্সের অধঃপতন? দেখিব না। দেখিতে হইবে না। পতন ও উত্থান, পর্য্যায় মাত্র। দিনে হউক, মাসে হউক, বৎসরে হউক, যুগে হউক—কালবক্ষে অদৃষ্টচক্র ঘুরিবেই ঘুরিবে, স্থির রহিবে না। * * * * * * কি বলিলে? আমার চরম কাল উপস্থিত হইয়াছে? আমাকে চরমেচ্ছাপত্র প্রকাশ করিতে হইবে? এমন দিন কি হইবে? আমার শেষ? আমি ফুরাইলে আমার নাম ফুরাইবে ত! যদি না ফুরায়। * * * পিপাসা। মা!"

আমি অভিভূত হইয়াছিলাম, কুসুমকুমারী কখন উঠিয়া গিয়াছে জানিতে পারি নাই। নিকটস্থ একটি পাত্রে কি ছিল, ঔষধ বিবেচনায় বসন্তের মুখে ঢালিয়া দিলাম। বসন্তের চক্ষুঃ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, বসন্ত উঠিয়া বসিবার উপক্রম করিল, পারিল না। বুঝিলাম বন্ধুর কার্য্য করিয়াছি, কোন্ বিষ দিয়াছি!

বসন্ত উগ্র হইয়া উঠিল, পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল—

"আমি কৃতঘ্ন নহি। যে হস্তে অমৃত পাইয়াছি, সে হস্তে বিষ লইতে কুণ্ঠিত হই না। আমি কারাগারে, যিনি দয়া করিয়া বা নিষ্ঠুরতা প্রকাশিয়া এই কারাগারের বিভীষিকা আমাকে দেখাইতে জ্ঞানালোকের সম্পাত করিয়াছেন, তিনি এই যন্ত্রণা ভুলিবার যে উপকরণ দেন, তাহা অবশ্য গ্রাহ্য, তাই আমি

গ্রহণ করিয়াছি। বীর্য্য, সাহস, ক্ষমা, দয়া কাহাকে বলে জানি, আমার প্রয়োগ শক্তি নাই, তাহা জানি। তবে কি বন্ধনে মরিব; তাই এই অমিয় সাগরে ডুবিয়াছি। সুরেশ্বরী ভগবতি! দুর্গতি নাশিনি! কুপ্রবৃত্তি দনুজ দলনি! যেদিন কিন্নরীর চরণকিঙ্কিণী তালে তালে রিমি ঝিমি ঝিমি করিল, যে দিন তুমি আমার মস্তকে অধিষ্ঠিতা হইয়া সেই মস্তকে সেই মধুর নিক্কণ তুলিলে, তুলিয়া এ মস্তকে সে চরণে প্রভেদ নাই এই দিব্যজ্ঞান আমায় দিলে, সেই দিনে তোমার মাহাত্ম্য বুঝিলাম। দেবি! তুমি দয়া করিয়া আমার ভ্রমভঞ্জন করিলে। শিখিলাম যে তুমিই আমার গতি। মা! আমি অবোধ সন্তান; কি দিয়া তোমার পূজা করিব? অভিমানপূর্ণ মন ছিল, পরে কাড়িয়া লইয়াছে; অবশিষ্ট ভালবাসা ছিল, অপাত্রে রণরঘুকে তাহা পূর্ব্বেই দিয়া ফেলিয়াছ"—আমি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না—"দেহ আছে; তাহা কি হইবে? এ যন্ত্রণা হইতে আমায় কি উদ্ধার করিবে? পাপদেহের তোষামোদ করিতেই প্রাণ ক্ষরিত হইয়া গেল, হইতেছে। এখনও যদি দেহ লও তবে দিতে পারি। কালে বুঝি ইহাও থাকিবে না। তখন কি দিব মা? মুক্তিদাত্রি সুরে! এখন বল দাও, লৌহ সেবন করাও, একবার প্রাণ ভরিয়া তোমার নাম গাইয়া আত্মাকে চরিতার্থ করি। ভারতমাতা আমার বিমাতা; তোমার ক্রোড়ে যতক্ষণ থাকি ততক্ষণ দুঃখ ভুলি—এজন্মের মত ভুলাও মা! যেখানে ইচ্ছা লইয়া চল, আর তিষ্টিতে পারি না মা! * * * * * * বিষয় বিভবের ব্যবস্থা করিতে হইবে? কি বিষয়? কাহার বিষয়? কি ব্যবস্থা? কে করিবে? ঐ দেখ! ঐন্দ্রজালিক দেখ। পৃথিবী ঘুরিয়া গেল, দিবাবসান হইল; আর ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই। মুকুট, পদতলে; চতুর্দ্দিকে প্রাচীর; আত্মপর সমান জ্ঞান। এ ব্রহ্মজ্ঞান দিতেও তুমি, হরিতেও তুমি। আর কেন?"

অবস্থা ভয়ঙ্কর; আমার ভাবনা হইল। এমন সময়ে একজন সন্ন্যাসীসহ বসন্তের মাতা সেইখানে আসিলেন, আসিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া বাতাহত কদলীবৎ পড়িলেন। সন্তানের অমঙ্গল সমাচার পাইয়া কাশীধাম হইতে পথে পথে এই মাত্র আসিয়া এই দেখিলেন। বিষম বিভ্রাট। আমি আর থাকিতে পারিলাম না, চলিয়া আসিলাম।

শ্রীরণরঘু গোস্বামী।

দেবোপাখ্যান

(গ্রীস ও ভারতবর্ষ)।

পঞ্চমপ্রস্তাব।

পার্ব্বতী, লক্ষ্মী, সরস্বতী

হিরি, ডিমিটারি, এথিনী।

আমরা প্রথমতঃ ভুবনেশ্বরী পার্ব্বতীর সহিত গ্রীসের সুরেশ্বরী হিরির তুলনা করিব।

হিরির আয়তন দীর্ঘ, বর্ণ উজ্জ্বল গৌর; তিনি পরমসুন্দরী। তাঁহার মুখশ্রী গম্ভীর ভাবব্যঞ্জক এবং গর্ব্বদ্যোতক। একটি প্রিয় ময়ূরশিশু তাঁহার অঙ্কে শয়ন করিয়া আছে। দেবী অতি সাবধানে স্বর্ণোজ্জ্বল কেশগুচ্ছ সরাইয়া আপন বদনসৌন্দর্য্য বিকীর্ণ করিতেছেন। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিতে হইলে ময়ূরগণ অনন্ত বায়ুসাগরে সন্তরণ করিয়া তাঁহার শকট চালাইতেছে। তাঁহার একপার্শ্বে আইরিস্ (রামধনু), ও অন্য পার্শ্বে আরি (পল্লী) গণ সুসজ্জিত হইয়া তাঁহার অনুগমন করিতেছে। অন্যান্য দেবতা সকলের ন্যায় হিরিরও দুই হস্ত, দুই পদ; আকৃতি মনুষ্যের অনুরূপ।

সুরেশ্বরী পার্ব্বতীর একস্থানে বসিয়া থাকামাত্র কার্য্য নয়। তাঁহার হস্তে ত্রিভুবনের ভার ন্যস্ত। তিনি শক্তি, সুতরাং সমস্ত বিশ্বের স্থিতি বিনাশ তাঁহারই হস্তে। শক্তির অনন্ত শক্তি রণরঙ্গিনী বেশে জগতের বিপদ বিনাশ করিতেছে, ভুবনেশ্বরী বেশে জগতে রাজত্ব করিতেছে, আবার স্নেহময়ী জননী হইয়া সন্তানের লালন পালন করিতেছে। নগেন্দ্রনন্দিনীকে তজ্জন্যই ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ধারণ করিতে হইয়াছে। অসুরমর্দ্দিনী ভবানী 'দশবাহু সমন্বিতা', এই বেশে তিনি এথিনীর সহিত উপমেয়া।

দুর্গার এই মূর্ত্তি কেবল ভয়ঙ্করী নয়, আবার পরম রমণীয়া। যদিও তিনি 'জটাজুট সমাযুক্তা, অর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরা' তথাপি আবার ভক্তের নিকট তখনই, 'পূর্ণেন্দু সদৃশাননা' 'অতসী পুষ্পবর্ণাভা সুপ্রতিষ্ঠা সুলোচনা' 'নবযৌবনসম্পন্না সর্ব্বাভরণভূষিতা' 'প্রসন্নবদনা দেবী সর্ব্বকামফলপ্রদা'।

আপন সন্তানগণের বিপন্নিবারণার্থ পার্ব্বতী দশবাহু ধারণ করিয়াছেন, 'ত্রি-

শূল, খড়্গা, চক্রাদি অস্ত্রের সাহায্যে অসুরগণের বিনাশ সাধন করিতেছেন। বিপদের শীঘ্র দূরীকরণ জন্য ইচ্ছাময়ী, অনেক-হস্ত প্রসারিত করিয়া একদা অনেক শত্রু সংহার করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি ভক্তের নিকট কিছুই ভয়ঙ্কর নয়, সকলই মনোহর। ভক্ত দূর হইতে দেখিতেছে মূর্ত্তিমতী করুণাময়ী তাহার জন্য সংগ্রামপ্রবৃত্তা। তাহার জন্যে একহস্তে বর ও একহস্তে অভয় রহিয়াছে, ত্রিনয়নীর একটি নয়ন মধুর হাসি বিকাশ করিয়াই যেন ভক্তের প্রতি ন্যস্ত রহিয়াছে। সেই পূর্ণেন্দু সদৃশ আনন, সেই অতসী কুসুমিত উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, তাহার চিত্তে সন্তোষ প্রদান পূর্ব্বক তাহাকে উৎসাহিত করিতেছে

সমরাবসানে পার্ব্বতী আবার দ্বিভূজা ভুবনমোহিনী, উপাসক তখন :—

অশোকনির্ভৎসিত পদ্মরাগং
আকৃষ্টহেমদ্যুতি কর্ণিকারং
মুক্তাকলাপীকৃত সিন্ধুবারং
বসন্ত পুষ্পাভরণং বহন্তি।
আবর্জ্জিতা কিঞ্চিদিব—
বাসোবসানা তরুণার্করাগং
পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব।
সুগন্ধিনিশ্বাস বিবৃদ্ধ তৃষ্ণং
বিম্বাধরাসন্নচরং দ্বিরেফং
প্রতিক্ষণং সংভ্রম লোলদৃষ্টি
লীলারবিন্দেন নিবারয়ন্তী—

সেই পার্ব্বতীকে মনোহর শরীরে দেখিতেছে। পার্ব্বতী এক্ষণে ষোড়শী, রূপবতী, যৌবনসোপানারূঢ়া। কখনও বা তিনি জীবগণের মঙ্গলার্থ ভিক্ষার্থিনী; কখনও জগৎপতি পতিসহ শ্মশানবাসিনী, জগতের কার্য্য কারণ, সুখ দুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতির বিষয় অথবা অত্যুচ্চ পরমার্থতত্ত্ব স্বকান্ত-মুখে শ্রবণে যত্নবতী। আবার প্রয়োজন বিশেষে কালীমূর্ত্তি প্রভৃতিও পরিগ্রহ করেন।

পার্ব্বতীতে গৌরব আছে, কিন্তু সে গৌরব হিরির ন্যায় বাহ্যিক আকারে প্রকাশ হইয়া দাম্ভিকতায় পরিণত হয় নাই। জননী আপন গাম্ভীর্য্যমিশ্র গৌরবসহ আপন সন্তান সমীপে যেমন হাস্যময়ী, স্নেহময়ী, মাতা শৈলসুতাও তাহাই। তাঁহাতে কোনরূপ বিলাসচিহ্ন নাই, হিরিতেও নাই। কিন্তু হিরির ক্রোধ, অহঙ্কার, ঈর্ষা ও কপটতা আছে। পার্ব্বতীতে এসমস্ত দোষ সম্ভবেনা। তিনি অকারণ ক্রোধবশবর্ত্তিনী হইয়া হিরির ন্যায় ট্রয়নগরীর বিনাশ সাধন করেন নাই, বিষাক্ত বসনে বা কপট মন্ত্রণায় সপত্নীসংহারও করেন নাই। রূপগর্ব্বে গর্ব্বিতা হইয়া সামান্য মানবকে রূপবতীত্রয়ের রূপনির্ণয়মধ্যস্থও মান্য করেন নাই।

হিরিও সতী, সতীও সতী। এক্ষণে সতীতে সতীতে প্রভেদ আছে কিনা একবার দেখা যাউক। হিরি স্বামী ভিন্ন অন্যের প্রণয় ক্ষণেকের জন্যও হৃদয়ে স্থান দান করেন নাই, এজন্য গ্রীসে তিনি প্র-

শংসনীয়া। আর্টিমিস্ (চন্দ্র) চিরকৌমার্য্যব্রতাবলম্বিনী বলিয়া সতী নামে অভিহিতা। পতিগতপ্রাণা পার্ব্বতীও ভারতে সতী নামে প্রসিদ্ধা। এক্ষণে দেখিতে হইবে কে শ্রেষ্ঠ।

আর্টিমিসের সতীত্বের সহিত হিরি ও দুর্গার সতীত্ব উপমেয় নয়। কারণ এ সতীত্ব ভিন্ন প্রকৃতির। স্বামী ও স্ত্রীর প্রণয়ে ঐকমত্য ও সুখাবস্থান সতীত্বের সুফল। অপ্রিয়কার্য্যকারী গুণহীন স্বামীর প্রতিও যে স্ত্রী প্রিয়বাদিনী ও তদ্গতপ্রাণা, বাস্তবিক তাহাকেই সতী বলা যাইতে পারে। হিরি, যিয়সের আচরণে সর্ব্বদাই অসন্তুষ্টা। তাঁহাকে পারজয়িকতা জন্য অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিতে হিরি এত কৌশল ও এত পথ উদ্ভাবন করিয়াছেন যে তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। এমন কি, একদা নিতান্ত সামান্যা নরস্ত্রীর ন্যায়, একান্ত ইতরস্বভাবা পরস্পৃহাবতী যোষিতার ন্যায় আপন কন্যা ও দেবরের সহিত পরামর্শ করিয়া যিয়সকে বন্ধন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন! এই কি সতীত্বের লক্ষণ! এরূপ যে স্থলে সুরেশ্বরীর পতিভক্তি সে স্থলে নৈতিকবল কত প্রবল পাঠক বিবেচনা করিবেন। এই জন্যই কবি এগামেম্‌নন্, ইডিপস্ প্রভৃতির পরিবারের দুর্গতি বর্ণনায় কৃতকার্য্য। এই জন্যই হেলেন গ্রীসের সর্ব্বপ্রধান মহাকাব্যের নায়িকা।

আবার পার্ব্বতীকে দেখ। সাধারণ লোকের মধ্যে এইরূপ গল্প প্রচলিত আছে যে শিব ভাঙ্গ ধুতূরায় সর্ব্বদা উন্মত্ত; ভিক্ষান্নজীবী দেবের গৃহে খাদ্য বস্তুর অভাব; সন্তানগণ কাঁদিতেছে। পার্ব্বতী তাহাতেও স্বামীপ্রতি অপ্রিয়বাদিনী বা অপ্রিয়কারী নন, সর্ব্বদা পতিসেবায় রতা; পতির জন্য সিদ্ধি প্রস্তুত করিতেছেন; ঘৃণা নাই, আলস্য নাই। মায়ারূপে শিব জরাগ্রস্ত, সকলে ঘৃণা করে; কিন্তু পার্ব্বতীর পতিভক্তি তখনও অবিচলিত। তিনি পতিসহ শ্মশানে, পতিসহ ভিক্ষার্থিনী, পতিসহ জগতের হিতাকাঙ্ক্ষিণী, আবার পতিপার্শ্বে ত্রিভুবনেশ্বরী। তাঁহার রাজত্বে জাকজমক নাই। হিরির ন্যায় তাঁহার শিরে হৈমকিরীট মণি মাণিক্যাদিতে সুশোভিত হইয়া 'সময় ও গুণরাশির' সহিত উজ্জ্বলতা প্রদর্শনে প্রতিযোগিতা করে না। তাঁহার নিকট পার্থিব স্বর্ণাদি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। ঐশ্বর্য্য বিলাসীর জন্য, আশ্রিত জীবের জন্য। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য কি?

হিরির রূপে তুলনা নাই, রূপে অগ্নি স্বলে; প্রভাবেরও তুলনা নাই, ত্রিদিবেশ যিয়সও তাঁহার ভয়ে কম্পিত; আবার ক্রোধেরও তুলনা নাই। সামান্য জীবগণকর্ত্তৃক অবজ্ঞাত হইলে, অথবা পরমশক্তিব্যবস্থাপিত জগতের কোন নিয়ম অতিক্রম করিতে দেখিলে দেবগণের যে ক্রোধ সম্ভবে, তাহা হইতে প্রায় কেহই মুক্ত নহেন। আবার অনেকের মনের গতি অনুযায়ী ক্রোধোদ্রেকও দেখা যায়। হিরির

ক্রোধ এই শেষোক্ত প্রকারের। এ ক্রোধ নিতান্ত দূষনীয়। স্বার্থের সহিত এ ক্রোধের নিকটসম্বন্ধ। জগতের প্রচলিত রীতির পরিবর্ত্তন ঘটাইতে চেষ্টা করিলে, জীবসাধারণের অন্যায় সাধন করিলে, অথবা আপন যোগসাধনের ব্যাঘাত জন্মিলে তমোগুণের অপর সীমান্তবর্ত্তী দেবাদিদেব ভগবান ভূতভাবনেরও ক্রোধ হয়। সে ক্রোধ ভয়ঙ্কর। রুদ্রের হুঙ্কার অসহ্য ও অদম্য। যখন শূলীর শূল কম্পিত হয়, জটাবন্ধন খসিয়া পড়ে, এবং রবীন্দুপাবক এই ত্রিনয়ন ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে তখন জগতে কাহার সাধ্য যে সে ক্রোধ নিবারণ করে? কিন্তু সে ক্রোধ দীর্ঘকালস্থায়ী হয় না, কারণ নিঃস্বার্থ ও বিরোচিত। তাহার শাস্তি ও শান্তি নিমেষ মধ্যে সম্পাদিত হয়। এজন্য তিনি আশুতোষ। পার্ব্বতীর ক্রোধও নিঃস্বার্থ ও ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু হিরির ক্রোধ সেরূপ নহে। তাঁহার ক্রোধানল তুষানলের ন্যায় থাকিয়া থাকিয়া ক্রমে ক্রমে দগ্ধ করে। ট্রয়ের অবরোধ সময়ে তাঁহার আচরণে, সপত্নী ও সপত্নীতনয়দিগের সহিত নিষ্ঠুর ব্যবহার এবং স্বামি প্রতি ক্রোধ প্রদর্শনে তাহা বিলক্ষণ প্রমাণিত আছে। পার্ব্বতীর হৃদয় স্নেহ ও কোমলতার প্রিয়নিকেতন। অরণ্যের মৃগ, আকাশের পক্ষী, বনের বৃক্ষ সকলেই তাঁহার স্নেহের অংশভাগী। তিনি ইন্দ্রাদি দেবগণের মাতৃস্বরূপা, ভক্তের নিকট ক্রীতা ধাত্রী, সর্ব্বসাধারণের আশ্রয়দায়িনী স্নেহময়ী জননী। তিনি রামপ্রসাদের সহিত 'বেড়া' বাঁধিতেও ক্লেশ বোধ করেন নাই, সুরথ রাজার জীবন রক্ষার্থ লক্ষ অসি প্রহার সহ্য করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

পার্ব্বতীর পৌরাণিক মত উল্লিখিত হইয়াছে। আর এক প্রকৃতি আছে, সে তান্ত্রিক প্রকৃতি *। ইউরোপীয়গণ কালী ও শিবকেই হিন্দুদিগের দেব দেবীর মূলাধার জ্ঞান করিয়া কালীর তান্ত্রিক প্রকৃতির এক অংশ এবং শিবের তাপস প্রকৃতির কদর্য্যাংশ নিতান্ত অপকৃষ্টবর্ণে চিত্রিত করিয়া পাঠকগণসমক্ষে উপস্থিত করেন। তাহাতে ইউরোপীয়দের ত কথাই নাই অনেক এদেশীয় কৃতবিদ্য যুবকও বিশ্বাস করিয়া, সাদাচক্ষে (!) স্পষ্ট দেখা যায়, বিবেচনায় এদেশীয়দিগের পৌত্তলিকতার নিন্দা, এবং গ্রীসের পৌত্তলিকতার প্রশংসা করিতে ক্রুটি করেন না। প্রথমতঃ তাঁহাদের মতে মত দিয়া দেবীর তান্ত্রিক প্রকৃতি নিতান্ত অবজ্ঞেয় ও অশ্রদ্ধেয় মনে করি। এক্ষণে দেখিতে হইবে গ্রীসের ব্যাকস্ এবং তাহার উপাসনা কি পদার্থ। যদি ব্যাকস্‌কে প্রশংসা কর, কালীকে নিন্দা করিবে কেন? কালীর উপাসক অধিক,

* কেনেডি সাহেব বলেন, মাত্র তন্ত্রেই দুর্গাপূজা, কিন্তু সেটি ভ্রম। মার্কণ্ডেয় পুরাণের সর্ব্ব প্রধান উপগল্পই দুর্গাপূজা (জর্ণাল্ অব্ এসিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ১৮৩৭। ২৪১ শ্রী) পৌরাণিক সময়ের পূর্ব্বোক্ত দুর্গাপূজার উল্লেখ দেখা যায়।

না ব্যাকস্‌শিষ্য অধিক? যদি ব্যাকস্‌ পরিত্যাগ কর, তন্ত্রও ছাড়িয়া দাও; ছিন্নমস্তকার শরীরোপরি আবরণ বস্ত্রের পতিত হউক। আর যদি তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়, তন্ত্রেও,—হিন্দুসমাজের অধিকাংশ স্থলে অবজ্ঞেয় তন্ত্রেও জারজ; অনাদৃত তন্ত্রেও অনেক শ্রেষ্ঠত্ব দেখিতে পাইবে।

কালে সকলই বিকৃত হয়। উন্মত্ত তান্ত্রিকগণমধ্যে অনেকে তন্ত্রের যেরূপ অর্থ করিয়া আত্মা কর্দ্দমিত করিতেছে পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। ভ্রান্তবুদ্ধি, অথচ শিক্ষিত কএকজন ইপিকিয়ুরস বা চার্ব্বাকের মতের পক্ষপাতী হইয়া সাময়িক সুখ মূল্যবান জ্ঞানে তন্ত্রের অবতারণা করিয়াছে। কিন্তু তন্ত্র প্রশংসনীয় না হইলেও একথা নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত হইবে না যে, ব্যাকসের উপাসনা উপলক্ষে গ্রীসে যেরূপ পাপানুষ্ঠান হইত,তন্ত্রে সেরূপ কখনও হয় নাই।

হিরির প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার উপাসককেও ভীত থাকিতে হয়। কালী কেবল বিপক্ষের কালরূপিণী। তবে কালীকে ভয়ঙ্করী বলিব কেন? কালীমূর্ত্তি ভয়ঙ্করী হইলেও প্রকৃতি অনেক সময়ে মনোহারিণী সংশয় নাই।

সতী হিরি সতীত্বের উপর বিরাজ করেন। কুমারীগণের বিবাহানুষ্ঠানে তিনি সর্ব্বদাই আগ্রহপরা। পার্ব্বতীও তাই। যে পর্য্যন্ত কুমারী অষ্টমবর্ষীয়া থাকে, তাহার পবিত্রতা গিরিজার প্রিয় নিকেতন। বিবাহ উপলক্ষে হরপার্ব্বতীর বিবাহ প্রস্তাব, স্ত্রীলোকদিগের গল্প সকল ও গান সকল, এদেশে যেমন আদরের সহিত শ্রুত হয় এবং প্রত্যেক স্থলেই উপমারূপে ব্যবহৃত হয়,গ্রীসেও সেইরূপ হিরির সহিত যিয়সের পরিণয় বিষয়ক প্রস্তাব সকল গানে, প্রস্তাবে এবং ললনাকণ্ঠে শ্রুত হইত। তবে বিশেষ এই যে সতী সর্ব্বদাই সতীর পক্ষপাতিনী, তাঁহার প্রার্থনা সর্ব্বদাই পূর্ণ করেন। হিরির নিকট প্রার্থনা করিতে হইলে তাঁহার প্রকৃতি বুঝিয়া প্রার্থনা করিতে হয়। ভক্ত অকুতোভয়ে পার্ব্বতীর নিকট সর্ব্বদাই বলিতে পারে:—

"ওঁ মহিষঘ্নি! মহামায়ে! চামুণ্ডে!
মুণ্ডমালিনি!
আয়ুরারোগ্যবিজয়ং দেহি দেবি
নমস্তুতে।
ওঁ ভূত দৈত্য পিশাচেভ্যো রক্ষো-
ভ্যশ্চ মহেশ্বরি!
দেবেভ্যো মানুষেভ্যশ্চ ভয়েভ্যস্বা-
হিমাংসদা।
সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে! শিবে! সর্ব্বার্থ-
সাধিকে!
উমে! ব্রহ্মাণি! কৌমারি! বিশ্বরূপে!
প্রসীদ মে।
রূপন্দেহি যশোদেহি ভাগ্যং ভগবতী
দেহি মে
পুত্রন্দেহি ধনংদেহি সর্ব্বান্‌ কামাংশ্চ
দেহি মে।
চন্দনেন সমারব্ধে কুঙ্কুমেন বিলেপিতে
বিল্বপত্র কৃতাবাসে দুর্গেহহংশরণংগতঃ॥"

এক্ষণে লক্ষ্মীকে কাহার সহিত তুলনা করিব ? সমুদ্রমন্থনে তাঁহার উৎপত্তি, সুতরাং সমুদ্রের ফেনজা এফ্রোডাইটের সহিত কি কমলার তুলনা হইবে ? লক্ষ্মীর পাদস্পর্শে ধরা শস্যপূর্ণা ও হাস্যমতী হয়। আবার এফ্রোডাইট্ যেস্থলে পাদার্পণ করেন, সেস্থলও সবুজ শোভায় সুশোভিত হয়। তবে এফ্রোডাইট ও লক্ষ্মী কি এক প্রকৃতির ? না। এফ্রোডাইটের এমন দুর্ব্বলতা আছে যে লক্ষ্মী তাহা হইতে অনেক উচ্চে অবস্থান করেন। এফ্রোডাইট্ সৌন্দর্য্য ও প্রণয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ; সুন্দরী প্রীতিময়ী লক্ষ্মী ধন ও সৌভাগ্যের ঈশ্বরী। সুতরাং লক্ষ্মীকে ডিমিটারের সহিত তুলনা করিয়া এফ্রোডাইট্‌কে রতির সহিত তুলনা করা উচিত।

ডিমিটার গ্রীসের লক্ষ্মী। শস্যশোভিত ক্ষেত্রসকল তাঁহার প্রিয় নিকেতন। উজ্জ্বল পীতবর্ণ কেশগুচ্ছ শস্যছটায় সুশোভিত করিয়া, দক্ষিণহস্তে ধান্যশীর্ষ ধারণ করিয়া এবং বামহস্তে আলোক ও কর্ত্তরিকা লইয়া, অথবা রাজদণ্ড ধারণ করিয়া ডিমিটার শ্রমজীবী কৃষকগণের পরিশ্রম পর্য্যবেক্ষণ করেন। তাঁহার সুদীর্ঘ আয়তন, উজ্জ্বল মুখশ্রীতে মিলিত হইয়া গৌরব ও গাম্ভীর্য্য যুগপৎ প্রকাশ করে। ইলিয়ুসিশের পবিত্রতা তাঁহারই প্রসাদাৎ। তিনি শান্তপ্রকৃতি, আবার ভামিনী। কিন্তু লক্ষ্মীর ন্যায় চপলা নহেন।

ডিমিটারের অন্য নাম সিরেস। তিনি যিয়সের প্রতি অসন্তুষ্টা হইয়া কিলিয়স্ নামক এক সঙ্গতিপন্ন মানবের বাটীতে গমন করিয়া গন্ধহারিকার বেশে অবস্থান করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার সন্তানের লালন পালন করিতেন। এক দিবস সেই মানবশিশুকে অমর করিবার জন্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া উঠাইতেছিলেন। তাঁহার অপরিজ্ঞাত কার্য্যসকল দর্শন করিয়া সকলেই সন্দেহপর হইয়াছিল। সুতরাং তাহারা অদৃশ্যভাবে থাকিয়া বালকের প্রতি সিরেসের আচরণ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। ঐ অমানুষিক অগ্নিনিক্ষেপব্যাপার সন্দর্শনে সকলেই ভীত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ডিমিটার ক্রোধপরবশ হইয়া বালককে তাহার মাতৃঅঙ্কে প্রদান করিলেন, এবং নিজরূপ ধারণ করিয়া আপন উদ্দেশ্য বর্ণন করিলেন। বালকের অমরত্বে ব্যাঘাত হওয়ায় সকলেই যার পর নাই দুঃখিত হইল। ডিমিটার অদৃশ্যা হইলেন।

এই প্রস্তাবের সহিত ভারতীয় অনেক প্রস্তাব ঐক্য হয়। ডিমিটারের ন্যায় লক্ষ্মী অন্যের বাটীতে যাইয়া দাসীত্ব স্বীকার করেন নাই বটে, কিন্তু ডিমিটারের অনুগ্রহে কিলিয়সের যেমন অতুল ঐশ্বর্য্য হয়, লক্ষ্মীর পদার্পণে এবং করুণাকটাক্ষে সেইরূপ অনেকেরই অতুলবিভব হইয়াছে। এদেশীয় স্ত্রীলোকেরা অনেকেই এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব সকল আলোচনা করিয়া থাকেন।

লক্ষ্মী সমুদ্রমন্থনে উদ্বেল ফেনরাশিতে

উৎপন্ন হইয়াছিল; বিষ্ণুর সহধর্ম্মিনী হইয়া বৈকুণ্ঠের সিংহাসনের অর্দ্ধভাগ লাভ করিয়াছেন; আপন প্রকৃতির কোমলতায় কমলে পদস্থাপন করিয়া দণ্ডায়মান আছেন। বর্ণ উজ্জ্বল গৌর, রূপজ্যোতি শরীরে ধরে না, কমলালয়া কমলা পূর্ণযৌবনা। মুখে, সরল শুভ্র দশন জ্যোতিবিকাশক, নয়ন সরলতাব্যঞ্জক, স্বভাবের পবিত্রতাদ্যোতক হাসি প্রকাশ হইয়া অঙ্গলতিকা যৌবনলহরীতে দোলাইতেছে, কিন্তু অলঙ্কার নাই। সুন্দরী মানবীর ন্যায় রূপগর্ব্বে গর্ব্বিতা হইয়া প্রসাধনবাহুল্যেও প্রয়াস পান না। পুরুষোত্তম স্বামী লাভ করিয়াও হরিপ্রিয়া বৃথা গৌরব প্রকাশ করেন না। তাঁহার স্নেহময়ী মূর্ত্তি, সুধাময়ী দৃষ্টি সকলই মনোহারিণী। লক্ষ্মী জগতের শ্রী, বৈকুণ্ঠের শ্রী, শরীরের শ্রী, সবুজবসনে সুসজ্জিতা প্রকৃতি দেবীর শ্রীসম্পাদনকারিণী। লক্ষ্মী শ্রীস্বরূপা। তিনি সর্ব্বদাই মিষ্টভাষিণী, পতিব্রতা।

পার্ব্বতী, লক্ষ্মী, হিরি এবং ডিমিটার সকলেই সুন্দরী। পার্ব্বতীর বর্ণ অতসী পুষ্পের ন্যায় অথবা তপ্তকাঞ্চনতুল্য, অথবা নির্ব্বাত প্রদেশস্থ প্রদীপবৎ স্থির। লক্ষ্মীর বর্ণ চপলার ন্যায়, অতি মনোহর, অথচ চঞ্চল। হিরির বর্ণ উজ্জ্বল পাবকবৎ অথবা নৈদাঘমার্ত্তণ্ড তুল্য। ডিমিটারের বর্ণ হরিদ্বর্ণ বৃক্ষপত্রের ন্যায়। এক গৃহে দীর্ঘকাল সৌভাগ্য থাকে না, ভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এজন্য লোলা। সরস্বতী তাঁহার সপত্নী। তাঁহার সহিত কমলার প্রণয় সম্ভবে না। বাহ্য প্রকৃতির কর্ত্রী, বাহ্য সুখসম্পদবিধায়িনী দেবীর সহিত অন্তঃপ্রকৃতির অধীশ্বরী দেবী বীণাপাণির কখনও প্রণয় সম্ভবে না। সম্পদ থাকিলে বিদ্যা বিরল, বিদ্বান প্রায়ই দরিদ্র।

চপলা চপলা হইলেও ডিমিটারের ন্যায় ক্রোধাভিভূতা নহেন। ডিমিটার পার্সিফোণির অনুসন্ধানে অকৃতকার্য্য হইয়া দেব ও মানবের প্রতি যেরূপ ক্রুদ্ধব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ হইলে আর তাঁহাকে প্রসন্নবদনা দেবী কমলবাসিনীর সহিত উপমেয় বলিয়া বোধ হয় না।

লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠেশ্বরী, সর্ব্ব বিষয়েই ঐশ্বর্য্যশালিনী। তাঁহার সুচিক্কণ কৃষ্ণ কেশগুচ্ছমধ্যস্থ সৌদামিনীতুল্য বদনসৌন্দর্য্যের সহিত জগতের কোন সৌন্দর্য্যই উপমেয় নয়। জীবনস্বরূপ অর্থ লক্ষ্মীর প্রসাদমাত্র। তিনি সকল বিষয়েই ধনশালিনী। তাঁহার প্রকৃতিও অমূল্য। ডিমিটার সেরূপ নন। তাঁহার হস্তে মনুষ্যজীবন, লক্ষ্মীর হস্তেও মনুষ্যের জীবন। লক্ষ্মী রাজবেশধারিণী, কিন্তু ডিমিটার কৃষকসহচরী, এবং কৃষককন্যার ন্যায় সামান্য শয্যায় সুশোভিতা। এস্থলে সারল্যে ও অমায়িকতায় ডিমিটারের চিত্র অধিক মনোহর সন্দেহ নাই। অন্যদিকে কৃষকগণের দারিদ্র্য এবং রাজা, বণিক, শিল্পী এবং রাজপুরুষগণের ঐশ্বর্য্য দৃষ্টি করিলে গ্রীককবির কল্পনা অযথাপ্রযুক্ত বোধ হইবে।

বীণাপাণি দেবীর সহিত পেলাস এথিনীর তুলনা চলে। পেলাস্ রোমের মিনর্ভায় আরও অধিক সুন্দররূপে চিত্রিতা। গ্রীককবি পেলাসকে বাহ্যজগতে সংসৃষ্ট রাখিয়াছেন ; রোমের কবি মিনর্ভাকে অন্তরস্থ জগতের অধীশ্বরী করিয়াছেন, সুতরাং মিনর্ভায় ও সরস্বতীতে অধিক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

গ্রীক কবি এথিনীকে স্ত্রীসুলভ কোমল-সৌন্দর্য্যে সাজাইতে প্রয়াস পান নাই। তিনি পার্ব্বতীর ন্যায় রণরঙ্গিণী। সৌন্দর্য্যের লক্ষণ ইউরোপে অঙ্গদ্রাঘিমা, সুতরাং দেবী এথিনীর আকৃতিও দীর্ঘ। তিনি যিয়সের মস্তকভেদ করিয়া অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিতাবস্থায়, ভূতলে অবতীর্ণা হন। স্বয়ং শৈলেশতনয়ার ন্যায় সর্ব্বদা দৈত্যবধ করেন না বটে, কিন্তু, দৈত্যদলন হিরাক্লেস্, বেলারোফণ্টেস্ পার্সিয়স্, থিসিয়স্ প্রভৃতির সাহায্যার্থ সর্ব্বদাই বদ্ধপরিকর। আবার তিনি জ্ঞানজগতের অধীশ্বরী,সকলের বুদ্ধি সৎপথে পরিচালন,সকলকে বিদ্যা ও জ্ঞানে শিক্ষিত করণ প্রভৃতি গুরুতর কার্য্য সম্পাদন তাঁহার নিত্যকর্ম্ম। এই গুণে তিনি সরস্বতীর সহিত তুলনীয়া। গ্রীসে শিল্প বিজ্ঞানাদির অধিষ্ঠাত্রী নয়টি দেবী আছেন, তাঁহাদিগকে মিয়ুজ বলে। এথিনী সেই মিয়ুজগণের কর্ত্রী। বীরগণের বীরধর্ম্ম রক্ষা করা তাঁহার এক প্রধান কর্ত্তব্য। তিনি সতী। কিন্তু তাঁহার দুর্ব্বলতা আছে কিনা একবার বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

এথিনী গ্রীসের দেবীগণ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমা হইলেও কদর্য্যরুচির হস্ত হইতে মুক্তা নহেন। গ্রীসের দেবী মানবের দেহধারিণী। গ্রীসের পৌরাণিক সময়ের অনেক পূর্ব্ব হইতেই দেবদেবীগণ মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু এথিনীর কাহারও সহিত বিবাহ হয় নাই, অথচ তিনি ফিবস্ ও লিকনসের জননী! কেহ কেহ বলেন, এপোলন হিফিস্টসের ঔরসে তাঁহার ভগ্নী এথিনীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। আবার এথিনী মৃত্যুশীল মানব পিসিষ্ট্রেটস্ ও প্রমিথিয়সের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী! আবার প্রমিথিয়সের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া স্বীয়জনক যিয়সকে বঞ্চনা পূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে অগ্নি অপহরণ কার্য্যে সহকারিণী। আবার আপন পিতাকে বন্ধন করিতে চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য্যা!

এক্ষণে শুভ্র শরীর, শ্বেতাম্বরা, জ্ঞানময়ী দেবী সরস্বতীর আকৃতি ও প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক। বাগেদবী 'তরুণ সকল মিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তী'।

রোমীয় মিনর্ভার ন্যায় বিদ্যার্থীর প্রতিই তাঁহার বিশেষ স্নেহ। তাঁহার সকলই শুভ্র, সকলই সরল ; তিনি বেলফুল। তাঁহাতে মানবীর বিলাস লালসা,সামান্যা দেবীদিগের অকারণ ক্রোধ বা পরানিষ্ট কামনা কিছুই নাই। তাঁহার সকলই নির্ম্মল ও পবিত্র। যদি জ্ঞানের মনোমোহন

চিত্র কল্পনার বিষয়ীভূত হইতে পারে, যদি সেই চিত্র অনুরূপসরলসজ্জায় সুশোভিত করিয়া শরীরী ও দৃষ্টব্য করা যাইতে পারে তবে সে চিত্র বীণাপাণি সরস্বতীতে আছে। যখন তাঁহার ঈষৎ প্রস্ফুরিত অধরান্তে শুভ্রদশনের জ্যোতি ও প্রকৃতিলব্ধ প্রফুল্লতা বিকাশ হয় তখন জ্ঞানীর হৃদয় জ্ঞানালোকের বিমল জ্যোতিতে সুশোভিত হইয়া উঠে।

বাগ্দেবীও কমলাসনা। শ্বেত শতদলে চরণ-যুগল স্থাপন করিয়া দেবী ভারতী সুমধুর বীণা বাদন করিতেছেন; সেই মনোহর স্বরে জ্ঞানীর হৃদয়-সরোবরে জ্ঞানের লহরী চলিতেছে। অর্ফিয়সের গান শুনিতে স্রোতস্বতীর স্রোতগতি রোধ হইত, পশুপক্ষিগণ নিশ্চল ও নিস্পন্দ হইয়া সেই দুর্লভ কণ্ঠনিনাদ শ্রবণ করিত, প্রস্তরাদি নির্জীব পদার্থে সজীবতা সঞ্চালিত হইত। সে গানে অভীপ্সিত মনোবৃত্তিনিচয় উত্তেজিত হইত। কিন্তু সে উত্তেজনা স্থায়ী হইতে পারিত না, হৃদয়স্থ যমুনা-স্রোত উজান বহিত না—নিম্নাভিমুখ বেগ বর্দ্ধিত হইত মাত্র। বীণাপাণির বীণাস্বর সেরূপ ক্ষণস্থায়ী নহে। সে স্বর কীর্ত্তিদেবীর সুকণ্ঠনিঃসৃত সুধাপূর্ণ স্বর। তাহাতে দুর্ব্বল মন সবল হয়, নিরাশ হৃদয়ে আশা সঞ্চারিত হয়, ধমনীতে উষ্ণ-শোণিত-স্রোত বিদ্যুৎবেগে প্রধাবিত হইতে থাকে। বরদার বরপুত্র কালিদাস সরস্বতী কুণ্ডে স্নাত হইয়া সেই দেবদুর্লভ বীণা-নিক্কণ শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাতেই দেবলালিত-কবিতাসুধা বর্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছেন।

তুমি বিপন্ন, বাগ্দেবী দৈববাণীতে তোমায় আশ্বস্ত করিলেন। তুমি বিদ্যার্থ যত্নশীল, ভারতীর অনুগ্রহে বেদব্যাস হইলে। তোমার জীবনের প্রথমাংশ অকার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছে, দৈববশাৎ দেবীর কৃপাকটাক্ষ মুহূর্ত্তজন্য তোমাতে ন্যস্ত হইল, তুমি ক্রৌঞ্চমিথুন-নিধন-দর্শনে ব্যাধকে ভৎ‍র্সনা করা উপলক্ষে ভূমণ্ডলের প্রথম কবি বাল্মীকি হইলে!

মিনর্ভা যেমন টেলিমেকসের ভ্রমণসময়ে অরণ্যে, পর্ব্বতে, সমুদ্রে, পরগৃহে সর্ব্বদাই তাহাকে আপন তত্ত্বাবধানে রাখিয়া প্রতিপালন ও সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন, বিদ্যাদেবীও সেইরূপ ভারতসন্তানকে জ্ঞান-ভূষণে ভূষিত করিয়া নিরাপদ ও উন্নত করিতে সর্ব্বদাই যত্নশীলা। এ চন্দ্রে কলঙ্ক নাই, এ শুভ্র কুসুম পর্য্যুসিত হয় না, এ ধবল বসনে দাগ নাই, এ হীরকে ছিদ্র নাই। সরস্বতী পবিত্রতা, সরলতা এবং উত্তমতার জীবময়ী প্রতিমূর্ত্তি।

আমরা দেখিলাম সুরেশ্বরী হিরি এবং জ্ঞানেশ্বরী এথিনীর গৌরব পার্ব্বতীতে আছে। ডিমিটারের গুণ ও শক্তি এবং এফ্রোডাইটের সৌন্দর্য্য লক্ষ্মীতে আছে; এথিনীর লোকহৃদয়ের অভ্যন্তরস্পর্শি কার্য্য ও শক্তি সরস্বতীতে আছে। কিন্তু যে পার্থক্য অবলম্বন করিয়া ভারতীয় দেবীদিগকে আর্য্যকবিগণ স্বর্গে স্থাপন করি-

য়াছেন, সেই লোকাতীত পবিত্রতা গ্রীসে কোথায় পাইব ? কোথায় সে বিলাসবিরতা লোকাতীত দেবপ্রবৃত্তি, আর কোথায় সামান্য জনসুলভ কলহপ্রিয়তা ও দুর্ব্বলতা! সামান্য মানবের গৃহবিবাদে হিরিকে একপক্ষ সমর্থন করিতে দেখিলে, অসৎ চৌর্য্যানুষ্ঠানে এথিনীকে সহকারিনী মনে করিলে, এবং ভিনসপ্রকৃতি স্মরণ হইলে, কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি গ্রীসের দেবীগণকে সামান্যা কলহপ্রিয়া রমণী বিবেচনায় তাহাদিগের ঘৃণস্পদ প্রকৃতির প্রতি ঘৃণা করিয়া পার্ব্বতী লক্ষ্মী সরস্বতীর সহিত তুলনায় না বিরত হইবে ? কেই বা বলিবে যে গ্রীক দেবীগণ সহানুভূতি বিষয়ে অধিক সমর্থা।

উৎপাদিকা প্রকৃতিতে তিনটি শক্তি বর্ত্তমান, শারীরিক, মানসিক এবং আর্থিক। ভগবতী মূর্ত্তিমতী দৈহিকশক্তি, সরস্বতী মানসিক এবং লক্ষ্মী আর্থিকশক্তিস্বরূপা। এই ত্রিবিধ শক্তির কার্য্য প্রদর্শনেই ভারতীয় দেবোপোখ্যানে দেবীত্রয়ের অবতারণা। দেবত্রয়কে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপে পুরুষকল্পনা করিলে দেবীত্রয়মধ্যে প্রত্যেকেই প্রকৃতি। এই প্রকৃতি ও পুরুষেই জগতের সৃষ্ট্যাদি ব্যাপার সম্পাদিত হয়। কমলযোনি কখনও প্রকৃতি কখনও পুরুষ, কারণ তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা।

এক্ষণে যে ভাবে ইচ্ছা হয়, দুই দেশের দেবীগণকে তুলনা কর। আকৃতি সমালোচনা কর, প্রকৃতি পরীক্ষা কর এবং নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখ ভারতীয় দেবীসকল প্রকৃত দেবীই কি না। এখনও কি বলিবে সহানুভূতি প্রদর্শনে গ্রীকদেবীগণেরই একচেটিয়া অধিকার? ব্র—

শব-সাধন।

নিবেছে অনল ?—নিবে নি এখন,
কে নিবাবে বল, নিবিবে কেমনে ?
সপ্তশত বর্ষ জ্বলিছে এমন,
কত শত বর্ষ জ্বলিবে কে জানে ?
যেই দিকে দেখি,—এই মহানল !
কোথায় ভারত ?—অনন্ত শ্মশান !
শ্মশান—শ্মশান—শ্মশান কেবল !
রাবণের চিতা, লঙ্কার প্রমাণ !

ঢাল যদি সপ্ত মহাপারাবার,
এ অনল নাহি হইবে নির্ব্বাণ,
দেহ চাপাইয়া হিমাদ্রির ভার,
যাবে ভস্ম হয়ে তৃণের সমান।
দুঃখিনী কল্পনে ! কেন উদাসিনী
বৃথা নেত্রবারি কর বরিষণ,
নয়নের জলে জ্বান না তাপিনী,
এ প্রচণ্ড শিখা হবে না বারণ।

৩

এই মহা অগ্নি, ভীষ্মের পিপাসা,
ভৃঙ্গারের বারি উপহাস তার;
ধরিয়া গাণ্ডীব,—ভারতের আশা!—
ভারত হৃদয় করহ বিদার;
ভোগবতী গঙ্গা ভীম-প্রবাহিনী
অন্তঃস্তল হতে উঠিবে হুঙ্কারি,
নিবাবে শ্মশান, শক্তি-স্রোতস্বিনী,
যুড়াবে ভারত অমৃত সঞ্চারি।

৪

না পার,—বসিয়া এ মহা-শ্মশানে,
বিংশতিকোটিক শবের উপর,
উগ্র উদ্দীপনা মহাসুরা পানে,
সাধ মহামন্ত্র অভয় অন্তর।
ঘোর অমাবস্যা প্রগাঢ় তিমিরে,
আচ্ছন্ন ভারত, নীরব এখন,
শ্মশান-অনল গর্জ্জিছে গম্ভীরে,
হাহাকার শব্দে স্বনিছে পবন।

৫

আর্য্য-বীর্য্য-ভস্ম মাখি কলেবরে,
স্মৃতি মহামালা জপ অনিবার,
'ত্রাহি মে ভৈরবি'—ডাক উচ্চৈঃস্বরে
সাধ মহামন্ত্র—ভারত-উদ্ধার।
কত বিভীষিকা করিবে দর্শন,
ব্রহ্মাস্ত্র-গর্জ্জন, পাশ-ঝনৎকার,
মস্তক উপর সনন্ সনন্
খেলিবে বিজলি শত তরবার।

৬

কি ভয়? আবার হৃদয় ভরিয়া,
কর উদ্দীপনা মহাসুরা পান,
করতালি দিয়া, নয়ন মুদিয়া,
কর বীরাচারে মহাশক্তি ধ্যান;—
'করালবদনা, নৃমুণ্ডমালিনী,
লেলিহান জীহ্বা রুধিরে লোহিত,
উর মা শ্মশানে শ্মশানবাসিনী,
সৃক্ক-দ্বন্দ গলদ্রুধির চর্চ্চিত।

৭

'মহামেঘপ্রভা! কর বরিষণ
মহা বারি ধারা জ্বলন্ত শ্মশানে;
ফলুক আবার সাধনার ধন
বীর রত্নরাশি এই আর্য্যস্থানে!
সদ্যচ্ছিন্ন আর নহে ওই শির,
কি লাজে ধর মা দেও ফেলাইয়া,
খরশান খড়্গো মলিন রুধির,
সদ্য রক্তে পুনঃ লও শাণাইয়া!

৮

'ঘোরারাবে মাতা ছাড়িয়া হুঙ্কার,
মহারৌদ্রীরূপে হও অধিষ্ঠান,
নাচ রণরঙ্গে, নাচ আরবার,
দেখুক নয়নে ভারত সন্তান!
যেই বীরদর্পে ক্ষিতি টলমল,
দেখি মহারুদ্র দিলেন পাতিয়া
হিমাদ্রি সদৃশ হৃদয় অটল,—
দেখিব সে মূর্ত্তি নয়ন ভরিয়া।

৯

'অভয়, বরদ,—অধ ঊর্দ্ধ কর,
শোভিছে দক্ষিণে ভারতের তরে,
দেহ মা অভয়, হায়! নিরন্তর
নিবসি শ্মশানে সভয় অন্তরে;
প্রচণ্ড অনলে কত কাল হায়!

জ্বলে আর্য্যজাতি কাল-নির্ব্বিশেষ,
একি অভিশাপ ! তথাপি ধরায়
হতভাগ্য জাতি হলো না নিঃশেষ ।

১০

'অনন্ত জীবন, অনন্ত দাহন,—
কত কাল সবে ভারত দুঃখিনী ?
মরে না, বাঁচে না, জীবনে মরণ,
অর্দ্ধ মৃত, অর্দ্ধ দগ্ধ অভাগিনী !
তুমি মা বরদা, দেহ এই বর,—
নিঃশেষি জীবন নিবুক শ্মশান ;
কিম্বা চিতানল নিবাও সত্বর,
মৃতকল্প দেহে কর প্রাণ দান !

১১

'অচল ধমনী—উঠুক উছলি,
নব বরষায় জাহ্নবী যেমন ;
স্থির রক্ত স্রোতে ছুটুক বিজলি,
'জয় মা ভৈরবী'—উঠুক গর্জ্জন ।'
ফলিয়াছে শব-সাধন তোমার,
নয়ন মেলিয়া দেখহ কল্পনা ;
ভারত শ্মশানে আজি আরবার ;
কি ভীষণ নৃত্য, কি ঘোর বাজনা !

১২

প্রতি ঘরে ঘরে—শ্মশানে শ্মশানে !
মহাবিঘ্ন দিনে মহাশক্তি ওই
নাচিছে রঙ্গিণী সকর-কৃপাণে,
গর্জ্জিছে সাধক 'মা ভৈ মা ভৈ'।
নিবিড় নিশীথে ঘোর অন্ধকারে ;
ধূমপুঞ্জ মাঝে নাচে ভয়ঙ্করী,
ত্রিনেত্র হইতে অনল হুঙ্কারে,
মহাকালী মূর্ত্তি—ভীমা দিগম্বরী !

১৩

বাজে জয়ঢাক ঘন ঘোর রোলে,
শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁশা ভীষণ আরাবে,
কভু শূন্যে ভীমা,—কভু ধরা কোলে,
রক্তারক্ত অঙ্গ-নর-রক্ত স্রাবে !
নর-কর-কাঞ্চি কটিদেশে বাজে,
নর-মুণ্ড-মালা দুলিছে গলায় ;
রুধির-আধার এক করে সাজে,
অন্য করে তীব্র কৃপাণ খেলায় ।

১৪

ভারত সন্তান ! দেখ না মাতার
লোলজীহ্বা শুষ্ক, শুষ্ক রক্তাধার,
দেখ বাম কর করিয়া প্রসার,
সদ্য উষ্ণ রক্ত মাগে বারম্বার ।
নাহি কি ভারতে হেন বীরাচারী,
আপনার বক্ষ করি বিদারণ,
করে, জননীর পিপাসা নিবারি,
ভারত শ্মশানে শক্তি আরাধন ।

শ্রীনঃ—

লাক্ষ্মণেয়।

মনুষ্য-হৃদয়ে সুখের কথা অপেক্ষা দুঃখের কথা অধিক দৃঢ়রূপে অঙ্কিত থাকে। কিন্তু দুর্ব্বিষহ দুঃখের সময়েও আমরা সুখের কথানুষ্ঠানে ক্ষণকালের জন্য উৎসাহ এবং উল্লাসে মাতিয়া উঠি, সুতরাং ভালবাসি। বর্ত্তমান রুচি অনুসারে, এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অনুবর্ত্তন করিলে কৃতবিদ্যগণের অশ্রদ্ধাভাজন হওয়ারই অধিক সম্ভাবনা, এই আশঙ্কা করিয়া বাঙ্গালির বর্ত্তমান দুঃখ অথবা পূর্ব্বসুখ, কিছুই স্পর্শ করিব না। শুদ্ধ বঙ্গের পুরাবৃত্তঘটিত কএকটি ঐতিহাসিক কথা আলোচনাই এই প্রবন্ধে আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য রহিল।

সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা মিনহাজউদ্দীন তাঁহার 'তবকাৎনাসরী' গ্রন্থে বলিয়াছেন—বখতিয়ার কর্ত্তৃক বঙ্গ-বিজয়কালে * * * 'লক্ষ্মণিয়া' নামে জনৈক রাজা বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনিই তাঁহার মতে বঙ্গদেশের শেষ হিন্দুরাজা। কিন্তু এতদ্দেশীয় প্রাচীন গ্রন্থসমূহে 'লক্ষ্মণিয়া'র কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। বোধ হয় বল্লালসেনের পৌত্র ও লক্ষ্মণসেনের পুত্র মাধবসেন এবং তদীয় ভ্রাতা কেশবসেন অতি অল্পকাল রাজত্ব করা নিবন্ধন, মুসলমানেরা তাঁহাদের পরবর্ত্তী ভূপতিকে লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিবেচনায়—'লক্ষ্মণিয়া' নাম দিয়া থাকিবেন। বিশেষতঃ 'লক্ষ্মণিয়া' সংস্কৃত বা বাঙ্গলা শব্দ বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং ইহা 'লাক্ষ্মণেয়' (লক্ষ্মণ শব্দের উত্তর 'ঢেয়' প্রত্যয় নিষ্পন্ন) শব্দের অপভ্রংশ মাত্র, এইরূপ অনুমান একেবারে অগ্রাহ্য করা যুক্তিসম্মত নয়।

মুসলমানদিগের মতে কেশবসেনের পরে নৌজিব, নারায়ণ, (দ্বিতীয়) লক্ষ্মণ, এবং লক্ষ্মণিয়া এই চারিজন ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করেন। রাজাবলী গ্রন্থে মাধবসেনের পর সু অথবা সুরসেনের নামোল্লেখ দেখা যায়। আবার কিংবদন্তী এইরূপ যে অশোক নামে আর একজন রাজা ছিলেন। কিন্তু ইনি কাহার পরবর্ত্তী বা কাহার পূর্ব্ববর্ত্তী তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই। এখন দেখা যাউক বল্লালসেন হইতে বখতিয়ার কর্ত্তৃক বঙ্গাধিকার কতদূর ব্যবধান, এবং তাহাতে এতগুলি রাজার সমাবেশ সম্ভবে কি না।—বল্লালসেনের রাজত্বকাল সম্পর্কে 'সময়প্রকাশ' এবং 'আইন আকবরীতে' ঐক্য দেখা যায়। 'সময়প্রকাশ' অনুসারে ১০১৯

শকে অর্থাৎ ১০৯৭ খৃঃ অব্দে বল্লালসেন 'দানসাগর' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন *। অতএব তিনি অবশ্য একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 'আইন আকবরী' মতে বল্লালসেন ১০৬৬ খৃঃ অব্দে রাজপদে অভিষিক্ত হয়েন। 'দান সাগর' গ্রন্থ প্রণয়ণের পর তিন বৎসর কাল জীবিত থাকিলে, ১১০১ খৃঃ অব্দে তদীয় পুত্র লক্ষ্মণসেনের রাজ্যারম্ভ গণনা করিতে হইবে। এদিকে, মিনহাজ্‌উদ্দীন বখতিয়ারকর্ত্তৃক বঙ্গাধিকারের (৫৮) অষ্টাধিক পঞ্চাশৎ বৎসর পর অর্থাৎ ১২৬০ খৃঃ অব্দে বঙ্গদেশে লক্ষ্মণসেনের সমকালিক লোকের প্রমুখাৎ প্রকৃত অবস্থা অবগত হইয়া 'তবকাৎনাসরী' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; কাজেই তাঁহার কথা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার মতে বঙ্গদেশের শেষ রাজা 'লক্ষ্মণিয়া' অশীতি বৎসর রাজত্ব করিয়া ১২০৩ খৃঃ অব্দে বখ্‌তিয়ার কর্ত্তৃক পদচ্যুত হয়েন। সুতরাং তাঁহার রাজ্যারম্ভকাল ১১২৩ খৃঃ অব্দ বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে। এখন ১১০১ হইতে ১১২৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত মাত্র ত্রয়োধিক বিংশতি বৎসর রহিল। এই অল্পকালের মধ্যে এতগুলি রাজাকে সন্নিবেশিত করিতে হইবে।

* নিখিল ভূপচক্রতিলক-শ্রীবল্লালসেন দেবেন। পূর্ণেশশিনব দশমিতে শকাব্দে দান সাগরো রচিতঃ।

লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালের গণনা কোনস্থলে সঠিকরূপে নির্দ্দিষ্ট নাই। আবুলফাজেল বলেন তিনি মাত্র আট বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু তদীয় মন্ত্রী হলায়ুধ 'ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, লক্ষ্মণসেন তাঁহাকে কৈশোর বয়সে সভাপণ্ডিত নিযুক্ত করেন, যৌবনাবস্থাতে মন্ত্রিপদ প্রদান করেন এবং অবশেষে ধর্ম্মাধিকার পদে বরণ করেন। কিন্তু এত অল্পকাল মধ্যে এইরূপ পরিবর্ত্তন কোন মতে সম্ভবে না। এতন্নিবন্ধন বর্ত্তমান তত্ত্বানুসন্ধায়িগণ ১১০১ হইতে ১১২১ খৃঃ অব্দ লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল বলিয়া স্থির করেন। ইহার পরে মাধবসেন এবং কেশবসেন। সুতরাং দেখা যায়, হয় নৌজিব, (দ্বিতীয়) লক্ষ্মণ এবং সু অথবা সুরসেন ও অশোক প্রত্যেকে মাত্র দুই এক মাস রাজত্ব করিয়াছেন— অথবা এই অভিধানগুলি এক লাক্ষ্মণেয়ের নামান্তর মাত্র। প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতীয় অনুমান অধিক যুক্তিসঙ্গত এবং প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয়।

কোন ব্যক্তির সম্পর্কে কিছু লিখিতে গেলে তাঁহার পিতৃপুরুষদিগের উল্লেখ না করা ভাল দেখায় না, এই জন্য এস্থলে তাঁহাদের সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে।

মেট্‌কাফ্‌ সাহেব রাজসাহীর অন্তর্গত দিয়পাড়ার নিকটবর্ত্তী বুড়িন (Burrin) নামক স্থানে একখানা তাম্রশাসন প্রাপ্ত

হয়েন। তাহাতে বিজয়সেন, হেমন্তসেন, শামন্ত সেন এবং বীরসেন এই চারিজন সেনবংশীয় রাজার নাম লিখিত আছে। সম্ভবতঃ বীরসেনই এই বংশের নায়ক, কারণ তিনি চন্দ্রের অপত্য বলিয়া খ্যাত এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী আর কাহারও নাম উল্লিখিত নাই। বীরসেনের পুত্র শামন্তসেন, তৎপর হেমন্তসেন, হেমন্তসেনের পুত্র বিজয়সেন। কথিত আছে বিজয়সেন আসাম (কামরূপ) ও কলিঙ্গ দেশ * অধিকার করিয়া পাশ্চাত্য ভূপতিদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধসজ্জা করিয়াছিলেন।

বরিশালে ৺ কানাইলাল ঠাকুরের জমীদারিতে প্রিন্সেপ সাহেব যে দানপত্র প্রাপ্ত হয়েন, তাহাতে লিখিত আছে, গৌড়েশ্বর কেশবসেন জনৈক ব্রাহ্মণকে বাগুলে, বেত্তোগাত ও উদ্মমূল † নামে তিনখানি গ্রাম দান করেন। সম্প্রদাতা কেশবসেন ‡ লক্ষ্মণসেনের পুত্র বল্লালসেনের পৌত্র এবং বিজয়সেন অথবা সুখসেনের প্রপৌত্র আত্ম পরিচয় দিয়াছেন। 'আইন আকবরী' তেও সুখসেনকে বল্লালসেনের পিতা বলা হইয়াছে। 'দানসাগর' গ্রন্থে বল্লালসেনপ্রদত্ত যে দানপত্রের উল্লেখ আছে, তাহাতে তিনি বিজয়সেনের পুত্র এবং হেমন্তসেনের পৌত্র বলিয়া পরিচিত। অধুনাতন সুন্দরবনে লক্ষ্মণসেনের যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে লক্ষ্মণসেন বল্লাল সেনের পুত্র, বিজয়সেনের পৌত্র এবং হেমন্তসেনের প্রপৌত্র। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হয় বঙ্গদেশের সেনবংশীয় ভূপতিদিগের কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ শিলালিপি সমূহে উল্লিখিত রাজগণ একই বংশ সম্ভূত।

লাক্ষ্মণেয় হইতে বল্লালসেন পর্য্যন্ত ভূপতিগণের রাজত্বকালের একরূপ নির্দ্দেশ আছে। কিন্তু বল্লালসেনের পূর্ব্ববর্ত্তীগণের কাল নিরূপণ চেষ্টা সম্যক্‌রূপে অনুমান মূলক হইবে বলিয়া উহা হইতে বিরত থাকিলাম।

সেনবংশ এইরূপ শ্রেণীবদ্ধ হইতে পারে।

---

* "ত্বং নান্যবীরবিজয়ীতি গিরঃ কবীনাং
শ্রুত্বাঽন্যথা মননরূঢ়নিগূঢ়রোষঃ।
গৌড়েন্দ্রমদ্রবদপাকৃতকামরূপ-
ভূপং কলিঙ্গমপি যস্তরসা জিগায়॥
এই শ্লোকের শেষার্দ্ধের অর্থ সম্পর্কে মতপার্থক্য দৃষ্ট হয়।

† প্রসিদ্ধ আছে যে, এই গ্রামত্রয় বিক্রমপুরের নিকটবর্ত্তী ছিল।

‡ শিলালিপির যেস্থলে কেশব সেনের নাম লিখিত আছে, সেইস্থলে বোধ হয়, পূর্ব্বে অপর একটি নাম ছিল; সেই নাম কাটিয়া নূতন নাম সংযোজিত হইয়াছে। সেই অপর নাম মাধবসেন। বোধ হয় দানসিদ্ধির পূর্ব্বেই মাধবসেনের মৃত্যু হয়। সুতরাং স্পষ্ট দেখা যায়, কেশবসেনের পূর্ব্ববর্ত্তী মাধবসেনও লক্ষ্মণসেনের পুত্র।

বীরসেন * .. ..
সামন্তসেন (পুত্র)
হেমন্তসেন (পুত্র)
বিজয়সেন ওরফে
সুখসেন (পুত্র)
বল্লালসেন (পুত্র) ১০৬৬ খ্রীঃ অঃ
লক্ষ্মণসেন (পুত্র) ১১০১ খ্রীঃ অঃ
মাধবসেন (পুত্র) ১১২১ খ্রীঃ অঃ
কেশবসেন (ভ্রাতা) ১১২২ খ্রীঃ অঃ
লাক্ষ্মণেয় ওরফে অসোক, সু অথবা সুরসেন। (পুত্র) ১১২৩ খ্রীঃ অঃ

অনেকের মনে এই সিদ্ধান্তটি বদ্ধমূল আছে যে বঙ্গদেশের সেন রাজারা বৈদ্যবংশীয়; এবং এখনও অনেক বৈদ্যসন্তান বর্ত্তমান আছেন যাঁহারা বল্লাল সেনকে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ মনে করিয়া গর্ব্ব করেন। একবার উচ্চবংশজ বলিলে যতদূর কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা সহস্রবার অন্য প্রকার স্তুতিবাদে ততদূর হওয়ার নহে। কেউকে সন্তুষ্ট করিবার এ একটি অব্যর্থ মহান্ উপায়। কুলাচার্য্যগণ ইহা বিলক্ষণ জানিতেন, এবং জানিয়া স্বার্থসাধন মানসে অনেক অপেক্ষাকৃত নীচবংশজাত ব্যক্তিদিগকে কোন প্রসিদ্ধ রাজকুলের বংশধর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশের বৈদ্যদিগের সঙ্গে বল্লালসেনের এইরূপ সম্বন্ধ হওয়াই নিতান্ত সম্ভব। বর্ত্তমান সময়েও এতদ্দেশে এইরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, যখন কোন বিবাহাদি কার্য্যোপলক্ষে কুলীনগণ মৌলিকের বাড়ীতে উপস্থিত হয়েন 'ঘটক চূড়ামণি' গণ অর্থলোভে মৌলিকদিগকে একেবারে স্বর্গে তুলিয়া দেন; আবার সময়ান্তরে ইচ্ছামত অর্থসাহায্য না হইলে তাহাদিগকে নরকের কীট বলিতেও অণুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন না। সকলেরই বিদিত আছে এই পতিতপাবন মহাত্মাদিগের অসাধ্য কর্ম্ম নাই।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে 'অম্বষ্ঠ' নামক এক শ্রেণী ক্ষত্রিয় বাস করিত। 'বিষ্ণুপুরাণে' † উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের জাতিসমূহের উল্লেখচ্ছলে এবং পাণিনীয় ব্যাকরণে 'অম্বষ্ঠ' শব্দ ক্ষত্রিয় অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। মহাভারতে 'অম্বষ্ঠ' শব্দের অর্থ এক স্থলে 'ক্ষত্রিয়জাতি' এবং স্থানান্তরে স্বনামখ্যাত ক্ষত্রিয়বংশজাত রাজা। মহাভারতের 'অম্বষ্ঠ' এবং মনুর উক্ত 'অম্বষ্ঠ' একই অর্থব্যঞ্জক বলিয়া ভ্রম হওয়া বশতঃই, বোধ হয়, সেন রাজারা বৈদ্যবংশজ, এই জনশ্রুতি প্রচলিত হইয়া

* রাজা আদিশুর এবং বীরসেন প্রায় সমকালিক, এরূপ প্রমাণ দৃষ্ট হয়; কিন্তু আদিশুরকে পালবংশীয় বলিয়া বোধ হয় না। এই জন্য কেহ কেহ অনুমান করেন 'আদিশুর' বীরসেনের নামান্তর। 'শুর' এবং 'বীর' একই অর্থ ব্যঞ্জক; এবং 'আদি' প্রথম, অর্থাৎ বংশনায়ক, এই অর্থে ব্যহৃত হইয়াছে।

† 'মদ্রারামাস্তথাম্বষ্ঠাঃ পারসিকাদয়স্তথা।'

থাকিবে। আবার আবুলফাজেল এবং পীর ভীফেনথেলার সেনরাজাদিগকে কায়স্থ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়েও উত্তরপশ্চিম প্রদেশে 'অম্বষ্ঠ' নামক এক শ্রেণী কায়স্থজাতি বাস করে। সম্ভবতঃ ইহাই এই গুরুতর ভ্রমের মূলকারণ হইবে। কিন্তু এইরূপ অযৌক্তিক জনশ্রুতির প্রতিকূলে সেনবংশের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্পর্কে যে সকল যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ বর্ত্তমান আছে, তাহাতে কোন মতে বিশ্বাসস্থাপন না করিয়া পারা যায় না।

রাজসাহীর তাম্রশাসনে স্পষ্ট লিখিত আছে, সেনবংশনায়ক বীরসেন * চন্দ্রবংশজাত অর্থাৎ ক্ষত্রিয়। অপরস্থলে শামন্তসেন 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণাম্ কুলশিরোদাম' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন †। বাখরগঞ্জের তাম্রশাসনেও সেন রাজাদিগকে সোমবংশসম্ভূত বলা হইয়াছে। সুন্দরবনে লক্ষ্মণসেনের প্রদত্ত যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তদনুসারেও সেনবংশ ক্ষত্রিয়, এ কথা প্রতিপন্ন হইতেছে ‡। এই রূপ ভূরি ভূরি প্রবল প্রমাণ বর্ত্তমানে বোধ হয় কাহারও মনে সেনবংশের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত রাজা লাক্ষ্মণিয়ার জন্মসম্বন্ধে 'তবকৎনাসরীতে' একটি গল্প লিখিত আছে। এস্থলে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা বোধ হয় দোষাবহ হইবে না। পিতার মৃত্যুকালে লাক্ষ্মণেয় মাতৃগর্ভস্থ, সুতরাং রাজমুকুট গর্ভোপরি স্থাপিত হয়। রাজমাতার প্রসবকাল উপস্থিত হইলে দেশীয় জ্যোতির্বিদ্‌গণ একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, এই সময়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে নানা অনর্থের কারণ হইবে, কিন্তু দুই ঘণ্টা পর প্রসব হইলে ভাবী রাজা অশীতিবর্ষকাল সিংহাসনারূঢ় থাকিবেন। রাজমাতা তদনুসারে

* 'যৎ সিংহাসনমীশ্বরাস্য কণকপ্রায়ং জটামণ্ডলং
গঙ্গাশীকরমঞ্জরীপরিকরৈর্যচ্চামরপ্রক্রিয়া।
শ্বেতোৎফুল্লফণাঞ্চলঃ শিবশিরঃ সন্ধানদামোরগচ্ছত্রং যস্য জয়ত্যসাবচরমো রাজা সুধাদীধিতিঃ॥
বংশেতস্যামরস্ত্রীবিততরতকলাসাক্ষিণোদাক্ষিণাত্যক্ষৌণীন্দ্রৈর্ব্বীরসেনপ্রভৃতিভিরভিতঃ কীর্ত্তিমদ্ভির্ব্বভূবে। ইত্যাদি'।

† 'সব্রহ্মক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদামশামন্তসেনঃ।'

‡ (ক) 'তেজোবিবস্বর মুষোদ্বিষতামভূবন্ ভূমীভুজঃ স্ফুটমশৌষধনাথবংশে।'

(খ) 'দোকষ্যাক্ষপিতারি সঙ্গররসে। রাজন্যধর্ম্মাশ্রয়ঃ
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনভূপতিরতসৌজন্যসীমাহজনি॥'

এই শিল্প-লিপির কোন স্থলে বল্লাল সেনকে শ্রীবিক্রমপুরবাসী বলা হইয়াছে।

পদদ্বয়ে রজ্জুবন্ধন দ্বারা উর্দ্ধপাদ হইয়া ঝুলিয়া থাকেন, এবং শুভলগ্ন উপস্থিত হইলে বন্ধনমুক্ত হইয়া লাক্ষ্মণেয়কে প্রসব করেন। কিন্তু অসহ্য প্রসবযন্ত্রণায় তাঁহার মাতার তৎক্ষণাৎ প্রাণ বিয়োগ হয়।

লাক্ষ্মণেয় বিলক্ষণ শাস্ত্রপারদর্শী এবং ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া কথিত। তাঁহার বৃদ্ধাবস্থায় ১২০২ খৃঃ অব্দে যখন বখতিয়ার বেহার জয় করেন, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ এবং জ্যোতির্বিদ্গণ সমবেত হইয়া রাজাকে বলিলেন—তাঁহাদের পুরাতন গ্রন্থসমূহে তুরস্কদিগকর্ত্তৃক বঙ্গ অধিকৃত হইবে বলিয়া লিখিত আছে এবং তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে সেই সময় উপস্থিত; সুতরাং দেশ পরিত্যাগ করা বিধেয়। লাক্ষ্মণেয় বৃদ্ধবয়সে রাজধানীর মমতা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না, অথচ দেশরক্ষার্থ কোন উপায়ও অবলম্বন করিলেন না। এস্থলে বক্তব্য এই যে, লাক্ষ্মণেয়কে ভীরু, কাপুরুষ, যাহাই যিনি বলুন, দেখিতে হইবে বখতিয়ারকে বঙ্গবিজয় উপলক্ষে ইতিহাসবিদ্গণ যে যশোরাশিতে বিভূষিত করিয়াছেন, প্রকৃত পক্ষে তিনি তাহার উপযুক্ত কি না। বখতিয়ার সমস্ত সেনা নিকটবর্ত্তী অরণ্যে লুক্কায়িত রাখিয়া মাত্র সপ্তদশ অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে নদীয়ায় প্রবেশ করেন। নিরস্তর ধূর্ত্ততা, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা এবং অসরল ব্যবহারে আত্মগোপন করিয়া ক্রমে রাজপ্রাসাদপর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয়েন এবং অতিনিষ্ঠুরভাবে নিরস্ত্র রাজানুচরবর্গকে অন্যায়রূপে আক্রমণ করতঃ অবশেষে সোনার বাঙ্গালা একেবারে ছারখার করেন। যদি বলেন, ইহা প্রবঞ্চনা বা ধূর্ত্ততা নহে, ইহা যুদ্ধকৌশল; আমি জিজ্ঞাসা করিব, মিথ্যা কথা বা অন্যায় এবং অনাবশ্যক নিষ্ঠুরতা কি প্রকৃত যোদ্ধার ধর্ম্ম? উহা চোরের ধর্ম্ম, দস্যুর ধর্ম্ম। এরূপ ছলনা করাতে কি বখতিয়ারের ভীরুতা প্রকাশ পায় নাই? তবে তিনি কি অভিপ্রায়ে রক্ষকদিগের নিকট দূত বলিয়া আত্মপরিচয় দিলেন? কি অভিপ্রায়ে প্রকৃত যোদ্ধার ন্যায় স্পষ্টভাবে যুদ্ধঘোষণা করিলেন না? হিন্দুরা কোন্ কালে দিগ্বিজয়ী যোদ্ধা বলিয়া ভুবনবিখ্যাত ছিলেন। এমন দিন ছিল, যখন হিন্দুযোদ্ধৃবর্গের সগর্ব্বপদভরে মেদিনী কম্পমান হইত। কিন্তু তাঁহারা কোন কালে প্রবঞ্চনা এবং ছলনা, মিথ্যাকথা এবং অসত্য ব্যবহার স্বপ্নেও জানিতেন না। সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সরলতাপূর্ণ, শত্রু মিত্র উভয়েরই প্রতি সমভাবে সরল এবং উদার। হিন্দুদিগের সঙ্গে তুলনা করিলে যবনদিগের চরিত্রের অপকৃষ্টতা সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইবে। বাস্তবিক এইরূপ ছলনা এবং অসত্য ব্যবহারে বখতিয়ারের চরিত্রে অনপনেয় কলঙ্ক রহিয়াছে, সন্দেহ নাই। তাঁহার সম্বন্ধে নদীয়ার একটি প্রাণীরও মনে কোন সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল না; বরং তাহারা বখতিয়ারকে রাজপ্রাসাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া

অবধারণ না করা পর্য্যন্ত অশ্বব্যবসায়ী বলিয়া স্থির করিয়াছিল। যখন অকস্মাৎ রাজপুরী এবং নগরমধ্যে ভয়ানক কোলাহল উপস্থিত হইল, তখন লাক্ষ্মণেয় আহার করিতে বসিয়াছিলেন এবং প্রকৃত অবস্থা জানিবার পূর্ব্বেই বখতিয়ার প্রবলবেগে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অনন্যোপায় হইয়া বৃদ্ধ রাজা পরিবার ও অনুচরবর্গ এবং সমস্ত অর্থসম্পত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক একাকী শূন্যপদে প্রাণভয়ে ধাবমান হইলেন।

আর গুটি দুই কথা বলিয়াই এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বখতিয়ার সমস্ত বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন, এই কথা সত্য নহে। ১২৬০ খৃঃ অব্দে সুবিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা মিনহাজউদ্দীন লিখিয়া গিয়াছেন 'রায় লাক্ষ্মণিয়া সঙ্কনট (জগন্নাথ ?) ও বঙ্গাভিমুখে পলায়ন করেন। সেখানে তাঁহার মৃত্যু হয়। অদ্যাপি তাঁহার সন্তানেরা বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেছেন।' কলিকাতা মাদ্রাসার প্রিন্‌সিপাল্ আরবী ভাষাবিশারদ ব্লকমেন সাহেব লিখিয়াছেন 'বখতিয়ার সমস্ত বঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন, এরূপ বিশ্বাস করা অন্যায়। তিনি মাত্র মিথিলার দক্ষিণপূর্ব্বাংশ, বারেন্দ্র, রাঢ়ের উত্তরাংশ এবং বগড়ির উত্তর-পশ্চিমাংশ অধিকার করিয়াছিলেন। বাস্তবিক পদ্মানদীর পূর্ব্বপারস্থিত বঙ্গরাজ্য তাঁহার আয়ত্তাধীন হয় নাই। 'তবকং নাসরী' বা বঙ্গে মুসলমানরাজত্বের প্রথম শতাব্দীর কোন মুদ্রাতে সুবর্ণ গ্রামের নাম উল্লেখ নাই। 'তারিখিবরণী' ঐতিহাসিক গ্রন্থে বুলবন বাদসাহের সময়েও (১২৮০ খৃঃ অঃ) সুবর্ণগ্রাম এক জন স্বাধীন রাজার বাসস্থল বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। তঘলক সাহার রাজত্বকালে (১৩২৩ খৃঃ অঃ) সোনারগাঁ প্রভৃতিস্থল মুসলমানদিগকর্ত্তৃক প্রথম অধিকৃত হয়।

শঃ—

প্রাতরুত্থান ও প্রাতঃক্রিয়া।

'পাখী রবে কলরবে, এখনো ঘুমায়ে রবে ?
স্বাস্থ্যপ্রদায়িনী উষা দুয়ারে দাঁড়ায়ে ঐ।'

'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং'— এই অমূল্য কবিতার্দ্ধটি যে মহাত্মার অমৃতময়ী লেখনী হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, তিনি যে শরীরিমাত্রেরই চিরকৃতজ্ঞতাভাজন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বাস্তবিক শরীররক্ষাই আদি ও সর্ব্বাগ্রগণ্য ধর্ম্ম। দেহের প্রতি যত্নশূন্য হইয়া ঐহিক বা পারলৌকিক কোন প্রকার ধর্ম্মসাধন করা দুরুহ—যদি কেহ তাহা করিতে চেষ্টা করে, তাহাও বিড়ম্বনামাত্র। এই জন্যই

উল্লিখিত কবিতাংশের সৃষ্টি হইয়াছে। যদিও পুরাতন ঋষিগণ সময়ে সময়ে দেহের প্রতি মমতাশূন্য হইয়া ধর্ম্মসঞ্চয়ের বিধান দিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারাই আবার শরীর রক্ষার জন্য নানাবিধ স্বাস্থ্যকর নিয়মসমূহের তত্ত্ব ও উপায় উদ্ভাবন করিতে ত্রুটি করেন নাই। আয়ুর্ব্বেদ, চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রই তাহার উদাহরণ স্থল। এই সকল গ্রন্থ পূর্ব্বতন ঋষিগণেরই লেখনীপ্রসূত। প্রকৃতির সহিত প্রাণিগণের নিতান্ত ঘনিষ্টতা আছে, সুতরাং কিরূপ নিয়মে চলিলে সেই ঘনিষ্টতার যোগভঙ্গ না হয়, এবং কীদৃশ অনিয়মের বশীভূত হইলে উহার বিচ্ছেদ ঘটে, তত্ত্বাবৎই ঐ সকল গ্রন্থে বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। ঐ সকল গ্রন্থের মর্ম্মগ্রহণ পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলীর উপর নির্ভর করিয়া চলিলে দীর্ঘকাল শরীর সুস্থ থাকে এবং বিবিধ আময়সমূহের যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ লাভ করা যায়। কিন্তু ইহার ব্যভিচার ঘটিলে শরীর দুর্ব্বল হয়, বাঁচিয়া থাকা ভার বোধ হয় এবং অল্পকালের মধ্যে মৃত্যুও ঘটে। অনেক সবলকায় ব্যক্তি প্রথমতঃ রক্তের তেজে স্বেচ্ছাচারী হইয়া স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালনসম্বন্ধে শৈথিল্য প্রকাশ করে; তাহারা মনে করে যে, যথেচ্ছাচারী হইয়া জীবনধারণে কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটিতে পারে না; কিন্তু তাহারা যদি একবার ভাবিয়া দেখে যে, বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির অভেদাত্ম সম্বন্ধ আছে, তাহার পার্থক্য ঘটিলে অবশ্যই বিপর্য্যয় ঘটিবে, সুতরাং এতদুভয়ের নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ রক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য—ইহার অন্যথা করিলে অকালে কালকবলিত হইতে হইবে, তাহা হইলে অসময়ে প্রায় কাহাকেই জীবন-বিসর্জ্জন দিতে হয় না। কিন্তু মানুষের যে কেমন এক অমনোযোগিতা, সে সুস্থাবস্থায় আত্মশরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে ইচ্ছা করে না। সুতরাং অচিরেই তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হয়। যখন শরীর সুস্থ থাকে, সেই সময় হইতে ভাবি স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া চলা উচিত। বরাবর শরীরের প্রতি যত্ন প্রদর্শন করিয়া চলিলে অবিচ্ছিন্ন স্বাস্থ্যরক্ষার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যত প্রকার নিয়ম আছে, তন্মধ্যে প্রাতরুত্থান একটি অত্যুৎকৃষ্ট নিয়ম। এই প্রস্তাবে তাহাই লিখিব।

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া ধর্ম্ম ও অর্থ চিন্তা করিবে। মনে মনে ঈশ্বরের ধ্যান করিবে *। সুস্থ ব্যক্তি আয়ুঃ রক্ষার্থ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উঠিয়া শারীরিক চিন্তা অর্থাৎ জীর্ণাজীর্ণ বিবেচনা করিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবেক †। রজনী অপসৃত

* ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় ধর্ম্মমর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ। কায়ক্লেশন্তদুদ্ভূতং ধ্যায়েত্তু মনসেশ্বরং ॥ কূর্ম্মপুরাণ, উপবিভাগ; ১৭ অধ্যায়।

† ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্তিষ্ঠেৎ সুস্থোরক্ষার্থমায়ুষঃ। শরীরচিন্তাং নির্বর্ত্ত্য মৈত্রকর্ম্মং সমাচরেৎ ॥ রাজবল্লভ গ্রন্থ।

হইলে পূর্ব্বদিকে যে তমিস্রালোক জনিত একপ্রকার আভা সমুদ্ভূত হয় তাহারই নাম ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত বা উষাকাল। খনার বচন বলিয়া বঙ্গদেশে একটি প্রবাদ আছে, 'ডাকে পাখী না ছাড়ে বাসা, খনার মতে সেই সে উষা'। পেচক প্রভৃতি কয়প্রকার পক্ষী ব্যতীত অপরাপর বিহঙ্গ রাত্রিকালে দেখিতে পায় না, সুতরাং উষাকালের আলোক ও অন্ধকার নিবন্ধন পক্ষিগণ জাগ্রত হইয়াও উড়িতে পারে না। ক্রমে আলোকের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে উহারা উড্ডীন হয়। এই সময়ে মৃত জগতের নবজীবন সঞ্চার হইতে থাকে। এই সময়ে মনুষ্যমাত্রেরই শয্যা পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি দীর্ঘজীবন আশা করে, এই সময়ে তাহাকে শয্যা ছাড়িয়া উষাচরণে প্রণিপাত করিতে হইবে। এই সময়ে গাত্রোত্থান করিয়া 'জীবনেচ্ছু ধীর ব্যক্তি স্বভাবতঃ প্রবৃত্ত মলমূত্রাদির বেগধারণ করেন না, কিন্তু স্বভাব প্রবৃত্ত কামক্রোধাদির বেগধারণ করিয়া থাকেন' *। 'যে ব্যক্তি সৌভাগ্যলক্ষ্মীর আকাঙ্ক্ষা করে সে এই সময়ে গাত্রোত্থান করিয়া বৈদ্য, পুরোহিত, মন্ত্রী ও দৈবজ্ঞ এই চারি ব্যক্তিকে দর্শন করিবে', † অর্থাৎ তাঁহাদিগের নিকট দৈনন্দিন শারীরিক ও মানসিক অবস্থা জ্ঞাপন করিবে।

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিয়াই কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ পদচারণা করা কর্ত্তব্য। কেননা সে সময়ে নিদ্রা শরীরকে এরূপ জড়ভাবাপন্ন ও নেত্রকে অবসন্ন করিয়া রাখে যে, উঠিয়া শয্যোপরি অবস্থান করিলে তৎক্ষণাৎ আবার নিদ্রাভিভূত হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। পদচারণার সময়েই শীতল জলে একবার নেত্রপ্রক্ষালন করা উচিত।। ইহাতে নিদ্রার আবরণী শক্তি নষ্ট হইয়া যায় এবং দৃষ্টির প্রসন্নতা জন্মে। অনন্তর সূর্য্য উঠিতে না উঠিতে প্রত্যহ অন্ততঃ একঘণ্টা কাল প্রাতর্ভ্রমণ করা বিধেয়। এতদ্দেশীয় এবং পাশ্চাত্য কৃতবিদ্য ও সুবিচক্ষণ চিকিৎসকগণ স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে প্রাতর্ভ্রমণ অতিমাত্র হিতকর বলিয়া স্বীকার করিয়াগিয়াছেন এবং বর্ত্তমান ভিসকেরাও ইহাই বলিয়া থাকেন। এইরূপ ভ্রমণে কফ, মেদরোগ, শরীরের স্থূলতা প্রভৃতি নষ্ট করে ‡। যাহাদিগের শরীর দুর্ব্বল বা পীড়িত, তাহাদিগেরও এ সময়ে সুখপ্রচারে অর্থাৎ পাদচারে কিয়ৎকাল বেড়ান বিধেয়। সুখপ্রচার আয়ুঃ ও বলবৃদ্ধিকর

---

* স্বভাবতঃ প্রবৃত্তানাং মলাদীনাং জিজীবিষুঃ। ন বেগান্ধারয়েদ্ধীরঃ কামাদীনান্তু ধারয়েৎ॥ রাজবল্লভ।

† বৈদ্যঃ পুরোহিতোমন্ত্রী দৈবজ্ঞো-হথ চতুর্থকঃ। প্রভাতকালে দ্রষ্টব্যোনিত্যং স্বশ্রিয়মিচ্ছতা॥ রাজবল্লভ।

‡ অথ মেদঃকফস্থৌল্য * * * বিনাশনঃ। রাজবল্লভ।

এবং পদরোগ বিনাশক * । যাঁহারা ধনবান্, তাঁহারা পায়ে হাঁটিয়া বেড়ান লজ্জাকর বিবেচনা করিলে স্বস্ব বাহনে আরোহণ করিয়া প্রাতর্ভ্রমণ করিতে পারেন। হস্তীতে, অশ্বে, শকটে বা পাল্কীতে চড়িয়া বেড়াইলেও অঙ্গের স্থিরতা, বল ও অগ্নিবৃদ্ধি হয়, কেবল কিয়ৎপরিমাণে বায়ু প্রকোপিত হইয়া থাকে †। কিন্তু অধিকভাগে উপকার লাভ হইলে যৎসামান্য অপকার অনায়াসে সহ্য করা যাইতে পারে।

সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে যে শীতল বায়ু মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহা বিশিষ্টরূপ স্বাস্থ্যপ্রদ। তদ্দ্বারা নিদ্রাজাত শারীরিক ক্লম ও জড়তাপনোদন হইয়া থাকে, এবং নূতন বলের সঞ্চার হয়। এই জন্যই আমাদিগের দেশে উহাকে ‘ বীরবায়ু ’ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। শীতকালে উহা কিঞ্চিৎ পরিমাণে কফবর্দ্ধক হয়, সুতরাং সে সময়ে প্রাতর্ভ্রমণের পরিচ্ছদ উষ্ণ হওয়া আবশ্যক। বিশেষতঃ বক্ষ, কণ্ঠ ও পাদদ্বয় উত্তমরূপে পশমজাত বস্ত্রাদির দ্বারা গরম রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। এই কয় অঙ্গেই অধিক পরিমাণে শীতানুভব হইয়া থাকে, বাসন্তীয় উষাকালের ভ্রমণ পরিচ্ছদ পশম ও কার্পাসসূত্র নির্ম্মিত বা কেবল কার্পাসের মোটা সূতা নির্ম্মিত হইলে ভাল হয়। গ্রীষ্মকালে উষাভ্রমণের সময় কার্পাসজাত সূক্ষ্ম পরিচ্ছদ ব্যবহার্য্য। বর্ষাকালে প্রাতর্ভ্রমণ নিষিদ্ধ; কেবল মধ্যে মধ্যে এক একদিন আকাশমণ্ডল পরিষ্কৃত ও ভূভাগ বিশুষ্ক থাকিলে বেড়ান উচিত। কিন্তু বর্ষাকালের উষাকালীন বৃষ্টিবর্ষণে সুখানুভব করিয়া উথোত্থান করিতে অলস হওয়া নিতান্ত অনুচিত। বর্ষা সময়ের উষাকালে নিদ্রিত থাকিলে অত্যন্ত বায়ুবৃদ্ধি হয়, সুতরাং স্বাস্থ্যসম্বন্ধে অনেকটা অপকার ঘটে।

প্রভাতকালে ভ্রমণ যেরূপ উপকারি, ঐ সময়ে সেইরূপ ব্যায়ামের দ্বারাও বহুল পরিমাণে কায়িক স্বাস্থ্যলাভ হয়। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের প্রতি ব্যায়াম উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত। স্নিগ্ধ দ্রব্য (ঘৃত, দুগ্ধাদি) ভোজনশীল ও বলবান্ ব্যক্তির প্রত্যহ ব্যায়াম (কুস্তি) চর্চ্চা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ শীত ও বসন্তকালে ইহা উৎকৃষ্টতম পথ্য। অপর কএকটি ঋতুতে আত্মহিতার্থে স্বাভাবিক ক্ষমতার অর্দ্ধ পরিমাণে কুস্তি করা বিধেয়। যে পর্য্যন্ত কুক্ষিদেশে, ললাটে ও গ্রীবায় ঘর্ম্মোদ্গম এবং শ্রমবোধ ও শ্বাসোদ্ভব না হয়, সেই পর্য্যন্ত ব্যায়াম করিবে, তদতিরিক্ত করিলে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার ঘটিবে। প্রত্যহ কুস্তি করিলে শরীরের লঘুতা, কার্য্যকরণে সামর্থ্য ও ক্লেশসহিষ্ণুতা জন্মায় এবং বাত-পিত্ত-কফের সমতা ও অগ্নিবৃদ্ধি হয়।

* সুখপ্রচারমায়ুষ্যং বল্যং পাদরুজাপহং ॥ রাজবল্লভ।

† হস্ত্যশ্বরথদোলাদ্যৈ ভ্রমণং বাতকোপনং স্থিরীকরণমঙ্গানাং বল্যং বহ্নিবিবর্দ্ধনং ॥ রাজবল্লভ।

বিরুদ্ধ ও অজীর্ণকর দ্রব্য ভোজন করিলেও পরিপাক হইয়া যায়। ব্যায়ামের ন্যায় অস্বাভাবিক স্থৌল্যবিনাশক অন্য ক্রিয়া নাই। যেরূপ গরুড়ের নিকট সর্পসমূহ গমন করিতে পারে না, সেইরূপ জ্বরা, ব্যাধি, শত্রু প্রভৃতি ব্যায়ামশীল মনুষ্যকে সহসা আক্রমণ করিতে পারে না। কিন্তু রক্তপিত্তরোগী, ক্ষয়কাশী, যক্ষ্মারোগী, শ্বাসকাশযুক্ত, ভুক্ত, ও স্ত্রীসংসর্গে কৃশ ব্যক্তির ব্যায়াম কর্ত্তব্য নহে *। অত্যন্ত ব্যায়ামে অর্থাৎ অবৈধ কুস্তিতে কাশ, রক্তপিত্ত, শ্রমক্লান্তি, শরীরক্ষয়, তৃষ্ণা জ্বর ও ছর্দ্দি (বমন) প্রভৃতি রোগের উৎপত্তি হয় †। যাহারা পূর্ব্বোক্ত রোগগ্রস্ত, তাহাদের প্রতি ব্যায়ামের পরিবর্ত্তে কেবল প্রাতর্ভ্রমণই সুপ্রশস্ত।

প্রাতঃকালে উঠিয়া ব্যায়াম বা প্রাতর্ভ্রমণের পূর্ব্বে মল মূত্রাদি পরিত্যাগ করা উচিত। তাহা না করিলে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে বিপরীত হইয়া পড়ে।

প্রভাতে উঠিয়া প্রত্যহ উত্তমরূপে দন্তধাবন, জীহ্বামর্দ্দন ও মুখ নেত্রাদি প্রক্ষালন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষ উষ্ণপ্রধান দেশ, এখানে বৃদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই প্রায় অনেকেরই দন্তপতন হইয়া থাকে। প্রাচীন ঋষিগণ ও ভিষগ্বর্গ ইহা বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। এইজন্যই তাঁহারা দন্তধাবন প্রভৃতির নিমিত্ত নানাবিধ নিয়ম উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। রাত্রিকালে দীর্ঘ নিদ্রাবশতঃ মুখের বৈজাত্য জন্মায় এবং লালা নির্গত হইয়া ওষ্ঠপার্শ্ব ও গণ্ডস্থল দুর্গন্ধ হইয়া উঠে, সুতরাং ভাল করিয়া মুখ প্রক্ষালন করা উচিত। দীর্ঘকাল নেত্র নিমিলিত থাকিলে নেত্রমল সমুদ্ভব হইয়া দৃষ্টির অস্পষ্টতা ঘটায়, সুতরাং শীতল জলে নেত্রধাবনও কর্ত্তব্য। জিহ্বায় ক্লেদ জন্মায় সুতরাং মার্জ্জনীসহযোগে জিহ্বামার্জ্জন বিধেয়।

(ক্রমশঃ) শ্রীরাজ—

---

* ব্যায়ামোহি সদা পথ্যো বলিনাং স্নিগ্ধভোজিনাং। স চ শীতে বসন্তে চ তেষাং পথ্যতমঃ স্মৃতঃ॥ সর্ব্বর্ত্তুষু সর্ব্বৈর্হি মর্ত্ত্যৈরাত্মহিতার্থিভিঃ শক্ত্যার্দ্ধে ন তু কর্ত্তব্যো ব্যায়ামার্দ্ধো ন চান্যথা॥ কুক্ষৌ ললাটে গ্রীবায়াং যদা ঘর্ম্মঃ প্রবর্ত্ততে। শক্ত্যর্দ্ধং তং বিজানীয়াদায়াসোচ্ছ্বাসমেব চ॥ লাঘবং কর্ম্মসামর্থ্যং স্থৈর্য্যং ক্লেশসহিষ্ণুতা। দোষক্ষয়োঽগ্নিবৃদ্ধিশ্চ ব্যায়ামাদুপজায়তে॥ ব্যায়ামং কুর্ব্বতো নিত্যং বিরুদ্ধমপি ভোজনং। বিদগ্ধমবিদগ্ধংবা নির্দ্দোষং পরিপচ্যতে॥ ন চ ব্যায়ামসদৃশমন্যৎ স্থৌল্যাপকর্ষণং। ন চ ব্যায়ামিনং মর্ত্ত্যমরয়োঽপিহি নোবলাৎ॥ ন চৈনং সহসাক্রম্য জ্বরা সমধিগচ্ছতি। ব্যায়ামক্ষুণ্ণগাত্রস্য পদ্ভ্যামুদ্বর্ত্তিতস্য চ॥ ব্যাধয়ো নোপসর্পন্তি বৈনতেয়মিবোরোগাঃ। রক্তপিত্তী ক্ষয়ী শোষী কাশী শ্বাসীক্ষতাতুরঃ। ভুক্তবান্ স্ত্রীষু চ ক্ষীণোব্যায়ামং পরিবর্জ্জয়েৎ॥ রাজবল্লভ।

† অতিব্যায়ামতঃ কাসোরক্তপিত্তঃপ্রবর্দ্ধতে। শ্রমঃ ক্লমঃ ক্ষয়ঃ তৃষ্ণা জ্বরশ্ছর্দ্দিশ্চ জায়তে॥ রাজবল্লভ।

বিরজা।

উপাখ্যান।

প্রথম অধ্যায়।

আষাঢ় মাস; বেলা প্রহরেক মাত্র আছে, আকাশের উত্তর পূর্ব্ব কোণে এক খণ্ড বৃহৎ নীল মেঘ সাজিয়াছে, তাহার ইতস্ততঃ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারিদখণ্ড ছড়াইয়া রহিয়াছে। ভগবান্ কমলাপতি যতই অস্তাচল-শিখরাভিমুখী হইতে লাগিলেন, বৃহৎ বারিদখণ্ড ততই বৃহত্তর হইতে লাগিল। গ্রামে কেহ বলবান্ ও ক্ষমতাশালী হইলে অন্য পাঁচজনে যেমন তাহার শরণাগত হয়, তদ্রূপ ক্ষুদ্রকায় বারিদখণ্ডগুলি দেখিতে দেখিতে বৃহৎ বারিদখণ্ডের সঙ্গে মিশাইয়া গেল। সূর্য্য-কিরণে মেঘগুলির পশ্চিম প্রান্ত রক্তবর্ণ হইল। ঝড় বৃষ্টি আগমনের পূর্ব্ব লক্ষণ দেখিয়া গগনবিহারী বিহঙ্গেরা ধীরে ধীরে নিম্নগমন করিতে লাগিল। দুই একটি শ্বেতকায় পক্ষী বারিদখণ্ডকে বিদ্রূপ করার ছলে তাহার ইতস্ততঃ বেড়াইতে লাগিল। নদীর আর পতিব্রতা নারীর একই স্বভাব; স্বামীর মুখ বিষণ্ণ দেখিলে পত্নীর বদনকমলও বিষণ্ণ হয়;—বারিদখণ্ডের কৃষ্ণকায় দেখিয়া পতিত-পাবনী ভাগীরথীও কৃষ্ণকায় হইলেন।

এই সময়ে একখানি নৌকা গঙ্গা দিয়া নবদ্বীপ হইতে কলিকাতা অভিমুখে যাইতেছিল। নৌকাখানি আষাঢ়মাসের গঙ্গার তীক্ষ্ণ-স্রোতবেগে পূর্ব্বপার দিয়া দ্রুতগমনে যাইতেছিল। আরোহীরা দুইয়ের ভিতরে ছিলেন, অতি অবেলায় আহার করিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন; আকাশে যে নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ মেঘ সাজিয়াছে তাহা তাঁহারা দেখেন নাই। যে স্থান দিয়া নৌকা যাইতেছিল, সেখানে এমন বিপদ সময়ে নৌকা রাখিবার উপযুক্ত স্থান নাই। আকাশে যে কৃষ্ণকায় মেঘ দেখা দিয়াছে, তাহা নৌকার মাঝি দেখিয়াছে, দেখিয়া ভীত হইয়াছে। উপযুক্ত স্থান পাইলে সে এখনই নৌকা রাখে, কিন্তু স্থান নাই। এমন সময়ে, যাহারা নৌকার সম্মুখদিকে বসিয়া দাড় বাহিতেছিল, তাহাদের একজন মাঝিকে অনুচ্চৈঃস্বরে সম্বোধন করিয়া কহিল, ‘ দাদা কি আন্দাজ কর ? ’, মাঝি কহিল ‘ আন্দাজ কর্‌ব আর কি ? পাখী সব নাচ্‌তেছে দেখ না ? ’ পাছে আরোহীরা শুনিতে পান ও শুনিতে পাইয়া ভীত হন, এই জন্য উহারা অনুচ্চৈঃস্বরে কথা কহিয়াছিল, কিন্তু

কথা তাঁহাদের নিকট অব্যক্ত রহিল না। নৌকার মধ্যে সকলেই ঘুমাইতেছিলেন, কেবল একটি বালিকা জাগরিত ছিল। আকাশে কি হইয়াছে, তাহা সে দেখে নাই; কিন্তু গঙ্গার জল অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ দেখিয়া সে চমৎকৃত ও ভীত হইয়াছিল। এখন সে মাঝিদের কথা শুনিয়া আপনা আপনি কহিল, 'গঙ্গার জল এমন হইল কেন? আকাশে বুঝি মেঘ করিয়াছে?' তাহার কথা এক জন যুবক আরোহীর কর্ণে গেল, তিনি আকাশে মেঘের কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। নৌকার ঝাপ খুলিয়া দেখিলেন, পূর্ব্ব ও উত্তরদিকে ভয়ানক মেঘ করিয়াছে। তিনি ভৃত্যকে তামাকু সাজিতে আজ্ঞা করিয়া ছইয়ের উপরে উঠিয়া বসিলেন। যুবক বড় ভীত হইয়াছিলেন, তিনি যদি এই সময়ে একাকি এই নৌকায় থাকিতেন, এত ভীত হইতেন না; কিন্তু তাহার সঙ্গে দুইটি স্ত্রীলোক ছিল।

ভৃত্য হুঁকাটি বাবুর হাতে দিল। বাবু তামাকু টানিতে টানিতে মাঝিকে কহিলেন 'যেখানে হউক, এক জায়গায় নৌকা ধর।'

মাঝি কহিল, 'কর্ত্তা এ পারে নৌকা রাখ্‌বের জায়গা নাই। আর দুকোশ ভেটিয়ে গেলেও এপারে নৌকা রাখ্‌বের জায়গা পাব না। হুকুম হয়ত ওপারে গিয়ে নৌকা ধরি।'

বাবু কহিলেন 'পাড়ি দিবার সময় নাই, পাড়ি দিতে দিতে জল ঝড় আসিয়া পড়িতে পারে; এই পারেই নৌকা ধর।'

নৌকায় একজন পূর্ব্ববাঙ্গলা অঞ্চলের দাড়ি ছিল, সে বাবুর কথায় বিরক্ত হইয়া কহিল 'এ পারে নাও রাখ্‌বা কি জান খোয়াবার লৈগা, আল্লা আল্লা বৈলা পাড়ি ধর, যা থাকে নসিবে, আপনে আপনে হইবে।'

ইহার কথা শুনিয়া বাবু রাগত হইলেন, কহিলেন; 'মাঝি ওর কথা শুনিও না। নৌকা ডুবি হইলে ওদেরত কোন ভয় নাই। ওরা জলজন্তু।'

বছরদ্দি বাবুর কথা শুনিয়া বড় রাগিয়া কহিল 'বাবু কথা কৈবা, গালি দিবা কেন্? আর যদি কসুর করি আমারে গালি দিবা, আমার দেশের লোকরে গালি দিবা কেন্? আমারে গালি দিলে সইতে পারি, আমার দেশের লোকরে গালি দিলে আমার দিলে খোঁচা লাগে।'

মাঝি বছরদ্দিকে দুই একটি মিষ্ট ভৎর্সনা করিয়া চুপ করাইল, পরে বাবুকে কহিল 'বাবু পূবে হাওয়া আছে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে পাড়ি দিব, ভয় নাই'। মাঝি নিজে ভীত হইয়াছিল, তথাপি বাবুকে কহিল 'ভয় নাই।' মানুষের স্বভাব এই আপনি বিপদ সাগরে ভাসিয়া অন্যকে বলে 'ভয় নাই।'

বাবু মাঝির কথায় কোন উত্তর করিলেন না; মাঝি তাঁহার মৌনভাব সম্মতির লক্ষণ জানিয়া পাড়ি ধরিল। দা-

ড়িয়া পাইল তুলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, মুসলমান দাড়িরা আল্লা আল্লা বলিয়া নৌকার গলুইয়ে জল ছিটাইয়া দিল।

নৌকার অভ্যন্তরে স্ত্রীলোক দুটির একটি বালিকা আর একটি মধ্যবয়স্কা। বালিকাটি সেই স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিল 'ঝি, তুমি সাঁতার জান ?।' সে কহিল 'বক্রেশ্বর নদীর তীরে আমার জন্ম বটে, কিন্তু আমি কখনও সাঁতার জানি না।'

বালিকাটি আবার কহিল, 'তবে যদি নৌকা ডোবে ত কি করিবে ?'

ঝি কহিল, 'অমন কথা বল্‌তে নাই, স্থির হয়ে বোসে থাক।'

এমন সময়ে পূর্ব্বদিক হইতে প্রবল বেগে বায়ু বহিল, ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় ফোটায় বৃষ্টি আসিল ; গঙ্গা জলের উপর চড় চড় শব্দে ও নৌকার ছইয়ের উপর চটাস্ চটাস্ শব্দে জল পড়িতে লাগিল।

পাইলে দম্‌কা বাতাস লাগাতে নৌকা কাইত হইল, নৌকায় বিস্তর জল উঠিল। ঝি ভয়ে কাঁপিতেছিল এবং ত্রাহিরবে মা গঙ্গাকে ডাকিতে লাগিল। এক জন দাড়ি নৌকার জল সেঁচিতে আরম্ভ করিল। অন্যেরা পাইলের দড়ি ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বাবু হুঁকা হাতে করিয়া নীচে নামিলেন, এবং নৌকা ডুবিলে যেন সহজে বাহিরে পড়া যায়, এমন স্থানে রহিলেন।

বাবুর অবস্থা দেখিয়া বচ্ছরদ্দি নিকটে আসিয়া কহিল, 'বাবু তোমার ডর লাগ্‌ছে ? ডরাইও না! যদি নাও ডোবে, আমি থাক্‌তে তুমি মর্‌বা না।'

চারিদিক অন্ধকার করিয়া ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হইতে লাগিল। নদীর কূল দৃষ্ট হয় না। বিপদ নিশ্চিত জানিয়া সকলে ঈশ্বরের নাম করিতে লাগিল। যুবক নাস্তিক ছিলেন, তিনিও এক্ষণে বিপদবান্ধব ঈশ্বরের উপর আত্মসমর্পণ করিলেন। ইতিমধ্যে আবার দম্‌কা বাতাস আসিয়া নৌকা জলমগ্ন করিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

গঙ্গার উভয় তীরে গঙ্গাযাত্রিদের বাস করিবার জন্য স্থানে স্থানে গৃহ নির্ম্মিত আছে। তাহাকে মরার ঘর বলে। কাহারও জীবনসংশয় পীড়া হইলে তাহার আত্মীয়েরা তাহাকে আনিয়া সেই গৃহে রাখে। গাঙ্গ্যপ্রদেশের অনেক দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও মরণাপন্ন পীড়িতদিগকে এইরূপে গঙ্গাতীরে আনা হয়।

পাঠককে এক্ষণে আমাদের সঙ্গে একটি মরার ঘরে যাইতে হইবে। ঐ দেখ, এক তক্তাপোষে একজন বৃদ্ধ প্রাণসংশয় পীড়িত হইয়া পড়িয়া আছেন। উঁহার শয্যাপার্শ্বে উঁহার দুই পুত্র বসিয়া আছেন। আর ঐ যে বৃদ্ধা আসন্নমরণ ব্যক্তির মস্তকে হস্তপ্রচার করিতেছেন, তিনি বৃদ্ধের পত্নী। অষ্টাহ অতীত হইল

ঐ পীড়িত ব্যক্তিকে এখানে আনা হইয়াছে। জলহিল্লোলে পীড়ার কিঞ্চিৎ উপশম হওয়াতে বৃদ্ধের আত্মীয়েরা অত্যন্ত ভাবনাযুক্ত হয়েন। কেননা গঙ্গাযাত্রার পর কোন ব্যক্তির মরণ না হইলে, এদেশে বড় কষ্টের বিষয় হয়। বহুব্যয়ে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সেই দুর্ভাগ্য ব্যক্তিকে গৃহে লইতে হয়; তথাপি একটা অখ্যাতি থাকিয়া যায়। কিন্তু আজি ঝড় বৃষ্টি দেখিয়া বৃদ্ধের আত্মীয়েরা বড় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা বৃদ্ধকে গঙ্গাজলে স্নাত করিয়া দধি ভাত খাওয়াইয়া দিয়াছেন। তাহাতে আবার যে গৃহে বৃদ্ধকে রাখা হইয়াছে, সে গৃহের দ্বারসকল মুক্ত; মুক্তদ্বার দিয়া বিলক্ষণ স্নিগ্ধ মারুতহিল্লোল গৃহে প্রবেশ করিতেছিল। এই সকল কারণে বৃদ্ধের নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়াছে। এক জন কবিরাজ নিকটে ছিল, সে নাড়ী ধরিয়া কহিল, 'আর বিলম্ব নাই।' সকলে বৃদ্ধের প্রাণপ্রয়াণের অপেক্ষায় বসিয়া ছিলেন। এক্ষণে কবিরাজের অনুমতি পাইয়া তাঁহারা তাঁহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া গেলেন। তাঁহার নাভীদেশ পর্য্যন্ত গঙ্গাজলে রাখিয়া, মস্তকে গঙ্গাজল ও গঙ্গামৃত্তিকা দিয়া (কফের জোর বাড়াইয়া) সকলে হরি নাম করিতে লাগিলেন!

রাত্রি দুই প্রহর, এ সময়ে বৃষ্টি নিবারণ হইয়াছিল, কেবল বেগে শীতল বায়ু বহিতেছিল। বৃদ্ধের জন্য চিতা প্রস্তুত, কেবল তাঁহার মৃত্যু হইলেই হয়। অনেক ক্ষণ পরে তাঁহার কঠিন (নির্লজ্জ) প্রাণ প্রয়াণ করিল। শাস্ত্রবিহিত কার্য্য করিয়া তাঁহার দেহ চিতায় আরোহিত করা হইল। চিতা বায়ুভরে জ্বলিয়া উঠিল। বৃদ্ধের পত্নী গঙ্গাতীরে চিতার অনতিদূরে বসিয়া অনুচ্চ রোদন করিতে লাগিলেন।

আমাদিগের নব্যদলের পাঠকেরা হয়ত বলিবেন, 'এ বড় বেহায়া স্ত্রীলোক; যাহাকে জোর করিয়া মারিল, তাহার জন্য আবার রোদন কেন?' আমরা এরূপ পাঠকগণকে অনুরোধ করি, তাঁহারা গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জনের কথা স্মরণ করুন। পুত্র বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিদেশে গেলে যে হিন্দুমাতারা কাঁদিয়া অস্থির হয়েন, তাঁহারাই এক কালে,ধর্ম্মের অনুরোধে,পাষাণে বুক বাঁধিয়া, গঙ্গাসাগরে স্বহস্তে সন্তান বিসর্জ্জন করিতেন। ধর্ম্মের অনুরোধে স্ত্রীলোক কেন, পুরুষে কি না করিতে পারে? আর কি না করিয়াছে?

ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে; আবার আকাশে বড় বড় নক্ষত্র ফুটিয়াছে; আবার অনন্ত নীল আকাশে শশধর দেখা দিয়াছেন; আবার ভাগীরথীর তরঙ্গ নানা রঙ্গে নক্ষত্রশশধরশোভিত আকাশমণ্ডলের ছবিখানি বুকে করিয়া নাচিতে নাচিতে সাগরাভিমুখে যাইতেছে।

পণ্ডিতেরা বলেন, এ জগতের ধন মান সকলিই অস্থায়ি; আমরা বলি, এজগতের শোক দুঃখও অস্থায়ী। কালে সকলই সহিয়া যায়। বৃদ্ধার শোকাবেগ অনেক

হ্রাস পাইল। তিনি রোদন পরিত্যাগ করিয়া নীরবে বসিয়া আছেন। মনে মনে কি ভাবিতেছেন। এমন সময়ে অদূরে স্ত্রী লোকের অনুচ্চ রোদন শুনিতে পাইলেন। প্রথমবার শুনিয়া কিছু ঠাহরিতে পারিলেন না; আবার মন দিয়া শুনিলেন; বুঝিলেন, এ স্ত্রীলোকের রোদন শব্দ। বৃদ্ধা তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে ডাকিলেন, 'গঙ্গাধর!' গঙ্গাধর মাতার নিকটে আসিলে বৃদ্ধা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, 'ঐ দিকে মেয়ে মানুষের কান্না শুনতে পাচ্ছি; আমার সঙ্গে এস, দেখে আসি।' মাতাপুত্রে চলিলেন, যাইয়া দেখেন, একটি বালিকা নদীতীরে বালুকা চড়াতে পড়িয়া রহিয়াছে, অনুচ্চে রোদন করিতেছে, উচ্চে রোদন করিবার যেন শক্তি নাই। বৃদ্ধা অতিব্যস্তে নিকটে যাইয়া তাহাকে ধরিয়া তুলিতে তুলিতে জিজ্ঞাসিলেন, 'তুই কে মা?' বালিকা কোন উত্তর করিল না, হাত বাড়াইয়া বৃদ্ধার হাত ধরিল। কিন্তু বৃদ্ধা তাহাকে তুলিতে পারিলেন না দেখিয়া গঙ্গাধর তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া কোলে লইল। বৃদ্ধা কহিলেন, ওকে আগুনের কাছে নিয়ে চল। গঙ্গাধর লইয়া চলিল। যাইতে যাইতে বৃদ্ধা বালিকাকে জিজ্ঞাসিলেন, 'বাছা তোর এ দশা কেন?' বালিকা অতি অস্ফুট স্বরে কহিল, 'নৌকা ডুবি হয়েছে।' বৃদ্ধা বুঝিলেন যে, বৈকালিক ঝড়ে উহার এই দশা করিয়াছে।

চিতার নিকটে আসিয়া বৃদ্ধা আপনি স্বতন্ত্র অগ্নি জ্বালিলেন, এক জনকে দিয়া একখানি শুষ্ক বস্ত্র আনিয়া বালিকাকে পরাইলেন, এবং অগ্নির নিকটে একটি মাদুরে বালিকাকে রাখিয়া সেঁকিতে আরম্ভ করিলেন। অনেক সেঁকিতে সেঁকিতে বালিকার শরীর একটু উষ্ণ হইল। বৃদ্ধা দেখিলেন, বালিকাটি পরমসুন্দরী; শরীরে নূতন গহনা। এক্ষণে জিজ্ঞাসিলেন, 'হাঁ গা, তোর নাম কি গা?' বালিকা উত্তর করিল, 'আমার নাম বিরজা।' বৃদ্ধা বালিকার অর্দ্ধশুষ্ক কেশগুলি নাড়িতে নাড়িতে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোরা আপনারা কি?' বালিকা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'আমরা ব্রাহ্মণ'। বৃদ্ধা তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, 'কাঁদিও না; এখন আমাদের বাড়ী চল; খোঁজ করিয়া আমি তোমাকে তোমার বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিব। আমি তোমাকে আপনার মেয়ের মত রাখিব।'

অনেকক্ষণ পরে শবদাহ শেষ হইল। শাস্ত্রকৃত্য সম্পাদন করিয়া সকলে সেই মরার ঘরে যাইয়া অবশিষ্ট রাত্রি যাপন করিল। পরদিন প্রাতে সকলে গঙ্গাস্নান করিয়া গৃহে যাত্রা করিল। সে দিবস তাহারা গৃহে পঁহুছিতে পারিল না; পথে এক চটিতে রাত্রি যাপন করিল; পর দিন অপরাহ্ণে গৃহে পঁহুছিল। ইহাদিগের বাটী গঙ্গাতীর হইতে ১৬ ক্রোশ দূরে। বিরজা ইহাদের সঙ্গে গিয়া ইহাদের বাটীতে

রহিল। বাটীস্থ সকলে বিরজাকে যথেষ্ঠ স্নেহ করিতে লাগিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

যে বৃদ্ধকে পাঠক গঙ্গাতীরে তনু-ত্যাগ করিতে দেখিলেন, তাঁহার নাম রামতনু ভট্টাচার্য্য; এ বাটী তাঁহার। রামতনু ভট্টাচার্য্য বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ ছিলেন। দশ বিঘা জমি জুড়িয়া তাঁহার বাটী। বাটীর বাহিরে একটি ও খিড়কিতে একটি, এই দুইটি পুষ্করিণী। প্রায় দুই শত বিঘা ভূমি আবাদ করা হয়। বাহির বাটির ও ভিতর বাটির উঠান দুটি যেন ঘোড়দৌড়ের মাঠ। এতদ্ভিন্ন টাকা কড়ি ধার দেওয়া আছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দুই পুত্র; জ্যেষ্ঠের নাম গোবিন্দচন্দ্র, কনিষ্ঠের নাম গঙ্গাধর। ইহাঁদের বিবাহ হইয়াছে। এক্ষণে গোবিন্দের বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি, গঙ্গাধরের অষ্টাদশবর্ষ। গঙ্গাধর বৰ্দ্ধমানের ইংরাজি বিদ্যালয়ে লেখা পড়া যৎকিঞ্চিৎ শিখিয়াছে। আমরা যৎকিঞ্চিৎ বলি, কিন্তু রামতনু ভট্টাচার্য্য মনে করিতেন, লেখা পড়া ইহা অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না। যৎকিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিখিলে যে দোষ হয়, তাহা গঙ্গাধরের হইয়াছিল। কিন্তু গোবিন্দচন্দ্র বড় ধীরস্বভাব—যদিও তিনি কখনও বিদ্যালয়ের কাষ্ঠাসন স্পর্শ করেন নাই তথাপি সচ্চরিত্র। গোবিন্দ সর্ব্বদা সংসার লইয়া ব্যস্ত। সময়ে আহার হয় না, সময়ে নিদ্রা হয় না। প্রাতঃকালে মাঠে যান, একটা দুটার সময় গৃহে আসিয়া স্নানাহার করেন; আহারান্তে আবার তাগাদায় বাহির হন। কিন্তু গঙ্গাধর এ সকল চাষার কৰ্ম্ম মনে করে; সকালে সকালে স্নানাহার করিয়া সে গ্রামের নিষ্কর্ম্মা লোকের সঙ্গে তাস পিটে ও বড়ে টিপে সময়সংহার করে। গুণ ত এই, ইহাতে যদি আবার দেও বলিলে বাড়ীতে কোন জিনিষ না পান, তবে মায়ের প্রতি রাগ, বড় বউয়ের প্রতি রাগ, দাসদাসিদের প্রতি রাগ। সকলে গঙ্গাধরকে বাবু বলে, গঙ্গাধর বাবুর ভয়ে সকলে ভীত। জ্যেষ্ঠভ্রাতা গঙ্গাধরকে অত্যন্ত ভাল বাসেন, তাঁহার চক্ষে গঙ্গাধরের দোষ দোষ বলিয়া বোধ হয় না। গোবিন্দচন্দ্রের পত্নী অত্যন্ত সাধুশীলা; তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর, দুটি পুত্র সন্তান হইয়াছে। গোবিন্দের মাতা নামে গৃহিণী, কিন্তু ঘরকন্না সকল জ্যেষ্ঠপুত্রবধূর হাতে। গঙ্গাধরের পত্নী আর বিরজা একই বয়েসী; অর্থাৎ গঙ্গাধরের পত্নীর বয়স দশবর্ষ মাত্র, নাম নবীনমণি। এ বয়সে বালিকারা স্বামিগৃহে যায় না; কিন্তু সংক্রামক জ্বরে নবীনের পিতা মাতা উভয়ের মৃত্যু হওয়াতে নবীনকে এখানে আনা হইয়াছে।

বিরজা এই গৃহে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। সে আপনার স্বভাবগুণে সকলের প্রিয়পাত্র হইল। বিশেষ ছোট বউ

নবীনের সহিত তাহার অত্যন্ত ভালবাসা হইল। দুইজন এক সঙ্গে স্নান করে, এক সঙ্গে আহার করে, এক সঙ্গে খেলা করে।

এক দিন গৃহিণী আহারান্তে দাবায় মাদুর পাতিয়া শুইয়াছেন। বিরজাকে মাথা দেখিতে বলিয়াছেন, সে শিয়রে বসিয়া মাথা দেখিতেছে। এমন সময়ে গৃহিণী বিরজাকে নৌকা ডুবির বৃত্তান্ত বিবৃত করিতে অনুরোধ করিলেন।

বিরজা বালিকা, নবীনের সঙ্গে খেলায় মত্ত থাকিত, সুতরাং সে সকল বিষয় এক প্রকার বিস্মৃত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহার সকল কথা মনে পড়িল। তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। গৃহিণী কহিলেন, 'এখন আর ভয় কি? এখন বল। না বলিলে কেমন করিয়া তোমাকে তোমার বাপের বাড়ী পাঠাব?'

বিরজা কহিল, 'আমার বাপ মা কেউ নাই, আমি কোথা যাব; এখানেই থাকিব।'

'তা থাক না, কে তোমাকে তাড়ায়? তবে তোমার আর কে আছে?'

বালিকা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'আমার কেউ নাই।'

বৃদ্ধা যে রাত্রে বিরজাকে পাইয়াছিলেন, সে রাত্রে বিরজার সীমন্তে সিন্দুর-ফোটা দেখিয়াছিলেন, সে কথা তাহার মনে আছে। তিনি আবার কহিলেন, 'তোমার বিয়ে হয়েছে কোন্ গ্রামে?'

'আমি সে গ্রামের নাম জানি না।'

'তোমার বাপের বাড়ী কোন্ গ্রামে?'

'আমি জানি না।'

'তোমার মামার বাড়ী কোথা?'

'আমি তাও জানি না।'

বৃদ্ধা আর কোন কথা উত্থাপন না করিয়া নিদ্রা যাইতে মনস্থ করিলেন। নবীন নিকটে আসিয়া বিরজাকে হাতে ধরিয়া লইয়া গেল। যাইতে যাইতে তাহার চক্ষের জল মোচন করিয়া দিল।

ইহার একবৎসর পরে বিরজা একদিন নবীনকে আত্মবিবরণ বলিল, তাহা এই—

'অতি ছোট বেলায় আমার পিতার মৃত্যু হয়, তাহার পর আমার মাতা শান্তিপুরের এক গোস্বামীর বাড়ীতে আমাকে লইয়া থাকেন। মাতা সেই বাড়ীতে রাঁধুনীর কর্ম্ম করিতেন। আমার যখন চারিবৎসর বয়স, তখন মাতার মৃত্যু হয়। মাতার মরণে আমি অনেক কাঁদিয়াছিলাম। সেই অবধি আমি সেই গোস্বামিদের বাড়ীতেই থাকিতাম। দশ বৎসর বয়সে আমার বিবাহের কথা হয়, কলিকাতার এক বাবুর সঙ্গে আমার বিবাহ হয়। বিবাহের আট দিন পরে সেই বাবু আমাকে লইয়া কলিকাতায় যাইতেছিলেন, সেই দিন ঝড় বৃষ্টি হইয়া নৌকা ডুবি হয়। আমি বড় সাঁতার জানিতাম; সকলে আমাকে জলজন্তু বলিত। আমি সাঁতার দিয়া দিয়া নদীর তীরে আলো দেখিয়া সেইখানে উঠি। তাহার পরে এঁরা আমাকে দেখিতে পাইয়া লইয়া আইসেন।'

আমরা বিরজার বৃত্তান্তের অবশিষ্টাংশ বলি। বিরজা গোস্বামীদের পালিতা কন্যা বলিয়া তাহার বিবাহের বিষয়ে বড় কষ্ট হইয়াছিল। বিরজার নিজের কোন দোষ ছিল না; সে দেখিতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী। কিন্তু বিরজা কাহার কন্যা, তাহার নিশ্চয় প্রমাণ নাই; সুতরাং কোন্ ভদ্র লোক বিবাহ করিবে। শান্তিপুরের একটি যুবক কলিকাতায় থাকিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিত; সে এই সংবাদ তাহার এক বন্ধুকে দেয়। বন্ধু শুনিয়া এক দিন শান্তিপুরে বিরজাকে দেখিতে যান। দেখিয়া তিনি তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হয়েন। তিনি বিদেশী, পিতা মাতাকে না বলিয়া গোপনে বিরজাকে বিবাহ করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, বিরজাকে কলিকাতায় আনিয়া কোন বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষার্থ রাখিয়া দিবেন। পথে নৌকা ডুবি হয় পাঠক তাহা নিজে দেখিয়াছেন। ইহার পরের বৃত্তান্ত বিরজা নিজে বলিয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়।

গোবিন্দের পত্নী ভবতারিণীর পিত্রালয় কোন্নগরে। তিনি লিখিতে পড়িতে জানিতেন; এবং বিরজা ও নবীনমণিকে অবকাশমতে শিক্ষা দিতেন। চারি পাঁচ বৎসরে তাহারা উভয়ে এক রকম লেখা পড়া শিখিল, বিরজা কিছু অধিক শিখিল। বিরজা গৃহিণীর কাছে বসিয়া রামায়ণ বা মহাভারত পাঠ করিত, পাড়ার অনেক প্রাচীনা আসিয়া জুটিয়া, শ্রবণ করিতেন।

বিরজা এক্ষণে পঞ্চদশবর্ষ অতিক্রম করিয়াছে; নবীনেরও এই বয়স। বিরজা গৌরাঙ্গী, নবীনমণি শ্যামাঙ্গী। গৌরাঙ্গী হইলেই রূপবতী হয় না, আর শ্যামাঙ্গী হইলেই কুৎসিতা হয় না। ইহারা উভয়েই রূপসী; কিন্তু বিরজার রূপলাবণ্য চমৎকার, নবীনের রূপলাবণ্য সাধারণ। বিরজা দীর্ঘকায়া, নবীন খর্ব্বকায়া। বিরজার নাসিকা ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে যতটুকু স্থান থাকিলে মানায়, ততটুকু স্থান অধিকার করিয়াছে; আর ততটুকু উচ্চ। কিন্তু নবীনের নাসিকা কিছু অধিক উচ্চ। বিরজার নয়ন দুটি বৃহৎ, দীর্ঘাকার; নবীনের নয়ন দুটি আরও বৃহৎ, কিন্তু কলিকাতার কালী প্রতিমার চক্ষের ন্যায় প্রায় কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহাকেই যদি কবিরা আকর্ণ বিশ্রান্ত চক্ষু বলেন, তবে আমরা ইহাতে সৌন্দর্য্য দেখি না। বিরজার কপাল সমতল, কিন্তু নবীনের কপাল উচ্চ। বিরজার গ্রীবাদেশ দীর্ঘ, যাহাকে হংসগ্রীবা বলে, কিন্তু নবীনের গ্রীবাদেশ হ্রস্ব। অন্যান্য বিষয়ে উভয়ের রূপ সমান। উভয়ের কেশদাম নিতম্বচুম্বিত, উভয়ের বাহু মৃণালসন্নিভ, উভয়ের অঙ্গুলীগুলি সুগোল পদ্মকলিকা সদৃশ, উভয়ের দেহে নবযৌবনের সম্পূর্ণ আবির্ভাব, কিন্তু স্বভাববিষয়ে বৈলক্ষণ্য আছে। উভয়ে একত্র বাস করেন, অক্র-

ত্রিম প্রণয়; কিন্তু উভয়ের স্বভাব এক-রূপ নহে। বিরজা মিষ্টভাষিণী, নবীনও মিষ্টভাষিণী; কিন্তু যে স্থলে উচিত কথা বলিলে অন্যের মনে কষ্ট হয়, বিরজা সে স্থলে কোন কথা বলে না, নীরবে থাকে। নবীন তাহা পারে না; অন্যের মনে কষ্ট হউক, আর না হউক, আপনি সকল সময়ে উচিত কথা বলে। সত্য ও উচিত কথা বলাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু বলিলে যদি পরের মনে কষ্ট দেওয়া হয়, তাহা হইলে না বলিয়া মৌনাবলম্বন করা ভাল। নবীন ইহা জানিত না, বা বুঝিত না। গঙ্গাধরের সঙ্গে নবীনের সুপ্রণয় না হইবার ইহাই এক প্রধান কারণ। গঙ্গাধর সমস্ত দিন তাস পিটে ঘরে আসিলে, বিরলে পাইয়া নবীন তাহাকে ভৎর্সনা করিত। অকপটচিত্তে তাহার দোষের কথা উল্লেখ করিত। গঙ্গাধরের মঙ্গল সাধনোদ্দেশে নবীন এরূপ করিত; কিন্তু গঙ্গাধর তাহা বুঝিত না। সে মনে করিত স্ত্রী স্বামীর অধীন; স্বামীর দোষ উল্লেখ করিতে তাহার অধিকার নাই। যাঁহারা স্ত্রীকে গৃহের সামগ্রীবিশেষ জ্ঞান করেন, তাঁহারা গঙ্গাধরের সঙ্গে একমত হইবেন; এবং স্ত্রীর মুখে আপনার দোষ উল্লেখ শুনিয়া বিরক্ত হইবেন। কিন্তু এরূপ মহাত্মাদিগকে আমরা জানাইতেছি যে, স্ত্রীলোকেরা আপনাদিগকে স্বামিগৃহের তৈযসবিশেষ জ্ঞান করে না; তাহারা আপনাদিগকে স্বামীর সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী, স্বামীর বন্ধু, স্বামীর সুপরামর্শদাতা মন্ত্রী; অধিক কি, তাহারা আপনাদিগকে সংসার রূপ তরণীর হালি জ্ঞান করে। এজন্য আবশ্যক স্থলে স্বামীকে ভৎর্সনা করিয়া থাকে। কিন্তু নবীন যেমন দোষী স্বামীর প্রতি সর্ব্বদা আরক্ত নয়নে দৃষ্টি করিত, আমরা এরূপ করিতে কোন সুন্দরীকে পরামর্শ দি না। মিষ্টবাক্যে ও সপ্রেম ব্যবহারে স্বামীকে সন্তুষ্ট করিবে। এবং পরে স্বামীর অসদ্ব্যবহারে নিজে দুঃখিত হইয়া দুঃখের সহিত কোমল নয়ন দুটি বাষ্পবারি পরিপূর্ণ করিয়া স্বামীকে ভৎর্সনা করিয়া দেখিও, স্বামী সুপথে আইসে কি না।

এই কারণে গঙ্গাধর পার্য্যমানে নবীনকে দেখা দিত না। তাহাতে নবীনের আরও অনিষ্ট হইতে লাগিল। গঙ্গাধর বিরজার প্রতি অনুরক্ত হইল। বিরজার হাস্যবদন, বিরজার মধুর বাক্য, বিরজার অনুরাগের ভাব, সদাই সে ধ্যান করিত। বিরজা প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই। শেষে গঙ্গাধরের ভাববৈলক্ষণ্য টের পাইল। কিন্তু নবীনকে বলিল না, বলিলে নবীনের সহিত তাহার বিচ্ছেদ হয়, এই ভাবিয়া বলিল না। নবীনের বিরজার প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস ও ভালবাসা ছিল। এজন্য তাহার প্রতি সন্দেহ হইল না। বিরজা আরো ভাবিল যদি একথা নবীনকে বলি, গঙ্গাধরের প্রতি নবীন আরও হতশ্রদ্ধ হইবে। বিরজা নবীনকে

স্বামীর সহিত মধুর ব্যবহার করিতে, ও স্বামীর মন যোগাইয়া চলিতে পরামর্শ দিল। নবীন বিরজার পরামর্শে সেরূপ করিতে চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু পারিল না; যাহা তাহার স্বভাবের বিপরীত, তাহা পারিবে কি প্রকারে? বিরজা ভাবিয়াছিল, নবীনের প্রতি যদি অনুরাগ দৃঢ় হয়, তবে আর গঙ্গাধর তাহার প্রতি অনুরক্ত হইবে না। সে কল্পনা সিদ্ধ হইল না; নবীন গঙ্গাধরকে বশ করিতে পারিল না। গঙ্গাধরের অনুরাগ বিরজার প্রতি দিন দিন বাড়িতে লাগিল। একদিন গঙ্গাধর বিরজাকে বলিল, 'তুমি কলিকাতায় চল; এখানে দাসীভাবে আর কতকাল থাকিবে? কলিকাতায় বিধবাবিবাহ হয়, তোমাকে বিবাহ করিয়া আমি কলিকাতায় থাকিব।' বিরজা 'অমন কথা বলিও না,' বলিয়া গঙ্গাধরের সম্মুখ হইতে বিদ্যুতের ন্যায় চলিয়া গেল। গঙ্গাধর অবোধ, সে মনে করিল, তাহার প্রতি বিরজাও অনুরাগিনী।

পঞ্চম অধ্যায়।

ভাদ্র মাস, শরতের পূর্ব্বীয় পবন মেঘরাশি সরাইয়া অনন্ত আকাশ নির্ম্মল করিয়াছে। মাট,ঘাট,সরোবর জলে পরিপূর্ণ। ভট্টাচার্য্যদের বাটীর খিরকির পুষ্করিণীতে বিস্তর জল হইয়াছে। আজি পুর্ণিমা রাত্রি। আহারান্তে বিরজা ও নবীন থালাহাতে করিয়া ঘাটে গিয়াছে। পুষ্করিণীর জলে অসংখ্য কুমুদিনী ফুটিয়াছে, সরোবরের কোলে তারকামণ্ডিত ও পূর্ণচন্দ্র পরিশোভিত নীল নভোমণ্ডল হাসিতেছে। কুমুদপত্রগত বারি-মধ্যে পর্য্যন্ত চন্দ্ররশ্মী খেলা করিতেছে। পুষ্করিণীর চারি তীরস্থ বৃক্ষাবলীর পত্রে চন্দ্রকিরণ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বিরজা যে থালা ধুইয়া ষানবাঁধা ঘাটে রাখিয়াছেন, তাহাতে পর্য্যন্ত চন্দ্রকিরণ পড়িয়া হাসিতেছে। বিরজা ঘাটের আলিসায় বসিয়া আছেন, নবীন গা ধুইতে জলে নামিয়াছেন।

নবীন গা ধুইতে ধুইতে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। বিরজা তাহা লক্ষ্য করিলেন। কহিলেন, 'নবীন এমন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলে কেন?'

'মনের দুঃখে।'

'কি দুঃখ?'

'তা কি জান না?'

বিরজা, 'জানি' বলিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া আবার কহিল, 'ও কি ও, নবীন! তুমি কাঁদিতেছ না কি?'

'কাঁদিতেছি।'

'এত জলে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছ কেন?'

'বিরজে! আমার কেউ নাই যে, কাঁদিলে চক্ষের জল মুছাইয়া দেয়। তাই জলে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছি যেন চক্ষের জল পুকুরের জলে মিশে যায়।'

'কেন আমি আছি—আমি কি তোমার চক্ষের জল মুছিয়া দেই নাই?

'দিয়াছ—কিন্তু কতকাল দিবে ?'

'যতকাল বাচিব।'

'তুমি কি আমায় এত ভাল বাস ?'

'তা তুমি জান ?'

'আমি যদি মরি, আমার জন্যে তুমি কাঁদিবে ?

'কাঁদিব।'

কেবল কাঁদিবে, আমি মরিলে মরিবে না ?'

নবীন বিরজাকে ভাবনায় ফেলিল। বিরজা বলিল, 'মরিব বই কি ?'

'আমি মরিলে, আমার জন্যে মরিতে পার, তুমি আমায় এত ভাল বাস না। তাহা হইলে অত ভাবিয়া বলিবে কেন 'মরিব বৈ কি ?''

বিরজা কথা উড়াইয়া দিবার জন্য কহিল, 'আচ্ছা, আমি তোমায় ভাল বাসি না, আর তোমারও মরে কাজ নাই, আমার ভালবাসাও দেখাইয়া কাজ নাই; এখন গা ধুইয়া উঠ।'

এমন সময়ে পুষ্করিণীর তীরে টিপ্ করিয়া একটি পাকা তাল পড়িল। তখন নবীন হাসিয়া কহিল, 'তবে বুঝি ভালবাসা, যদি আমাকে ঐ তালটি কুড়িয়ে এনে দাও।'

বিরজা একটিও কথা না কহিয়া তাল কুড়াইতে গেল। আমাদিগের পল্লীগ্রামস্থ পাঠক ও পাঠিকারা জানেন যে, তাল তলায় প্রায়ই ছোট ছোট অনেক বৃক্ষলতাদি থাকে। এ তালতলায়ও তাহা ছিল। সুতরাং পূর্ণিমার রাত্রি হইলেও তালতলায় কিছু কিছু অন্ধকার ছিল। তালের রং আর অন্ধকারের রং একই; বিরজা যাওয়া মাত্রই তালটি পাইল না। সে উবুড় হইয়া জঙ্গলের মধ্যে তালটি খুঁজিতে লাগিল। তাল খুঁজিতে অনেক ক্ষণ লাগিল। অনেক ক্ষণ পরে তাল পাইয়া 'পেয়েছি, পেয়েছি' বলিয়া মস্তক তুলিয়া ঘাটের দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিল, জল হইতে একজন পুরুষ মানুষ উঠিয়া চলিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। ইহা দেখিয়া বিরজার শরীর শীহরিয়া উঠিল। আবার তদ্দণ্ডে সাহসে ভর করিয়া ধীরে ধীরে ঘাটে আইল। ঘাটে আসিয়া নবীনকে দেখিতে পাইল না; কিন্তু পুষ্করিণীর জল যেন অত্যন্ত গভীর বোধ হইল। বিরজার সমস্ত শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। হাতের তাল অজ্ঞাতসারে মাটিতে পড়িয়া গেল। বিরজা শেষে থালা কখানি কম্পিত হস্তে তুলিয়া বাটীতে প্রবেশ করিল।

বাটীতে আসিয়া, অন্যে যেন সন্দেহ করিবার কারণ না পায়, এমত ভাবে নবীনের অন্বেষণ করিল, কিন্তু পাইল না। নবীনের শয়নগৃহ দেখিল, সলিতা আনিবার ছল করিয়া বড়বধূর শয়নগৃহে গেল, মহাভারত খানা আনিবার ছল করিয়া গৃহিণীর ঘরে গেল, কোথাও নবীনকে দেখিতে পাইল না! পাছে অন্যে সন্দেহ করে, এই ভয়ে আর কিছু না করিয়া

বিরজা আপনার ঘরে যাইয়া শয়ন করিল। মন উৎকণ্ঠিত থাকিলে নিদ্রা হয় না। রাত্রি দ্বিপ্রহর হইল, বিরজার চক্ষে নিদ্রা নাই। বিরজার মনে নানা চিন্তার তরঙ্গ; কেবল পার্শ্ব পরিবর্ত্ত করিতে লাগিল। এই প্রকারে আরও প্রহরেক গত হইল। বিরজা তখন ভাবিল, এখন সকলে নিদ্রিত, একবার ঘাটে যাইয়া দেখি, কি হইয়াছে। বোধ হয়, নবীনকে কেউ জলে ডুবাইয়া মারিয়াছে। তা হলে এতক্ষণ সে ভাসিয়া উঠিয়াছে। বিরজা সাহসে নির্ভর করিয়া ধীরে ধীরে ঘাটে গেল। দেখিল, জলে একটি শব ভাসিতেছে। বিরজা শব দেখিবামাত্র পশ্চাৎ সরিয়া বাটীর ভিতরে আসিল। পরে আপনার কক্ষে আসিয়া ভাবিল, এখন কি করি? দুই জনে এক সঙ্গে ঘাটে গিয়াছিলাম, সকলে জানে। নবীন যদি নিজেও জলে ডুবিয়া মরিয়া থাকে, কিম্বা আর কেহও যদি তাহাকে মারিয়া থাকে, দোষ আমার উপরে পড়িবে। সকলে আমাকে সন্দেহ করিবে; নানা লোকে নানা কথা কহিবে। থানা পুলিস হইবে, অপমান ও লাঞ্ছনা আমার হইবে। 'নবীন, তুই মরিলি, আমাকে মারিলি কেন?'

বিরজা শেষে, অনেক চিন্তার পর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, আজি হইতে এ বাড়ীতে আমার অন্ন উঠিল। যদি নৌকাডুবিতে মরিতাম, এ দুঃখ হইত না। এখন কি করি? অনেক ভাবিয়া বিরজা স্থির করিল, এস্থান পরিত্যাগ করাই পরামর্শ। এই স্থিরসংকল্প করিয়া সে ধীরে ধীরে রাত্রি থাকিতে থাকিতে ভট্টাচার্য্যের বাড়ী ত্যাগ করিয়া চলিল।

নিশীথ চিন্তা।

নদীর জল।

"সাগর উদ্দেশে নদী, ভ্রমে দেশে দেশে রে,
অবিরাম গতি!
গগণে উদিলে শশী, হাসি যেন পড়ে খসি,
নিশী রূপবতী।"

ঐ যে কলকলায়মানা নদী, জ্যোৎস্না-তরঙ্গে তরঙ্গ মিশাইয়া, উন্মাদিনীর মত, প্রেম-বিহ্বলার মত, আনন্দের প্রবাহের মত, উছলিয়া উছলিয়া চলিয়া যাইতেছে, আজিকার এই আনন্দময়ী উন্মাদিনী জ্যোৎস্নায় উহার সহাস্য পুলিনই আমার এ হৃদয়ের বিশ্রামস্থল। জ্যোৎস্না হাসিতেছে, নদীর তরঙ্গও হাসিতেছে, অথচ এই হা-

সিতে প্রাণ কেন যে উদ্বেল, উদাস এবং কেমন এক সহর্ষ যন্ত্রণায় অধীর হইয়া উঠিতেছে, তাহা বুঝিতে পারি না। যাহারা স্বার্থের দাস, সুখের ভিখারী এবং সমাজরূপ অভিনয়গৃহের ক্রীড়াপুত্তল তাহারাই গিয়া ধনীর প্রাসাদ এবং বিলাসীর প্রমোদভবনে স্বার্থ, সুখ এবং সামাজিক সম্মানের অন্বেষণ করুক; যাহারা অর্দ্ধমৃত, তাহারাই গিয়া মনুষ্যের অর্দ্ধমৃত প্রণয়, অর্দ্ধমৃত আমোদ, অর্দ্ধমৃত উপদেশ এবং অর্দ্ধমৃত হৃদয়ের জন্য লালায়িত রহুক। আমার ভোগের স্থান ঐ নদীর জল, বিলাসের স্থান ঐ নদীর জল, এবং শিক্ষার স্থানও ঐ নদীর জল। আমি উহার তর-তর-বাহি সজীব প্রবাহে যে সজীব সৌন্দর্য্য এবং চল-শোভা দেখিতেছি, সংসারে কিসের সহিত তাহার তুলনা দিব? উহার হ্রাস ও বৃদ্ধি, আবর্ত্ত ও আবেগ, উহার ক্রোধের গর্জ্জন, উহার মধুর সম্ভাষণ, উহার আবিলতা এবং অট্টহাস্যও আমার চক্ষে যেরূপ প্রতিভাত হইতেছে, জগতে কোন্ বস্তুকে তাহার উপমাস্থল বলিব?

তরঙ্গিণি! তুমি মায়াময়ী, তুমি মহিমাময়ী, তুমি চিন্তার চির-উদ্দীপনা। তোমায় আমি ভালবাসি। তোমারও নিদ্রা নাই, আমারও নিদ্রা নাই। তুমি অবিরাম প্রবাহিত হইতেছ;—জান না কোথায় যাও, তথাপি বহিয়া যাইতেছ। আমার হৃদয়-নিঃসৃত দুর্নিবার স্রোতও অবিরাম প্রবাহিত হইতেছে;—জানে না কোথায় যায়, তথাপি বহিয়া যাইতেছে। তুমিও আপনার সুখে এবং আপনার দুঃখে আপনা আপনি গাইতেছ, এবং আপনার গীতে আপনিই ঢল ঢল রহিয়াছ;—আমিও আনার সুখে এবং আপনার দুঃখে আপনা আপনি গাইতেছি, এবং আমার এই অস্ফুট অথচ গভীর সংগীতে আপনিই বিভোর রহিয়াছি। আজি তুমি যেমন চন্দ্রমার অমল কৌমুদী রাশিতে মিশিয়া গিয়াছ, সর্ব্বাঙ্গেই কৌমুদী পরিয়াছ, এবং সমীরণের হিল্লোলে হিল্লোলে হিল্লোল তুলিয়া ঐ কৌমুদী লইয়াই ক্রীড়া করিতেছ, আমার ইচ্ছা করে আজি আমিও সেইরূপ সর্ব্বাঙ্গে তোমাকে মাখিয়া, তোমার সহিত মিশ্রিত হইয়া, তোমার ঐ মরালনিন্দি লহরীচয়ের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে একবারে সেই অনন্ত সাগর-ক্রোড়ে গিয়া নিপতিত হই। কিন্তু তুমি স্বাধীন, আমি পরাধীন! কে আমার চরণের লৌহ-নিগড় ভাঙ্গিয়া আমাকে তোমার মত স্বাধীন করিয়া দিবে? তুমি কাহারও ভ্রূকুটি-ভঙ্গিতে ফিরিয়া চাও না; আমি মনুষ্যের ভয়ে সতত শশব্যস্ত। কে আমায় অভয় দান করিয়া আমাকে তোমার মত দৃক্‌পাতশূন্য করিবে? হায়! আমি যদি তোমার ঐ একাগ্রমতি, নির্ভীকগতি এবং উচ্ছৃঙ্খলতা লাভ করিতে পারিতাম, তবে এতদিনে আমিও, তোমার মত, আমার গম্যস্থান প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইতাম।

কিন্তু আমার সে মনোরথ কি কখনও সফল হইবে ?

হে মোহান্ধ মনুষ্য-কবি ! তুমি আমায় কি কাব্যে মোহিত করিবে,বল। তোমার কাব্য অপূর্ণ,অর্দ্ধবিকশিত। কল্পনা তোমার মানসপটে কখনও খেলা করে,কখনও খেলা করে না। উহা তোমার নিকট বিদ্যুতের ক্ষণিক স্ফুরণের ন্যায় এই দৃশ্য, এই অদৃশ্য। তুমি শত আরাধনা করিয়াও উহাকে হৃদয়ে বান্ধিয়া রাখিতে পার না। তুমি লৌকিক যশের জন্য নিয়ত আকুলিত; কল্পনার অলৌকিক-শোভাময় কেলিকাননে কিরূপে প্রবেশ করিবে! তুমি দ্বেষহিংসার অধীন ; কল্পনার অপাপবিদ্ধ অমৃতরসাঞ্জনে তোমার ঐ পাপচক্ষু কিরূপে রঞ্জিত হইবে ! আর ভাষা ? তুমি কল্পনার আকস্মিক করুণায় সত্য ও সৌন্দর্য্যের যে টুকু আভা দৈবাৎ দেখিতে পাও, তোমার মানুষী ভাষায় তাহাও পরিব্যক্ত হয় না ;—তোমার দুর্ব্বল বর্ণতুলিকায় তাহাও ফলায় না। আমার কাব্য ঐ তরঙ্গিণী,—পরিস্ফুট, পূর্ণবিকশিত, এবং তরঙ্গে তরঙ্গে আন্দোলিত। আমি উহাতে কখনও প্রীতির প্রমত্ত উচ্ছ্বাস দেখিয়া পুলকে পরিপূরিত হই, কখনও করুণার মৃদুকণ্ঠ শুনিয়া দর দর ধারায় অশ্রুবিসর্জ্জন করি, কখনও বীররসের তটাভিঘাতি কল্লোল-নাদে মত্ত হইয়া উঠি, এবং কখনও উহার অবাতবিক্ষোভিত প্রশান্ত মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া, ধীরে ধীরে, চৈতন্যেরও অগোচরে, শান্তির নির্ম্মলসলিলে নিমজ্জিত হইতে থাকি।

মনুষ্যের প্রেমে আমার বিশ্বাস নাই, মনুষ্যবর্ণিত প্রেমিক এবং প্রেমিকায়ও আমার শ্রদ্ধা নাই। আমি অমন আধ আধ ভালবাসা ভালবাসি না, প্রেমের অমন ভ্রমর-বৃত্তিতায় কখনও ভুলিয়া পড়ি না। যে প্রেম আঁখির পলকে পরিবর্ত্তিত হয়, আতপতপ্ত কুসুমের মত দেখিতে দেখিতেই শুকাইয়া যায়, অথবা ব্রততীর ন্যায় বাতাহত হইলেই ছিন্ন হইয়া পড়ে,—যে প্রেম সুখে এক,দুঃখে এক, সম্পদে এক,বিপদে এক, যখন নূতন তখন এক, এবং যখন পুরাতন তখন এক, কুকবির কুহকাচ্ছন্ন চঞ্চল মনুষ্যই তাহা লইয়া তৃপ্ত রহিতে পারে। আমার প্রেমের গুরু তরঙ্গিণী। যদি কখনও ভালবাসি,—যদি কখনও সাধনা করি, তবে ঐ তরঙ্গিণীর নিকটই ভালবাসা এবং সাধনার মন্ত্র গ্রহণ করিব। জোয়ারে উঠিব, ভাটায় নামিব, বর্ষায় স্ফীত হইব, শীতে ক্ষীণ হইয়া যাইব, তথাপি গতি সাগরের দিকে। যদি পর্ব্বতও সম্মুখে আসিয়া পড়ে,তাহা ভাসাইয়া দিব, কি ভেদ করিয়া চলিয়া যাইব, এবং যদি প্রাণ-প্রবাহ একবারে শুষ্ক হইয়া যায়, তথাপি অন্তঃসলিলা ফল্গুগঙ্গার ন্যায় অভ্যন্তরে প্রবাহিত হইব। প্রেমের এমন লীলা আর কোথায় আছে ?

মনুষ্য যে মনুষ্যের জন্য বিলাপ করে, তাহাতেও আমার হৃদয় আর্দ্র হয় না।

মনুষ্যের বিলাপ ক্ষণস্থায়ী, উহা প্রায়ই স্বার্থ এবং কপটতায় জড়িত, এবং অধিক স্থলেই নটনৈপুণ্যের ন্যায় প্রদর্শিত। প্রাতে যাহার শোক,এবং সন্ধ্যাগমেই যাহার সুখ-লালসা, যে লোকাচারের বশবর্ত্তী হইয়া হাসিতে হাসিতে কান্দিয়া ফেলে এবং ক্রন্দনের আর্ত্তনাদ নিবৃত্ত না হইতে হই-তেই ফুল্ল অরবিন্দের ন্যায় হাসিতে থাকে, শোক যাহাকে অন্ততঃ এক যুগও ক্ষুধাতৃ-ষ্ণায় বর্জ্জিত,আমোদ ও উৎসবে বিরত এবং শয্যাগত করিয়া না রাখে, সে কেন বৃথা শোকাকুলতা দেখাইয়া মমতার বিড়ম্বনা করে? আমার যদি কখনও কেহ প্রিয় হয়, আর আমি যদি কখনও প্রিয়জন-শোকে আকুল হই, তবে ঐ পুরোবর্ত্তিনী তরঙ্গিনীর ন্যায় বিলাপ করিব। সূর্য্য উ-দিত হইবে এবং সূর্য্য অস্ত যাইবে, চন্দ্র তারা নভোমণ্ডলে প্রস্ফুটিত হইয়া পুন-রায় বিলীন হইবে, আমি তথাপি ঐ দ্রব-ময়ীর ন্যায় বিলাপ করিতে থাকিব। যদি প্রাণ ভরিয়া এবং যগান্ত ব্যাপিয়া কা-ন্দিতে না পারিলাম, তবে আর সে ক্রন্দ-নের তাৎপর্য্য কি?

হে সহৃদয়! তুমি কি তোমার জীবনে কখনও কাহারও জন্য কান্দিয়াছ, অথবা অন্যের ক্রন্দন শুনিয়াছ? যদি কাঁদিতে কি ক্রন্দন শুনিতে ইচ্ছা কর, তবে স্বচ্ছ-সলিলা সরযুর তটে গমন কর। কত রাজা ও রাজ্য জগতে বিরাজ করিল, কত রাজা ও রাজ্য বিলয় পাইল। পরিবর্ত্তনের স্রোতে কতই কি পরিবর্ত্তন ঘটিল। কিন্তু সরযুর তটে আজিও হা রাম! হা অযোধ্যা! এই একমাত্র হাহাকার! জ্যোৎস্নায় এবং অন্ধকারে,সন্ধ্যার রক্তিমায় এবং ঊষার বি-রসলাবণ্যে, সকল সময়েই ঐ হা রাম! হা অযোধ্যা! এই একই হাহাকার-ধ্বনি স্নেহগদ্গদ স্রোতস্বিনীর বক্ষঃস্থল বিদারণ করিয়া ফাটিয়া বাহির হইতেছে, এবং প-রদুঃখকাতরা প্রতিধ্বনিও যেন হা রাম! হা অযোধ্যা! বলিয়াই নিশার নিস্তব্ধ গা-ম্ভীর্য্যের মধ্যে বিলাপ করিতেছে।

অকৃতজ্ঞ ভারতবাসী, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের ভোগে সুখে নিমগ্ন হইয়া, ভারতের ভূত-পূর্ব্ব-কীর্ত্তি চিরকীর্ত্তনীয় আর্য্যজাতিকে অ-নায়াসে ভুলিতে পারিয়াছে;—যাঁহাদি-গের পদরজঃস্পর্শে পৃথিবী পবিত্র হইয়া-ছিল, যাঁহাদিগের গুণগরিমায় এবং তে-জঃপ্রভায় ভারতভূমি দেবভূমি বলিয়া প-রিচয় পাইয়াছিল, যাঁহাদিগের কবিজন-স্পৃহণীয় পৌরুষ-সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া কবিতা আপনিই এক সময়ে প্রেমা-ধীনা কুলকামিনীর ন্যায় ভারতনিকুঞ্জে বিরাজমানা ছিল,ভারতসন্তান সেই প্রাণা-ধিক-প্রিয় পূজনীয় পূর্ব্বপুরুষদিগকে অ-কাতরমনে পাসরিয়া রহিয়াছে। কা-হারও চক্ষু একবিন্দু অশ্রুবারি দিয়াও তাঁ-হাদিগের তর্পণ করে না; কাহারও হৃদয় তাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়া সামান্য একটি নিঃশ্বাসেও উত্তপ্ত হয় না; কেহ দিনান্তেও একবার তাঁহাদিগের নাম করিয়া স্ববংশ-

বাৎসল্য ও স্বজনানুরাগের পরিচয় দেয় না। কিন্তু আর্য্যের গৌরবসহচরী কালিন্দী এবং ভাগীরথী, নর্ম্মদা এবং গোদাবরী আজি বিংশতি শতাব্দীর সুদূর ব্যবধানেও আর্য্যনাম ভুলিতে পারে নাই। উঁহারা অদ্যাপি পুত্রশোকাতুরা জননীর ন্যায়, পতিশোক-বিবশা বিধবার ন্যায়, ভারতীয় আর্য্যের জন্য নিয়ত বিলাপ করিয়া, তটস্থিত তরুলতা এবং তরুশাখাস্থিত বিহঙ্গনিচয়কেও শোকে সংজ্ঞানশূন্য করিয়া রাখিতেছে ; এবং যাহার শরীরে শোণিতের কিঞ্চিন্মাত্রও সঞ্চার আছে, যাহার হৃদয়যন্ত্র প্রায়-নিস্পন্দ ঘটিকা-যন্ত্রের ন্যায় এখনও একটুকু একটুকু স্পন্দিত হইতেছে, ঐ মর্ম্মস্পর্শি নৈশবিলাপ তাহাকেও আকুল ও উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছে।

ধিক্ আমায় ! আমি আপনাকে আপনি মনুষ্য বলিয়া গণনা করি ! ধিক্ আমায় ! আমি আমার এই শীতসঙ্কুচিত পাষাণকঠিন প্রাণের আবার স্পর্দ্ধা করি ! আমি যদি এইরূপ নির্দ্ধন মনুষ্য না হইয়া বৃক্ষের একটি পাতা কি বনের একটি ফুল হইতাম, তাহাও ইহা অপেক্ষা শতগুণে আমার ভাল ছিল। আমার এ আগুণ তাহা হইলে আর আমায় দাহন করিত না, লজ্জায় এবং অনুতাপে অহোরাত্র এইরূপ পুড়িয়া মরিতাম না, এবং স্মৃতি ও আশা, অভিমান এবং আত্মাবমাননার বিরোধ-দুঃখও আমাকে সর্ব্বদা এরূপ দংশন করিত না। যেমন স্রোতের জলে নির্ম্মাল্য পুষ্প,—হর্ষ নাই, বিষাদ নাই, ভূত নাই, ভবিষ্যত নাই,—আমিও তাহা হইলে ঠিক্ সেইরূপ থাকিতাম, এবং চিরকাল তরঙ্গবক্ষে ভাসিয়া ভাসিয়া অবশেষে ঐ স্রোতের জলেই মিশিয়া যাইতাম। আমি আছি কি নাই কেহ তাহা দেখিত না, আমি ছিলাম কি না তাহাও কেহ জানিত না। যদি দেখিত কি জানিতে পাইত, তাহা হইলেও কেহ আমায় হাসিত না, কি আমার জন্য কাঁদিত না।—(উদাসীন।)

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

সরোজিনী, বা চিতোর আক্রমণ নাটক। পুরুবিক্রম নাটকরচয়িতা কর্ত্তৃক প্রণীত।—এই নাটকখানি গ্রীককবি ইউরিপাইডিজের ইফিজিনিয়া নামক সুপ্রসিদ্ধ নাটকের অনুকৃতি। কিন্তু অনুকৃতিতে প্রায়ই যে সকল দোষ ঘটে, ইহাতে তাহা পরিলক্ষিত হয় না। ইহা সর্ব্বাংশে নূতন স্বষ্টির মত হইয়াছে ; যাঁহার কবিত্ব নাই, যাঁহার কল্পনা স্ফূর্ত্তিমতী নহে, যিনি পুরাতনকে নূতন করিতে না পারেন, এইরূপ অনুকরণ তাঁহার পক্ষে এক অসাধ্যব্যাপার। আমরা পুরুবিক্রম পাঠ করিয়া গ্রন্থকারকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছি ; সরোজিনী পাঠে বুঝিয়াছি যে,

তিনি আত্মগোপনের জন্য অশেষ যত্ন করিলেও বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে আর অধিক দিন অপরিচিত রহিতে পারিবেন না। গ্রন্থনায়িকা সরোজিনী সৌন্দর্য্যের এক আশ্চর্য্য প্রতিমূর্ত্তি। প্রীতি এবং পবিত্রতা সরোজিনীতে যেন এক হইয়া গিয়াছে। পবিত্রতা প্রীতির ন্যায় কমনীয় প্রতিভাত হইতেছে, এবং প্রীতি কুসুমকোমলা হইয়াও পবিত্রতার উজ্জ্বল জ্যোতিতে শোভা পাইতেছে। এইরূপ চিত্রনৈপুণ্য সামান্য শক্তির কার্য্য নহে। আমরা এই নাটকখানির সমালোচনা প্রসঙ্গে আর কিছু না বলিয়া ইহার দুইটি কবিতা পাঠকবর্গকে উপহার দিব। আমাদিগের নিশ্চিত ভরসা আছে যে, যিনি তাহা পাঠ করিবেন, তিনিই গ্রন্থকারকে সুকবি বলিয়া প্রশংসা করিবেন, সহৃদয় বলিয়া ভাল বাসিবেন, এবং স্বদেশবৎসল বলিয়া তাঁহার নিকট শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার পাশে বদ্ধ হইবেন।—

"পরাণে আহুতি দিয়া সমর-অনলে,
স্বর্গে পিতা পুত্র পতি গিয়াছেন চ'লে,
এখন কি সুখ আশে, থাকিব সংসার-পাশে,
এখন কি সুখে আর ধরিব পরাণ।
হৃদয় হয়েছে ছাই, দেহও করিব তাই,
চিতার অনলে শোক করিব নির্ব্বাণ।
দূর হ! দূর হ তোরা ভূষণ-রতন!
বিধবা রমণী আজি পশিবে চিতায়;
কবরি! তোরেও আজি করিনু মোচন,
বিধবা পশিবে আজি অনল-শিখায়;
অনল সহায় হও, বিধবারে কোলে লও,
লয়ে যাও পতি পুত্র আছেন যথায়;
বিধবা পশিবে আজি অনল-শিখায়।

(সকলে সমস্বরে)

জ্বল্ জ্বল্ চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক্ জ্বলুক্ চিতার আগুণ
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা॥
শোন্‌রে যবন! শোন্ রে তোরা!
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে,
সাক্ষী রলেন দেবতা তার,
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে॥

* * *

কতকগুলি আহত রাজপুত সমস্বরে

দ্যাখ্ রে জগৎ, মেলিয়ে নয়ন,
দ্যাখ রে চন্দ্রমা, দ্যাখ্ রে গগন!
স্বর্গ হ'তে সব দ্যাখ দেবগণ,
জ্বলদ-অক্ষরে রাখ গো লিখে।
স্পর্দ্ধিত যবন, তোরাও দ্যাখ্‌রে,
সতীত্ব-রতন, করিতে রক্ষণ,
রাজপুত সতী আজিকে কেমন,
সঁপিছে পরাণ অনল-শিখে॥"

সাধনা ও সিদ্ধি।

মনুষ্যলোকে যাহা কিছু সুখকর, যাহা কিছু বাঞ্ছনীয়, তাহাই সাধনাসাপেক্ষ। বিনা সাধনায় কিছুতেই সিদ্ধি হয় না। বিদ্যা, বৈভব, মান, প্রণয়, প্রভুত্ব, পরাক্রম, চারিত্র-বল, আত্মশোধন, স্বজাতির উন্নতি, স্বদেশের গৌরব বিস্তার, স্বাধীনতা অথবা স্বর্গসুখ, ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার সম্পদই সাধনার অধীন। সাধনায় বজ্রবিদ্যুৎ ভৃত্যের কার্য্য করে, পর্ব্বত স্বকীয় পাষাণবক্ষ বিদারণ করিয়া সাধকের গতায়তের জন্য পথ খুলিয়া দেয়, অন্ধকার আলোকের ন্যায় দৃষ্টির সহায় হয়, এবং যাহা কল্পনার চক্ষেও কেহ দেখিতে পায় না, তাহা স্বাভাবিক কার্য্যের ন্যায় সুসম্পন্ন হইয়া যায়। এই নিমিত্তই সাধনার নাম ব্রত, সাধনার নাম তপশ্চর্য্যা, এবং সাধনার নাম যোগ। যাঁহারা সাধনার পথে পথিক হইয়া যত্নসহকারে ব্রত পালন করেন,—তপস্বীর ন্যায় উহাতেই একবারে ডুবিয়া যান, তাঁহারা সিদ্ধ হন। যাঁহারা তাহা না করিয়া চিরকালই স্রোতের জলে ভাসিতে থাকেন, তাঁহারা চিরকালই ঐরূপ ভাসমান রহেন।

যিনি যে বিষয়ে সিদ্ধকাম হইতে চাহেন, তাঁহাকে তদুপযোগিনী সাধনা অবলম্বন করিতে হয়। যথা, যিনি সরস্বতীর সাধক, তাঁহার একরূপ সাধনা; যিনি জাতীয় স্বাধীনতারূপ মহামন্ত্রের সাধক তাঁহার আর একরূপ সাধনা। যিনি প্রভুত্বের সাধক, তাঁহার একরূপ সাধনা, যিনি প্রেমের সাধক, তাঁহার আর একরূপ সাধনা। গ্যালিলিও আর গ্যারিবল্ডী, শঙ্করাচার্য্য আর শিবজী, অথবা হাওয়ার্ড আর ক্রমওয়েল, এবং চৈতন্য ও প্রতাপাদিত্য, ইঁহারা সকলেই অতি শ্রেষ্ঠ কল্পের সাধক, অথচ ইঁহাদিগের সাধনা বিভিন্ন প্রকারের। ইহাঁদিগের কাহারও হস্তে বীণা, কাহারও হস্তে ভেরী। কেহ কেবলই কুসুম চয়ন করিয়াছেন, কেহ কেবল কণ্টক চয়ন করিয়া তদ্দ্বারাই পরিশেষে কুসুম-কোমল শয্যা রচনা করিয়াছেন। কেহ নিরবচ্ছিন্ন অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন, কেহ অশ্রুর মূল প্রস্রবণ পর্য্যন্ত শোষণ করিবার জন্য আপনার হৃৎপিণ্ডকেও ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু এই অনৈক্যেও একতা আছে, এই বিভিন্নতার মধ্যেও কতক গুলি নিয়ম বিষয়ে অভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা এই প্রবন্ধে সর্ব্ববিধ সাধনার বীজসূত্রস্বরূপ সেই সাধারণ নিয়ম গুলিই অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব।

সাধনার প্রথম অঙ্গ, উদ্দেশ্য নির্দ্ধারণ,—অথবা মন্ত্রপরিগ্রহ। কৃতী পুরুষেরা বহু-

চিন্তা, বহুপর্য্যবেক্ষণ এবং নিজ হৃদয়ে বহু আলোচনার পর কোন না কোন মন্ত্রে দীক্ষিত হন, এবং শয়নে, জাগরণে, নির্জ্জনে কি লোকারণ্যে সতত ঐ ইষ্টমন্ত্রই জপ করিতে রহেন। এই মন্ত্র গ্রহণেই মনের একাগ্রতা, এবং এই একাগ্রতাতেই উন্নতি। নাবিক যেমন গভীর অন্ধকারের মধ্যে নক্ষত্রবিশেষের প্রতি চক্ষুঃ স্থির রাখিয়া সমুদ্রের অনন্ত বিস্তার ভেদ করিয়া চলিয়া যায়, প্রকৃত সাধকেরাও সেইরূপ আপনার মূলমন্ত্রে মনঃসন্নিবেশপূর্ব্বক অনন্ত সংসার সমুদ্রের তরঙ্গরাজি ভেদ করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হন। সুতরাং তাঁহাদিগের দৃষ্টি অর্থযুক্ত, এবং তাঁহাদিগের হাস্য,উল্লাস, আমোদ, উৎসব, ভোগ,বিলাস, শ্রম ও বিরাম সমস্তই অর্থযুক্ত। তাঁহাদিগের প্রতিপদনিক্ষেপেই জীবনের এক একটি কার্য্য। তাঁহাদিগের গতি স্থির।

যখন ইটালীর চিরকীর্ত্তিস্বরূপ ক্ষণজন্মা রায়েঞ্জি, রোমের দুষ্কর্ম্মরত দুর্ব্বৃত্ত আভিজাতদিগের প্রমোদগৃহে উপবিষ্ট রহিয়া, সুরসিক বিদূষকের ন্যায় তাহাদিগকে প্রতিদিন নানাবিধ নূতন কথায় পরিতুষ্ট করিতেন,—কখনও হাসিতেন, কখনও হাসাইতেন, কখনও আপনাকে হাস্যাস্পদ করিয়া পরের মন যোগাইতেন, যদি কেহ তখন তাঁহার হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তদীয় ইষ্টমন্ত্র পাঠ করিতে পারিত, সে নিশ্চয়ই ভয়ে কণ্টকিত কিংবা ভক্তিতে স্তম্ভিত হইত। মূর্খেরা তাঁহাকে আমোদলহরীর ফেণা মাত্র মনে করিত, কিন্তু তিনি নিয়ত আপনার মন্ত্র সাধন করিতেন। যখন মন্ত্রিবর কলবার্ট, চতুর্দ্দশ লুইর স্বর্ণময় সিংহাসনের এক পার্শ্বে অতি নির্ব্বোধের মত দণ্ডায়মান থাকিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে রাজনিয়োগ পালন করিতেন, যদি পুরাতন রাজপুরুষগণ তাঁহার সেই লাবণ্যশূন্য, মাধুর্য্যবিহীন নিস্তেজ মূর্ত্তির বহিরাবরণ ভেদ করিয়া,তিনি কি নাম জপনা করিতেছেন তাহা তখন জানিতে পাইতেন,তবে তাঁহারা তদ্দণ্ডেই তাঁহাকে উন্মূলিত করিয়া ফেলিতেন। জন্মান্ধ পৌরবর্গ তাঁহাতে কেবল রূপেরই অভাব দেখিত; কিন্তু তিনি তখন গুণগত পরাক্রমের এক আশ্চর্য্য প্রাসাদ নির্ম্মাণেই অহোরাত্র যত্নপর রহিতেন। যখন বীরশ্রেষ্ঠ বোনাপার্টি, যোসিফিনের মৃণালনিন্দি বাহুলতা অবলম্বন করিয়া,পারিসের তদানীন্তন প্রভু প্রসিদ্ধনামা বেরাসের বিহারভবনে তালে তালে নৃত্য শিক্ষা করিতেন, যদি কেহ তখন তাঁহার অন্তরতম মন্ত্রের অস্ফুট গর্জ্জন শ্রবণ করিতে সমর্থ হইত, সে নিশ্চয়ই আতঙ্কে অধীর হইয়া দূরে সরিয়া পড়িত। লোকে ভাবিত তিনি নৃত্য শিখিতেছেন; কিন্তু যে তালে সমগ্র ইউরোপ এক সময়ে ভয়ানকরূপে নৃত্য করিয়াছিল, তিনি তখন সেই কদ্রতালই অভ্যাস করিতেন। পৃথিবীতে যাঁহারা কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলেরই এইরূপ এক একটি মন্ত্র ছিল। তাঁহারা ম-

মন্ত্রবলে পৃথিবীকে স্বর্গে তুলিয়া নিয়াছেন, অথবা স্বর্গের শোভা সম্পদ পৃথিবীতে আনিয়া ছড়াইয়া দিয়াছেন,—মৃতদেহে জীবনী দান করিয়াছেন, এবং পুতুল ও ক্রীড়াকন্দুক লইয়া পর্ব্বত ভাঙ্গিয়াছেন।

যাহারা কোন মন্ত্রেই দীক্ষিত নহে, তাহাদিগের সকলই ইহার বিপরীত। তাহাদিগের জীবন অর্থশূন্য, তাহাদিগের গতি বাতহিল্লোলে তৃণের মত। তাহারা কখনও উত্তরে যায়, কখনও দক্ষিণে গড়াইয়া পড়ে, কখনও পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হয়, কখনও প্রতিকূলবায়ুতে পশ্চিমে নীত হইতে থাকে। তাহাদিগের মন্ত্র নাই, মন্ত্রসাধনা নাই, সুতরাং কিছুই ' কার্য্য ' নাই। ক্ষুধার সময়ে তাহারা আহার করে, নিদ্রার সময়ে তাহারা শয়ান রহে ; কেহ জাগাইলে তাহারা একটুকু জাগে বা না জাগে,কেহ না জাগাইলে তাহারা ঐরূপই পড়িয়া থাকে। লালসা আর ইচ্ছা এক নহে। লালসা প্রবৃত্তির দাসী, প্রবৃত্তিরই অনুগামিনী ;—ইচ্ছা অধীশ্বরী, প্রভাবশালিনী। লালসা প্রবৃত্তির উদ্রেকে উদ্রিক্ত হয়, প্রবৃত্তির নিদ্রিতাবস্থায় নিদ্রিত রহে। ইচ্ছা আপনার ক্ষমতাতেই আপনি উদ্রিক্ত থাকিয়া সমস্ত প্রবৃত্তির উপর আধিপত্য করে। বস্তুতঃ ইচ্ছা একটী মহতী শক্তি। যাঁহারা মন্ত্রদীক্ষিত, তাঁহারা লালসাশূন্য, কিন্তু ইচ্ছান্বিত ; তাঁহাদিগের ইচ্ছা প্রগাঢ়, ঘনীভূত, কেন্দ্র-নিবদ্ধ। তাঁহাদিগের বুদ্ধি, হৃদয় ও সর্ব্ব প্রকার মানসিক বৃত্তি সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদিগের ইচ্ছাধীন। আর যাহারা উল্লিখিত প্রকার মন্ত্রহীন, তাহারা ইচ্ছাশূন্য, কিন্তু লালসান্বিত। তাহাদিগের সমুদয় মনোবৃত্তিই স্বতন্ত্ররূপে কার্য্য করে, কোনটিই কাহারও প্রভুত্ব মানে না। যদি তাহাদিগের মনে ইচ্ছার কিঞ্চিন্মাত্র স্ফূর্ত্তি জন্মে, সে ইচ্ছা গাঢ় হয় না, ঘনীভূত হয় না, এবং কোন একটি বিশেষ কেন্দ্রে নিবদ্ধ হইতে পারে না বলিয়াই কদাপি ফলে আসে না।

সাধনার দ্বিতীয় অঙ্গ রহস্যরক্ষা অথবা মন্ত্রগুপ্তি। মন্ত্রগুপ্তি মন্ত্রসিদ্ধির কিরূপ অনুকূল, তাহা সহজে বুঝান এক কঠিন ব্যাপার। কিন্তু যাঁহারা, কল্পনার বিনোদকাননে বিচরণ না করিয়া, মানবজীবনের বহুকণ্টকময় দুর্গম শৈলে পাদচারণা করিয়াছেন, যাঁহারা লোকপ্রকৃতির বহির্দ্দেশেই চিরদিন অজ্ঞের ন্যায় দণ্ডায়মান না থাকিয়া, চিন্তার সহায়তায় উহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পাইয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহারা ভূয়োভূয়ঃ এইরূপ উপদেশও দিয়াছেন যে, কোন মন্ত্রই মন্ত্রগুপ্তির দুর্ভেদ্য-বর্ম্মবিরহে দীর্ঘকাল সজীব থাকে না। যে মন্ত্র সাধকের হৃদয়মধ্যে কূপোদক-নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রবৎ লুক্কায়িত রহিল, তাহা মন্ত্র ; যাহা লোকের মুখে মুখে পরিভ্রমণ করিল,—এক কর্ণের পর আর এক কর্ণ এইরূপ করিয়া সহস্র কর্ণে যাতায়াত করিতে লাগিল, তাহা কথা। কথায় কার্য্য

হয় না, কার্য্য যাহা হয় তাহা মন্ত্রে। অতএব মন্ত্র যাহাতে কথায় কথায় পরিণত না হয়, এবিষয়ে যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

খৃষ্ট বলিয়াছেন, তোমার দক্ষিণ হস্ত যে কার্য্য করে, তোমার বাম হস্ত যেন তাহা জানিতে না পায়। অধুনাতন খৃষ্টীয় ইউরোপ দানাদি সম্বন্ধে এ বিধির অনুবর্ত্তী হইয়া না থাকিলেও মন্ত্রগোপন বিষয়ে ইহা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিয়াছে। বর্লিনের লৌহময়ী রাজনীতি শুদ্ধ মন্ত্রগুপ্তির মহিমাবলেই বাহুবলদৃপ্ত উদ্ধত ফরাশি জাতিকে পদতলে আনিয়াছে। রুশিয়া মন্ত্র-গোপন বিদ্যায় অসাধারণ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছে বলিয়াই সমস্ত প্রতিবেশীকে সতত শঙ্কান্বিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। রোমের বর্ত্তমান রাজবৈজয়ন্তী মন্ত্রগুপ্তির প্রসাদেই পুনরায় রোমীয় প্রাসাদসমূহে বহুদিনের পর শোভা পাইতেছে, এবং বৃটিশ মন্ত্রনাও এসিয়া এবং আফ্রিকায় বিশ্বাস-বিমুগ্ধ রাজ্যনিচয়ে এই হেতুতেই সমধিক প্রভাবের সহিত কার্য্য করিয়া আসিতেছে।

এইরূপ প্রবাদ আছে যে, পণ্ডিতবর পিথাগোরাস তদীয় শিষ্যবর্গকে পাঁচ বৎসর কাল মৌনী রহিতে বাধ্য করিতেন, এবং যে এই পাঁচবৎসরের মৌনব্রত সাধুতার সহিত উদ্‌যাপন করিতে সক্ষম হইত, তাহাকে পরিগৃহীত শিষ্যজ্ঞানে শিক্ষা দিতেন, যে তাহাতে অক্ষম হইত, তাহার নিকট হইতে একবারে বিদায় লইতেন। স্থূলদর্শী ব্যক্তিরা পিথাগোরাসের এই কঠিন নিয়মে যত কেন উপহাস করুন না, ইহার প্রকৃত অর্থ অতীব গভীর। মৌনে মনোনিধান, মৌনে গাম্ভীর্য্য এবং মৌনব্রতেই চিত্তসংযমের প্রথম সোপান। কোন কোন ক্ষীণপ্রাণ মনুষ্য যে বিনা প্রয়োজনেও মর্ম্মনিহিত গূঢ় সংকল্প অথবা সম্প্রদায় বিশেষের গূঢ় মন্ত্র প্রকাশ করিয়া ফেলে, ইহার কারণ কি ?—না সে তরল, সে লঘু, সে ভারবহনে অসমর্থ, সে লৌকিক যশের জন্য লালায়িত। সে অগাধ-জলসঞ্চারী অবিকারী রোহিতের স্থৈর্য্য ও অটলতায় কি মাহাত্ম্য আছে তাহা বুঝিতে পারে না। তাহার হৃদয় শফরীর মত, উহা গণ্ডূষজলেই নৃত্য করিয়া সুখানুভব করে। কার্য্যের সুসমাপ্তি দূরে থাকুক, কার্য্য আরম্ভ না করিয়াই সে তাহার পরিণামভোগ্য প্রশংসাবাদের জন্য অস্থির হইয়া উঠে। অবলা যেমন অবলার কণ্ঠে ভর করিয়া অকারণেও মনের সুখদুঃখঘটিত কথা লইয়া আমোদ করে, সেও রাজ্যের উত্থান ও পতন এবং সমাজের সৃষ্টি-বিপ্লব-ঘটিত ভয়ঙ্কর কথা লইয়া আমোদ করিতে সেইরূপ ভালবাসে। পরের চক্ষেই সে সর্ব্বদা দেখিতে চাহে, পরকীয় দৃষ্টিতেই সে বিলম্বিত রহে। সুবিখ্যাত রিশিলু এই শ্রেণির পুরুষদিগকে পুরুষদেহে স্ত্রীলোক বলিতেন। আমরাও ইহাদিগকে স্ত্রীলোক ব-

লিয়াই কৃপার নয়নে দেখিয়া থাকি। ইহাদিগকে যত ইচ্ছা শ্রদ্ধা কর, প্রীতি কর, কাহারও তাহাতে আপত্তি নাই; প্রমোদপ্রসঙ্গে ইহাদিগের সাহচর্য্য গ্রহণ কর, তাহাতেও কাহারও ক্ষোভ দুঃখ নাই। কিন্তু মন্ত্রভবনে ইহাদিগকে কখনও আহ্বান করিও না। কারণ, ইহারা মন্ত্ররক্ষায় অসমর্থ; ইহারা স্বভাবতঃ অসিদ্ধ।

সাধনার তৃতীয় অঙ্গ উৎসাহ অথবা মন্ত্রমদ; চতুর্থ অঙ্গ উদ্যম অথবা মন্ত্রপ্রয়োগ; পঞ্চম অঙ্গ আত্মোৎসর্গ অথবা মন্ত্রার্থে আহুতি; ষষ্ঠ অঙ্গ অধ্যবসায় অথবা মন্ত্র-শক্তিতে নির্ভর এবং শেষ ও সপ্তমাঙ্গ অপরাজিত সহিষ্ণুতা অথবা মন্ত্রপূতচক্ষে কালপ্রতীক্ষা। এই পাঁচটি সাধনার প্রাণ। ইহাদিগের সংমিশ্রণে মনে কি যে এক অপূর্ব্ব অবস্থা জন্মে, ভাষা আপনিই তাহা যথোচিত রূপে ব্যক্ত করিতে পারে না।

কে বলে যে মনুষ্য দুর্ব্বল?—কে বলে যে, রোগে মনুষ্যের শক্তি হ্রাস হয়, শোক তাহাকে দাহন করে, বয়োবৃদ্ধিসহকারে জরা আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলে, এবং দুঃখ, দারিদ্র্য ও নানাবিধ দুর্ঘটনায় তাহার আত্মা অবসন্ন হইয়া পড়ে? যাহার হৃদয়ে উৎসাহের উদ্দীপনা নাই, এবং সুতরাং আত্মায় স্ফূর্ত্তি ও অন্তরে চৈতন্য নাই, তাহার পক্ষে এসকলই সম্ভব বটে। সে বিনা রোগেও রুগ্ন, বিনা বার্দ্ধক্যেও জরাজীর্ণ, এবং শোক দুঃখের কশাঘাত বিনাও চিরম্লান, চিরবিষণ্ণ, চিরকালের জন্য অকর্ম্মণ্য। কিন্তু যাঁহারা মন্ত্রমদে প্রমত্ত, তাঁহাদিগের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা কখনও বৃদ্ধ হন না, কখনও ভাঙ্গিয়া পড়েন না, এবং জীবনের অন্তিমক্ষণেও তাঁহারা উৎসাহশূন্য ও উদ্যমহীন হইয়া মনুষ্যজীবনের অসারতা প্রতিপাদন করেন না। তাঁহাদিগের হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এক অনির্ব্বচনীয় তেজঃপ্রবাহ প্রবাহিত হয়; উহা তাঁহাদিগের প্রত্যেক ধমনীতে তাড়িত বেগ প্রদান করে, এবং শরীর যখন ছাড়িয়া দেয়, হস্তপদ শিথিল হইয়া পড়ে, তখনও উহা তাঁহাদিগকে কেমন এক আশ্চর্য্য প্রভাবে যুবার মত সজীব রাখে।

মহাত্মা ওয়াসিংটন অতি বৃদ্ধ বয়সেও যখন স্বজাতির ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতেন, তখন তাঁহার নিস্তেজ নেত্র প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত, তাঁহার নিস্পন্দদেহ শক্তির পুনঃসঞ্চারে পুলকিত হইত। তাঁহার উৎসাহ ও উদ্যম নিদ্রাবস্থায়ও তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। ডেনিয়েল ওকোনেল যখন জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান, আয়র্লণ্ডের মঙ্গল কামনা তখনও তাঁহার হৃদয়ে তরঙ্গ তুলিত, এবং তাঁহার পবিত্র রসনা হইতে তখনও যে দুই একটি বাক্য বহ্নিকণার ন্যায় স্খলিত হইত, সহস্র সহস্র হৃদয়ে তাহা এক ভয়ানক দাবানল জ্বালিয়া দিত। নিরুৎসাহ ও অবসাদ কাহাকে বলে হাম্বোল্ড তাহা কখনও জানিয়া যান নাই। যে বয়সে অন্যেরা বৈরাগ্যের ভজনা করে, বিষয়ে বীতরাগ হইয়া নিরবচ্ছিন্ন দীর্ঘনিঃ-

শ্বাসেই সময়াতিপাত করিতে ভালবাসে, অথবা অতীতস্মৃতির আশ্রয় লইয়া পুরাতন কথার রোমন্থন করিতেই যত্নপর রহে, তিনি তখনও যৌবনের নূতন মত্ততায় জ্ঞান সাধন করিতেন, এবং মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্তে নূতন কিছু লাভ করিবার জন্য যার পর নাই আকুল রহিতেন। লর্ড পামার্ষ্টন যখন চক্ষু মেলিয়া চাহিতেও কষ্ট অনুভব করিতেন, রুসিয়ায় তখনও অনেকে অনিদ্র ও উৎকর্ণ রহিয়া তাঁহার মন্ত্রনার মর্ম্মার্থভেদ করিতে চেষ্টা করিত। চিরজীবী টিয়ার ভূষণ্ডী কাকের মত ফরাশি রাষ্ট্রবিপ্লবের ভূকম্প দেখিয়াছেন, প্রথম নেপোলিয়নের বিজয়-দুন্দুভিনাদে নৃত্য করিয়াছেন, তৃতীয় নেপোলিয়ানকে পিতৃব্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় দেখিয়া করতালি দিয়াছেন, আবার সেদিন সিডানের বিপৎপাতের পর হইতে পারিসের রুধিরাক্ত দেহে ঔষধি লেপন করিয়া আপনি যে অদ্যাপি ইহলোকেই রহিয়াছেন এবং অদ্যাপি স্বদেশেরই সেবা করিতেছেন, সংসারকে তাহা কার্য্যতঃ জানাইয়াছেন। লোকে এইরূপ বলিয়া থাকে যে বৃটিশ রাজতরণীর বর্ত্তমান কর্ণধার বার্দ্ধক্যে অত্যন্ত জড়িত হইয়াছেন। কিন্তু আজও বৃটিশ প্রাণ তাঁহার উৎসাহে উৎসাহিত হইতেছে; বৃটেনিয়ার মন্দীভূত প্রতাপ-স্রোত তাঁহারই অভিঘাতে বেগে বহিতেছে। সাধকের উৎসাহ ও উদ্যম সর্ব্বত্র ও সকল সময়েই এইরূপ। উহা দ্রবীভূত বহ্নি। যে উহা নিভাইতে কিংবা উহার গতিরোধ করিতে যায়, সে আপনিই উহাতে পুড়িয়া মরে।

সাধক সম্প্রদায়ের আত্মোৎসর্গ ইহা অপেক্ষাও অধিকতর বিস্ময়জনক। তাঁহাদিগের এই আত্মোৎসর্গই যথার্থ আরাধনা। ভক্ত যেমন আপনাকে আরাধ্য দেবতার পদারবিন্দে পুষ্পাঞ্জলি স্বরূপ সমর্পণ করিয়া উহাতেই বিলীন হইতে কামনা করেন, তাঁহারাও সেইরূপ তনু, মন, প্রাণ সর্ব্বস্বই তাঁহাদিগের আরাধ্য মন্ত্রে আহূতি স্বরূপ উৎসর্গ করিয়া নিজ নিজ পৃথগস্তিত্বও উহাতেই নিমজ্জিত করিয়া দেন। তখন তাঁহারা তদ্গত, তন্ময় হন। সুখ তখন তাঁহাদিগকে সুখী করে না, প্রশংসার মৃদুমোহন মধুর ধ্বনি তখন তাঁহাদিগের চিত্তকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না, মন স্নেহ মমতার মায়াময় বন্ধনীতে বদ্ধ হইয়া চায় না, এবং কিছুই তাঁহাদিগকে তখন দক্ষিণে কি বামে হেলাইতে পারে না। তখন তাঁহারা অত্যন্ত জীবিত এবং এই হেতুতেই অত্যন্ত মৃত, অথবা অত্যন্ত মৃত এবং এই হেতুতেই অত্যন্ত জীবিত রহেন। বাল্মীকির অস্থি পঞ্জর হইতে রাম নামের ন্যায় তাঁহাদিগের মর্ম্মাস্থি হইতেও তখন কেবল একই নাম নির্গত হয়, এবং তাঁহাদিগের পরিগৃহীত মন্ত্র যত কেন দুঃসাধ্য হউক না, আত্মোৎসর্গের অভাবনীয় বলেই তখন তাহা সুসাধ্য হইয়া উঠে।

কাব্য ও পুরাণে যাঁহাদিগের বর্ণনা দৃষ্ট হয়, সেই সমস্ত প্রাচীন সাধকগণ শী-

তের সময় হিমরাশিতে পরিবেষ্টিত রহিতেন, অতি ঘোরতর গ্রীষ্মের সময়ে চারিদিগে অগ্নি জ্বালিয়া তাহার মধ্যে উপবিষ্ট থাকিতেন। কেহ আপনার চক্ষু দুটিকেও সাধনার পরিপন্থী বিবেচনায় উৎপাটন করিয়া ফেলিয়া দিতেন, কেহ অন্য প্রকারে মনোনিবেশে সমর্থ না হইলে জিহ্বা কিংবা হস্ত পদ প্রভৃতি অপরিহার্য্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গও অকাতরমনে পরিবর্জ্জন করিতেন। এসকল কার্য্য সঙ্গত কি অসঙ্গত, তাহার বিচার করা এইক্ষণ অনাবশ্যক। সাধারণতঃ বলিতে গেলে প্রকৃতির বিরোধী না হওয়াই শ্রেয়ঃ। কিন্তু যাঁহারা সাধনায় রত হইতে চান, ত্যাগ এবং আত্মনিগ্রহই তাঁহাদিগের প্রধান সহায়। যাহারা ত্যাগে ভীত, যাহারা আত্মনিগ্রহে কুণ্ঠিত, তাহাদিগের মত লোকের দ্বারা সত্য যুগেও কোন কার্য্য হয় নাই, কলিযুগেও কোন কার্য্য হইবে না।

তুমি জ্ঞানী,—তুমি সরস্বতীর সাধক। তোমার আবার সুখের লালসা কেন? যদি তুমি জ্ঞানের নির্ম্মল আনন্দ অপেক্ষা সাংসারিক খ্যাতি প্রতিপত্তিকেই অধিক মনে করিলে—তোমার আরাধ্য শক্তির প্রসন্ন দৃষ্টি অপেক্ষা ভোগ বিলাসের আবিল আনন্দের জন্যই অধিকতর অধীর রহিলে, তবে তোমার আবার সাধনা কি? তুমি প্রেমিক, তুমি অপার্থিব বৈভবের জন্য লালায়িত। এই বণিগ্বৃত্তিসম্পন্ন কলুষিত মনুষ্যলোকে যাহা স্বপ্নে বই কেহ দেখে না, কবি বই যাহা কেহ জানে না, কবিমুখে বিনা যাহার কথা শুনা যায় না, তুমি সেই জ্ঞানের অগম্য অজ্ঞেয় ধনের জন্য চিরতৃষিত। তোমার আবার ধন, মান, ক্ষতিলাভ গণনা কেন? আর তুমি স্বদেশবৎসল! স্বজাতির বন্ধু! তুমি যে প্রত্যেক কার্য্যেরই পরিণাম চিন্তার পূর্ব্বে আত্মপরিণাম চিন্তা করিতেছ, দেশ-হিত-ব্রতে ব্রতী হইতে গিয়া প্রতিক্ষণেই আত্মহিত ব্রতে অগ্রসর হইতেছ, দেশীয়দিগের মধ্যে স্বাধীনতার পবিত্র নাম লইয়া ধীরে ধীরে পরাধীনতার বিষাক্ত বীজ ছড়াইয়া দিতেছ, সকলকে স্বর্গের শোভা দেখাইবে বলিয়া নরকে আনিয়া ডুবাইতেছ,—প্রভুস্বরূপ পূজা করিবে বলিয়া পদতলে আনিয়া বান্ধিতেছ, তোমারও এ প্রতারণা, এ বিড়ম্বনা কিসের জন্য? তুমি অগ্নিকুণ্ডে আপনাকে ভস্ম কর আর না কর, সে এক পৃথক্ কথা। কিন্তু যদি তুমি জ্ঞান চাও, কি প্রেম চাও, কি স্বজাতির অভ্যুদয় চাও, তবে আগে আপনাকে বলি দান কর,—আপনার বলিতে যাহা কিছু আছে, তাহা দূরে ফেলিয়া দাও, সাধকের ন্যায় আপনি ক্রুশকাষ্ঠে বিলম্বিত হও, তাহার পর সিদ্ধির কল্পলতা হইতে আপনার আকাঙ্ক্ষিত ফল বাছিয়া লও। জনক রাজা যোগী হইতে পারেন নাই; তিনি তাঁহার কমণ্ডলুটি বড় ভাল বাসিতেন। সলোমন জ্ঞানী হইতে পারেন নাই; তিনি জ্ঞান অপেক্ষা সুখ

সম্ভোগের অধিক আদর করিতেন। এবিলার্ড প্রেমিক হইতে পারেন নাই; তিনি প্রেম অপেক্ষা আপনাকে অধিক জানিতেন। রবিস্পীয়র স্বজাতির সুহৃৎ হইতে পারেন নাই, তিনি দেশের স্বাধীনতা ও গৌরব অপেক্ষা আপনার স্বাধীনতা ও গৌরবের জন্য অধিকতর ব্যগ্র রহিতেন। ইহাঁরা কেহই আত্মোৎসর্গ করেন নাই।

অধ্যবসায় উল্লিখিত সর্ব্বপ্রকার সাধকধর্ম্মের ভিত্তি স্বরূপ। উহা স্বাস্থ্যে অমৃত, উহা রোগে ঔষধ, এবং উহাই মুমূর্ষুর অবলম্ব-যষ্টি। যদি এ সংসারকে সমুদ্র বল, অধ্যবসায়ই তাহার একমাত্র ভেলা; যদি সাধনাকে জ্বলন্ত বহ্নি বল, অধ্যবসায়ই তাহার একমাত্র উদ্দীপনা। সাধকের হৃদয়নিহিত যে ভাব যখন হীন-শক্তি হইয়া পড়ে, অধ্যবসায়ই সেইটিকে তখন আশ্রয়দানে দৃঢ় করিয়া রাখে, এবং যে তেজ নির্ব্বাণপ্রায় হয়, অধ্যবসায়ই তাহাকে পুনরায় প্রদীপ্ত করিয়া তুলে। অধ্যবসায় ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা; সৃষ্টিও যদি বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়, তথাপি উহা টলে না; উহা সাহসের সার, ভয়ের কোন রূপ কারণই উহাকে বিচলিত করিতে পারে না।

অভীষ্ট সংকল্প প্রথম উদ্যমেই সংসিদ্ধ হইবে এমন আশা করা কাহারও উচিত হয় না, এবং প্রথম পদস্খলনে কি প্রথম বিঘ্নদর্শনেই যাহার উদ্যম-ভঙ্গ, আশা-ভঙ্গ ও ব্রত-ভঙ্গ হয়, তাহার দ্বারাও কখন কোন রূপ কঠোর সাধনা হইয়া উঠে না। অতএব অধ্যবসায়ের আবশ্যকতা। সামর্থ্য আর কি? অধ্যবসায়ই প্রকৃত সামর্থ্য। ঐ যে দুর্ব্বল শিশু, অদূরবর্ত্তিনী স্নেহময়ী জননীর আশ্বাস-প্রদ মধুর হাস্যে উৎসাহিত হইয়া, অল্পে অল্পে দণ্ডায়মান হইবার ক্রম শিখিতেছে, উহার ঐ দুর্ব্বল দেহলতিকা কতবার ঢুলিয়া পড়িবে, কতবার ক্ষত বিক্ষত হইবে, কে তাহা এইক্ষণ বলিতে পারে? কিন্তু হয়ত ঐ শিশুটিরই পদভরে পর্ব্বতও এক সময়ে বিকম্পিত হইবে। একখানি প্রস্তরের ক্ষুদ্রতম এক অংশও উহার নিকট এইক্ষণ হিমাদ্রিসদৃশ; কিন্তু অধ্যবসায় থাকিলে হয়ত উহারই পদ্মের ন্যায় কোমল হস্ত পিরামিড গাড়িয়া তুলিবে। বস্তুতঃ, অধ্যবসায়ের তুলনা নাই। অধ্যবসায় বিঘ্ন বিপত্তির সহিত ক্রীড়া করে, সাগর শোষণ করিয়া ফেলে, এবং সহস্র বিভীষিকা, বজ্রপাত ও ঝঞ্ঝাবায়ুর মধ্যেও তরুলতাশূন্য তুষারমণ্ডিত অচলের ন্যায় নির্ভীক ও নিষ্কম্প রহিয়া আপনার মন্ত্র আপনি সাধন করিতে থাকে।

সহিষ্ণুতা অন্য এক পদার্থ। উহা অধ্যবসায়ের সদৃশ, অথচ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অধ্যবসায় হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। সাধারণতঃ সহিষ্ণুতার অর্থ ক্ষমা, সহিষ্ণুতার অর্থ মৃদুশীলতা। কেহ তোমায় তিরস্কার করিল, তুমি প্রত্যুত্তরে তাহাকে তিরস্কার করিলে না; কেহ তোমার মস্তকে পদাঘাত করিল, তুমি তাহার পদনখও স্পর্শ করিলে না। লোকে ইহাকেই সহিষ্ণুতা

বলিবে। কিন্তু সহিষ্ণুতার প্রকৃত নাম কাল-প্রতীক্ষা। যে কার্য্যে যশ নাই, মান নাই, আশু সুখের প্রলোভন নাই, এবং সম্মুখেও আশার উত্তেজনা নাই,—যে কার্য্যে এইক্ষণ কোনরূপ সহায় নাই, এবং শত বৎসরেও যাহাতে সাফল্যের সম্ভাবনা নাই, যিনি তাহাতেও হৃদয় মন সঁপিয়া লিপ্ত রহিতে পারেন, তিনিই যথার্থ সহিষ্ণু, এবং যিনি এই প্রকার সহিষ্ণুতাকে আপনার প্রাণের মধ্যে পোষণ করিয়া ভবিষ্যতের নিবিড় অন্ধকার ভেদ পূর্ব্বক কালের দিকে চাহিয়া থাকিতে পারেন, তিনিই যথার্থ সাধক, তিনিই যথার্থ পুরুষ।

প্রকৃতির সহিষ্ণুতা দেখ। আজি যে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ সহস্র বিহঙ্গকে আশ্রয় দান করিয়াছে, সহস্র তাপিতদেহ শীতল করিতেছে, এক সময়ে তাহা ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র একটি বীজ মাত্র ছিল; প্রকৃতি ধীরে ধীরে উহাকে এইরূপ পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন। আজি যে দৃঢ় ভূমি অসংখ্য জীব জন্তুর আবাস-স্থান এবং গ্রামনগরে শোভিত হইয়াছে, এক সময়ে তাহা একটি বালুকণা মাত্র ছিল; প্রকৃতি বালুকণার সহিত বালুকণা বান্ধিয়া তাহাতেই ধীরে ধীরে এই আশ্চর্য্য ভিত্তি গড়িয়াছেন। আজি যে প্রশস্তহৃদয়া স্রোতস্বিনী লক্ষ লক্ষ প্রাণীর উপজীব্য এবং সমগ্র একটি দেশের সুখ ও সৌভাগ্যের ভার বক্ষে ধারণ করিয়া গর্ব্বভরে বহিয়া যাইতেছে, এক সময়ে তাহা অতি সূক্ষ্ম একটি রজতরেখা মাত্র ছিল; প্রকৃতি সেই রজতরেখাটিকেই ধীরে ধীরে কি না করিয়া তুলিয়াছেন! আবার, যুগান্তের পরে যে বিপ্লব ঘটিবে, যে বিপ্লবে কত কি উচ্ছিন্ন যাইবে, কত কি উন্মূলিত হইবে,—যে বিপ্লব কোথাও প্রলয়পয়োধির তিমিরাবৃত তরঙ্গমালার ন্যায় ভয়ঙ্কর রাবে গর্জ্জন করিবে, কোথাও কালের সর্ব্বসংহারিণী মূর্ত্তিতে জগতের সুন্দর ও কুৎসিত, স্থায়ী ও অস্থায়ী, দ্রব ও ঘন সমস্ত বস্তু লইয়া ক্রীড়া করিতে রহিবে,—যাহার শ্বাস প্রশ্বাসে অনন্ত অশনিপাত, যাহার আবর্ত্তে আবর্ত্তে অনন্ত জ্যোতিরাবর্ত্ত স্ফুটিত ও আলোকিত হইতে থাকিবে, প্রকৃতি এখনই তিল তিল করিয়া তাহার শক্তি সঞ্চয় করিতেছেন,—নীরবে, নিস্তব্ধ ভাবে, তাহার কারণ পরম্পরার শৃঙ্খল গাঁথিছেন,—কেহ দেখে না, দেখিয়াও কেহ বুঝে না এমন রূপে তাহার উপকরণ সংগ্রহে রত রহিয়াছেন। ইহাই সহিষ্ণুতা। যদি অনন্ত শক্তিও সাধনা ব্রতে এইরূপ সহিষ্ণু হইতে পারে, মনুষ্য কি তবে অসহিষ্ণু হইবে?

হায়! যে দেশে বাবদূকতাই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, আর সাধনা ক্রমশঃই বিলুপ্ত হইতেছে, সে দেশে কাহার আর কিসে সিদ্ধি হইবে? যে দেশে প্রত্যেকেই শতমন্ত্রে দীক্ষিত এবং মন্ত্র রক্ষায় সকলেই অশিক্ষিত, যাহাদিগের মধ্যে পরস্পর-বিদ্বেষ ও

আস্ফালনের নাম উৎসাহ, চীৎকারের নাম উদ্যম, অঞ্চলবায়ু-সেবনের নাম আত্মোৎসর্গ এবং অবিচলিত নিদ্রার নাম অধ্যবসায়, তাহাদিগের আর ভরসা কোথায় ? যাহারা প্রাতঃসূর্য্যের অভ্যুদয়ে যে কার্য্যের কল্পনা করে, সন্ধ্যা হইতে না হইতেই তাহার ফলভোগের জন্য ব্যস্ত হয়,—এক রাত্রিতেই রোম নির্ম্মাণ করিতে চাহে, শ্মশ্রূদ্গমের পূর্ব্বেই জীবনের সকল ব্যাপার সম্পাদন করিয়া কীর্ত্তিশৈলে আরূঢ় হইয়া বসে, তাহাদিগের আর আশা কি ? তবে জানি না, কবে সাধকের পুনরুদয় হইবে,—কবে আবার সাধনা পুনঃপ্রবর্ত্তিত হইয়া অন্ধকারকে আলোক করিবে।

বিরজা

ষষ্ঠ অধ্যায়।

রাত্রি প্রভাত হইল। সকলের অগ্রে ভবতারিণী খিড়কির ঘাটে গিয়াছেন। বায়ুর হিল্লোলে নবীনমণির মৃতদেহ ঘাটের দক্ষিণ পার্শ্বে আনিয়াছে। ভবতারিণী প্রথমেই মরা মানুষ জলে ভাসিতে দেখিয়া শীহরিয়া উঠিলেন। তিনি ভয় পাইলেন, কিন্তু তাঁহার পাদসঞ্চার হইল না; স্তম্ভিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। ইচ্ছা, পশ্চাৎ সরিয়া বাটীতে যান, কিন্তু পদযুগল তাঁহার ইচ্ছার অনুগত হইল না; তিনি দণ্ডবৎ স্থির রহিলেন। যতক্ষণ সেই মৃতদেহের প্রতি তাঁহার চক্ষু রহিল, ততক্ষণ একপদও পশ্চাৎ সরিতে পারিলেন না। এক্ষণে চক্ষু অন্যদিকে পতিত হইল, অমনি তিনি পশ্চাৎ সরিতে আরম্ভ করিলেন। খিড়কির দ্বার পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে গেলেন; দ্বার অতিক্রম করিবামাত্র ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া একবারে আপন কক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন। গোবিন্দ পত্নীর এতাদৃশভাবে গৃহপ্রবেশ দেখিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া জিজ্ঞাসিলেন 'বৃত্তান্তটা কি ? এমন করিয়া দৌড়িয়া আসিলে যে ?' ভবতারিণী ঘননিশ্বাসত্যাগজনিত অস্পষ্টস্বরে কহিলেন, 'ঘাটে মড়া ভাস্‌ছে।'

'ঘাটে মড়া ভাস্‌ছে ?'

'হাঁ, দেখ সে !'

'তুমি আর কিছু দেখেছ ?'

'না; মড়া ভাস্‌ছে। চল দেখ্‌বে এখন।'

গোবিন্দচন্দ্র দেখিতে চলিলেন। ভবতারিণী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। যাইবার সময়ে ভব নবীনের শয়নকক্ষের জানালায় আঘাত করিয়া নবীনকে ডাকিলেন। উত্তর না পাওয়াতে কহিলেন, 'আবাগি, ওঠ্ ওঠ্ দেখ্‌সে ঘাটে মড়া ভাস্‌ছে।' এই বলিয়া দ্রুতপদে স্বামির অনুগমন করিলেন। তাঁহার যাইবার পুর্ব্বে গোবিন্দ ঘাটে

পুঁছিয়া গালে হাতদিয়া ভাবিতেছিলেন। ভবকে তাঁহার গালে হাত দিয়া ভাবিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে হইল না; তিনি এখন চিনিতে পারিলেন যে, নবীনের দেহ জলে ভাসিতেছে। ভব উচ্চরবে কাঁদিতে উদ্যত হইলে গোবিন্দ তাঁহার মুখে হাত দিয়া তাঁহাকে কাঁদিতে নিষেধ করিলেন। ভব কাঁদিলেন না।

কিয়ৎক্ষণ পরে বাড়ীর সকলেই জানিল যে, নবীন জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। আরো দেখা গেল যে, বিরজা নাই; তাহার টিনবাক্স খুলিয়া দেখা গেল, তাহার গহনার কৌটাও নাই। তখন স্পষ্ট জানা গেল যে, বিরজা পলায়ন করিয়াছে; বিরজা যখন পলাইয়াছে, তখন তাহা হইতেই নবীনের প্রাণনষ্ট হইয়াছে। গঙ্গাধর সে রাত্রে বাহিরে শুইয়াছিল; সে বলিল, আমি নবীনকে ও বিরজাকে রাত্রে থালা হাতে করিয়া ঘাটে যাইতে দেখিয়াছিলাম। তখন সকলেরই বিশ্বাস হইল যে, বিরজাই নবীনকে মারিয়া ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছে। গঙ্গাধর আপনি থানায় সংবাদ দিতে গেল। পাড়ার সকল লোকে জানিল। নবীনের দেহ পুষ্করিণীতে ভাসিতে লাগিল; চৌকিদার তীরে বসিয়া চৌকি দিতে লাগিল।

গৃহিণী শোক করিতে বসিলেন। তিনি ভাবিলেন, আমি কেন এ পাপ ঘরে আনিয়াছিলাম। এ হইতে আমার সর্ব্বনাশ হইল; কুলে কলঙ্ক হইল! আমার বাটীতে যাহা কখনও হয় নাই, তাহা হইল। ভবতারিণীও অনেকক্ষণ রোদন করিলেন। তাঁহার অনেকক্ষণ রোদন করিবার কারণ এই যে, তিনি নবীন ও বিরজা, উভয়কেই অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তাঁহার বিশ্বাস হইল না যে, বিরজা নবীনকে বধ করিয়াছে। তিনি গঙ্গাধরের চরিত্র বিলক্ষণ জানিতেন; আরও জানিতেন যে, গঙ্গাধরের বিরজার প্রতি আসক্তি জন্মিয়াছে; তজ্জন্য দুই একবার বিরজাকে সাবধানও করিয়া বলিয়াছিলেন, 'বিরজে! সাবধান, ভ্রমর পিছনে লাগিয়াছে।' তাহাতে বিরজা বলিয়াছিল, 'ভয় নাই, দিদী!' বিরজা বয়সে ছেলে মানুষ বটে, কিন্তু ধর্ম্মভয় আছে। তাঁহার অনেক কথা মনে পড়িল। কোন্ দিন গঙ্গাধর বিরজার প্রতি কি প্রকার সানুরাগ দৃষ্টিপাত করিয়াছিল, তাহাতে বিরজা কেমন করিয়া ঘোম্‌টা টানিয়া সরিয়া পড়িয়াছিল, তাহা মনে পড়িল। গঙ্গাধর নবীনের প্রতি সচরাচর কি প্রকার বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়াছিল; নবীন গঙ্গাধরের অসদ্ব্যবহারে কি প্রকার খেদ করিত, তাহাও মনে পড়িল। তিনি গৃহকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কাঁদিতে, ভাবিতে—আবার ভাবিতে ও কাঁদিতে লাগিলেন। বাড়ী নিতান্ত শূন্য ও শোকপরিপূর্ণ বোধ হইতে লাগিল। সকলেরই মুখে বিষাদের চিহ্ন, সকলেই শোকাকুল। গোবিন্দচন্দ্র শোকে ও লজ্জায় অধোমুখে বাহির

বাড়ীতে বসিয়া হুঁকা টানিতে লাগিলেন। কলিকায় আগুন নাই, টানে ধূমা বাহির হয় না; তথাচ তিনি হুঁকা টানিতে ও দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। গ্রামস্থ প্রাচীনদের মধ্যে কেহ কেহ কাছে বসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের বাক্যব্যয় মাত্র সার হইল। কেন না তাঁহাদের সান্ত্বনাসূচক বাক্যসকল গোবিন্দচন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল কি না, সন্দেহ। কাহারও কথায় শোক নিবৃত্তি হয় না। সময়ই একা শোক নিবারণ করিতে পারে। শোক যত বড়ই হউক না কেন, সময়ে শমতা প্রাপ্ত হয়।

বৈকালে হরিপুরের থানার নাএব-দারোগা লোক জন সঙ্গে করিয়া তদারক করিতে আসিলেন। তিনি তদারক করিয়া রিপোর্ট করিলেন যে, বিরজা হইতেই এ কর্ম্ম হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরও সেই প্রতীতি হইল। তিনি বিরজার আকৃতি বর্ণনা করিয়া ইস্তিহার জারি করিলেন; আরও প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যে কেহ বিরজাকে ধরাইয়া দিতে পারিবে, সে পাঁচ শত টাকা পুরস্কার পাইবে। থানায় থানায় এই কথা প্রচার করিয়া দেওয়া হইল।

এই ঘটনায় গঙ্গাধরের চরিত্র একবারে পরিবর্ত্তিত হইল। সে এখন আর গ্রামের গাঁজা ও গুলিখোরদের সঙ্গে মিশে না। ব্যবসায়ী অলসদের সঙ্গে দিবারাত্র তাস পিটিয়া ও বড়ে টিপিয়া সময় নষ্ট করে না। কিন্তু বাড়ীরও কোন কর্ম্ম করে না। বাহির বাটীতে বসিয়া মনে মনে কি ভাবে আর কেবল তামাকের সর্ব্বনাশ করে। স্নান করিতে গেলে গামছা কাঁধে করিয়া ঘাটে বসিয়া ভাবে, আহারে বসিলে ভাবে, শয্যায় শুইয়া ভাবে। সদাই তাহার বিষণ্ন বদন। ইহা দেখিয়া বাটীর সকলে মনে করিল যে, গঙ্গাধর যদিও নবীনকে মুখে ভালবাসা দেখাইত না, তথাপি মনে মনে ভাল বাসিত। এখন তাহার শোকে গঙ্গাধরের এ দশা হইয়াছে। গৃহিণী গঙ্গাধরকে আপনার কুঠরীর এক অংশে শয্যা করিয়া দিলেন। গঙ্গাধর সেই খানে শুইত। রাত্রে সে এক একবার চমকিয়া উঠিত।

ক্রমে বৎসরেক অতীত হইল। বাড়ীতে যে কাণ্ড হইয়াছিল, সকলে তাহা এক প্রকার বিস্মৃত হইলেন। গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গাধরের আবার বিবাহ দেওয়া স্থির করিলেন। সহস্র দুশ্চরিত্র হইলেও এদেশে—এদেশে কেন? এসংসারে—পুরুষের বিবাহের কোন অসুবিধা নাই। অধিকাংশ স্থলে—লোকে পুরুষের রূপ দেখে না, গুণ দেখে না, চরিত্র দেখে না; কেবল দেখে কুল ও ধন। গঙ্গাধরের তাহা ছিল; কুল ছিল, ধন অধিক ছিল না বটে, কিন্তু যাহা ছিল, তাহা যথেষ্ট। অনেক স্থলে বিবাহের কথা হইল। গোবিন্দচন্দ্র স্বয়ং দুই এক স্থলে কন্যা দেখিতে গেলেন। অনেক স্থলে কন্যা দেখিবার পর একস্থলে একটি মনের মত পাওয়া গেল। বিবা-

হের বিষয় সকলই স্থির হইল। কেবল দিন ধার্য্য হওয়া বাকি। এমন সময়ে গঙ্গাধর একদিন নিরুদ্দেশ। গ্রামস্থ কোন বাড়ীতে তাহাকে পাওয়া গেল না। গ্রামান্তরে কুটুম্ব বাটীতে সন্ধান করা গেল, সেখানেও পাওয়া গেল না। দুই মাস অনুসন্ধান হইল, গঙ্গাধরের উদ্দেশ আর পাওয়া গেল না। শেষে স্থির হইল, গঙ্গাধর মনের দুঃখে উদাসীন হইয়াছে। গৃহিণী কহিলেন, 'আহা, বাছা আমার বউয়ের শোকে বাহির হইয়া গেল!'

সপ্তম অধ্যায়।

ঐতিহাসিক কালের বা ভৌগোলিক পন্থার অনুসরণ করা উপন্যাস রচনার প্রথা নহে। অতএব সময়—গঙ্গাধর নিরুদ্দেশের দুই বৎসর পর; স্থান—কলিকাতার জেনেরেল পোষ্টাফিস।

ডাকঘরের নিয়ম এই, যে সকল পত্র বিলি হয় নাই ও বিজ্ঞাপন দিলেও যে সকল পত্র কেহ লইয়া যায় না, তাহা অগ্নিতে দগ্ধ করা হয়। একজন বাবু তাহা খুলিয়া দেখিয়া দেন, তাহাতে কোন মুল্যবান বস্তু আছে কিনা। বাবু আজি অনেক পত্র দেখিয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে এক খানি বাঙ্গালা পত্র তাঁহার হাতে পড়িল। পত্রখানি মোটা শ্রীরামপুরী কাগজে লিখিত হইয়াছিল। বাবু পত্রখানি খুলিলেন, দেখেন, তাহাতে স্ত্রীলোকের নাম স্বাক্ষরিত। তিনি পত্রখানি পকেটে রাখিয়া দিলেন; মনে মনে বলিলেন, এ কোন মেয়ে মানুষের প্রণয় পত্রিকা হবে, বাসায় গিয়া পাঠ করিব। পত্রখানি পকেটে রহিল। তিনি আপন কর্ম্মে ব্যাপৃত হইলেন।

এই বাবুর বাসা সিমলায়। বাবু অপরাহ্নে বাসায় আসিয়া আহারান্তে বিশ্রাম করিতেছেন। এমন সময়ে সেই পত্রের কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি পত্রখানি পকেট হইতে বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন।

এই বাবুর বয়ঃক্রম প্রায় ত্রিশ বৎসর। এবয়সে বাঙ্গালি বাবুরা অবিবাহিত থাকেন না। কিন্তু ইনি বিবাহ করিয়াছেন কি না আমরা জানি না। ক্রমে জানা যাইবে।

পত্রখানি পড়িতে পড়িতে বাবুর ললাট দেশ স্বেদার্দ্র হইল, বদনে আনন্দ, বিস্ময় প্রভৃতি নানা মানসিক ভাবের প্রতিবিম্ব অঙ্কিত হইতে লাগিল। যে পত্র পড়িয়া বাবুর মনে এরূপ ভাবোদয় হইল, আমরা তাহা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

"শ্রীমতী ভবতারিণী দেবীর শ্রীচরণেষু

আপনারা জানেন, আজি দুই বৎসর ধরিয়া আমি নিরুদ্দেশ। আমি কাহাকে না বলিয়া আপনাদের বাটী পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। কারণ কি? পাছে নবীনকে খুন করিয়াছি বলিয়া আপনারা আমাকে পুলিশে দেন। কেন না নবীন আর আমি এক সঙ্গে ঘাটে গিয়াছিলাম,

ভোর রাত্রে নবীনের দেহ জলে ভাসিয়া উঠিল; আমার প্রতি সকলের সন্দেহ। আমি যদি বলিতাম, আমি নবীনকে খুন করি নাই, কে বিশ্বাস করিত? নানা কারণে লোকে আমার প্রতি সন্দেহ করিত। এই জন্য আমি পলাইয়া আসি।

কিন্তু আজি বলিতেছি আমি নবীনকে খুন করি নাই। আজি বলিতেছি, নবীনকে আমি মারি নাই; আমি তাহাকে প্রাণের সমান ভাল বাসিতাম। কিন্তু তাহার মরণে নিজের প্রাণভয়ে আমি তখন প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতেও পারি নাই। তাহার পরে কাঁদিয়াছিলাম।

গঙ্গাধর বাবু ভয়ানক পীড়িত হইয়া কলিকাতার ডাক্তার খানায় আইসেন। মরণকালে তিনি সমস্ত স্বীকার করিয়াছেন। নবীন আর আমি এক সঙ্গে ঘাটে গিয়াছিলাম সত্য; বাগানে তাল পড়াতে নবীন আমাকে তাহা কুড়াইতে বলে, আমি তাল কুড়াইতে যাই; তাল খুঁজিতে আমার বিলম্ব হয়, তখন নবীন গা ধুইতেছিল। ইতিমধ্যে গঙ্গাধর বাবু যাইয়া নবীনকে জলে ডুবাইয়া ধরেন। যতক্ষণ সে জলের ভিতরে নড়িল, ততক্ষণ ছাড়িলেন না। আমি তাঁহাকে উঠিয়া যাইতে দেখিয়াছিলাম। কিন্তু একথা আমি বলিলে তখন কে বিশ্বাস করিত? গত কল্য প্রাতঃকালে গঙ্গাধর বাবুর মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তিনি আমাকে বাচাইয়া গিয়াছেন। আরো শুনিলাম, তাঁহার কথা সকল হাসপাতালের বড় সাহেব লিখিয়া আপনাদের জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, সুতরাং আমি এখন মুক্ত।

আমি আর আপনাদের বাটীতে যাইব না; আর কি করিতে যাইব? আর সে নবীন নাই? কাহার সঙ্গে প্রাণ ভরিয়া কথা কহিব? গঙ্গাধর বাবু আরো বলিয়াছেন যে আপনার শাশুড়ীর পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে। সুতরাং আর কাহাকে রামায়ণ পড়িয়া শুনাইব? আপনাদের বাটীতে আর যাইব না। কিন্তু আপনাকে ভগিনীর মত ভালবাসি তাহা জানেন, বড়বাবু যখন কলিকাতায় আসিবেন, শিবনাথ ডাক্তরের বাসায় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বলিবেন, আপনার ছেলেদের জন্য কিছু জিনিষ দিব।

আমি আপনাদিগের দয়া প্রাণ থাকিতে ভুলিতে পারিব না। বলিতে কি, আপনার স্বর্গীয়া শাশুড়ী আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি যদি আমাকে গঙ্গাতীর হইতে তুলিয়া লইয়া না যাইতেন, আমি সেই রাত্রে পঞ্চত্ব পাইতাম। কিন্তু আমার মৃত্যুই ভাল ছিল। আজি আট বৎসর, স্বামির উদ্দেশ পাইলাম না। তিনি কি নৌকা ডুবিতে মরিয়াছেন? তবে বিধাতা আমাকে বাঁচাইয়া রাখিলেন কোন্ বিবেচনায়? বোধ হয়, তিনি মরেন নাই, নৌকার একজন বাঙ্গাল মাঝি বলিয়াছিল, সে তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিবে। দিদী আ-

মার মন বলে, তিনি বাঁচিয়া আছেন। সুশীলের বাপকে বলিবেন, যদি বিপিন বিহারী চক্রবর্ত্তী নামে কোন লোকের সন্ধান পান, তাঁহার কাছে যেন আমার বিবরণ বলেন। দিদী এখন পত্র শেষ করি।

আমি সেই বিরজা।"

পত্রখানি একবার, দুইবার, তিনবার পড়া হইল। তিনবারের পর বাবু পত্রখানি তাকিয়ার উপরে রাখিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। কোন কোন লোকের স্বভাব এই, একটি গুরুতর বিষয় উপস্থিত হইলে বহুক্ষণ বহুদিন অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করেন, ভবিষ্যৎ ভাবেন। এমন লোক প্রায় কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হয়েন না। আমরা যে বাবুটির কথা বলিতেছি, ইনি এরূপ স্বভাবের লোক ছিলেন না, ইনি একেবারে কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। উঠিয়া কামিজটি পড়িয়া, চাদর ও যষ্টি লইয়া বাটীর বাহির হইলেন। যাত্রাকালে পত্রখানি সঙ্গে লইলেন।

ডাক্তার শিবনাথ বাবু কলিকাতার মধ্যে ডাক্তারি কার্য্যে বড় বিখ্যাত লোক ছিলেন না। কলিকাতায় অনেক ডাক্তার আছে, হাইকোর্টের অনেক উকিলের মতন তাহাদের বাসাখরচ পর্য্যন্ত চলে না। শিবনাথ বাবু এদলের ডাক্তার নহেন, কিন্তু একজন বিখ্যাত ডাক্তারও নহেন তাহার প্রতিবাসী, আত্মীয়,বন্ধুবান্ধব ছাড়া অন্যে বড় তাঁহাকে ডাকে না; হাসপাতালে যে বেতন পান তাহাতে স্বচ্ছন্দে চলে। শিবনাথ বাবু এক সময়ে ব্রাহ্ম ছিলেন, গোপনে যজ্ঞোপবীতও ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু শুনিতে পাই, মাতার মৃত্যুর পর আবার হিন্দু হইয়াছেন। ব্রাহ্ম হইয়া স্ত্রীকে বিলক্ষণ লেখা পড়া শিখাইয়াছিলেন, এবং অনেকটা স্বাধীনতাও দিয়াছিলেন; এখন হিন্দু হইয়া সে স্বাধীনতাটুকু কাড়িয়া লইতে পারেন নাই। এখন আপত্তিকর ভক্ষ্য অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করা হয়; কিন্তু তাহাতে কোন দোষ নাই; কেননা হিন্দুধর্ম্মের আবরণ অঙ্গে আছে। সে যাহা হউক, শিব নাথ বাবু বড় ভদ্র লোক, তাঁহার পত্নী কাত্যায়নীও বড় দয়াবতী ও সুশীলা। আমাদের বিরজা ইহাঁদের বাড়ীতে থাকে। যে বয়সে ইংরেজ পুরুষ ও কামিনীদিগকে যুবকযুবতী বলা যায়, শিবনাথ বাবু ও কাত্যায়নীর সেই বয়েস; অর্থাৎ চল্লিশ ও পঁয়ত্রিশ। বিরজা শিবনাথ বাবুর বাড়ীতে সামান্যা পরিচারিকার ন্যায় থাকে না; শিবনাথ বাবুর দুটি কন্যাকে শিক্ষা দেওয়া বিরজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম

পুনঃ পুনঃ ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনে শিক্ষিত সমাজে শিবনাথ বাবুর নাম রাষ্ট্র হইয়া যায়। আমরা পূর্ব্বে যে বাবুর কথা বলিতেছিলাম, গোবরগুলি নিবন্ধন তিনিও শিবনাথ বাবুর নাম শুনিয়াছিলেন।

রাত্রি দশটার পরে শিবনাথ বাবুর দ্বারবান্ উপরে যাইয়া সংবাদ দিল যে, একটি বাবু আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক-

রিতে আসিয়াছেন। শিবনাথ বাবু তৎকালে আহারাদি করিয়া সর ওয়াল্টার স্কটের আইবানহো নামক আখ্যায়িকা পাঠ ও তাহার অর্থ পত্নীকে বুঝাইয়া দিতেছিলেন, এবং এই পুস্তকের কোন্ কোন্ চিত্রের সহিত বাঙ্গলা উপন্যাস বিশেষের কোন্ কোন্ চিত্রের সাদৃশ্য আছে তাহাও বলিতেছিলেন। ভগবতী যেমন মহাদেবের মুখে অনন্যমনে যোগকথা শ্রবণ করিতেন, পতিপ্রাণা কাত্যায়নী তদ্রূপ কার্পেট বুনিতে বুনিতে শ্রবণ করিতেছিলেন। দ্বারবান্ সম্বাদ দিলে শিবনাথ বাবু পুস্তক বন্ধ করিয়া নীচে গেলেন।

নীচেকার বৈঠকখানায় আগন্তুক বাবু বসিয়াছিলেন, শিবনাথ বাবু তথায় যাইয়া বসিলেন। আগন্তুক জিজ্ঞাসিলেন, 'মহাশয়ের নাম শিবনাথ বাবু?'

'আজ্ঞা হাঁ।'

'কি প্রয়োজনে আসা হইয়াছে?'

'এই পত্রখানি পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন?'

এই বলিয়া আগন্তুক ডাক্তারের হাতে পত্রখানি দিলেন, শিবনাথ বাবু প্রদীপের নিকট সরিয়া গিয়া পত্রপাঠ করিতে লাগিলেন।

দীর্ঘ পত্র পড়িতে একটু সময় লাগিল। পড়া শেষ হইলে পত্রের যে পৃষ্ঠায় বিপিন বিহারী চক্রবর্ত্তীর নাম উল্লেখ ছিল, সেই পৃষ্ঠা উল্টাইয়া শিবনাথ বাবু জিজ্ঞাসিলেন, 'আপনার নাম কি বিপিন বাবু?'

'আমার নাম বিপিন বিহারী চক্রবর্ত্তী—আমি বিরজার স্বামী।'

'এখন আপনার অভিপ্রায় কি?'

'আমি বিরজাকে গ্রহণ করিতে চাহি।'

'আপনি সেই অবধি বিবাহ আর করেন নাই?'

'করি নাই—করিতামও না।'

'শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলাম। আমি বিরজার বিবরণ সমস্ত শুনিয়াছি। আপনার অনেক অনুসন্ধান গোপনে গোপনে করিয়াছি, কিন্তু উদ্দেশ পাই নাই। বিরজা অতি সতী লক্ষী মেয়ে, আমার ব্রাহ্মণী বিরজাকে আপানার কন্যাবৎ স্নেহ করেন। তবে বিরজাকে ত সহসা বিদায় করিতে পারি না। বিরজা আমার কন্যাসদৃশী, আপনি জামাতা; যেমন করিয়া কন্যা বিদায় করিতে হয়, তেমনি করিয়া বিরজাকে বিদায় করিব।'

'আপনি যে সম্পর্ক পাতিলেন, ইহাতে অধিক কথা বলিতে পারি না; তবে এই মাত্র বলিতে চাই যে, অদ্য একবার আমি কি বিরজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারি না?'

'অবশ্য পারেন। আপনি বসুন, আমি বাড়ীতে এ সংবাদ দি।' বলিয়া তিনি অন্তঃপুরে যাইয়া পত্নীকে সমস্ত বলিলেন। তিনি বিরজাকে ডাকিয়া জি-

জ্ঞাসিলেন, ‘ বিরজে, বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তীকে তুমি চিন ? ’ বিরজা শীহরিয়া উঠিল ; আনন্দ ও বিস্ময়ে বিরজাকে পরাভূত করিল ; ক্ষণেক কাল স্তম্ভিতের ন্যায় থাকিয়া বিরজা উত্তর করিল, ‘ আমার স্বামির ঐ নাম। ’

‘ তাঁহাকে দেখিলে এখন তুমি চিনিতে পারিবে ? ’

‘ পারিব ’ বলিয়া বিরজা কাঁদিয়া ফেলিল।

‘ আমি তাঁহাকে উপরে লইয়া আসি’ বলিয়া শিবনাথ বাবু নীচে গেলেন।

গৃহিণী বিরজাকে কহিলেন,তিনি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন।

অষ্টম অধ্যায়।

আশার আশ্বাস মাত্রে যে মিলন এতদিন বিলম্বিত ছিল, বহুদিন পরে, যুগান্তে, গভীর নিশীথে দম্পতীর সেই মিলন কি সুখের সামগ্রী। শিবনাথ বাবুর দোতালার বারেন্দায় আজি সেই গভীর আনন্দময় মিলন। বিপিনবিহারীর পদপ্রান্তে বিরজা কাঁদিতেছেন, আর নিশীথিনী লক্ষ চক্ষু মেলিয়া তাহাই দেখিতেছে। বিপিনবিহারী উদাসীনের মত স্পন্দরহিত, রবরহিত দণ্ডায়মান আছেন। যে পূর্ণ চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে সে উদাসীন। পূর্ণতায় আজি বিপিনবিহারী উদাসীন।

সহৃদয় শিবনাথ নিরর্থক শব্দ করিয়া গৃহহইতে গৃহান্তরে গমন করিলেন। তখন বিপিন বিরজার চমক হইল। তখন বোধ হইল যে সংসারে এরূপ মিলন অনন্তকাল স্থায়ি নহে। ক্রমে আরও বোধ হইল যে, একবার সর্ব্ব সমক্ষে উভয়ে উভয়ের পরিচয় লওয়া আবশ্যক।

বিরজা অগ্রেই কথা কহিলেন ; ‘ আমি যে এখানে আছি, আপনি কেমন করিয়া জানিলেন ’ বলিয়া এতক্ষণ পরে বিরজা চক্ষু মুছিবার চেষ্টা করিলেন। আবার জল বেগে উছলিয়া উঠিল, মনে মনে ভাবিলেন ‘ হায় আমি এমন কপালও করিয়াছিলাম, এই প্রীতিপূরিত হৃদয়ের প্রথম সম্বোধনে হৃদয়েশ্বরকে এমন করিয়া সম্ভাষণ করিতে হইল। ’

বিপিনবিহারী এখনও নীরব ; তিনি বিরজার পত্র বিরজাকে প্রদান করিলেন।

বিরজা জিজ্ঞাসা করিলেন এ পত্র আপনাকে কি ভবতারিণী দিদী দিয়াছেন ? বিপিন বলিলেন ‘ না ’। একটি কথার পর দশটি কথা বলা অতি সহজ। এখন বিপিন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘ ভবতারিণী ’ তিনি কে ? তুমি তাঁহাদের বাড়ী কতদিন ছিলে ? সেখান হইতে তুমি তাঁহাদের না বলিয়া কোথায় গিয়াছিলে ? আমি পত্রের সকল কথা বুঝিতে পারি নাই। ’

বিরজা আবার অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, ‘ আমি হতভাগী একটা সংসার মজাইয়াছি ; আমার দুরদৃষ্ট বশে একটা বৃহৎ সংসার হতশ্রী হইয়াছে। ভবতারিণী দি-

দীর দেবর আমাকে কলুষিত চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন।' বিরজা ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, বিপিন বিহারী পার্শ্বস্থ একখানি চৌকিতে উপবেশন করিলেন।

বিরজা বলিতে লাগিলেন 'আমি তাঁহার পত্নী নবীনমণিকে প্রাণের মত ভাল বাসিতাম, আর ভবতারিণী দিদী আমাকে স্বীয় অনুজা ভগিনীর মত ভাল বাসিতেন। আমরা নবীনমণির স্বামীর অসৎ অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিতাম। সে আপনার অসৎ পথ হইতে কণ্টক দূর করিবার অভিপ্রায়ে রাত্রিযোগে নবীনমণিকে হত্যা করে। আমি সেই রাত্রিতেই সেখান হইতে পলায়ন করি। হতভাগা কিছুদিন পরে গৃহ হইতে নিরুদ্দেশ হইয়া যায়, এবং বাতুলের মত দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। পরিশেষে সে কলিকাতার অন্যান্য রোগীদিগের আশ্রয়ে সর্ব্ব সমক্ষে নিজ গুরুতর পাপ স্বীকার করিয়া ইহসংসার হইতে অপসৃত হইয়াছে। আমি আমার আশ্রয়দাতা শিবনাথ বাবুর মুখে সকল শুনিয়া ভবদিদীকে পত্র লিখিয়াছিলাম। সে বাড়ীতে আমি আর ইহ জন্মে মুখ দেখাইতে পারিব না। আমি সে বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ না করিলে,নবীনমণি এতদিন স্বামীসোহাগে সেই সংসারের শোভা বর্দ্ধন করিত, আর বর্ষীয়সী গৃহিণীও পুত্র শোকে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেন না। যখন দেখিলাম যে হতভাগ্যের হৃদয়ে কালাগ্নি জ্বলিয়াছে, তখন কেন আমি সেই গৃহ হইতে স্থানান্তরে গেলাম না। আমি সেই গভীর রাত্রিতে পথচারিণী হইয়াছিলাম, কিছুদিন পূর্ব্বে সেরূপ করিলে আমার আজি তোমার কাছে অনুশোচনা করিতে হইত না।'

এবার বিরজার হৃদয়ভার অনেক লঘু হইয়াছে, তিনি মুখ ফুটিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এতক্ষণ বিপিন বিহারী প্রায়ই নীরবে ছিলেন,তিনিএখন প্রকৃত পুরুষের মত দণ্ডায়মান হইয়া, রোরুদ্যমানা বিরজাকে হৃদয়প্রান্তে আকর্ষণ করিয়া লইলেন, এবং বলিলেন—'সাধ্বি, তুমি কেন অনুশোচনা করিবে? পবিত্রহৃদয়া অবলা প্রদীপ্ত পাবকশিখা;—যে প্রেমের অবমাননা করিয়া পতঙ্গের মত তাহাতে ঝাঁপ দিয়া পড়িবে সেই এইরূপ পুড়িয়া ভস্ম হইবে। তবে নবীনের সারল্যময়ী প্রতিমূর্ত্তি যে তোমার চিত্তপটে চিরদিন অঙ্কিত থাকিবে, এবং উহা যে অনেক সময়েই তোমাকে দগ্ধ করিবে, তাহা আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারি। অবলা কোমলপ্রাণা, কুসুমকোমলা। ইহাতেই অবলার সুখ, ইহাতেই অবলার দুঃখ। ইহাই অবলার গৌরব, ইহাই অবলার যন্ত্রণা'। (হ)

সমাপ্ত।
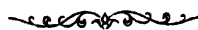
বধূর অঞ্চল।

গাওরে সকলে গাও 'বঙ্গের বিজয়'
গাও সুগভীর স্বরে, গাও ছয় কোটি নরে,
জয়নাদে দশদিশি হোক্ জয় জয়
হোক্ আজি স্বর্গে মর্ত্তে অকাল প্রলয়।

প্রুসিয়ার বীরগর্ব্ব যা'ক্ রসাতলে,
কাঁপুক ইংলণ্ড বাঙ্গালির ভুজবলে,
দাপটে অধীর হোক্ ফরাশির দল,
ভয় পেয়ে ভীত হোক্ রুসিয়ার বল;
ঘুচিল বঙ্গের ভয়, গাওরে বঙ্গের জয়,
নির্জ্জীব ভারত হোক্ সজীব এখন;
মাতুক পাষাণচয়, জলস্থল সমুদয়,
জ্বলুক বঙ্গেতে আজি জ্বলন্তদহন।

কি ভয় বঙ্গের, আর কি ভয় বঙ্গের?
প্রদীপ্ত প্রতিভা বলে, বাঙ্গালির করতলে,
কামিনী-অঞ্চল-অস্ত্র অমোঘ অজয়,
ধর অস্ত্র, সাজ রণে, কর বিশ্বজয়
গাওরে আবার গাও 'বঙ্গের বিজয়'।

নাহি অসি চর্ম্ম, নাহি বন্দুক কামান,
নাই তেজ, নাই বীর্য্য, নাই ধনুর্ব্বাণ,
হৃদয়ে সাহস নাই, দেহে নাই বল,
নাই বা থাকিল—আছে বধূর অঞ্চল!
বীরত্ব গৌরব স্থল, প্রেয়সী বসনাঞ্চল,
ছাড়িও না, ছাড়িও না কভু বঙ্গবাসি!
বাজাওরে জয়ভেরী, সাজাওরে নিজনারী,
ছড়াওরে স্বাধীনতা, হাস সুখহাসি।

নখ দন্তে সিংহ ব্যাঘ্র রণেতে ভীষণ,
ভুজঙ্গের বরাহের সম্বল দশন,
মদমত্ত করী করে কর আস্ফালন,
মেষ মহিষের শৃঙ্গ রণে প্রহরণ,
সারসের বায়সের চঞ্চুই সম্বল
বাঙ্গালির ব্রহ্ম অস্ত্র বধূর অঞ্চল।

তবে কেন?—বল তবে কেন আর
বৃথা কাল হর, হও অগ্রসর,
'বাঙ্গালি বিজয়ী' গাওরে আবার,
কর সসাগরা ধরা অধিকার।

অর্জ্জুনের গাণ্ডীবের নাই প্রয়োজন,
জুলিয়স সিজরের, অথবা সেকন্দরের,
শাণিত অসির বাঞ্ছা ক'রোনা কখন;
বাঞ্ছিও না রাইফল বন্দুক কামান
অঞ্চলের নিধি! কর অঞ্চলের ধ্যান।

কিসের অভাব ভবে বঙ্গ যুবকের?
সাহিত্য বিজ্ঞান গণিত দর্শন;
লোক ব্যবহার নীতি বিবরণ,

অস্ত্র পাশুপত, চক্র সুদর্শন,
গদা কৌমোদকী, অশনি ভীষণ,
বঙ্গ কুলবধূদের আঁচলের কোণে ;
ভুবনে অতুল বঙ্গ আঁচলের গুণে,
বল আর বাঙ্গালির অভাব কিসের ?

পিতৃভক্তি ভ্রাতৃস্নেহ দূরমপসর,
ভগিনীর প্রতি প্রীতি প্রকাশে কি কাজ ?
চিরন্তন সমাজবন্ধন ছিন্ন কর,
দূর কর লজ্জাবতী রমণীর লাজ ;
হউক উজ্জ্বল বঙ্গ যশের কিরণে
ঘুষুক বঙ্গের যশ সমগ্র ভুবনে।

স্বর্গাদপি গরীয়সী স্নেহপ্রবাহিনী
কে বলিবে এজগতে কেবলি জননী ?
আছে ভক্তি-প্রীতি-স্নেহ-আদরের খনি,
প্রাণাধিকা প্রণয়িনী নয়নরঞ্জিনী ;
যার চঞ্চল অঞ্চলে, বিলম্বিত কুতূহলে,
রসাল বাঙ্গালি, সেই বঙ্গ বধূ কুল,
একমাত্র বাঙ্গালির উন্নতির মূল।

ললিত লতিকা শোভে কিসলয় দলে,
সুদৃশ্য পাদপচয় ফুল্ল ফুল ফলে,
নব দূর্ব্বাদলে শোভে শিশিরের বিন্দু,
শারদ গগণে শোভে সুবিমল ইন্দু,
আবার—
শশীসহ তারাদলে নিশি শোভা পায়,
কামিনীর কণ্ঠ শোভে মুকুতামালায়,
নূপুর সিঞ্জনে শোভে নর্ত্তকীচরণ,
বধূর অঞ্চলে শোভে বঙ্গবাসিগণ।

আর কি ভাবনা,—তবে আর কি ভাবনা ?
কর মন্ত্রপূত আঁচলের কোণা ;
ছুটিবে বিদ্যুতরাশি, কাঁপিবে ত্রিলোকবাসী,
দেব দৈত্য নর গন্ধর্ব্ব কিন্নর,
যক্ষ রক্ষ আদি কাঁপিবে সকল,
ঝলসিবে চক্ষু, ঘুড়িবে মস্তক,
মানিবে সভয়ে সবে পরাজয়,
বাজিবে অস্ত্রের বিজয় ঝঞ্ঝনা
হইবে অচিরে বিজয় ঘোষণা।

তাই বলি—
দম্ভভরে মেতে উঠ বঙ্গবাসিগণ !
প্রচণ্ড প্রতাপ তাপে, ভয়ঙ্কর বীরদাপে,
ভুজদণ্ডের প্রভাবে, হৃদয়ের উষ্ণভাবে,
টলুক কৈলাসপুরে শূলীর আসন ;
কাঁপুক অবনী ব্যোম, খসুক আদিত্য সোম,
পড়ুক নক্ষত্র পুঞ্জ হয়ে কক্ষচ্যুত ;
মাত ভীম রণমদে, ধাও সবে ক্ষিপ্রপদে,
দেখাও বিক্রম আজি চিরনির্ব্বাপিত।

কিভয় ?
ক্লান্তকলেবর যবে হইবে আহবে,
ধরিয়া চিবুকখানি, বামকরে বামাঙ্গিনী,
অঞ্চল দোলায়ে মৃদু বাতাস করিবে,
ললাটের স্বেদজল অঞ্চলে মুছিবে,
কিভয় ? অঞ্চল যার সহায় এভবে।

আক্রমে বিপক্ষ যদি হর্য্যক্ষ বিক্রমে,
আকর্ণ-পুরিয়া করে বাণবরিষণ,
আঁচল সাঞ্জোয়া দিয়ে,কুলতনু আচ্ছাদিয়ে

দিবে ফুলময়ী, হবে অভেদ্য তখন,
শ্রান্ত হবে শক্রচমূ শুধু পণ্ডশ্রমে।

অসংখ্য অরক্ত করে সংখ্যাতীত অসি,
দেখিয়া স্তম্ভিত ভয়ে হ'ওনা কখন;
ধীরে আঁচলের আড়ে,ধীরে দাঁড়াইবে স'রে,
মেঘ আড়ে মেঘনাদ যুঝিত যেমন,
যুঝিবে তেমতি, দে'খে সৌদামিনী হাসি।
শিরে শিরস্ত্রাণ দিবে আঁচল টানিয়া,
কামিনী-কটাক্ষ লবে শাণাইয়া;
লভিবে বিজয়লক্ষ্মী আঁচলের বলে,
কর সিংহনাদ, ভয়ে কাঁপুক সকলে।
জান কি ভবের ভাব কিসে কিবা ফলে?
বঙ্গের অব্যর্থ সন্ধি বধূর অঞ্চলে। শ্রীম

প্রাতরুত্থান ও প্রাতঃক্রিয়া

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের অবশিষ্ট।)

মনুষ্য বাসীমুখে থাকিলে সর্ব্বদা অপবিত্র, সেই হেতু যত্নপূর্ব্বক দন্তধাবন করিবে (১)। প্রাতঃকালে নিশিজল পান করিয়া কোমল অথচ কষায়, কটু ও তিক্ত রসযুক্ত দন্তকাষ্ঠ (দাঁতন) দ্বারা দন্তঘর্ষণ কর্ত্তব্য। কিন্তু এরূপভাবে ঘর্ষণ করিতে হইবে যে, তদ্দ্বারা দন্তমাংসের (মাড়ির) যেন পীড়া না হয় (২)। দন্তকাষ্ঠ মধ্যাঙ্গুলির ন্যায় স্থূল, দ্বাদশাঙ্গুলি দীর্ঘ ও ত্বচযুক্ত হইবে। তাহাতেই দন্তধাবন করিবে(৩) কিংবা উহা কনীনী অর্থাৎ কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগের ন্যায় স্থূল হইলেও চলিতে পারে (৪)। করবীর, আম্র, করঞ্জ, বকুল, ক্ষীরি, মালতী, অপামার্গ, বিল্ব প্রভৃতির এবং কণ্টকযুক্ত বৃক্ষমাত্রের কাষ্ঠে দন্তধাবন কর্ত্তব্য (৫)। যাবতীয় তিক্তরসযুক্ত দন্তকাষ্ঠের মধ্যে নিম্বের দন্তকাষ্ঠই সবিশেষ প্রশস্ত। বঙ্গদেশাপেক্ষা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ও উড়িষ্যা প্রভৃতি দেশস্থ লোকদিগের মধ্যে অনেকেই দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করে। গুবাক, তাল, হিন্তাল, খর্জ্জুর, কেতকী, নারিকেল, তেড়েৎ প্রভৃতি কএক

(১) মুখে পর্য্যুষিতে নিত্যং ভবত্যপয়তো নরঃ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনং॥ (বৃদ্ধশাতাতপ।)—(২) প্রাতর্ভুক্ত্বা চ পানীয়ং কষায়কটুতিক্তকং। ভক্ষয়েদ্দন্তকাষ্ঠকং দন্তমাংসান্যবাধয়ন্॥ (রাজবল্লভ)।—(৩) মধ্যাঙ্গুলসমস্থৌল্যং দ্বাদশাঙ্গুলসম্মিতং। সত্বচং দন্তকাষ্ঠং স্যাত্তস্যাগ্রেণ চ ধাবয়েৎ॥ (কূর্ম্মপুরাণ, উপবিভাগ, ১৭ অধ্যায়।)—(৪) কনীন্যগ্রনিভস্থৌল্যং সকূর্চ্চং দ্বাদশাঙ্গুলং। (নরসিংহ পুরাণ।)—(৫) করবীররসালশ্চ করঞ্জবকুলাসনান্। দন্তকাষ্ঠার্থমন্যে তু সর্ব্বাস্তরূন্ কণ্টকিতান্॥ (রাজবল্লভ)।—ক্ষীরিবৃক্ষসমুদ্ভূতং মালতীসম্ভবং শুভং। অপামার্গঞ্চ বিল্বঞ্চ করবীর বিশেষতঃ॥ (কূর্ম্মপুরাণ, উপবি-

প্রকার কাষ্ঠে দন্তধাবন কর্ত্তব্য নহে (১)। এই সকল বৃক্ষের শিরা (ডাঁটা) পত্র প্রভৃতির দ্বারা দন্তধাবন করিলে, যে পর্য্যন্ত গোদর্শন না হয়, তাবৎকাল চণ্ডালত্ব ঘটে (২)। দন্তমাংসে আঘাত লাগিয়া পাছে রক্তপাত ও পীড়া উপস্থিত হয়, সেই জন্যই এই সকল বৃক্ষকাষ্ঠাদিতে দন্তধাবন নিষিদ্ধ বলিয়া নানা প্রকার শাসন সৃজিত হইয়াছে। ইষ্টক (ইট বা অন্য প্রকার দগ্ধমৃত্তিকাখণ্ড) লোষ্ট (লৌহমল) প্রস্তর ও অঙ্গুলি দ্বারা দন্তধাবনও কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু সময়বিশেষে যদিও অঙ্গুলিযোগে দন্তধাবন করিবার আবশ্যক ঘটে, তাহা হইলে অনামিকা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি যেন ব্যবহৃত না হয় (৩)। অঙ্গুলি দিয়া দন্তধাবন করিলে নখরাঘাতে দন্তমাংস ছিন্ন হইয়া যন্ত্রণা উপস্থিত হইবে বলিয়া প্রাচীন ঋষিগণ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, যদি দন্তকাষ্ঠের প্রচলন দোষাবহ নহে, তবে অঙ্গুলি ব্যবহার কি জন্য দোষের হইবে ? দন্তমাংসে শোণিতপাত ও পীড়ার ভয় কি কেবল অঙ্গুলিতেই হয়, দন্তকাষ্ঠে হয় না ? আমরা স্বীকার করি, তাহা হয় বটে, কিন্তু অনিষিদ্ধ দন্তকাষ্ঠের দ্বারা দন্তধাবনের সময়, যদিও সময়ে সময়ে মাড়ি ছিন্ন হইয়া পীড়া উপস্থিত হয়, কিন্তু তদ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাঘাত ঘটিতে পারে না। নখরধারে একপ্রকার বিষাক্ত দ্রব্য আছে, সুতরাং নখর দ্বারা দন্তমাংস ছিন্ন হইলে স্বাস্থ্যহানির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা নখর-বিষের বিষয় সবিশেষ অবগত ছিলেন, এমন কি দন্তকাষ্ঠের অভাবে ও দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তমার্জ্জনের প্রতিষিদ্ধ দিবসেও অঙ্গুলি ব্যবহারে অনুমতি দেন নাই ; কেবল দ্বাদশ গণ্ডূষ জল দ্বারা মুখশুদ্ধির বিধান দিয়া গিয়াছেন (৪)। দক্ষিণাস্যে দন্তধাবনে আয়ুঃক্ষয়, পশ্চিমাস্যে রোগ, উত্তরাস্যে ও পূর্ব্বাস্যে সম্পদ লাভ হয় (৫)। অমাবস্যা, প্রতিপৎ ও নবমী তিথিতে দন্তধাবন নিষিদ্ধ (৬)।

ভাগ, ১৭ অধ্যায়।)—(১) গুবাকতালহিন্তালখর্জ্জূরৈঃ কেতকীযুতৈঃ। নারিকেলেন তাড়্যা চ ন কুর্য্যাদ্দন্তধাবনং ॥ (রাজবল্লভ।)—(২) গুবাকতালহিন্তালাস্তথা তাড়ী চ কেতকী। খর্জ্জূরনারিকেলৌ চ সপ্তৈতে তৃণরাজকাঃ ॥ তৃণরাজশিরাপত্রৈর্যঃ কুর্য্যাদ্দন্তধাবনং। তাবদ্ভবতি চাণ্ডালোযাবদ্গাং নৈব পশ্যতি ॥ (ক্রিয়াকৌমুদী।)—(৩) নেষ্টকালোষ্টপাষাণৈরিতরাঙ্গুলিভিস্তথা। ত্যক্ত্বা অনামিকাঙ্গুষ্ঠৌ বর্জ্জয়েদ্দন্তধাবনং ॥ (পরাশরভাষ্য যাজ্ঞবল্ক্য।)—(৪) অলাভে দন্তকাষ্ঠানাং প্রতিষিদ্ধদিনে তথা। অপাং দ্বাদশগণ্ডূষৈর্মুখশুদ্ধির্বিধীয়তে ॥—(নৃসিংহপুরাণ।) (৫) মৃত্যুস্যাদ্দক্ষিণাস্যেন পশ্চিমাস্যেন চাময়ঃ। পূর্ব্বাস্যেনোত্তরাস্যেন সম্পদে- দন্তধাবনাৎ ॥ (রাজবল্লভ।)—(৬) প্রতিপদ্দর্শষষ্ঠীষু নবম্যাঞ্চৈব সত্তমাঃ। দন্তানাং কাষ্ঠসংযোগো দহত্যাসপ্তমং

অজীর্ণ হইলে, ব্রত বা উপবাস করিলে, এবং জন্ম, বিবাহ ও শ্রাদ্ধ দিবসেও দন্তধাবন পরিত্যাগ করা উচিত (১)। বোধ হয় অনেকে দন্তধাবনের এরূপ শাস্ত্রীয় বিধি দেখিয়া উপহাস করিবেন। বিশেষতঃ অধুনাতন নব্য বঙ্গীয় যুবকমণ্ডলীর নিকট ঈদৃশী শাস্ত্রবিধি পাগলামি বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু যাঁহারা এরূপ কথা বলিতে অগ্রসর, তাঁহারা একবার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করিয়া দেখিলেই জানিতে পারিবেন যে, পূর্ব্বতন আর্য্যমনীষিগণ কেবল সনাতন হিন্দুধর্ম্মেরই চরমোৎকর্ষ স্থাপনের জন্য চেষ্টিত ছিলেন না, ধর্ম্মের সঙ্গে বিজ্ঞান মিশাইয়া বুদ্ধিমত্তার প্রচুর পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। যে কোন আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্র খুলিয়া দেখ, তাহার মধ্যে বিজ্ঞান মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। আবার যে কোন আর্য্য-বিজ্ঞান-শাস্ত্র উন্মোচন কর, তন্মধ্যে বিজ্ঞানের হাড়ে হাড়ে ধর্ম্মের নাম উজ্জ্বলিত দেখিবে। এরূপ হইবার কারণ কি? মনুষ্য পাপের ভয়ে ও পুণ্যের লোভে ধর্ম্মকে ভয় করে। বিশেষতঃ প্রাচীন কালে যখন সমগ্র জগৎ সরলতাপূর্ণ ছিল, তখন লোকের মনে ধর্ম্মধ্যান স্বতঃই জাগ্রত থাকিত। ধর্ম্মোপার্জ্জনের জন্য সকলেই আত্মবিসর্জ্জন দিতেও কাতর হইত না। এক্ষণে কালমাহাত্ম্যে ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মবন্ধন শিথিল হইতেছে দেখা যায়, তখন ধর্ম্মবন্ধন শিথিল না হইয়া বরং উত্তরোত্তর দৃঢ়তর হইয়াছিল। অপিচ তৎকালে নীরস বিজ্ঞানের দিকে বড় কেহ আদর প্রদর্শন করিত না, বরং উহাকে তুচ্ছ ভাবিয়া উপেক্ষা করিত। সুতরাং তৎকালে মনুষ্যকে বিজ্ঞানে বিশ্বস্ত করিবার জন্য উহার সহিত ধর্ম্মশাসন মিশ্রিত করিতে হইয়াছিল। স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলি বিজ্ঞান শাস্ত্রের অন্যতর অংশ বলিয়া পরিগণিত। অতএব প্রাচীন ঋষিগণ যেখানে স্বাস্থ্যসম্বন্ধে যে কোন কথা বলিয়াছেন, সেই খানেই ধর্ম্মভয় দেখাইয়া উহা দৃঢ়বদ্ধ করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং কোন্ দিকে অভিমুখীন হইয়া দন্তধাবন প্রভৃতি স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় কার্য্য করিলে রোগ, কোন্ দিকে সম্পদ, বা কোন্ দিকে আয়ুঃক্ষয় এবং চণ্ডালত্ব, পাপগ্রস্ত বা পতিত হইতে হয়, এবংবিধ নানা প্রকার কথা লিখিত হইয়াছে। সুচতুর ঋষিগণের এই প্রকার কৌশলে প্রাচীন সময়ে সকলে ধর্ম্মভীত হইয়া স্বাস্থ্যরক্ষায় যত্নবান্ হইত। ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যান্য দেশের চিকিৎসাশাস্ত্র সমূহ উদ্ঘাটন করিয়া দেখ, তৎসমুদয়ে ধর্ম্মের কোন সংশ্রব আছে কি না সন্দেহ। তাহারই বা কারণ কি? আমরা এক প্রকার বলিতে পারি যে, আর্য্যধর্ম্ম যেরূপ উৎকৃষ্ট ও আর্য্যজাতি যেরূপ ধর্ম্মভীরু, সেরূপ পৃথিবীর অন্য কোন দে-

কুলং॥ (নৃসিংহ পুরাণ।)—(১) শ্রাদ্ধে জন্মদিনে চৈব বিবাহেঽজীর্ণসম্ভবে। ব্রতে চৈবোপবাসে চ বর্জ্জয়েদ্দন্তধাবনং॥ (বৃদ্ধশাতাতপ।)

শের ধর্ম্ম উৎকৃষ্ট বা তথাকার লোক ধর্ম্মভীরু বলিয়া বোধ হয় না। ভারতবর্ষে ধর্ম্মের বন্ধন নিরতিশয় দৃঢ় বলিয়াই যাবতীয় বিষয়েই কোন না কোন রূপে উহা প্রতিভাসিত হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা প্রাচীন ঋষিগণকর্ত্তৃক স্বাস্থ্যের সহিত ধর্ম্মমিশ্রণসম্বন্ধে আর একটি কথা বলিব। তাঁহারা যে কেবল স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে খালি খালি ধর্ম্মের দোহাই দিয়া গিয়াছেন, এমন নহে। কেন না তাঁহাদের বিধিব্যবস্থাসমূহের প্রতি বিশেষ মনোযোগসহকারে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে, তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানবিৎ মাত্রেই অবগত আছেন যে, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণের সঙ্গে জীবশরীরের সহিত অতি নিকট সম্বন্ধ আছে। তিথিবিশেষে ঐ সকল গ্রহের সংক্রমণ কালে মানব শরীরের স্বাস্থ্যসম্বন্ধে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। এইজন্য অমাবস্যা, পূর্ণিমা, একাদশী প্রভৃতি তিথিতে লঘু আহার বা উপবাস ইত্যাদির বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। এবং এইজন্যই অমাবস্যা, প্রতিপৎ ষষ্ঠী ও নবমী তিথিতে দন্তকাষ্ঠদ্বারা দন্তধাবনাদির ব্যবস্থা দেওয়া হয় নাই। দিক্-বিশেষে অভিমুখীন হইয়া দন্তধাবনেরও এই প্রকার নিগূঢ় কারণ আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন মনীষিগণ মানবকুলের স্বাস্থ্য রক্ষার নিমিত্ত এবংবিধ নানা প্রকার বিধি ও উপদেশ দিয়া গিয়া সাধারণের চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। যে পরিমাণে অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে, সেই পরিমাণে তাঁহাদিগের বুদ্ধিমত্তা, চিন্তার গভীরতা ও অপূর্ব্ব কৌশল সমন্বিত স্বাস্থ্যবিধান সমুহের অন্তস্তলস্থ মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবে। কতকগুলি অদূরদর্শী ব্যক্তির মতে প্রাচীন হিন্দুগণ বিজ্ঞানচর্চ্চায় অনিপুণ ছিলেন বলিয়া প্রতিঘোষিত হইয়াছে, কিন্তু সেটি নিতান্ত ভ্রম ও অন্যায়। আমরা বলিতে পারি, ধর্ম্ম সম্বন্ধে হিন্দুজাতির নিকট কাহারও উচ্চশির হইবার পন্থা নাই, কিন্তু বিজ্ঞান সম্বন্ধে যদিও তাঁহারা মধ্যে মধ্যে অতিব্যাপ্তি প্রভৃতি কোন কোন দোষ ঘটাইয়া গিয়াছেন বটে, তথাপি বিজ্ঞানে তাঁহাদিগের অসাধারণ জ্ঞান ছিল না বলিয়া কে প্রতিপন্ন করিতে পারে? এ প্রস্তাবে সে বিষয়ের অবতারণা করা উদ্দেশ্য নহে।

দন্তধাবনের পক্ষে লবণও ভাল পদার্থ। ইহা দ্বারা দন্ত মাংসের দুষিত রস নির্গত হইয়া দন্তমূলকঠিন হয়। দন্তের উর্দ্ধাধঃ ঘর্ষণ পূর্ব্বক মুখে জলপূর্ণ করিয়া নেত্রদ্বারে জল সেচন করিলে শীঘ্র দৃষ্টিপ্রসন্ন হয় (১)। কিন্তু অর্দ্দিতরোগী অর্থাৎ বায়ু রোগে বক্রীকৃত মুখরোগগ্রস্ত ব্যক্তি, কর্ণরোগী, দন্তরোগী, নবজ্বরী, যক্ষ্মারোগী, কাসরোগী ও মূর্চ্ছারোগযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন কর্ত্তব্য নহে (২) এতদ্ব্য-

(১) দন্তানূর্দ্ধমধোঘৃষ্ট্বা জলসিক্তেচ্চ লোচনে। তোয়পূর্ণমুখস্তেন দৃষ্টিরাশু প্রসীদতি॥ (রাজবল্লভ।)—(২) অর্দ্দিতী ক-

তীত সুস্থ ও অপরবিধ পীড়াগ্রস্ত লোক-দিগের পক্ষে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করা প্রযুক্ত্য।

প্রাতঃক্রিয়ার আর একটি অঙ্গ জিহ্বা-মার্জ্জন। সুবর্ণ, রজত, তাম্র অথবা লৌহের দশাঙ্গুল পরিমিত সূক্ষ্ম অথচ কোমল মার্জ্জনীতে (জিব-ছোলাতে) জিহ্বা-মার্জ্জনে মুখের বিরসতা ও জিহ্বা ও দন্ত-ক্লেদ দূর হয়, এবং আরোগ্য, রুচি ও দন্তের সদ্যঃ বিশুদ্ধতা জন্মে (১)। জিহ্বা-মার্জ্জনীর দ্বারা জিহ্বামার্জ্জনের এই সকল গুণ থাকিতেও অনেকে উহা ব্যবহার করে না, সেটি কেবল আলস্যদোষে ঘটিয়া থাকে। আবার কেহ কেহ অনালস্য পরতন্ত্র হইয়া কেবল তর্জ্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয় মুখমধ্যে যুগপৎ প্রবেশ করাইয়া জিহ্বার উপর ঘন ঘন সঞ্চালন করিয়া থাকে। এ উভয়ই ভাল নহে। কারণ, একবারে জিহ্বামার্জ্জন না করিলে জিহ্বায় ক্রমে ক্রমে ক্লেদ জন্মিয়া জিহ্বাক্ষত হইবার সম্ভাবনা এবং অঙ্গুলি প্রবেশনে জিহ্বা মার্জ্জন করিলে কণ্ঠনালীর বিকৃততা ঘটিয়া উঠে।

প্রাতর্ভ্রমণ ও তদনন্তর মুখ, দন্ত, জিহ্বাদি ধাবনের পর প্রাতঃস্নান করা অতি বিধেয়। প্রাতঃস্নান করিলে যে দেহী মাত্রেরই স্বাস্থ্য অটুট ও পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহা প্রাচীন আর্য্য মনীষিগণ বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। প্রাতঃস্নায়ী ব্যক্তি পূর্ব্বদিক্ অরুণকিরণগ্রস্ত দেখিয়া প্রাতঃস্নান করিবে (২)। প্রতিদিবস প্রাতঃকালে সুস্থ ব্যক্তি দন্তধাবন করিয়া নদ্যাদিতে বা গৃহে স্নান করিবে (৩)। প্রাতঃস্নানে বিশেষরূপে স্বাস্থ্যরক্ষা হয় বলিয়া প্রাচীন ঋষিগণ ইহার মধ্যেও ধর্ম্মের দোহাই দিয়া গিয়াছেন (৪)। বাস্তবিক স্নান করিলে

...র্ণশূলী চ দন্তরোগী নবজ্বরী। শোষী কাসী চ মূর্চ্ছার্ত্তো দন্তকাষ্ঠং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ (রাজবল্লভ)।(১)জিহ্বানির্লেখনং রৌপ্যং সৌবর্ণং তাম্রমারসং। তন্মলাপহরং শস্তং মৃদুসূক্ষ্মং দশাঙ্গুলং ॥ নিহন্তি বক্তৃবৈরস্যং জিহ্বা-দন্তাশ্রিতং মলং। আরোগ্যং রুচি মাধত্তে সদ্যোদন্তবিশোধনং ॥ (রাজবল্লভ)—(২) প্রাতঃস্নায্যরুণকিরণগ্রস্তাং প্রাচীমবলোক্য স্নায়াৎ। (সমুদ্রকর)।—(৩) যথাহনি তথা প্রাতর্নিত্যং স্নায়াদনাতুরঃ। দন্তান্ প্রক্ষাল্য নদ্যাদৌ গেহে চেত্তদমন্ত্রবৎ ॥ (কাত্যায়ন)।—(৪) উষঃকালে তু সংপ্রাপ্তে কৃত্বা চাবশ্যকং বুধঃ। স্নায়ান্নদীষু শুদ্ধাসু শৌচং কৃত্বা যথাবিধি ॥ প্রাতঃস্নানেন পূয়ন্তে যেঽপি পাপকৃতো জনাঃ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন প্রাতঃস্নানং সমাচরেৎ ॥ প্রাতঃস্নানং প্রশংসন্তি দৃষ্টাদৃষ্টকরং হি তৎ। অলক্ষ্মীঃ কালকর্ণী চ দুঃস্বপ্নং দুর্বিচিন্তিতং ॥ প্রাতঃস্নানেন পাপানি ধূয়ন্তে নাত্র সংশয়ঃ। নচ স্নানং বিনা পুংসাং প্রাশস্ত্যং কর্ম্ম সংস্মৃতং ॥ হোমে জপ্যে বিশেষেণ তস্মাৎ স্নানং সমাচরেৎ। (গারুড় পুরাণ, ৫০ অধ্যায়।)—অপিচ—উষস্যুষসি যৎ স্নানং সন্ধ্যায়ামুদিতেরবৌ। প্রাজাপত্যেন ত-

শরীর পবিত্র হয়, অর্থাৎ ঘর্ম্ম, গাত্রমল প্রভৃতি দূষিত পদার্থ বিধৌত এবং শারীরিক বল প্রভৃতি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে (১)। অধিকন্তু লোমকূপ সমূহ পরিষ্কৃত হইয়া শোণিত বিশুদ্ধ হয়। সুতরাং স্বাস্থ্য বর্দ্ধনের পক্ষে স্নান অত্যন্ত হিতজনক। অনেকে সুবিধানুসারে দিবাভাগের মধ্যে যে কোন সময়ে স্নান করে, কিন্তু সেরূপ না করিয়া যদ্যপি প্রতিদিন প্রাতঃস্নানের কোন সুবিধা করিতে পারে, তাহা হইলে শারীরিক সুস্থতা বিষয়ে অধিকতর উপকারলাভ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্নান প্রধানতঃ দুই প্রকার। অবগাহন ও ঊর্দ্ধবর্ষণ। নদী, সরোবর প্রভৃতি জলাশয়ে বা বৃহৎ জলপূর্ণ পাত্রে সমুদয় শরীর মগ্ন করাইয়া প্রথম প্রকার ও পাত্রস্থ জল ঊর্দ্ধ হইতে মস্তকাদিতে ঢালিয়া দ্বিতীয় প্রকার স্নান হইয়াথাকে। এতদুভয়ের মধ্যে অবগাহন স্নানই প্রশস্ত ও অধিকতর হিতকর।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে প্রত্যহ স্নান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু অর্দ্দিতরোগী, নেত্ররোগী, কর্ণরোগী, অতিসাররোগী, আধ্মানরোগী, পীনসরোগী, অজীর্ণরোগী এবং ভুক্ত ব্যক্তির পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ (২)। এবংবিধ রোগীদিগের রোগ শমতা ও ভুক্ত ব্যক্তির আহার্য্য জীর্ণ হইলে স্নান করা বিধেয়। অনেকে পেট ফাঁপিলে তাড়াতাড়ি জলে নামিয়া ডুব দিতে থাকে, কিন্তু তদ্দ্বারা উপকারের বদলে অনিষ্ট ঘটিবার নিতান্ত সম্ভাবনা। বায়ু প্রকুপিত হইলেই পেট ফাঁপে, সুতরাং তখন উদরে তৈলমর্দ্দন করাই বিধেয় (৩)।

উল্লিখিত উভয়বিধ স্নানই শীতল (কাঁচা) ও উষ্ণ (পাকা) জলে সম্পন্ন হয়। তন্মধ্যে উষ্ণজলে অধঃকায়ের (মস্তক ব্যতীত দেহাংশের) পরিষেক করিলে বলহ্রাস হয়, কিন্তু মস্তকের পরিষেক করিলে কেশ ও চক্ষুঃসত্তা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আর শীতল জলে শিরঃস্নান অর্থাৎ অবগাহন স্নান করিলে তৃষ্ণা, তালু ও ওষ্ঠশোষ, মলা, উষ্ণব্রণ, গাত্রকণ্ডূ এবং পিত্তজন্য শিরোরোগ বিনষ্ট হয় (৪)।

তুল্যং মহাপাতকনাশনং ॥ যৎফলং দ্বাদশাব্দানি প্রাজাপত্যৈঃ কৃতৈর্ভবেৎ। প্রাতঃস্নায়ী তদাপ্নোতি বর্ষেণ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ॥ য ইচ্ছেদ্বিপুলান্ ভোগান্ চন্দ্রসূর্য্যগ্রহোপমান্। প্রাতঃস্নায়ী ভবেন্নিত্যং দ্বৌমাসৌ মাঘফাল্গুনৌ ॥ (গারুড়পুরাণ ২১৫ অধ্যায়)—(১) স্নানং পবিত্রমায়ুষ্যং শ্রমস্বেদমলাপহং। শরীরবলসন্ধানং কেশমার্জ্জকরং পরং ॥ (রাজবল্লভ।)—(২) স্নানমর্দ্দিতনেত্রাস্যকর্ণরোগাতিসারিষু। আধ্মানপীনসাজীর্ণভুক্তবৎসু চ গর্হিতং ॥ (আয়ুর্ব্বেদ।)—(৩) নাস্তি তৈলাৎ পরং কিঞ্চিদৌষধং মারুতাপহং। (রাজবল্লভ)—(৪) উষ্ণাম্বুনাধঃকায়স্য পরিষেকো বলাপহং। তেনৈবতূত্তমাঙ্গস্য বলকৃৎ কেশচক্ষুষোঃ ॥ বিনিহন্তি শিরঃস্নানং তৃষ্ণাতাল্বোষ্ঠশো-

প্রত্যহ যাহাদিগের প্রাতঃস্নান সহ্য হয় না এবং যাহারা অশক্ত ও পীড়িত, তাহাদিগের পক্ষে প্রাতরবগাহন স্নানের পরিবর্ত্তে আশিরস্কস্নান অর্থাৎ গাত্র প্রক্ষালন বা আর্দ্র গাত্র-মার্জ্জনী (গামোছা) দ্বারা শরীর পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য (১)।

প্রাতঃস্নানের অব্যবহিত পূর্ব্বে নিদান পক্ষে ১৫ মিনিটকাল উত্তমরূপে তৈলমর্দ্দন করা উচিত। লোমকূপ দিয়া শরীরাভ্যন্তরে তৈল প্রবিষ্ট হইলে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেকটা উপকার দর্শে। তৈলমর্দ্দনে শরীর কোমল, কফ ও বায়ুর শমতা, ধাতুপুষ্টি এবং কান্তিপ্রসন্নতা হয়। পায়ের তলায় তৈলমর্দ্দন করিলে নেত্রের উপকার দর্শিয়া নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে না। এবং পায়ের কোনপ্রকার পীড়া থাকিলে, তাহার শমতা হইয়া থাকে। কিন্তু কফরোগী, জীর্ণ রোগী ও বমনবিরেকাদি দ্বারা সংশুদ্ধ দেহীর তৈলমর্দ্দন কর্ত্তব্য নহে। তৈলমর্দ্দন করিয়া স্নান করিলে বল বৃদ্ধি হয় এবং লোমকূপ দিয়া শিরামুখযোগে নাড়ীতে তৈল প্রবিষ্ট হইলে শরীরের তৃপ্তিসাধন হইয়া থাকে। সর্ব্বদা তৈল দ্বারা মস্তক আর্দ্র রাখিলে শিরঃশূল, টাকপড়া প্রভৃতি মস্তকের পীড়া হয় না, এবং শীঘ্র কেশপক্ক ও কেশ পতন না হইয়া বরং ঘন, দৃঢ়, কৃষ্ণবর্ণ ও দীর্ঘ হয়। তৈলমর্দ্দনে মুখশ্রী বৃদ্ধি হয় এবং কর্ণে নিত্য তৈলপূরণ করিলে বায়ুজন্য কর্ণরোগ, বাধির্য্য অর্থাৎ উচ্চৈঃশ্রবণ প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে (২)। মর্দ্দনের পক্ষে তিল ও সরিষার তৈলই সুপ্রশস্ত। সার্ষপ তৈল কটু, উষ্ণবীর্য্য, এবং কফ, বায়ু, গাত্রকণ্ডূ ও ক্রিমিরোগনাশক; কিন্তু রক্তপিত্ত রোগে অহিতকারী ও শুক্রনাশক (৩)। তিলতৈল বয়ঃক্রমের স্থৈর্য্যকর, বায়ুনাশক, বস্তিকর্ম্মে অর্থাৎ পিচ্‌কারীতে, মর্দ্দনে,

---

ষণং ॥ মলোষ্ণপিড়কাকণ্ডূশিরোরোগাক্ষিপৈত্তিকান্। (রাজবল্লভ।)—(১) অশক্তাবশিরস্কং বা স্নানমস্য বিধীয়তে। আর্দ্রেণ বাসসা চার্থ মার্জনং কারিকং স্মৃতং ॥ (কূর্ম্মপুরাণ, উপ, ১৭ অঃ)—অপিচ—আশিরস্কং ভবেৎ স্নানং স্নানাশক্তৌ চ কর্ম্মিণাং। অদ্রেণ বাসসা বাপি মার্জ্জনং দৈহিকং বিদুঃ। (জাবাল)—(২) অভ্যঙ্গো মার্দ্দবকরঃ কফবাতবিনাশনঃ। ধাতূনাং পুষ্টিজননো মৃজাবর্ণপ্রসাদনঃ। পাদাভ্যঙ্গোঽথ নিদ্রাকৃচ্চক্ষুষঃ পাদরোগহা। বর্জ্জ্যোঽভ্যঙ্গঃ কফগ্রস্তকৃতসংশুদ্ধজীর্ণিভিঃ ॥ স্নেহোঽবগাহনে যুক্তঃ শরীরে বলমাচরেৎ ॥ শিরামুখৈ রোমকূপৈর্দ্ধমনীভিশ্চ তর্পয়েৎ। নিত্যং স্নেহার্দ্রশিরসঃ শিরঃশূলং ন জায়তে। ন খালিত্যং ন পালিত্যং ন কেশাঃ প্রপতন্তি চ॥ দৃঢ়মূলাশ্চ কৃষ্ণাশ্চ ভবন্তি চ ঘনায়তাঃ। ইন্দ্রিয়াণি প্রসীদন্তি শুষ্কং ভবতি চাননং ॥ কর্ণপ্রপুরণান্নিত্যং ন মন্যাহনুসংগ্রহঃ। নোচ্চৈঃ শ্রুতি র্ন বাধির্য্যং ন কর্ণে বাতজাকজঃ ॥ (রাজবল্লভ।)—(৩) কটূষ্ণং সার্ষপং তৈলং রক্তপিত্তপ্রদূষণং। কফশুক্রানিল-

নাসিকা ও কর্ণ প্রভৃতিতে সংপূরণে হিতকারী (১)। নিম্বতৈল তিক্তরস, ক্রিমি ও কুষ্ঠরোগ পর্য্যন্তেরও শমতাকারক (২)। কিন্তু স্নানার্থ মর্দ্দনের পক্ষে যাবতীয় তৈলাপেক্ষা তিল তৈলই অধিকতর প্রশস্ত (৩)।

স্নানকালে তৈলমর্দ্দনে যেমন উপকার লাভ হয়, সেইরূপ গাত্রমার্জ্জন ও গাত্রঘর্ষণ দ্বারাও অনেকটা উপকার হইয়া থাকে। গাত্রমার্জ্জনে দুর্গন্ধ, গাত্রের গুরুতা, চুলকনা, ছুলি, মলা, অরুচি, ঘর্ম্ম, ঘৃণা ইত্যাদি নষ্ট হয় (৪)। গাত্রের দুর্গন্ধ প্রভৃতি নষ্ট হইলেই ঘৃণা অপনোদিত হইয়া থাকে। স্নান কালে গাত্রমার্জ্জন ব্যতীত দিবসের মধ্যে আরও দুই তিনবার ঐরূপ করা আবশ্যক। গামোছা, তোয়ালে প্রভৃতি দ্বারা পুনঃ পুনঃ গাত্রমার্জ্জন করিলে লোমকূপ সমুহ আবদ্ধ থাকে, সুতরাং তন্মধ্য হইতে শরীরাভ্যন্তরস্থ ঘর্ম্ম প্রভৃতি দূষিত পদার্থের নির্গমন এবং বহিঃস্থ বিশুদ্ধ বায়ুর প্রবেশন হইয়া স্বাস্থ্যের উপকার সাধিত হয়।

উদ্বর্ত্তন অর্থাৎ গাত্রঘর্ষণ করিলে বাত, কফ, মেদরোগ ও বায়ু নষ্ট হয় এবং অঙ্গ সমূহের স্থৈর্য্য ও ত্বকের প্রসন্নতা হইয়া থাকে (৫)। হরিদ্রাদিতে গাত্রঘর্ষণ করিলে গাত্রচুলকনা, বিবর্ণতা ও রুক্ষতা নষ্ট হয় (৬)। এবং তিলের দ্বারাও এই সকল ক্রিয়া হইয়া থাকে (৭)। কিন্তু কথা এই যে, হরিদ্রার দাগ লাগিয়া বস্ত্র প্রভৃতি কুৎসিত হইয়া যায় এবং বর্ত্তমান সময়ে সভ্যতা সম্বন্ধেও হরিদ্রাঘর্ষণ ভদ্রসমাজে প্রচলিত নহে; সুতরাং তিলের দ্বারা মধ্যে মধ্যে উদ্বর্ত্তন কার্য্য সমাধা করা অনুপযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না।

প্রাতঃস্নানের পর প্রাচীন ঋষিগণ চন্দন প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য ও মৃত্তিকাদি দ্বারা তিলক ও দেহলেপনাদির বিধান দিয়া গিয়াছেন (৮) সুগন্ধি দ্রব্য লেপনে প্রীতি

হৃৎ কণ্ডূক্রিমিবিনাশনং॥ (রাজবল্লভ)—(১) তিলতৈলং বয়ঃ-স্থৈর্য্যকরং বাতঘ্নমুত্তমং। হিতং বস্ত্যভ্যঙ্গপানে-নস্যে কর্ণাক্ষিপূরণে॥ (ঐ।)—(২) নিম্বতৈলন্তু কুষ্ঠঘ্নং তিক্তং ক্রিমিহরং পরং। (ঐ।)—(৩) সর্ব্বেভ্যস্ত্বিহ তৈলেভ্যস্তিলতৈলং প্রশস্যতে। (রাজবল্লভ।)—(৪) দৌর্গন্ধ্যং গৌরবং কণ্ডূং কচ্ছুং মলমরোচকং। স্বেদং বীভৎসতাং হন্তি শরীরপরিমার্জ্জনং॥ (রাজবল্লভ)—(৫) উদ্বর্ত্তনং বাতহরং কফমেদোঽনিলাপহং। স্থিরীকরণমঙ্গানাং ত্বক্‌প্রসাদকরং পরং॥ (ঐ।)—(৬) উদ্বর্ত্তনং হরিদ্রাদ্যৈঃ কণ্ডূবৈবর্ণ্যরৌক্ষ্যজিৎ। (ঐ।)—(৭) তিলেনোদ্বর্ত্তনং কণ্ডূরৌক্ষ্যত্বগ্দোষনাশনং। (ঐ)

(৮) জাহ্নবীতীর সম্ভূতাং মৃদং মূর্দ্ধ্না বিভর্ত্তি যঃ। বিভর্ত্তি রূপং সোঽর্কস্য তমোনাশায় কেবলং॥ (ব্যাস)—গোমতীতীরসম্ভূতাং গোপীদেহ সমুদ্ভবাং। মৃদং মূর্দ্ধ্না বহেদ্‌যস্তু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ (শাতাতপ।)—ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং মৃদা কুর্য্যাৎ ত্রিপুণ্ড্রং ভস্মনা সদা। তিলকং বৈ দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ চন্দনেন যদৃচ্ছয়া॥ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং দ্বিজঃ

ও তেজোবৃদ্ধি হয় এবং ঘর্ম্ম, দুর্গন্ধ, তন্দ্রা, পাপ অর্থাৎ পীড়া, শ্রম ইত্যাদি বিলুপ্ত হইয়া যায় (১)। ফলকথা, দুর্গন্ধ নিবারণের পক্ষে সুগন্ধি দ্রব্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। কেহ কেহ বলেন মৃত্তিকাদ্বারা তাড়িৎ নষ্ট হইয়া থাকে। বোধ হয়, এই জন্যই বহিঃস্থ শরীরজ প্রয়োজনাতিরিক্ত তাড়িৎ নিবারণার্থ মৃত্তিকা তিলকাদি ধারণের বিধান প্রচারিত হইয়া থাকিবে। অধুনা আমাদের বঙ্গদেশে নব্যশ্রেণীর মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রবিষ্ট হওয়াতে চন্দন বা মৃত্তিকার তিলকাদি অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। যদিও পল্লিগ্রাম অঞ্চলে কোন কোন স্থলে ইহা দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু রাজধানী প্রভৃতি স্থানে একবারেই অদৃশ্য। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশে তিলক বা অনুলেপনের প্রচলন এখনও পূর্ব্বের ন্যায় বর্ত্তমান আছে। অস্মদ্দেশীয় নব্য শ্রেণীর মধ্যে আতর, গোলাপ, বিলাতি সুগন্ধি দ্রব্য এক্ষণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাও ভাল। যে কোন প্রকারেই হউক, সুগন্ধি দ্রব্য হইলেই চলিতে পারে।

প্রাতঃস্নানের পরেই যেন সম্পূর্ণরূপে আহার করা না হয়, কারণ, তৎকালে শিরাসমূহে দ্রুতবেগে রক্ত চালিত হইতে থাকে। স্নানের এক ঘণ্টা পরে ভোজন করা বিধেয়; কিন্তু স্নানের অব্যবহিত পরেই কিঞ্চিৎ জলযোগ করাও উপযুক্ত।

আমরা প্রাতরুত্থান ও প্রাতঃক্রিয়ার বিষয় বলিতে গিয়া শেষটিরই কথা অনেকটা বলিলাম। কিন্তু এক্ষণে প্রথমটির সম্বন্ধে আরও কিছু বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যে ব্যক্তি স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিতে ইচ্ছা করে, ঊষাকালে তাহার গাত্রোত্থান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু এক্ষণে বলিতেছি যে, যাহার ঐ উভয় এবং জ্ঞান ও প্রসিদ্ধি লাভ করিবার বাসনা থাকে সে অবশ্য সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করিবে। প্রাতরুত্থান ব্যতীত দীর্ঘজীবী ও প্রসিদ্ধ হওয়া অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। সুতরাং সাধারণের তাহাতে নির্ভর করা অদূরদর্শিতার কার্য্য। যাহাদিগের প্রাতরুত্থান অনভ্যস্ত তাহাদিগের স্বাস্থ্যের যেমন ক্ষতি হয়, সেইরূপ আবার প্রয়োজনীয় কর্ম্মেরও অনেকটা ব্যাঘাত ঘটে। এই জন্যই মহাত্মা ফ্রাঙ্কলিন্ বলিয়া গিয়াছেন যে, "যে ব্যক্তি বিলম্বে গাত্রোত্থান করে, তাহাকে স্বকার্য্য সাধনের জন্য সমস্ত দিবস অত্যন্ত দৌড়াদৌড়ি করিতে হয়, অথচ রাত্রি পর্য্যন্ত খাটিয়াও সম্পূর্ণরূপে সমাধা হয় না।" সুবিজ্ঞ ডীন সুইফ্‌ট বলেন যে, তিনি প্রাতরুত্থায়ী ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে সক্ষম ও মহৎ হইতে দেখেন

কুর্য্যাৎ ক্ষত্রিয়শ্চ ত্রিপুণ্ড্রকং। অর্দ্ধচন্দ্রঞ্চ বৈশ্যশ্চ বর্ত্তুলং শূদ্রযোনিজঃ॥ (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।)—(১) প্রীতিতেজকরং বৃষ্যং স্বেদদৌর্গন্ধ্যনাশনং। তন্দ্রাপাপোপশমনং শ্রমঘ্নমনুলেপনং॥ (রাজবল্লভ।)

নাই। পণ্ডিতবর বক্‌ন্‌ সাহেব তাঁহার গ্রন্থ রচনা সম্বন্ধে বলেন যে, তিনি প্রথমাবস্থায় অত্যন্ত নিদ্রাপ্রিয় ছিলেন, সুতরাং তদীয় বহুমূল্য সময় অনেকটা বৃথা নষ্ট হইয়া যাইত। এই জন্য তিনি তাঁহার জোজেফ্‌ নামক একজন ভৃত্যকে আজ্ঞা করেন যে,সে যেন প্রত্যহ তাঁহাকে সূর্য্যোদয়ের পুর্ব্বে উঠাইয়া দেয়, তাহা হইলে তিনি তাহাকে একটি করিয়া ক্রাউন্‌ মুদ্রা প্রদান করিবেন। জোজেফ্‌ তদনুসারে তাঁহাকে ভোরে জাগাইতে গেল, কিন্তু তিনি এতদূর পর্য্যন্ত প্রাতর্নিদ্রার বশীভূত হইয়াছিলেন যে, কর্ত্তব্যকর্ম্মপরায়ণ ভৃত্যের আহ্বানে ভগ্ননিদ্র হইয়া মারিতে উদ্যত হইলেন। ভৃত্য পলায়ন করিল। তদনন্তর তিনি অভ্যাসানুসারে ১০।১১ টার সময়ে উঠিয়া জড়ভরতের ন্যায় হইয়া রহিলেন। পুনর্ব্বার তিনি জোজেফ্‌কে জাগাইতে আদেশ করিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, আমি যদি সে সময়ে তোমাকে গালি দিই বা মারিতে যাই, সে আমার দোষ, তোমার নহে। কিন্তু জোজেফ্‌ ক্রাউন লাভের আশা পরিত্যাগ করিও না, আর আমারও স্বাস্থ্য ও উন্নতির উপায় যেন তোমার হৃদয়ে প্রতিনিয়ত জাগরিত থাকে। কএক দিনের পর জোজেফ্‌ কৃতকার্য্য হইল— দ্বিপ্রহরোত্থায়ী বক্‌ন্‌ সাহেবও প্রাতরুত্থায়ী হইলেন। তিনি একদা বলিয়া ছিলেন যে, "আমি যতগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছি, তন্মধ্যে ১০। ১২ খানির জন্য মদীয় পরম হিতৈষী জোজেফের নিকট চিরজীবন ঋণী থাকিলাম।" বাস্তবিক, প্রাতরুত্থানবশতঃই উল্লিখিত পণ্ডিত একজন উচ্চ শ্রেণীর গ্রন্থকার হইয়া গিয়াছেন। প্রাতরুত্থান বশতঃই গ্রন্থ সম্বন্ধে তিনি সকলের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। যিনি একজন উৎকৃষ্ট গ্রন্থকার হইতে ইচ্ছা করেন, বক্‌ন্‌ সাহেবকে তাঁহার সর্ব্বদা স্মরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

প্রুসিয়াধিপতি দ্বিতীয় ফ্রেডরিক প্রত্যহ রাত্রি ৪টার সময়ে গাত্রোত্থান্‌ করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্য ও ভ্রমণ করিতেন। অনেকেই রুসিয়াধিপতি পিটার দি গ্রেটকে অবগত আছেন। ঐ মহাত্মা যখন লণ্ডন নগরস্থ একটা ডকে পোত-সূত্রধরের কার্য্য করিতেন, যখন কামারের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং অবশেষে যখন রুসীয়রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন, সকল সময়েই তিনি ঊষাকালে শয্যা পরিত্যাগ করিতেন। তিনি বলিতেন যে, 'আমি আমার জীবনকে দীর্ঘকাল স্থায়ী করিবার জন্য যতদূর পারি নিদ্রাকে অল্প সময় প্রদান করিয়া থাকি।'

প্রাতরুত্থান সম্বন্ধে ডড্‌রিজ্‌ সাহেব বলেন যে, 'প্রত্যহ প্রাতঃকালে ৫টা হইতে ৭টার মধ্যে গাত্রোত্থান করিয়া আমি নিউটেষ্টামেণ্টের টীকা ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রণয়ণ করিয়াছি। প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে নিদ্রা গিয়া প্রাতঃকালে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে শয্যাত্যাগ করিলে ৪০ বৎসরের

মধ্যে প্রায় ১০ বৎসরের সময় পাওয়া যায়। সুতরাং ঐ ১০ বৎসরে জীবনের অনেক উন্নতি হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ কি ? একজন সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ গ্রন্থকারকে কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, ‘মহাশয় আপনি প্রত্যহ বেলা ১০টা হইতে সমস্ত দিন আমোদ আহ্লাদে অতিবাহিত করিয়া থাকেন, কিন্তু এত পুস্তক কিরূপে রচনা করিলেন ?’ তিনি তদুত্তরে বলেন যে, ‘আমি প্রত্যহ রাত্রি শেষে ৩টার সময় গাত্রোত্থান করিয়া সকাল পর্য্যন্ত লিখিয়া থাকি’।

বিদ্যাধ্যায়ী ছাত্রগণের পক্ষে প্রাতরুত্থান সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। অধিক রাত্রি জাগিয়া পাঠাভ্যাস কখনই কর্ত্তব্য নহে। একেত অধ্যয়ন কেবল মানসিক পরিশ্রম, তাহাতে আবার অধিক রাত্রিজাগরণ করিলে যে, কি পর্য্যন্ত বিষময় ফলোৎপাদন হয়, তাহা চিকিৎসকমাত্রেই বিশেষরূপে অবগত হইয়া এবিষয়ে সতর্ক হইতে আদেশ দিয়া থাকেন। রাত্রি ৯টা হইতে দশটার মধ্যে ছাত্রদিগের শয়ন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ৬। ৭ ঘণ্টা কাল নিদ্রার পর ভোরে ৪। ৫ টার সময় গাত্রোত্থান করিবার সুবিধা হইতে পারে। দীর্ঘকাল বিশ্রামের পর শরীর ও মন প্রকৃতিস্থ থাকে, সুতরাং প্রাতঃকালে অধ্যয়ন কার্য্য সুন্দররূপে সম্পাদিত হইবে,তাহাতে সন্দেহ কি ? বিশেষতঃ স্বাস্থ্যেরও ব্যাঘাত ঘটিবে না। রাত্রি শয়নের জন্য, জাগিবার নিমিত্ত নহে—প্রাতঃকাল জাগরিত হইবার জন্য, নিদ্রার নিমিত্ত নহে। সুতরাং দীর্ঘকাল রাত্রি জাগিয়া ও দীর্ঘকাল নিদ্রিত থাকিয়া স্বভাবের নিয়মভঙ্গ করা অতি গর্হিত কার্য্য। মনকে নিরতিশয় পীড়িত করিয়া, রাত্রি জাগিয়া অধিক বিদ্যোপার্জ্জনের অপেক্ষা স্বাভাবিক নিয়মানুসারে চলিয়া অপেক্ষাকৃত কম বিদ্যা হয়, তাহাও ভাল। কিন্তু স্বাস্থ্যের প্রতি সর্ব্বপ্রযত্নে দৃষ্টি না রাখা নিতান্ত মন্দ। ডাক্তার পেরিস্ সাহেব বলেন, মনকে বিদ্যাভারে অতিমাত্র ভারি করিয়া শরীরকে দুর্ব্বল করা অপেক্ষা অল্প পরিমাণে মনোবৃত্তির চালনা করিয়া হার্‌ক্যুলিসের ন্যায় শরীরকে বলিষ্ঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

যে ব্যক্তি স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রাতরুত্থান করিবার ইচ্ছা করে, তাহাকে দিবা নিদ্রা ও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রাত্রিজাগরণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। দিবসে নিদ্রা গেলে রাত্রিকালে শীঘ্র নিদ্রা আসে না এবং অধিকক্ষণ রাত্রিকালে জাগিয়া থাকিলে শেষ রাত্রিতে নিদ্রার অত্যন্ত সমাবেশ হয়, সুতরাং প্রাতরুত্থানের কিছুই সুবিধা থাকে না। প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে রাত্রির প্রথমভাগেই শয়ন করা কর্ত্তব্য। তাহতে চক্ষুঃ বা স্বাস্থ্যের কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটে না। ডাক্তার ভুইট্ তদীয় ছাত্রগণকে বলিতেন যে, রাত্রির প্রথমভাগে এক ঘণ্টা

কাল নিদ্রিত থাকিলে যতটা উপকার দর্শে, উহার অন্তিমে দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত শুইয়া থাকিলে তদ্রূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। বাস্তবিক, উক্ত ডাক্তারের উপদেশ বহুমূল্য। ডুইটের মতানুসারে আমাদিগেরও চিকিৎসা শাস্ত্রে এইরূপ উপদেশ দেখা যায়। যথাযোগ্যকালে নিদ্রা সেবনে ধাতুর সমতা,তন্দ্রানাশ,শরীরের পুষ্টি,বর্ণ,বল, উৎসাহ ও অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে (১)।

ইহা অতিমাত্র বিশ্বাসযোগ্য যে, যে ব্যক্তি বাল্যকাল হইতে নিয়মিতরূপে প্রাতরুত্থান ও প্রাতঃক্রিয়া অভ্যাস করে, সে দীর্ঘজীবী, কর্ম্মঠ ও গুণান্বিত হয় এবং তাহার জীবনকাল শান্তি ও আনন্দে অতিবাহিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার বিপরীতাচরণে প্রায়ই বিপরীত ফল উৎপন্ন হয়। জীবনের ন্যায় শয্যাও নিদ্রাকে অতিশয় প্রিয়জ্ঞান করা নিতান্ত ভ্রান্ত ও অবৈধ কার্য্য। কিন্তু জীবন সহচর প্রাতরুত্থানকে জীবনের সহিত অভিন্ন জ্ঞান করা অবশ্য করণীয়, ইহা যেন ব্যক্তিমাত্রেরই মনে জাগরিত থাকে।

শ্রীরাজ—

(১) নিদ্রোপযুক্তকালে চ ধাতুসাম্যমতন্দ্রিতাং। পুষ্টিবর্ণবলোৎসাহমগ্নিদীপ্তিং করোতি চ ॥ (রাজবল্লভ।)

বঙ্গদর্শনের বিদায়।

সংসারে অধিকাংশ মনুষ্যই প্ররোচনার দাস, প্রবৃত্তির ক্রীড়াসামগ্রী, এবং সুখের প্রত্যাশী। যে বস্তুতে যে পরিমাণ প্ররোচনা, প্রবর্ত্তনা ও সুখের প্রত্যাশা, সেই বস্তুতেই সেই পরিমাণে তাহার প্রীতি; এবং সেই বস্তুর বিয়োগ কি বিচ্ছেদেই সেই পরিমাণে তাহার দুঃখ। বঙ্গদর্শনের আকস্মিক বিয়োগ এবং বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজের বর্ত্তমান দুঃখধ্বনিও এই কথাই প্রমাণ করিতেছে। বাঙ্গালি বঙ্গদর্শনে সুখী ছিল ; বঙ্গদর্শনের বিয়োগ অথবা বিচ্ছেদ তাহার নিকট দুঃখপ্রদ এবং অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

বঙ্গদেশীয় পুরুষদিগের মধ্যে যাঁহারা অর্দ্ধ-অবলা,—যাঁহারা স্বভাবতঃ চিন্তায় অসমর্থ, এবং শিক্ষার ন্যূনতাদি কারণে চিন্তার উদ্দীপক বিষয় মাত্রেই সুতরাং বিরক্ত, এই চারি বৎসর কাল একমাত্র বঙ্গদর্শনই মৃদু মদিরার ন্যায় তাঁহাদিগের অবলম্ব ছিল। বঙ্গদর্শন দার্শনিক তত্ত্বের গূঢ় সংবাদ লইয়া কিরূপ ব্যায়াম করিতেন, তাহা তাঁহারা ভাবিতেন না; বঙ্গদর্শন ভবভূতি প্রভৃতি কবির কাব্য সমালোচনপ্রসঙ্গে কিরূপ পাণ্ডিত্য, স্বাদগ্রাহিতা ও মনস্বিতা প্রদর্শন করিতেন, তাহা তাঁহারা

গণনায় আনিতেন না; বঙ্গদর্শন সূর্য্যমুখী ও প্রতাপ প্রভৃতির অতিমানুষ-সৌন্দর্য্যময় অপূর্ব্ব চিত্র সকল আঁকিতে গিয়া কিরূপ কবিত্ব, নৈপুণ্য, এবং কল্পনার কিরূপ লীল খেলা দেখাইতেন, তাহা তাঁহারা দেখিতে চাহিতেন না। কিন্তু বঙ্গদর্শনে ললিতলবঙ্গলতা, কুন্দনন্দিনী ও শৈবলিনী প্রভৃতি কামিনীর যে কাহিনী টুকু থাকিত, তাহাতেই তাঁহারা পরিতৃপ্ত রহিতেন। সুকুমারমতি বালক বালিকারা ধাত্রীমাতার চতুঃপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া যেরূপ তৃষিত কর্ণে রাজকন্যা ও মন্ত্রিকন্যার কাহিনী শুনে, তাঁহারাও বঙ্গদর্শনের চতুঃপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া শুধু সেইরূপ কাহিনী শুনিতেন। কাহিনীর পর পর ঘটনা অবগত হওয়ার জন্য তাঁহারা যথার্থই আকুল হইয়া থাকিতেন, এবং কাহিনী শুনিয়াই এই কণ্টকময় পৃথিবীর সকল দুঃখ যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইতেন। যে বার বঙ্গদর্শনে কোন কাহিনী না থাকিত, সেবার তাঁহাদিগের ক্রোধ, ক্ষোভ ও মনস্তাপের আর সীমা থাকিত না। বনের পশু পক্ষী, তরু লতাও তখন তাঁহাদিগের বিষাদে বিষণ্ণ হইত।

বঙ্গদেশে যাঁহারা 'রসিক' বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ,—যাঁহারা অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেই রসিক হইয়া বসেন, ছাত্রমহলে কেবলই রসের কথা কহেন, এবং গ্রাম্য জমিদারের বিলাসভবনে; বিবাহের সভায়, বাসরঘরে, যাত্রার আসরে এবং নূতন গ্রন্থকারমণ্ডলে নিরবচ্ছিন্ন রসতরঙ্গেই তরঙ্গায়িত রহেন, বঙ্গদর্শনে তাঁহাদিগেরও একমাত্র উপজীব্য ছিল। উহাতে বিজ্ঞানরহস্যের মাথামুণ্ড যাহা থাকিত, তাহা তাঁহাদিগের চক্ষে বিষের ন্যায় লাগিত। উহাতে উচ্চ অঙ্গের যে সমস্ত কবিতা প্রকটিত হইত, তাহা তাঁহাদিগকে ভয়ানক কষ্ট দিত। উহাতে চরিত্রবর্ণনচ্ছলে মানবহৃদয়ের যে সকল গভীরতত্ত্ব আলোচিত হইত, তাহা তাঁহাদিগের যতদূর সম্ভব বিরক্তি জন্মাইত। কিন্তু উহার নবীনা ও প্রাচীনার কথা, আলবালা সুন্দরী কি অলক্তরাগরঞ্জিত চরণের বর্ণনা, ইন্দিরার পরিহাস-রসিকতা, বানরের কল্যাণে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া এবং 'ঢাল ব্রাণ্ডি ঢাল' এইরূপ ব্যঙ্গগর্ভ দুই একটি লহরীই তাঁহাদিগের সকল তৃষ্ণা পূর্ণ করিত। তাঁহারা দিনান্তে একবার

"আয়রে চাঁদের কোণা
তোরে খেতে দিব ফুলের মধু,
পরতে দিব সোনা"

অথবা—

'আমার মরম কথা তাই লো তাই'

এইরূপ কতিপয় পংক্তি পাঠ করিতে পাইলেই চরিতার্থ হইতেন।—নিবিড়জলদাচ্ছন্ন নভোমণ্ডলে বিদ্যুতের ক্ষণিক প্রভার ন্যায় কদাচিৎ কখনও চটুলনয়না হীরা কি বচনচতুরা হরিদাসী বৈষ্ণবীর ক্ষণিক দর্শন পাইলেই তাঁহারা হরিনামভক্ত বৈষ্ণবের ন্যায় ঢলিয়া পড়িতেন। অপিচ, যাঁহারা পণ্ডিত, যাঁহারা সুশিক্ষিত, সুরুচিসম্পন্ন, যাঁ-

ছারা কাব্যে সৌন্দর্য্যপ্রিয়, কথায় রসগ্রাহী, এবং যাঁহারা স্বাভাবিক ও শিক্ষালব্ধ সামর্থ্যে চিন্তাজনিত ক্লেশে অকাতর, বঙ্গদর্শন তাঁহাদিগেরও একান্ত আদরের পাত্র, উহা তাঁহাদিগেরও সহায়, সুহৃৎ ও অপরিহার্য্য সহচর ছিল। এই সমুদয়শ্রেণির বাঙ্গালিই বঙ্গদর্শনের বিয়োগে হৃদয়ে আঘাত পাইয়াছেন,— প্রিয়বিয়োগদুঃখ অনুভব করিতেছেন।

বঙ্গদর্শনের বিলোপ বান্ধবের নিকট উল্লিখিত সমস্ত কারণের অতিরিক্ত আর এক কারণে বিশেষ দুঃখজনক। আমরা সেই দুঃখেই প্রকৃত মর্ম্মাহত হইয়াছি। যদি শুধু উপন্যাস পড়াই উদ্দেশ্য হয়, তাহা বাঙ্গালায় পড়িলেও চলে, ইংরেজীতে পড়িলেও চলে। বরং ইংরেজীতেই সে আকাঙ্ক্ষার অধিকতর সন্তর্পণ হয়। ইংরেজী গ্রন্থালয়ে যে সকল রসপরিপূর্ণ উপাদেয় উপন্যাস স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে, শতাব্দীর এক চতুর্থভাগেও তাহা পড়িয়া শেষ করা যায় না। যাঁহার যেমন রুচি, ইংরেজী উপন্যাসে তাহাই তিনি প্রাপ্ত হইবেন। যিনি প্রীতির প্রশস্তক্ষেত্র এবং শোভার অনন্তবিস্তার চাহেন, পুরুষকারের নয়নাভিরাম গাম্ভীর্য্য দেখিতে ভালবাসেন, তিনি স্কটের গিরিকন্দরশোভিত, নির্ঝরবারিসিক্ত কল্পকাননে প্রবিষ্ট হইলেই স্নিগ্ধ হইবেন; আর, যিনি মেঘাবৃতচন্দ্রমার বিষাদময় সৌন্দর্য্য দেখিয়া সুখী হন, অথবা যিনি আলোকমিশ্রিত অন্ধকারেই অধিকতর আনন্দলাভ করেন, তিনি বুলওয়ার লিটনের ধ্যাননিলয়ে প্রবেশ করিলেই পরমা তৃপ্তি লাভ করিবেন। সমাজে ও মনুষ্য প্রকৃতিতে যাহা কিছু উপহসনীয়, তিল তিল করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গীন বর্ণনে অথচ সাধারণতঃ দয়া ও মহানুভাবতার পুষ্টিসাধনে,—যাহা সর্ব্বত্র উপেক্ষিত, তাহাতেও আদরের বস্তু প্রদর্শনে ডিকেন্সের তুলনা কোথায়? আবার, সমাজে পাপের যে প্রবল প্রবাহ চলিতেছে, মনুষ্যপ্রকৃতিতে ভোগতৃষ্ণা যেরূপ তর তর ধারে বহিতেছে, তাহার উদ্দীপক ও যুবজনমাদক অতিবর্ণনেও কে কলঙ্কভয়শূন্য রেনল্ডের সমকক্ষ হইবে? বিজ্ঞান ও দর্শনাদিশাস্ত্র শিক্ষার জন্যও ইংরেজী প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষার পুস্তকনিচয় যেরূপ সাহায্য দান করিতে পারে, বঙ্গীয় কোন পুস্তকেই তাহা প্রত্যাশা করিতে পারি না। সরোবরের স্বচ্ছসলিল পরিত্যাগ করিয়া কূপোদকে তৃষ্ণা পূরণ করিতে ইচ্ছা হয় না; এবং বেকন, কোমত, মিল, বেন্থাম, বকল, ও স্পেন্সার প্রভৃতি অগাধসত্ত্ব সুধী জনের সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালির অপূর্ণবিকসিত প্রতিবিম্বিত চিন্তার আশ্রয় লইতেও প্রবৃত্তি যায় না। যদি কাব্যের কথা বল, তবে কি কারণে শেক্সপীর কি বায়রণ, মিল্টন কি ড্রাইডন ছাড়িয়া বাঙ্গালার নকলের নকল তরল কবিতা লইয়া সময়াতিপাত করিব, বল। কেহ ইচ্ছা করিলে,

ইংলণ্ডীয় কাব্যকুঞ্জে সমস্ত জীবনও সুখে যাপন করিতে পারেন। কিন্তু ইহার কিছুই বাঙ্গালা নহে,—মেঘনাদবধ প্রভৃতি কাব্য, কিংবা বহুরসের প্রস্রবণ বঙ্গদর্শনের ন্যায় ইহার কিছুই বাঙ্গালির নিজস্ব নহে। বাঙ্গালির জন্য বাঙ্গালায় যে সুখ, বাঙ্গালায় যে সম্মান, এবং বাঙ্গালায় যে স্বার্থ, সামর্থ্য, ও গৌরব, জগতে আর কিছুতেই কি তাহা সম্ভবে?

আমরা ইহা ভূয়োভূয়ঃ প্রকাশ করিয়াছি,—আমাদিগের কণ্ঠধ্বনি যতদূর উচ্চে উঠিতে পারে, সেই স্থলে উঠিয়া আমরা ইহা তারস্বরে বলিয়াছি যে, বঙ্গভাষা আমাদিগের প্রাণস্বরূপ অথবা প্রাণাধিক প্রিয়তর। আমরা উহাকে যার পর নাই ভালবাসি; উহার উন্নতি দেখিয়া আনন্দে অধীর হই, উহার হীনাবস্থা ও অধোগতি দেখিলে দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ি। আমাদিগের এইরূপ বিশ্বাস যে, বাঙ্গালির কখনও যদি নিদ্রাভঙ্গ হয়, যদি কখনও শক্তির অগ্নিময়স্পর্শে বাঙ্গালির মৃৎপিণ্ড সদৃশ নিস্তেজ হৃদয় চৈতন্যলাভ করে, বঙ্গভাষার শক্তিলাভই তাহার কারণ হইবে। কোট হ্যাট যাহা করে নাই, পরপাদুকালেহনে যাহা হয় নাই, পরকীয় ছন্দানুবর্ত্তনে যাহা ফলে নাই, বঙ্গভাষার বিকাশ ও সামর্থ্যসঞ্চয়েই তাহা সম্পন্ন হইয়া আসিবে; এবং যেমন রক্তসঞ্চারে বলসঞ্চার, তেমন জাতীয় হৃদয়ে ভাষাপথে তেজঃসঞ্চারেই এই মৃতপ্রায় জাতি পুনরায় দৃঢ়, বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ হইয়া মনুষ্যালোকে মনুষ্যের ন্যায় উত্থান করিবে।

ঐ যে নব্য বাবু, দুঃখিনীর সন্তান, আজি পরিচ্ছদপরিবর্ত্তেই আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া দ্বিতীয় বাসব হইয়া বসিয়াছেন,—স্বদেশ ও স্বজাতির সম্পর্ক পর্য্যন্তও ভুলিয়া গিয়াছেন, স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভাষাকে ঘৃণিত দাসী জ্ঞানে পায়ে ঠেলিয়াছেন, উঁহার নিকট আমাদের প্রত্যাশা নাই। ঐ যে পদগৌরবান্ধ নূতন সভ্য, ঐ যে ক্ষুদ্রপ্রাণ মহামতি পরের উচ্ছিষ্টে প্রতিপালিত, পরপ্রসাদে হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া আপনার জাতীয় চিহ্ন অপসারণের জন্য একটুকু একটুকু করিয়া যত্ন করিতেছেন,—জাতীয় ভাষার প্রিয়বন্ধন ছেদন করিতে পারিলেই আহ্লাদে অবশ হইতেছেন, উহাঁর নিকটও আমাদিগের ভরসা নাই। আমাদিগের ভরসাস্থল স্বদেশপ্রিয় সহৃদয় বাঙ্গালি, আমাদিগের আশা বঙ্গভাষার ভাবি সম্পদে। যে কোন ব্যক্তি বাঙ্গালার উন্নতি ও ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য কায়মনোবাক্যে যত্ন করিবেন, তাঁহাকেই আমরা শ্রদ্ধা করিব,—যে কোন সদ্‌গুণান্বিত সৌভাগ্যবান্ লোক বঙ্গভাষাকে নানা উপচারে পূজা করিবেন, নানা আভরণে সাজাইয়া তুলিবেন, তাঁহাকেই আমরা হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা উপহার দিব।

বঙ্গদর্শন এই চারি বৎসরকাল বঙ্গভাষার পূজা রূপ পবিত্র উৎসবে অকাতরপ্রাণে পরিশ্রম করিয়াছে;—আর, যদি আমরা

নিতান্ত অন্ধ না হই, বঙ্গভাষার বৈভববিস্তারেও বহুল অংশে কৃতকার্য্য হইয়াছে। মধুসূদন যেমন দেবী বঙ্গভারতীকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের নিগড় হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়াছিলেন, বঙ্গদর্শনও ভাষাকে কতকগুলি কুসংস্কারের নিগড় হইতে নির্ম্মোচন করিবার জন্য সেইরূপ অশেষ প্রয়াস পাইয়াছে, এবং বস্তুতঃ তদর্থ বীরের মত অশেষ অত্যাচারও সহিয়াছে। এই হেতুতেই আমরা উহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে চিরবদ্ধ, এবং এই হেতুতেই আজি উহার তিরোধানে আমরা এইরূপ তীব্র দুঃখে দুঃখিত। বঙ্গদর্শনে আমরা বাঙ্গালার চল সৌন্দর্য্য, লীলাচাতুর্য্য, আবেগ, উচ্ছ্বাস ও সজীবতা দেখিয়াছি। ইহা কেমনে শীঘ্র বিস্মৃত হইব ? উহা আমাদিগের কর্ণে কখনও নিশীথে বংশীধ্বনির ন্যায় মধুধারা ঢালিয়া দিয়াছে, কখনও বীণার মৃদুস্বর ঝঙ্কারে হৃদয় মন উন্মাদিত করিয়া তুলিয়াছে। ইহা কিরূপে ভুলিতে পারিব ?

আমরা আশা করি, বঙ্গদর্শন শীঘ্রই আবার অন্য কোন মুর্ত্তিতে পুনর্জ্জীবিত হইবে, এবং যিনি উহার প্রাণ ও প্রতিপত্তি ছিলেন,আর যাঁহাদিগের পরিশ্রমে উহার এত গৌরব বাড়িয়াছিল, তাঁহরা সকলে মিলিয়া পুনরায় বঙ্গভাষার অধিকার ও বৈভববিস্তারে যত্নপর হইবেন। বাঙ্গালার আজিও সাহিত্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, আজিও শিক্ষাভিমানী বাঙ্গালির সহিত বাঙ্গালার দৃঢ় সম্বন্ধ জন্মে নাই, আজি পর্য্যন্তও বাঙ্গালার অভাব ও প্রভাবের সীমারেখা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। যে পর্য্যন্ত না এ সমস্ত গুরুতর কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, সে পর্য্যন্ত আমরা বঙ্গদর্শনের মত প্রতিভান্বিত সহায়কে বিদায় দিতে সমর্থ হইব না। আমরা সকল সহিতে পারি, সর্ব্বপ্রকার নিগ্রহ ও লাঞ্ছনা অক্ষুব্ধহৃদয়ে ভোগ করিতে পারি ; কিন্তু জননী, জন্মভূমি, এবং জন্মভাষার কাতর মুর্ত্তি ও হীন দশা চক্ষে দেখিতে পারি না। পৃথিবীতে কোন্ ভূমি বঙ্গভূমির ন্যায় শ্যামল শোভাশালিনী, স্বজনপরিপালিনী ও নদ নদীর স্বাভাবিক সম্পদে উদারতার প্রতিমুর্ত্তিরূপিণী ? কিন্তু বাঙ্গালির আলস্য ও অনাদরে উহার কি অবস্থা ঘটিয়াছে ! পৃথিবীতে কোন্ ভাষা বঙ্গভাষার ন্যায় হৃদয়স্পর্শিনী, অমৃতবর্ষিণী এবং আমাদিগের সন্তাপহারিনী ? কিন্তু আত্মাদরশূন্য প্রাণহীন বাঙ্গালির উপেক্ষা ও অবমাননায়, —যাঁহারা ধন-বৈভব-সম্পন্ন, তাঁহাদিগের মোহমহিমায়, যাঁহারা বিষয়রত, গণনাতৎপর, তাঁহাদিগের মদান্ধতায়, এবং যাঁহারা শিক্ষিত ও শক্তিসামর্থ্যযুক্ত তাঁহাদিগের নির্লজ্জ উদাসীনতায় উহার মুখশ্রী কিরূপ মলিন রহিয়াছে !

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। মানসরঞ্জিনী। প্রথমভাগ।—শ্রীযুক্ত বাবু প্রমদাচরণ সেন-প্রযত্নে প্রকাশিত।

২। কুসুমকলিকা। শ্রীপ্রসন্নকুমার ঘোষ প্রণীত।

যেরূপ কবিতা পাঠমাত্রেই একবারে হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে গিয়া স্পৃষ্ট হয়, এ দুখানিতে সেইরূপ কবিতা নাই, এবং যেরূপ ছন্দের গাঁথনি ও পদাবলীতে ভাষা হেলিয়া দুলিয়া নৃত্য করেন এদুখানির ছন্দোবন্ধনেও তেমন বৈচিত্র্য নাই। কিন্তু এই উভয় পুস্তকই সুখপাঠ্য। মানসরঞ্জিনী অপেক্ষাকৃত গাঢ়, কুসুমকলিকা অপেক্ষাকৃত মধুর ও মনোমদ। উভয় গ্রন্থেই প্রশংসার অনেক কথা আছে। মানসরঞ্জিনী-প্রণেতা করুণরসে অধিক কৃতকার্য্য হইবেন, এবং বোধ হয় প্রসন্ন বাবু ক্রোধ, বিদ্বেষ ও অভিমান প্রভৃতি মানসিক ভাবের উদ্দীপনে অধিকতর যশোলাভ করিবেন। পাঠকসমাজে এই নূতন লেখকদ্বয়ের আদর হওয়া উচিত।

৩। কবিতা-কলাপ। প্রথমভাগ।—শ্রীরামলাল চক্রবর্ত্তী বিরচিত।

৪। পদ্য-প্রসূন। প্রথমভাগ।—শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র সোম প্রণীত।

৫। কবিতাকুসুমাঙ্কুর। প্রথমভাগ।—শ্রীময়ন্ উদ্দীন আহাম্মদ এবং শ্রীরামনারায়ণ দাস কর্ত্তৃক বিরচিত।

এই তিনখানি পদ্যপাঠ শিশুদিগের জন্য লিখিত হইয়াছে। দোষ গুণ তিনখানিতেই প্রায় সমান। কবিতাকলাপ নিতান্ত নিম্ন শ্রেণীর বালকদিগের উপযোগী হইবে না। যাহারা শিশুশিক্ষা তৃতীয়ভাগ পর্য্যন্ত পড়িয়াছে, তাহাদিগের ইহা উপকারী হইতে পারে। ইহার লেখক সরস পদ্য রচনায় ক্ষমতাশূন্য নহেন। পদ্য-প্রসূনের দুই একটি পংক্তি যেমন সরল, তেমন সদর্থযুক্ত। 'পার কি না পার ফিরে দেখ আর বার' এই কবিতাটি বালকদিগের কণ্ঠস্থ করান কর্ত্তব্য।

৬। মণিহারা ফণী ভারতজননী। পদ্য। শ্রীপার্ব্বতীনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

৭। ভারতবন্দিনী। রূপক। শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা প্রণীত।

সকলেই যে কাঁদিতে পারে, এমন নহে। কাঁদিবারও ক্ষমতা চাই। পার্ব্বতী বাবুর কাঁদিবার একটুকু ক্ষমতা আছে। কিন্তু তিনি তাঁহার গ্রন্থের নামকরণে বড় ঠকিয়াছেন। মণিহারা ফণী বলিলেই গোবিন্দ অধিকারীর কীর্ত্তন এবং ব্রজের বিরহবিধুরা রাধার কথা মনে আসে, ভারতের কথা মনে আসে না। তাঁহার পুস্তক ভারতবন্দিনী অপেক্ষা অনেক গুণে উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ভারতবন্দিনীতে স্থানে

স্থানে শব্দের আস্ফালন আছে; কোথাও কিঞ্চিৎ পারিপাট্যও আছে। কিন্তু পারিপাট্য অপেক্ষা আস্ফালন অধিক।

৮। সটীক পাঁচালি। প্রথমখণ্ড। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত।—গ্রন্থকার দাশরথির মন্ত্রশিষ্য। কিন্তু গুরু শিষ্যে অনেক অন্তর। এখনকার ভদ্রলোকেরা দাশুরায়ের পাঁচালিতেই যার পর নাই বিরক্ত;—গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পাঁচালি তাঁহাদিগের নিকট কি পরিমাণ প্রীতিকর, শ্রুতিমনোহর, ও রসমাধুর্য্যযুক্ত বোধ হইবে, তাহা অনেকক্ষণ না ভাবিয়া বলিতে পারি না। আমরা নিম্নে পাঠকবর্গের বিবেচনার জন্য ইহার কএক পংক্তি সাদরে উদ্ধৃত করিলাম।

'পাঁচালির ভঙ্গি যত শুঞ্চি সমুদয়।
চৌদ্দহাজার আঁচালপেচাল মিথ্যা সমুদয়।
ভাল কথা শুন্তে মিঠা লাগে সমুদয়।
খান দুই তিন মজার কথা আছে সমুদয়।
মিঠা যেমন কাশীর চিনি আছে সমুদয়।

৯। ব্রুটশ ও এণ্টনীর বক্তৃতা। শ্রীহরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশক।—শেক্সপীয়রের জুলিয়স সিজর নামক সুপ্রসিদ্ধ নাটকে ব্রুটশ ও এণ্টনীর যে বক্তৃতা আছে, গ্রন্থকার তাহাই অবলম্বন করিয়া এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। যাঁহারা মূলে অনধীতী, এই অনুবাদ পাঠ করিয়া তাঁহারা সুখী হইবেন। তাঁহারা ইহাতে পদযোজনার লালিত্য দেখিবেন, এবং অর্থেরও গাম্ভীর্য্য দেখিয়া নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করিবেন। আর যাঁহারা শেক্সপীয়র পড়িয়াছেন, তাঁহারা গ্রন্থকারকে সহোদরের ন্যায় স্নেহ করিলেও বলিবেন যে, তাঁহার সমস্ত পরিশ্রমই বিফল হইয়াছে। হৃদয়ের অনুবাদ কাব্য,—কাব্যের আবার অনুবাদ কি? কাব্যের মধ্যে শেক্সপীয়রেরও কি আবার অনুবাদ সম্ভবে? অলৌকিক শেক্সপীয়র ব্রুটশ ও এণ্টনীর মুখে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িবার সময়ে মূর্ত্তিমতী কাপুরুষতাও তেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, পাষাণও করুণায় বিগলিত হয়। যে ভাষায় উহা লিখিত হইয়াছে, সেই ভাষায়ও উহার রূপান্তর হইতে পারে না, এবং বোধ হয় কবি স্বয়ং আসিয়া পুনরায় চেষ্টা করিলেও উহার একটি অক্ষর অপসারণ কিংবা উহাতে আর একটি অক্ষর নূতন যোজন করিতে পারেন না। আমরা তথাপি অনুবাদককে নিন্দা করি না। অনেকেই অনুবাদ করিতে গিয়া অনুকরণ করিতে শিখেন, অনুকরণ করিতে যত্নশীল হইয়া শেষে উদ্ভাবনার আলোক দেখিতে পান। যদি তালে আর তিলে তুলনা কর প্রায়শ্চিত্তশূন্য পঞ্চ মহাপাতক মধ্যে পরিগণিত না হয়, তবে বলিতে পারি যে, উপন্যাস-গুরু ওয়াল্‌টার স্কটের প্রথম শিক্ষাও এইরূপে হইয়াছিল।

গ্রন্থের মুখপত্রে লিখিত আছে "তাওয়াল-রাজ-দুহিতা শ্রীমতী কৃপাময়ী দেবীর কৃপাশীলতায় এই কবিতাটি লোক লোচনের বিষয়ীভূত হইল।" দেবী কৃপাময়ী এবং

তদীয় সহোদর কুমার রাজেন্দ্র নারায়ণ সত্য সত্যই বঙ্গীয় সাহিত্যের সুহৃৎ ও আশ্রয় হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত ভূস্বামিবর্গের অনুকরণীয়।

১০। জাতীয়-সংগীত। প্রথম ভাগ। স্বদেশানুরাগোদ্দীপক সঙ্গীত-মালা। যাঁহার প্রযত্নে এই ক্ষুদ্র গীতি-পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহাকে আমরা অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করি। তিনি বুদ্ধিমান্, কারণ তিনি রুচির গতি বুঝিয়াছেন। তিনি স্বদেশবৎসল, কারণ এই সংগ্রহেই তিনি বিলক্ষণ সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় ব্যক্তিমাত্রেরই এই পুস্তকের এক এক খণ্ড ক্রয় করা ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য। ইহাতে কবিবর হেমচন্দ্রের বিখ্যাত ভারত-সংগীত, বান্ধবের প্রবাসী বন্ধু কর্ত্তৃক লিখিত হৃদয়হারিণী যমুনালহরী, বাবু সত্যেন্দ্রনাথের "মিলে সব ভারত সন্তান" নামক জলদ-গম্ভীরা গীতি, বাবু মনোমোহন বসুর 'দিনের দিন, সবে দীন' নামক মর্ম্মস্পর্শিনী পদাবলী, বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথের "মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি" এবং সংগ্রহকারের 'না জাগিলে সব ভারত ললনা' প্রভৃতি কতকগুলি অতি প্রশংসনীয় গীত সংগৃহীত হইয়াছে। এই গীত গুলি সর্ব্বত্র এত পরিজ্ঞাত, যে, ইহার কোনটিরই পৃথক্ উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইল না। সাধারণীর সুবিজ্ঞ সম্পাদক এই গীতসংগ্রহে 'সাহজাদা আলম্' ইত্যাদিক লখ্নৌর প্রসিদ্ধগীত নিচয় গ্রথিত না দেখিয়া ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা ভরসা করি সংগ্রহকার ইহার দ্বিতীয় সংস্করণের সময় সাধারনীর কথাগুলি স্মরণ রাখিবেন, এবং পলাসির যুদ্ধের যে সকল দীপক কবিতা গীতে পরিণত হইতে পারে, তাহাও এই সংগ্রহে উদ্ধৃত করিয়া ইহার পূর্ণতা সম্পাদন করিবেন।

১১। কাশ্মীর কুসুম। অর্থাৎ কাশ্মীরের বিবরণ। শ্রীরাজেন্দ্রমোহন বসু কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। ভারতবর্ষ নৈসর্গিক শোভায় ভূতলে স্বর্গ বলিয়া পরিচিত, কাশ্মীর রাজ্য সেই ভারতবর্ষের মুকুট-মণি। কাশ্মীরের বিবরণ পাঠে সকলেরই যে কৌতূহল জন্মিবে, ইহাতে কিছুই বিচিত্রতা নাই। গ্রন্থকার কাশ্মীরের প্রাকৃত সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন এবং উহার প্রাকৃত সৌন্দর্য্য বর্ণনেই সমধিক প্রয়াস পাইয়াছেন। যদি ঐতিহাসিক বিষয়ের গূঢ় অনুসন্ধান করা এবং সমাজসংস্থানের অন্তস্তল পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া দেখা তাঁহার উদ্দেশ্যের অন্তর্গত হইত, তাহা হইলে এই গ্রন্থের গৌরব অনেক বাড়িত। যাহা হউক, তিনি প্রথম উদ্যমেই আমাদিগকে যাহা উপহার দিয়াছেন, আমরা তজ্জন্য তাঁহার নিকট বাধিত রহিলাম। কাশ্মীরের মর্ম্ম কথা বুঝিতে না পারি, এই উপাদেয় গ্রন্থ পাঠে কাশ্মীরের বহিরাবরণ সংক্রান্ত অনেক কথা জানিতে পাইব। ইহার লেখা অনেক স্থলেই উপন্যাসের ন্যায় মনোহর।

১২। বিনোদিনী। মাসিক পত্রিকা, শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী কর্ত্তৃক সম্পাদিতা। আমরা ইহার প্রথমসংখ্যা দর্শনে আশা প্রকাশ করিয়াছিলাম, ইহার উত্তরোত্তর উন্নতি দর্শনে আমাদিগের সেই আশা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। ইহাতে যে সকল কবিতা প্রকটিত হইতেছে, তাহা ভুবনমোহিনীর নামের অযোগ্য নহে। এদেশের আধুনিক সভ্যদিগের মধ্যে অনেকেই স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী। বঙ্গীয় কুলকামিনীগণ সুশিক্ষিত হউন, ইহাই তাঁহাদিগের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, এবং এই উদ্দেশ্যসাধনেব জন্য তাঁহারা নিজ নিজ বক্ষঃস্থল বিদারণপুর্ব্বক রক্তধারা ঢালিয়া দিতেও প্রস্তুত। কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা যে, তাঁহারা এই অযত্নবর্দ্ধিতা বঙ্গবালাকে উৎসাহের সাহায্যদানেও কুণ্ঠিত।

১৩। উত্তরপাড়া হিতকরী সভার ত্রয়োদশ সাংবৎসরিক বিবরণ।—উত্তরপাড়া গ্রাম অন্যান্য সৎকার্য্যের সঙ্গে এই হিতকরী সভার অনুষ্ঠাননিচয় দ্বারাই অধিক পরিচিত। আমরা সভার এই বিবরণী পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। সভা আপাততঃ স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বিধানেই অধিক মনোযোগ দিতেছেন। ইহার অন্যান্য বিভাগেও উপযুক্তরূপে কার্য্য হয়, এমন বোধ হইল না। হিতকরী সভা সম্প্রতি দেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের অনুশীলনের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ করিতেছেন। ইহা প্রশংসনীয়।

১৪। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ভুবৃত্তান্ত। আলিগড়ের রাজকীয় বিদ্যালয়ের তৃতীয় শিক্ষক শ্রীকালীপ্রসাদ শাণ্ডিল্য কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।—উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ভারতবাসী ব্যক্তি মাত্রেরই আদরের স্থান; বর্ষীয়ান্ ও যুবক, রোগী ও সুস্থকায় তীর্থযাত্রী ও ভ্রমণবিলাসী, ঐতিহাসিক ও কবি সকলেরই স্মরণীয়। ভারতের উন্নতি এই প্রদেশে, অধোগতি এই প্রদেশে, এবং বোধ হয় ভাবি আশাও এই প্রদেশে। বঙ্গভাষায় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোন উৎকৃষ্ট ভূগোল ছিল না। গ্রন্থকার সেই অভাব মোচন করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। উত্তর পশ্চিমের লোকসংখ্যামধ্যে প্রায় চৌদ্দ আনা হিন্দু, এবং কেবল হিন্দুই ইংলণ্ডের লোকসংখ্যার দ্বিগুণ।

১৫। আমার বাসগৃহ অর্থাৎ মানব দেহের বিবরণ। শ্রীরামচরণ নাথ কর্ত্তৃক সংগৃহীত। এই পুস্তকখানিতে শারীরসংস্থান বিদ্যার অবশ্যজ্ঞেয় কথা সকল সচিত্র বিবৃত হইয়াছে। ইহার লেখা সরল এবং বালক শিক্ষার উপযোগী।

১৬। চিকিৎসাসার। শ্রীরামচরণ নাথ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহার বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে, "চিকিৎসাসার কেবল চিকিৎসাব্যবসায়িদিগের প্রয়োজনীয় নহে, প্রতি পরিবারের কর্ত্তার বা কর্ত্রীর ইহা অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য।"

নাটক।

(আধুনিক বাঙ্গালা নাটক।)*

কোন এক প্রসিদ্ধ কবি বলিয়াছেন যে, মানবচরিত্রের বৈচিত্র্যই মনুষ্যের উৎকৃষ্টতম পাঠ্য পুস্তক। কবি বা দার্শনিক, ব্যবসায়ী বা রাজনীতিজ্ঞ, সকলের পক্ষেই মনুষ্যচরিত্রের কোন না কোন ভাগ মূলধন। যিনি মানবচরিত্রের বৈচিত্র্য উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছেন, তিনি কবি হইলে ব্যাস বা সেক্ষপিয়র, দার্শনিক হইলে শঙ্করাচার্য্য বা কোম্‌ৎ, ব্যবসায়ী হইলে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি, এবং রাজনীতিজ্ঞ হইলে কণিক বা মেকিয়াবেলি, চাণক্য বা ডিস্‌রেলি।

এই মানব চরিত্রের বৈচিত্র্য নানা প্রকারে সাধিত হয়। মনুষ্য সময়স্রোতের তাড়নায় নিরন্তরই ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে। এই রূপেই প্রাচ্য আর্য্যজাতির অধঃপতন ও প্রতীচীন আমেরিক জাতির অভ্যুত্থান। এই জন্যই ইংলণ্ড তেরিজ জমা খরচ দেখিতেছে, স্পেন গৃহবিবাদ করিতেছে, ফ্রান্স ক্ষতদেহে প্রলেপ দিতেছে, প্রুসিয়া অস্ত্রবলে গর্ব্বিত, তুর্কি খ্রীষ্টানগণের ষড়যন্ত্রভয়ে বিকম্পিত। ইত্যাদিরূপে সময়স্রোতের তটাভিঘাত ইতিহাসের সমালোচ্য। মনুষ্য আবার কিয়ৎপরিমাণে

* ১। শরৎ সরোজিনী। (দ্বিতীয় সংস্করণ)।
২। হেমলতা। (দ্বিতীয় সংস্করণ)। শ্রীহরলাল রায় প্রণীত।
৩। মহারাষ্ট্রকলঙ্ক। শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত।
৪। যৌবনে যোগিনী। শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত।
৫। ভারতবিজয়। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত।
৬। জয়পাল। শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র প্রণীত।
৭। ভারতের সুখশশী যবনকবলে। শ্রীনবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক বিরচিত।
৮। রুদ্রপাল নাটক। (ইংরেজী মেকবেথ অবলম্বন করিয়া) শ্রীহরলাল রায় প্রণীত।
৯। শত্রুসংহার। (বেণীসংহার নাটক অবলম্বন করিয়া) শ্রীহরলাল রায় প্রণীত।
১০। প্রণয়ের প্রতিফল নাটক। শ্রীমোহিনীমোহন ঘোষাল কর্ত্তৃক প্রণীত।
১১। প্রকৃতবন্ধু। শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত।
১২। কুমুদকামিনী। শ্রীরজনীকান্ত শর্ম্মা বিরচিত।
১৩। প্রমোদমনোরমা। শ্রীবিশ্বেশ্বর বসু কর্ত্তৃক প্রণীত।

ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুৎ এই ভূত চতুষ্টয়ের দাস; এবং আহার ও পরিচ্ছদ বৈচিত্র্যেও মানবীয় চরিত্রের বৈচিত্র্য হইয়া থাকে। এজন্যই নাকি তণ্ডুল-ভোজী ভারতবাসী, গোল-আলু-ভোজী আইরিস ও রম্ভাফলভোজী দাক্ষিণামেরিক, মাংসভুক্ বিজেতার চিরদাসত্বে নিযুক্ত রহিয়াছে। এজন্যই ভারতবর্ষের বুদ্ধির দীপ এত ঝঞ্ঝাবাতেও নিবিয়াও নিবে না, আর লাপলাণ্ড বা শিবির দেশবাসীর তিমি-পঞ্জর-নির্ম্মিত কুটীরমধ্যে তিমিতৈল পান করা ঘুচিয়াও ঘুচেনা। মনুষ্যচরিত্র লইয়া শীতবাতাতপের এইরূপ ক্রীড়া কুর্দ্দন উন্নত পদার্থবিদ্যার এবং আধুনিক বাকল-বিদ্যার সমালোচ্য সামগ্রী।

আবার দেখিতে গেলে মনুষ্য কিয়ৎ পরিমাণে নীতিশিক্ষার স্বহস্ত-গঠিত পুত্তল। বণিগ্বৃত্তিক ইংরেজের নিকট নিত্য নীতি শিক্ষা করিয়া, আধুনিক আর্য্যসন্তান এখন অনায়াসে অতিথিকে প্রত্যাখ্যান ও স্বীয় ভবন হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন;—মুসলমানের নিকট নীতি শিক্ষা করিয়া পক্ব দ্রাক্ষাফলের মত, সুগন্ধি কর্পূরখণ্ডের মত, মহিলাগণকে বায়ুস্পর্শবিরহিত অবরোধে রুদ্ধ করিয়া রাখেন। আবার এই নীতিশিক্ষার প্রভাব বলেই পরমভাগবত নিত্যানন্দগোষ্ঠীসম্ভূত যুবক সুরা সেবনে ঘৃণিত, আর এই শিক্ষাবলেই প্রবঞ্চকের প্রিয়শিষ্য ধর্ম্মাচার্য্যের পদে অভিষিক্ত।

আর এক প্রকার দেখিতে গেলে মনুষ্য প্রাসাদশোভিনী বাতশলাকার ন্যায় সর্ব্বদাই তাড়িত হইয়া থাকে। সেই তাড়নাকারি কারণসমষ্টিকে সংসার বলা যায়। সকল মনুষ্যই এই জগৎ সংসারের ক্রীড়াকন্দুক। সময়ের তরঙ্গাভিঘাতকে, জড় জগতের শক্তি সামর্থ্যকে, বা নীতির উপদেশপরিচালনাকে সংসারতাড়না বলি না; মনুষ্য এই কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া স্বকীয় আবেগের উপর যে পরকীয় আবেগের আঘাত প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই সংসার তাড়না বলি। সংসার তাড়নার একটি অপূর্ব্ব নিয়ম আছে। তাহা এইরূপ;—দশদিক হইতে দশজনে ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায়ে তোমায় তাড়না করিতেছে, অথচ তোমার প্রকৃতিবলে তুমি একটি নির্দ্দিষ্ট দিকে চালিত হইতেছ। আমরা যাহাকে প্রকৃতি বলিলাম এক শ্রেণীর দার্শনিকেরা তাহাকেই অদৃষ্ট বলেন। এই অদৃষ্ট বা প্রকৃতিপরিণত মানবের সহিত, সংসার বলিয়া অভিহিত পরকীয় আবেগসমষ্টির যে যুদ্ধ, তাহাই নাটকে বর্ণিত হইয়া থাকে। এই যুদ্ধ যে একের সহিত অনেকে করিতেছে, এমন নহে। এই সংসারে সকলেই সকলের সহিত যুদ্ধ করিতেছে, অথচ সময় বিশেষে এই সমরক্ষেত্রে এক একজন মাত্র অধিনায়ক বা অধিনীত রূপে পরিলক্ষিত হইতেছেন। কুরুক্ষেত্রের ভীষণ সমরে সপ্ত অক্ষৌহিণীর সহিত একাদশ অক্ষৌহিণী সমরে প্রবৃত্ত ছিল, অথচ তাহার ভাগবিশেষ অধিনায়কের নামে ভীষ্মপর্ব্ব, বা

দ্রোণপর্ব্ব বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। সংসারও সেইরূপ; কত শ্বেতপুরুষ ভারতবাসীকে উৎপীড়িত করিতেছেন, এবং স্বকীয় অমল শ্বেত অঙ্গে ফুৎকার দিয়া রাজদ্বার হইতে অব্যাহতি লাভ করিতেছেন! কিন্তু সময়ে সময়ে কেবল মিয়র্স বা ফুলারই অধিনায়ক বা অধিনীতরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন। নাটকে সেইরূপ; কেণ্ট, গ্লষ্টর, এডমণ্ড, এড্গার, বিদূষক, গণরিল, রিগান, ও কর্দ্দেলিয়া সকলের মধ্যেই আবেগের "ঘাত প্রতিঘাত" চলিয়াছে; কিন্তু সকলের মধ্যে বার্দ্ধক্যের বেগপরিচালিত নৃপতি লীয়রই অধিনীত, সুতরাং সমস্ত নাটক খানির নাম 'লীয়র'। নাটকের অভিমন্যুরূপী দিনেমার রাজকুমার সপ্তরথী পরিবেষ্টিত,—রজনীযোগে ভূতযোনিকর্ত্তৃক আক্রান্ত, পরদিন প্রণয়িনীকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত; কখনপাপিষ্ঠা গর্ব্ভধারিণীর সহিত বাগ্‌যুদ্ধ করিতেছেন, আবার কখন বা প্রাণবন্ধু হোরেশিয়োর পরামর্শে সংশয়াচ্ছন্ন হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন; লেয়ার্টিসের বিষাক্ত বাণে জর্জ্জরিত কলেবর হইয়া ঈদৃশ কপটাচরণে ঘৃণায় অভিভূত;—আবার সেই মুহূর্ত্তেই বন্ধুর প্রাণরক্ষাজন্য মৃত্যুশয্যা হইতে উত্থান করিতেছেন। তিনিই অধিনায়ক এবং তিনিই অধিনীত; সুতরাং সেই নাটকের নাম 'হেমলেট'।

স্থূলতঃ বলিতে গেলে অধিনায়ক বা অধিনীত বিশেষের সংসার তাড়নায় বা পরকীয় আবেগসমষ্টির উত্তেজনায় যে চরিত্রগত পরিবর্ত্তন ও পরিণাম হইয়া থাকে, তাহা প্রদর্শন করাই নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য। যিনি শিখিতে জানেন তিনি নাটক হইতে ইহলোকের চরমশিক্ষা লাভ করিতে পারেন। বিষভক্ষণে মৃত্যু হয়, বঙ্গদেশে বাস করিলে শরীর দুর্ব্বল হয়, কেবল মাত্র অন্নভোজী হইলে মনুষ্য লম্বোদর সুতরাং অলস-প্রকৃতি হয়, বিলাসপ্রিয় জাতি ক্রমে কঠোরপ্রাণ জাতির কর-কবলিত হয়, ইতিহাস বা বিজ্ঞানের সমীপে যেমন এইরূপ নানা কথা শিক্ষা করিতে হয়, সেইরূপ কাব্য নাটকের স্থানেও আমরা নানা গভীর নীতি শিক্ষা করিয়া থাকি। যদি ঘুণাক্ষরেও সরলা প্রণয়িনীকে অনর্থক অবিশ্বাস কর, তবে তুমি ওথেলো বৃথা পাঠ করিয়াছ; আবার যদি প্রণয়িনীর অসঙ্গত আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণ করিতে ঘুণাক্ষরে সম্মত হও, তবে তুমি মেকবেথ বৃথা পড়িয়াছ। সম্মানলুব্ধ ব্যক্তিরা প্রায়ই চাটুবচনপ্রিয়। তুমি লীয়র পড়িয়াছ এখনও কি চাটুবচনে মত্ত করিবে? আর তুমি নেপোলিয়ন, লিঙ্কন, বিষমার্ক বা ডিস্‌রেলি, তোমারা কি মনে কর যে কেবল সীজরের বিরুদ্ধেই ব্রুটসের বিশ্বাসঘাতকতার সমাধা হইয়াছে? শত শত ব্রুটস হয়ত এই মুহূর্ত্তেই তোমাদের নিমিত্ত গুপ্ত-অস্ত্র শাণিত করিতেছে। কবির কল্পনা-হইতে এইরূপ গভীর উপদেশ সকল পাওয়া যায়। তবে কেহ তিনবৎসরেও শুক্ল;

পাঠের ব্যাখ্যা করিতে পারে না, আর কেহ যাবজ্জীবনেও উৎকৃষ্ট নাটকের মর্ম্ম কথার বর্ণমাত্র বুঝিতে পারে না। সংসার তাড়নায় অধিনায়ক বা অধিনীত-বিশেষের চরিত্রগত পরিবর্ত্তন ও পরিণাম যখন নাটকের উদ্দেশ্য, এবং মানসিক আবেগের বা অন্তঃপ্রকৃতির উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের 'ঘাত প্রতিঘাতই' যখন নাটকের জীবন, তখন কথোপকথন বা স্বগত বচনই নাটকের একমাত্র দেহ।

অনুরূপ কাব্যে কল্পনার অধিকতর লীলাচাতুরি আছে, সৌন্দর্য্যের স্ফুটতর বিকাশ আছে, হৃদয়ের তরতর উচ্ছ্বাস আছে, ইন্দ্রিয়গ্রাম অবশ করে এমন মোহিনী শক্তি আছে, এবং হয়ত অনেক স্থলে আবেগেরও তরঙ্গ আছে, কিন্তু কেবল মাত্র নাটকেই সেই তরঙ্গের "ঘাত প্রতিঘাত" দেখিতে পাওয়া যায়। এক জন কোন বন্ধুর নিকট চিত্তাবেগ প্রকাশ করিলেন; বন্ধু তাঁহাকে সান্ত্বনাবাক্যে উত্তর দিলেন; প্রথম বক্তার আবেগ অমনিই অন্যদিকে ধাবিত হইল, বন্ধুহৃদয়ের আর এক দিকে এবার আঘাত লাগিল, বন্ধু এবার সান্ত্বনা না করিয়া সহানুভূতি-স্বরে দুইটি কথা কহিয়া রুদ্ধকণ্ঠ হইলেন, তাহাতেই আবার প্রথম বক্তা বিচলিত হইলেন।—এইরূপ কথোপকথন নাটকের দেহ। কিন্তু [illegible]পকথন থাকিলেই যে নাটকের [illegible] হইল এরূপ মনে করা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। তাহা হইলে প্লেটোর তর্কবাদ বা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ষড়দর্শনসংবাদ উৎকৃষ্ট নাটক; কেন না তার্কিকের মধ্যে যত আবেগ আছে, এত বোধ হয় সংসারে আর কাহারও নাই। কিন্তু তাহাতে সংসার কৈ? সংসারের তাড়না কৈ? অধিনায়ক বা অধিনীত কৈ? ইহাতে অনেকে মনে করিতে পারেন, ঐ ষড়দর্শনসংবাদে বা প্লেটোর তর্কবাদে যদি দুটি একটি স্ত্রীলোক থাকিত, ও সঙ্গে সঙ্গে একটি সুন্দর গল্প থাকিত, তাহা হইলেই ঐ গ্রন্থগুলি নাটক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত। এটিও নিতান্ত ভ্রমের কথা। তাহা যদি হইত তবে টেক চাঁদের হরিহর, পদ্মাবতীর কথোপকথন, এবং যদু বাবুর ধাত্রী-শিক্ষাও উৎকৃষ্ট নাটক বলিয়া সেক্ষপীয়রের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারিত। আধুনিক বাঙ্গালা নাটকের দেহ আছে, প্রায়ই প্রাণ নাই। কেবল রসপূর্ণ কথোপকথন আছে, আবেগ তরঙ্গের চলাচল নাই। কেবল নাটক বলিয়া নয়, আমরা সর্ব্বত্রই শুদ্ধ বাহ্যাড়ম্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখি, এবং বাহ্য চিত্রের উদ্দেশ্য কি তাহা ভুলিয়া যাই। অন্যান্য কাব্যেতেও এইরূপ হইয়াছে। এতদিন বাঙ্গালা যাঁহাকে প্রধান কবি বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেছিল, সেই ভারতচন্দ্র একজন বাহ্যাড়ম্বরপ্রিয় কবি; তাঁহার দৃষ্টি কেবল ছন্দে আর লালিত্যে, অনুপ্রাসে ও যমকে। এখনও যাঁহাদিগকে আমরা কাব্যকাননের সারী শুক বলিয়া প্রিয় সম্বোধন করি, তাঁ-

হারাও কি অনেক সময়ে কেবল বাধিন্যাসে মত্ত নহেন? তখন সাতু বাবু, নিধু বাবু, কোকিল, কমল, ভ্রমরগুঞ্জন, কদম্ব, দাড়িম্ব লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, এখন হইয়াছে "নৈশগগনের সান্ধ্য সমীরণ"—আর "নৈদাঘ তপনের মুর্ম্মুরদাহন"। ফল কথা বর্ণনকাব্যে এখনও আমরা শব্দের অনুচিত শাসন এড়াইতে পারি নাই। সেইরূপ সঙ্গীতে দেখিবেন, কলাবত কেবল তান লয় মান প্রভৃতি সঙ্গীতের বাহ্য প্রকৃতি লইয়াই ব্যস্ত। এদিকে করুণরসের গানে বীভৎস-রসপূর্ণ গমক সন্নিবেশিত করিতেছেন, বা ভক্তিরসে উৎকট বিকট গীট্‌কারি যোজনা করিয়া সম্পূর্ণ রসভঙ্গ করিতেছেন, সঙ্গীতের অন্তঃপ্রকৃতির প্রতি তাঁহার দৃষ্টিই নাই। এইরূপ সকল বিষয়েই আমরা বাহ্যাড়ম্বরে সন্তুষ্ট। আমাদের মধ্যে সভা আছে, সমিতি আছে, সমাজ আছে, কিন্তু একতা নাই। ত্রিকণ্ঠীশোভিত, ত্রিপুণ্ড্রক-চর্চ্চিত, সর্ব্বাঙ্গে হরিনামাঙ্কিত গোস্বামী বাবাজী আছেন, আর ইমন-গীতি-পরিপূরিত, চল-বীজন-সেবিত, স্ফাটিক-দীপাধার-বিলম্বিত প্রার্থনামন্দির আছে, কিন্তু কোথাও এক শতক ভক্তি আছে কি না সন্দেহ? এখন গেরুয়া বসন পরিধান করিলেই যোগী, আর কথোপকথন প্রসঙ্গে গল্প রচনা করিলেই নাটক। অহো কি দুর্ভাগ্য!

কথোপকথন নাটকের শরীর, এই কথায় নাটকাবয়ব বর্ণনের পর্য্যাপ্তি হয় না। আবেগের তরঙ্গচলাচল সাধারণতঃ কথোপকথনেই বিকশিত হয় বটে; কিন্তু আবেগচলাচলের আরও দুইরূপ পরিণাম আছে। এক, আবেগের দুইটি প্রতীপগামী সংঘাত হইতে ঘোরতর সংশয়ের উৎপত্তি এবং তাহা হইতে আত্মচিত্তপরীক্ষা, আর আবেগের পূর্ণতা হইতে উচ্ছ্বাস এবং সেই উচ্ছ্বাসের পরিণাম গান। এই আত্মচিত্ত পরীক্ষা ও কণ্ঠোচ্ছ্বাস উভয়ই স্বগত হইয়া থাকে, এবং ইহাও নাটকের অবয়বের মধ্যে। একাধিক ব্যক্তি মিলিয়া যে নাটকের মধ্যে গান করে, এবং কাহারও আত্মচিত্ত পরীক্ষা না হইয়াও যে স্বগত বাক্যের বিস্তার থাকে—সে সকল নাটকের অঙ্গীভূত পদার্থ নহে।

এখন নাটকের পরিচ্ছদের কথা। নাটকের ছন্দোবন্ধন, ভাষার গাঁথনি বা রচনা-প্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত? এই বার অনেক কৃতবিদ্যের মতের সহিত আমাদের মতবিরোধ উপস্থিত। আমাদের মূলসূত্রানুসারে বঙ্গীয় নাটককারের আবেগের তরঙ্গই যখন নাটকের জীবন, তখন ইহার পরিচ্ছদ বা ভাষাও সম্পূর্ণ তরঙ্গায়িত হওয়া আবশ্যক। ভাষার নিয়মিত তরঙ্গকেই রচনার ছন্দ বলিতে পারা যায়। নাটকে সেইরূপ ছন্দোবন্ধ রচনা হইলেই স্বভাবসঙ্গত হয়। স্ব[illegible] যেখানে দেখিবেন মানসিক উদ্বেগ, [illegible] নই থানেই দেখিবেন কথা ছন্দোময়ী। আনন্দের যে

নৃত্য, তাহাতে যেরূপ ছন্দ আছে, শোকের যে উচ্ছ্বাস ও ক্রোধের যে গর্জ্জন, তাহাতেও সেইরূপ ছন্দ আছে।

মনুষ্যমন আবেগপূর্ণ হইলে কথা কেন ছন্দোময়ী হয়, যদিও এপ্রশ্নের উত্তর দান করা তত সহজ নহে, কিন্তু এরূপ যে হইয়াছে, তাহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই। এই জন্য পৃথিবীর সকল উৎকৃষ্ট নাটককারই ছন্দোময়ী ভাষাতে নাটক রচনা করিয়াছেন। যদিও সংস্কৃত ভাষার প্রধান নাটককারেরা গদ্য পদ্য উভয়বিধ প্রকারেই নাটকের পরিচ্ছদ প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে আমাদের মূল সূত্রের সমর্থন হয়, অপিচ খণ্ডন হয় না; কেন না সংস্কৃতের যে গদ্য তাহা অন্য ভাষার পদ্য বলিলেও চলে। যখন শাপবশে লুপ্তস্মৃতি দুষ্মন্ত নৃপতি শকুন্তলাকে শুদ্ধান্তশ্চারিণী করিতে অস্বীকৃত হইলেন, তখন সেই যে শকুন্তলা একবার মাত্র ঊর্দ্ধ্বদৃষ্টি করিয়া আবার নতনয়না হইয়া সর্ব্বংসহাকে সম্বোধন করিয়া হৃদয়ভেদিনী উক্তি প্রয়োগ করিলেন,—বলিলেন "ভঅবদি বসুন্ধরে দেহি মে অন্তরং" এই উক্তিকে আমরা গদ্য বলি না ইহা পদ্যের চরমোৎকর্ষ। ইহাতে তরঙ্গ আছে, ছন্দ আছে, ন্যাস আছে, লয় আছে। সংস্কৃত নাটকের গদ্য এইরূপ, আর তাহাতেই সংস্কৃত নাটকে গদ্য পদ্য উভয় পরিচ্ছদই সন্নিবেশিত আছে। বাঙ্গালা গদ্যের অবস্থা সেরূপ নহে, বাঙ্গালা এখনও এলাইয়া এলাইয়া পড়ে, ধরি ধরি করিয়া রাখিতে হয়। সুতরাং বাঙ্গালা নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রচলিত করা নিতান্ত আবশ্যক। যে ছন্দে হিন্দুস্থানী সিপাহী দুর্ব্বল বাঙ্গালির উপর স্বীয় ক্রোধ প্রকাশ করে, যেরূপ ছন্দে পুত্রশোক-বিহ্বলা জননী বিনাইয়া বিনাইয়া আপনার শোক প্রকাশ করে, আবেগের তাহাই প্রকৃত পরিচ্ছদ। আবেগ-জীবন নাটকে সেইরূপ তরঙ্গায়িত রচনা থাকা নিতান্ত আবশ্যক, অর্থাৎ নাটকের ভাষা সাধারণতঃ অমিত্রাক্ষর ছন্দে নিবদ্ধ হওয়া উচিত।

এই সঙ্গে আর একটি কথা বলা আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে। নাটকের ভাষা কেবল তরঙ্গায়িত বা ছন্দোময়ী হইলেই যথেষ্ট হইবে না। ভাষার জমাট গাঁথনি হওয়া চাই। যেখানে মানসিক আবেগের গম্ভীরতা আছে, সেখানে ভাষার গাঁথনি কখন বালকের মত আধ আধ বা গোস্বামীর গীতিকাব্যোক্ত ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরের ন্যায় ধীরবাহী ও নিদ্রাকর্ষণকারী হয় না। না বাঙ্গালা দেশেই আছে, আর না বাঙ্গালা কাব্যেই আছে, কোথাও শোকের বা ক্রোধের, ঘৃণার বা সাহসের গম্ভীরতা নাই। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষা সর্ব্বত্রই চিরবিরহান্তে মিলিত নায়কসমীপে রসালসা নায়িকার মত কেবলই এলাইয়া এলাইয়া যায় ও হেলিয়া হেলিয়া পড়ে।

ভাষার এ বিলাসিতা হইতে আমরা কবে মুক্তিলাভ করিব বলিতে পারি না।

সংবাদ পত্রে সর্ব্বদা দেখিতে পাই, বাঙ্গালি আজি কালি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিষ্পীড়িত জীব। শুনিতে পাই এই দুর্ব্বল বাঙ্গালির উপর নাকি স্বদেশী বিদেশী উভয়ই সমান অত্যাচার করিয়া থাকেন। শুনিতে পাই সাহেব বা সাহেবের কর্ম্মচারী, জমীদার বা মহাজন, মহামারী বা জলকষ্ট সকলই নাকি বাঙ্গালির উপর সমান দৌরাত্ম্য করে। ইহা যদি সত্য হয়, তবে এই নিষ্পীড়িত জাতির ভাষায় এত বিলাসিতা কেন? যাহার মর্ম্মে পীড়া, গাত্রে কশাঘাত, হৃদয়ে বেদনা, সে কেন গলি গলি আধ্‌ধার তালে ঝিঁঝিট খাম্বাজ গাইয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়? তাহার ভাষায় আবার এত রসাবেশ কেন? লালিত্য কেন? মাধুর্য্য কেন? আর সেই বাঙ্গালির রচিত নাটকনামধারি কথোপকথনঘটায় এত প্রণয়, প্রণয়, প্রণয়, কেন? বাস্তবিক এই বাল-স্বভাব-সুলভ অল্পপ্রাণ প্রণয়েই বাঙ্গালার কাব্য বল, নাটক বল, সমাজ বল, আর যাহাই বল, সকলই ছারখার হইল। পূর্ব্বে এই প্রণয়ের তাড়নায় জটাবল্কলধারী যোগী সেতুবন্ধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এই প্রণয়ের বেগে শত শত সতী নারী জ্বলন্তচিতায় সুখশয্যাবোধে মৃত পতিপার্শ্বে শয়ন করিতেন, আর এখনকার প্রণয়িনীগণ ভর্ত্তার দৃঢ় অনুরোধে দুর্গেশনন্দিনী পাঠ করেন, আর প্রণয়াবতার প্রণয়প্রতিমার অনুরোধে তাহাকে সঙ্গে লইয়া ইডন্ উদ্যানে বায়ুসেবন করিতে যান। সমাজে প্রণয়ের বেগ এইরূপ; তবে নাটকে তদপেক্ষা যে গভীর হইবে,—তাহার সম্ভাবনা কেন কর? রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময়ের ইংলণ্ড-বাসীর মানসিক আবেগের গভীরতা ছিল, সেই সময়ের ভাষার প্রগাঢ়তাও সেইরূপ ভূরি পরিমাণে ছিল, তাহার ফল বেকন ও কুলর, রালী ও সেক্ষপিয়র, বেনজনসন ও মাসিঞ্জর। আমরা মনোমধ্যে একটু মাত্র আবেগ হইলেই শফরীর মত ফর ফর করি, দুখানি ক্ষুদ্র পক্ষ পাইলেই পিপীলিকার মত আকাশে উড্ডীন হইয়া হিংস্র পক্ষিগণের কবলাশ্রয়ে নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হই। আমাদের মনের যেরূপ বেগ নাই, আমাদের ভাষার সেইরূপ গাঢ়তা ও তেজ নাই। সেক্ষপিয়রের প্রণয়বীর রোমীয় যখন একটিমাত্র শ্লোকার্দ্ধ উচ্চারণ করেন,—He jests at scars, that never felt a wound,— আমাদের লীলাবতীর প্রণয়বাতুল ললিতমোহন সেই সময়ে আপনার পুস্তকাগারে বসিয়া কেবল হৃদয়ভাবের ব্যাখ্যার উপর ব্যাখ্যা ও টীকার উপর টীকা ও ভাষ্যের উপর অনুভাষ্য জল্পনা করিত। যাহাদের যেরূপ স্বভাব চরিত্র, তাহাদের ভাষাও সেইরূপ, কাব্যও সেইরূপ, নাটকও সেইরূপ। তাহাতেই নাটকের সুদীর্ঘ বক্তৃতা সকল জমাট করিয়া লিখিতে বলি। একে সংস্কৃত কূটগ্রন্থাবলীর অর্থবাদ করিতে এই ‘সাধু

ভাষার' সৃষ্টি হইয়াছে, বিদ্যালয়ের অল্প-বয়স্ক বালকগণের সম্প্রসারিত অনুবাদে বা তাহাদের উপযোগী অধিকতর সম্প্রসারিত পাঠ্য পুস্তকে তাহার স্থিতি হইতেছে, ইহার উপর যদি আবার বয়স্ক-জন-পাঠ্য কাব্য নাটকেও তুলির উপর তুলি ঘসিয়া বর্ণকের উপর বর্ণক ফলাইয়া কেবল রং চড়াও, ও চিত্র বিস্তৃত কর, এখনও যদি—হে জীবিতেশ্বর, হে দয়িতপ্রাণবল্লভ, হে কাশী-কাঞ্চী-দ্রাবিড়-মথুরা-উৎকল-অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-ভ্রমণ-কারিন্! হে তাল-তমাল-শাল-হিন্তাল-পিয়াল-রসাল-কিশলয়-সদৃশ শ্যামল-শোভন-নয়ন-রঞ্জন! হে বিপুল-বিশাল-বক্ষঃ, অতুল-রসাল-চক্ষুঃ, কমলচরণ, চম্পকাঙ্গুল, বিশেষবিদ্বান্, অশেষগুণনিধান বলিয়া সম্প্রসারিত পদে বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে বস, তাহা হইলে আর নিস্তার নাই। যদি বাঙ্গালির কোথাও কিঞ্চিন্মাত্র স্বাধীনতা থাকে, তবে সে কেবল ভাষাতেই আছে। আমাদের সর্ব্বস্ব গিয়াছে কেবল মাত্র এক সম্বল আছে এই ভাষা। বিদেশীয় রাজা যাহাকে আদর করিয়া উপাধি প্রদান করেন, আমরা তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ মনে করি যে তিনিই বাস্তবিক একটি গণ্যজীব; বিদেশীয় শাসন-কর্ত্তা যদি কাহারও দণ্ডবিধান করিলেন, অমনি আমরা তাঁহাকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করি। বিদেশীয় রাজা বলিলেন এইটি অপরাধ, আমরা অমনই সেটিকে মহাপরাধ বলিয়া মনে করি। এইরূপ আমরা আচারে, বিচারে, শাসনে, রক্ষণে, প্রবৃত্তি পরিচ্ছদে দিন দিন অস্থি মজ্জায় পরাধীন হইয়া পড়িতেছি। একটুমাত্র স্বাধীনতা আছে এই মাতৃ ভাষায়। যদি আমরা বেওয়ারিস ময়দার মত তাহা লইয়া এখন খেলা করি, তবে কি আমরা মহাপাপে পাপী নহি? এই জন্য এক নাটকের ভাষা উপলক্ষ করিয়া আমরা এত কথা বলিতে সাহসী হইতেছি। কষ্ট করিয়াও কাব্য নাটকের ভাষা আমাদের সংযত করা কর্ত্তব্য। ভাষার ভরে ক্রমে ভাবের প্রগাঢ়তা জন্মিবে, তাহাহইলে হৃদয়ের আবেগপুঞ্জও ক্রমে গভীর হইবে।

অনেকে মনে করিতে পারেন, আমরা উপরোক্ত হেতুবাদে সাধ্যসাধনের বিপর্য্যয় ঘটনা করিতেছি, আবার অগ্রে শকটযোজনা করিতেছি, বাস্তবিক তাহা নহে। আপাততঃ বোধ হইতে পারে বটে, যে অগ্রে মানসিক পরিবর্ত্তন তাহার পর ভাষার পরিবর্ত্তন, ও তাহার পরে কাব্য-নাটকাদির পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তন। অনেকস্থলে এইরূপ হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু জাতীয় ভাষার উন্নতির বলে জাতীয় চরিত্রের উন্নতি হওয়াও বিচিত্র নহে। জর্ম্মণির পঞ্চম চার্লস বলিতেন, যে আমি নূতন একটি ভাষা শিক্ষা করিলে আমার বোধহয় যেন আমি আর একটি অভিনব আত্মা পাইয়াছি। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা দেখিতে পাই। এক জনকে বেকনের প্রগাঢ় ভাষার শিক্ষাদান করুন, দেখিবেন

তিনি ক্রমেই স্থির গম্ভীর হইবেন। ভাষার এইরূপ মহীয়সী শক্তি আছে বলিয়াই আমরা নাটকের ভাষার দিকে নাটককারগণকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে বলি।

এখন নাটকের পরিণামের কথা। এস্থলে সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের সহিত, আমাদের বাঙ্গালির প্রচলিত প্রবৃত্তির সহিত এবং ড্রাইডেন প্রভৃতি সমালোচকগণের "কাব্যে সুবিচার চাই" ইত্যাদি কথার সহিত আমাদের সম্পূর্ণ মতবিরোধ। উৎকৃষ্ট নীতি ও উৎকৃষ্ট নাটক একই শিক্ষা প্রদান করে, উভয়েই স্পষ্টবাক্যে আমাদিগকে মনে করিয়া দেয়,—"শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর"। মনুষ্যজীবনের যে পরিণাম, সংসার-তাড়িত মনুষ্য-জীবন-চিত্রেরও তাহাই পরিণাম। ঐ যে জনাকীর্ণ সভাস্থলে ঘোর বাগ্মী স্বদেশী বিদেশী উভয়কে দক্ষিণে বামে কশাঘাত করিতেছেন, তাঁহার পরিণাম কি? আর ঐ যে পতিবিয়োগবিধুরা বঙ্গীয়বালা, নীরবে—অতি নীরবে, অশ্রুধারা বর্ষণ করিতেছে,—উহারই বা পরিণাম কি? ঐ যে কঠোর-প্রাণ, কবাট-বক্ষঃ, বজ্রমুষ্টি সাহেব স্বীয় দুর্ব্বল ভৃত্যকে পাশব-বলপ্রয়োগে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া ঘর্ঘরচক্র শকটে ভজনালয়ে গমন করিলেন উঁহারই বা পরিণাম কি? আর ঐ যে শতগ্রন্থিবসনা ভিখারিণী রোগ-শোক-জরাজীর্ণা হইয়া রাজপথপার্শ্বে পড়িয়া আছে, উহার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর কেহ শুনিয়াও শুনিতেছে না, উহার রক্তহীন পাণ্ডুরচ্ছবি কেহ দেখিয়াও দেখিতেছে না, উহারই বা পরিণাম কি? সকলেরই একই পরিণাম, সেই সার্দ্ধত্রিহস্তপরিমিত ভূমিখণ্ডোপরি "দৃষ্টিহীন নাড়ীক্ষীণ, হিম কলেবর"।

এই জন্যই সকল ভাষারই উৎকৃষ্ট নাটকের পরিণাম সেইরূপ হৃদয়-ভেদ কর। নাটক বলিয়া নহে, উৎকৃষ্ট কাব্য মাত্রেরই পরিণাম এইরূপ। বাল্মীকি ও ব্যাসদেবের অদ্ভুত গ্রন্থদ্বয়, হোমরের ইলিয়দ্ প্রভৃতি উকৃষ্ট কবিসৃষ্ট পৌরাণিক কাব্য বা মহাকাব্যগুলির পরিণামের বিষয় সকলেই জানেন। সুতরাং নাটকের পরিণামও যে সেইরূপ ঘোর বিষাদপূর্ণ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? নাটকের বিষাদ-পরিণাম সম্বন্ধে কএকটি আপত্তি আছে। আমরা বলিয়াছি যে "মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ" এই কথাই স্বাভাবিক এবং নাটকে তাহাই থাকে মাত্র। ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে, স্বাভাবিক হইলেই যে কাব্যোপযোগী হইবে, এমত কি কথা আছে? বরং কবির সৃষ্টি সংসারসৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। কবি আবেগপূর্ণ চরিত্র সৃষ্টি করিয়া কল্পনার সাহায্যে মানবমণ্ডলীকে শিক্ষা প্রদান করেন। সুতরাং তাঁহার সংসার-কৌশল স্বাভাবিক না হইয়া বরং অনেকটা কাল্পনিক; সুতরাং কাব্যের পরিণাম সংসারের পরিণামের অনুরূপ না হইলেও ক্ষতি নাই। যাঁহারা এইরূপ যুক্তিবাদ প্রদর্শন

করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলেন যে, " কাব্যশাস্ত্রবিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাম্", যাঁহাদের মতে কাব্যকলাপ তাসক্রীড়ার মত কাল কাটাইবার ও বিনোদনের সামগ্রী, তাঁহাদের সহিত আমাদের কোন তর্ক নাই। কিন্তু যাঁহারা শিক্ষাবলে কাব্যের উচ্চতর উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিয়াছেন, এবং মহর্ষি বাল্মীকি বা কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে সংহিতাকারগণ অপেক্ষা আন্তরিক শ্রদ্ধা করেন, তাঁহাদিগকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, বিষাদ-পরিণাম নাটকহইতে আমরা গভীরতর উপদেশ প্রাপ্ত হই, এবং সেই সকল উপদেশ গভীরতর খাতে হৃদয়ে বহিতে থাকে। কেন থাকে তাহা পরে দেখান যাইতেছে; এক্ষণে আপত্তিকারিগণের আর দুই একটি হেতুবাদের কথা বলিব।

অনেকে বলিতে পারেন যে, কবিগণকে নীতিশিক্ষক বলিয়া স্বীকার করিলেও বিষাদ-পরিণাম নাটক যে অন্য নাটক অপেক্ষা অধিকতর নীতিপূর্ণ একথা স্বীকার করা যায় না। প্রথম আপত্তি এই যে, সংসারে এত বিষাদ আছে যে, বিষাদে হৃদয় দ্রাবিত করিবার জন্য ঐরূপ কাব্য নাটক পাঠের কোন প্রয়োজন নাই। এই তর্ক সারগর্ভ হইলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, সাগর দেখিয়াছে সে আবার বায়রণ বা কালিদাস হইতে কি সাগরবর্ণন পাঠ করিবে? যুবক যুবতী যদি বৃন্দাবন ভ্রমণ করিয়া থাকে, তবে তাহারা আর জয়দেবভারতী শ্রবণ করিয়া কি করিবে? ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে—যখন সংসার রহিয়াছে তখন আবার কাব্য কেন? স্বভাব-সৃষ্টিই যথেষ্ট, ইহার উপর আবার কবির কল্পনা কেন? বাস্তবিক বিবেচনা করিতে গেলে কবির কাব্য এরূপ অপদার্থ পদার্থ নহে। কাব্যজগৎ এই জড়-জীব-জগতের সার,—এখনকার ভাষায় বলিতে গেলে এসেন্স বা আরক। কাব্যশোধিত সংসার এক অপূর্ব্ব সামগ্রী। কাব্যে যে তীব্রতা, যে উপকারিতা আছে, সংসারে তাহা নাই। কেন না সংসার যদি গোলাপবারি হয়, তবে আমরা বলিব কাব্য আতর; আবার সংসার যদি দ্রাবক হয় তবে কাব্য মহাদ্রাবক। কাব্য তীব্র বলিয়াই অধিকতর উপকারী। সুতরাং সংসারে বিষাদ আছে বলিয়া কাব্যনাটকে বিষাদ থাকিবার প্রয়োজন নাই, এ-কথা সারগর্ভ নহে। সংসারে তুমি আমি আছি বটে, আমাদের বিষাদও আছে, কিন্তু কাব্যে রাম ও হরিশ্চন্দ্র, জোভ ও হেমলেট, ওথেলো ও লীয়র, সীতা ও দেসদিমোনা আছেন, সংসারে সেরূপ কোথাও নাই। যে জন্য কর্পূর থাকিতেও কর্পূরের আরকের প্রয়োজন সেই জন্যই কাব্যের প্রয়োজন। আর এক প্রকার আপত্তি আছে। —কেহ কেহ বলেন যে, বিয়োগ-পরিণাম নাটকের একটি মহান্ দোষ এই যে, ইহাতে মনোমধ্যে সহানুভূতি সমুত্থিত হয়, অথচ তাহা হইতে কোন কার্য্য হয় না।

এইরূপ বারংবার হইলে মনের এমনই একটি স্বভাব হইয়া উঠে যে তাহাতে কেবল সহানুভূতিই হইতে থাকে, সেই চিত্তবেগ কখনও কার্য্যে পরিণত হয় না। একথাটি সম্পূর্ণ মনুষ্যস্বভাবের গতির বিপরীত কথা। মহাবীর আলেকজাণ্ডর জপমালার মত হোমরের অদ্ভুত গ্রন্থ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন; এরূপ প্রবাদও আছে যে, উহার সমস্তই তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। কে বলিবে যে সেই বীররসাত্মক মহাকাব্য পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে কেবল বীররসের উদ্দীপনা হইত, কখন প্রবর্ত্তনা হইত না। মহাবীর নেপোলিয়ন সেইরূপ জুলিয়সের স্বরচিত ইতিহাস অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। নেপোলিয়ন কি কিছুই বীরের কার্য্য করেন নাই? চৈতন্যদেব দিবারাত্রি বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতির কৃষ্ণ-ভক্তির পদাবলী পাঠ করিতেন। গৌরাঙ্গ কি কেবল ভক্তিতেই অভিভূত রহিয়া ছিলেন, কোন কার্য্য করেন নাই? বালকবালিকার মনে যত ভয়ের ভাব উদ্দীপন করিবে, কার্য্যকালে তাহারা তত ভীত থাকিবে। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণেরও এইমত। তাঁহারা বলেন যে, কোন রসের স্থায়িভাব হইতেই কার্য্যের উৎপত্তি হয় এবং সকল কাব্যেরই প্রধান উদ্দেশ্য হৃদয় মধ্যে স্থায়িভাবের উদ্দীপনা। উৎকৃষ্ট নাটকের স্থায়িভাব শোক। যিনি কাব্যের লুক্রিশিয়া বা দ্রৌপদী দেখিয়া শোকতপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, সে নব্য টারকুইন বা জয়দ্রথ দেখিলে অবশ্য তাহার আক্রমণ বিফল করিতে অগ্রসর হইবে। আরও এক প্রকার আপত্তি আছে; প্রকৃত প্রস্তাবে সেটি আপত্তি নহে, আব্‌দার। অনেকে আব্‌দার করেন যে, ভগবানের সৃষ্টিতে সুবিচার হউক না হউক, অন্ততঃ কাব্যে সুবিচার চাই। এসকল কাব্যপ্রিয় শিশুপ্রকৃতির সমালোচক মহর্ষি বাল্মীকিকে দেখিতে পাইলে এইরূপে সৎপরামর্শ প্রদান করিতে প্রস্তুত আছেন,—'মহর্ষে! আপনি আপনার মহাকাব্যের পরিণামে সীতাদেবীকে পাতালগতা করাইয়া সুবিচারকের কার্য্য করেন নাই। আহা! সেই দিন যদি রামচন্দ্র সীতা সতীকে বামে বসাইতেন, আর কুশী-লব যদি তাঁহাদের অঙ্কে উপবিষ্ট হইত, তাহা হইলে কি শোভা হইত! কি আহ্লাদের কথা হইত! আবার কিছুদিন পরে অষ্টভ্রাতার বিবাহের পর সীতা ভগিনীত্রয়সহ নবদম্পতী চতুষ্টয়কে বরণ করিয়া গৃহে লইতেছেন, দেখিতে কি সুন্দর হইত!' এই সকল সমালোচকের ইচ্ছা যে, নিমজ্জমানা ওফেলিয়াকে কোন ধীবর গৃহে লইয়া গিয়া রাখে, আর হেমলেট লোয়ার্টিসকে বধ করিয়া ও ক্লাদিয়সকে কারারুদ্ধ করিয়া গোরার বাজনা বাজাইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিয়া লইয়া আসেন। ইহাদের ইচ্ছা যে বৃদ্ধ লীয়র কর্দেলিয়ার পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া তাহার বড়মাসীদের রীতি চরি-

ত্রের ব্যাখ্যা করেন। ইহাদের ইচ্ছা যে স্ত্রীবধোদ্যত ওথেলোর নিকটে কণ্ঠাগত-প্রাণ ইয়াগো মুমূর্ষূক্তিতে আপনার ষড়যন্ত্রের কথা স্বীকার করে এবং যেরূপ একটি ক্ষুদ্র শিশু দ্বাপরের ভাদ্রাষ্টমীর নিশীথে বসুদেবের ক্রোড়হইতে যমুনায় স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল, কিছু দিন পরে সেইরূপ একটি নীলকান্ত কালমাণিক ওথেলোর অঙ্কহইতে দেশদিমোনার গলা জড়াইয়া ধরে। এ সকল বালকের আব্দার বালকের মুখে শুনিতে মন্দ শুনায় না, কিন্তু বঙ্গীয় সমালোচকগণ যখন ড্রাইডেনের চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিতে করিতে কুন্দনন্দিনীর সমালোচনার উপলক্ষে এই সকল কথার উল্লেখ করেন, তখন আমরা হাস্য সংবরণ করিতে পারি না।

যদি কর্দ্দেলিয়া আবার বাঁচিয়া উঠিতেন, তবে লীয়র যাহা বলিয়াছিলেন বাস্তবিক তাহাই প্রকৃত হইত। তাহা হইলে লীয়রের যে এত শোক তাহা কেবল উপন্যাসের রচনাভঙ্গীমাত্র, আর কিছুই নহে। সেক্ষপিয়র কিন্তু তাঁহার উৎকৃষ্ট কাব্য কয়খানিতে সে প্রকার উপন্যাস রচনার চেষ্টা করেন নাই। তিনি এক এক খানিতে এক একটি গম্ভীর রসের অবতার করিয়া গিয়াছেন। আজি লীয়রের জন্য কাঁদিতেছি, কাল আবার লীয়রের দৌহিত্রের সঙ্গে কৌতুককলাপ দেখিয়া আহ্লাদিত হইতেছি, এরূপ কাব্য লীয়রনাটক নহে। লীয়রের জন্য যে দুঃখ তাহা আমাদের হৃদয়ে চির-অঙ্কিত রহিয়াছে। সেই রূপ হেমলেট, সেই রূপ ওথেলো। সসত্ত্বা শকুন্তলাকে যখন দুষ্মন্ত পরিবর্জ্জন করেন, তখন কেবল দুর্ব্বাসার উপরেই ক্রোধ হয়, শকুন্তলার জন্য তত দুঃখ হয় না, কেননা জানি যে আবার সেই রাজদম্পতীর মিলন হইবে। কিন্তু চির-দুঃখিনী সীতার দুঃখের কথা স্মরণে আছে বলিয়া অদ্যাপি কেহ আপন কন্যার নাম সীতা রাখিতে পারে না। আমাদের পূর্ব্বতন মহর্ষিগণ বা পাশ্চাত্য কবিগণ যদি এখনকার যাত্রাকারগণের মত যুগলরূপের মিলন করিয়া সকল কাব্যের সমাপ্তি করিতেন, তাহা হইলে করুণরসের স্থায়িভাব আমরা কাব্যে কখনই দেখিতে পাইতাম না। তাহা হইলে হৃদয়ের প্রধান শিক্ষার অভাব থাকিত। হৃদয়ের প্রধান শিক্ষা এই রোগ-শোক-দুঃখ-দারিদ্র্য-জরা-জড়িত সংসারে, মানবহৃদয়ের প্রধান শিক্ষা করুণরসের স্থায়িভাবে। যে পরের দুঃখ দেখিয়া অন্তরের সহিত চিরদিন কাঁদিতে পারে, কখনও ভুলেনা, ইহজগতে তাঁহার নীতিশিক্ষার পরাকাষ্ঠা হইয়াছে। এক দিন ছিল, এক কাল ছিল, যখন আর্য্যসন্তান সেইরূপ উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া পরের জন্য প্রাণ দিতে অগ্রসর হইতেন। তখন আর্য্যসন্তান বুঝিতেন যে, যে নদীতে জল ওদিকে যায় আবার এদিকে আসে, তাহা জোয়ার ভাটার নদী, সমুদ্র-উচ্ছ্বাসের লীলাখেলার সামগ্রী, কিন্তু কথনই গম্ভীর

নায়েগ্রা প্রপাতের মত আত্মার উচ্ছ্বাসক নহে। তখনই রামায়ণ মহাভারতের সৃষ্টি হয়। তাহার পর আর্য্যের অধঃপতন। এই অধঃপতনের পর না হইলে ভবভূতি কখনও রামসীতার পুনর্মিলনের কল্পনা করিয়া বালকবৃন্দের করতালির প্রত্যাশায় দণ্ডায়মান হইতেন না। তদবধি আমরা অধঃপাতে যাইতেছি,তাহাতেই আমরা এখন শোকের স্থায়িভাব যত্নপূর্ব্বক পরিহার করি। আর তাহাতেই নীলদর্পণ আমাদের তত ভাল লাগে না। বাস্তবিক ভারতবাসীর এখন আর হৃদয় নাই, মর্ম্ম নাই, আবেগ নাই। তীব্রতর, কঠোরতর, গভীরতর, গম্ভীরতর ভাব প্রকৃতিতে কিছুই নাই। এখন বালকের মত কখন তাথিয়া তাথিয়া আছে; কখন বা "খাবার দে না" করিয়া "মা মা" বলিয়া উচ্চরবে চীৎকার আছে; কখন বা "দিলি না" বলিয়া কেশাকর্ষণ করিয়া ভূমে গড়াগড়ি আছে; আর কখন বা রজ্জুতে সর্প বোধ করিয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া মুদিতনয়নে অবস্থান করা আছে। সকলই বালকের মত। হৃদয়মধ্যে কোন ভাবেরই স্থায়িত্ব নাই,গভীরতা নাই,প্রগাঢ়তা নাই। জলতলে শৈবালরাজির ন্যায় আমাদের হৃদয়ভাব সকল পবনদেবের স্বেচ্ছাচারফুৎকারে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিমে যাইতেছে; ভীমের ত্রিবেণী বন্ধনের ন্যায়, ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের ন্যায়, পাষাণে গভীরখাতে ক্ষোদিত নদীশয্যার মত চিরদিন একদিকে বহে না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মানসিক আবেগের বা অন্তঃপ্রকৃতির উচ্ছলিত তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতই নাটকের জীবন। এখন আর আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির প্রকৃত আবেগ নাই। মানসিক হ্রদে সামান্য কুলকলি আছে, কিন্তু গভীর প্রপাতের সহিত কল্লোল নাই। আমরা এখন বাতুলের মত হাসিতে হাসিতে কাঁদিয়া ফেলি, কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিয়া ফেলি। সুতরাং আমাদের মধ্যে এখন উৎকৃষ্ট নাটকের প্রত্যাশাও করা যাইতে পারে না। ভাল নাটক যে হয় না, সে এখন আমাদের জাতীয় প্রকৃতির বৈগুণ্য হেতু; কেবল গ্রন্থকারগণের দোষে নহে। এই জন্য আমাদের দেশে ভাল নাটক হয় নাই, অথচ ভাল প্রহসন হইয়াছে। এরূপ প্রহসন অন্য কোন দেশে আছে কি না সন্দেহ। কবি মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী, পদ্মাবতী, শর্ম্মিষ্ঠা নাটকগণনায় কোথায় স্থান পায় তাহা নির্দ্দেশ করাও কঠিন; কিন্তু দত্তজকৃত "একেই কি বলে সভ্যতা" ও "বুড়শালিকের ঘাড়ে রোঁ" নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থদ্বয় প্রহসনের আদর্শ। আবেগপূর্ণ মানবচরিত্রের কিছুই তাহাতে নাই, কিন্তু যেরূপ গৌরাঙ্গের জীব সকল এখন বাঙ্গালায় ক্রীড়া করিতেছেন, তাহাদের চিত্র সেই প্রহসনদ্বয়ে সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে।

তাহার পর পণ্ডিতবর রামনারায়ণ তর্করত্ন। বিবেচনা করিতে গেলে তিনি পণ্ডিতের পদ্ধতিতে প্রহসনের কবি, নাট-

কের কেহ নহেন। তাঁহার কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব পাঠ করিলে, কুলীন কন্যাগণের কথাবার্ত্তা শুনিলে, যেমন সকলই গড়াপেটা বলিয়া বোধ হয়, মর্ম্মকথা যেরূপ কর্ণে বাজে সেরূপ হয় না। তাঁহার নায়িকার মধ্যে একটি বিবাহের কথা শুনিয়া বলিলেন—

" জাহ্নীব যাইয়া বুঝি জাহ্নবীর ঘাট।
পাইবে সুন্দর বর সুন্দরীর কাঠ॥ "

সুতরাং তর্করত্নের নাটক বিষাদ-পরিণাম হইয়াও একরূপ প্রহসন। তর্করত্নের নাপিতিনী ভাল, যখন সে অলক্তক-সজ্জা লইয়া—

" বাড়ী মোর বংশীপুরে, দেখাযায় কিছুদূরে,
ঘেরা ঘোরা ঘর দুইখানি। "

বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে দিতে রঙ্গাঙ্গনে প্রবেশ করে, তখন আমরা তাহাকে ভারতের হীরার সহচরী করিতে প্রস্তুত হই, আর তাঁহার উদরপরায়ণ শর্ম্মা যখন—

" ঘিয়েভাজা তপ্ত লুচি, দুচারি আদার কুচি
কচুরি তাহাতে খান দুই "

বলিয়া উত্তম ফলার বর্ণনা করিতে থাকেন, তখন তর্করত্নের নরম লেখনীর গুণে সত্য সত্যই আমাদের রসনা রসাল হইয়া উঠে, এবং পণ্ডিতবর রামনারায়ণকে বৈদিক-কুল-চূড়ামণি বলিয়াই বোধ হয়। তর্করত্নের নবনাটকও সেই ;—নাটক নহে, প্রহসন। নবনাটকের সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু গবেশ বাবুকে ভুলি নাই।

তাহার পর দীনবন্ধু। দীনবন্ধু এককালে প্রকৃত দীনবন্ধুই ছিলেন। প্রপীড়িত প্রজার জন্য দীনবন্ধু যাহা করিয়াছেন, এখন পর্য্যন্ত বাঙ্গালার কোন গ্রন্থকার তাহা করেন নাই। তাঁহার অক্ষয়-কীর্ত্তি —সেই নীলদর্পণ। অনেকে মনে করেন যে, নীলদর্পণ কেবল সাময়িক তরঙ্গের উচ্ছ্বাস মাত্র; এই কথাটা কতক দূর সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। নীলদর্পণ যদি সত্য সত্যই এক দিন বা দশ দিনের জন্য হইত, যদি জেতৃবর্গের অত্যাচার কেবল এক দেশেই পর্য্যাপ্ত হইত, তাহা হইলে এসংসার সোণার সংসার, এভারত সোণার ভারত। আমেরিকায় যে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাও একরূপ নীলদর্পণের অভিনয়। তবে সেখানে শত সহস্র বিন্দুমাধব ও নবীনমাধব একবারে উত্থান করিয়াছিলেন, আর এখানে কচিৎ এক আধ জন দেখা দেন এইমাত্র প্রভেদ। বহুদিন হইল মিস্ ষ্টোয়ে অঙ্কলটমস্ কাবিন লিখিয়াছেন, তাহাও নীলদর্পণ— আর বৃটিশ গায়েনার শ্রমজীবী গৃহস্থগণের কষ্ট বর্ণনা করিয়া একজন বিলাতের বারিষ্টার যে কুলী নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহাও নীলদর্পণ। যত দিন এই বণিগ্বৃত্তিক রাজপুরুষ অন্নসংস্থান জন্য এদেশে আগমন করিবেন, আর যত দিন ইংরেজ রাজবিচারে শ্বেত-কৃষ্ণের প্রভেদ করিবেন, ততদিন নীলদর্পণ আমাদের জাতীয় জীবনের যথার্থ চিত্র থাকিবে। নরহত্যাকারী ফুলরের উপযুক্ত শাস্তি হয়

নাই, এই কথা নবাগত গবর্ণর বলিয়াছিলেন বলিয়া, দেখিতেছ না এখনকার পি পি উড ও ডবলিউ ডবলিউ রোগগণ কিরূপ গর্জ্জন করিতেছেন; তবে আর কোন্ প্রাণে বলিব যে নীলদর্পণ ক্ষণস্থায়ি-সমাজচিত্র মাত্র। তাহা যে নহে এই আমাদের দুঃখ।

দীনবন্ধু বাঙ্গালার উৎকৃষ্ট নাটক-কার। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নীলদর্পণ রচনার পর হইতেই তাঁহার কাব্য রস-তরল হইতে থাকে। তাহার পরিচয়—সধবার একাদশী। তাঁহার নিমেদত্ত কবির একটি অদ্ভুত সৃষ্টি। নিমেদত্ত স্বর্গভ্রষ্ট সয়তান, তাহার সম্মুখে কাচপাত্রে নরকাগ্নি; নিমচাঁদ, এখন আর স্বর্গে অধিকার নাই বলিয়া স্বর্গের উপর রাগ করিয়া, অবাধে সেই নরকাগ্নি দিবারাত্রি গলাধঃকরণ করিতেছে। এই স্বর্গ-নরক-সমষ্টিকে দীনবন্ধু তরলমতি বঙ্গীয় যুবকের দলে স্থাপিত করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার নিমচাঁদ, পূর্ণকলেবর হইয়াও স্ফূর্ত্তি পায় নাই। নিমচাঁদের প্রয়োজন ছিল কেবল এক নরকাগ্নি। এ স্বর্গভ্রষ্ট সমাজে তাহার অভাব কোথায়। যে নরকাগ্নি হরিশ্চন্দ্রকে অকালে অতলে লইয়া গেল, যে অগ্নিতে রামগোপাল এতদিন দগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা অনুসন্ধান করিতে অটলের টেবিলে, গোকুলের উপবনে, কাঞ্চনের ভবনে, নিমচাঁদকে পাঠান কেন? নিমচাঁদকে সেই হরিশ, সেই রামগোপাল মধ্যে স্থাপিত করিতে হয়। তবে নিমচাঁদ স্ফূর্ত্তি পাইত। আর নীলদর্পণ-কার যেরূপ পল্লীগ্রামের চিত্র প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেইরূপ নাগরিক চিত্রের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া অধিকতর যশস্বী হইতেন। তাহা হয় নাই; দীনবন্ধু ক্রমেই তরলভাব অবলম্বন করেন। সেই জন্য তিনি নবীনতপস্বিনীতে নাটক লিখিতে প্রহসন করিয়াছেন, আবার জামাইবারিক প্রহসন লিখিতে গিয়া নাটক করিয়াছেন। তাঁহার লীলাবতীর নায়ক নায়িকাকে যত না মনে পড়ে, তাহার নদেরচাঁদকে তাহার অধিক মনে পড়ে। প্রহসনে দীনবন্ধু অদ্বিতীয়।

তাহার পর ময়শোরূপেয়াকার। তাঁহার নায়ক নায়িকা ঠিক লীলাবতীর মত, কিন্তু তাহার সাতুলাল একটি প্রকৃত শোধিত চিত্র। একজন সমালোচক বলিয়াছেন, সাতুলাল গাঁজায় নিমচাঁদ। সুতরাং বাঙ্গালার পূর্ব্বতন নাটক-কারগণ সকলেই প্রহসন পটু। কেবল এক নীলদর্পণ-কারই প্রগাঢ় ও নীলদর্পণ প্রকৃত নাটক-পদ-বাচ্য।

এইক্ষণ আধুনিক বাঙ্গালা নাটক।

আধুনিক বাঙ্গালা নাটক সমুদ্রবিশেষ, একে একে তাহার তরঙ্গ গণনা করা আমাদের অসাধ্য। তবে সৌভাগ্যক্রমে যে কএক খানি নাটক আমাদের সম্মুখে আছে, সেই গুলিকে আদর্শ করিয়াই আমরা আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিতে পারি। আধুনিক নাটক প্রধানতঃ তিন

শ্রেণীর। (১) দেশ-হিতৈষিতা-প্রাসঙ্গিক। (২) অনুবাদ-মূলক। (৩) প্রণয়-জীবন-নাটক।

আমাদের উল্লিখিত কয়খানি নাটক এই তিন শ্রেণীর; তবে দুই একখানি একটু বিশেষ সমালোচনের যোগ্য। শরৎ সরোজিনী * গ্রন্থ নিতান্ততরলমতি বালকের জন্য নহে। শরৎ সরোজের প্রণয় প্রগাঢ় ও পরীক্ষিত, শরতের দেশহিতৈষিতা তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে মধ্যে মধ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। আর ভুবনমোহিনীর প্রতিহিংসাও নিতান্ত অশ্রদ্ধার সামগ্রী নহে। ইহার ভাষা প্রায়ই প্রগাঢ়। ছন্দোবদ্ধ হইলে আরও অধিকতর আবেগপূর্ণ হইত। ৫৫ পৃষ্ঠায় ভুবনমোহিনীর উক্তি মধ্যে এইরূপ আছে;

"এই ভেবে মনে মনে প্রতিজ্ঞা কল্লেম, (দন্ত-ঘর্ষণ) যে মতিলালের রক্তে চান করে আমার মেয়ে জনম সার্থক করব।"

আমরা বলি এইরূপ স্থলে অমিত্রাক্ষরছন্দে হইলে অধিকতর আবেগপূর্ণ হইত।

"মনে মনে তাই ভাবি করিনু প্রতিজ্ঞা,
মতিলাল পাপিষ্ঠের রক্তে স্নান করে,
আমার এ নারীজন্ম করিব সার্থক।"

যাহাই হউক গুণগণনায় শরৎ-সরোজিনী প্রথম স্থানীয়া ও শরৎ-সরোজিনী-কার আধুনিক নাটক-কারগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান।

(২) তাহার পর হেমলতা। হেমলতা নাটকে দেশহিতৈষিতার সঙ্গে সঙ্গে বীররস উদ্ভাবনের চেষ্টা আছে। আমাদের পূর্ব্বকথিত নানা কারণে হরলাল বাবু ইহাতে বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কিন্তু গ্রন্থকার যে কেবল প্রণয় লইয়া মত্ত না হইয়া সঙ্গে সঙ্গে টপ্পা-প্লাবিত দেশে বীররস উদ্ভাবনের চেষ্টা করিয়াছেন, ইহাতেই তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। হেমলতার কমলাদেবীতে আমরা বাৎসল্য রসের বিলক্ষণ পরিপুষ্টি দেখিতে পাই।

৩। তাহার পর মহারাষ্ট্রকলঙ্ক। ইহাতে যবন কলঙ্ক ঔরঙ্গজিবের হস্তে মহারাষ্ট্র-কলঙ্ক শম্ভুজির দুর্দ্দশার কথা বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থে সাময়িক চিত্র প্রদর্শনের অনেক ব্যতিক্রম আছে, আর এখনকার প্রথামত তুলিকার উপর তুলিকা ঘষিয়া সুদীর্ঘ আত্ম-সমালোচন ও বক্তৃতা আছে। বন্ধুঘাতক শম্ভুজি গদ্যে পদ্যে আড়াই পৃষ্ঠা স্বগত চালিয়াছেন; সুতরাং আবেগের কঠোর আঘাত ও ভাষার প্রগাঢ়তা ইহাতে অতি অল্পই আছে। কিন্তু তথাপি মহারাষ্ট্র-কলঙ্ক দ্বিতীয়শ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান নাটক।

তাহার পর চারি খানিতে একই সময়ের চিত্র। তন্মধ্যে গৌরবে প্রথম 'যৌবনে যোগিনী'। ইহার অধিনায়ক একদিকে পৃথ্বীরাজ প্রভৃতি, অন্যদিকে কুতবুদ্দীন প্রভৃতি।

দ্বিতীয় ভারত বিজয়। ইহারও অধিনায়কগণ পৃথ্বীরাজ, জয়চন্দ্র, একদিকে; অন্যদিকে কুতব, মামুদ, রহিম প্রভৃতি।

* প্রথমসংস্করণের সময়ে আমরা এই গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছি।

তৃতীয়। 'ভারতের সুখশশী যবন কবলে' ইহাতেও ঐ সকল অধিনায়ক।

চতুর্থ। 'জয়পাল'। ইহাতে পঞ্চনদেশ্বর জয়পাল ও তৎপুত্র অনঙ্গপাল একদিকে, অন্যদিকে পূর্ব্বোক্ত মুসলমান আক্রমণকারিগণ।

ভারতের সেই দুর্দ্দশার দিন বাঙ্গালি বা ভারতবাসী যদি এখন উজ্জ্বল অক্ষরে, আবেগ-সহকারে, প্রগাঢ়ভাষায় বা গভীরভাবে চিত্রিত করিতে পারিবে, তাহা হইলে আমাদের ভাবনা কোথায়? ভারতের এখনও সে দিন আসে নাই।

এই জন্যই বিদ্যারম্ভের পৃথুরাজ ও মিত্রজের জয়পাল জীবিতেশ্বরি, জীবিতেশ্বরি, বলিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন *। আর এই জন্যই ভারতবিজয়ের উপসংহারে আমরা ঝিঁঝিট, মধ্যমানে এইরূপ সঙ্গীত শুনিতে পাই :—

'আহা কি সুন্দর শোভা কর সবে দরশন।
পবিত্র-প্রণয়-ডোরে বাঁধা প্রণয়ী দুজন।'

যে জাতি এখনও দেশের কথা ভাবিতে গিয়া গৃহিণীর অলঙ্কারের সৌন্দর্য্যের জন্য স্বর্ণকারের সহিত কলহ করে, সেই জাতি হইতে আমরা রসমাধুর্য্য বিনা অধিক আর কি প্রত্যাশা করিব?

তাহার পর বাবু হরলাল রায় প্রণীত দুইখানি অনুবাদিত নাটক। সংস্কৃত বেণীসংহার হইতে শত্রুসংহার ও সেক্ষপিয়রের মেকবেথ্ হইতে রুদ্রপাল। সেক্ষপিয়রের প্রগাঢ়তা বাঙ্গালা রুদ্রপালে অনেক সময়েই রক্ষা হয় নাই বলিলে, কেবল প্রকারান্তরে সেক্ষপিয়রেরই প্রশংসা করা হয় ও প্রগাঢ়তায় বাঙ্গালা ভাষা এখনও অনেক উন্নতিসাপেক্ষ ইহাই বলা হয়। রুদ্রপাল অপেক্ষা শত্রুসংহার অনুবাদে ভাল হইয়াছে।

অবশিষ্ট চারিখানি প্রণয়-জীবন নাটক। বাঙ্গালির প্রণয়ের অর্থ বেহাগের গান—'সখিরে আমায় ধর ধর'—কোমল, মৃদুল, এলায়িত, আবেশময় রসালসপূর্ণ। সুতরাং প্রণয়-জীবন নাটকে আর কিছু না থাকিলেও কোমলতা থাকে। প্রণয়েরপ্রতিফলে সেইরূপ কোমল, ললিত পদবিন্যাস আছে। আর 'প্রকৃত বন্ধুর' বনদেবীতে সেইরূপ সরল লীলাময় আত্মোৎসর্গ আছে। কিন্তু কুমুদ-কামিনীতে এইরূপ কিছু না থাকিলেও, এক প্রমোদ-মনোরমাতেই সকল আছে। উহাতে রাজা আছে, পুরোহিত আছে, ভট্টাচার্য্য আছে, বিদূষক আছে, জমীদার আছে, ইয়ারগণ আছে, মন্ত্রী, শিক্ষক, ঘটক, প্রতিহারী, দূত, পান্থ, ভৃত্য, রাজরাণী, রাজকন্যা, সুদীর্ঘ বক্তৃতা, নানারসের গীত, রজ্জুকাষ্ঠ, মৃত্তিকা, গোময়, তুষ, ছাই, পাঁশ, ভস্ম সকলই আছে; নাই কেবল গ্রন্থকারের শিক্ষা কিংবা শক্তির পরিচয় ও তাঁহার ভাষাজ্ঞান। অনেক নাটককার সং-

* ভারতের সুখশশী যবনকবলের ১৩৭ পৃষ্ঠা ও জয়পাল নাটকের ১১৮ পৃষ্ঠা দেখ।

স্কৃত বা ইংরেজী নাটক পড়েন না,প্রমোদ-মনোরমা রচয়িতা বাঙ্গালা কোন নাটক পর্য্যন্তও পড়েন নাই। প্রমোদ-মনোরমা আধুনিক অপকৃষ্ট বাঙ্গালা নাটকের আদর্শ।

আমরা নাটক, বাঙ্গালা নাটক ও আধুনিক বাঙ্গালা নাটক সমালোচনা করিতে গিয়া মানবচরিত্রের বৈচিত্র্য হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে আধুনিক বাঙ্গালা নাটকের অপকৃষ্ট গ্রন্থরূপ অধঃপতিত বাঙ্গালার অন্ধতম কূপে আসিয়া পতিত হইয়াছি।

এক্ষণে এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহারে সংক্ষেপে সারসংগ্রহ করিব।

মনুষ্য নানারূপে তাড়িত। সংসার-তাড়িত মানব-বিশেষের পরিবর্ত্তন ও পরিণাম প্রদর্শন করা নাটকের উদ্দেশ্য। মনুষ্য-হৃদয়ের আবেগ-পরম্পরার চলাচলে এই পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। জীব-শরীরে শোণিতসঞ্চালন যেমন জীবনী শক্তির মূল; আবেগচলাচল সেইরূপ নাটকের জীবন। আবেগপূর্ণ কথোপকথন বা স্বগত আত্মচিত্তপরীক্ষা বা কণ্ঠোচ্ছ্বাস নাটকের শরীর। তরঙ্গায়িত বা ছন্দোবন্ধ রচনাই নাটকের উপযুক্ত পরিচ্ছদ। অন্য পরিচ্ছদে একরূপ চলে, কিন্তু সাজে না। উৎকৃষ্ট নাটকের পরিণাম অতীব শোককর; এরূপ না হইলে ভাবের প্রগাঢ়তা হয় না, এবং রসের স্থায়িত্ব হয় না।

উৎকৃষ্ট কাব্যনাটক রচনার জন্য ভাষার প্রগাঢ়তা অবলম্বন করা আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য। নহিলে রসের ঘনীভাব হয় না। ভাষার প্রগাঢ়তা হইতে আমাদের ভাবের গম্ভীরতা হইবে, তাহা হইলে ক্রমে আমরা কার্য্যকর মনুষ্য হইব। এখন আমাদের যেরূপ জাতীয় স্বভাব, আর যেরূপ এলায়িত ভাষা, ইহাতে উৎকৃষ্ট কাব্য নাটকের উৎপত্তি হওয়াই অসম্ভব। ভাল প্রহসন হইতে পারে, তাহাই হইয়াছে। মধুসূদন, রামনারায়ণ, দীনবন্ধু, ইহারা সকলেই প্রহসন লেখক। প্রহসনে বাঙ্গালা অদ্বিতীয়। আধুনিক বাঙ্গালা নাটকে কেবল দুই এক খানি ব্যতীত সকল গুলিই অসার। যেখানে দেশহিতৈষিতা উদ্দীপনের চেষ্টা, সেখানে গ্রন্থকার প্রায়ই অকৃতকার্য্য। বাঙ্গালি দেশহিতৈষিতা কহিতে শিখিয়াছে, মর্ম্মকথায় দীর্ঘশ্বাসে এখনও অপরের হৃদয়ে দেশবাৎসল্য উদ্দীপন করিতে শিখে নাই। কোমল বাঙ্গালি একটু কোমল প্রণয় লিখিতে,বলিতে শিখিয়াছে। অপকৃষ্ট নাটকগুলি তাই লইয়াই ব্যস্ত। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, আবারও বলি—মর্ম্মে যার পীড়া, গাত্রে যার কশাঘাত, গৃহে যার অন্নকষ্ট,বাহিরে যার দণ্ডবিধি,মস্তকে যার অগ্নিবৃষ্টি,পদে পদে যার বিপদ, সে কেন আধ্‌ধার তালে ঝিঁঝিট রাগিণীতে প্রণয়ের গীত গাইয়া বেড়ায়। বঙ্গবাসিন্‌ একবার প্রগাঢ় ভাষায় কঠোরভাব উদ্দীপন করিবার চেষ্টা কর দেখি।

অনন্ত সুখ।

আহা! কি সুন্দর নিশি মধুময়,
শুক্ল-কলেবরা, শোভার নিলয়,
সুনীল ললাটে পূর্ণ শশধর!—
রজতের চাপ শান্ত মনোহর;
মৃদু নীল-রুচি অমল অম্বরে,
শ্বেতাম্বুদ-দাম মন্থরে বিহরে;
নিশি-অশ্রুজল, তরুর শিখরে,
চন্দ্রের কিরণে ঝলমল করে!
উচ্ছ্বাসিয়া বয় নৈশ সমীরণ,
সৌরভের সনে মৃদু পরশন;
চারু-চন্দ্রচ্ছবি তরঙ্গিণী-নীরে,
শত চন্দ্র চারু চঞ্চলিত ধীরে!
কোলে করি শশধর!
ঝলমলে নীলাম্বর!
চারু-কৌমুদিনী-মালা,
ফুটাইছে ফুল-বালা,
সরসীর নীল জলে,
তরল কৌমুদী খেলে;
মরি কিবা মনোহর মধুরা যামিনী!
তারা-কিরীটিনী চারু-চন্দ্রমা-শালিনী।

(উচ্ছ্বাস)

কোলে করি শশধর!
ঝলমলে নীলাম্বর!
চারু-কৌমুদিনী-মালা,
ফুটাইছে ফুল-বালা,
সরসীর নীল জলে,
চাঁদের কৌমুদী খেলে;
নীরব যামিনী, নীরব ভুবন,
নীরব সকলি শান্ত দরশন;
প্রকৃতি সুন্দরী, ক্লান্ত কলেবরা,
সারাদিন পরে নিদ্রায় কাতরা;
প্রকৃতির সনে জগত ঘুমায়,
নিদ্রিত পার্থিব প্রাণী সমুদায়;
নিদ্রা বিনোদিনী প্রতি ঘরে ঘরে,
শান্তি-সুধা-রাশি বিতরণ করে,
দরিদ্র দুঃখীরে সুপর্ণ কুটীরে!
পতিবিয়োগিনী চির-দুঃখিনীরে!
যুড়ান জননী, সুকোমল করে—
নয়নের জল, মুছি স্নেহ ভরে!
নীরব ভুবন মরি!
স্তব্ধ নিশি রূপেশ্বরী,
নীল চন্দ্রাতপ তলে,
থরে থরে মণি জ্বলে!
দূরে শ্যাম-তরুপরে,
শুধু ঝিল্লী রব করে,
মঞ্জুল বিপিনে নিশি কোকিল কুহরে!
মঞ্জুল কুমুদীকোলে ভ্রমরী গুঞ্জরে!

(উচ্ছ্বাস।)

নীরব ভুবন মরি!
স্তব্ধ নিশি রূপেশ্বরী,
নীল চন্দ্রাতপ তলে!
থরে থরে মণি জ্বলে!

দূরে শ্যামতরুপরে,
শুধু ঝিল্লী রব করে,
এহেন নিশীথে, মন্দির-ভিতরে,
একটি রমণী বসিয়া কাতরে!
নীরবে ফেলিছে নয়নের নীর!
বিশুষ্ক-বদন ম্লান দুঃখিনীর!
সুখদা নিদ্রার চিত্ত-মুগ্ধকরী,
ত্রিলোক-মোহিনী সুধার লহরী,
বিমোহিনী সুধা করি বরিষণ,
করেনি মুদিত সজল নয়ন!
নয়ন-সম্মুখে, কোমল শয্যায়,
শায়িত যতনে মলিন বিভায়!
প্রাণের নন্দিনী! সুবর্ণবল্লরী!
মানসের স্বর্ণ-সরোজ-সুন্দরী!
মলিনবদন শশী!
মলিন সৌন্দর্য্য-রাশি!
ম্লান নেত্র-নীলোৎপল!
ম্লান বপু সুকোমল!
কোমল বয়ান পরে!
অশ্রু ঝর ঝর ঝরে!
মেলিয়া নয়নপদ্ম জননীর পানে,
চাহিছে বিষাদে বালা বিকল পরাণে

(উচ্ছ্বাস)

মলিনবদন শশী!
মলিন সৌন্দর্য্য-রাশি!
ম্লান নেত্র-নীলোৎপল!
ম্লান তনু সুকোমল!
কোমল বয়ান পরে!
অশ্রু ঝর ঝর ঝরে!
শিয়রে জননী! স্নেহ-স্বরূপিণী!
নয়নের নীরে! তিতিছে দুঃখিনী!
শান্ত-প্রভাময়, নয়নের মণি!
অনন্ত তিমিরে, ডুবিবে এখনি!
শুকাবে এখনি নিদাঘে অকালে,
হৃদয়কুসুম জীবনমৃণালে!
চিরদুঃখিনীর, অতুল অমল—
একটি রতন সংসারে সম্বল!
সেই যতনের জীবনের ধনে,
হরিবে কৃতান্ত অদয় জীবনে!
অই অভাগীর সকলি ফুরায়,
জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত প্রায়!
জীবনকাননে তার,
যৌবন-কুসুম-হার,
পূর্ণ বিকসিত নয়!
এখনি বিশুষ্ক হয়!
হে বিধাতঃ বল নাথ!
কেন একুসুম-পাত—
অকালে, মিশায় কেন, চিরদিন তরে
জীবন-প্রবাহ তার, কালের সাগরে!

(উচ্ছ্বাস)

জীবন কাননে তার,
যৌবন-কুসুম-হার,
পূর্ণ বিকসিত নয়!
এখনি বিশুষ্ক হয়!
হে বিধাতঃ বল নাথ!
কেন একুসুম-পাত;
ইন্দুমতী নিশি চারুচন্দ্র ভাসে,
নীল জলধর ধরাতল হাসে!
দুগ্ধময় পথে কোমল অম্বরে,
ত্রিদিব-নন্দিনী মর্ত্ত্যে অবতরে!

সুরাঙা চরণ, শত-পদ্ম-জ্যোতি !
নিথর বদনে শশধর ভাতি !
মন্দার-দামে বিন্যস্ত কবরী,
যৌবন-সাগরে লাবণ্য-লহরী !
ত্যজিয়া অম্বর উতরি অবনী,
কুটীরের দ্বারে দাঁড়াল রমণী,
মরুভূমে হল বরিষা সঞ্চার !
অরণ্যে বিজনে ফুটিল মন্দার !
পারিজাত শত শত,
পরিমলে অবিরত,
রমণী-চরণ ধরি,
উল্লাসে ফুটিল মরি !
নন্দনের পরিমলে,
মুগ্ধ হল ধরাতলে ;
কাঞ্চন-প্রতীমা হেরি প্রকৃতি সুন্দরী ;
চমকিল ! ম্লান হল সচন্দ্র সর্ব্বরী !
(উচ্ছ্বাস)
পারিজাত শত শত,
ফুটি তথা অবিরত ;
রমণী-চরণ ধরি,
উল্লাসে ফুটিল মরি !
নন্দনের পরিমলে,
মুগ্ধ হল ধরাতলে।
কহিলা রমণী, কতক্ষণ পরে,
স্বর্গীয় নিক্কণে, সুমধুর স্বরে !
সরস বসন্তে কাকলি উগরি,
ঝঙ্কারিল বনে, পিক-কুলেশ্বরী ;
সুস্বর-লহরী, নৈশ সমীরণে,
ভাসিল সত্বরে, অমৃতের সনে ;
" এস প্রিয়তমে এসলো ভগিনী !
ত্যজ দুঃখময় নশ্বর-মেদিনী !
মায়ার শৃঙ্খল কাট এইবার !
অনিত্য সৃজন অলীক সংসার !
চল যাই সখি প্রফুল্ল বদনে,
চিরানন্দ ময় সুখের ভবনে, "
" রোগের অনন্ত জ্বালা,
তথায় নাহিক বালা,
তরুলতা প্রাণিচয়,
অনন্ত আনন্দময় !
অনন্ত সুখের ধাম,
চিরপুলকিত প্রাণ !
চির রুচি মধুমাস প্রফুল্ল কাননে !
চির রুচি মৃদু হাসি প্রাণীর বদনে ! "
(উচ্ছ্বাস)
" রোগের অনন্ত জ্বালা,
তথায় নাহিক বালা,
তরুলতা প্রাণীচয়,
সকলি আনন্দময়।
অনন্ত সুখের ধাম,
চির-পুলকিত প্রাণ ! "
নীরবিল বালা ; নীরবে যেমতি
শ্যাম-মৃদু-কণ্ঠ ; শ্যাম-রূপবতী—
কোকিল-কামিনী, কানন-অখিলে,
ললিত পঞ্চমে দূরে ঝঙ্কারিলে ;
মরণ-উন্মুখ বালিকা-বদন,
নীহার-নিসিক্ত মলিন-নয়ন !
হল ম্লানতর মুহূর্ত্তেক তরে,
ক্ষণে শিহরিল ক্লিষ্ট কলেবরে ;
কমনীয়-রুচি বদন-চন্দ্রিমা !
ধীরে ধীরে মরি ব্যাপিল নীলিমা !

বহিল সবেগে ধমনী-নিচয়!
উষ্ণ-রক্ত-স্রোত সুশীতল হয়!
জীবনের লীলা তার,
ফুরাইবে এইবার!
আঁধারিয়া দশ দিশি,
আসিছে অনন্ত নিশি!
জীবন-তপন হায়!
চির অস্তাচলে যায়!
রঙ্গ-ভূমে অভিনয়! হল সমাপন!
জীবনের যবনিকা হতেছে পতন।
(উচ্ছ্বাস)
জীবনের লীলা তার,
ফুরাইবে এইবার!
আঁধারিয়া দশ দিশি,
আসিছে অনন্ত নিশি!
জীবন-তপন হায়!
চির অস্তাচলে যায়!
নিরখিল বালা মনের নয়নে,
স্বর্গ সুন্দরীরে, স্বর্গীয় সান্দনে!
নিরখিল বালা, নয়ন উপরে
আনন্দময়ীরে, বসিয়া শিয়রে,
নিরখিল বিশ্ব অন্ধকারময়!
জনমের তরে সব শেষ হয়!
'জননী যাই মা' বলিল বদন!
নিরখিল মায়ে জন্মের মতন!
মার প্রতিবিম্ব, নয়ন-মুকুরে!
রহিল বিম্বিত! চিরদিন তরে,
মুদিল যুগল নয়ন মলিন!

জীবন তরঙ্গ হইল বিলীন!
মায়ের জীবন-বনে,
নিদাঘের পরশনে,
সোণার কুসুমে গাঁথা,
শুকাল বসন্ত-লতা!
সন্ধ্যার শারদশশী,
পশ্চিমে পড়িল খসি!
উজলি অম্বরদেশ রূপের কিরণে;
সুবর্ণের বিহঙ্গিনী উড়িল গগণে!
(উচ্ছ্বাস)
মায়ের জীবন-বনে,
নিদাঘের পরশনে,
সোণার কুসুমে গাঁথা,
শুকাল বসন্ত-লতা!
সন্ধ্যার নবীন-শশী!
পশ্চিমে পড়িল খসি!
পার্থিব পিঞ্জরে ত্যজিয়া অচিরে,
সুরভি কোমল নন্দন-সমীরে!
কাঞ্চন-প্রতীমা! আরোহি উল্লাসে,
চলিল সত্বরে, নন্দন সকাশে;
চির রুচি মৃদু, কমল আসনে,
বসিল রমণী প্রফুল্ল আননে;
শোভিল যেন রে উমা সুবদনে,
বঙ্গের মন্দিরে শারদ-পার্ব্বণে!
মিলি ত্রিদিবের, বিলাসিনী গণে,
সাজাল যতনে, নন্দন-ভূষণে;
ভুলি ভব-ধাম, পরিল সুন্দরী—
অনন্ত সুখেতে অনন্ত মাধুরী। শ্রীহঃ—

দেবোপাখ্যান।

(গ্রীস ও ভারতবর্ষ)

ষষ্ঠ প্রস্তাব।

কার্ত্তিকেয়; গণেশ; বিশ্বকর্ম্মা।

এরেশ্; হিফেষ্টস্; হার্মেস্।

কার্ত্তিকেয় দেবসেনাপতি, এরেশ্ (মার্চ)ও দেবসেনাপতি। কার্ত্তিকেয় ময়ূরবাহন শ্রীমান্, এরেশ্ দীর্ঘায়ত বীরপুরুষ। স্কন্দের মুখশ্রী প্রফুল্ল, মার্চের মুখশ্রী কুঞ্চিত, ভ্রূযুগলে এবং ক্রোধকষায়িত নয়নে ভ্রুকুটী প্রকাশক। কার্ত্তিকেয় মনোহর, এরেশ্ ভয়ঙ্কর।

অমিতপরাক্রম তারকাসুরের বিনাশসাধনে কার্ত্তিকেয় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বলবিক্রমের তুলনা নাই, দেব মানব অসুর গন্ধর্ব্ব কেহই সমরে তাহার সম্মুখীন হইতে সমর্থ হয় না, সকলেই তাঁহার পদানত হয়। কিন্তু তাঁহার আকৃতি কোমল, গৌরবর্ণ উজ্জ্বল মুখশ্রী,—পরমরূপবান্ পুরুষ। তাঁহার সৌন্দর্য্যের সহিত তুলনায় মার অর্থাৎ কন্দর্পও কুরূপ, এজন্য কার্ত্তিকেয়ের নাম কুমার। যদিও আর্য্যকবি দেবগণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনে তাঁহাদিগকে মানবগণহইতে ভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট করিয়াছেন এবং যে আকৃতি মানবে অপ্রযুক্ত, অথবা প্রযুক্ত হইলেও প্রকৃতিগত দোষের কারণ হয়, দেবগণকে সেইরূপ আকারবিশিষ্ট করিয়া মানব হইতে অশেষগুণে উৎকর্ষ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তথাপি আমরা স্কন্দ ও এরেশ্কে তুলনা করিতে আকৃতিতে এরেশ্কেই প্রশংসা করিব। কারণ, বিপক্ষের শোণিতপান যাহার ধর্ম্ম, অনাবৃত সমরাঙ্গণ যাহার প্রিয় নিকেতন, লৌহ যাহার অঙ্গাবরণ ও অবলম্বন, সে কুসুমসুকুমারদেহ হইবে ইহা নিতান্ত অসম্ভব। পুরাণবর্ণিত কার্ত্তিক বঙ্গগৃহবিরাজিত বাবু কার্ত্তিক হইতে অনেক পৃথক্ আকার হইলেও মার্চকেই এবিষয়ে প্রশংসা করিতে হইবে। মার্চের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিই বিপক্ষকে *পলায়নে বাধ্য করে।

সেনাপতির সুকুমার দেহ কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক, সুতরাং রূপবিষয়ে কার্ত্তিকের নিন্দনীয়। কিন্তু ইয়োরোপীয় লেখকগণ যে হিন্দুদেবগণের সকলকেই ভয়-

ন্দর বলেন, কার্ত্তিকের সে অপবাদহইতে মুক্ত। রূপবর্ণনায় গ্রীক কবিগণ প্রশংসনীয় বটেন, কিন্তু গুণবর্ণনায় তাঁহারা নিন্দনীয়। তাঁহারা জানিতেন রূপের অনেক দোষ, এজন্য ভিনস্‌কে পিশাচী করিয়া তুলিয়াছেন, রূপ ও গুণের একত্র সমাবেশ কখনও করেন নাই। কিন্তু হিন্দুগণ দেবগণকে রূপ ও গুণ উভয়েই ভূষিত করিতে যুগপৎ প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহারা কুমারকে কোমল আকৃতি প্রদান করিয়া প্রকৃতি তদনুরূপ করেন নাই। তাঁহার হস্তে বাবুদিগেরপ্রিয়, বাতাসের ভরে নত ক্ষীণবেত্র অথবা বিলাসি-কর-লালিত ক্ষুদ্রাতপত্র স্থান প্রাপ্ত হয় না। তাঁহার অবস্থান বিলাস হইতে অনেক অন্তর, অনেক উচ্চ। আপন বীরধর্ম্মের ব্যাঘাত হইবে ভয়ে তিনি চিরকৌমার্য্য ব্রতাবলম্বী। সমরাঙ্গণগমনোন্মুখ বীরপুরুষও বিদায় সময়ে আপন প্রেয়সীর অশ্রুদর্শনে ক্ষণকালের জন্য আর্দ্র-চিত্ত হইয়া আপন সঙ্কল্প বিস্মৃত হইতে পারেন, আপন জীবনকে অন্ততঃ মুহূর্ত্তজন্য যশহইতে মূল্যবান্ বিবেচনা করিতে পারেন, এজন্য বীরশ্রেষ্ঠ স্কন্দ আপন হৃদয় অন্যের জন্য উৎসর্গ করেন নাই, স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দেন নাই। এরেশ্‌ও কি পার্ব্বতীনন্দনের ন্যায় চির-কুমার? না। পরিণয় কেন? এরেশ্ বীরধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া, বিরজনকর্ত্তব্য অন্যের ধর্ম্মরক্ষা বিস্মৃত হইয়া পরস্ত্রীর প্রণয় পিপাসু! হিফেষ্টস্‌ললনা এফ্রোডাইট মার্চের অনুগ্রহে তিনপুত্রের জননী! রাক্ষস বা পৈশাচ বিবাহ অবিবাহিতার পক্ষে, এ তাহা হইতেও ঘৃণনীয়। যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া মেসিনার যুদ্ধাবসানে স্পার্টানগরীতে লোকবসতি হয়, যে উপায়ে আর্গোনট্‌গণকর্ত্তৃক অনেক দ্বীপ ও উপনিবেশ জনাকীর্ণ হয়, ট্রয়ের অবরোধ সময়ে গ্রীসের লোকসংখ্যার সমতা রক্ষিত হয়, এ সেই উপায়, সেই প্রণালী। গ্রীকজাতির উপাস্য দেবগণের সেনানায়ক সৌন্দর্য্য ও প্রণয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এফ্রোডাইটের রমণীয় নিকুঞ্জবনের, ললিত-লবঙ্গ-লতা-পরিবৃত-শ্যামল-তমাল--তালী বনের বসন্তের কোকিল, বিলাসের শামাপাখী!

এরেশের এই বীরত্বের,—অবলার প্রতি বলপ্রকাশের পুরস্কার হাতে হাতে লাভ হইয়াছিল। এলয়েড্‌দ্বয় তাঁহাকে পরাজিত ও কারারুদ্ধ করিয়া দীর্ঘকাল দাসরূপে রাখিয়াছিল। পরিশেষে তিনি অন্যদীয় সাহায্যে মুক্তিলাভ করেন। যিনি কুমারী রিয়াসিলভিয়ার প্রতি বল প্রয়োগ করিয়া রমুলস্ ও রিমসের সুতরাং রোমের জনক, রোমীয় দেবত্বে তাঁহার মাহাত্ম্য বিস্তারিতরূপে বর্ণিত থাকিবে আশ্চর্য্য কি?

দেবাসুরে যুদ্ধ, সকল দেশীয় দেবতত্ত্বেই বর্ণিত আছে। দেবগণকে এক এক বার দৈত্যগণকর্ত্তৃক পরাজিত ও অপমানিত হইতে দেখিয়া সকল দেশীয় কবিই এক একবার দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

কিন্তু গ্রীস ভিন্ন প্রায় অন্য কোন দেশেই দেবসেনাপতিকে দাসত্বে দেখা যায় নাই। পার্ব্বতীপুত্র কখনও অন্যের দাসত্ব স্বীকার করেন নাই।

গণেশের সহিত হিফেষ্টসের তুলনা করিয়া দেখা যাউক। গণেশ পার্ব্বতীর মানসপুত্র,—শক্তির দৈবশক্তিতে জাত। ভল্‌কান্‌ও হিরির মানসপুত্র। ভগবতী আপন স্বামীর নিকট বর প্রার্থনা করিয়া গণপতিকে লাভ করেন; জুনো আপন ইচ্ছায় স্বামীর অজ্ঞাতসারে হিফেষ্টস্‌কে প্রাপ্ত হন। নগেন্দ্রনন্দিনী সহর্ষে আপন স্বামীকে তনয় দেখাইলেন, শনির দৃষ্টিতে পুত্রকে প্রথমতঃ ছিন্নমস্তক, পরে গজাননন হইতে দেখিয়া উভয়েই যারপরনাই দুঃখিত হইলেন। জুনো দেখিলেন তাঁহার পুত্র কুরূপ ও খঞ্জ হইল, তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণ হইল। কদাকার পুত্র আপন স্বামীকে দেখাইতে লজ্জা বাসিলেন, এবং জননী হইয়া পুত্রহন্ত্রী হইতে প্রয়াস পাইলেন। অচিরপ্রসূত হিফেষ্টস্‌ পলায়ন করিয়া সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিলেন, এবং সমুদ্রের অধিষ্ঠাত্রীদেবীকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন *। হিরির আপন মানসতনয় দর্শনে লজ্জা ও স্বামীকে না দেখাইয়া তাহার বিনাশচেষ্টা, এবং পার্ব্বতীর মানসপুত্র লইয়া স্বামীসহ সুখাবস্থান ও তনয়ের বিপদ দেখিয়া দুঃখ, এতদুভয়ের দোষ গুণ পাঠক বিচার করুন।

গণেশ খর্ব্বাকার, স্থূলতনু, গজেন্দ্রবদন, লম্বোদর, সুন্দর। যেরূপ অঙ্গগঠনে অন্যকে নিতান্ত কুরূপ দেখায় গণেশ সে সমস্তেও সুন্দর। ভল্‌কান্‌ খঞ্জ, সুতরাং খর্ব্ব না হইলেও খর্ব্ব, স্থূলতনু, বিকৃতবদন, লম্বোদর, কিন্তু কুৎসিত। দেবমানব সকলের নিকটই তিনি কদাকার বলিয়া ঘৃণার্হ। গণেশ সকলের অগ্রে পূজা লাভ করেন; তিনি সিদ্ধিপ্রদ, কর্ম্মদ। হিফেষ্টস কেবল লৌহকর্ম্মকারের নিকট পূজা লাভ করেন কিন্তু হেরম্ববৎ বিঘ্ননাশন নহেন। লৌহদ্বারা বজ্র গঠন করিয়া যিয়সকে সাহায্য করা মাত্র তাঁহার কর্ম্ম। দেব সভায় গণেশের আসন সকলের সম্মুখে, কিন্তু ভল্‌কান্‌ দেব সভায় আসন প্রাপ্ত হন না। লঘুহস্ত চতুর্ভুজ গণপতি বেদচতুষ্টয় এবং মহাভারতের লেখক, অত্যন্ত বুদ্ধিমান্‌ ও সদ্বিবেচক। কিন্তু হিফিষ্টসের বুদ্ধি তাঁহার ব্যবসায়ের উপাদানবৎ স্থূল।

মানবশরীরবৎ শরীরীর চারি হস্ত অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইলেও যখন স্থিরচিত্তে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, কবিগণ সর্ব্বদাই লঘুহস্ত বুঝাইতে চতুর্ভুজ, সদ্বক্তা বুঝাইতে পঞ্চবদন এবং বহুদর্শী বুঝাইতে সহস্রলোচন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সহস্র সহস্র বৎসর পরেও সেই উপমা এপর্য্যন্ত সেই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তখন আর অস্বাভাবিকত্ব স্মরণ থাকে না। তবে মানবশরীরে গজমুণ্ড অস্বাভাবিক সংশয় নাই।

* দৈবকীনন্দন কৃষ্ণের বাল্যজীবনের সহিত তুলনা কর।

কিন্তু প্রকৃতির কোমলতায় ও উত্তমতায় আকৃতিগত দোষ এককালে ঢাকিয়া রাখে। মানবশরীর সময়ে সময়ে এত কদাকার দেখা যায় যে, কবির কল্পনাও তাহার সমতুল হইতে পারে না। সুতরাং ভল্‌কান্‌, শরীর কুরূপ হইলেও, অস্বাভাবিক নহে। অন্যদিকে আকৃতি স্বাভাবিক হইলেও প্রকৃতি নিতান্ত কদর্য্য বলিয়া, কার্য্য নিতান্ত সামান্য বলিয়া মহাজ্ঞানী পরমধার্ম্মিক গণেশের সমকক্ষ হওয়া অসম্ভব।

কবিগণ সকল দেশেই নিয়তির উপাসক। সর্ব্বশক্তিময়ী জুনো নিয়তিমার্গ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না, তাঁহার মানসপুত্র নিতান্ত ঘৃণনীয় হইল। সুরেশসুন্দরী পার্ব্বতীও নিয়তির হস্ত হইতে মুক্ত থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার প্রিয়তম তনয় নিতান্ত কদাকার হইল।

ভল্‌কান্‌ যেমন কদাকার তাঁহার স্ত্রী তেমনই সুন্দরী। লৌহব্যবসায়ীর শরীর ও মন লৌহ ও অশনির ন্যায় কঠিন, প্রণয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর শরীর কুসুম হইতেও সুকুমার, তারল্য হইতেও তরল। হিফেষ্টস্‌ সৎগৃহস্থ, নিরীহব্যবসায়ী, তাঁহার সহধর্ম্মিণী কুলবধূ বা বিবি। রূপবানের ভাগ্যে রূপবতী ভার্য্যা, গুণবানের ভাগ্যে গুণবতী ললনা, সুন্দরীর ভাগ্যে অনুরূপ স্বামী, অথবা গুণশীলার গুণগ্রাহী পতি লাভ করা প্রায় অসম্ভব, জগতে সচরাচর মণিকাঞ্চনযোগ দেখা যায় না। যে বিধাতা সকল বিষয়ে জগতে অপরিতৃপ্ত অনন্তুতৃষ্ণা রাখিবার জন্য প্রাণিগণও আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন কে আর কারণ বুঝিতে পারিবে? কারণ যেই হউক গরিব ভদ্রলোক হিফেষ্টস্‌ সেই জন্যই ভিনসের স্বামী, প্রণয়বিহীন ভল্‌কান্‌ সৌন্দর্য্য ও প্রণয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রাণকান্ত। জগতের কার্য্যানুকরণ করিয়া দেবমানবে সাদৃশ্য রক্ষা করিতে গিয়া, রূপবতী ভিনসের যৌবনের অপরিতৃপ্ত বিলাসবাসনার পরিণাম প্রদর্শনে গ্রীক কবি ভিনস্‌কে পরকীয়া করিয়াছেন, কল্পনা স্বাভাবিক হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, যাহা মানবে স্বাভাবিক হয়, দেবেও কি তাহাই কল্পনা করা এবং এইরূপে অশেষগুণে শ্রেষ্ঠ প্রাণীকে মানবের ন্যায় দুর্ব্বল ও পাপপ্রিয় জ্ঞান করা উচিত? এতদ্দ্বারা এরিষ্টটলের বাক্য সপ্রমাণ হইয়াছে। গণেশের স্ত্রী নবপ্রতিমা সতী সাবিত্রী। ভারতীয় অন্যান্য দেবললনার ন্যায় গণেশকামিনীও পতিব্রতা। মহাযোগী গণেশের সহধর্ম্মিণীও তাঁহার অনুরূপ। ভারতীয় কবি দেবদেবীগণের মিলন মানবমানবীর ন্যায় না করিয়া সতর্কতার সহিত মণিকাঞ্চনের যোগের ন্যায় করিয়াছেন। ভারতীয় দেবীগণ তাই সুন্দরীর ধর্ম্মানুষ্ঠানের পথপ্রদর্শিনী।

হার্ম্মেস্‌ ক্ষীণকায়, দীর্ঘায়ত। তাঁহার হস্তে একখানা যষ্টি, তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি সর্পদ্বারা জড়ান। তাঁহার শিরস্ত্রাণে

ও পাদুকায় পাখীর ন্যায় চারিটি পক্ষ *। জুপিটারের ঔরসে মায়াদেবীর গর্ভে তাঁহার জন্ম, তিনি উভয়েরই প্রিয়পাত্র।

গ্রীকদেবদেবীগণমধ্যে হার্মেসের চরিত্র যেমন বিরুদ্ধ ও বিভিন্ন বর্ণে চিত্রিত তেমন আর কাহারও নহে। তাঁহার সম্বন্ধীয় উপাখ্যান সমস্তও অতি আশ্চর্য্য ও কৌতুহলজনক। তিনি একবার নারদ দেবদূত, অথচ কৌতুক করিবার জন্য, বিরোধ ঘটাইবার জন্য মিথ্যাবাদী। আবার তিনি লক্ষ্মীর ন্যায় বাণিজ্য দ্রব্য ও শস্যাদির কর্ত্তা। আবার দেহহইতে বিমুক্ত আত্মা প্লুটোর রাজ্যে লইয়া যাইতে পথপ্রদর্শক যমদূত। তিনি সূত্রধর, কর্ম্মকার, তন্তুবায় প্রভৃতি ব্যবসায়ী লোকের উপাস্য দেবতা, সুতরাং বিশ্বকর্ম্মা। তিনি বৃহস্পতির ন্যায় বাগ্মী ও সুচতুর, দেবর্ষি নারদের ন্যায় কৌতুকপ্রিয়, বানরের ন্যায় চঞ্চল প্রকৃতি, এবং মহীরাবণের ন্যায় মায়াবী ও তস্কর।

রজনী তিমিরাবগুণ্ঠিতা, মানবগণ আপন আপন ভবনে নিদ্রা যাইতেছে, হার্মেস্ গোপনে তাহাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত ও প্রতারিত করিতে একাগ্রচিত্তে যত্ন করিতেছেন। তাহাতে তাঁহার উপাসকও মুক্ত হইতে পারে না। অন্যের অনিষ্ট করার সময় কেহই হার্মেসের অভিপ্রায় পূর্ব্বে বুঝিতে পারে না, এবং কেহই তাঁহার নীরস হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক করিতে পারে না। মরণধর্ম্মশীল মানবের ত কথাই নাই, প্রবলপরাক্রান্ত দিনমণি এপোলোও তাঁহার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। প্রসিদ্ধ ডেল্‌ফির মন্দির হইতে এপোলোর বহুকালসঞ্চিত সমস্ত সম্পত্তি হরণ করিতে এবং তাঁহার গো সকল আত্মসাৎ করিতে হার্মেসের মনে অণুমাত্রও ভয়সঞ্চার হয় নাই। তাঁহার জননী ভয়ে অভিভূতা হইয়া তাঁহাকে কত নিবারণ করিলেন, হার্মেস্ তাঁহার কথা শুনিলেন না। যখন তাঁহার বৈমাত্র ভ্রাতা লেটোনানন্দন এপোলো তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং চুরি করা যথার্থ কি না জানিতে চাহিলেন, হার্মেস্ স্বীকার করিলেন না, স্পষ্ট কোন উত্তরও দিলেন না, হাসিয়া তাঁহার কথা উড়াইয়া দিলেন। পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করায় অবশেষে বলিলেন "যদি তুমি আমাকে দেবগণমধ্যে শ্রেষ্ঠশ্রেণীতে গণ্য কর এবং তোমার ন্যায় ক্ষমতা ও যশ আমার লাভ হয়, তবে আমি অনুসন্ধান করিয়া তোমার সম্পত্তি তোমাকে প্রত্যর্পণ করি।" এপোলো স্বীকার করিলেন, তখন হার্মেস্ তাঁহার সমস্ত বস্তু প্রত্যর্পণ করিলেন। এপোলো তাঁহার নিকট হইতে বীণা লইয়া তাহার বিনিময়ে আপন সর্পসংযুক্ত যষ্টি প্রদান করেন, তখন উভয়ের সন্ধি হয়।

একদা হার্মেস্ কোন স্থানে গমন সময়ে দেখিলেন একটি কূর্ম্ম ধীরে ধীরে চ-

---

* কেমন স্বাভাবিক? "পায় পাগড়ী মাথায় জুতা।"

লিয়া যাইতেছে। তখন তিনি বলিলেন, "এক্ষণে কথা বলিতে পার না, কিন্তু মৃত্যুর পর উত্তম গান করিতে পারিবে।" অমনি তাহাকে বধ করিয়া তাহার দৃঢ় পৃষ্ঠাবরণ দ্বারা আপনার প্রসিদ্ধ বীণা প্রস্তুত করেন। এপোলো সেই মনোমোহন বীণাধ্বনিতে মোহিত হইয়াই হার্মেসের সহিত সন্ধি করেন, এবং তাঁহার সকল অপরাধ ভুলিয়া যান।

হার্মেস্ দৌত্যকার্য্যে তাড়িৎবার্ত্তাবহ। মেঘে আরোহণ করিয়া অতিক্রুত বায়ুসাগর অতিক্রম করেন। অন্যের যাহা অসাধ্য হার্মেস্ তাহা অতি সহজেই সম্পাদন করেন। কার্য্যসাধনে তাঁহার ক্ষমতা আশ্চর্য্য। কিন্তু তাঁহাকে বিশ্বাসের কার্য্যে নিয়োগ করিয়া কেহই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না।

ব্যবসায়ী লোকের নিকট মার্কিয়ুরি শান্তপ্রকৃতি এবং বিলক্ষণ কর্ম্মক্ষম। শ্রমজীবী শিল্পব্যবসায়িগণ এই জন্যই ভক্তির সহিত তাঁহার পূজা করে। বাণিজ্যব্যবসায়িগণও তাঁহার উপাসক। কিন্তু যখন ঝটিকারম্ভ হয়, যখন তাহারা মার্কিয়ুরির আবির্ভাব, সঞ্চরমাণ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালায় নিরীক্ষণ করে, তখন তাহাদের প্রাণ উড়িয়া যায়। এবং দেখিতে দেখিতে সর্ব্বস্ব সহ যখন তাহাদের অর্ণবযান সকল সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়, তখন তাঁহার বানরপ্রকৃতির নিন্দা করিতে এবং নেপচুনের শরণাগত হইতে কেহই বিস্মৃত হয় না।

বিশ্বকর্ম্মা পূর্ণায়ত সবলশরীর। তাঁহার আকৃতি দেখিলেই তাঁহাকে কর্ম্মক্ষম বলিয়া বোধ হয়। শিল্পীদিগের মার্কিয়ুরি আর পৌরাণিক বিশ্বকর্ম্মা একরূপ। কিন্তু মার্কিয়ুরির অন্যান্য প্রকৃতির সহিত বিশ্বকর্ম্মার কোন সাদৃশ্য নাই।

বৃহস্পতেস্তু ভগিনী বরস্ত্রী ব্রহ্মচারিণী।
যোগসিদ্ধা জগৎকৃৎস্নমসক্তা বিচরত্যুত ॥
প্রভাসস্য তু ভার্য্যা সা বসূনামষ্টমস্য তু।
বিশ্বকর্ম্মা মহাভাগস্তস্যাংযজ্ঞে মহামতিঃ ॥
কর্ত্তা শিল্পসহস্রাণাং ত্রিদশানাঞ্চ বর্দ্ধকিঃ।
ভূষণানাঞ্চ সর্ব্বেষাং কর্ত্তা শিল্পবতাংবরঃ ॥
যঃ সর্ব্বেষাং বিমানানি দেবতানাং চকার হ।
মনুষ্যাশ্চোপজীবন্তি যস্য শিল্পং মহাত্মনঃ * ॥

আবার,—

বিশ্বকর্ম্মা প্রভাসস্য পুত্রঃ শিল্পপ্রজাপতিঃ
প্রাসাদভবনোদ্যানপ্রতিমাভূষণাদিষু।
তড়াগারামকূপেষু স্মৃতঃ সোঽমরবর্দ্ধকিঃ ॥ †

বৃহস্পতির ভাগিনেয় প্রভাসতনয় ত্বষ্টা দেবগণের শিল্প ও স্থপতিকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তাঁহার ক্ষমতা আশ্চর্য্য। বৈকুণ্ঠপুরী নির্ম্মাণ করিতে হইবে, আজ্ঞামাত্র কার্য্য আরম্ভ হইল, দেখিতে দেখিতে এক রজনীর মধ্যেই পুরী নির্ম্মিত হইল। যাহা হইল তাহাতে কোন অংশে দোষ প্রদর্শন কাহারও সাধ্য হইবে না। যত সম্পন্ন ও যত উৎকৃষ্ট অবস্থা কল্পনা করা যাইতে পারে তাহার কিছুই বিশ্বকর্ম্মার সুনি-

---

* বিষ্ণুপুরাণ ১ম অংশের ১৫ অধ্যায়।

† মাৎস্য ৫ম অধ্যায়।

পুন সূক্ষ্ম দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে না।

বিশ্বকৃৎ কখনও ছদ্মবেশ বা কপটতা অবলম্বন করেন না। তাঁহার আকৃতি যেমন সরল, প্রকৃতিও সেইরূপ। সুতরাং তিনি সরলমতি নিরীহপ্রকৃতি কারু ও স্থপতি গণের প্রিয়তম উপাস্য দেবতা। সকলেই তাঁহাকে আদরের সহিত পূজা করিয়া থাকে।

হার্ম্মেসের প্রতারণাপ্রিয়তা ও খল প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে এবং তস্করবৃত্তি পরিদর্শন করিলে কাহার মনে ভক্তির উদয় হইবে? যে দেব আশ্রিতকে প্রতারিত ও তাহার সর্ব্বস্বান্ত করিয়া সহানুভূতি প্রদর্শন করেন, তাহার সহানুভূতি বিশিষ্ট প্রশস্ত অন্তঃকরণের প্রশংসা ইংরেজ ভিন্ন অন্য জাতির নিকট কখনও সম্ভবে না। গ্রীকদিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে তাঁহার স্বভাব চপলতা ও দুর্ব্বৃত্ততা জন্য নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু ইংলণ্ডীয় রাজনীতি-কুশল সুলেখকগণ হার্ম্মেসকে বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। আমরা স্বীকার করি, তাঁহাদের এই বর্ণনা কোন প্রকারে তাঁহাদের মত বিরুদ্ধ হয় নাই। কিন্তু নিরীহপ্রকৃতি দেব বর্দ্ধকি, হার্ম্মেস হইতে সম্পূর্ণ-ভিন্ন-প্রকৃতি-বিশিষ্ট।

এক্ষণে উল্লিখিত তুলনা হইতে পাঠকগণ এরেশ, হিফেষ্টস ও হার্ম্মেসের অপেক্ষা স্কন্দ, গণপতি এবং ত্বষ্টা যে কত উত্তম তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। এবং ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতগণের মত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক ও একদেশদৃষ্ট, তাহাও সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। সুতরাং এ প্রস্তাবের আর বাহুল্যে প্রয়োজন নাই।

প্রভু ও ভৃত্য

এজগতে বৈষম্যের প্রাচুর্য্য দেখা যায়—ধনবৈষম্য, ধর্ম্মবৈষম্য, বিদ্যাবৈষম্য। এজগৎ বৈষম্যে পরিপূর্ণ। সমাজের সৃষ্টি অবধি আবহমান কাল পর্য্যন্ত ইহা চলিয়া আসিতেছে। আজিও ইহার ভয়ানক শক্তি প্রায় সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। কেহই কাহারও সমান নহে, আমি তোমাহইতে পৃথক্, তুমি তাঁহাহইতে পৃথক্ এই ভাবই বৈষম্যের মূল। সৃষ্টির প্রারম্ভেই 'Might is Right' অথবা 'জোর যার মুলুক তার' এই নিষ্ঠুর বিধির প্রচলন হয়। রাম যদি শ্যামকে এক আঘাতে ভূমিশায়ী করিতে পারেন তাহা হইলে রাম প্রভু, শ্যাম ভৃত্য। রাম আজ্ঞাকর্ত্তা, শ্যাম আজ্ঞাপালয়িতা। রাম এই গ্রীষ্মকালের স্নিগ্ধ সুবাসিত সুরম্য গৃহে পর্য্যঙ্কে বসিয়া দিন

কাটাইবেন ; শ্যাম ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে দুই প্রহর সময়ে মাঠে ঘুরিবে, সন্ধ্যার প্রাকালে আসিয়া আবার রামের আহারের আয়োজন করিয়া দিবে ; রাম পাদোপরি পাদন্যস্ত করিয়া সুখে উদর পূর্ণ করিবেন। কাহারও পৌষ মাস, কাহারও সর্ব্বনাশ। রাম বাবু হইয়া গৃহে বসিয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত সামগ্রীর ছড়াছড়ি করিবেন ; আর শ্যাম ? এত খাটিয়াও পরিবারের কথা দূরে থাকুক, নির্ব্বিঘ্নে স্বীয় ভরণ পোষণ করিতেও অক্ষম। ইহাই সমাজের প্রথম বৈষম্য। অর্থাৎ সমাজের প্রথম বৈষম্য বাহুবলজনিত; যাহার ক্ষমতা আছে সে প্রভু ; যাহার ক্ষমতা নাই সে ভৃত্য।

আজি কালি ভৃত্যভাবেরবিরুদ্ধে ভয়ানক চীৎকার শুনা যাইতেছে ; কিন্তু বৈষম্যভাব এজগৎ হইতে লুপ্ত হয় নাই। বাহুবলজনিত * বৈষম্যের তিরোধান হইয়াছে সত্য, কিন্তু ধনবৈষম্য, বিদ্যাবৈষম্য, কোন কোন প্রদেশে বা ধর্ম্মবৈষম্য এখনও ভয়ানক প্রবল। পূর্ব্বাপেক্ষা আমাদিগের অবস্থা অনেকাংশে উন্নত হইয়াছে বটে †, কিন্তু যত দিন সাম্যবিধি এজগতে সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত না হয়, ততদিন সমাজের মঙ্গল নাই।

বৈষম্যের বিরুদ্ধে এখন যদিও দুই একটি কথা শুনিতে পাওয়া যায়, সমাজের আদি অবস্থায় এতৎসম্বন্ধে কোনরূপ ন্যায় বা দর্শন কিছুই ছিল না। প্রভুর যাহা ইচ্ছা তিনি তাহাই করিতেন ; মারিলে মারিতে পারিতেন কাটিলে কাটিতে পারিতেন, কেহই বারণ করিবার ছিল না। বিশেষ আবার দেশীয় আচার, ব্যবহার, ন্যায়, ধর্ম্ম সকলে মিলিয়া তাঁহার কর্ম্মে স্পষ্ট সম্মতি দান করিত। এই বিধি প্রায় সকল দেশেই প্রচলিত ছিল। সুতরাং প্রভুদিগের ক্ষমতা অসীম। তাঁহারা আপনাদিগের ইচ্ছামত সকল কার্য্যই ভৃত্যদ্বারা সম্পাদন করাইতেন। ক্ষেত্রে বীজ বপন করিতে হইবে,তাহাও ভৃত্য করিবে; প্রভুর পদসেবা আবশ্যক, তাহাও ভৃত্যের কার্য্য। কোনরূপ ত্রুটি হইলে আর রক্ষা নাই, ভৃত্যের যৎপরোনাস্তি শাস্তি আবশ্যক। ক্ষেত্রে যে শস্য জন্মিবে, তাহার সমস্তই প্রভুর ; ভৃত্য কেবল যৎসামান্য আহার্য্য মাত্র পাইতে পারে ! কোন কোন স্থলে তাহাও পাওয়া দুষ্কর।

* প্রজাদিগের মধ্যে বলবৈষম্য কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইয়া থাকিলেও রাজাদিগের মধ্যে উহা দূর হয় নাই এবং শীঘ্র যে দূর হইবে তাহারই বা সম্ভাবনা কোথায় ?

† একথা আমরা সকল জাতি সম্বন্ধে বলিতেছি না। আরব ও তাতারদেশীয়দিগের মধ্যে পূর্ব্বে যেরূপ বৈষম্যভাব ছিল এই এখনও সেইরূপ দৃষ্ট হয় ! পূর্ব্ববৎ এখনও তাহারা বনকুটীরে বাস করে, বনের ফল মূলে জীবনধারণ করিয়া থাকে ; সুতরাং তাহাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা আদিমাবস্থা হইতে বড় বিভিন্ন নহে।

রূপে ক্ষেত্রজাত সমস্ত সম্পত্তিই প্রভু মহাশয়েরা আত্মসাৎ করিতে লাগিলেন। আর ভৃত্যেরা ক্ষুধাতৃষ্ণায় জ্বালাতন হইয়া ক্রমে দরিদ্রভাবাপন্ন হইয়া পড়িল। একদল ধনী, অপর নির্ধন; একদল ক্রোড়পতি, অপর দল ভিখারী। এইরূপে ধনবৈষম্যের জন্ম। যাঁহার অগাধ সম্পত্তি, তিনিই জনসমাজে মাননীয়; যাহার ধনসম্পত্তি নাই, তিনি সাধারণো নিন্দিত, ঘৃণিত ও উপহাসাস্পদ। আজিও ধন-বৈষম্য প্রায় সর্ব্বপ্রদেশেই বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ধনীরা নির্ধনীদিগকে ঘৃণার সহিত অবলোকন করেন। ভিখারিরা ক্রোড়পতিদিগকে মান্য করিয়া চলেন, সময়ে সময়ে পূজা করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। ধনবৈষম্য বহুকাল পর্য্যন্ত এদেশে প্রবল ছিল। 'ইহলোকে দরিদ্রতা অপেক্ষা গুরুতর দোষ আর কিছুই নাই। ইহলোকে যাহার অর্থ আছে, সেই ব্যক্তিই বন্ধুবান্ধবসম্পন্ন প্রধান পুরুষ বলিয়া গণনীয় ও পণ্ডিতপদবাচ্য হইয়া থাকে। ধনই কুলমর্য্যাদা ও ধর্ম্মবুদ্ধির নিদান। নির্ধন ব্যক্তি ইহলোকে বা পরলোকে সুখী হইতে পারে না। লোকের শরীর কৃশ হইলে, তাহাকে কৃশ বলা যায় না, যাহার অশ্ব, গো, ভৃত্য ও অতিথি অধিক না থাকে, সেই যথার্থ কৃশ*।'

সমাজসৃষ্টির অব্যবহিত পরেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাঁহারা বলবান্ বা ধনবান্ তাঁহারাই পৌরহিত্যকর্ম্ম করিতেন। ধর্ম্মসম্বন্ধে সকল ভার তাঁহাদিগের উপর। অন্যের স্বর্গ নরক তাঁহাদিগেরই হস্তে। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে কাহাকে নরকে ফেলিতে পারেন, কাহাকে বা স্বর্গে তুলিতে পারেন। তাঁহারা সময়ে যুদ্ধকার্য্য করিতেন, সময়ে আবার ধর্ম্মমন্দিরস্থ দেবতার পুরোহিত সাজিতেন। গ্রীসের পুরাবৃত্তে এরূপ ঘটনার স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। কালে লোকের ধর্ম্মভয় প্রবল হইয়া উঠিল, ইহকালের সুখের জন্য কেহই আর ব্যতিব্যস্ত নহে। সকলেই পরকাল চায়। পরকালের সুখ, পরকালের শান্তি সকল হৃদয়েই বিরাজমান; কেহ আর সংসারের দিকে ভুলিয়াও দৃষ্টিক্ষেপ করে না। এই সকল বড়লোকেরা তখন দেখিলেন, যে বাহুবলজনিত বা ধনজনিত বৈষম্যের আসন্নকাল উপস্থিত; সকলেই বীরবেশ ছাড়িয়া পুরোহিতরূপধারী হইলেন। এই সময় হইতেই প্রকৃত ধর্ম্মবৈষম্যের সৃষ্টি। যিনি পুরোহিত, তিনিই পূজনীয়, অপরেরা তাঁহাকে দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিত। তিনি অন্যান্যদিগকে ভৃত্যবৎ আচরণে দিবারাত্র জ্বালাতন করিতেন। ভৃত্যেরা ইচ্ছা থাকিলেও কিছু বলিতে পারিত না, কেননা, তাহা হইলে তাহার ইহকালও নাই, পরকালও নাই। ইহকালে ভীষণ অত্যাচার, কঠোর শাস্তি, সাধারণ্যে নিন্দা, আত্মীয় পরিবারের গালাগালি; পরকালে আবার স্বর্গ হ-

* শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ানুবাদিত মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব।

ইতে একেবারে বঞ্চিত হইতে হইবে। বঙ্গদেশে ধর্ম্মবৈষম্য ভয়ানক প্রবল ছিল। ব্রাহ্মণ বালক, দরিদ্র বা কৃপণ, উঁহাকে অবজ্ঞা করা বিধেয় নহে। ব্রাহ্মণকে নিরাশ করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে প্রীত করিতে পারে, তাহার পুত্র পৌত্র, বন্ধু বান্ধব, অমাত্য, পশু, নগর ও জনপদ প্রভৃতি সমুদয় নিরাপদে অবস্থান করে। ব্রাহ্মণকে দান করিলে নিশ্চয়ই স্বর্গ লাভ হয়। ইহলোকে ব্রাহ্মণকে দান করিলে পিতৃলোক ও দেবলোকের তৃপ্তি সাধন করা হয় †।”

এইরূপে যাঁহারা বলবান্ বা ধনবান্, অথবা যাঁহারা পৌরহিত্য-কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতেন, তাঁহারাই সময়ে “বড়লোক” আখ্যা পাইলেন। বড়লোকের সন্তান বড়লোক; তিনি মহাপাপ করিলেও বড়লোক; তিনি বলহীন ধনহীন হইলেও বড়লোক। তিনি ধর্ম্মের বা পৌরহিত্য কার্য্যের কিছু না বুঝিলেও বড়লোক। এই স্থলে আর এক প্রকার বৈষম্যের উৎপত্তি —রক্তজনিত বৈষম্য (Ascendancy of noble blood.) অর্থাৎ যদি কেহ বড়লোক হয়েন, তাঁহার বংশধরেরাও বড়লোক বলিয়া জনসমাজে পরিচিত ও গণনীয় হইবেন।

বড়লোকেরা প্রায় পর্ব্বতোপরি অথবা কোন প্রাচীরবেষ্টিত গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহাদিগের ভৃত্যেরা নগরপ্রান্তে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া কায়ক্লেশে দিনযাপন করিতেন। গ্রীসের ইতিহাসে ইহারাই পেরওকই (Peroikoi) বা প্রান্তবাসী, বা অনাগরিক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সময়ে সময়ে বিদেশ হইতে লোকজন আসিয়া এই দাসশ্রেণীভুক্ত হইত। অন্য দেশ হইতে যিনিই আসুন না কেন, এই দাসদিগের তিনি বড় প্রিয় পাত্র হইয়া দাঁড়াইতেন। তাহার বিশেষ কারণ এই যে, দাসেরা প্রভুদিগের অত্যাচারে এরূপ উৎপীড়িত হইত যে, সময়ে সময়ে তাহারা ভাবিত যে যদি কখন কোন জাতি তাহাদিগের সহিত একত্রে মিলিত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে পারে, তাহাদিগের ক্ষমতা বাড়িতে পারে, এমন কি সময়ে তাহারা অনেকাংশে প্রভুদিগের সমকক্ষ হইলেও হইবার সম্ভাবনা; সুতরাং তখন আর এরূপ যন্ত্রণা থাকিবে না; অসহ্য অত্যাচারে আর প্রপীড়িত হইতে হইবে না, এবং তাহাদিগের উপর প্রভুদিগের আধিপত্যও অনেক পরিমাণে হ্রাস হইতে পারিবে। এই ভাবিয়া যে আসিত, এই দাসদল তাহাকেই আশ্রয়দান করিত—কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হইত না। যে সকল লোক কোন বিশেষ পাপাচরণের জন্য স্বদেশ হইতে দূরীভূত হইত, অথবা যে সকল জাতি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্বদেশের মায়া পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইত, তাহারা এই দাসদলের সহিত এ-

† শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ানুবাদিত মহাভারত অনুশাসনপর্ব্ব।

ক্ষেত্রে মিলিত হইত। মিসরদেশীয় ইস্‌রেলাইটিজ্ এবং আটিকার পিলাসজিয়ানেরা এইরূপ তাড়িত হইয়া বিদেশীয় দাসদিগের সহিত যোগ দেয়। এইরূপে দাস সংখ্যা ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিল; বলে ধনে কিছুতেই ভৃত্য আর প্রভু অপেক্ষা ন্যূন নহে। প্রভুরা আর এক্ষণে তাহাদিগের উপর কোন রূপ অত্যাচার করিতে পারেন না। এই সময় হইতেই ভৃত্যেরা প্রভুদিগেব পরিবারবর্গের মধ্যে গণনীয় হইতে লাগিল।

কিন্তু দেখিতে দেখিতে আর এক বৈষম্য। সে বৈষম্য বিদ্যাজনিত। যাঁহারা বিদ্বান্ তাঁহারাই মহালোক, মূর্খেরা অপর শ্রেণীয়। কিন্তু আজি কালি বিদ্যাজনিত বৈষম্যের ক্রমশঃ লোপ হইতেছে। দীন, দরিদ্র, রাজা, প্রজা সকলেরই লেখাপড়া শিখিবার অধিকার আছে, এবং প্রায় সকলেই শিখিতেছে, সুতরাং বিদ্যাজনিত বৈষম্যের শীঘ্রই তীরোভাব হইবার সম্ভাবনা। এই বৈষম্যের লোপ হইলে অন্যরূপ কোন বৈষম্যের জন্ম হইতে পারে; কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা সাম্যবিধির তত্ত্ব সকলেই অধিকতর যে বুঝিয়াছে ও বুঝিতেছে তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। পূর্ব্বে যেরূপ অত্যাচার প্রচলিত ছিল এখন তাহায় অনেক উপশম হইয়াছে; এবং যাহা আছে, আমাদের দৃঢ় ভরসা, তাহাও সাম্যবিধিপ্রসাদে শীঘ্রই অন্তর্হিত হইবে।

বঙ্গদেশে দাসত্ববিধি প্রচলিত ছিল বলিয়া অনেকে আক্ষেপ করেন। শূদ্রেরা ব্রাহ্মণদিগের হস্তে ঘোরতর প্রপীড়িত হইত, এই কথা বলিয়া অনেকে দুঃখ করিয়া থাকেন, এবং ব্রাহ্মণেরা যে অত্যন্ত স্বার্থপর এই কথা সপ্রমাণ করিতে চাহেন, কিন্তু অন্যান্য দেশের সহিত তুলনা করিলে আমাদিগের এদেশকে অনেক সৌভাগ্যশালী বলিতে হইবে।

লেসিদিমোনীয় যোদ্ধৃদল দাসদিগকে তাঁহাদিগের জীবনের নিতান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী বলিয়া জ্ঞান করিতেন। দাস না হইলে যুদ্ধক্ষেত্রে কে তাঁহাদের সঙ্গী হইবে? কে আহারে রন্ধনকারী, শয়নে ব্যজনকারী হইবে? স্বদেশে বিদেশে কে আজ্ঞাবাহক, কে আজ্ঞাপালক হইবে? দক্ষিণরুশিয়ায় যে অসভ্যজাতি বাস করে, তাহারাও দাসপ্রিয় *। ক্রীতদাস না হইলে কোন কর্ম্মই হয় না। দুগ্ধদোহনেও ক্রীতদাস। অন্যান্য জাতি অপেক্ষা ইহাঁরা ভৃত্যদিগের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার করিতেন; এমন কি পাছে তাহারা পলায়ন করে, এই ভয়ে তাহাদিগকে ক্রয় করিয়াই অন্ধ করিয়া দেওয়া হইত। পুরাকালে জর্ম্মাণজাতীয়েরা ধার্ম্মিকা-

* আজি কালি আর পূর্ব্ববৎ বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায় না। রুশীয় সম্রাটের আজ্ঞানুসারে তথাকার কৃষকদল বহুদিন দারুণ ক্লেশ সহ্য করিয়াছিল। এক্ষণ ওরূপ বৈষম্যভাব লুপ্ত হইয়াছে বলিলেই হয়। এইক্ষণে এদেশীয় দাস ও প্রভু প্রায় একই সোপানারূঢ়।

অগ্রগণ্য বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বনমধ্যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া ফলমূলে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, তাহাদেরও সঙ্গে দাসগণ দলে দলে বাস করিত। এতদ্ব্যতীত তায়ার, করিন্থ্ প্রভৃতি যে সকল স্থান বাণিজ্যের জন্য পুরাকালে জগদ্বিখ্যাত ছিল, সেখানে দাসগণ আলুপটলের দরে বিক্রীত হইত। পুরাকালের দাস-বিক্রয়ের স্থান বলিয়া আজি পর্য্যন্ত অনেক নগরী পরিচিত। দাসী গর্ভবতী হইলে অথবা দাস একটু গুণবান্ বুদ্ধিমান্ বা বিদ্যাবান্ হইলে দাসস্বামী ক্রেতার নিকট হইতে দ্বিগুণ মূল্য আদায় করিতেন। এই কারণে দাসদিগকে বিদ্যাশিক্ষা, সঙ্গীতশিক্ষা, রন্ধনশিক্ষা প্রভৃতি নানারূপ অলঙ্কারে ভূষিত করা হইত, কেননা এরূপ করিলে তাহারা অধিকমূল্যে বিক্রীত হইতে পারিবে। এতদ্ব্যতীত এরূপ শিক্ষা দেওয়াতে প্রভুর আর কোন সদভিসন্ধি ছিল না।

কখন কখন প্রদেশ বিশেষে ভদ্রসন্তানদিগকেও দাসরূপে বিক্রয় করা হইত। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াই জেতৃগণ অনেক স্থলে বিজিতদিগকে আপনাদিগের ভৃত্যস্বরূপ রাখিত, কখন কখন বিক্রয়ও করিত †। সুন্দর বা বলবান্ বালক, অথবা রূপবতী বালিকা পাইলে তাহাদিগের আনন্দের সীমা থাকিত না। যখন বাণিজ্যের অপেক্ষাকৃত উন্নতি হয়, তখনও মধ্যে মধ্যে দাসপ্রথার কথা শুনা যাইত। ফলতঃ যে সকল পোত ভূমধ্যসাগর বা ভারতমহাসাগরের কূলে দিবারাত্র যাতায়াত করিত তাহারাও সুবিধা পাইলে, আমাদিগের ঠগী ডাকাইতের ন্যায়, লোকজন চুরি করিতে ছাড়িত না। কিন্তু শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয় যে, এত অত্যাচারেও কেহই এই ভয়ানক ভৃত্যভাবের বিরুদ্ধে কোন কথা কহিতেন না। এরিস্‌ততল্ একস্থলে স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, গ্রীকেরা প্রভু, রোমীয়েরা ভৃত্য,—কেননা গ্রীকেরা সুশিক্ষিত, বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্, রোমীয়েরা অশিক্ষিত, মূর্খ ও নির্ব্বোধ। ইহাতে স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে যে, তিনি দাসত্ববিধির কিছুমাত্র বিরোধী ছিলেন না। তিনি আর একস্থলে বলিয়াছেন যে, দাসেরা সজীব অস্ত্রবিশেষ (Living tool)। সূত্রধর যেমন সূত্রাদি লইয়া আপনার ইচ্ছামত কাষ্ঠ ছেদন বা পরিমাণ করে, প্রভুও তদ্রূপ—ভৃত্য তাঁহার স্বকার্য্য সাধনের অস্ত্র। কর্ম্মকার যেমন সকল কর্ম্মেই তাহার অস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে, প্রভুও দাসকর্ত্তৃক তাহার সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া লয়েন। যাহাই হউক এবিধি রোমীয়দিগের যে বিশেষ কষ্টকর হইয়াছিল, তাহাতে সংশয় নাই।

মিসরদেশে দাসত্ববিধির স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রভুরা ইচ্ছা করিলেই ভৃত্যদিগকে আপনাদিগের কার্য্যে নিয়োজিত

† ইউরোপীয়দিগের জয়পতাকা যখন আমেরিকায় উড্ডীন হয়, তখনও জেতৃগণ বিজিতদিগকে দাসবৎ আচরণে অহরহঃ ক্লেশিত করিত।

করিতে পারিতেন। কল, কৌশল, বল, যখন যেটির সুবিধা, তখন প্রভু সেইটির আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। কেহই তাঁহার প্রতিবন্ধক হইত না। অন্ন বস্ত্র দিলেই প্রভু মনে করিতেন, আমি ভৃত্যের আশাতিরিক্ত পুরস্কার দিয়াছি। ভৃত্যেরা একরূপ ক্রীতদাস। প্রভুর ইচ্ছানুসারে তাহারা বিক্রীত বা পরিবর্ত্তিত হইতে পারিত। প্রভুর আজ্ঞা পালন না করিলে প্রভু ভৃত্যকে বেত্রাঘাতে শাসন করিতেন। যখন প্রভুর ক্রোধে পড়িয়া ভৃত্যের কোন অঙ্গ বিকল হইত, তখনও প্রভুর একাধিপত্য। কেহ তাঁহাকে কোন কথা বলিবার নাই। ভৃত্য অকর্ম্মণ্য হইলে প্রভু তাহাকে দাসত্বভার হইতে মুক্ত করিয়া দিতেন; এরূপ মুক্তি দেওয়ায় তাঁহার লাভ ব্যতীত ক্ষতি নাই; অন্ধকে বা খঞ্জকে অন্নবস্ত্র দেওয়ায় কি উপকার? বাইবলের একস্থলে (Exodus) উক্ত হইয়াছে, প্রভু বেত্রাঘাতে যদি ভৃত্যের প্রাণ হনন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে; কিন্তু প্রহারের সময়ে না মরিলে তাঁহার কোন দণ্ড হইবে না, কেন না ভৃত্য প্রভুরই সম্পত্তি। এরূপ বিধিতে ভৃত্যের কোন উপকার নাই, প্রভুরও কোন অপকার নাই; কেন না প্রভু কখন ক্রোধভরে ভৃত্যকে বধ করেন না, বধ করিলে তাঁহারই কার্য্যের ক্ষতি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মিসরদেশে ভৃত্যের উপর প্রভুর একাধিপত্য ছিল। যাহারা যুদ্ধে বন্দী, বা যাহারা ঋণপরিশোধে অসমর্থ, যাহারা চৌর্য্যব্যবসায়ী, বা যাহারা দাসতনয়, তাহাদেরই ভৃত্যভাবে অবস্থান করিতে হইত।

কিন্তু এই সকল ভৃত্যসম্বন্ধে একটি সুবিধা ছিল। এক্‌সোডসের একবিংশতি অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, যদি কোন ভৃত্য তোমার আজ্ঞাবাহক হয়, সে ব্যক্তি ছয় বৎসরকাল পর্য্যন্ত তোমার অধীন থাকিবেক; সপ্তমবর্ষে সে আর কাহারও দাস নহে। যদি সে স্ত্রীসহ আসিয়া থাকে, সে স্ত্রীসহ চলিয়া যাইবে, যদি একক আসিয়া থাকে, একাকীই যাইবে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর এক অসুবিধা,—যদি প্রভু তাহার সম্বন্ধ দেখিয়া বিবাহ দিয়া থাকেন, এবং সেই স্ত্রীর গর্ভে যদি এই ছয় বৎসরকাল মধ্যে ভৃত্যের কোন অপত্যাদি জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে সন্তান ও দারাকে পরিত্যাগ করিয়া ভৃত্যকে একাকী যাইতে হইবে।

এই ভয়ানক ও নিষ্ঠুর বিধি মৈসরীদিগের প্রতি যে ঘোরতর অত্যাচারের কারণীভূত হইয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। যখন মিসররাজ সলোমনের যশপতাকাস্বরূপ প্রকাণ্ড মন্দির উত্তোলিত হয়, কথিত আছে, তখনও তিনি অন্যূন দেড় লক্ষ দাসকে সেই কর্ম্মে নিয়োজিত করেন। বস্তুতঃ, এদেশে প্রভুরা ভৃত্যদিগকে পশুবৎ আচরণ করিতেন।

স্পেনীয়েরা যখন আমেরিকাতে খনি

আবিষ্কার করিলেন, তখন তাঁহারা দেশীয়দিগের প্রতি এরূপ অত্যাচার করেন যে, তাহাতেই অনেকের মৃত্যু হয়।

ফ্রান্স এই নিষ্ঠুর আচরণের আর একটি দৃষ্টান্তস্থল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তথায় যে ভীষণ রাষ্ট্রবিপ্লব হইয়া গিয়াছে, ইতিহাস বৈষম্যকেই তাহার কারণ নির্দ্দেশ করে। পঞ্চদশ লুইর লম্পটতা, বিলাসপ্রিয়তা প্রভৃতি দুষ্কর্ম্মে অপরিমিত অর্থ ব্যয় হইতে লাগিল। তাহাতে রাজকোষ শীঘ্র শূন্য হইয়া পড়িল। এক কপর্দ্দকও মেলা ভার। তখন উপায়? না দীনদরিদ্রের প্রতি অত্যাচার, পীড়িতের উপর পীড়ন। যে ব্যক্তি সমস্ত দিবস পরিশ্রমের পরে কেবল আহার্য্যমাত্র সংগ্রহ করিল, তাহাকে উপবাসী রাখিয়া তাহার অর্জ্জিত ধন রাজার করায়ত্ত হইল। যে সমস্ত দিবস ভিক্ষা করিয়া এক কপর্দ্দক অর্জ্জন করিল, তাহারও নিস্তার নাই। বলে, ছলে, কলে, কৌশলে দরিদ্রেরা প্রপীড়িত হইতে লাগিল। তথাপি রাজকোষ শূন্য। আর ধনীরা? অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া শিয়রে উপবিষ্ট। ভাবনা নাই; চিন্তা নাই। কৃষকদিগের আয় হইতে রাজা যাহা আহরণ করিলেন, তাহারও অর্দ্ধেক আত্মসাৎ করিতে ধনীরা যত্নশীল। যত অত্যাচার দরিদ্রদিগের উপর। অস্বীকার করিলে নিস্তার নাই, গুরুতর ও ভীষণ শাস্তি, কোন কোন স্থলে বা প্রাণবধ। এইরূপে একদিকে আমোদ ও নিশ্চিন্ততা, অপর দিকে অন্নের জন্য হাহাকার *।

কিন্তু পৃথিবীর একটি প্রদেশে এরূপ ভয়ানক দাসবিধি প্রচলিত ছিল না—একটি দেশে ভৃত্যদিগের প্রতি ঘোরতর নিষ্ঠুর অত্যাচার প্রকাশ করা হইত না। অন্যান্য প্রদেশে প্রভু ও ভৃত্য মধ্যে যে সম্বন্ধ ছিল, একটি দেশে সেরূপ সম্বন্ধ ছিল না,—সেটি আমাদিগের ভারতবর্ষ।

আমরা এরূপ বলিতেছি না যে, এদেশে বৈষম্যের জন্ম হয় নাই; অথবা এখানে একদল প্রভু অপরদল ভৃত্য ছিল না। যেখানে সমাজ, সেই খানেই বৈষম্য, সুতরাং ভারতবর্ষেও যে বৈষম্য ছিল, তাহা আমরা অবশ্য স্বীকার করিব। কিন্তু তাহা হইলেও ভারতবর্ষ অন্যান্য দেশের মত ঘোরতর অত্যাচারে প্রপীড়িত হয় নাই। অত্যাচার ছিল, কিন্তু তাহার সঙ্গে ভৃত্যেরা যে অনেকাংশে স্বাধীন ছিল, তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। পণ্ডিতবর বকল একস্থলে বলিয়াছেন যে, যে দেশে শস্য অধিক জন্মে, সেখানে আহার্য্য অতি সুলভমূল্যে পাওয়া যায়। সুতরাং সেস্থলের লোকসংখ্যা দিন দিন বাড়িতে থাকে। পূর্ব্বে শত ব্যক্তির মধ্যে যে অর্থ বিভক্ত হইত, লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হওয়াতে সেই টাকা এক্ষণে সহস্রাংশে ভাগ করিতে হয়, সুতরাং প্রত্যেকের অংশে পূর্ব্বে

* এই ভীষণ অত্যাচারের ফল শীঘ্রই ফলিয়াছিল। প্রথম ষোড়শ লুইয়ের সিংহাসনচ্যুতি, দ্বিতীয় তাঁহার প্রাণবধ।

যাহা পড়িত, এক্ষণ তাহা অপেক্ষা ন্যূন পড়িয়া থাকে। কাজেই দরিদ্রদিগের অবস্থা আরও হীনতর হইয়া বৈষম্যভাব প্রবলতর হইতে থাকে। ভারতভূমি শস্যশালিনী, রত্নগর্ভা, সুতরাং সেখানে বৈষম্য অবশ্যই থাকিবে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সেই বৈষম্য হইতেই দুইদলের উৎপত্তি, একদল ব্রাহ্মণ, অপর শূদ্র। ব্রাহ্মণেরা প্রভু, শূদ্রেরা ভৃত্য। ব্রাহ্মণেরা আজ্ঞাকর্ত্তা, শূদ্রেরা আজ্ঞাপালয়িতা।

ব্রাহ্মণ ও শূদ্র মধ্যে যে বিলক্ষণ বৈষম্য ছিল, তাহা মনুসংহিতায় স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। ব্রাহ্মণের মঙ্গলসূচক, ক্ষত্রিয়ের বলসূচক, বৈশ্যের ধনসূচক ও শূদ্রের নিন্দাসূচক নাম করিবে। ব্রাহ্মণের মঙ্গলবাচক, ক্ষত্রিয়ের রক্ষাবাচক, বৈশ্যের তুষ্টিবাচক ও শূদ্রের দাসবাচক শব্দ করিবে *।

পুনশ্চ প্রথম অধ্যায়ের একনবতি শ্লোকে,
একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া॥

এই কথাদ্বারা দাসত্ব যে শূদ্রদিগের অবলম্বন, ইহা মনু স্পষ্টতঃ দেখাইয়াছেন। সাধারণ বিধি ব্রাহ্মণদিগের সেবা করা, কিন্তু সুবিধা অভাবে শূদ্র, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারে ২। শূদ্র এরূপ হেয় জাতি যে, তাহার সমক্ষে বেদপাঠ করিলেও ব্রাহ্মণকে নরকগামী হইতে হইবে ৩। ‘ শূদ্র জাতি যদি ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণকে কঠিন বাক্যদ্বারা আক্ষেপ করে, তবে ঐ শূদ্র জিহ্বাচ্ছেদ রূপ দণ্ড প্রাপ্ত হইবে, যেহেতু পাদরূপ জঘন্য স্থান হইতে উহার জন্ম হয় ৪ ’। ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে বসিলে শূদ্রের বিলক্ষণ শাস্তিভোগ করিতে হইবে ৫। ‘ তোমা-

---

* মঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতং। বৈশ্যস্য ধনসংযুক্তং শূদ্রস্য তু জুগুপ্সিতং॥ শর্ম্মবদ্ ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্রাজ্ঞো রক্ষাসমন্বিতং। বৈশ্যস্য পুষ্টিসংযুক্তং শূদ্রস্য প্রৈষ্যসংযুতং॥ মনু ৩১,২ অ, ৩২॥

২ বিপ্রাণাং বেদবিদুষাং গৃহস্থানাং যশস্বিনাং। শুশ্রূষৈব তু শূদ্রস্য ধর্ম্মো নৈঃশ্রেয়সঃ পরঃ। মনু॥ ৯ অ, ৩৩৪॥

৩ নাবিস্পষ্টমধীয়ীত ন শূদ্রজনসন্নিধৌ। ন নিশান্তে পরিশ্রান্তো ব্রহ্মাধীত্য পুনঃ স্বপেৎ॥ মনু ৪ অ ৯৯॥

৪ (মনুসংহিতা। কুল্লূকভট্টকৃত টীকা বাঙ্গলানুবাদ সম্বলিতা। কলিকাতা সংস্কৃত কালেজ স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র শিরোমণি কর্ত্তৃক সংশোধিতা। পাঠকগণকে বলা বাহুল্য যে, যে সকল অনুবাদে উদ্ধৃত চিহ্ন দেওয়া থাকিবেক, তাহা উক্ত পুস্তক হইতে গৃহীত।)

একজাতির্দ্বিজাতীংস্তু বাচা দারুণয়া ক্ষিপন্। জিহ্বায়াঃ প্রাপ্নুয়াচ্ছেদং জঘন্যপ্রভবোহি সঃ॥ মনু ৮ম অ,২৭০॥

৫ সহাসনমভিপ্রেপ্সুরুৎকৃষ্টস্যাপকৃষ্টজঃ। কট্যাং কৃতাঙ্কোনির্ব্বাস্যঃ স্ফিচং

দিগের এই ধর্ম্ম অনুষ্ঠেয়, দর্প করিয়া শূদ্র যদি দ্বিজাতিকে এইরূপ ধর্ম্মোপদেশ দেয়, তবে রাজা উহার মুখে ও কর্ণে তপ্ত তৈল নিক্ষেপ করিবেন *।'

শূদ্রগণ এইরূপ দুরবস্থ হইলেও তাহাদিগের সামাজিক অবস্থা অন্যান্যজাতিদিগের মত ক্লেশ-বহুল ছিল না। তাহারা ইচ্ছা করিলে যাহারই হউক, তাহারই দাস হইতে পারিত। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য বর্ণ যে শূদ্রকে ইচ্ছানুসারে পালন করিতে পারিত, অনেকস্থলে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ইচ্ছা করিলে ব্যবসায়দ্বারও তাহাদিগের পক্ষে উন্মুক্ত ছিল—কেহই প্রতিবন্ধক হইতে পারিতেন না। তাহাদিগের প্রভুরাও তাহাদিগকে ব্যবহার বিরুদ্ধ কোনরূপ শাস্তি দিতে, অথবা তাহাদিগের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার প্রকাশ করিতে পারিতেন না। ইচ্ছা করিলে শূদ্রও অর্থসঞ্চয় করিতে পারিত। মনুর একস্থলে কথিত আছে যে, অন্যান্য বর্ণেরাও পাপাচরণ করিলে শূদ্রবৎ আচরিত হইত। ষষ্ঠ অধ্যায়ে মনু লিখিয়াছেন, অনুমতি না লইয়া অন্যের ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে, ক্ষেত্রজাত ফল ক্ষেত্রস্বামীরই হইবে †।

ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, যে, ব্রাহ্মণ ইচ্ছা করিলে শূদ্রের প্রতি যথেচ্ছাচারিতা প্রকাশ করিতে পারিতেন না।

আর একস্থলে—ভয়প্রদর্শন পূর্ব্বক অন্যের গৃহ, তড়াগ, উদ্যান, বা ক্ষেত্র হরণ করিলে পাঁচশতপণ দণ্ড দিতে হইবে। অজ্ঞানবশতঃ হরণ করিলে কেবল দুইশত পণ লাগিবেক। সীমানিরূপণের গোলযোগ উপস্থিত হইলে রাজা স্বয়ং আসিয়া সকল বিষয়ের মীমাংসা করিবেন ‡।

এই কথা বলিয়া মনু স্পষ্ট স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণেরা স্বেচ্ছাচারী হইবার ইচ্ছা থাকিলেও হইতে পারিতেন না। তাঁহাদিগকেও শূদ্রদিগের মত নিয়মানুযায়ী কর্ম্ম করিতে হইত। নিয়ম ভঙ্গ করিলে শাস্তি পাইতেন।

রাজাও ইচ্ছা করিলে যথেচ্ছাচারী হইতে পারিতেন না। সকল বিষয়েই তাঁহার প্রাপ্য কর নির্দ্ধারিত ছিল, তাহার অধিক তিনি চাহিতেন না, চাহিলেও পাইতেন না। " বাণিজ্য দ্রব্যের ক্রয় ও বিক্রয়ের মূল্য তাহা কতদূর হইতে আনীত

বাস্যাবকর্ত্তয়েৎ ॥ মনুসংহিতা ৮ অ২৮১ ॥

* ধর্ম্মোপদেশং দর্পেণ বিপ্রাণামস্য কুর্ব্বতঃ। তপ্তমাসেচয়েত্তৈলং বক্তে্র শ্রোত্রে চ পার্থিবঃ ॥ ৮ অ ২৭২ ॥

† যেহক্ষেত্রিণো বীজবন্তঃ পরক্ষেত্রপ্রবাপিণঃ। তে বৈ শস্যস্য জাতস্য ন লভন্তে ফলং কচিৎ ॥ মনু, ৬ অ ৪৯ ॥

‡ গৃহং তড়াগমারামং ক্ষেত্রং বা ভীষয়া হরন্। শতানি পঞ্চ দণ্ড্যঃ স্যাদজ্ঞানা দ্বিশতোদমঃ ॥ মনু। ৮ অ, ২৬৪ ॥

সীমায়ামবিষহ্যায়াং স্বয়ং রাজৈব ধর্ম্মবিৎ। প্রদিশেদ্ভূমিমেতেষামুপকারাদিতি স্থিতিঃ ॥ মনুসংহিতা ৮ অ, ২৬৫ ॥

পাথেয় ব্যয় এবং তাহা চৌরাদি হইতে রক্ষণাবেক্ষণ নিমিত্ত যে ব্যয়, এই সকল বিষয় অনুসন্ধান করিয়া এবং তজ্জন্য যত ব্যয় ধরিয়া তদতিরিক্তে যাহা লব্ধ নিশ্চয় হইবে, তদনুসারে বাণিজ্যদ্রব্যাদির উপর বণিক্‌দিগের নিকট হইতে রাজা কর লইবেন। সর্ব্বতোভাবে বিবেচনা পুরঃসর রাজা তাঁহার রাজ্যে কর নিরূপিত করিবেন, যাহাতে উভয়পক্ষ অর্থাৎ নিজে এবং বণিক্ আপন আপন কার্য্যের যথার্থ ফললাভ করিতে পারেন। যে প্রকারে জলৌকা রুধির পান, বৎস দুগ্ধপান ও ভ্রমর মধুপান করে, সেই প্রকারে অল্পে অল্পে রাজা বার্ষিক কর গ্রহণ করিবেন, যাহাতে প্রজাদিগের মূলধনের প্রতিকোন ব্যাঘাত না হয়। পশু ও সুবর্ণ সম্বন্ধীয় লভ্যের কর পঞ্চাশ ভাগের একভাগ। ধান্যাদিশস্য বিষয়ে কর, ক্ষেত্রের বলাবল বিবেচনায় এবং ভূমি বিশেষে কৃষিকার্য্যের আবশ্যক পরিশ্রমের ন্যূনাধিক্য বিবেচনায় ষষ্ঠ বা অষ্টম অথবা দ্বাদশ অংশের একাংশ রাজা লইবেন। বৃক্ষ, মাংস, মধু, ঘৃত, গন্ধদ্রব্য, ওষধি, বৃক্ষাদির রস, পুষ্পমূল,ফল, পত্র, শাক, তৃণ,বংশনির্ম্মিত পাত্র ও মৃণ্ময় পাত্র, প্রস্তরময় দ্রব্য এই সপ্তদশ প্রকার দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ে যাহা লাভ হইবে, রাজা তাহার ষষ্ঠ ভাগ গ্রহণ করিবেন *।”

এই সকল দ্বারা ইহা স্পষ্ট প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, কি রাজা কি ব্রাহ্মণ কেহই শূদ্রের প্রতি যথেচ্ছা অত্যাচার করিতে পারিতেন না। সকলকেই আইনমত কার্য্য করিতে হইত। মধ্যযুগের (Middle Ages) দাসেরা (Slaves) যেরূপ কষ্ট সহিত, তাহার তুলনায় আমাদিগের শূদ্রেরা যে অনেক সুখী ছিল, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। এদেশে প্রাচীন কালে যতই কেন বৈষম্য থাকুক না,এক দল প্রভু অপর দল ভৃত্য হউন না, কিন্তু আমরা স্পষ্ট বলিতে পারি যে, তাঁহাদিগের মধ্যে হৃদয়বিদারক অত্যাচার কখন প্রচলিত ছিল না। এই জন্যই আমরা বলিতেছিলাম, যদি কোন দেশে অত্যাচাররূপ

---

* ক্রয়বিক্রয়মধ্বানং ভক্তঞ্চ সপরিব্যয়ং। যোগক্ষেমঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য বণিজো দাপয়েৎ করান্॥ মনুসংহিতা ৭ অ, ১২৭॥—যথা ফলেন যুজ্যেত রাজা কর্ত্তা চ কর্ম্মণাং। তথাবেক্ষ্য নৃপোরাষ্ট্রে কল্পয়েৎ সততং করান্॥ ঐ ৭ অ ১২৮॥ যথাল্পাল্পমদন্ত্যাদ্যং বার্য্যোকোবৎ সষট্পদাঃ। তথাল্পাল্পো গ্রহীতব্যো রাষ্ট্রাদ্রাজ্ঞাব্দিকঃ করঃ॥ ঐ ৭ অ, ১২৯॥ পঞ্চাশদ্ভাগ আদেয়ো রাজ্ঞা পশুহিরণ্যয়োঃ। ধান্যানামষ্টমোভাগঃ ষষ্ঠো দ্বাদশ এব বা॥ ৭ অ ১৩০॥ আদদীতাথ ষড়্ভাগং দ্রুমাংসমধুসর্পিষাং। গন্ধৌষধিরসানাঞ্চ পুষ্পমূলফলস্য চ॥ ঐ ৭ অ, ১৩১॥ পত্রশাকতৃণানাঞ্চ বৈদলস্য চ চর্ম্মণাং। মৃণ্ময়ানাঞ্চভাণ্ডানাং সর্ব্বস্যাশ্মময়স্য চ॥ ঐ ৭ অ, ১৩২॥

নির্ষ্ঠুর বিধি না থাকে, যদি কোন দেশে প্রভু ও ভৃত্যদিগের মধ্যে সম্বন্ধ অন্যদেশীয়দিগের মত না হয়, সেটি আমাদিগের এই ভারতবর্ষ।

আমরা আর একপ্রকার প্রভু ভৃত্যের উল্লেখ করিয়া এই প্রস্তাব সমাপ্ত করিব।

আজি কালি স্ত্রী ও পুরুষ মধ্যে ভয়ানক বৈষম্যভাব দৃষ্ট হয়। এভাব যে পূর্ব্বে ছিল না একথা আমরা বলিতেছি না। কিন্তু প্রাচীন রমণীগণ বর্ত্তমান কামিনীদিগের অপেক্ষা যে সৌভাগ্যশালিনী ছিলেন ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব। তখন পুরুষ ও স্ত্রী প্রায় একই সোপানারূঢ় ছিলেন। ব্রহ্মা আপন দেহকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া একভাগে নারী এবং অপরভাগে নর সৃজন করিলেন †। এতদ্ব্যতীত স্ত্রীলোক যে সকলের পূজনীয়া, পিতা, ভ্রাতা, পতি, দেবর প্রভৃতি সকলেরই মাননীয়া, তাহা মনু স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। যেখানে স্ত্রীলোক পূজিত না হয়,সেখানে দেবতারাও প্রসন্ন নহেন। যেখানে স্ত্রীলোক অলঙ্কারে ভূষিত ন হয়, সেখানে কোন মঙ্গল নাই। যেখানে স্ত্রীলোকের মান আছে সেই স্থান যশের আকর; সেই কুল পবিত্র যেখানে স্ত্রীলোক পূজিতা। যেখানে স্ত্রীলোক অনাদৃতা হয়, সেইখানে সকল অমঙ্গল আসিয়া একত্র হয়, ইত্যাদি *। এই সকল বাক্যদ্বারা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোকেরা অধিকতর আদৃতা হইতেন। কিন্তু তাই বলিয়া যে প্রাচীন কালে পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের সমান অধিকার ছিল, তাহা কথনই নহে। স্ত্রীলোকদিগকে সকল সময়েই যে পুরুষের বশ্যতা স্বীকার করিতে হইত, তাহাও মনুর আর একস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। ‘ স্ত্রীলোক বালিকাই হউন, যুবতীই হউন, বা বৃদ্ধাই হউন, গৃহেতেও কোন কর্ম্ম ভর্ত্তৃপ্রভৃতি হইতে স্বতন্ত্র হইয়া করিতে পারিবেক না। স্ত্রীলোক বাল্যাবস্থায় পিতার বশে থাকিবে, যৌবনাবস্থায় স্বামীর বশে ও স্বামী মরিয়া গেলে

† দ্বিধা কৃত্বাত্মনোদেহমর্দ্ধেন পুরুষোভবৎ অর্দ্ধেন নারী। মনু।

* পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দ্দেবরৈস্তথা। পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ॥ মনুসংহিতা ৩ অ, ৫৫॥ যত্র নার্য্যাস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃক্রিয়াঃ॥ ৩ অ, ৫৬॥ শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যন্ত্যাশু তৎকুলং। ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥ ৩ অ ৫৭॥ জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ। তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ॥ ৩ অ,৫৮॥ তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যাভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ। ভূতিকামৈর্নরৈর্নিত্যং সৎকারেষূৎসবেষু চ॥ ৩ অ, ৫৯॥ সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈবচ। যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবং॥ ৩ অ ৬১॥

পুত্রের বশে, পুত্র না থাকিলে স্বামীর সপিণ্ড, সপিণ্ড না থাকিলে রাজার বশে থাকিবেক,স্ত্রীলোক কখন স্বাধীনতা লাভ করিবেক না। পিতা, স্বামী, পুত্র ইহাঁদিগের হইতে স্ত্রী কখন বিচ্ছিন্ন হইবেক না, যেহেতু স্ত্রী ইহাঁদিগের সহিত বিযুক্তা হইলে পতিকুল, পিতৃকুল, উভয়কুল নিন্দিত হয় *।' কিন্তু তাঁহারা স্বাধীন না হইলেও যে বর্ত্তমান রমণীদিগের অপেক্ষা অনেক উচ্চাসন অধিকার করিয়া ছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। পূর্ব্বেও পুরুষ প্রভুছিল, স্ত্রী ভৃত্য ছিল, এখনও তাহাই; কিন্তু পূর্ব্বের সম্বন্ধ এখনকার সম্বন্ধ হইতে অনেক পৃথক্। এক্ষণে সে সম্বন্ধ ভিন্নভাব ধারণ করিয়াছে। পুরুষেরা সর্ব্বেসর্ব্বা স্ত্রীলোক তাঁহাদিগের দাসী বলিলেই হয়। সাম্যবিধি প্রচারিত না হইলে সকল প্রকার বৈষম্য এজগৎ হইতে লুপ্ত হইবে না। যত দিন তাহা না হয়, তত দিন ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র, স্ত্রী এবং পুরুষ ইহাদিগের মধ্যে বিদ্বেষভাব বর্ত্তমান থাকিবেই থাকিবে। তত দিন ব্রাহ্মণ শূদ্রের প্রতি অত্যাচার করিবে, পুরুষ স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করিবে। যত দিন দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে এবিধি প্রচলিত না হয়, তত দিন এদগ্ধ জগতের মঙ্গল নাই। তত দিন পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাব আমরা দেখিতে পাইব না। তত দিন ছোট বড় জ্ঞান তিরোহিত হইবে না।†　　শ্রীমঃ—

* বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা। ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্ত্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্য্যং গৃহেষ্বপি ॥ ৫ম অ, ১৪৭ ॥ বাল্যে পিতুর্ব্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে। পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাং ॥ ৫ম অ, ১৪৮। পিত্রাভর্ত্রা সুতৈর্ব্বাপি নেচ্ছেদ্বিরহমাত্মনঃ। এবাং হি বিরহেণ স্ত্রী গর্হ্যে কুর্য্যাদুভে কুলে ॥ ৫ম অ, ১৪৯ ॥

পুনশ্চ মনুর নবম অধ্যায়ে লিখিত আছে।

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে। রক্ষন্তি স্থাবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥ ৩ ॥ ইমং হি সর্ব্ববর্ণানাং পশ্যন্তোধর্ম্মমুত্তমং। যতন্তে রক্ষিতুং ভার্য্যাং ভর্ত্তারো দুর্ব্বলা অপি ॥ ৬ ॥

† এই প্রবন্ধ লেখকের সহিত অনেক বিষয়েই আমাদিগের মতের একতা নাই। সাম্য ও বৈষম্য বিষয়ে আমাদিগের যাহা বক্তব্য আছে, আমরা কোন সময়ে অন্য এক প্রবন্ধে তাহা প্রকাশ করিব। সং—

জানকীর অগ্নিপরীক্ষা।

চরিতাখ্যায়কের নয়নে দর্শন করিলে জানকীর সমগ্র জীবনই অগ্নিপরীক্ষা। কৌমারে ধনুর্ভঙ্গপণ, যৌবনে বনবাসে পতির অনুগমন, অশোকবনে চেড়ীদিগের উৎপীড়ন, অযোধ্যায় রামকৃত নির্ব্বাসন এবং তপোবনে পুত্রকৃত স্বামীর নিধনশ্রবণ এই সমুদয়ই সেই ভীষণ অগ্নিপরীক্ষার ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়। কিন্তু এতদ্ভিন্ন একটি বিশেষ ঘটনা শব্দতঃ জানকীর অগ্নিপরীক্ষা নামে অভিহিত হইয়াছে। রাবণ নিহত হইলে যখন জানকীর উদ্ধারসাধন হয়, তখন বহুকাল পরগৃহে বাসজন্য তাঁহার সতীত্ব সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে যে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তন্নিরাকরণার্থই এই পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল। রামায়ণে উল্লেখ আছে যে, জানকী জ্বলদগ্নির মধ্যে প্রবেশ করেন এবং তন্মধ্যহইতে অক্ষতশরীরে বহির্গতা হয়েন। এই পরীক্ষায় বিজয়লাভই তাঁহার অক্ষুন্ন সতীত্বের নিঃশংসয় প্রমাণরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পৌরাণিকের নয়নে ইহা ঐশ্বরিক ব্যাপার, অথবা অতিমানুষিক ঘটনা; পক্ষান্তরে যাঁহাদিগের পৌরাণিক ইতিবৃত্তে আস্থা অল্প; তাঁহারা বলেন যে, ইহা কল্পনার অত্যাশ্চর্য্য সৃষ্টি বটে, কিন্তু বস্তুতঃ কবির অতিবর্ণনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। পৌরাণিকদিগকে নমস্কার করিয়া আমরা দূরে অবস্থান করিতেছি। তাঁহাদিগকে মর্ম্মস্পর্শী কোন কথা বলা আমাদিগের অভিপ্রায় নহে। আমরাও বিশ্বাস করি জানকী সতীত্বের আদর্শ, জানকী পরমা সতী। ঐশ্বরিক ব্যাপার কিংবা কবির অতিবর্ণনা না বলিয়া এই ঘটনা অন্য কোন প্রকারে ব্যাখ্যাত হয় কি না, বিজ্ঞান এই দুর্ব্বোধ্যবিষয়মধ্যে কোন আলোক প্রদান করে কি না, এই প্রবন্ধে আমরা তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিব। আমরা পাঠকবর্গকে অদ্য এই ঘটনার যে ব্যাখ্যা উপহার দিতেছি, তাহাই যে উহার অভ্রান্ত ব্যাখ্যা আমরা এরূপ বলি না; পক্ষান্তরে ঐ ব্যাখ্যা যে বিজ্ঞান ও সদ্‌যুক্তির অনুমোদিত তাহাতেও আমাদিগের সন্দেহ নাই।

অগ্নিপরীক্ষা ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ নহে। পুরাকালে অন্যান্য দেশেও ইহা প্রচলিত ছিল। সফোক্লিসের এণ্টিগোন্ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, গ্রীকেরা কখন কখন অগ্নিপরীক্ষাদ্বারা তাহাদিগের দোষ প্রক্ষালন করিত। উক্ত পুস্তকে লিখিত আছে যে, ক্রিয়ন এক ব্যক্তির নামে অপবাদ করাতে সে লোহিততপ্ত লৌহ হস্তে ধারণ করিয়া, এবং অগ্নির উপর দিয়া গমন করিয়া আপনাকে নির্দ্দোষী প্রমাণ

করিতে প্রস্তুত ছিল। ইংলণ্ডেশ্বর এডোয়ার্ডের মাতা রাণী এমার সহিত উইন্‌চেস্টরের ধর্ম্মাধ্যক্ষ অল্‌উইনের আত্মীয়তা থাকা বশতঃ সাধারণ্যে তাঁহার সতীত্বের উপর সন্দিহান হয়। রাণী এমা লোহিততপ্ত লৌহখণ্ডের উপর দিয়া অক্ষতপদে গমন করিয়া স্বীয় কলঙ্ক দূর করেন *। সিম্প্লিসিয়স্ অটন্ নগরের ধর্ম্মাধ্যক্ষ হওয়ার পরেও স্ত্রীর সহিত এক ভবনে বাস করিতেন। এই জন্য লোকে তাঁহাকে ভোগবিলাসী বলিয়া ঘৃণা করিত। কথিত আছে সিম্প্লিসিয়স্-জায়া বহুজনসমক্ষে তপ্ত অঙ্গার বস্ত্রে ও বক্ষে ধারণ করেন। তাঁহার বস্ত্র অদগ্ধ ও শরীর অক্ষত থাকে। পরে সিম্প্লিসিয়স্ স্বয়ংও ঐরূপ করেন। ইহাতে সর্ব্বসাধারণ তাঁহাদিগকে ভোগস্পর্শ-শূন্য বলিয়া সাদরে গ্রহণ করে। এই ঘটনা খৃষ্টের চতুর্থ শতাব্দীতে হইয়াছিল *। পঞ্চম শতাব্দীতে আবার সেণ্ট ব্রাইস্ এইরূপে আপন কলঙ্ক প্রক্ষালন করেন †।

মধ্যযুগে ইউরোপে অগ্নিপরীক্ষা প্রচলিত ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষে ইহার যেরূপ প্রাদুর্ভাব ছিল, অন্য কোথাও তদ্রূপ ছিল না। যাজ্ঞবল্ক্য, কাত্যায়ন প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণোদকেরা অগ্নিপরীক্ষার বিধি করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষে অগ্নিপরীক্ষা কেবল পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল এমত নহে; ইংরেজাধিকারের পরেও মধ্যে মধ্যে এইরূপ পরীক্ষা হইত। ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে কাশীর প্রধান বিচারক আলি ইব্রাহিম খাঁ। দুইটি অগ্নিপরীক্ষায় স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন ‡। তৎকালে নয় প্রকার পরীক্ষা প্রচলিত ছিল। নিম্নলিখিত বিবরণ তাঁহারই বর্ণনা অনুসারে লিখিত। ১—পরীক্ষার্থী এক দিন সম্পূর্ণ উপবাসী থাকিবে। পরে যজ্ঞান্তে তাহাকে তৌলে মাপা হইবে। দোষবাচক একখণ্ড কাগজ তাহার মস্তকে বাঁধিয়া দিয়া মন্ত্রপাঠান্তর তাহাকে পুনরায় মাপা হইবে, তাহাতে তাহার ভার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইলে সে দোষী, এবং ন্যূন হইলে সে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হয়; সমান হইলে পুনরায় মাপিতে হইবে। যাজ্ঞবল্ক্যের টীকাকার যোগী বিজ্ঞানেশ্বর তাঁহার মিতাক্ষরা পুস্তকে বলেন যে, তৃতীয়বারে অবশ্যই ন্যূনাধিক্য হইবে। ২—নয় হস্ত দীর্ঘ, দুই বিতস্তি পরিসর এবং এক বিতস্তি গভীর একটি খাত করিয়া তাহা পিপ্পল কাষ্ঠের অগ্নিদ্বারা পূর্ণ করিতে হয়। পরে পরীক্ষার্থী নগ্নপদে উহার উপর দিয়া গমন করে। পদ ক্ষত হইলে দোষী এবং অক্ষত থাকিলে নির্দ্দোষী সাব্যস্থ হয়। ৩—নাভীজলে দণ্ডায়মান হইয়া পরীক্ষার্থী ডুব দিয়া একজন ব্রাহ্মণের পদধারণ করিয়া থাকিবে। একটি দূরনিক্ষিপ্ত তীর আনয়ন পর্য্যন্ত ডুব দিয়া থাকিতে পারিলে নি-

* মোসিমের ধর্ম্ম ইতিহাস ২য় খণ্ড।

† ঐ ঐ

‡ এসিয়াটিক রিছার্চ ১ম খণ্ড।

র্দ্দোষী; অন্যথা দোষী। ৪—আট রত্তি মাখনের সহিত আড়াই রত্তি বিষনাগ ব্রাহ্মণহস্তে ভক্ষণ করিতে হয়, ইহাতে পরীক্ষার্থীর যদি কোনরূপ কষ্ট না হয় তাহা হইলে সে নির্দ্দোষী। বিষপরীক্ষা অন্য এক প্রকারেও গৃহীত হইয়া থাকে। ভাণ্ডমধ্যে একটি সর্প রাখিয়া তন্মধ্যে একটি মুদ্রা কিংবা অঙ্গুরীয়ক ফেলিয়া দেওয়া হইত। উহা তুলিয়া লইতে সর্প যদি পরীক্ষার্থীকে দংশন না করে তাহা হইলে সে নির্দ্দোষী। ৫—শালগ্রাম ধোয়াইয়া সেই জল পরীক্ষার্থী পান করিলে যদি দুই সপ্তাহের মধ্যে কোন পীড়া না হয় তাহা হইলে সে নির্দ্দোষী। ৬—শালগ্রাম ওজন করিয়া তণ্ডুল লইতে হইবে। সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদিগকে সেই তণ্ডুল চর্ব্বণ করিতে দিতে হইবে। যাহার মুখ হইতে শুষ্ক সরক্ত তণ্ডুল বহির্গত হইবে সেই দোষী। ৭—তপ্ত তৈলে হস্ত প্রদান করিলে যদি অক্ষত থাকে, তাহা হইলে নির্দ্দোষী প্রমাণ হয়। ৮—তপ্ত লৌহকন্দুক কিংবা তীরাগ্রস্পর্শে হস্ত অক্ষত থাকিলে সে নির্দ্দোষী। ৯—ধর্ম্মের এবং অধর্ম্মের দুইটি মূর্ত্তি করিয়া জলভাণ্ডে নিক্ষেপ করিতে হয়। পরীক্ষার্থী যদি ধর্ম্মের মূর্ত্তি উত্তোলন করে তাহা হইলে সে নির্দ্দোষী। এই নয়টি পরীক্ষার মধ্যে দ্বিতীয়, সপ্তম এবং অষ্টম এই তিনটি অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে গণ্য হইতে পারে। আলি ইব্রাহিম খাঁ সপ্তম এবং অষ্টম প্রকারের দুইটি পরীক্ষা স্বয়ং দর্শন করিয়াছিলেন। সপ্তম প্রকারের পরীক্ষায় তপ্ততৈলে পরীক্ষার্থীর হস্তদগ্ধ হইয়া যায় এবং সে দোষী সাব্যস্ত হয়। অষ্টম প্রকারের পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী লোহিততপ্ত লৌহকন্দুক অক্ষত হস্তে ধারণ করিয়া নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হয়। আলি ইব্রাহিম খাঁ এই পরীক্ষার্থীদ্বয়কে নিবারণ করিতে চেষ্টা পান, কিন্তু তাহারা কোন প্রকারেই তাঁহার কথায় সম্মত হয় না। লৌহকন্দুকধারী হস্তে সাতটি অশ্বত্থ পত্র ও সাতটি দুর্ব্বা দিয়া লইয়াছিল।

যদিও এখন দোষ প্রমাণ কিংবা প্রক্ষালন জন্য এরূপ পরীক্ষা প্রচলিত নাই, তথাপি এই শ্রেণীর ঘটনা মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। বোধ হয় পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ কেহ লোহিততপ্ত কোদালের উপর সতৈলপদ স্পর্শ করাইয়া সেই পদদ্বারা রোগীকে ঝাড়িতে দেখিয়া থাকিবেন। এইরূপ আরও দৃষ্টান্ত আছে। বাহুল্য ভয়ে তৎসমুদয় ত্যাগ করিয়া আমরা এক্ষণে মূল বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটি সাধারণ পাঠকের বোধগম্য করিতে যত্নশীল হইব।

মসৃণ লৌহ বা রৌপ্যফলক তপ্ত করিয়া তদুপরি কএক বিন্দু জল নিক্ষেপ করিলে উহা ফলকের তাপানুসারে শীঘ্র বা গৌণে শুকাইয়া যায়; অর্থাৎ ফলক যত তপ্ত, তত অল্প সময়ে জলবিন্দু বাষ্পাকারে পরিণত হয়। কিন্তু একটি নির্দ্দিষ্ট তাপরেখা অতিক্রম করিলে আর এরূপ ঘটে না। জলের পক্ষে এই নির্দ্দিষ্ট

রেখা তাপমান যন্ত্রের ১৫০ ডিগ্রি *। ১৫০ ডিগ্রি কি ততোধিক তপ্ত ফলকোপরি কতিপয় কবোষ্ণ জলবিন্দু নিক্ষেপ করিলে উহা সহসা বাষ্পাকারে পরিণত না হইয়া নলিনীদলগত জলবৎ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে থাকে এবং প্রায়শঃই জলবিন্দুর পার্শ্ব কুঞ্চিত দৃষ্ট হয়। তরল পদার্থের এই অবস্থা গোলকম্প অবস্থা নামে অভিহিত হইয়াছে। ফলক খানিকে ক্রমে শীতল হইতে দিলে যখন তাহার তাপ ১৫০ ডিগ্রির ন্যূন হয়, তখন সহসা শব্দ করিয়া গোলকম্প জল বাষ্পাকারে পরিণত হয়। অনেক কাল হইতে এই বিষয়টি বিদিত ছিল, কিন্তু শতাধিক বর্ষ হইল লীডনফ্রস্ট প্রথম উহার গূঢ়ানুসন্ধান করেন। সম্প্রতি বুটিনী এতৎসম্বন্ধীয় অনেক গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশিত করিয়াছেন। বুটিনীই 'গোলকম্প অবস্থা' এই সংজ্ঞা প্রথম ব্যবহার করেন। সম্ভবতঃ সমুদয় তরল পদার্থই এই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। এযাবৎ জল, সুরাসার, ইথর, তরল গন্ধকীয় অম্ল,তরল যবক্ষারীয় অম্লজান, সোডিয়ম গন্ধক ও যাবক্ষারিক অম্ল এই কএকটি তরল পদার্থদ্বারাই পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হওয়া গিয়াছে †। সুরাসার দিয়া এই পরীক্ষা করিতে হইলে ফলকের তাপ ১৩৪½ ডিগ্রি কিংবা তদূর্দ্ধ হওয়া আবশ্যক, ইথরের পক্ষে কেবল ৬১ ডিগ্রি হইলেই হয়।

যে তাপে কোন তরল পদার্থ ফুটিতে থাকে সে তাপকে সেই পদার্থের স্ফুটন তাপ কহে। পরীক্ষাকালে তাপমানযন্ত্র দ্বারা গোলকম্প তরলের তাপ নিরূপণ করিলে দেখা যায় উহার তৎকালীন তাপ

* এই প্রবন্ধে তাপ নির্দ্দেশ সময়ে তাপমান যন্ত্রের শতকীয় বিভাগ (Centigrade scale) ব্যবহৃত হইয়াছে। তাপমানের এইরূপ বিভাগ করিতে নিম্ন লিখিত প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়। প্রথমতঃ তাপমান যন্ত্র গলৎ বরফের মধ্যে নিমগ্ন করিয়া রাখিলে পারদ যে স্থলে নামিয়া স্থির হয় তাহা চিহ্নিত করিতে হয়। পরে স্ফুটজ্জলের বাষ্পে নিমগ্ন করিলে পারদ যেস্থলে উঠিয়া স্থির হয় তাহাও চিহ্নিত করিতে হয়। এই দুই চিহ্নের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধানকে শতাংশে বিভক্ত করিতে হয় এবং নিম্ন হইতে ০, ১, ২, ৩,······৯৮,৯৯,১০০ চিহ্নের সংজ্ঞা দিতে হয়। ১০০ র ঊর্দ্ধে ঐরূপ সমান অংশ করিয়া ১০১, ১০২, ১০৩ ইত্যাদি চিহ্ন দিতে হয় এবং ০র নীচে ঐরূপ সমান অংশ করিয়া—১,—২,—৩ ইত্যাদি চিহ্ন দিতে হয়। সুতরাং—৩৯ ডিগ্রি বলিলে শূন্য ডিগ্রির ৩৯ ডিগ্রি নিম্নতাপ অর্থাৎ যে তাপে বরফ গলিতে থাকে তাহার ৩৯ ডিগ্রি কম তাপ বুঝায়।

† আমরা ইংরেজী অস্ ও ইকের পার্থক্য বাঙ্গলায় ঈয় এবং ইক দ্বারা নির্দ্দেশ করিব। যথা সালফিয়ুরিক এসিড গান্ধকিক অম্ল; সালফিয়ুরস্ এসিড গন্ধকীয় অম্ল।

স্ফুটনতাপ অপেক্ষা ন্যূন। এতদ্বিষয়ে বুটিনীর তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। পদার্থের বিপরীতে প্রথমতঃ স্ফুটন-তাপ ও তৎপরে গোলকম্পাবস্থার তাপ লিখিত হইল।

জল	১০● ডিগ্রি	৯৫ ডিগ্রি
সুরাসার	৭৮ "	৭৫ "
ইথর	৩৭ "	৩৪ "
গন্ধকীয় অম্ল	১০ "	১১ "

এই সূত্রের উপর নির্ভর করিয়া বুটিনী কএকটি আশ্চর্য্য এবং বিস্ময়জনক প-রীক্ষা সম্পাদন করিয়াছেন। গন্ধকীয় অম্ল—১০ ডিগ্রির নীচে এবং যাবক্ষারীয় অম্ল—৭০ ডিগ্রির নীচে তরল অবস্থায় থাকে এবং তদূর্দ্ধ তাপে বাষ্পাকার ধারণ করে। লোহিততপ্ত ক্ষুদ্র রৌপ্য পাত্রে যদি কএক বিন্দু তরল গন্ধকীয় অম্ল নি-ক্ষেপ করা যায় তাহা হইলে উহা গোল-কম্পাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং বুটিনীর পরী-ক্ষানুসারে উহার তাপ—১১ ডিগ্রি থাকে, জল ০ ডিগ্রির নীচেই অদ্রব বরফে প-রিণত হয়। অতএব যদি ঐ লোহিততপ্ত পাত্রস্থ তরল গন্ধকীয় অম্লের উপরে কএক বিন্দু জল নিক্ষেপ করা যায় তাহা হইলে জলের তেজঃক্ষয় হইয়া উহা বরফে প-রিণত হয় *। বুটিনী এই প্রকারে পারদ-কেও অদ্রবাবস্থ করিয়াছেন।—৩৯ ডি-গ্রির নীচে পারদ অদ্রব অবস্থা ধারণ করে। গোলকম্প তরল যবক্ষারীয় অ-ম্লের তাপ—৭০ ডিগ্রির নীচে থাকে, অতএব তদুপরি কএক বিন্দু পারদ নি-

* আমরা Heat হীট এবং Temperature টেম্পারেচর এই দুইয়ের পার্থক্য রক্ষার জন্য বাঙ্গালায় তেজ ও তাপ এই দুইটী শব্দ নির্দ্দেশ করিব। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ও এই দুই শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু অধুনাতন বিজ্ঞানলেখকদিগেরমধ্যে শ্রীযুক্ত কানাইলাল দে রায় বাহাদুর এবং শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এই দুইয়ের পা-র্থক্য রক্ষার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া উভয় স্থলেই তাপ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। হীটকে তাপ বলিয়া থারমমিটরকে তাপ-মান বলা যে কতদূর অসঙ্গত তাহা যাঁহারা বিজ্ঞানের উপক্রমণিকা মাত্র পাঠ করি-য়াছেন তাঁহারাও বুঝিবেন। ইহাঁরা কি হীট এবং টেম্পারেচরের পার্থক্য স্বীকার করেন না? না কেলরিমিটর এবং থার্ম্মমি-টর উভয়ই ইহাঁদিগের নিকট এক পদার্থ। হীটকে তাপ বলিলে এই কেলরিমিটর-কেই তাপমান বলা উচিত। বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক শব্দের প্রয়োগ বিষয়ে ইহাঁ-দিগের এক এক জনের উদাসীনতা আরও বিস্ময়কর; ইঁহারা সমস্ত পুস্তকে হীটকে তাপ বলিয়া শেষে স্পেসিফিক্ হীটকে আপেক্ষিক তেজ নাম দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আমরা হীটকে তেজ, টেম্পারেচরকে তাপ, থারমমিটরকে তা-পমান, কেলরিমিটরকে তেজোমান এবং স্পেসিফিক্ হীটকে আপেক্ষিক তেজ বলিব।

ক্ষেপ করিলে উহার তেজঃক্ষয় হইয়া উহা অদ্রবাবস্থ হয়। ফেরাডে এই পরীক্ষাটি প্রকারান্তরে সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি তরল যবক্ষারীয় অম্লের পরিবর্ত্তে ইথর এবং অদ্রব আঙ্গারিক অম্লের ব্যবহার করিয়াছেন।

তরল পদার্থের এই গোলকল্প অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার কারণ কি ? সামান্যতঃ একটি উষ্ণ এবং একটি শীতল পদার্থ একত্র করিলে উভয়ের তাপসামঞ্জস্য হয়, অর্থাৎ উষ্ণ পদার্থ কিঞ্চিৎ শীতল ও শীতল পদার্থ কিঞ্চিৎ উষ্ণ হইয়া উভয়েরই এক তাপ হয়। আবার তেজের তাপ বৃদ্ধি যেরূপ একটি কার্য্য, অবস্থা পরিবর্ত্তন করাও সেইরূপ আর একটি কার্য্য, অর্থাৎ তাপবৃদ্ধি হইতে যেরূপ তেজঃক্ষয় হয়, অদ্রব পদার্থকে তরল, কিংবা তরল পদার্থকে বাষ্প করিতেও সেইরূপ তেজঃক্ষয় হয়। গোলকল্প অবস্থার পরীক্ষা সমূহে তেজ, ফলক ও তরলের তাপসামঞ্জস্য করিবার পূর্ব্বেই তরল পদার্থকে বাষ্পে পরিণত করে। এই বাষ্পমণ্ডলে গোলকল্প তরল পদার্থ ভাসমান থাকে অর্থাৎ তরল পদার্থ লোহিতোষ্ণ ফলককে স্পর্শ করে না বাষ্প উহাদিগের মধ্যে ব্যবধান থাকে। এই ব্যবধান থাকা বশতঃই তাপসামঞ্জস্য শীঘ্র হইতে পারে না। ফলক ক্রমে ক্রমে শীতল হইলে আর পর্য্যাপ্ত বাষ্প উদ্গাত হয় না। তখন তরল পদার্থ ফলক স্পর্শ করে এবং স্পর্শমাত্রই তাপসামঞ্জস্য করিতে লোহিততপ্ত পাত্রের তেজঃ তরল পদার্থকে এককালে বাষ্পাকারে পরিণত করে।

গোলকল্প তরল পদার্থ ও লোহিততপ্ত ফলক যে পরস্পর স্পর্শ করে না, তাহা পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে। ফলক খানি ঠিক সমান করিয়া বসাইয়া যদি কএক বিন্দু জল তাহার উপরে নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে জল কোন দিকে গড়াইয়া পড়ে না। উপর হইতে একটি তার জলসংলগ্ন করিয়া ধরিলে জল স্থির থাকিবে। এখন ফলক ও জলের মধ্য দিয়া দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে অপর পার্শ্বস্থ দীপশিখা দেখা যাইবে। জল কালী দ্বারা কাল করিয়া দিলে পরীক্ষাটি আরও স্পষ্ট হয়। তাড়িতালোক সাহায্যে পটে এই পরীক্ষার ছায়া নিক্ষেপ করিলে ফলক ও জলের মধ্যে যে ব্যবধান আছে তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। নিম্নতল হইতে অতিমাত্রায় বাষ্প উদ্গাত হওয়াতেই এই ব্যবধান থাকে এবং এই কারণেই গোলকল্প তরল স্থির না থাকিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে। চার্চ্চ সাহেব ভিন্ন প্রকারের গুটিকত পরীক্ষা দ্বারা এই ব্যবধান সপ্রমাণ করিয়াছেন। ঐ সমস্তের একটির মাত্র আমরা এস্থলে উল্লেখ করিব। রৌপ্য সোডিয়ম-গন্ধক-সংলগ্ন হইলে রৌপ্য-গন্ধক প্রস্তুত হয় এবং তজ্জন্য রৌপ্যে একটি কাল দাগ পড়ে। চার্চ্চ সাহেব দেখাইয়াছেন যে, রৌপ্যপাত্র লোহিততপ্ত করিয়া তদুপরি

সোডিয়ম-গন্ধক নিক্ষেপ করিলে যতক্ষণ উহা গোলকল্প অবস্থায় থাকে ততক্ষণ রৌপ্যপাত্রে কোন দাগ লাগে না।

অতি তপ্ত ধাতু এবং তরল পদার্থ যে পরস্পর সংলগ্ন হয় না, তাহা আরও অন্যান্য উদাহরণদ্বারা দেখান যায়। যদি প্লাটিনম্‌নির্ম্মিত একটি কন্দুক লোহিততপ্ত করিয়া জলপাত্রে নিমজ্জিত করা যায় তাহা হইলে জলরাশি উহার পার্শ্ব হইতে অপসৃত হয় এবং প্লাটিনম কন্দুকটি বাষ্পমণ্ডলে আবৃত হইয়া কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত লোহিততপ্তই থাকে; পরে যখন জলকে বাষ্পে পরিণত করিতে উহার এত তেজঃক্ষয় হয় যে, উহার তাপ ১৫০ ডিগ্রির ন্যূন হইয়া যায়, তখন অন্যোন্য সংলগ্ন হইয়া জল ফুটিতে থাকে এবং প্রভূত বাষ্পরাশি উদ্গত হয়। আরও একটি সাধারণ উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। পটাসিয়ম জলে নিক্ষেপ করিলে জলজান ও পটাস প্রস্তুত হয়। জলজান জ্বলিতে থাকে এবং তজ্জন্য এত অধিক তাপ হয় যে, পটাস জলসংলগ্ন না হইয়া উপরে ভাসিতে থাকে। জলসংলগ্ন হইলে ভারবশতঃ ডুবিয়া যাইত।

গলিত সীসকের মধ্যে অথবা গলিত লৌহের মধ্যেও কিরূপে হস্ত দেওয়া যাইতে পারে তাহা উপরোক্ত পরীক্ষাসমূহ বুঝিয়া থাকিলে, সহজেই প্রতিপন্ন হইবে।*

* সীসকের গলনতাপ ৩৩৫ ডিগ্রি, লৌহের ১৫০০ ডিগ্রি।

হস্ত আর্দ্রবস্ত্রে মুছিয়া পরে গলিত ধাতুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করিতে হয়। অতিতাপজন্য হস্তের জল বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া হস্তকে ধাতুসংলগ্ন হইতে দেয় না। এই জন্যই হস্ত অক্ষত থাকে। কিন্তু তপ্ত জলে হস্ত দিলে জলসংলগ্ন হওয়াতে দগ্ধ হইয়া যায়।

এক্ষণে দেখা যাউক অগ্নিপরীক্ষা বিশ্বাস করা যায় কি না? হইতে পারে মনুষ্যের জ্ঞানভাণ্ডার পুরাকাল অপেক্ষা এক্ষণে প্রশস্ততর হইয়াছে। কিন্তু ইহাও কি সম্ভবপর নহে যে পুরাকালে যে সমস্ত বিষয় লোকবিদিত ছিল তাহার মধ্যে দুই চারিটি আমরা জানি না। সম্ভবতঃ এমন কোন পদার্থ পুরাকালে বিদিত ছিল যাহা শরীরে মর্দ্দন করিয়া কিংবা মাখিয়া গেলে তাহার বাষ্প শরীরকে অগ্নিসংলগ্ন হইতে দেয় না। অতএব দেখা যাইতেছে বাষ্পব্যবধানে অগ্নিপরীক্ষার সুন্দর ব্যাখ্যা রহিয়াছে। আর একটি কথা বলিয়া আমরা প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

সংপ্রতি সুইডেন দেশবাসী কাপ্তান আলষ্ট্রম এক নূতন পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়াছেন। উহা পরিধান করিয়া স্বচ্ছন্দে অগ্নিমধ্যে অর্দ্ধঘণ্টা বা তদূর্দ্ধ কাল কর্ত্তন করা যায়। সিলিসিয়া নগরে এই পরিচ্ছদের যে পরীক্ষা হয়, তাহাতে আলষ্ট্রম, স্বয়ং জ্বলদগ্নির মধ্যে প্রবেশ করেন। চারি স্তূপ কাষ্ঠ অগ্নিসংযোগে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি অনায়াসে অগ্নিশিখার মধ্যে ভ্রমণ

করিতে লাগিলেন কখনও বা কোন জ্বলৎ কাষ্ঠখণ্ডের উপর বসিতে লাগিলেন। পর দিবস নিকটস্থ অঙ্গারখনির মধ্যে পুনরায় এই পরিচ্ছদের পরীক্ষা করা হয়। খনির এক পার্শ্ব গ্যাসপূর্ণ করিয়া অন্যান্য অংশ হইতে পৃথক্ করা হয়। একজন ভদ্রলোক স্বেচ্ছাক্রমে ঐ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া খনিমধ্যে অবতীর্ণ হইলেন এবং গ্যাসে অগ্নি প্রদান করা হইল। তিনি ২০ মিনিট কাল এই জ্বলৎ গ্যাস মধ্যে বিনা কষ্টে থাকিয়া বাহিরে আসিলেন। আলষ্ট্রম্ এই পরিচ্ছদ প্রুসিয়াদিগের নিকট ৫০ মার্ক মূল্যে বিক্রয় করিয়াছেন। বিজ্ঞানের কোন্ নিগূঢ় সূত্র অবলম্বন করিয়া তিনি এই পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা এযাবৎ প্রকাশিত হয় নাই। পরিচ্ছদের মূল্যহ্রাসভয়ে উহা অপ্রকাশিত রাখা হইয়াছে। আমরা উপরে বিজ্ঞানের যে কএকটি তত্ত্ব প্রকটিত করিয়াছি তাহা এবং এই অগ্নিপরিচ্ছদের মূলতত্ত্ব এক কি না বলিতে পারি না। যদি এক না হয় তাহা হইলে জানকীর এই ভুবনবিশ্রুত, প্রসিদ্ধ অগ্নিপরীক্ষার আরও একটি বিজ্ঞানসম্মত, যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীল—

নিন্দুকের এত নিন্দা কেন ?

এদেশের এক প্রাচীন নীতি-প্রবক্তা এইরূপ বলিয়াছেন যে, পৃথিবী সকল ভার সহিতে পারেন, নিন্দুকের ভার সহিতে পারেন না। নিন্দুক পর্ব্বত ও সমুদ্র হইতেও দুর্ব্বহ। আবার সকল নীতি-প্রবক্তার শিরোমণি মহামনা সেক্ষপিরও নিন্দুকের নিন্দাচ্ছলে অতিমর্ম্মস্পর্শি বাক্যে এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন যে,—

"যে আমার ধনরাশি অপহরণ করে, সে আমার কিছুই অপহরণ করে না। উহা অবস্তুমধ্যে পরিগণনীয়। উহা আমার ছিল, এইক্ষণ তাহার হইল, এবং পূর্ব্বেও উহা সহস্র সহস্র লোকের ভোগে আসিয়াছিল। কিন্তু যে আমা হইতে আমার সুনামটি অপহরণ করে, সে আপনি ধনী হয় না, অথচ আমায় প্রকৃতই দরিদ্র করে।"

এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে, সমাজে সকলেই নিন্দুকের উপর খড়্গহস্ত ; সকলেই নিন্দুককে হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করেন। নিন্দুকের জিহ্বার নাম বিষ, নিন্দুকের সাহচর্য্যের নাম নরক, নিন্দুকের কথোপকথনের নাম ভাষার কলঙ্ক। ইহা কেন ? নিন্দা যদি এমনই এক মহাপাতক, তবে এপাপে কে না লিপ্ত ? মনুষ্যনিবাসে কে না পরের নিন্দা করে ?

যাঁহারা বয়োবৃদ্ধ, বহুদর্শী, তাঁহারা নব্যমাত্রকেই হিতাহিতবিবেচনাশূন্য, অস্থিরস্বভাব ও উদ্ধত বলিয়া নিন্দা করেন;—যাঁহারা নব্য, তাঁহারাও বৃদ্ধদিগকে নিক্রিয়, নিরুদ্যম, অনুরাগশূন্য ও ক্ষতিলাভ-গণনা-তৎপর বলিয়া নিন্দা করিতে ভালবাসেন। যেখানে পাঁচটি প্রাচীনা গৃহিণী একত্র উপবিষ্ট হন, সেখানে কেবলই নবীনাদিগের নিন্দা,—নবীনা কুলবধূরা, বিলাসিনী, বস্ত্রাভরণপ্রিয়া অলসা, লজ্জাহীনা, অকর্ম্মণ্যা কেবলই এই আলাপ। আবার যেখানে পাঁচটি সভ্যতাভিমানিনী নবীনা দৈবযোগে আসিয়া একত্র হন, সেখানেও শুধু প্রাচীনাদিগেরই নিন্দাবাদ।

কি বিচিত্র! যাঁহারা স্বয়ং যারপর নাই নিন্দনীয়, তাঁহারাও পরনিন্দায় বিমুখ নহেন। কোন প্রাচীনা কোন্দলে এত অনুরক্ত যে, আর কাহাকেও না পাইলে, তিনি বাগানের বৃক্ষ লতার সহিতও প্রতিদিন কিছুক্ষণ বিবাদ করিয়া থাকেন। তাঁহার আস্ফালনে,হুঙ্কারে,তর্জ্জনে ও গর্জ্জনে, তাঁহার ভ্রূকুঞ্চনে, বাহুতাড়নে দন্তে দন্তঘর্ষণে, ও চক্ষুদ্বয়ের বিকট আবর্ত্তনে বালক বালিকার কথা দূরে থাকুক, পশু-পক্ষীও ত্রাহিরবে পলাইয়া যায়। তাঁহার গগণ-বিদারী ঘর্ঘর চীৎকারে গ্রামের কুকুর গুলিও ভয়ে চমকিয়া উঠে। অথচ তিনি তাঁহার ভ্রাতার পুত্রবধূটিকে, সর্ব্বদাই মুখরা বলিয়া তিরস্কার করেন,—আধুনিক যুবতীরা লেখাপড়া শিখিয়া অশিষ্ট হইতেছে এই ভাবিয়া সর্ব্বদা দুঃখিত রহেন। এদিগে ক্ষীরদা ছয় মাস হইল ক খ ছাড়িয়া নাম আর পত্র লিখিতে অভ্যাস করিতেছেন; তিনি পায়ে একটুকু আলতা মাখিয়া, হাতে একখানি শিশুশিক্ষা লইয়া, শ্বশ্রূ ননান্দৃ প্রভৃতি গুরুজনদিগকে মূর্খ ও অসভ্য বলেন, এবং তাঁহাদিগের শাস্ত্রালাপবর্জ্জিত কাব্যকথাশূন্য, কথোপকথন হইতে দূরে রহিতে পারিলেই আপনাকে কৃতার্থ বিবেচনা করেন।

এই প্রকার পরস্পর নিন্দা সর্ব্বত্রই প্রচলিত। যাজক সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা কবি, দার্শনিক ও রাজনীতিনিপুণ ব্যক্তিদিগকে প্রায়ই সেই এক অনির্ব্বচনীয় সানুনাসিক স্বরে পাপী ও নাস্তিক বলিয়া নিন্দা করেন; ইহারাও পক্ষান্তরে অতি উদারস্বভাব, বিশুদ্ধচরিত্র ও স্নেহার্দ্রচিত্ত যাজকদিগকেও কপট, ভণ্ড, বকতপস্বী ও বিশ্ববিদ্বেষী বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন।

যেমন প্রভুদিগের মধ্যে ভৃত্যের নিন্দা, ভৃত্যদিগের মধ্যেও সর্ব্বদাই সেইরূপ প্রভুনিন্দা। যদুর প্রভু বড় কৃপণ, বড় শঠ। তিনি তাঁহার ভৃত্যদিগের প্রতি আগে নানারূপ সদাশয়তা প্রদর্শন করেন, কিন্তু বেতন দিবার সময়ে নিশ্চয়ই তাহাদিগকে নানাবিধ কৌশলে বঞ্চনা করিতে যত্নপর হন। রামেশ্বরের প্রভু পিশাচের নিকটই প্রথম বয়সে পাঠ লইয়া থাকিবেন।

হিলে তাঁহার কথা কহিবার রীতি এমন কদর্য্য কেন যে,শুনিলে ইতরলোকেও লজ্জা অনুভব করে। রমেশের প্রভু কাক কি কোকিল ইহাই সন্দেহের বিষয়। তাঁহার চক্ষু কোকিল-চক্ষুর ন্যায়, সকল সময়েই আরক্ত; তাঁহার কণ্ঠধ্বনি কাককণ্ঠনিঃসৃত কঠোরধ্বনি হইতেও অধিকতর শ্রুতিপীড়ক। মাধব বলে যে, তাহার প্রভু এক আশ্চর্য্য বীর। তিনি ঘরের বাহির হইলে সর্ব্বদাই মার্জ্জারভীত মুষিকের ন্যায় ভয়ে জড়সড় থাকেন; কিন্তু যেই স্বগৃহে প্রত্যাগত হন, অমনি ইহাকে পদাঘাত করেন, উহাকে কটু কথা বলেন, এবং আর কাহারও কিছু না পারিলেও মাধবকে আর মাধবের কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে অবশ্যই কিঞ্চিৎ বচনসুধা উপহার দেন। প্রভু-চরিত্রের এইরূপ আলোচনা কোথায় না শ্রুত হয়?

মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের যত যত বিষয়ে আলাপ হয়, তাহার প্রধান এক ভাগই ঈদৃশী নিন্দা। দুখানি জিহ্বা আর চারিটি কর্ণ একত্থানে হইলেই একজন না একজনের নিন্দাবাদ আরম্ভ হইল। ইহাতে এই বোধ হইতে পারে যে, মনুষ্যকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির পণ্ডিতেরা যেমন দ্বিপাদ, দ্বিভুজ, বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়াছেন, মনুষ্য জাতিকে নিন্দুকসংজ্ঞা দিলেও দর্শনশাস্ত্রানুসারে তাহা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না।

আর একপ্রকারে দেখিতে গেলে নিন্দা অপরিহার্য্য। তুমি এই সংসারে যে কোন কার্য্যে লিপ্ত হও, তাহাতেই তোমাকে অল্প কি অধিক পরিমাণে নিন্দুক হইতে হইবে। যাঁহারা ধর্ম্ম সংস্কারক,কি কোন বিশেষ সত্যের প্রচারক,তাঁহারা সকলেই নিন্দুকের অগ্রগণ্য। সম্প্রদায় বিশেষের নিগ্রহ বিনা সাম্প্রদায়িক বিজয়পতাকা কোন দেশে উড্ডীন হয় নাই। লোকে লুথরের কতই না প্রশংসা করে। কিন্তু বিচারতঃ তাঁহার প্রধান প্রশংসা এই যে, পোপ এবং পোপের শিষ্যবর্গকে নিন্দা করিবার সময়ে তিনি একাই একসহস্র জিহ্বা এবং সহস্রাধিক ভেরীর কার্য্য করিতেন। ক্যাথলিকগণ যেখানে তাঁহার এক গুণ নিন্দা করিতেন, তিনি সেখানে অযুতগুণে তাঁহাদিগের নিন্দা করিয়া ঋণপরিশোধে যত্ন পাইতেন। এইরূপ ঐতিহাসিক, এইরূপ চরিতাখ্যায়ক, এইরূপ রাজনীতিবেত্তা এবং এইরূপ সংবাদ পত্রাদির সম্পাদক ও সাহিত্য সমালোচক। কেহ লোকান্তরবাসী রাজা ও রাজমহিষী এবং মৃত গ্রন্থকারদিগকে মন্ত্রবলে পুনর্জ্জীবিত করিয়া তাঁহাদিগের উপর নিদারুণ কশাঘাত করিতেছেন;—কেহ জীবিত রাজপুরুষ, জীবিত গ্রন্থকার অথবা অন্য কোন শ্রেণির জীবিত প্রধান ব্যক্তিদিগকে ক্রীড়া পুত্তলের মত নির্জ্জীব বিবেচনায় যথেচ্ছ গালি দিতেছেন। অধিক আর কি, কল্পনা মাত্র যাঁহাদিগের সম্বল সেই কবিগণও অতি সূক্ষ্ম কৌশলে

লোকের নিন্দা করিয়া জগতে নিন্দার সার্থকতা দেখাইতেছেন। যখন সকলেই এই প্রকার কাহারও না কাহারও নিন্দা করিতে বাধ্য হইতেছেন, বল তবে নিন্দুকের আর নিন্দা করিব কেন ?

এই প্রশ্নটি প্রথমে যত সহজ বোধহয়, বস্তুতঃ তত সহজ নহে। ইহার প্রত্যুত্তরে অনেক কুট কথার আন্দোলন হইতে পারে। আমরা তথাপি সহজপথ অবলম্বন করিতেই চেষ্টা করিব।

আমাদিগের বিবেচনায় স্তুতি ও নিন্দা উভয়েরই সীমারেখা সত্য। সত্যকে উল্লঙ্ঘন করিয়া স্তুতি করিবে না, এবং সত্য উল্লঙ্ঘন করিয়া কখনও কাহারও নিন্দাও করিবে না। কিন্তু যদিও এক মাত্র সত্যই এই উভয়ের শেষ সীমা, কিন্তু এক মাত্র কর্ত্তব্যবুদ্ধিতেই উভয়ের প্রবর্ত্তনা নহে। মনুষ্য প্রণয়ের অধীন হইয়া প্রিয়জনের স্তুতিবাদ করিতে পারে, ভক্তিরসে বিগলিত হইয়া ভক্তিভাজনের গুণানুবাদ করিতে পারে। তাদৃশ স্থলে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা হইলেই হইল। আমরা তখন স্তুতি ও গুণানুবাদের প্রয়োজন ও অপ্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিব না। উদ্বেলহৃদয় অন্যদীয় হৃদয়ের প্রতি প্রধাবিত হইলে,তাহাতে সংসারের সুখসমষ্টির হ্রাস হয় না, বরং বৃদ্ধি হয়। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে ও বিনা বিবেক ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির শাসনে মনুষ্য মনুষ্যের নিন্দা করিতে অধিকারী নহে। নিন্দা গরল; চিকিৎসক যেমন শুধু ঔষধার্থেই গরল ব্যবহার করিতে পারেন, উহা লইয়া খেলা করিতে পারেন না, যাঁহারা বিশেষ কোন মনুষ্য কি বিশেষ কোন সমাজের উপকার করিতে চাহেন, তাঁহারাও শুদ্ধ সেই এক প্রয়োজনেই নিন্দার ব্যবহার করিতে পারেন, উহা লইয়া খেলা করিতে তাঁহাদিগের অধিকার নাই। তাঁহাদিগের কথা কেবল সত্য হইলেই হইবে না, কিন্তু যে কথা তাঁহারা বলিতেছেন তাহাতে প্রয়োজন এবং ন্যায়পরতার শাসনও আছে কি না, তাহাও প্রগাঢ় দৃষ্টিতে দর্শন করিতে হইবে। যাহারা নিন্দুক বলিয়া পরিচিত, সাধারণ্যে তাঁহাদিগের যে এত নিন্দা ইহাই তাহার এক প্রধান হেতু। তবে নিন্দারও প্রকার আছে, প্রকৃতি আছে, এবং যেখানে উহার অন্তস্তলে বিবেক নাই, সেখানে অন্য কোন গূঢ় কারণ আছে। কেহ আহূত নিন্দুক, কেহ অনাহূত নিন্দুক, কেহ বা স্বয়াহূত নিন্দুক। নিন্দুককে কি পরিমাণে নিন্দা করিতে হইবে, তাহা অবধারণ করিবার পূর্ব্বে সেই প্রকার, প্রকৃতি ও কারণের প্রতি দৃষ্টি করা আবশ্যক।

নিন্দার এক কারণ সহানুভূতির অভাব। যাহার সহিত তোমার মতে মিলে না, হৃদয়ে মিলে না, তুমি তাহার নিন্দা কর এবং সেও তোমার নিন্দা করে। তাহার আত্মা তোমার নিকট এক গভীর অন্ধকার কূপ, তোমার আত্মাও তাহার

নিকট এক গভীর-অন্ধকার-কূপ। দুইয়েই দুইয়ের বহিরাবরণ মাত্র দেখিয়া থাক, এবং শুদ্ধ বহিরাবরণ দেখ বলিয়াই দুইয়ে দুইয়ের সম্বন্ধে একে আর এক অর্থ কর। সাম্প্রদায়িকদিগের পরস্পর নিন্দা এই শ্রেণির, যাহাদিগের মধ্যে অবস্থার পার্থক্য নিতান্ত বৃহৎ, তাহাদিগের পরস্পর নিন্দাও এই শ্রেণির, এবং বৃদ্ধ ও যুবজনে যে পরস্পর নিন্দা হইয়া থাকে তাহাও প্রধানতঃ এই শ্রেণির। বৃদ্ধ যুবার প্রতপ্ত ও প্রমত্ত হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারেন না—সে কেন হাসে, সে কেন কান্দে, সে কি উৎসাহে উৎসাহিত হয়, কি দুঃখে ঢুলিয়া পড়ে, তিনি কোন দিন বুঝিয়া থাকিলেও এখন আর তাহা বুঝেন না। আবার, যুবজনেরা বৃদ্ধের শীতসঙ্কুচিত ঘনীভূত প্রাণের মর্ম্মস্থান দর্শন করিতে সমর্থ হন না। তাঁহারা এক পা অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে কেন শতবার চিন্তা করেন, তাহা তাঁহাদিগের তরল বুদ্ধিতে প্রবেশ করে না। সহানুভূতির অভাবে কিরূপে নিন্দার সৃষ্টি হয়, আমরা তাহার প্রকার মাত্র দেখাইয়া দিলাম। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ইহা হইতেই বহুবিধ কথার তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে পারিবেন। সহানুভূতির অভাবমূলক নিন্দা কথঞ্চিৎ সহনীয়। কারণ ইহার অভ্যন্তরে খলতার ভাগ অত্যল্প। ইহা অনাহূত হইলেও ক্ষমাযোগ্য।

নিন্দার আর এক কারণ শক্তির অভাব অথবা অক্ষমতা। অশক্ত ও অধম ব্যক্তিরা আপনা হইতে উচ্চতর ব্যক্তিদিগের নিকটে পঁহুছিতে পারে না,—তাঁহারা চিন্তার যে গ্রামে অবস্থান করেন, কল্পনার সহায়তায় যেখানে উড্ডীন রহেন, সেখানে উঠিতে সামর্থ্য পায় না এবং সুতরাং তাঁহারা কেন কি করেন, তাহা ইহাদিগের নিকট কার্য্য ও কারণের শৃঙ্খলে দৃঢ়বদ্ধ বলিয়াই প্রতীয়মান হয় না। তাঁহাদিগের অতি সুন্দর কার্য্যও ইহাদিগের নিকট সুন্দর দেখায় না। ইহারা এই নিমিত্তই কৃপাপাত্র। পৃথিবীর এক অসাধারণ পুরুষ মরণমুহূর্ত্তেও এই শ্রেণির নিন্দুক ও অত্যাচারীদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে পারিয়াছিলেন।

আপাততঃ এইরূপ বোধ হইতে পারে যে, যাহারা শক্তির অভাব কি ন্যূনতাহেতু নিন্দুক, তাহাদিগের দ্বারা সমাজের অনিষ্টসাধন হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা হয় না। স্বাভাবিকী প্রতিভা প্রথমতঃ যত কেন প্রচ্ছন্ন থাকুক না, উহা পাবকতুল্য। তৃণরাশি কখনও উহাকে ঢাকিয়া রাখিতে পারে না। তৃণ আপনিই দগ্ধ হইয়া যায়। শক্তি ও অশক্তিতে, আলোকে ও অন্ধকারে, জ্ঞানে ও অজ্ঞতায়, এবং পুরুষে ও অপুরুষে যেখানে বিরোধ হইয়াছে, ইতিহাসে সেখানেই এই কথা জ্বলদক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।

নিন্দার তৃতীয় কারণ অতৃপ্ত ক্রোধ। ক্রোধ জিঘাংসার অপক্ক ফল। কাহারও সম্বন্ধে মনে ক্রোধ জন্মিলে স্বভাবতই তা-

হার অনিষ্ট সংসাধনে প্রবৃত্তি জন্মে। যে-খানে সে প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত হয়, সেখানক.র পরিণাম অনুতাপ অথবা দয়া ; যে-খানে উহা পরিতৃপ্ত হইতে পারে না, সে-খানকার পরিণাম নিন্দাবাদ। যদি কাহারও আচারে কি ব্যবহারে অথবা কোন কথায় আমাদিগের অভিমান আহত হয় এবং সেই আহত অভিমান, আহত সর্পের ন্যায়, তাহাকে ফিরিয়া দংশন করিতে না পারে, তাহা হইলেই আমরা সেই ব্যক্তির নিন্দা করিয়া থাকি। এই প্রবন্ধে নিন্দার যে সকল উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহার অনেকটিই এই শ্রেণীতে স্থান পাইবে। আর, সমৃদ্ধ ও সম্পন্ন ব্যক্তিরা যে হীনাবস্থ ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক অনেক সময়ে নিন্দিত হইয়া থাকেন, তাহারও কারণ এই বলিতে হইবে। নীতি-নিপুণ পণ্ডিতেরা এই জন্যই উপদেশ করিয়াছেন যে, কাহারও অভিমানে অকারণে আঘাত করিও না, কাহারও ক্রোধাগ্নিতেও বিনা প্রয়োজনে ঘৃতাহুতি দিও না। ইহা ন্যায়ের চক্ষে অসহ্য, ইহা দয়ার চক্ষে নিষ্ঠুরের কার্য্য, ইহা বুদ্ধির চক্ষে অশুভকর। যাহারা আহত হইয়া নিন্দা করে, তাহারাই আহত নিন্দুক।

নিন্দার চতুর্থ কারণ জাতীয় বিদ্বেষ। ইহার অভ্যন্তরে সহানুভূতির অভাব আছে, অজ্ঞতা আছে, এবং তদতিরিক্ত বিদ্বেষ আছে। ইহাও আহূত মধ্যেই পরিগণনীয়। এই বিদ্বেষবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়াই ফরাশি প্রুশীয়ানের সর্ব্বাঙ্গে কালিমা দেখেন, এবং ইহারই প্রণোদনায় প্রুশীয়ার পরমধার্ম্মিক ব্যক্তিও ফরাশির নিন্দাবাদে জিহ্বাকে কলুষিত করেন। ইহার আরও অনেক দৃষ্টান্ত অঙ্গুলিনির্দ্দেশ সহকারে প্রদর্শন করিতে পারি। কিন্তু চক্ষুষ্মানের জন্য তাহা অনাবশ্যক।

নিন্দার পঞ্চম ও শেষ কারণ পরশ্রীকাতরতা। ইহাকে স্বশ্রীকাতরতা বলিলেও ভাষার গুরুতর দোষ ঘটে না। কেননা ইহা স্বজাতি ও পরজাতির মধ্যে স্বজাতীয় ও সন্নিহিত প্রতিবেশীকেই বিশেষতঃ লক্ষ্য করে, এবং বলিব কি—ইহা দূরসম্পর্কিত অপেক্ষা নিকট সম্পর্কিতকে, যথার্থ পর অপেক্ষা স্বকৃত পর, আপনার জনকেই বরং অধিকতর স্পর্শ করে। নিন্দার অন্য অন্য কারণ সম্বন্ধে যে কোন কথাই কেন বল না, বোধ হয় যুক্তির কোনরূপ আকুঞ্চনেই পরশ্রীকাতরতামূলক জঘন্য নিন্দাবাদের পক্ষ সমর্থন করা সম্ভব হইবে না। যাহারা পরশ্রীকাতরতার বিষমজ্বালায় দগ্ধ হইয়া স্বদেশীয় কি স্বজাতীয় উন্নত ব্যক্তিদিগের অনর্থক নিন্দা করে, যেখানে অমৃতের প্রত্যাশা সেখানে গরল ঢালিয়া দেয়, সম্মুখে স্তুতিবাদ করিয়া পরোক্ষে আঘাত করিতে থাকে, তাহারা যেমন খল-স্বভাব তেমনই ক্ষুদ্রপ্রাণ। যদি নিন্দুক শব্দের কিছুমাত্র অর্থ থাকে, তবে ইহারাই সেই নিন্দুক। ইহারা জ্যোৎস্না দেখিলেই চক্ষু মুদিয়া রহে, এবং সমস্ত দিনও যদি ইহারা প্রফুল্ল

কুসুমকাননে পরিচারণ করে, তথাপি ই-ছারা করে কতিপয় কণ্টকমাত্র লইয়াই গৃহে প্রত্যাগত হয়। ইহারাই প্রকৃত রবাহূত নিন্দুক। অভ্যুদয়ই ইহাদিগের চক্ষে অপরাধ এবং উন্নতিই ইহাদিগের চক্ষে পাপ।—ইহারা অভিমানশূন্য,—কারণ, যেখানে অভিমান আছে, সেখানে বিনা আঘাতে পরকীয় সমৃদ্ধিতে কাতরতা হয় না। ইহারা কাপুরুষ;—কারণ যেখানে পৌরুষ তেজস্বিতার কণিকা মাত্রও বিদ্যমান থাকে, সেখানে অন্যদীয় শক্তি, সামর্থ্য ও সম্পদরাশিতে আনন্দ বই কখনও ঈর্ষা ও অন্তর্দাহ জন্মে না।

মনুষ্যসমাজে অদ্যাপি নিন্দায় কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও ন্যায়পরতার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বিবেকের বশবর্ত্তী হইয়াই মনুষ্য মনুষ্যের নিন্দা করে না। যে দিন তাহা হইবে, সে দিন এই পৃথিবীতেই স্বর্গের দুরশ্রুত দুন্দুভিনাদ শ্রুত হইবে। সে দিন মনুষ্য সমাজের অর্দ্ধেক দুঃখভার কমিয়া যাইবে।

এই কি সেই অযোধ্যা ?

চির আশা ছিল মনে—
দেখিতে অযোধ্যা, যার কীর্ত্তির পতাকা
উড়িয়াছে সূর্য্যবংশ-প্রশংসা-পবনে ;—
ভারতদর্পণে আজো রহিয়াছে আঁকা।
পুরাবৃত্তে যার নাম করেছি শ্রবণ;—
ক্ষত্রিয়-গৌরবে ভরা শোভার বাজার—
এই কি সে রাজপুর ?
বিক্রমে বিশাল, শূর—
—সূর্য্যবংশ অবতংশ ইক্ষ্বাকু রাজার ?
এই কি সে প্রকৃতির বিলাস ভবন ?
ছিল একদিন হিন্দু-সুখের সদন ?

২

এই কি সে স্রোতস্বতী
সরযূ,—শোভিত যার বিমল সলিলে
পুরাঙ্গনা-মুখ-পদ্ম প্রকাশিত-জ্যোতিঃ
ঈষৎ দুলিয়ে সুখে প্রদোষ অনিলে ?
এই কি পবিত্রা নদী অযোধ্যার মাঝে ;
সুরতরঙ্গিণী যথা স্বর্গে মন্দাকিনী ?
কল কল রব উঠে
হৃদয়ে তরঙ্গ ছুটে
রজতের ধারা যেন সুন্দর বিরাজে।
সাগর উদ্দেশে দ্রুত ধায় প্রবাহিণী।
কলস্বরে নিরন্তর অচল-নন্দিনী !

৩

এতদিন যার মূলে—
করিলাম সলিল সিঞ্চন প্রাণপণে,
সেই আশা-লতা যদি শোভিল মুকুলে,
অমনি কি হোল শেষ নিশার স্বপনে ?
হায় ! একি ইতিহাসে বর্ণনাই সার ?
কবির কল্পনা, সেকি আকাশ কুসুমে,
সত্যের সুবেশ দিয়া

মিথ্যা রাখে সাজাইয়া
লুঠে লয় ভাবুকের হৃদয় ভাণ্ডার।
উথলয় ভাব কূপ মিছাধামধূমে;
অবশেষে,মানুষে কি ফেলায় দিগ্‌ভ্রমে?

৪

এই কি অযোধ্যাপুরী—
বহে সমীরণ যার যশের সৌরভ
কত দেশে কতস্থানে সাগর উত্তরি
জাগাইয়া ভারতের নিদ্রিত গৌরব?
এই কি সে অনুপম সুখের আগার?
ভারতে অলকা সম এই সে নগরী?
আমি যাহা শুনে কানে
আইলাম প্রাণপণে
কই তার চিহ্ন কিছু নাহি দেখি আর।
কে নাশিল শোভা তব ভারতসুন্দরি!
ক্ষত্রিয় কুলের গর্ব্ব লইলেক হরি?

৫

কোথা বীররাজ সব
সমরে অটল, সূর্য্যবংশের ভূষণ
মান্ধাতাদি নৃপচয় ক্ষত্রিয় গৌরব?
রাবণ-বিজেতা রাম কোথায় এখন?
দাম্পত্য-প্রণয়-সুখে হইয়া নিরাশ
চিরদিন শোকানলে হৃদয় দহিয়া
যেই রঘুকুল-কেতু
লোকের সন্তোষ হেতু
প্রেয়সী মহিষী-ধনে দিলা বনবাস—
অকাতরে সীতাশোক অন্তরে সহিয়া;
প্রকৃতিরঞ্জন-ব্রতে জীবন অর্পিয়া?

৬

অযোধ্যার অলঙ্কার—
কোথা দাশরথি এবে দয়ার সাগর?
এর প্রতি আজ তব করুণা সঞ্চার
হয় নাকি, রঘুকুল-গৌরব-আকর?
পরের দেখিয়া সুখ আনন্দে ভাসিতে—
করিয়াছ প্রাণপণে প্রজার মঙ্গল।
দেখিলে অন্যের দুখ
ফাটিয়া যাইত বুক,
আজ কেন চিত্ত তব না হয় চঞ্চল?
ভাসে তব রাজপুরী দুর্দ্দশার স্রোতে।
কেমনে রয়েছ রাম, ধৈর্য্য ধরি চিতে?

৭

হায়! কেন দেখিলাম—
তোমাদের নগরি! হেরি বিদরে হৃদয়।
নয়ন ভাসিয়া ধারা বহে অবিরাম;
পূর্ব্বের সৌভাগ্য মনে হইলে উদয়!
আহা! আর্য্যভূমি মাঝে শোভার সদন,
আনন্দের সরোবর সুখের আগার;
পবিত্র পুণ্যের ভূমি;
বীরপ্রসবিনী তুমি।
হইত যশের গান ভারতে তোমার!
ছিলে তুমি আর্য্যবংশ উজলি তখন।
তোমার সে ছবি হায়! কোথায় এখন?

৮

কোথা সে সুন্দর বেশ?
সুদৃঢ় সুরম্য হর্ম্ম্য পরশি গগন
বিরাজিত দেহ তব সাজায়ে অশেষ!
ছিলে তুমি সুবিমল সুখের ভবন!
পরিপাটি রাজবাটী; সজ্জিত তোরণ
নিরন্তর সুশোভিত কুসুম-শয্যায়;
রমণীয় উপবনে

বিহঙ্গ বিহঙ্গী সনে
সুস্বরে করিত গান বসিয়া বাসায়।
অমৃতের বরিষণে জুড়াত শ্রবণ!
সুখের সে দিন তব গিয়াছে এখন!

৯

কিছুই নাহিক আর!
আছে মাত্র চিহ্ন তার বাড়াইতে দুখ,
ভারতের ভাগ্যে ঘোর যাতনা অপার।
হিন্দুকুলে প্রতিকূল বিধাতা বিমুখ।
অটল-অচল-সম রম্য হর্ম্ম্যমালা,
ভাঙ্গিয়া পড়েছে যেন প্রলয়ের ঝড়ে!
নিবিড়কণ্টকী লতা;
পূরিয়া রয়েছে তথা।
ভুজঙ্গের বাসা আজি তাহার ভিতরে!
ধিক্ বিধি বুঝিতে না পারি তব লীলা।
কাহারে ইন্দ্রত্ব পদ, কার হাতে খোলা!

১০

কোথা সে অমরাবতী—
—অযোধ্যা নগরী মর্ত্ত্যে; এবে ভগ্নপ্রায়।
সিংহপুরে শৃগালের রাজত্ব সম্প্রতি ?
গগন পরশি সৌধ শোভা নাহি পায়,
প্রফুল্ল কমল তুল্য গবাক্ষের দ্বারে
শোভেনা সুন্দরী কুল, নয়ন উজ্জ্বল,
মদন-হিল্লোলে দুলি
কটাক্ষে সকল ভুলি
নলিনীর বনমাঝে পুলক অন্তরে—
শোভিত যেরূপে আহা! নৃপতি চঞ্চল,
বসেনা সেরূপে আর পুরনারীদল!

১১

একদিন এইস্থানে—
—এই রাজপুরে—এই উন্নত প্রাসাদে—
রঘুকুল নরপতি সুপ্রশস্ত মনে—
সুবিধি স্থাপন হেতু বাদ অনুবাদে
রত থাকিতেন নিজ পারিষদ লয়ে।
এখন শার্দ্দূল বৃক ভীষণ মুরতি—
সহচরী সহ বাস—
করিতেছে বারমাস—
কুতূহলে লয়ে নিজ সন্তান সন্ততি।
বিচরণ করে সদা নিঃশঙ্ক হইয়ে॥

১২

এই বিশ্রাম ভবনে—
রাজকার্য্য অবসানে লভি অবসর,
আসিতেন নরনাথ আরাম কারণে—
অকৃত্রিম প্রণয়ের বাড়াতে আদর—
বিরলে মহিষীসহ আনন্দ অন্তরে।
হায় হায়! কব কায় দুঃখের কাহিনী।
এহেন সুখের স্থানে,
এবে বন্য জন্তুগণে
পরস্পর নিরন্তর কোলাহল করে।
বীণার বিনোদতান আর নাহি শুনি।
শিবাসব করে রব, দিবস যামিনী!

১৩

ভারত-উজ্জ্বলা এই
অযোধ্যা নগরী আহা ছিল একদিন!
জ্যোতিঃ হীন এবে, হায়! কিছুমাত্র নেই
পড়িয়া পরের করে হয়েছে শ্রীহীন!
হায় রে দুঃখের ভার সহনীয় নয়
কেমনে বহিবে তবে; ধিক্‌রে বিধিরে।
কিবলিব হায় হায়!
দেখে বুক ফেটে যায়।

বানরে খেলেছে সুখে ভানুর মন্দিরে ? *
ধিক্ হে সহস্রকর বৃথা তেজোময়,
তব কুলে একলঙ্ক একি প্রাণে সয় ?

১৪

এই কি অযোধ্যা সেই ?
তবে কেন চিত্তে ঘোর যাতনা বাড়ায় ?
নাশিতে সন্তাপ হেথা কিছুই কি নেই ?
সকলি কি কাল সহ হয়েছে বিলয় ?
ধিক্‌রে ভারত বাসি, ধিক্ তোমা সবে।
দুরাত্মা যবন আসি তোমা সবাকার
অতুল বিভব কাড়ি
লইল দুর্দ্দশা করি ;
রাজত্ব তেজিয়া শেষে দাসত্ব স্বীকার ?
আর কত কাল সবে অপমান সবে ?
একলঙ্ক ভারতের কতদিন রবে ?

১৫

হে অযোধ্যে একা নয়।
তোমার দুর্দ্দশা ; ঘোর দুঃখের অনলে
জ্বলিয়াছে আর্য্যভূমি সুখের আলয়।
ভাসিছে ভারত লক্ষ্মী নয়নের জলে !
ঘোরতর নাগ পাশে সুদৃঢ় বন্ধনে।
জননীর স্নেহময় সন্তান সকল
পড়িয়া মায়ের বুকে
কাঁদিতেছে অধোমুখে,
অন্নাভাবে শীর্ণতনু গায় নাহি বল।
ঈশ্বরের জীব তাই বাঁচাতে জীবনে
দাসত্বে উদর পালে অন্যের চরণে ! শ্রীয-

* সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণের প্রতিষ্ঠিত সূর্য্য দেবের মন্দির এক্ষণে নিবিড় অরণ্যে পরিপূর্ণ দৃষ্ট হয়।

প্রকৃতি ও পশু পক্ষীর সংস্কার।

মনুষ্য প্রবল বুদ্ধিবলে, বহুযত্নে এবং অতিপরিশ্রমে বিজ্ঞান এবং গণিত মন্থন করিয়া যে সমস্ত সত্য উদ্ধার করিয়াছে, পশুপক্ষীরা সংস্কারবলে দৈনিক কার্য্যব্যবহারে তৎসমুদয়ে কিরূপ আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়রসে আপ্লুত হইতে হয়। পণ্ডিতবর গ্যালিলিওর অগাধসত্ব মেধাও যাহা ধারণা করিতে সমর্থ হয় নাই, মক্ষিকারা প্রতিদিন সেই বিজ্ঞানসূত্র কার্য্যে পরিণত করে, এবং মধুমক্ষিকারা চক্র নির্ম্মাণে যে অপূর্ব্ব কৌশল প্রকাশ করে, গণিতগুরু নিউটন্ সমস্ত জীবনের অশেষ পরিশ্রমেও তদ্বিষয়ক জ্ঞান সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। পশুপক্ষীর সংস্কারগত কার্য্যপ্রণালীতে মনুষ্যের আয়াসলব্ধ বিজ্ঞান এবং গণিত সম্বন্ধীয় জ্ঞান কতদূর লক্ষিত হয়, এবং তাহাদের শরীরসংস্থানে প্রকৃতির কিরূপ আশ্চর্য্য কৌশল ও নৈপুণ্য দৃষ্ট হয়, তাহা জানিবার নিমিত্ত স্বভাবতঃই কৌতুহল জন্মে। সেই কৌতুহল পরিতর্পনার্থেই আমরা এই প্রবন্ধে পশুপক্ষীর শরীর সং-

স্থানের এবং তাহাদের সংস্কারগত কার্য্য-প্রণালীর কএকটি উদাহরণ প্রদান করিব।

নির্দ্দিষ্ট স্থান মধ্যে যদি সমান এবং এ-কবিধ কুঠরী সমুহ নির্ম্মাণ করিতে হয়,তাহা হইলে মধ্যে মধ্যে স্থান বৃথা নষ্ট না ক-রিয়া ত্রিবিধ আকারের কুঠরী হইতে পারে। প্রথম সমবাহু ত্রিভুজ, দ্বিতীয় সমবাহু চতুর্ভুজ এবং তৃতীয় সমবাহু ষড়্-ভুজ। অন্যবিধ আকারের কুঠরী নির্ম্মাণ করিলে যে মধ্যে মধ্যে স্থান বৃথা নষ্ট হয় তাহা গণিত সাহায্যে অনায়াসে প্রমাণ করা যায়। আবার এই ত্রিবিধ আকা-রের মধ্যে সমবাহু ষড়্ভুজই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। কারণ ইহার কোণ সমুহ স্থূল হওয়াতে কোন গোল পদার্থ রা-খিতে হইলে কোণে অতি অল্প স্থানই বৃথা নষ্ট হয়। ষড়্ভুজের আরও একটি সুবিধা আছে। ইহাতে অন্তর্দ্দেশ কিংবা বহির্দ্দেশ হইতে কোন বল প্রযুক্ত হইলে অনিষ্ট হইবার অতি অল্প সম্ভাবনা। কুঠরী গুলি গোলাকার হইলে এই অনি-ষ্টের আরও অল্পতর আশঙ্কা হয় সত্য; কিন্তু তাহাতে মধ্যে মধ্যে বৃথা স্থান থাকে। মক্ষিকারা মধুচক্র নির্ম্মাণ করিতে কুঠরী গুলি এইরূপ ষড়্ভুজই করিয়া থাকে। ইহাতে স্থান-লাঘবও হয় এবং নির্ম্মাণসা-মগ্রীও অল্প লাগে। অন্য কোন আ-কারের কুঠরী করিলে স্থান এবং নির্ম্মাণ-সামগ্রী উভয়ই অধিকতর লাগিত। কু-ঠরী সমূহের প্রাচীর নির্ম্মাণ বিষয়েই যে এইরূপ কৌশল অবলম্বিত হয় তাহা নহে, কুঠরীর ছাদ ও ভিত্তি আশ্চর্য্যতর কৌ-শলে নির্ম্মিত হয়। গণিতবেত্তারা প্র-মাণ করিয়াছেন যে, অল্পতম স্থানে দৃঢ়-তম সংস্থান করিতে হইলে ছাদ অথবা ভিত্তি এক বিন্দুতে সংলগ্ন তিনটি বর্গ-ক্ষেত্র দ্বারা নির্ম্মিত হওয়া আবশ্যক। বীজগণিতের উচ্চতম শাখা অবলম্বন ক-রিয়া তাঁহারা আরও প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই ক্ষেত্র তিনটি যদি একটি নির্দ্দিষ্ট কোণে * পরস্পর সংলগ্ন হয় তাহা হইলে অল্পতম স্থান ও অল্পতম পরিশ্রম লাগে। অন্য কোন কোণে সংলগ্ন হইলে অধিক-তর নির্ম্মাণ সামগ্রী ও পরিশ্রম আবশ্যক করিবে। বস্তুতঃ দেখা গিয়াছে যে মধুম-ক্ষিকারা কুঠরী সমূহের ছাদ কিংবা ভিত্তি তিনটি বর্গক্ষেত্র দ্বারাই নির্ম্মাণ করে এবং ক্ষেত্র তিনটিও এই নির্দ্দিষ্ট কোণেই পর-স্পর সংলগ্ন হয়। গণিত শাস্ত্রের এই সমুদয় তত্ত্ব অগাধ-ধী-সম্পন্ন নিউটনের আশ্চর্য্যতম আবিস্ক্রিয়ার ফল স্বরূপ; তিনিও জানিতেন না: পরে তাঁহার শি-ষ্যেরাই আবিষ্কার করিয়াছেন। ক্ষুদ্র কীটেরাও যে এসমুদয় জানে ইহা কি কেহ স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল?

মনে কর কোন পাত্র হইতে বায়ু নি-ষ্কাশিত করিয়া লওয়া হইল। বায়ু নি-ষ্কাশনের পূর্ব্বে বাহিরে এবং অভ্যন্তরে

---

* স্থূল কোণ ১১০ ডিগ্রি এবং সূক্ষ্ম কোণ ৭০ ডিগ্রি।

বায়ু থাকাবশতঃ পাত্রের বহির্গাত্রে বায়ুর যেরূপ চাপ পতিত হয় অন্তর্গাত্রেও সেইরূপ চাপ পড়ে *। নিষ্কাশনের পরে বহির্গাত্রে বায়ুর চাপ পতিত হয় কিন্তু ঐ চাপের প্রতিকূলে অভ্যন্তরে আর কোন চাপ থাকে না। এইজন্য পাত্রের বহির্দ্দেশ সবলে নিষ্পেষিত হয়। কঠিন পাত্র অত্যন্ত স্থূল না হইলে ভাঙ্গিয়া যায় এবং কোমল পাত্র কুঞ্চিত হইয়া যায়। মধুমক্ষিকারা ছোট ছোট ফুলহইতে মধু আহরণ করিতে হইলে ফুলের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না; মধুভাণ্ডের মুখে মস্তক ও শরীর প্রবিষ্ট করিয়া বায়ু চুষিয়া লয়। ইহাতে ফুলের কোমল বহির্দ্দেশ কুঞ্চিত হয় এবং মধু তাহাদিগের মুখের সন্নিধানে উপস্থিত হয়।

বায়ুর এই চাপ প্রতি বর্গ বুরুলে প্রায় সাত সের। অতএব যদি দুই হস্ত একত্র করিয়া হস্তমধ্যের বায়ু সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশিত করা যায়, তাহা হইলে হস্তদ্বয় এই চাপের দ্বিগুণ বলে পরস্পর সংলগ্ন থাকিবে। কারণ, হস্তের উভয় পৃষ্ঠেই এই চাপ পতিত হয়। আবার যদি হস্ত প্রাচীরে স্থাপন করিয়া হস্তপ্রাচীরমধ্য বায়ু সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশিত করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে হস্ত প্রতি বুরুলে সাত সের পরিমাণে অর্থাৎ দুই মণের অধিক চাপে প্রাচীর সংলগ্ন হইয়া থাকিবে। মক্ষিকা, অষ্টপদ প্রভৃতি কীটসমূহ প্রাচীর এবং ছাদ বাহিয়া সচ্ছন্দে যাতায়াত করে; ছাদে তাহাদের মস্তক ও শরীর নীচে ঝুলিয়া থাকে। ব্যবচ্ছেদবিদ্যাবিশারদ হোম সাহের প্রমাণ করিয়াছেন যে, কীটসমূহ বায়ু নিষ্কাশন দ্বারাই এরূপ অনায়াসে গমনাগমন করিতে সমর্থ হয়। অনুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা দেখা গিয়াছে যে, এই সমস্ত কীটের পদ হংসাদির ন্যায় চর্ম্মাবৃত। এই চর্ম্ম আকুঞ্চিত করিয়া তাহারা বায়ু টানিয়া লয়। মনে কর একটি মক্ষিকা ছাদে আছে। এক্ষণে তাহার পদ ও ছাদের মধ্যে যে বায়ু ছিল তাহা টানিয়া লওয়াতে,উপর হইতে বায়ুর চাপ থাকিল

* এই জন্যই আমরা বায়ুর চাপ বুঝিতে পারি না এবং জলে ডুব দিলেও জলের চাপ বুঝি না। চতুর্দ্দিকে এবং উপরে ও নীচে বায়ু কিংবা জল থাকাতে সমুদয় দিক হইতেই চাপ লাগে। দ্রব পদার্থের (তরল এবং বায়ব) এই একটি গুণ যে উহা সকল দিকেই সমান ভাবে চাপে। উপর হইতেও যদ্রূপ, নিম্ন হইতেও তদ্রূপ এবং চতুষ্পার্শ্ব হইতেও তদ্রূপ, সুতরাং পরস্পর বিরুদ্ধ চাপ থাকাতে একটি অপরটির প্রতিকূলাচরণ করে এবং আমরা কোন চাপই বুঝিতে পারি না। পক্ষান্তরে বায়ু নিষ্কাশন যন্ত্রের মুখে হস্ত স্থাপন করিয়া যদি হস্তের নীচের বায়ু নিষ্কাশিত করা যায়, তাহা হইলে বায়ুর উপরের চাপ অপ্রতিহত থাকে (কারণ হস্তের নীচে আর বায়ু নাই) এবং হস্তে বায়ুর ভার অনুভূত হয়।

না, কিন্তু নিম্ন হইতে চাপ থাকিল; সুতরাং উহা না পড়িয়া ছাদ দিয়া অনায়াসে গমনাগমন করিতে সক্ষম হয়। টিকটিকী, তৈলপোকা প্রভৃতিও এই কৌশলেই গমনাগমন করে এবং সিন্ধুঘোটকও এই কৌশলেই তুষারপর্ব্বতোপরি শীর্ষভাবে আরোহণ করিতে সক্ষম হয়।

শকটের কোন চক্রের পরিধিকাষ্ঠে একটি লৌহশলাকা বিদ্ধ করিয়া দিলে শকট যদি চালিত হয় তাহা হইলে ঐ লৌহশলাকাটি বায়ুতে যে পথ নির্দ্দেশ করে, গণিতবেত্তারা উহাকে (Cycloid) চক্রকল্প পথনামে অভিহিত করিয়াছেন। এই চক্রকল্প বক্র রেখার একটি গুণ এই যে, যদি কোন বস্তু, স্বকীয় ভারবলে এবং অন্য একটি শক্তি দ্বারা চালিত হইয়া, একস্থান হইতে ঠিক তন্নিম্ন স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে নামিতে চায়, তাহা হইলে এই চক্রকল্প পথে নামিলেই অল্পতম সময় লাগিবে। সরল রেখায় কিংবা চক্রকল্প রেখা হইতে কম বা অধিক বক্র অন্য কোন পথে নামিলে অধিকতর সময় আবশ্যক করে। পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা পক্ষিগণের গতির স্থির নির্দ্দেশ করা সম্ভব নহে, কিন্তু যে সমস্ত পক্ষী পর্ব্বতোপরি কুলায় নির্ম্মাণ করে বলিয়া প্রায়শঃই উচ্চতর বা নিম্নতর পর্ব্বতে উঠে কিংবা নামে, তাহাদিগের গতির সহিত এই চক্রকল্প রেখার অনেক সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়াছে।

গোলাকার পদার্থের বিস্তৃতি সর্ব্বাপেক্ষা অল্প অর্থাৎ নির্ম্মাণ সামগ্রী সমান হইলে গোলাকার পদার্থ যত অল্প স্থান ব্যাপিয়া থাকে, অন্যবিধ কোন আকারের হইলে তদপেক্ষা অধিকতর স্থানের আবশ্যক হয়। কিন্তু কোন দ্রব (তরল কিংবা বায়ব) পদার্থের মধ্যে অতি সহজে যাতায়াত করিতে অতি সূক্ষ্ম তারই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। চতুষ্পার্শ্বস্থ দ্রব পদার্থ সূক্ষ্মতম বস্তুর অল্পতম বাধা জন্মায়। আবার যদি এরূপ জিজ্ঞাসা করা যায় যে, কোন বস্তু এক হস্ত দীর্ঘ হইলে এবং স্থূলতম স্থানে এক বিতস্তি প্রস্থ হইলে দ্রব পদার্থের মধ্যে অতি সহজে যাতায়াত করিবার নিমিত্ত উহার কিরূপ আকার হওয়া উচিত? তাহা হইলে দেখা যাইবে যে গণিতবেত্তারা যাহাকে 'অল্পতম প্রতিরোধজনক অদ্রব' (Solid of least Resistance) নামে অভিহিত করিয়াছেন উহার সেইরূপ আকারই হওয়া আবশ্যক। বীজগণিতের উচ্চতম শাখার সাহায্যে অতি দুরূহ যুক্তি পরম্পরা অবলম্বন করিয়া এই আকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহার সহিত মৎস্যের মস্তকের অতিশয় সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

নিউটন প্রমাণ করিয়াছেন যে, শ্বেত আলোক নানা বর্ণের কিরণ যোগে উৎপন্ন হয়। ভিন্ন ভিন্ন আলোককিরণ স্বচ্ছ পদার্থের মধ্য দিয়া গমন করিতে ভিন্ন ভিন্ন রেখায় প্রতিভগ্ন হয়; তজ্জন্য প্রতিভগ্ন কিরণমালায় গঠিত বিম্ব অত্যন্ত অস্পষ্ট হইয়া থাকে। পুরাতন দূরবীক্ষণদ্বারা পদার্থের

যে বিম্ব দেখা যাইত তাহা এইরূপ অসম প্রতিভগ্ন কিরণ মালায় গঠিত হইত সুতরাং অত্যন্ত অস্পষ্ট দেখা যাইত। এই কারণে পূর্ব্বে দূরবীক্ষণ অসম্পূর্ণ বস্তু ছিল। পঞ্চাশৎবর্ষ পরে ডোলণ্ড ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির কএক খণ্ড কাচ একত্রিত করিয়া এই দোষের কিঞ্চিৎ লাঘব করেন। ইহার ত্রিংশৎ বৎসর পরে ব্রুয়ার দেখাইয়াছেন যে, কএকখণ্ড কাচ একত্রিত না করিয়া কএকটি তরল পদার্থ একত্রিত করিলে এই দোষ প্রায় নিঃশেষিত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, চক্ষুঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে তাহাতেও এইরূপ বিভিন্ন প্রকারের তরল পদার্থ দৃষ্ট হয়। যান্ত্রিক এবং রাসায়নিক কূট পরীক্ষানিচয়ে যে নিয়ম অতি অল্প দিন মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, চক্ষুঃগত তরল পদার্থ গুলি স্বভাবতঃই সেই নিয়মে কার্য্য করে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বচ্ছ গোলক অণুবীক্ষণের কার্য্য সম্পাদন করে। পক্ষিগণ বৃক্ষাদির শাখা প্রশাখার মধ্য দিয়া সর্ব্বদা যাতায়াত করে, এইজন্য উহাদিগের চক্ষুঃ শরীর হইতে বাহির না হইয়া শরীরের সমান থাকা নিতান্ত আবশ্যক। অন্যথা শাখা প্রশাখায় লাগিয়া চক্ষুঃ নষ্ট হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। আবার উহারা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট সমূহও শীকার করিয়া আহার করে। অতএব তাহাদের চক্ষুঃ সময়ে সময়ে গোলাকার হইয়া অণুবীক্ষণের কার্য্য করিতে পারে, এমত হওয়াও আবশ্যক। ঐ গোলাকার করিতে চক্ষুঃ শরীর হইতে বাহির হইয়া পড়ে। এই উভয় কার্য্যেরই সুবিধার জন্য পক্ষিগণের চক্ষুর পার্শ্বে কএকটি পেশী আছে; ঐ পেশীগুলি আকুঞ্চিত বা বিস্ফারিত করিয়া পক্ষিগণ আবশ্যক মত চক্ষুঃ সমান বা গোলাকার করিয়া থাকে।

অনুধাবন করিয়া দেখিলে পিপীলিকার শ্রমশীলতা এবং কৌশল মধুমক্ষিকার অপেক্ষাও বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়। উহাদিগের বাসস্থান একটি ক্ষুদ্র নগর। তন্মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ সৌধরাজি এবং গমনাগমনের সৌকার্য্যার্থ সুন্দর প্রশস্ত পথ ও সেতুসমূহ এরূপ অপূর্ব্ব কৌশলে নির্ম্মিত হয় যে, তাহাতে পিপীলিকাগণের স্থপতিবিদ্যার গূঢ় তত্ত্বসমূহে আশ্চর্য্য অভিজ্ঞান লক্ষিত হয়। মধু উহাদিগের প্রধান ভক্ষ্য। উহা প্রতিদিন আবশ্যক মত সংগৃহীত হয়। অধুনা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, উহারা শস্য আহার করে না; মধু এবং মাংসই আহার করিয়া থাকে। উহাদিগের প্রতিবেশী একরূপ কীট আছে, তাহাদিগের নিকট হইতেই মধু আহরিত হয়। কখনও বা এই কীটগণকে নগরের মধ্যে লইয়া আসে এবং মনুষ্য যেরূপ গাভী প্রভৃতি পালন করিয়া তাহাদিগের দুগ্ধ গ্রহণ করে, উহারাও সেইরূপ উক্ত কীটগণকে পালন করিয়া তাহাদিগের নিকট মধু গ্রহণ করে। এমন কি কখন কখন এই কীটের ডিম্বও লইয়া আইসে। তৎপরে

যত্নে ডিম ফুটাইয়া যতদিন পর্য্যন্ত মধুদানোপযোগী না হয়, ততদিন লালন পালন করিয়া থাকে। আর একটি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পিপীলিকারা যত শীত সহ্য করিতে পারে, এই কীটেরাও তত শীত সহ্য করিতে পারে। ইহারা তত শীত সহ্য করিতে না পারিয়া মরিয়া গেলে পিপীলিকারাও আহারাভাবে মরিয়া যাইত। আবার শীতাধিক্য প্রযুক্ত পিপীলিকাগণ যখন জড়বৎ পড়িয়া থাকে কীটেরাও তখন তদবস্থ হয়।

পিপীলিকাদিগের নগরের নাম বল্মীক। মহান্ পদার্থের সহিত ক্ষুদ্র পদার্থের তুলনা করিলে ইহাকে পিপীলিকাপর্ব্বত বলা যাইতে পারে। এই বল্মীকের মধ্যেই প্রাসাদ, ভাণ্ডার, গৃহ, শয়নাগার, পথ, সেতু প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়। মলুএট সাহেব বল্মীকের যে বৃত্তান্ত দিয়াছেন, তাহা অতীব বিস্ময়কর। অন্যান্য পর্য্যটকেরাও তদ্রূপ বিবরণ প্রদান না করিলে উহা অত্যুক্তি দোষে দূষিত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিত। তিনি যে বল্মীক দেখিয়াছিলেন, তাহা ১২।১৪ হস্ত উচ্চ, ২০।২৫ হস্ত দীর্ঘ ও তদনুরূপ প্রশস্ত এবং আকারে মন্দিরের ন্যায়। আমরা যে সমুদয় পিপীলিকা দেখি তাহাদিগের ন্যায় উহারা নিরীহ নহে। বল্মীকের নিকটস্থ হইলে সকলে মিলিয়া আক্রমণ করিয়া অনধিকারগামীকে খাইয়া ফেলে। বল্মীক নষ্ট করিতে হইলে চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া বল্মীকোপরি কামান দ্বারা গোলাবর্ষণ করিতে হয়। পিপীলিকারা বাহির হইয়া অগ্নিতে পুড়িয়া মরে। দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকাতেই এই বল্মীক দৃষ্ট হইয়াছে।

বীবরেরা আবাসভূমি নির্ম্মাণে কিরূপ নৈপুণ্য প্রকাশ করে তাহা চারুপাঠ প্রথম ভাগে অনেকে পাঠ করিয়াছেন। বাবুই প্রভৃতি পক্ষীরা কুলায় নির্ম্মাণে কিরূপ কৌশল প্রদর্শন করে, তাহাও প্রায় সকলেই অবগত আছেন। পশুপক্ষীর সংস্কারগত নৈপুণ্যের বিষয় আর অধিক না বলিয়া তাহাদের শরীর সংস্থানের উপযোগিতা বিষয়ে আমরা গুটিকত কথা বলিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিব। উষ্ট্রেরা মরুদেশের নমনীয় ভূমিতে সচ্ছন্দে যাতায়াত করিতে পারিবে বলিয়া তাহাদের ক্ষুর অত্যন্ত প্রশস্ত। অপ্রশস্ত হইলে ভারবশতঃ ক্ষুর নমনীয় ভূমিতে বসিয়া গিয়া যাতায়াতের অত্যন্ত অসুবিধা ঘটাইত। আবার সুদীর্ঘপথ অতিবাহনেও অধিক ক্লান্তি না হয়, এই জন্য উহাদিগের পদের অস্থি ও বন্ধনী এবং ক্ষুরের মধ্যে কিঞ্চিৎ ব্যবধান আছে। এই ব্যবহিত স্থান অতি কোমল ও স্থিতিস্থাপক পদার্থে পূর্ণ। পদনিক্ষেপ ও উৎক্ষেপে এই কোমল পদার্থ স্বীয় আকার পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। এই জন্য উষ্ট্রের শরীর অত্যন্ত ভারী হইলেও উহারা মূষিকের ন্যায় কোমল গমনে সক্ষম। অশ্বের পদেও অতি সুন্দর কৌশল আছে।

ইহাদের পদ শরীরের নিম্নে দীর্ঘভাবে সুদৃঢ় স্তম্ভের ন্যায় অবস্থাপিত হইলে প্রতিপদে শরীর বিকম্পিত হইত। তাহা না হইয়া ইহাদিগের পদ বক্রভাবে ন্যস্ত এবং নিম্নদেশে স্থিতিস্থাপক বন্ধনী মালায় আবদ্ধ। শকটে স্প্রিং থাকিলে উহা যদ্রূপ আঘাত প্রতিঘাতে অল্প বিকম্পিত হয়, তদ্রূপ অশ্বের এই স্থিতিস্থাপক বন্ধনীমালা থাকাবশতঃ আঘাত-প্রতিঘাত-জন্য শরীর বিকম্পনের অনেক লাঘব হয়। রীণ মৃগের ক্ষুরে আরও আশ্চর্য্যতর কৌশল। ইহারা শীত প্রধান মেরুর নিকটস্থ প্রদেশেই বাস করে এবং বরফের মধ্যে ইহারা শকট টানিয়া থাকে। ঐ শকটের চক্র নাই, নিম্নতল ভূমিস্পৃষ্ট। ইহাদের ক্ষুর অতি প্রশস্ত এই জন্য বরফে বসিয়া যায় না, পক্ষান্তরে বায়ু প্রতিরোধে গমনাগমনের অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য ইহারা ভূমিহইতে পদোত্তোলন করিলেই ক্ষুর সঙ্কুচিত করিয়া ক্ষুদ্রায়ত করিতে পারে। ইহাদিগের ক্ষুরের নিম্নতল ঘন রোমরাজিতে আবৃত। রোম অতি অল্প পরিমাণেই তেজসঞ্চালন করে, * তজ্জন্য ইহাদিগের পদে বরফের নিদারুণ শৈত্য লাগিতে পারে না। আবার ইহাদিগের ক্ষুর এমনই সুকৌশলে নির্ম্মিত যে, ইহারা তদ্দ্বারা বরফ তুলিয়া ফেলিয়া নীচের ঘাস খাইতে সক্ষম হয়। এই ঘাসের নাম 'লিচন্'। যখন শীতপ্রভাবে অন্যান্য উদ্ভিদ প্রায় নষ্ট হইয়া যায়, তখনই এই ঘাস অধিক জন্মে। এই শীতকালেই ইহারা মনুষ্যের অতিশয় উপকারে আসে এবং তৎকালেই প্রকৃতি এই ঘাসোৎপাদনে ইহাদিগের প্রাণধারণের উপায় করিয়া দেয়। শুক্ল ভল্লুকের পদতলও রোমে পরিপূর্ণ। খদ্যোতিকা কীটের পুরুষেরা উড়িতে পারে, তাহাদের পাখা আছে। স্ত্রীদিগের পাখা নাই এবং উড়িতে পারে না। পুরুষেরা স্ত্রীগণের আলোকেই তাহাদিগকেই অন্বেষণ করিয়া লইতে সক্ষম হয়। ভূমধ্য সাগরে নাবিক (Nautilus) নামে এক প্রকার আশ্চর্য্য মৎস্য আছে। ইহারা শম্বুক জাতীয় এবং ইহাদিগের বহিরস্থি নৌকার ন্যায়। তদুপরি শরীর স্থাপন করিয়া ইহারা চর্ম্মচটিকার পক্ষের ন্যায় দুইটি চর্ম্মের পাল তুলিয়া দেয় এবং পদের দ্বারা ক্ষেপণীর কার্য্য সমাধা করে। এই প্রকারে ইহারা ইতস্ততঃ গমন করিয়া থাকে। নৌকার সমুদয় উপকরণই ইহাদিগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে স্থান পাইবে, কে ইহা ভাবিয়াছিল। আর ইহারা বিনা শিক্ষায় যে নিপুণনাবিকের গুরুস্থানীয় হইবে, কে ইহা কল্পনা করিয়াছিল?

নী—

* রোমের এই গুণ থাকাতেই অনেক পশুপক্ষী শীতে কষ্ট পায় না। বরফ কম্বল জড়াইয়াও এই জন্য রাখা হয়। বাহিরের তেজ কম্বল ভেদ করিয়া শীঘ্র মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না এবং বরফ না গলিয়া অনেকক্ষণ অদ্রবাবস্থায় থাকিতে পারে।

হরগৌরী

প্রথম প্রস্তাব।
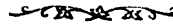
"আধ বাঘছাল ভাল বিরাজে, আধ পটাম্বর সুন্দর সাজে;
আধ মণিময় কিঙ্কিণী বাজে, আধ ফণি ফণা ধরি রে।
আধই হৃদয়ে হাড়ের মালা, আধ মণিময় হার উজ্জ্বালা,
আধ গলে শোভে গরল কালা, আধই সুধা মাধুরী রে॥
এক হাতে শোভে ফণিভূষণ, এক হাতে শোভে মণি কঙ্কণ,
আধ মুখে ভাঙ্গ ধুতুরা ভক্ষণ, আধই তাম্বূল পুরি রে।
ভাঙ্গে ঢুলু ঢুলু এক লোচন, কজ্জলে উজ্জ্বল এক নয়ন,
আধ ভালে হরিতাল সুশোভন, আধই সিন্দূর পরি রে॥
কপাল-লোচন আধই আধে, মিলন হইল বড়ই সাধে,
দুই ভাগ অগ্নি এক অবাধে, হইল প্রণয় করি রে।
দোহার আধ আধ আধ শশী, শোভা দিল বড় মিলিয়া বসি,
আধ জটাজূট গঙ্গা সরসী, আধই চারু কবরী রে॥"

কবিবর ভারতচন্দ্র পুরাণ হইতে এই চিত্রটি তুলিয়া আনিয়াছেন। কিন্তু যাঁহার কল্পনায় ইহা প্রথম প্রতিভাত হইয়াছিল, তাঁহার প্রশংসার সীমা নাই। তিনি অতি উচ্চ শ্রেণীর দার্শনিক, অতি প্রগাঢ় পণ্ডিত, অতি পূজনীয় কবি। তাঁহাকে আমরা অভিবাদন করি। তাঁহার এই লীলাময় চিত্রপটে সৌন্দর্য্যের কি বিচিত্র মাধুরী খেলা করিতেছে, মানব-প্রকৃতির পূর্ণাবয়বত্তা কি আশ্চর্য্য শোভা পাইয়াছে, সামাজিক সম্পদের কি অপূর্ব্ব প্রতিমা প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং দাম্পত্য-প্রেমের কি অলৌকিক প্রতিমূর্ত্তিই ইহাতে অঙ্কিত রহিয়াছে! এই চিত্র জগতে অতুল। ইহা মনস্বী ও ভাবুক, সকলেরই সমান ভোগ্য।

ইহার বহিঃস্থ পরিস্ফুট অর্থ পূর্ণসৌন্দর্য্য। এই অনন্ত নিসর্গরাজ্য সৌন্দর্য্যের এক অনন্ত সমুদ্র। ইহার তরঙ্গে তরঙ্গে কেবলই সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ। নয়নাভিরাম শ্যামল নভোমণ্ডলে, কুসুমকাননে, স্রোতস্বিনীর আবিল বক্ষে, চন্দ্রমার অমৃতময় জ্যোৎস্নায়, সূর্য্যের খরজ্যোতিতে, সূর্য্যালোকরঞ্জিত মেঘমালায়, সরোবরের নির্ম্মল জলে, শৈবালে, শৈবালবেষ্টিত কুমুদ-কমলে, শস্য-শোভাময় রমণীয় ক্ষেত্রে, তৃণশষ্পসমা-

চ্ছাদিত ভূখণ্ডে, বনে, উপবনে, উন্নত পাদপে, দুলিত লতিকায়, তুষারে, তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতশৃঙ্গে, জলধির তরল পর্ব্বতময় অসীম বিস্তারে, সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্যের উচ্ছ্বাস, এবং সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্যের অবিরামবাহি আমোদলহরী। হৃদয়বান্ ব্যক্তি এই সৌন্দর্য্যসুধা পান করিয়া মনুষ্যদেহেই দেবজনস্পৃহণীয় স্বর্গসুখ সম্ভোগ করেন, এবং ভাষায় তিনি কবি না হইলেও কাব্যের এই প্রাণগতরস হৃদয়ে পোষণ করিয়া কৃতার্থ হন। তাঁহার নিকট প্রভাত, সন্ধ্যা, মধ্যাহ্ন ও গভীরা নিশীথিনী সকলেই সামবেদী ঋষির ন্যায় সৌন্দর্য্যের স্তুতিগীত গান করে, এবং তদীয় চিত্ত সৌন্দর্য্যসলিলে ভাসিয়া ভাসিয়াই সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা ভুলিয়া থাকে, এবং সর্ব্বপ্রকার কলুষপঙ্কিলতা, ক্ষুদ্রতা ও সঙ্কীর্ণতা হইতে বিনা প্রযত্নেই নির্ম্মুক্ত রহে।

কিন্তু এই যে সৌন্দর্য্যের উল্লেখ হইল, ইহা কি সকল স্থলেই একরূপ?—না ইহাতে বিচিত্রতা আছে? পর্ব্বতে যে সৌন্দর্য্য, পর্ব্বতপ্রান্তবাহিনী তরঙ্গিণীতেও কি সেই সৌন্দর্য্য? পাদপের দৃঢ়তা ও দৃক্পাতশূন্য পৌরুষে যে কান্তি, পাদপকণ্ঠশোভিনী পুষ্পময়ী ব্রততীতেও কি সেই কান্তি? যাহার চক্ষু আছে, তিনিই বলিবেন,—না।

যেমন কবিতায় রসবৈচিত্র্য, তেমন সৌন্দর্য্যেও বিচিত্র প্রভেদ। সৌন্দর্য্য অনেক প্রকার। উহা কোথাও ভয়ানক, কোথাও কারুণ্যব্যঞ্জক,—উহাতে কোথাও ভক্তির উদ্দীপনা, কোথাও প্রীতির প্রবর্দ্ধনা। অমাবস্যার রাত্রি, ঘোরতম অন্ধকার, আকাশে নিবিড় ঘনঘটা, বায়ুর শ্বাস প্রশ্বাসে শোকের সুগভীর নিঃস্বন, মুসলধারে বৃষ্টি, মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুতের স্ফূর্ত্তি, মুহুর্মুহুঃ বজ্রপাত, জলে স্থলে এক, শূন্যে অশূন্যে সমরূপতা, এই এক প্রকারের সৌন্দর্য্য,—ভয়ঙ্কর, রোমহর্ষণ, নিরুপম। এই প্রকারের সৌন্দর্য্যে হৃদয়ে বিলাসের আবেশ হয় না, হৃদয় সুখসংস্পর্শেও শীতল হয় না; উহা ক্রমশঃ কেবল স্তম্ভিত হইতে থাকে, এবং স্তম্ভিত হইয়াও ক্রমে ক্রমে স্ফীত হইয়া উঠে। আবার লতাবৃত বিনোদকুঞ্জে কৌমুদীর ক্রীড়াকৌতুক, দুর্ব্বাদলে শিশির, সুন্দরীর কমনীয় ললাটে চূর্ণকুন্তল, শিশুর সরল হাস্য, এই সকল আর এক প্রকারের সৌন্দর্য্য,—প্রাণারাম, প্রিয়দর্শন, প্রীতিপ্রদ। হরগৌরীর অপরূপ সম্মিলনে এই উভয়বিধ সৌন্দর্য্যেরই আভা রহিয়াছে। এই জন্যই বলিয়াছি, ইহাতে পূর্ণ সৌন্দর্য্য প্রতিবিম্বিত। অণুমাত্রায় হইলেও ইহাতে পূর্ণতার কিঞ্চিৎ ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে,—কবির কল্পনা পরস্পর-বিরোধি বিচিত্রতার একত্র সমাবেশ করিতে চেষ্টা করিয়া অতি অল্প পরিমাণে হইলেও ইহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছে। ইহাতে,—

"আধ গলে শোভে গরল কালা,
আধই সুধা মাধুরী রে।"

সুতরাং যাহাতে আতঙ্ক, আমরা এই

মূর্ত্তিতে তাহারও প্রতিকৃতি দেখিতে পাই; যাহাতে আনন্দ আমরা তাহাও এই মনোহর মূর্ত্তিতে সন্দর্শন করিয়া প্রীত হই। ইহাতে মধুরিমা ভয়ের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে, ভয় মধুরবেশে মন মোহিত করিতেছে। ইহাতে কাঠিন্য কোমল হইয়া গিয়াছে, কোমলতা কাঠিন্যে পরিণতি পাইয়াছে। কে এ রূপ একবার দেখিলে বিস্মৃত হইতে পারে?—যেখানে হৃদয় যাই যাই বলিয়াও যাইতে সাহস পায় না, এবং যে অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য হইতে চিত্ত দূরে যাইতে ইচ্ছুক হইলেও যাইতে পারে না, কে তাহার মন্ত্রমোহ হইতে মুক্ত রহিবে?

এই হরগৌরীচিত্রের অন্তঃস্থ অস্ফুট অর্থ মানবপ্রকৃতির পূর্ণাবয়বতা। মানব-প্রকৃতির কোন কোন বৃত্তি ফণীর মত গর্জ্জন করে, কোন কোন বৃত্তি কিঙ্কিণীর কলনাদে হৃদয় মন কাড়িয়া লয়;—কোন কোন ভাব অগ্নির মত জিহ্বা প্রসারণ করিয়া পোড়াইতে কি গ্রাস করিতে আসে, কোন কোন ভাব শরীরে অমৃতধারা ঢালিয়া দেয়। যখন মনুষ্য ক্রোধে প্রজ্বলিত, তাহাকে তখনও দেখিও; যখন সে স্নেহে বিগলিত, তাহার তদানীন্তন মাধুর্য্যও একবার দেখিয়া লইও। মনুষ্যের অভিমান সর্ব্বদাই 'দূরে রহ' বলিয়া দর্প সহকারে তোমাকে ইঙ্গিত করিতেছে, মনুষ্যের মমতা জ্যোৎস্নার হিল্লোলের ন্যায় তোমার তাপিত অঙ্গে আপনা হইতে আসিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে। মনুষ্যচক্ষের কোন রূপ দৃষ্টি বিষাক্ত শলাকার ন্যায় তোমার মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়া যাইতেছে, এবং উহা যতদূর প্রবিষ্ট হইতেছে, ততদূরই যেন প্রতপ্ত লৌহ কি প্রতপ্ত গরল স্রোতে বহিতেছে; আবার মনুষ্যেরই আলস্যময়, আবেশময়, প্রাণস্পর্শি নয়নভঙ্গি তোমায় উন্মাদিত করিয়া তুলিতেছে;—যে কল্পকানন স্বপ্নে বই কেহ দেখিতে পায় না, অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও তোমায় তাহার সুস্নিগ্ধ শ্যামল জ্যোতি দেখিতে দিতেছে। কবিকল্পিত হরগৌরী মূর্ত্তিতে এই উভয়বিধ ভাবেরই একত্র নিবেশ; ইহাতে যেমন নানারূপ সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব মিশ্রণ, তেমন পুরুষকার ও প্রীতিরও অপূর্ব্ব সম্মিলন। ইহাই মনুষ্যের চরমোৎকর্ষ। ইহাতে ব্যাঘ্রচর্ম্ম ও পট্টাম্বর আলিঙ্গনবদ্ধ, ইহাতে ফণী ও মণি, জটাজুট ও চারুকবরী, ধবল বিভূতি ও গন্ধ কস্তুরী একাধারে জড়িত গড়িত। অলৌকিক কালিদাস এই মোহন মূর্ত্তির আভা দর্শন করিয়াই দিলীপ বর্ণনে বলিয়াছেন যে,—

"ভীমকান্তৈর্নৃপগুণৈঃ স বভূবোপজীবিনাং
অধৃষ্যশ্চাভিগম্যশ্চ যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ॥"—

এবং কালিদাসের আদিগুরু আদিকবি বাল্মীকিও শোভা ও সামর্থ্যের এই সম্মিলন ধ্যান করিয়াই কখনও রামের কোদণ্ড টঙ্কারে ও জলদ-গম্ভীর গর্জ্জনে ত্রিভুবন কম্পিত করিয়াছেন, কখনও বা রামচন্দ্রের করুণবিলাপ ও অশ্রুবর্ষণে বনের পশু প-

ক্ষীকেও বিলাপ করাইয়াছেন ;—পাষাণে দ্রবময়ীর লীলা দেখাইয়া, পাষাণে কুসুমরাশি প্রস্ফুটিত করিয়া লোককে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ রাখিয়াছেন।

বিধাতা মনুষ্যকে দুটি চক্ষু দিয়াছেন। কিন্তু সংসারে অধিকাংশ মনুষ্যই কাকের মত এক চক্ষে দেখিয়া থাকেন, এবং একার্দ্ধ মাত্র দেখিতে পান বলিয়া মানবমহিমার একার্দ্ধেরই উপাসনা করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও নিকট শুধু পৌরুষগুণেরই গৌরব ও সম্মাননা। তাদৃশ ব্যক্তিদিগের বিবেচনায় যে কোন ভাব, যে কোন বিষয় এবং যাহা কিছুতে হৃদয়ের গন্ধ আছে, অবলাপ্রকৃতির সম্পর্ক আছে এবং অবলাজনসুলভ সারল্য, কোমলতা, পরমুখপ্রেক্ষিতা, ও পরের প্রতি নির্ভরের ছায়া আছে, তাহাই দূষণীয়, তাহাই জঘন্য। তাঁহারা আত্মীয়জনের উপকার করিতে প্রস্তুত, কিন্তু আত্মীয়জনকে আদরে পরিতুষ্ট করিতে তাঁহারা লজ্জা অনুভব করেন। তাঁহারা বন্ধুতার অনুরোধে বিপদসময়ে সাহায্য দান করিতে অসম্মত নহেন, কিন্তু কোন অনুরোধেই কাহাকেও স্নেহের সজলনয়নে অভিনন্দন করিতে তাঁহারা সম্মত হয়েন না। এসকল তাঁহাদিগের চক্ষে যেমন অনাবশ্যক, তেমন অবজ্ঞেয়, তেমনই উপহসনীয়। তাঁহাদিগের আদর্শ পুরুষ আপনাতে আপনি দৃঢ় হইয়া লৌহস্তম্ভের মত দণ্ডায়মান থাকিবেন, কখনও পরের কণ্ঠে ভর করিবেন না ; তিনি শত্রুমর্দ্দনে একে এক সহস্রের মত কার্য্য করিবেন, কিন্তু কখনও সুহৃৎসমাগমে ঢলিয়া পড়িবেন না ; তাঁহাতে মার্ত্তণ্ডের প্রখর দীপ্তি থাকিবে, কিন্তু কখনও চন্দ্রমার স্নিগ্ধ কান্তি বিলাসিত হইবে না ; তিনি সুখে সুখী হইতে পারেন, কিন্তু সুখে কখনও কৃতজ্ঞ হইবেন না ; এবং বিরহ, বিয়োগ প্রভৃতি দুঃখ তাঁহার চরণোপান্তে প্রবাহিত হইয়া যাইবে, কখনও তাঁহাকে স্পর্শ করিবে না।

পক্ষান্তরে, এমনও অনেক ব্যক্তি আছেন যে, তাঁহারা পৌরুষধর্ম্মে পূজার উপযুক্ত সামগ্রী কিছুই দেখিতে পান না, কিন্তু প্রীতির মোহিনী মায়া এবং ঢল ঢল লাবণ্য রাশিকেই সর্ব্বস্ব মনে করেন। তাঁহাদিগের অভিধানে বিষয়লিপ্সা ও কার্য্যকুশলতার নাম কপটতা, পরাক্রমের নাম পাপ, বীরগর্ব্ব ও অভিমান অধোগতির প্রশস্ত পথ। যে সকল পুরুষ আঘাতের উত্তরে প্রতিঘাত করিয়া পৃথিবীতে চিরকাল কেবল মল্লযুদ্ধেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন ; যাঁহারা সূচির ন্যায় কূটচক্র ভেদ করিয়াছেন, রিপুকুলের মস্তকে বজ্রের ন্যায় ভীমশব্দে নিপতিত হইয়াছেন, এবং কোথাও বা ঝটিকার ন্যায় সম্মুখস্থ সমস্ত বিঘ্ন বাধা বেগে উড়াইয়া নিয়াছেন, তাঁহাদিগের চক্ষে তাদৃশ ক্ষণজন্মা ব্যক্তিরাও অপদেবতার অবতার। এই সম্প্রদায়ের আদর্শ পুরুষ কুসুমের ন্যায় কোমল হইবেন, কিন্তু তাঁহাতে কণ্টকের কোন লক্ষণ থাকিবে

না ; তাঁহার নেত্রযুগল হইতে সুখে দুঃখে সকল সময়েই ধারায় বাষ্পবারি বিগলিত হইবে, প্রণয় তাঁহার হৃদয়কে একবারে ডুবু ডুবু করিয়া রাখিবে, এবং তাঁহার দৃষ্টি ও কথায় কেবলই মধু ক্ষরিবে। তিনি বিনীত, তিনি শান্ত,তিনি ক্রোধাদিবিকার-রহিত। তিনি সংসারে নির্লিপ্ত। তিনি শত্রুর নিকটও পদানত। তিনি মৃদুতার সজীব প্রতিমূর্ত্তি।

যাঁহারা পূর্ণতার উপাসক, তাঁহারা এই উভয় সম্প্রদায়েরই আংশিক অনুসরণ করেন, অথচ এই উভয়ে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে যাহা অনুভব করিতে না পান, তাহা অনুভব করিয়া, উভয়েরই অগম্য এক উচ্চতর গ্রামে আরূঢ় হন। তাঁহাদিগের বিবেচনায় যে পৌরুষে প্রীতি নাই, কেবল স্বার্থ আছে, তাহা শ্মশানসদৃশ ; এবং যে প্রীতিতে পৌরুষের অবলম্ব নাই, কেবল অসার সৌরভ আছে, তাহা শুষ্ক ও দলিত পুষ্প-দল-সদৃশ। তাঁহারা এই নিমিত্ত, পৌরুষ ও প্রীতির সম্মিলিত অবস্থাকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া পূজা করেন, এবং যাহাতে প্রতিমনুষ্যেই এই উভয় ভাবের সমুচিত বিকাশ হয়, যাহাতে প্রত্যেকেই অংশতঃ পুরুষ ও অংশতঃ অবলা-স্বভাব হইয়া গঙ্গাসাগর সঙ্গমের ন্যায় এক তীর্থস্বরূপ হইতে পারেন, ইহাই তাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করেন। তাঁহাদিগের আদর্শ এই হরগৌরীমূর্ত্তি, একার্দ্ধে প্রলয়, অপরার্দ্ধে প্রাণদান—একার্দ্ধে সমাধির নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য্য, অপরার্দ্ধে ঈষদ্ধাসিত প্রফুল্লতার প্রিয় আকর্ষণ। তাঁহাদিগের ধর্ম্মনীতি কাপুরুষকে অবজ্ঞা করে ; যে ভীরু, যে নিরভিমান, যে আঘাতে উত্তেজিত হয় না, অপমানের নিদারুণ দংশনেও জ্বলিয়া কি জাগিয়া উঠে না, যাহার চিত্ত কোনরূপ কঠোর সাধনাতেই সাহস পায় না, যাহার মন কার্য্যের সময় ফুৎকারেরও ভর সহে না, তাহাকে উহা মনুষ্যগণনারই বাহিরে রাখে। অথচ, যাঁহারা ক্রূরকর্ম্মা, যাঁহারা নিষ্ঠুর, যাঁহারা কিছুতেই আর্দ্র হন না, কিছুতেই কাহাকেও আর্দ্র করিতে পারেন না, যাঁহারা প্রাণ খুলিয়া ভাল বাসিতে জানেন না, প্রাণ দিয়া পরের পূজা করিতে ইচ্ছা করেন না,—যাঁহারা ঐশ্বর্য্যের আনন্দ চাহেন, কিন্তু স্নেহের অধীনতার কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ আছে তাহা বুঝিতে চাহেন না, ঐ প্রশস্ত নীতি তাঁহাদিগকেও অধম পুরুষ বলিয়া ঘৃণার চক্ষেই নিরীক্ষণ করে।

মনুষ্যের একটি আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। মনুষ্য আপনার অভাব ও অপূর্ণতাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিবার জন্য ভাষাকে দাসীর ন্যায় ব্যবহার করে, এবং নূতন নূতন শব্দের সৃষ্টি করিয়া ঐ সমস্ত নূতন শব্দের আবরণেই আপনার ক্ষুদ্রতা ও ক্ষীণতা ঢাকিয়া রাখিতে যত্নশীল রহে। আমরা উপরে পৌরুষ-বিরোধী ও হৃদয়-বিরোধী এই দুইটি বিভিন্নশ্রেণিস্থ ব্যক্তিদিগের মতি ও গতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি,

তাহাতেই একথার অতি সুন্দর নিদর্শন আছে। যাঁহারা পৌরুষ-বিরোধী, তাঁহাদিগের মুখে আমরা সকল সময়েই শান্তি, ক্ষমা, নির্ব্বেদ, বৈরাগ্য, শত্রুর প্রতি দয়া, বিশ্বজনীন প্রীতি ইত্যাদি কতকগুলি পবিত্র শব্দ শুনিতে পাইয়া থাকি। তাঁহারা দীর্ঘ নিঃশ্বাস সহকারে এই সমস্ত শব্দ উচ্চারণ করেন, এবং এই সকল শব্দের সহায়তা লইয়াই পৃথিবীর রঙ্গভূমি হইতে পৌরুষ ও পরাক্রমের সকল প্রকার ক্রীড়া এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনাদিগের অপবাদ ও কলঙ্ক দূর করিবেন বলিয়া আশান্বিত হন। তাঁহারা যখন আহত হইয়া শয্যাগত থাকেন, তখন উহা পরকাল চিন্তা; তাঁহারা যখন ভয়ে কণ্টকিত হইয়া অঞ্চলের আশ্রয় লন, তখন উহা বিরোধবিমুখকতা। হায়! এই ধর্ম্মই যদি মনুষ্যজাতির পরিত্রাণের ধর্ম্ম হইত, তবে ইতিহাস কাহাদিগের কাহিনী শুনাইয়া মনুষ্যের চিত্ত বিমোহিত করিত? ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণার্জ্জুন, সেকন্দর, সিজর, হানিবাল, ও বোনাপার্টি প্রভৃতি ধুরন্ধর পুরুষদিগের দিগন্তবিশ্রুত নাম কোথায় থাকিত? থর্ম্মপোলীর অতুল কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া কে আনন্দে উচ্ছ্বলিত হইত? আর, জগতে অদ্যাপি যে সকল অবদান পরম্পরা অহরহ অনুষ্ঠিত হইতেছে, কোথায় তাহার চিহ্ন থাকিত? কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই, যাঁহারা পৌরুষের নিন্দা করেন, তাঁহারা শব্দের সৃষ্টি করিতে যেমন বিচক্ষণ, মানবপ্রকৃতির পরিবর্ত্ত-সাধনে তেমন সক্ষম নহেন। তাঁহারা তাঁহাদিগের শব্দসম্পদ লইয়া সুখে নিদ্রাভোগ করুন।

যে শ্রেণিস্থ ব্যক্তিরা হৃদয়গত উৎকর্ষের বিরোধী, তাঁহাদিগের প্রধান কথা, 'দুর্ব্বলতা'। তাঁহারা সকল করিতে পারেন ও সকল সহিতে পারেন, কিন্তু কিছুতেই হৃদয়ের দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করিতে পারেন না। তাঁহাদিগের দ্বারে ভিখারী রোদন করিতেছে, দিনান্তে মুষ্টি 'ভিক্ষা পায় নাই বলিয়া কাতরকণ্ঠে চীৎকার করিতেছে, কিন্তু তাঁহারা তাহার প্রতি কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করিবেন না। কারণ, ইহা হৃদয়ের দুর্ব্বলতা। যে তাঁহাদিগের মুখে একটি প্রিয়কথা শুনিলেই আহ্লাদে অবশ হয়, তাঁহারা তাহাকে প্রাণান্তেও প্রিয় সম্বোধনে সম্ভাষণ করিবেন না। কারণ, ইহা হৃদয়ের দুর্ব্বলতা। জীবনের চিরসঙ্গিনী অশেষ মানসিক যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত হইয়া প্রণয়-পিপাসু নয়নে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতেছেন; তাঁহারা তাঁহার প্রতি ফিরিয়া চাহিবেন না। কারণ, ইহা হৃদয়ের দুর্ব্বলতা। যে সকল কার্য্যে লোকে প্রীত হয়, পরিতৃপ্ত হয়, লোকে অন্তরের সহিত কৃতজ্ঞতা ও সাধুবাদ দেয়, তাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাতে পরাঙ্মুখ রহিবেন। কেননা, ইহাও হৃদয়ের দুর্ব্বলতা। অহো মনুষ্য! কিছুই তোমার অসাধ্য নহে। যাহা ঘোরতর পাতক, তুমি তাহাতেও পুণ্যের কমনীয়চ্ছবি প্রদান করিতে পার, এবং যাদৃশ আচরণে দয়া

অশ্রুবর্ষণ করেন, ধর্ম্ম নিপীড়িত হন, তুমি তাহাও পৌরুষের নির্ম্মল নাম লইয়া অনুষ্ঠান কর।

হৃদয়ের দুর্ব্বলতা? দুর্ব্বলতা এ শব্দ কে কোথা হইতে আনিল? আর, যদি মনুষ্যের হৃদয় স্বভাবতঃই দুর্ব্বল হয়, তবে উহা দোষ না গুণ? হৃদয় বিবেকের অগ্রবর্ত্তী। বিবেক যেখানে পহুঁছিতে পারে না, হৃদয়ের গতি সেখানেও অব্যাহত। হৃদয়ের দুর্ব্বলতাতেই এই অচিন্তনীয় বল। ইহা সত্য যে, মনুষ্য হৃদয়ের দুর্ব্বলতা বশতঃ প্রণয়ে পরতন্ত্র হয়, পরের সুখে হাসে, পরের দুঃখে কাঁদে, পরের বিচ্ছেদবেদনায় ক্লিষ্ট হয়, পরচিত্তবিনোদনের জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করে। কিন্তু ইহাও সত্য যে, এই হৃদয়ের দুর্ব্বলতা বশতঃই সে গিরিসাগর লঙ্ঘন করিয়া সাধারণের অসাধ্য কার্য্য সকল অবহেলায় সাধন করিয়া উঠে; এই দুর্ব্বলতার সামর্থ্যেই সে বিপদরাশির মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়ে; এই দুর্ব্বলতার মহিমাবলেই সে আপনার অস্থিচর্ম্ম বিক্রয় করিয়া জাতি বিশেষের উদ্ধারের পথ উন্মোচন করিয়া দেয়। হৃদয়ের দুর্ব্বলতা জ্ঞানে তাহার সহায়, জগতের হিতজনক যশস্কর কার্য্যে তাহার উদ্দীপনা, সমরাঙ্গণে তাহার মনোমাদিনী শঙ্খধ্বনি, ধর্ম্মে তাহার বীজমন্ত্র, প্রেমে তাহার প্রাণ। মনুষ্য প্রবৃত্তির সজীবতা বৃদ্ধির জন্য যতবিধ মদিরা পান করিয়া থাকে, হৃদয়ের দুর্ব্বলতাই তন্মধ্যে তাহার প্রধান মদিরা। সংসার যাঁহাদিগের নিকট ঋণী রহিয়াছে, তাঁহারা সকলেই এই মদিরাপানে বিভোর থাকিতেন।

মনুষ্যের প্রকৃতিকে তুমি সুন্দর বল। কিন্তু উহার সৌন্দর্য্য কিসে?—না হৃদয়ের দুর্ব্বলতায়। মনুষ্য অনেক কার্য্যেই দৈত্যদানবের উপমাস্থল বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে; কিন্তু দেবতার সহিত যে তাহার উপমা হয়, তাহা শুধু হৃদয়ের দুর্ব্বলতায়। যখন দেখিবে যে, যোদ্ধা ধূমান্ধকার যুদ্ধক্ষেত্রে বিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে নিপতিত হইয়া, প্রাণ যায় যায় এমন সময়েও করধৃত বারিপাত্র আপনার মুখের নিকট হইতে অপসারণপূর্ব্বক অধিকতর তৃষাতুর অন্য একজনের মুখে তুলিয়া দিতেছেন, তখন ইহা মনে রাখিও যে, হৃদয়ের দুর্ব্বলতাই সেখানে তাঁহার বল বিধান করিয়াছে। যখন দেখিবে যে, কোন স্থানে অগ্নির জ্বলন্ত জিহ্বা, মৃত্যুর করাল জিহ্বার ন্যায়, চতুর্দ্দিক ব্যাপিয়াই লক্ লক্ ও ধক্ ধক্ করিতেছে, সকলেই আপনাকে মাত্র বাঁচাইয়া সে স্থান হইতে দূরে পলাইতেছে; কিন্তু একটি ক্ষীণাঙ্গী ললনা সেই অগ্নি ও সেই সাক্ষাৎ মৃত্যুকে ভয় না করিয়া একটি সুকুমার শিশুর জীবন রক্ষার জন্য উহার মধ্যে অম্লানবদনে প্রবিষ্ট হইতেছে, এবং আপনি অর্দ্ধদগ্ধ হইয়াও ক্রোড়স্থ শিশুটিকে আবরিয়া রাখিতেছে, তখন জানিও যে তাহার যাহা কিছু সামর্থ্য, হৃদ-

য়ের দুর্ব্বলতা হইতেই সে তাহা প্রাপ্ত হইয়াছে। যখন দেখিবে যে, যাঁহার পদাঘাতে পৃথিবীতে ভুকম্প হইত, যাঁহার ঝলসিত অস্ত্রচালনে বিদ্যুতরাশি খেলা করিত, পর্ব্বতের মেঘস্পর্শী মস্তকও যাঁহার অভ্যর্থনা ও আজ্ঞাপালনের জন্য অবনত হইয়া আসিত, সেই তেজঃপুঞ্জ মহাবীর লোকলীলার অন্তিম ক্ষণেও আপনাকে বিস্মৃত হইয়া স্বজাতির অধোগতি স্মরণেই অশ্রুজলে পরিপ্লুত হইতেছেন,—যিনি কাতরতা কাহাকে বলে তাহা কখনও বুঝিতেন না, তিনি আজি জননী ও জন্মভূমিকে কাহার হাতে তুলিয়া দিয়া যাইবেন এই চিন্তাতেই বালিকার মত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, তখন জানিও যে হৃদয়ের দুর্ব্বলতাই তাঁহার রোমে রোমে প্রসৃত হইতেছে; হৃদয়ের দুর্ব্বলতাই সেই মহামুহূর্ত্তে তাঁহাকে আত্মদুঃখে অন্ধ রাখিয়া পরদুঃখে দাহন করিতেছে। হৃদয় অমৃতের অনন্ত প্রস্রবণ। একটি বালুকণাকে চঞ্চল সূচিশৃঙ্গে তুলিয়া দিলে উহা যতক্ষণ সেখানে অবস্থান করিতে না পায়, যদি ততক্ষণের জন্যও সমগ্র মনুষ্য জাতির হৃদয়-প্রস্রবণ একবারে শুষ্ক রহে, তাহা হইলে এই অবনীর অন্তস্তল হইতে এমন এক অশ্রুতপূর্ব্ব হাহাকার ধ্বনি সমুত্থিত হয় যে, দূরস্থ গ্রহ নক্ষত্রও তাহাতে চমকিয়া উঠে। হে ধীর! তুমি ইহার পরও কি হৃদয়ের দুর্ব্বলতায় লজ্জিত হইবে? যিনি এই নিখিল সংসার মধ্যে কেবল আপনাকেই সার জ্ঞান করিয়াছেন, তিনিই মনুষ্য হৃদয়ের দুর্ব্বলতার উপহাস করুন; কিন্তু যিনি আপনার ক্ষুদ্রতাকে পূর্ণতায় প্রসারিত করিতে ইচ্ছা করেন, হৃদয়ের দুর্ব্বলতা তাঁহার চক্ষে লজ্জার নহে। হৃদয়ের দুর্ব্বলতা হেতুই তুমি আমার, আমি তোমার, এই আমার বন্ধু, এই আমার বান্ধব, এই আমার আত্মীয় স্বজন, এই আমার স্বজাতি ও স্বদেশ। হৃদয়ের দুর্ব্বলতা দূরীভূত হইলে, কাহার সহিত আর কাহার কি সম্পর্ক থাকে, বল।

আমরা হরগৌরী মূর্ত্তির স্ফুট ও অস্ফুট দুইটি অর্থের ব্যাখ্যা করিয়াছি, এইক্ষণ ইহার আর একটি অর্থও সংক্ষেপে বিবৃত করিব; এবং যেমন হৃদয়ের অবমাননায় মনুষ্য মাত্রেরই বিড়ম্বনা হয়, হৃদয়ের অবমাননায় সমাজেরও যে সেইরূপ কি ততোধিক বিড়ম্বনা হইতেছে, তাহা বুঝাইতেই এস্থলে প্রধানতঃ যত্নপর হইব। আমাদিগের বুদ্ধিতে এই হরগৌরী মূর্ত্তিতেই মনুষ্যসমাজের ভাবি সম্পদ প্রতিভাসিত।

মনুষ্যসমাজ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই নিতান্ত রুগ্ন, জীর্ণ, ও বিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে। সামাজিক জীবনে কোথাও শান্তি নাই, কোথাও সুখ নাই, কোথাও ভবিষ্যতে বিশ্বাস নাই। যাহারা আশা করেন, তাঁহারা নিরাশ হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিক্ষেপ করেন; যাঁহারা প্রথম হইতেই নিরাশ, তাঁহারা আশাভঙ্গের তীব্র দুঃখ

অনুভব না করিলেও চিরদিন নিরুৎসাহ ও নিরানন্দ রহেন। ইহা কেন? সমাজ অবিরত আবর্ত্তিত হইতেছে, অথচ ইহার উন্নতি হয় না;—মনুষ্য সমাজসংস্করণের জন্য, ইতিহাস, অর্থবাদ, বিজ্ঞান, দর্শন, প্রভৃতি সকল শাস্ত্রের সাহায্য, লইতেছে,—কখনও কাব্যের সুধারসস্বাদে দিব্য-শক্তি লাভ করিয়া নূতন সৃষ্টি করিতেছে, কখনও বিবেকের অঙ্কুশতাড়নে অধীর হইয়া যাহা পুরাতন তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে; কিন্তু তথাপি মনুষ্যের মনস্তাপ ঘুচিতেছে না, মনে তৃপ্তি হইতেছে না। ইহার কারণ কি? এই কূটসমস্যা সমাজবিজ্ঞানের বীজসূত্র; আর যাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহারাই ইহার আলোচনা করিতে সমর্থ, এবং তাঁহারাও ইহার প্রকৃত মীমাংসায় অসমর্থ। তাঁহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকেই এই প্রশ্ন অবলম্বনে এক এক অভিনব তত্ত্বের অবতারণ করিয়াছেন; এবং কেহ রাজনীতি, কেহ ধর্ম্মনীতি, কেহ বা সমাজনীতির শত শাখায় বিচরণ করিয়া পরিশেষে যেখান হইতে আরম্ভ সেখানেই অবসন্নচিত্তে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

আমাদিগের বিশ্বাস এই যে, মনুষ্যসমাজে যত যত প্রকারের দুরবস্থাও বিকার পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহার সমুদয় গুলিই এক-কারণ-সম্ভূত নহে। অতএব, একটি কারণ নির্দ্দেশ করিলেই সমাজের বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ সমস্ত ব্যাধির কারণ-নির্দ্দেশ হইবে, এমন সম্ভব হইতে পারে না। একদিগে দেখিতেছি আভিজাত অভিমান-কুসুমকোরকস্থ কীটের মত সমাজের মর্ম্মস্থানে দংশন করিতেছে, সামাজিক-শক্তির বিকাশের পথে সহস্র প্রতিবন্ধক জন্মাইয়া সমাজ বিশেষকে শতাব্দী পশ্চাৎ রাখিতেছে;—আর একদিগে দেখিতেছি পশুশক্তি ন্যায়ের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচারে পরিণত করিয়া তুলিতেছে, এবং যাহা লজ্জাকর, ঘৃণাকর ও লোকের অহিতকর, তাদৃশ কার্য্য নিচয়কেও অতি মনোহর পরিচ্ছদ দিয়া সমাজে প্রচলিত করিয়া উঠাইতেছে। এস্থানে দেখিতেছি মনুষ্য, পাপে প্রবর্ত্তনার জন্য, বহুবিধ রুচিকর বস্তুর বিপণি সাজাইয়া মনুষ্যকে তাহাতে আহ্বান করিতেছে; স্থানান্তরে দেখিতেছি যাহারা অপরাধী, তাহারা নির্দ্দোষ নিরপরাধ ব্যক্তিদিগের স্কন্ধে সকল ভার চাপাইয়া দিয়া আপনারা অস্পৃষ্ট শরীরে সরিয়া পড়িতেছে। সমাজে বিভিন্নজাতীয় ব্যাধির এইরূপ বিভিন্ন কারণ। কিন্তু যদি তথাপি সোপানের পর সোপানে আরোহণ করিয়া বহু কারণের এক-কারণ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক হয়, আমরা অক্ষুব্ধ মনে বলিব যে, সমাজে হরগৌরীর বিচ্ছেদ, অথবা নর নারীর অসামঞ্জস্যই সমস্ত সামাজিক ব্যাধির মূল। যাবৎ না ইহা তিরোহিত হয়, তাবৎ কি কখনও সমাজশক্তির পূর্ণবিকাশ হইবে?

কি উন্নত-ইউরোপ, কি উন্নত-আমেরিকা,

কি গৌরবভ্রষ্ট এসিয়া,কি তিমিরাবৃত আফরিকা, ইহার সকল দেশে এবং সকল সমাজেই আমরা মনুষ্যের সমবেত-বুদ্ধি এবং সমবেত-বাহুবলের বিবিধ কার্য্য দেখিতে পাইতেছি, কোথাও সমবেত-হৃদয়ের কোনরূপ কার্য্য দেখিতে পাই না। সুতরাং, যে দেশ ও যে সমাজ বুদ্ধিবলে ও বাহুবলে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে, সেই দেশ ও সেই সমাজই জগতের পুজা ও পুষ্পাঞ্জলি পাইতেছে, এবং যে দেশ ও যে সমাজ বুদ্ধিবল ও বাহুবল বিষয়ে ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে, সেই দেশ ও সেই সমাজই সবল প্রতিবেশীর পাদপীড়নে দিন দিন অধঃপাতে যাইতেছে। তোমরা যাহাকে উন্নতি বল, যাহাকে সভ্যতা বল, যে সকল কার্য্যকে উনবিংশ শতাব্দীর অক্ষয় গৌরব বল, তত্তাবতের অন্তঃপ্রবাহেও কি বুদ্ধিবল এবং বাহুবল ব্যতীত আর কোনরূপ সামাজিকবল দৃষ্টিগোচর হয়? মনুষ্য উত্তরোত্তর বুদ্ধিবলে বলীয়ান্ হইয়া সাগরের গর্ভ হইতে মণি, মুক্তা, প্রবাল ও রত্ন আহরণ করিতেছে,—গিরির পাষাণবক্ষ ভেদ করিয়া আপনার পথ খুলিতেছে; এবং মনুষ্য উত্তরোত্তর বাহুবলে বলীয়ান্ হইয়া দুর্ব্বলের নিষ্পেষণে নিত্য নূতন মহিমা দেখাইতেছে,—যে দরিদ্র তাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া, যে ধনী তাহার ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া দিতেছে। সমাজে ইহা ছাড়া আর কি হইয়া থাকে? পুরাবৃত্তের স্তবকে স্তবকে কি এই একই কাহিনীরই নানারূপ বর্ণনা নহে,এবং লোকের কণ্ঠেও কি এই একই কথাই ভ্রমণ করে না? ইংলণ্ড ফ্রান্স, জর্ম্মণী ও রুশিয়া প্রভৃতি সুসভ্যরাজ্যে কোটি কোটি প্রাণী উদরের জ্বালায় অসংখ্য দুষ্ক্রিয়া দ্বারা অবনীকে কলুষিত করিতেছে; কোন স্থানে গো মহিষের ন্যায় পুত্রকন্যা বিক্রয় হইতেছে; কোন স্থানে গণিকাবৃত্তির স্রোত ভয়ঙ্করবেগে বহিয়া যাইতেছে; কোথাও আকাশের চন্দ্র তারা ভ্রূণহত্যাদি দেখিয়া দেখিয়া ভয়ে থর থর কাঁপিতেছে; এবং কোথাও স্ত্রীহত্যা, মাতৃহত্যা ও পিতৃহত্যাদি পাপের অসহ্যভারে পৃথিবী বসিয়া পড়িতেছে; অথচ ঐ সমস্ত রাজ্যের অধিনায়কেরা কেবল নিজ নিজ বাহুবলবৃদ্ধি ও অন্যকে বঞ্চনা করিবারই আয়োজন করিতেছেন, সমাজে আর কি হয় না হয় তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ করিবারও অবসর পাইতেছেন না। ইহাই কি মনুষ্যসমাজের প্রাকৃত অবস্থা? বিধাতা কি মানবজাতিকে বুদ্ধি ও বাহু এই দুইটি মাত্র শক্তিই প্রদান করিয়াছিলেন?—না, মনুষ্যসমাজের সর্ব্বাঙ্গীন-বৈভবের জন্য তাহাতে অন্যান্য শক্তিরও অঙ্কুর রোপণ করিয়াছিলেন?

সামাজিক মনুষ্য এ সকল কথার উত্তর দিতে অক্ষম! সে ব্যক্তিবিশেষের চারিত্রবিকাশের জন্য হৃদয়ের আবশ্যকতা স্বীকার করিলেও, সমগ্রসমাজের জন্য তাহা স্বীকার করে না; সে হৃদয়হীন আটিলা ও বরজ্রিয়াকে পশু বলিয়া ঘৃণা

করিতে প্রস্তুত হইলেও, হৃদয়হীন মনুষ্যসমাজকে পশুসমাজ বলিতে তাহার ইচ্ছা হয় না। তাহার এই কামনা যে স্বার্থই প্রত্যেক সমাজের একমাত্র লক্ষ্য থাকিবে, বুদ্ধি সেই স্বার্থের অনুসরণ করিবে, এবং বাহুবল বুদ্ধির সহায় ও সেবক হইয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিতে রহিবে। সে এই নিমিত্তই সমাজের একার্দ্ধকে সর্ব্ববিধ সামাজিক সম্পদে বঞ্চিত করিয়া গভীরতম অন্ধকারে ফেলিয়া রাখিয়াছে;—এবং সে এই নিমিত্তই, যাহারা ক্ষতদেহে প্রলেপ, যাহারা রোগে ঔষধ, শোকে শান্তনা, দুঃখে সহানুভূতি, এবং পরার্থচিন্তায় মুর্ত্তিমতী প্রীতি, আজি সমাজের হৃদয়স্বরূপ সেই অবলাজাতিকে ক্রীড়ার পুতুল কি পদসেবার দাসীভাবে নিয়োজিত রাখিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছে।

সমাজের এই অবস্থা কতযুগে পরিবর্ত্তিত হইবে তাহা বলিতে পারি না। সমাজে বণিগ্বৃত্তি ও বঞ্চনা দিন দিন যেরূপ আদর পাইতেছে, কাব্যে লোকের যেরূপ অশ্রদ্ধা জন্মিতেছে, মুদ্রাময়ী মহাদেবতার প্রভাব ও প্রভুত্ব যেরূপ বাড়িয়া উঠিতেছে, এবং পরপীড়নাদি অসুরব্যবহারে লোকের অবজ্ঞার ভাব যেরূপ কমিয়া যাইতেছে, তাহাতে শীঘ্র যে কোন মৌলিক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইবে এমনও আশা করি না। কিন্তু ইহা অকুতোভয়ে নির্দ্দেশ করিতে পারি যে, যে দিন মনুষ্য, প্রকৃতির কশাঘাতে উদ্বোধিত হইয়া,সামাজিক-যন্ত্রচালনে বুদ্ধিবল ও বাহুবলের সঙ্গে হৃদয়বলেরও আবশ্যকতা স্বীকার করিবে, সমাজের হরগৌরী সেদিন বিযুক্ত ও বিচ্ছিন্ন না রহিয়া পরস্পর মিলিত হইবে। আর, যেদিন হইতে এই হরগৌরী-সম্মিলনে সমাজের উভয়ার্দ্ধ এক হইয়া,সমাজের সম্পদ-বর্দ্ধনে ও সন্তাপ-হরণে, সমাজের শাসনে ও গঠনে সমানরূপে ব্রতী রহিবে, সেদিন হইতে মনুষ্যের শোণিতশোষণ অপেক্ষা মনুষ্যের শরীর-পোষণেই মানবজাতি অধিকতর মনোযোগ দিবে;—বিজ্ঞান সেদিন হইতে হত্যাকাণ্ডে সহায়তা না করিয়া সামাজিক দুঃখ-ভার-মোচনেই অনুকূলতা করিতে থাকিবে,—বীরের অস্ত্র অকারণ প্রযুক্ত না হইয়া অনাথ,অনাশ্রয় ও দীন দুর্ব্বলের বল বিধান করিবে;—এবং সে দিন হইতে শ্বেত কৃষ্ণে তারতম্য, অবস্থাভেদে ব্যবস্থাভেদ, ক্ষুধা, তৃষ্ণাও দারিদ্র্যপাপের প্রায়শ্চিত্তে কারাবাস, কারাগৃহের নরক, এবং স্বজাতির শ্রীবৃদ্ধির জন্য পরজাতির অস্থিচর্ব্বণ প্রভৃতি কলঙ্করাশি পৃথিবী হইতে প্রক্ষালিত হইয়া যাইবে।

কবির উপহার।

(প্রাপ্ত)

রাজন্ !

রত্নগর্ভ পূর্ব্ববঙ্গে তুমি ভাগ্যবান্
হিন্দুকুলে,
পূর্ব্ববঙ্গ সমুজ্জ্বল গৌরবে তোমার ;
যে কৃপাণ কৃপা করি
অর্পিলা ভারতেশ্বরী
তব করে, অক্ষয় তা থাক তব ঘরে,
সমুজ্জ্বল, পূর্ব্ববঙ্গ আশীর্ব্বাদ করে।

কালের করাল স্রোতে গিয়াছে ভাসিয়া
অভাগীর,
কত শত কীর্ত্তিস্তম্ভ,—গৌরব-আধার ;
তাহে পদ্মা বাম যারে,
কে রক্ষিতে পারে তারে,
পূর্ব্ব-ইতিহাস-কথা কহে ধীরে ধীরে
ভগ্নশীলা, বুড়ি গঙ্গা কীর্ত্তিনাশাতীরে।

এতদিনে অভাগিনী পুছিয়া নয়ন
সনিশ্বাসে,
যুড়াবে তাপিত প্রাণ,দেখিয়া তোমারে ;
মলিন বদনে আসি,
দেখা দিবে চারু হাসি,
ভগ্নশীলারাশি মাঝে দেখিবে এখন,
তব কীর্ত্তি-স্তম্ভ-শোভা নয়নরঞ্জন।

নিষ্প্রভ শশাঙ্ক যথা প্রভাকর করে
সমুজ্জ্বল ;
আজি এই আর্য্য ভূমে হায়রে তেমতি,
ব্রিটিশ-তপন-করে,
শোভিতেছে স্তরে স্তরে,
চন্দ্রনিভ সংখ্যাতীত নৃপতি মণ্ডল,
ভারতের সূর্য্যবংশ গেছে অস্তাচল।

আপনি নিষ্প্রভ তবু প্রভাকর করে
শশধর,
শীতল কিরণজালে যুড়ায় সংসার,
তেমতি হে নৃপবর,
যুড়াউক নিরন্তর,
আজি হতে বঙ্গভূমি কিরণে তোমার,
স্থাপুক স্মৃতিতে চির প্রতিবিম্ব তার।

রচি যথা প্রভাকর ঘনবর-শিরে
ইন্দ্রচাপ,
চাতকিনী তৃষা তাহে বাড়ায় দ্বিগুণ,
বৃটিশ ভাস্কর আজি,
তোমায় ভূষণে সাজি ;—
গুরুভার !—বাড়ায়েছে তৃষ্ণা বাঙ্গালার,
যুড়াইবে তুমি বর্ষি দয়ার আসার।

মগ্ননাশ্রু,
ঝরে যথা অনিবার, অদৃশ্যে, আঁধারে,
শোকাতুরা বিহঙ্গিনী,
কাঁদে যথা একাকিনী,
নির্জ্জন কাননে, সেই অরণ্যে রোদন
করে যেন তব নেত্রে অশ্রু আকর্ষণ।

উঠিয়াছে বঙ্গে যেই হা অন্ন হুতাশ—
হাহাকার!—
নাজানি ইহার শেষ হইবে কোথায়,
দরিদ্রতা দাবানলে,
যায় দেশ যায় জ্বলে,
কর এ অনলে দয়া-বারি বরিষণ,
বড় শোভা সমৃদ্ধের সজল নয়ন।

কল্পতরু হোক্ ওই হৃদয় তোমার,
মহাভাগ!
দিন দিন দীপ্তি তার হউক বর্দ্ধিত,
প্রসারি তরঙ্গ রঙ্গে,
জ্ঞানজ্যোতি পূর্ব্ব বঙ্গে;
শান্তি সুখে পূর্ণ হোক্ সেই জ্যোতি তল,
লভুক নিরন্নে অন্ন, তৃষাতুরে জল।

দেশের দুর্ভাগ্যে যেন কাঁদে তব মন,
নৃপবর!
রত্নপ্রসবিনী বঙ্গ সাগর-সম্ভবা,
হইতেছে দিন, দিন
তনুক্ষীণ, প্রাণহীন,
দিন দিন অধোগতি—ইচ্ছা বিধাতার
সম্মুখে অতল স্পর্শ রয়েছে তাহার!

বঙ্গের কবিতা ওই অনাশ্রিতা লতা,
দীনাহীনা,
পায় যেন নৃপবর আশ্রয় তোমার,
দিন দিন পল্লবিতা
হয় যেন রসাশ্রিতা,
তব যশ পুষ্পে সাজি, কোমল বল্লরী,
মোহে যেন বঙ্গবাসী, সৌরভ বিতরি।

তুমি রাজা, পুত্রবর 'রাজেন্দ্র' তোমার,
পুণ্যবান,
মিশিয়াছে তব গৃহে লক্ষ্মী সরস্বতী;
মিশি পূর্ব্ব বাঙ্গালায়,
যথা পদ্মা মেঘনায়
চলেছে অনন্ত মুখে,—বহুক তেমতি
একস্রোতে তব গৃহে যুগ্ম স্রোতস্বতী।

বঙ্গ ইতিহাস যেন গায় শতমুখে
তবকীর্ত্তি,
লিখে রাখে বঙ্গভাষা অমর অক্ষরে,
বাঙ্গালার ঘরে ঘরে,
অনন্ত কালের তরে,
হয় যেন যশোগান—পরম আদরে,
পুনর্ব্বার পূর্ব্ববঙ্গ আশীর্ব্বাদ করে। *

* এই কবিতাটি যশস্বিগণের অগ্রগণ্য, স্বজাতিবৎসল রাজশ্রী কালীনারায়ণ রায় বাহাদুর তদীয় উপাধিলাভের উৎসব সময়ে উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেশানুরাগ ও সহৃদয়তা চিরদিনই কাব্যে এইরূপ অভিনন্দিত হইয়া থাকে। (সং)

সংক্ষিপ্তসমালোচন।

১। অদ্ভুত রহস্য। কলিকাতা মিত্র এবং কোম্পানি দ্বারা প্রকাশিত। এই রহস্য সপ্তাহে এক ফর্ম্মা করিয়া বাহির হইতেছে। আমরা এপর্য্যন্ত ইহার যে কয় ফর্ম্মা পাইয়াছি,তাহা সুন্দর বলিয়া বোধ হইল। ইহার মুদ্রণকার্য্য যেরূপ উৎকৃষ্ট, ইহার লিখনভঙ্গীও সেইরূপ হৃদয়হারিণী। ভাষা সাধারণতঃ প্রাঞ্জল, কিন্তু মধ্যে মধ্যে সমাসের অনুচিত আড়ম্বর ও অনুচিত অনুপ্রাস একটুকু বিরক্তি জন্মাইয়া থাকে। শব্দ, রসের পরিপুষ্টির জন্য, রসবিঘাতের জন্য নহে। এই আখ্যায়িকার এক স্থানে একজনে বিরহবেদনায় আকুল হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতেছেন,—"প্রিয়ে! কোথায় গেলে। তোমার বিরহ আমার পক্ষে একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। এত কষ্ট সহ্য করা কেবল তোমারই জন্য। হায়! আর কি তোমার সেই অমল-কমল-বিনিন্দিত-বদনমণ্ডল দেখিতে পাইব না! আর কি তোমার সেই কোকিল-কাকলি-সদৃশ কথা শুনিয়া শ্রবণমনের সার্থকতা লাভ করিব না? আর কি তোমার চন্দ্রাননে সেই আস্যশোভন মধুরহাস্য দেখিয়া নয়ন চরিতার্থ করিতে পারিব না? ইত্যাদি—"

আমাদের এরূপ বোধ যে, প্রকৃত দুঃখের সময়ে আস্য ও হাস্য প্রভৃতি রমণীয় দৃশ্য এবং কোকিলকাকলি ও অমল-কমলবিনিন্দিত-বদনমণ্ডলের কথা পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে হৃদয়ের বেগ আপনা হইতে উছলিয়া উঠে, তাদৃশ গভীরভাব, সরল ভাষায় পরিব্যক্ত করাই কবিসঙ্গত।

অদ্ভুত রহস্যে ঘটনার কিরূপ বৈচিত্র আছে, তাহা বলা অনাবশ্যক। কারণ, গ্রন্থকার আপনিই স্বীকার করিয়াছেন যে ইহা "কোন সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজী গ্রন্থের উপাখ্যানভাগ অবলম্বনে বিরচিত" হইয়াছে। কিন্তু একথা বলা নিতান্তই আবশ্যক যে, তিনি অন্যদীয় কল্পনার সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকিলেও চিত্রনৈপুণ্যে নিন্দনীয় হন নাই। তাঁহার অনুকৃতি আদরযোগ্য। এই রহস্য বিবৃতির অবশিষ্ট অংশ কেমন হয়, তাহা দেখিবার জন্য আমরা উৎসুক রহিলাম।

২। গুপ্তলিপি। কলিকাতা কর প্রেস হইতে শ্রীযদুনাথ মণ্ডল দ্বারা প্রকাশিত।—গুপ্তলিপি পুরাতন গুপ্তকথারই পুনঃসংস্করণ মাত্র। ইহার রুচি আমাদিগের নিকট নিতান্ত বিকৃত বোধ হইল। উপন্যাসের লেখা ইদানীং যেরূপ হইয়া থাকে, ইহার লেখা সেইরূপ সরস। কৌতুহলের উদ্দীপন হয় ইহাতে সেইরূপ কাহিনীও অনেক আছে। কিন্তু এক বিকৃতরুচির পরিচয়েই আমরা ইহার প্রকাশ-

ককে ধন্যবাদ দিতে অক্ষম হইলাম। তবে, এই যে রুচিগত দোষের উল্লেখ করিলাম, ইহাতে আমরা স্বয়ং ধন্যবাদের যোগ্য হইয়াছি। কারণ, দেখিতেছি যে গ্রন্থের এইরূপ সমালোচনা হয়, ভ্রমরপ্রকৃতি পাঠকবর্গ সেই গ্রন্থের প্রতিই ঝুকিয়া পড়েন;—যেন তাহাতে কি মধু আছে, এইরূপ মনে করিয়া অনেকেই একবার তাহার স্বাদ লইতে ইচ্ছা করেন।

৩। পদ্যরঞ্জিনী। প্রথমভাগ। শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন কর্ত্তৃক বিরচিত। গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন যে, তিনি 'এই ক্ষুদ্রপদ্যময় গ্রন্থখানা শিশুগণের উপকার সাধন মানসে বহু যত্ন ও পরিশ্রমে রচনা' করিয়াছেন, 'কিন্তু আশানুরূপ ফললাভে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা বলিতে' পারেন না। আমরা তাহা বলিতে পারি। আমরা বলিতে পারি যে তিনি কৃতকার্য্য হন নাই। শিশুদিগের জন্য কিরূপ কবিতা লিখিতে হয়, তাহা তিনি জানেন না; এবং দুর্ভাগ্যের বিষয় এই, যাঁহারা সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ইদানীং কেবলই শিশুদিগের জন্য পদ্য লিখিতেছেন, তাঁহাদিগের অনেকেই তাহা জানেন না। ইহাতে কাল ও অনুতাপ ইত্যাদি শিরোনাম দিয়া যে সকল কবিতা লিখিত হইয়াছে, সেগুলি কোন্ শ্রেণীর শিশুর জন্য উপযুক্ত হইবে, তাহা আমাদিগের বুদ্ধির অগম্য। এই পুস্তক খানির মধ্যে আমরা যে কয়টি পংক্তির প্রশংসা করিতে পারিয়াছি নিম্নে তাহার একটি তুলিয়া দিলাম।

"ছলে স্বার্থ সিদ্ধি করা খলের স্বভাব।"

কবিদিগের সহিত ব্যাকরণ শাস্ত্রের যে বিরোধ আছে, তাহা চিরপ্রসিদ্ধ। কিন্তু বোধ হয়, কর্ত্তৃপদে আর ক্রিয়া পদে অন্বয় রক্ষা করা তাঁহাদিগের নিতান্ত নিন্দাজনক না হইতে পারে। পদ্যরঞ্জিনীর রচয়িতা ঐরূপ নিন্দা ভয়ে ভীত। পাছে তাঁহার কবিত্বে কেহ সংশয় করে, এই আশঙ্কায় তিনি অনেকস্থলেই কর্ত্তৃপদে এবং ক্রিয়াপদে অন্বয় রাখেন নাই।

৪। পদ্যবিকাশ। শ্রীপ্রতাপচন্দ্র বসু। বিরচিত। এখানি শিশুশিক্ষার জন্য রচিত হয় নাই, ইহার এই এক গুণ, ইহার আর এক গুণ এই যে, ইহার রচয়িতার সহিত ব্যাকরণ শাস্ত্রের অহি-নকুল-সম্বন্ধ নহে। আমরা ইহার কোন কোন কবিতা পড়িয়া সুখী হইয়াছি। কিন্তু গ্রন্থকারকে আমরা একটি কথা স্মরণ রাখিতে বলিব। তাঁহার অন্তরে ইহা যেন দৃঢ় অঙ্কিত থাকে যে, ছন্দোবদ্ধ কথা আর কবিতা এক পদার্থ নহে। মুগ্ধবোধের সূত্রগুলি ছন্দোনিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু কেহ তৎসমুদয়কে কবিতা বলে না, এবং গদাধর ভট্টাচার্য্যের চৌনটী টীকাকে ছন্দের কোমলবন্ধনে বদ্ধ করিলে তাহাকেও কেহ, 'অনুমানখণ্ড কাব্য' কহিবে না। কাব্যের প্রাণ, আর কাব্যের মূলস্থান মনুষ্যের হৃদয়। যে কথা হৃদয় হইতে বাহির না হয়, তাহা অশেষ

শব্দালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইলেও কবিতা নহে। পদ্যবিকাশে যে কবিতা নাই তাহা নিম্নের পংক্তি কয়টি পাঠ করিলেই বিদিত হইবে।

" বিবাদ বারতা কহিব কায়,
কলুষ অনলে দহিছে কায়;
ধরম করমে ভুলিয়ে যত,
বিভব সঞ্চয়ে হইনু রত।
সুখদ-ধরম-রতন ভুলি,
লইনু পাপের পদের ধূলি।"

অন্তর্দাহ ও উদ্বোধিত বিবেকের ভাষা এরূপ নহে। যে সকল কবিতায় পাপের বৃশ্চিক দংশন এবং মনের হাহুতোস্মি ভাব বর্ণিত হইয়াছে, বোধ হয় সুকুমারমতি গ্রন্থকার এখন পর্য্যন্ত তাহা পাঠ করেন নাই; এবং আমরা ভরসা করি তিনি কখনও তাহা অনুভব করেন নাই।

৫। চক্রদত্ত অর্থাৎ মহামতি চক্রপাণি দত্ত প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসা সংগ্রহ; তত্ত্বচন্দ্রিকা নামক টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহিত। শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন কবিরাজ কর্তৃক সংশোধিত ও প্রকাশিত। বাবু কালীপ্রসন্ন সেন যে কার্য্যের আরম্ভ করিয়াছেন, যদি তাহা সুসমাপিত হয়, তবে তিনি বঙ্গীয় চিকিৎসকসমাজের প্রকৃত কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন। প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র আশ্রয় বিরহে বিনষ্ট প্রায় হইয়াছে। ধন্বন্তরি যে শাস্ত্রের অঙ্কুর রোপণ করিয়াছিলেন, যে শাস্ত্র সুশ্রুত বাভট প্রভৃতি মনস্বিবর্গের উপদেশ বারিতে পরিবর্দ্ধিত এবং চক্রদত্ত প্রভৃতি চিকিৎসা-বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতবর্গের উৎসাহ ও অধ্যবসায়ে পল্লবিত হইয়াছিল,—আজি রামচরণ শীল ও গুরুচরণ শীল প্রভৃতি 'কবিরাজবর্গের' ক্ষুরধার বুদ্ধিতে সেই শাস্ত্র ভূতলে খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িয়াছে, এবং যাহার ইচ্ছা সেই উহাকে পাদতলে দলন করিতেছে। কবিরাজ ও চিকিৎসক হইতে আমাদিগের দেশে এইক্ষণ এক মাস কালও অধ্যয়ন করিতে হয় না; ঔষধ সংগ্রহের জন্য একটি কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে হয় না; ঔষধের পরিচয় লাভের জন্য কাহারও নিকট কিছুই শিক্ষা করা আবশ্যক হয় না; এবং তেমন উৎকট ব্যাধির লক্ষণ নিরূপণ করিতে হইলেও ক্ষণকাল ভাবিতে হয় না। কারণ চিকিৎসকেরা এইক্ষণ গুণশীলসম্পন্ন এবং চিকিৎসকেরা এইক্ষণ কবিরাজ! অনেকে নৈষধের দুই একটি শ্লোক আবৃত্তি করিয়াই চিকিৎসক হন। অনেকে চিকিৎসক হইবার জন্য একটি পুঁটলিমাত্র সংগ্রহ করেন। এমন অবস্থায়ও যে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র মৃতপ্রায় হইয়াও পৃথিবীতে জীবিত আছে, ইহা আয়ুর্ব্বেদের সামান্য মহিমা নহে।

যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে শিক্ষিত হইতে চাহেন, এই খণ্ডশঃ প্রকাশ্য মাসিক পুস্তকে তাঁহাদিগের প্রভূত উপকার হইবে। ইহার অনুবাদভাগ এরূপ সরল হইয়াছে যে, অধ্যাপনা বিনাও তাঁহারা অনেক কথা বুঝিতে সমর্থ হইবেন।

আবুল ফজল।

যাঁহার লেখনী-প্রভাবে মহারাজ তোদড়মল্লের অলৌকিক রাজনীতিজ্ঞতা; রাজা মানসিংহ, জয়সিংহ, ভগবান দাস ও বীরবল প্রভৃতি বিখ্যাতনামা সেনানীদিগের বীরত্ব এবং সর্ব্বোপরি রাজাধিরাজ আকবর সাহের দিগন্তব্যাপিনী কীর্ত্তি অবগত হইতে আমরা সক্ষম হইয়াছি; যিনি স্বকাল-প্রচলিত আচার, ব্যবহার, শাসন প্রভৃতি দর্পণের ন্যায় চিত্র করিয়াছেন; যিনি একাধারে বিদ্যা, বুদ্ধ, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সৈনিকনৈপুণ্য প্রভৃতি বহুগুণের সমাবেশ প্রদর্শন করিয়াছেন; তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত অতিসংক্ষিপ্ত হইলেও সাধারণের প্রীতিপ্রদ হইবে এইরূপ আশা করা অসঙ্গত নহে।—

সিন্ধুদেশে সেখ খিজির নামে এক জন সুন্নি বাস করিতেন, তিনি কোন কার্য্যোপলক্ষে ভারতবর্ষে আগমন পূর্ব্বক নাগর নগরে বাস করেন, এই স্থানে সেখ মবারিক নামে তাঁহার একটি পুত্র জন্মে। মবারিক আরব্য ও পারস্য ভাষাতে এক জন অতি প্রসিদ্ধ মৌলবি ছিলেন। সমগ্র মহম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্র ও দর্শন অধ্যয়ন করাতে, তাঁহার ধর্ম্মমতের এত পরিবর্ত্তন ঘটে যে, কেহ তাঁহাকে কাফের, কেহ বা নাস্তিক বলিয়া ঘৃণা করিতে লাগিল। তিনি অচিরাৎ সুন্নি মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিয়া হইলেন; এবং আগরা নগরীতে একটি বিদ্যালয় সংস্থাপন পূর্ব্বক দর্শনশাস্ত্রের শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তদীয় বিপক্ষেরা তখন তাঁহার প্রতি এত নিগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল যে, তিনি বিদ্যালয় বন্ধ করিয়া সপরিবারে আগরা হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। এই মবারিকের কয়েকটি পুত্র ছিল, ইহারা প্রায় সকলেই গুণবান্ ও কৃতী। কিন্তু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ফায়জি ও তদনুজ আবুল ফজলই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

১৫৫১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি তারিখে নাগর নগরে আবুল ফজলের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা মবারিক স্বয়ং এই পুত্রদ্বয়ের শিক্ষা দেন। বাল্যকালাবধিই তিনি নিবিষ্টচিত্ত ও অধ্যবসায়ী ছাত্র বলিয়া বিখ্যাত। বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্ব্বেই আরব্য ও পারস্য ভাষাতে তাঁহার এরূপ প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল যে, তাঁহাকে লোকে "সেখ আবুল ফজল এলেমি" * বলিয়া ডাকিত।

* সংস্কৃতে যেরূপ "বিদ্যাসাগর," "বিদ্যাবাগীশ" খ্যাতি, পারস্য ভাষায় "এলেমি" তদ্রূপ। "এলেম" শব্দের অর্থ বিদ্যা।

ফায়জি কেবল আরব্য ও পারস্য ভাষায় যে ব্যুৎপন্ন ছিলেন এরূপ নহে; তিনি এক জন প্রগাঢ় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। আকবর সাহের অনুরোধে ইনি সংস্কৃতভাষা অধ্যয়ন করেন; ভাস্করাচার্য্যের বীজগণিত ও লীলাবতী, এবং মহাভারতান্তর্গত নলোপাখ্যান স্বয়ং অনুবাদ করেন; এবং বেদ, মহাভারত ও রামায়ণ অনুবাদে অপরাপর পণ্ডিতদিগকে সাহায্য করেন। তিনি নিজেও এক জন প্রধান কবি ছিলেন, এবং পারস্য ভাষায় তৎপ্রণীত অনেক কাব্য অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে আকবর সাহা যখন চিতোর আক্রমণ করেন, তখন ফায়জির কবিতা-কুসুমের সৌরভে আমোদিত হইয়া, তাঁহাকে "রাজকবির" পদ প্রদান করেন। ইহার ছয় বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে ফায়জির অনুরোধে আবুলফজল সম্রাটের সভায় আহূত হন। ভ্রাতৃদ্বয় কিছুদিনের মধ্যেই সম্রাটের প্রিয় সহচর ও হৃদয়বন্ধু হইয়া উঠিলেন। আকবর সাহের পৌত্তলিক ধর্ম্মে অবিশ্বাস ও নূতনধর্ম্মমতের আবিষ্কার আপনা হইতেই হইয়াছিল। কিন্তু এই সহোদরদ্বয়ের সহিত আলাপ ও তর্কবিতর্ক করাতে নবাবিষ্কৃত মত বদ্ধমূল হয়। তদীয় বিদ্যোৎসাহিতা প্রভৃতি গুণও ইঁহাদের পরামর্শেই বিকসিত হয়। আকবর ইঁহাদের সহিত যে কেবল ধর্ম্ম ও বিদ্যা বিষয়েই পরামর্শ করিতেন, এমন নহে। কিন্তু কোন রাজনৈতিক উৎকট প্রশ্নের উত্থাপন হইলেই ইঁহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন; এবং শাসন সম্বন্ধীয় গুরুতর অনেক কার্য্যের ভার ইঁহাদের উপর অর্পণ করিতেন।

দাক্ষিণাত্য আক্রমণের পূর্ব্বে তত্রত্য নৃপতিবৃন্দের সমীপে দূতস্বরূপ ফায়জি তথায় প্রেরিত হন। আবুলফজল সম্রাটের নিকট থাকিয়া দিন দিন উন্নতি সোপানে আরোহণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে "চাহার হাজারি মুনস্থবদার" (অর্থাৎ চারি সহস্র পদাতিকের অধ্যক্ষ), ও প্রধান সচিবের পদে আরূঢ় হন। আবুলফজলের প্রতি সম্রাটের অচল বিশ্বাস ছিল। তিনিও অমাত্য ও সৈনিকের কার্য্য অত্যন্ত দক্ষতার সহিত নির্ব্বাহ করিতেন। প্রভুর কার্য্য সম্পাদনে তাঁহার এতদূর আগ্রহ ছিল যে, ১১৮৬ খৃষ্টাব্দে যখন জইনখাঁ ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমাস্থ পরাক্রান্ত ইউসফজি জাতির বিপক্ষে প্রেরিত হন, তখন রাজা বীরবল ও আবুলফজল উভয়েই তদীয় সহকারী হইতে প্রার্থী হন। এবং উভয়ের মধ্যে কে নিযুক্ত হইবেন এই তর্কের মীমাংসা জন্য সুর্ত্তি খেলা হয়, তাহাতে বীরবলই নির্ব্বাচিত হন। তখন প্রভুর কার্য্য করিয়া যশোভাজন হইতে পারিলেন না বলিয়া আবুলফজলের ক্ষোভের পরিসীমা রহিলনা।

পক্ষান্তরে তাঁহার উপর আকবর সাহেরও কতদূর বিশ্বাস ছিল, তাহার ও দুই একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। দা-

ক্ষিণাত্যের আমির গণের সহিত সম্রাটের বিবাদ চলিতেছিল। তাহাদিগের প্রশমনার্থ যুবরাজ মুরাদ প্রেরিত হইয়াছিলেন। কথাছিল যে আকবর পঞ্জাব হইতে দাক্ষিণাত্য অভিমুখে যাত্রা করিলে, পথিমধ্যে যুবরাজেরা তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন; কিন্তু তাঁহাদিগের বিলম্ব দেখিয়া সম্রাটের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল; এবং যুবরাজ মুরাদকে দাক্ষিণাত্যে না রাখিয়া আবুলফজলকে তথায় রাখিবেন এই সঙ্কল্প করিয়া, তাঁহাকে কহিলেন "যদি আমিরেরা মিত্রভাবে স্বদেশ-শাসন-ভার আপনাদিগের হস্তে গ্রহণ করে, তবে যুবরাজ মুরাদের সহিত তুমি রাজধানীতে চলিয়া আসিবে; অন্যথা যুবরাজকে রাজধানী প্রেরণপূর্ব্বক তুমি তথায় থাকিবা।" স্বীয় পুত্র অপেক্ষা একজন কর্ম্মচারীর প্রতি অধিকতর বিশ্বাস কি সামান্য কথা?

আমরা এ বিষয়ের আর একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াই ক্ষান্ত হইব। ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে সেখ ফরিদ, আবুলফজল প্রভৃতি চারিজন সেনানীর প্রতি আসির দুর্গ আক্রমণ করিবার অনুমতি হয়। কিন্তু শত্রুপক্ষীয়দিগের সৈন্যসংখ্যা ইঁহাদের সৈন্য অপেক্ষা অনেকগুণ অধিক ছিল বলিয়া, প্রধান সেনাপতি সহসা দুর্গ আক্রমণে বিরত থাকিয়া, আসির দুর্গের তিনক্রোশ দূরে শিবির সংস্থাপন পূর্ব্বক সুযোগ অন্বেষণে রহিলেন। দুষ্ট লোকে সম্রাটকে বুঝাইয়া দিল (ইহাদের মধ্যে কুমার সলিমও ছিলেন) যে সেনানী চতুষ্টয় কোন দুরভিসন্ধিতে এরূপ করিতেছেন। সম্রাট্ এই কথায় ক্রোধে অগ্নিবৎ হইয়া প্রধান সেনাপতি সেখ ফরিদকে ভর্ৎসনা পূর্ব্বক দুর্গ আক্রমণ করিতে লিখিলেন। তখন আবুল ফজল সত্বর সম্রাট সমীপে উপনীত হইয়া সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন করিলেন। তাহা শুনিয়া সম্রাটের ক্রোধ একেবারে বিদূরিত হইল, এবং আবুল ফজলের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সেই দিনই খান্দেশের শাসনকর্ত্তা রূপে নিযুক্ত করিলেন। সেখ নবাব আবুল ফজলের পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বর্য্যও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তদীয় আমিরির একটি উদাহরণ দিলেই, পাঠক তাঁহার ঐশ্বর্য্যের কথঞ্চিৎ আভাস পাইতে পারিবেন। "মআসিরলওমরা" প্রণেতা কহেন "তিনি অপর্য্যাপ্ত আহার করিতেন। প্রতিদিন সুপ ও জলবাদে ২২ সের বস্তু ভক্ষণ করিতেন। আহারের সময় তদীয় তনয় আবদার রহমান 'সফরচি' স্বরূপ নিকটে বসিয়া থাকিতেন, এবং প্রধান 'বাবুরচি' ও তথায় উপস্থিত থাকিত। যদি আবুল ফজল কোন ব্যঞ্জন দুইবার আস্বাদ লইতেন, তবে পরদিনও ঐ ব্যঞ্জন পাক হইত। কোন ব্যঞ্জন ভাল না হইলে তিনি আবদার রহমানকে আস্বাদ লইতে পাত্রটি তাঁহার সম্মুখে দিতেন, তিনি উহার তার লইয়া প্রধান বাবুরচিকে দিতেন, কিন্তু

কোন কথাবার্ত্তা হইত না। আবুল ফজল যখন দাক্ষিণাত্যে ছিলেন, তখন তাঁহার এতদূর ভোজনবিলাসিতা ছিল, যে তাহা শুনিলে সহসা বিশ্বাস করা যায় না। একটি প্রকাণ্ড স্কন্ধাবারে সহস্র প্রকার উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রত্যহ আমিরদিগকে বিতরণ করা হইত। তাহার নিকটবর্ত্তী অপর শিবিরে অনাহুত ও রবাহূত প্রভৃতিকে খাদ্য দান করিতেন। সমস্ত দিনই খিচরি পাক হইত; এবং যাহার ইচ্ছা সেই খাইত।"

১৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে কোন গূঢ় মন্ত্রণা করিবার জন্য আকবর সাহা প্রিয়-সচিব আবুল ফজলকে দাক্ষিণাত্য হইতে সত্বর আগরা নগরীতে উপস্থিত হইবার আদেশ করেন। আবুল ফজল তৎক্ষণাৎ আগরাভিমুখে যাত্রা করেন, এবং পথি মধ্যে বুন্দেলখণ্ডের অন্যতর রাজা নরসিংহ দেবের ষড়্‌যন্ত্রে তাঁহার প্রাণনাশ হয়। যুবরাজ সলিমের মন্ত্রণায়ই নরসিংহদেব এই নৃশংস কর্ম্মে ব্রতী হন। "ওয়াকতে আসদ্‌বেগ" * নামক পারস্য গ্রন্থে লিখিত আছে "সেখ মবারকের পুত্র নবাব সেখ আবুল ফজলের আয়ুষ্কাল যখন পূর্ণ হইয়া আসিল, তখন সিরঞ্জ প্রদেশের অন্তর্গত সরাইবরার্ নামক স্থানে ১০১০ হিজরী শাকের রবিয়ল আওয়াল মাসের সপ্তম তারিখ শুক্রবার সেই বিখ্যাতনামা জ্ঞানীপ্রধান ব্যক্তি আততায়ীর হস্তে প্রাণত্যাগ করেন।" "সেই বিদ্বান্ শ্রেষ্ঠ যখন সিরঞ্জ নগরে উপস্থিত হইলেন, তখন তদ্দেশের শাসনকর্ত্তা গোপালদাস কহিল 'আপনার সমভিব্যাহারী সৈন্যেরা পরিক্লান্ত ও পীড়িত, অতএব তাহাদিগকে ইন্দ্রজীত বোন্দেলার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আসদ্‌বেগের অধীনে রাখিয়া আমার প্রদত্ত সৈন্য লইয়া আগরা গমন করুন।' গোপাল দাসের সৈন্য সংখ্যা ৩০০ শত ছিল, তাহারা সকলকেই রাজপুত জাতীয় হীন লোক, এবং সকলেই নূতন শিক্ষিত। পরন্তু এই সময়ে নরসিংহদেব দাক্ষিণাত্যে দস্যুতা করিতেছিল; আমরা প্রত্যহ আবুল খাঁর নিকট হইতে তাহার সংবাদ পাইতাম। এরূপ অবস্থায় অশিক্ষিত, অপরীক্ষিত সৈন্য সমভিব্যাহারে একাকী যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। ইত্যাদি নানারূপ বাক্যে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে আমরা যত্ন করিলাম, কিন্তু তিনি তৎসমুদয় অগ্রাহ্য করিয়া অশ্বারোহণে গমন করিলেন। আমি সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইলাম; তাহাতে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া আমাকে নিবৃত্ত হইতে কহিলেন। আমি অগত্যা বিরত হইলাম।" পরিশেষে কিরূপে একজন নীচাশয় রাজপুত-হস্তে আবুল ফজলের প্রাণনাশ হয়, তাহার বিস্তারিত বর্ণন আছে। অনাবশ্যক বোধে আমরা তাহা পরিত্যাগ করিয়া তদীয়

* ইহার অপর নাম 'হালতে আসদ্‌বেগ।'

চরিত্র ও রচনা প্রণালীর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

এল্‌ফিনিস্টোন সাহেব একস্থানে লিখিয়াছেন, "এই সময়ে (আকবর সাহের সময়ে) ই আবুল ফজলের নৈসর্গিক গুণাবলীর বিকাশ প্রাপ্ত হয়; এবং এই সময়েই তদীয় চরিত্রের দোষ-নিচয়ও প্রকাশিত হয়। যে কোন কার্য্যে আকবরের দয়া, জ্ঞান, কিংবা সামর্থ্যের অভাব প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা, আবুল ফজল হয়ত তৎসম্বন্ধে নির্ব্বাক, অথবা তত্তৎস্থানে সত্যের অপলাপ করিয়াছেন। যে স্থানে পড়, তাহাতেই কেবল আকবরের প্রশংসা; সুতরাং লেখক ও তদীয় নায়কের চরিত্রে পাঠকের বৈরক্তি উৎপাদন করে। এই অনুচিত চাটুবাদে আকবরের যথার্থ চরিত্র প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তবে তদীয় কার্য্যকলাপের উদ্দেশ্য, তদীয় বিপদরাশি এবং কি কি উপায়ে তাহা অতিক্রম করিতে তিনি সক্ষম হইয়াছিলেন, এ সকল কথা আমরা অন্যান্য গ্রন্থ হইতে অবগত হই।" অপর একস্থানে কহেন "প্রিয় পাত্র এবং অভিভাবকদিগকে চাটুকারের ন্যায় অদ্ভুতবাক্যে প্রশংসা করা, এবং যে কার্য্য বিশেষ দোষাবহ নহে, দোষস্পর্শভয়ে তাহাও সত্যের-বিরুদ্ধে বর্ণনা করা যে আবুল ফজলের অভ্যাস, 'আকবরনামা' পাঠকালে পাঠককে এ বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে। তদীয় আখ্যান ওজোগুণ বিহীন; শব্দাড়ম্বরপূর্ণ ও অপরিস্ফুট; স্থানে স্থানে সামান্য চিন্তাশক্তির আভাস আছে; এবং স্থানে স্থানে নীতিও আছে। কিন্তু উপসংহারে প্রায়ই অভিভাবকের প্রশংসা আছে।" পরন্তু অপরস্থানে "আবুলফজল আকবরের প্রসিদ্ধ ও প্রিয় সচিব ছিলেন। তদীয় মত উদারতাপূর্ণ ও বুদ্ধিশক্তি অপরিমিত। কিন্তু তিনি একজন আলঙ্কারিক; এবং যেরূপ রচনা ভারতে আদৃত, তদীয় রচনা তদ্রূপ অস্বাভাবিক রচনার আদর্শ। তিনি রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন, সুতরাং রাজার ও রাজ সচিবদিগের গুণের ব্যাখ্যা, দোষের গোপন, এবং তাঁহাদিগের মহিমা কীর্ত্তন করা তাঁহার স্বার্থ।"

এলফিনিষ্টোন খাস বিলাতি সাহেব; তিনি বিলাতি রুচিকে আদর্শ করিয়া, ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য সভ্যতাকে আদর্শ করিয়া, এবং মেজর প্রাইসের সংক্ষিপ্ত অনুবাদিত আকবর নামা সম্মুখে রাখিয়া, আবুলফজলের এত দোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন। সুতরাং এ স্থলে বলা অনাবশ্যক যে তিনি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। নৃপতি ও অন্নদাতার গুণানুবাদ এবং সুহৃদের গুণকীর্ত্তন এ দেশী শাস্ত্র সম্মত, এবং রীতি সম্মত; সুতরাং তাহাতে তাঁহাকে পক্ষপাতী বা চাটুকার বলা যায় পর নাই বিবেচিতা। এলফিনিষ্টোন যে বলেন, আবুলফজল জ্ঞাতসারে সত্যের অপলাপ করিয়াছেন, ইহাও তাঁহার ন্যায় ঐতিহাসিকের উপযুক্ত হয় নাই। অনুবাদ

দেখিয়া মূলগ্রন্থের সমালোচন ও তৎগ্রন্থকারের চরিত্রের উপর মতামত প্রকাশ করাই অন্যায়। তাহাতে আবার সে অনুবাদ মূলগ্রন্থের নহে, তাহার সংক্ষিপ্তসারের। যাঁহারা মূলগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন, এবং যাঁহাদিগের মতামত পারস্য ভাষা সম্বন্ধে বেদ বাক্য বলিলেও বলা যাইতে পারে; দেখা যাউক, তাঁহারা এ বিষয়ে কি বলিয়াছেন?

আকবর নামার চরমভাগের রচয়িতা ইনাএতউল্লা কহেন "সেখ আবুলফজল যে রাজ-গৌরব-বেশে সজ্জিত ছিলেন, সে পরিচ্ছদ প্রগাঢ় ও আন্তরিক রাজভক্তিরূপ কারুকার্য্যে ভূষিত ছিল।" এলফিনিষ্টোনের মতে এই রাজ-ভক্তির নাম পক্ষপাত ও চাটুকারিতা। ইনাএতউল্লা কহেন, "বীরসিংহ * দেবের দুরভিসন্ধি সন্দেহ করিয়া, আবুলফজলের সহচরেরা যখন তাঁহাকে কহিলেন 'এ স্থান হইতে ক্রোশান্তর স্থিত অন্তরিনগরে রায়রায়ান ও রাজা রায়সিংহ দুই সহস্র অশ্বারোহী লইয়া অবস্থিতি করিতেছেন,আপনি তাঁহাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করুন, নতুবা প্রাণ নাশের বিচিত্র নাই।' কিন্তু আবুলফজল সদর্পে কহিলেন 'মৃত্যুভয় নিরর্থক, কারণ নিয়তির অন্যথা কেহই করিতে সক্ষম নহে। আমি একজন দরবেশের পুত্র ছিলাম, স্বীয় শৌর্য্য বীর্য্যে এখন প্রধান আমির হইয়াছি। কেমন করিয়া নীচলোকের ন্যায় আমি অপরের আশ্রয় গ্রহণ করিব'?" এই উক্তিতে আবুলফজলের দুইটি মহৎগুণ দেখা যাইতেছে। প্রথমতঃ তিনি ধনী মানী হইয়াও সত্যের অনুরোধে পূর্ব্বের দরিদ্রাবস্থার উল্লেখ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। দ্বিতীয়তঃ অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করাকে তিনি আত্মাবমাননা মনে করিতেন। এখন আমরা পাঠককে জিজ্ঞাসা করি, যিনি আপন দরিদ্রতা প্রকাশে লজ্জিত নন, তিনি কি অপরের দোষ সত্ত্বেও তাহা গোপন করিয়া মিথ্যা প্রশংসাবাদ করিবার ব্যক্তি? এবং যিনি তেজস্বিতা প্রভাবে মৃত্যুকেও ভয় করিলেন না,তিনি কি চাটুকার হইতে পারেন?

"মাসিরাল ওমরা" প্রণেতা আবুলফজলের রচনা বিষয়ে এইরূপ সাক্ষ্য দিয়াছেন। "লেখক শ্রেণীতে আবুলফজল অদ্বিতীয়। তদীয় রচনা প্রণালী উচ্চ শ্রেণির। অপরাপর মুন্সিরা যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৌন্দর্য্য প্রকাশে এবং শ্রেণী বিশেষের বোধগম্য শব্দ প্রয়োগে ব্যস্ত, তিনি তদ্রূপ ছিলেন না। শব্দকলাপের ওজস্বিতা, বাক্য রচনার চাতুর্য্য,সমাসাদি প্রয়োগের উপযোগিতা, এবং বাক্য-সমাপ্তির সৌষ্ঠব, তাঁহার লেখাতে এত যে, অপরের তাহা অনুকরণ করিবার সামর্থ্য নাই।"

ইলিয়ট সাহেবকৃত ভারতেতিহাসের সম্পাদক ভট্ট জন ডাওসন কহেন "আমি সমগ্র আকবর নামা সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্মরূপে প-

* আসদ ও অপরাপর গ্রন্থকারের মতে ইহার নাম নরসিংহ।

রীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, তাহার অনেক অংশ অনুবাদও করিয়াছি, তাহাতে এল-ফিনিষ্টোনের মতে কখনও সায় দিতে পারি না। সত্য বটে আবুলফজল কোন কোন স্থলে আকবর সাহকে অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু আকবরের প্রতি অতিভক্তিই তাহার কারণ। তত্তৎ স্থান ভিন্ন যে সকল অত্যুক্তি আছে, তাহা আবুলফজলের অলঙ্কার-প্রিয়তার ফল, চাটুবাদের ফল নহে। তদীয় রচনা প্রণালীর বিচার করিবার সময়ে ইয়োরোপীয় উন্নত ইতিহাসের সহিত তাহার তুলনা করা অনুচিত; তিনি যে দেশের লেখক, তদ্দেশীয় অপরাপর লেখকের সহিত তাঁহার তুলনা করাই একমাত্র ন্যায় সঙ্গত।"

প্রসিদ্ধ পারস্য ভাষাবিদ্ শ্রীযুক্ত ব্লকম্যান সাহেব স্বীয় অনুবাদিত আইন আকবরীর উপক্রমণিকায় কহিয়াছেন— "ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা আবুলফজলকে চাটুকার ও সত্যের অপলাপকারী বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। একবার নিবিষ্টচিত্তে 'আকবরনামা' অধ্যয়ন করিলেই প্রতিপন্ন হইবে যে, এরূপ নিন্দাবাদ যারপর নাই অমূলক। এই দেশস্থ অপরাপর ইতিহাসের সহিত ইহার তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, তিনি অপরের অপেক্ষা কম প্রশংসা করিয়াছেন, এবং যতটুকু প্রশংসা করিয়াছেন, তাহাতেও সুরুচি ও আত্মগৌরব বিরুদ্ধ কিছুই নাই; এ বিষয়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য ঐতিহাসিক ও কবি অধিকতর দোষী। দেশীয় কোন লেখকই তাঁহাকে চাটুকার বলেন নাই। আবার আমরা একথা যখন মনে করি, যে রাজার মত অন্যায় কি ন্যায়ানুমোদিত হউক, এ দেশের সমস্ত নীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্রমতে তাহা প্রজার অনুমোদন করা কর্ত্তব্য; পরন্তু এদেশীয় কাব্য মাত্রেই যখন জঘন্য অত্যুক্তি রহিয়াছে; তখন আকবরের ন্যায় নায়কের প্রশংসা জন্য আবুলফজলকে কোনও দোষ দেওয়া যায়না।"

দোষশূন্য লোক নাই; সুতরাং আবুলফজলও যে দোষগুণ সমন্বিত তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু তদীয় গুণের ভাগ এত অধিক যে, এলফিনিষ্টোনও স্থানে স্থানে তাঁহাকে অদ্বিতীয় ও শ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়া প্রশংসা না করিয়া পারেন নাই। ড্রাইডন একস্থানে কহিয়াছেন—

'দোষ ভাসে তৃণসম জলের উপরে।
গুণরত্ন সাগরের গরভে বিহরে।'

তাই বলিয়াই আকবরনামার প্রাইসকৃত ইংরেজী অনুবাদ দৃষ্টে এলফিনিষ্টোনের চক্ষে অধিকাংশ দোষই পতিত হইয়াছে। মূলগ্রন্থরূপ রত্নাকরগর্ভে অবতরণ করিতে অক্ষম বশতঃ গুণ তত দেখিতে পান নাই।

"মাসিরালওমরা" প্রণেতা আবুলফজলের ধর্ম্মমত প্রভৃতির বিষয় এইরূপ লিখিয়াছেন। "কেহ কেহ আবুলফজলকে বিধর্ম্মী, কেহ হিন্দু, কেহ অগ্নি-উপাসক, এবং কেহ নাস্তিক বলিয়াছেন। ফলতঃ

তিনি 'সুফি' ধর্ম্মাক্রান্ত ছিলেন, এবং অপরাপর সুফির ন্যায় আপনাকে মহাম্মদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন। তিনি যে অতি উন্নত প্রকৃতির লোক ছিলেন, এবং সকলের সহিতই সৌখ্যভাবে বাস করিতে যে তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তিনি কখনও অন্যায় বাক্য মুখে আনিতেন না। উৎকোচ গ্রহণ, বেতন প্রদান না করা, অর্থদণ্ড করা প্রভৃতি তাঁহার পরিবার ও ভৃত্যবর্গ মধ্যে ছিল না। তিনি একবার কাহাকে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করিলে, সে অকর্ম্মণ্য হইলেও তাহাকে পদচ্যুত করিতেন না। তিনি কহিতেন 'অকর্ম্মণ্য ভৃত্যকে পদচ্যুত করিলে লোকে প্রভুকেই মূর্খ বিবেচনা করে; কারণ কর্ম্মণ্য কি না নিয়োগের পূর্ব্বে তাহা দেখা উচিত ছিল।' বৎসরের প্রথম দিনে তিনি পূর্ব্ব বৎসরের শেষ দিবসে তদীয় পরিবার মধ্যে যে যে বস্তু যে পরিমাণ রহিয়াছে, তাহার তালিকা করিতেন, এবং উহা নিজের নিকট থাকিত। পূর্ব্ববৎসরের কাগজাদি দগ্ধ করিয়া ফেলাইতেন। পাজামা ব্যতীত সমুদায় পুরাতন বস্ত্র ভৃত্যদিগকে দান করিতেন; পাজামা গুলি দগ্ধ করিতেন।"

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, কুমার সলিমের (জাহাঙ্গীরের) কুমন্ত্রণায় নরসিংহদেব আবুলফজলের বিনাশ সাধন করে। জাহাঙ্গীর স্বপ্রণীত "ওয়াকতে জাহাঙ্গীর" গ্রন্থে স্বয়ং তাহা স্বীকার করিয়াছেন। এবং আকবরের মৃত্যুর পর এই নরহত্যাকারীকে তিনি যথেষ্ট পুরস্কার ও উচ্চপদ প্রদান করেন। বোখারার রাজা আবদুল্লা কহিতেন "আবুলফজলের লেখনীকে আমি যত ভয় করি, আকবরের শাণিত শরকে তত ভয় করি না!" আবুলফজলের ক্ষমতা এইরূপ অসীমই ছিল। এই অসীম ক্ষমতাতে ভীত হইয়াই জাহাঙ্গীর এরূপ নৃশংস কার্য্যে ব্রতী হন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আবুলফজলের প্রতি আকবর সাহের অকৃত্রিম প্রেম ও অচল বিশ্বাস ছিল। আসদ, এনায়তউল্লা প্রভৃতি সকলেই কহিয়াছেন, আবুলফজলের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে আকবর শোকে এত অভিভূত হইয়াছিলেন যে, তিন দিবস আহার নিদ্রা ও শ্মশ্রুমুণ্ডন পরিত্যাগ পূর্ব্বক বালকের ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন। পুত্রকলত্রাদির সহিত পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ করেন নাই। চতুর্থ দিবসে রায়রায়ান আবুলফজলের প্রিয় সহচর আসদ্‌বেগকে সম্রাট সমীপে উপস্থিত করিলে, আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ শ্রবণ পূর্ব্বক শোক ভুলিয়া ক্রোধে অধীর হন, এবং হত্যাকারী নরসিংহ দেবের বিরুদ্ধে রায়রায়ান, বিক্রমোজ্জিত সিংহ, ও আবুলফজলের পুত্র আবদুর রহমানকে প্রেরণ করিলেন। নরসিংহ দেবের রাজধানী ভস্মসাৎ হয়, তদীয় রাজ্য সাম্রাজ্যভুক্ত হয়, এবং তদীয় আত্মীয় বন্ধুবর্গ সকলেই বিনাশ প্রাপ্ত

হয়। কেবল স্বয়ং ছদ্মবেশে নানা দেশে পর্য্যটন করিয়া প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। পক্ষান্তরে আবুলফজলের পুত্র ভ্রাতা, সহচর, বন্ধুবান্ধব সকলের প্রতিই সম্রাট সাতিশয় অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। এবং আসদবেগকে উচ্চপদ প্রদান করেন।

দেবোপাখ্যান।

(গ্রীস ও ভারতবর্ষ।)

সপ্তম প্রস্তাব।

ইন্দ্রাদি দেবগণ।

ইন্দ্র দেবরাজ। সূর্য্য, সোম, যম, কালাদি দেবগণ তাঁহার অধীন। বৈদিক ভারতে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদিদেব। মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা প্রভৃতি যেমন সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা বলিয়া বর্ণিত, ইন্দ্রও তাই। দেবরাজ্যে শান্তিরক্ষার্থ তাঁহাকে সর্ব্বদা পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। অসুরদিগের উপদ্রব নিবারণার্থ সর্ব্বদাই তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রধারী থাকিতে হইয়াছে। আবার যখন সমরাবসানে শান্তিসুখে বিচার করিতে বসিয়াছেন, তখন তিনি মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম। বিচারকার্য্য সমাধা হইলে, শচীসহ নন্দনকাননে অবস্থান করিয়া সুখে কালাতিপাত করিয়াছেন। ইন্দ্রের এই প্রকৃতিতে গম্ভীরতা ও উচ্চতা এত ছিল যে, গ্রীসের সর্ব্ব প্রধান দেব যিয়সও তাঁহার তুল্য নহেন।

যখন ভারতে পুরাণের আবির্ভাব, ইন্দ্রকে সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া তিন শ্রেষ্ঠ শক্তির অধীন হইতে হইল। ত্রিমূর্ত্তির আবির্ভাবে তাঁহাকে অধীন হইতে হইল। কেবল দেবত্রয় নয়, তাঁহাদের সহধর্ম্মিণীগণও উপাসনা ব্যতীত ইন্দ্রের প্রতি প্রসন্না হইতেন না। একবার ইন্দ্র দেবাদিদেব মহাদেবের মায়ায় একস্থানে তাঁহার নিজের ন্যায় পাঁচজন ইন্দ্র দেখিতে পাইলেন, তাহাতে তাঁহার অভিমান একেবারে কমিয়া গেল; সম্পূর্ণরূপে মহাদেবের অধীন ও আজ্ঞাবহ হইলেন। তাঁহার আদিদেবত্ব রহিল না। কিন্তু তথাপি উপাসনার সময় ভক্তের চক্ষে তিনি ঈশ্বর এবং

"বজ্রস্য ভর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা
বৃত্রস্য হন্তা নমুচের্নিহন্তা,
কৃষ্ণে বসানো বসনে মহাত্মা
সত্যানৃতে যো বিবিনক্তি লোকে।
যো বাজিনং গর্ভমপাং পুরাণং
বৈশ্বানরংবাহনমভ্যুপৈতি,

নমোঽস্তু তস্মৈ জগদীশ্বরায়
লোকত্রয়েশায় পুরন্দরায়।" *

ইত্যাদি বাক্যে স্তূয়মান।

পুরাণ-বর্ণিত ইন্দ্রের শক্তি বিস্তর খর্ব্ব হইলেও তাঁহার সহিত গ্রীকদেবগণমধ্যে মাত্র যিয়স্ই তুলনেয়। উভয়ের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্যও আছে। ইন্দ্র দেবরাজ, যিয়স্ও দেবরাজ। ইন্দ্র বজ্রধর, যিয়স্ও বজ্রধর। দেবশত্রু-দানবদমনে মহর্ষি দধীচির পবিত্র অস্থি, দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা কর্তৃক বজ্রনামক অমোঘাস্ত্রে পরিণত হইল; সেই অসাধারণ দৈব অস্ত্রের অপ্রমেয় তেজে দানবকুল নির্ম্মূল হইল; দানবর্ষভ বৃত্র সবংশে নিহত হইল, দেবগণ নির্ভীকচিত্তে স্বর্গে অবস্থান করিতে লাগিলেন। হিফেষ্টস্ আপন পিতা যিয়সের জন্য অশনিনামক অমোঘাস্ত্র প্রস্তুত করিলেন, সেই অব্যর্থ অস্ত্রে টাইটানকুল নির্ম্মূল হইল, দেবগণ নিশ্চিন্ত হইলেন।

দেবরাজের অনুগ্রহ না হইলে বৃষ্টি হয় না, মেঘ সকল তাঁহার আদেশব্যতীত স্থান হইতে নড়িতেও পারে না। পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তি কাজে কাজেই ইন্দ্রের উপর নির্ভর করে; এই গুণে ইন্দ্র এপোলো বা সূর্য্যের অনুরূপ। যিয়সশীর্ষও নীরদাবৃত।

আকাশে নানাবর্ণে রঞ্জিত বক্রাবৃত যে ধনু মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই ইন্দ্রধনু; যে ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা শরসন্ধানজনিত শিঞ্জী-নিনাদ। ইন্দ্রের শাসনে ত্রিভুবন কম্পিত। এ সকল বিষয়ে ইন্দ্র যিয়সের অনুরূপ। আবার দুর্ব্বলতায়ও উভয়েই একরূপ। কবি, কল্পনার বাছা বাছা ফুল সকল লইয়া যে মনোহারিণী অমরাবতী ও অনুপমেয় নন্দনকানন রচনা করিয়াছেন; তাহাতে উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা প্রভৃতির অভাব নাই। অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, বিদ্যুৎপর্ণা, তিলোত্তমা, অরুণা, রক্ষিতা, রম্ভা, মনোরমা, সুকেশিনী প্রভৃতি অপ্সরাগণ পুরী আলোকিত করিয়া থাকে। স্বয়ং কন্দর্প, প্রিয়সখা বসন্তসহ, চিরকাল নন্দনে বিরাজমান। তাহার পরও শত অহল্যা ইন্দ্রের সেবায় নিযুক্ত! এ বিষয়ে যিয়স্ হইতে ইন্দ্র ন্যূন নহেন। তবে বিশেষ এই যে, যিয়স্ দেবাদিদেব, দেবমানবের আদর্শ হইয়া দুর্ব্বল-প্রকৃতি। ইন্দ্র, শ্রেষ্ঠদেবগণের অধীনস্থ বিলাসলোলুপ শাসনকর্ত্তা।

সূর্য্য উদয় হইয়া গ্রীস ও ভারতবর্ষ উভয় দেশেই নিরপেক্ষভাবে আলোক বিতরণ করেন, সুতরাং সূর্য্যদেব দুই দেশেই প্রায় একপ্রকৃতিবিশিষ্ট। উভয়েরই প্রচণ্ড প্রতাপ, দুর্দ্ধর্ষ শক্তি, ও উদ্ধত স্বভাব কবিগণ উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। আকৃতি ও প্রকৃতি উভয়েরই একরূপ। তবে বিশেষ এই যে লেটোনা-নন্দন কিঞ্চিৎ স্থূলদর্শী, আদিত্য সূক্ষ্মদর্শী। যিনি

* মহাভারত, আদিপর্ব্ব, তৃতীয় অধ্যায়, ১৪৮ এবং ১৪৯ শ্লোক।

বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, শিল্পে বিশ্বকর্ম্মা, কলহপ্রিয়তায় নারদ, প্রতারণায় এবং চৌর্য্যে হার্ম্মেস্, সেই নিরুপম গ্রীকদেব এপোলোকে পদে পদে প্রতারিত করিল, এপোলো বুঝিলেন না। কিন্তু সহস্রলোচন সূর্য্যের নিকট এ প্রকার অবস্থা গোপন থাকা অসম্ভব।

আদিত্যের নামান্তর ও রূপান্তর বশতঃ জন্মবৃত্তান্ত নানা প্রকার। তাঁহাকে অদিতির পুত্র বলিয়া উপাসনা করাই প্রচলিত রীতি। বিণতাসুত অরুণও সূর্য্য। আবার বৃহদ্ভানু, চক্ষু, আত্মা, বিভাবসু, সবিতা, ঋচীক, অর্ক, ভানু,আশাবহ,রবি, মহ্য ; অথবা তাঁহাদের নামান্তর, দিক, বাত, অর্ক, প্রচেতা, অগ্নি, বহ্ণি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র, প্রজাপতি ও বৃহস্পতি. দিবের এই এগার পুত্রের প্রত্যেককেই সূর্য্য দেব বলিয়া বোধ হয়। মহ্যপুত্র দেবভ্রাট, তৎপুত্র সুভ্রাট্। সুভ্রাটের তিন পুত্র ;—দশজ্যোতি (অগ্নি), শতজ্যোতি (চন্দ্র) এবং সহস্রজ্যোতি (সূর্য্য) *। চন্দ্র ও সূর্য্য নামে দুইটি দানবও ছিল। এইরূপ এক প্রকার ও একার্থক নাম-বাহুল্যে সূর্য্যদেব-প্রকৃতি কিঞ্চিৎ জটিল হইয়া উঠিয়াছে।

আলোচ্য বিষয় দেখা যাউক। আদিত্য ও এপোলো উভয়েই রূপবান্ ও গুণবান্। উভয়েতেই উৎপাদিকা শক্তি, সুতরাং কুমারী কুন্তী কর্ণের জননী এবং সূর্য্যের প্রণয়িনী ; আর পরী করোনিস্ এপোলোর প্রণয়িনী। কুন্তী তাহার পর ইন্দ্রাদি দেবগণকে স্বামীরূপে গ্রহণ করেন, করোনিস্ এপোলোকে অবজ্ঞা করিয়া অন্য একজনের প্রণয়পঙ্কে নিমজ্জিত হন। বিশেষ এই যে হিন্দু কবি সাবধানতার সহিত স্বামীর অনুমতি ও দৈব ঘটনার বর্ণনা করিয়া মানবীর সতী নাম স্থির রাখিয়াছেন।

সূর্য্য উদয় হইয়া দ্রুতগতিতে অন্তরীক্ষে পরিভ্রমণ করেন, প্রসিদ্ধ পক্ষধারী হরিত নামক অশ্ব তাঁহার শকট বহন করিয়া লইয়া যায়। উষস্ তাঁহার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেয়। এপোলোও উদয় হইয়া রথারোহণে আকাশ-কক্ষে ভ্রমণ করেন, তাঁহার কন্যা ইয়স্ তাঁহার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেয়। সূর্য্য সহোদরা উষস্, এপোলো দুহিতা ইয়স্ বা অরোরা এক প্রকৃতি বিশিষ্ট। আবার ইয়সের সহিত তপন তনয়া তপতীরও বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। উভয়েই প্রভাতদেবী, পরমসুন্দরী। উভয়েরই অঙ্গুলি সকল গোলাপবৎ রক্তিমাভ ও মনোহর।

সূর্য্যপত্নী ত্বষ্ট্রা অন্তরীক্ষে অশ্বিনী কুমারদ্বয় প্রসব করেন, কিন্তু গ্রীসের অশ্বিনী-কুমার ক্যাষ্টর ওপোলকস্ যিয়সের সন্তান।

এক সময়ে সূর্য্যও সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-

* বিজ্ঞান জ্ঞান দেখ। মহাভারতের পূর্ব্বে সূর্য্যের তেজ, অগ্নিহইতে শতগুণ নির্ণয় হইয়াছিল। এ তত্ত্ব এত দিনে ইয়োরোপে প্রকাশ হইয়াছে।

কর্ত্তা রূপে উপাসনা প্রাপ্ত হইতেন; ঋগ্বেদে এবং গায়ত্রীতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। গ্রীকদিগের সূর্য্য এত ক্ষমতাশালী না হইলেও অনেক গুণ বিশিষ্ট। সঙ্গীতশাস্ত্র, কাব্যশাস্ত্র, কবিত্ব, এবং দেবত্ব তাঁহারই হস্তে। হার্ম্মেসের নিকট হইতে যে বীণা প্রাপ্ত হন, তাহাই সঙ্গীত ও কবিত্বের মূল।

দেখা গেল এপোলো ও আদিত্য এতদুভয়ের কার্য্যতায় পার্থক্য থাকিলেও কাহাকেও বড় অধিক প্রশংসা করিয়া প্রাধান্য দেওয়া যায় না।

এক্ষণে ডায়েনা ও চন্দ্র চরিত্র আলোচনার বিষয়। কিন্তু ডায়েনা দেবী, চন্দ্র দেব। ডায়েনা দেবসেনাপতি কুমারের ন্যায় চিরকুমারী, চন্দ্র কলঙ্কী। হিন্দু কবি অন্যান্য গ্রহ পৃথিবীর অধিষ্ঠাতৃদেববৎ চন্দ্রকেও পুরুষ কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহার বক্ষঃস্থ কলঙ্ক, সকলকে বুঝাইতে, গুরুপত্নী তারার অবতারণা করিয়াছেন। চন্দ্র সভায় তারার অভাব নাই, আবার চন্দ্রেরও কলঙ্ক আছে, কবি এ সুযোগ ছাড়িতে পারেন নাই, কলঙ্ক ব্যাখ্যা করিয়া শশাঙ্ককে কলঙ্কিত করিলেন। তাঁহার মৃগাঙ্ক, শশাঙ্ক, শশধর, শশী প্রভৃতি নামে যে দোষ গোপন করিয়াছিল, তাহা প্রকাশ পাইল।

গ্রীক কবি দেখিলেন সুন্দরীর বদনসুধাকর ব্যতীত পূর্ণসুধাকরসহ উপমেয় বস্তু জগতে আর নাই। সুন্দরীর স্বভাবে মৃদুতা, সরলতা ও মধুরতা বিরাজ করে; সুধাকরের কৌমুদীতেও মৃদুতা, শৈত্য ও সুখসেব্যতা প্রচুর আছে। সুন্দরীর সরলতা-পূর্ণ কোমল দৃষ্টিতে শরীর শীতল করে, চন্দ্রমার কোমল কৌমুদীতে তাপিত চিত্তও শান্তিলাভ করে। সুতরাং চন্দ্রমা অবশ্যই দেবী।

দেবী অথচ পবিত্রা। এমন নির্ম্মল, এমন সরল বস্তুতে পবিত্রতা না থাকিলে জগতে আর পবিত্রতা কোথায় থাকিবে? সুতরাং ডায়েনা কুমারী। নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করিলে এই মনোহারিণী কল্পনায় গ্রীক কবিরই প্রশংসা করিতে হইবে। পূর্ণশশধরে অন্তঃকরণে যে পবিত্রতা জন্মায়, বনদেবী স্বরূপা, মেষপালিকা, অথবা শবরী-রূপিণী ডায়েনা দেবীর আকৃতি ও প্রকৃতিতেও তাহাই করে। আর্টিমিস্ গ্রীসে পবিত্রতার আদর্শ।

ভারতকবি বর্ণিত বিরহবিধুর নায়ক এবং প্রোষিতভর্ত্তিকা নায়িকা মদনসহচর ইন্দুকিরণ অসহ্য বিবেচনা করিয়া অন্ধকারহৃদয়ে অন্ধকারে বসিয়া থাকেন। গ্রীককবিবর্ণিত নিরাশপ্রণয় যুবকযুবতী অবিচলিত পাষাণহৃদয়া ডায়েনা দেবীর শরণাপন্ন হন। কিন্তু যাঁহাদের আশা আছে, তাঁহারা ডায়েনা প্রকৃতির অজেয়ভাব দেখিয়া ভীত হন এবং দূরে অবস্থান করেন।

ডায়েনা-প্রকৃতি অজেয়, সুতরাং আর্টিমিস্ স্ত্রীলোক হইয়াও পুরুষাকার-বিশিষ্ট। শশী পুরুষ, কিন্তু এমন দুর্ব্বল ও স্ত্রী প্রকৃতি যে, বিদ্যাবুদ্ধি গৌরব থাকা সত্ত্বেও

স্ত্রী হইবার উপযুক্ত। ডায়েনা এপোলোর সহোদরা। যেমন ক্ষিরাব্ধিতনয়া লক্ষ্মী এবং চন্দ্র উভয়েই একস্থান হইতে উৎপন্ন আর্টিমিস্ ও এপোলনও তদ্রূপ। আর্টিমিসে ও চন্দ্রে বিস্তর সুন্দরতা আছে। কিন্তু প্রথমোক্তে পবিত্রতা অবিকৃত থাকায় এস্থলে গ্রীকদেবীরই শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিতরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে।

অতঃপর বরুণের সহিত নেপ্‌চুনের, পবনের সহিত ইয়োলসের, যমের সহিত প্লুটোর এবং অগ্নির সহিত ভল্‌কানের তুলনা করা যাইতে পারে। কিন্তু গ্রীক নাম সকল বাঙ্গালায় এমনই নীরস শুনায় যে, যাঁহাদের এ সমস্ত বিষয় আলোচনায় কৌতূহল আছে, তাঁহারাও মনোযোগ করিয়া পড়িতে পারেন না। দীর্ঘকাল হইল একরূপ প্রস্তাব পাঠে পাঠকগণও ধৈর্য্য অব্যাহত রাখিতে কষ্ট বোধ করেন। অপিচ উল্লিখিত দেবগণ মধ্যে কোন কোনটির প্রকৃতি স্থানান্তরে অন্য দেবসহ উপমিত হওয়ায় পুনরুক্তি দোষও হইতে পারে। অতএব ঐ কয়েকটি তুলনা পাঠকগণ আপনা আপনি করিয়া লইবেন বলিয়া লিখিতে বিরত থাকিলাম। পরবর্ত্তী প্রস্তাবে দুই দেশের অতি সুদৃশ্য, দুই একটি চিত্র প্রদর্শন করিয়া,নবম প্রস্তাবে সাধারণ সমালোচনা এবং দশম প্রস্তাবে উপসংহারভাগ লিখিতে বাসনা রহিল।

নর্ম্মদার প্রতি

নন্দন সৌরভময়ী নিদাঘ-যামিনী ;
শান্ত বিশ্ব চরাচর
পরিক্লান্ত কলেবর,
অনন্ত নিলীমা মাখা তারাময় নীলাম্বর,
মরি কি যামিনী শ্যামা কমনীয় মনোহর ;

২

নীরব প্রকৃতি-বালা, নীরব যামিনী,
নীরবে গগনতলে
শশধর ঝলমলে,
শশাঙ্ক চুম্বনে মহী মৃদু হেঁসে পাগলিনী,
পরিয়া শ্যামল-কণ্ঠে সুবিমল কৌমুদিনী।

সচন্দ্র যামিনী বসি ; নর্ম্মদা বেলায়
নিরখি নয়ন ভরে
উছলি তরঙ্গ-থরে,
কল কল মৃদু স্বনে নীরময়ী তরঙ্গিণী
বহিতেছে অবিরাম নীল-অম্বু-উন্মেশিনী

৪

চুম্বিয়া দোলন চম্পা অনিল সঞ্চরে,
বেল-যুই-পরিমল
করে প্রাণ সুশীতল,
সমীরণে তরুশিরে মর মরে নব দল,
উন্মাদিনী তরঙ্গিণী সিহরিছে অবিরল।

৫

প্রস্ফুটিত চন্দ্রকরে কল-নিনাদিনী,
নর্ম্মদার নীল জলে
চন্দ্র কৌমুদিনী জ্বলে ;
নীলাম্বুময়ীর কোলে শশ শত শশধর,
প্রেমে তরলিত হয়ে, চঞ্চলিছে নিরন্তর।

৬

চঞ্চলা নর্ম্মদা অয়ি ভুবন সুন্দরি !
সলিল অলকে মরি,
মালতীর মালা পরি,
মৃদুল করুণ গীতে বিশ্ব বিমোহিত করি,
কোথা যাও নেচে নেচে তরঙ্গিণী-কুলেশ্বরি,

৭

এমন অমৃতমুখী মধুরা নিশীথে,
বিনাইয়া মৃদু স্বরে,
কাঁপাইয়া নীলাম্বরে,
কেন আজি কল্লোলিনী কাঁদিতেছে অবিরাম,
কোন দুঃখে বল নদি, বিদরে তোমার প্রাণ।

৮

হেরিয়া কি ভারতের মলিন বদন,
তরঙ্গের রব সনে,
মিলায়ে, ব্যথিত মনে,
অভাগিনী ভারতের অনন্ত বিষাদ-গান,
সাগর-সদনে নদি, বহিতেছে অবিরাম।

৯

সেই দিন সেই দিন, আছে কি স্মরণ,
যেই দিন তুমি নদি,
কলনাদে নিরবধি,
ভারতের যশোগীতি মনের অনন্ত সুখে,
সাগর-সদনে মরি বহিলে সহস্র মুখে ;—

১০

সেই দিন কোথা আজি বল তরঙ্গিণী ;
সেই তুমি প্রেম আশে,
বও সাগরের পাশে ;
সেই অই পূর্ণ শশী, প্রকৃতির নীল ভালে,
সেই এই নিশীথিনী খচিত কুসুমজালে ;

১১

শোভার ভারত সেই নীলাম্বু-চুম্বিতা,
সেই ফুলময়ী উষা,
কুন্তলে কুসুম ভূষা,
সেই কোকিলের কণ্ঠে কুহু-স্বর মধুময়,
সেই অরবিন্দ-বনে গুঞ্জরে ভ্রমরীচয় ;

১২

সুখের শরদে সেই ভারত মন্দিরে,
জুড়াতে তাপিত প্রাণ,
ত্যজিয়া কৈলাস ধাম,
আবির্ভূতা হয় মাতা মৃত্যুঞ্জয়-বিমোহিনী
অনন্ত-পাবনী উমা অন্নপূর্ণা নিস্তারিণী ;

১৩

এই সেই আর্য্য ভূমি, শোভার নিলয়,
সেই নদী তরু জল
বিদ্যমান অবিরল,
সেই ভারতের কোলে চন্দ্র তমস্বিনী লীন ;
সব বিদ্যমান কিন্তু কোথা আজি সেইদিন।

১৪

প্রবাহিত সময়ের তরঙ্গিণী-তলে,
অমূল্য রত্নের প্রায়,
সকলি রয়েছে হায়।
কালের অনন্ত স্রোত তাহার উপরে বয় ;
যাবে দিন, যাবে যুগ, কখন কি হবে লয় ?

১৫

বল তুমি তরঙ্গিণি, বল কত দিনে,—
কত দিনে পুনরায়,
সেই রত্ন-রাশি হায় !
ডুবিয়া কালের অই অনন্ত নদীর জলে,
ভারত সন্তান কবে উত্তোলিবে কুতুহলে।

১৬

এক দিন দেখিয়াছ তুমি তরঙ্গিণি,
ভারত সন্তানগণে,
পশিতে দুর্ব্বার রণে,
বীরমদে ক্ষত্র-তেজে টলমলি ধরাতল,
বিজয় আরাবে পুনঃ বিদারিতে অভস্তল।

১৭

একদিন নদি, তব অই শ্যাম তটে,
চমকিয়া ত্রিভুবন,
ঘটিল ভীষণ রণ,
এক দিন তরঙ্গিণি, তোমার সুনীল জল
যবন-শোণিতে হল রক্ত-বর্ণ অবিরল।

১৮

এক দিন তুমি সেই অচল-নন্দিনি,
গরজি গম্ভীর স্বনে,
উৎসাহ-পূর্ণিত মনে,
রক্ত কলঙ্কিত অই তোমার বিনোদ বেলা
প্রক্ষালিলে জল দিয়ে প্রসারি লহরীমালা।

(১৯)

প্রক্ষালিলে রক্তস্রোত, পুনঃ তব তীরে,
সেই শ্যাম সুকোমল
জনমিল দূর্ব্বাদল,
পুনঃ সেই বনলতা দুলিল তরুর গলে,
নাচিল দিনেশ-দ্যুতি তব নিরমল জলে।

২০

কিন্তু বল তরঙ্গিণি, স্মৃতির প্রান্তরে,
কোটী যুগ তপস্যায়,
পারিবে কি কভু হায় !
প্রক্ষালিতে সেই রক্ত করি চির প্রক্ষালন?
পারিবেনা—পারিবেনা—বৃথা তব আকিঞ্চন।

২১

ফিরিবে কপাল কবে বল লো নর্ম্মদে,
ভারতের ভাগ্যে হায় !
বল কবে পুনরায়,
দাসীত্বের শত জ্বালা হবে চির বিমোচন,
হেরিব প্রফুল্ল কবে ভারতের সুবদন।

২২

সুখাইবে কবে মার নয়নের জল ?
কবে এই অনাথিনী,
হবে পুনঃ আহ্লাদিনী ?—
হবেনাকি কোন দিন? সৌভাগ্যের শশধর,
অত্যন্ত-সাগর-গর্ভে ডুবিল কি নিরন্তর ?

২৩

যাও তুমি দ্রুতপদে সাগর-রঙ্গিণি ;
নীল জল প্রসারিয়ে,
নীলাম্বু মন্দিরে গিয়ে,
নীলাম্বু গরভে যথা রত্নরাজি অগণন।
ভারতের সুখ-শশী কর তথা অন্বেষণ।

২৪

ত্যজিয়া ভারত-ভূমি অনন্ত বিরাগে,
অসীম পয়োধি তলে,
কনক রাজীব দলে
রচিত বিনোদাসনে, মনোদুঃখে বিষাদিনী,
ভারতের লক্ষ্মী আজি বিরাজেন একাকিনী।

২৫

সাগর গরভে বুঝি অয়ি প্রবাহিনী,
পদতলে কমলার,
চিরদুঃখে অনিবার,
গড়াইছে ভারতের সৌভাগ্যের শশধর,
কিরণ-বিহীন বিম্ব ম্লান ভাতি কলেবর।

২৬

যাও লো নর্ম্মদে সেই ইন্দিরা-মন্দিরে ;
ইন্দিরা-চরণ ধরি,
সহস্র মিনতি করি,
বলিও রাজীব-পদে মৃদু স্বরে অবিরত,
অনাথিনী ভারতের দুঃখের কাহিনী যত।

২৭

কি বলিব আদি হতে তুমি তরঙ্গিণি,
আছ তুমি চির দিন
ভারতের বক্ষে লীন,
রহিবে অনন্ত দিন তুমি নদী পুনর্ব্বার,
ভারতের কণ্ঠে যেন নীলমণি-ময় হার।

২৮

পুরাকালে তুমি সেই দেখেছ রঙ্গিণি,
ভারতের সিংহাসনে,
বসিতে রাজেন্দ্রগণে ;
দেখিলে আবার সেই হ'ল ভস্মে পরিণত,
তব পুণ্যময় তীরে রাজ ইন্দ্র শত শত।

২৯

আবার দেখিলে তুমি, কালের প্রভাবে,
না জানি কি পাপ ফলে,
কোন কুগ্রহের বলে,
ভারতের রঙ্গ-ভূমে যবনের অভিনয় ;
আবার কালের করে ফুরাইল সমুদয়।

৩০

দেখ আজি পুনরায় দেখ তরঙ্গিণি,
সেই সিংহাসনপরে
কোন জাতি রাজ্য করে,
কাঙ্গালিনী বেশে আজি কাহার চরণতলে
লুটায় ভারত ভূমি, ভাসিয়া নয়ন-জলে।

৩১

নিরখিলে যুগান্তর, দেখিলে সকল ;
এই আর্য্য সিংহাসন,
আর্য্য নরপতিগণ,
উজ্জ্বলিবে কবে পুনঃ বল অয়ি তরঙ্গিণি !
আশার আকাশে আর ঝলে কিলো সৌ-
দামিনী ?

শ্রীহ:—

ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন। *

ভারতবর্ষ একসময়ে কোন বিষয়েই নির্ধন ছিল না। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি অনেক বিষয়েই ভারতের জ্ঞান, ভারতের গাম্ভীর্য্য, এক দিন পৃথিবীব্যাপ্ত হইয়া ভারতীয় মহিমাকে শতগুণে মহীয়ান্ করিয়া তুলিয়াছিল। যে দিন আর্য্য মহাপুরুষগণ মানবমণ্ডলীর সূতিগৃহ মধ্য আসিয়ার বিস্তৃত ক্ষেত্রহইতে হলস্কন্ধে গোধনসঙ্গে হিন্দুকুশ পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম পূর্ব্বক পঞ্চনদে প্রথম পদার্পণ করেন, সেই দিন হইতেই ভারতীয় মহিমার সূত্রপাত হয়, সেই দিন হইতেই ভারতভূমি বিদ্যা ও সভ্যতার জননী বলিয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসন পরিগ্রহ করে। যে উজ্জয়িনী-জনিতা কবিতাবল্লীর মধুময় কুসুম বিকসিত হইয়া অদ্যাপি পৃথিবী আমোদিত করিতেছে, সেই দিনেই তাহার বীজ ভারতভূমিতে রোপিত হয়; যে প্রভাববতী চিকিৎসা বিদ্যা অদ্যাপি রোগার্ত্ত জনগণের প্রতীকার বিধান করিয়া আসিতেছে, সেই দিনেই তাহা ভারতহৃদয়ে স্থান পরিগ্রহ করে; যে প্রচণ্ড তেজ হলদিঘাট প্রভৃতি রণক্ষেত্রে বিকশিত হইয়া অতীত-সাক্ষী ইতিহাসের বরণীয় হইয়া রহিয়াছে; এবং অধিক দিন অতীত হয় নাই, যাহার একটি স্ফুলিঙ্গ চিনিয়ানওয়ালায় অতুল পরাক্রম শিখ-জাতির হৃদয়-চুল্লীহইতে উদ্গত হইয়া দুর্ব্বার ব্রিটিস তেজকেও বিধ্বস্ত করিয়াছে, যাহার নিমিত্ত পবিত্র ইতিহাসের আদরের ধন হলদিঘাট ও চিনিয়ানওয়ালা গ্রীসের থর্ম্মাপলী ও ম্যারাথন্ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইতেছে, সেই দিনেই তাহা ভারতহৃদয়ে অনুপ্রবেশিত হয়। আর্য্যগণ এই পবিত্র দিনে, পবিত্র সময়ে ভারতে পদার্পণ করিয়া অলৌকিক বুদ্ধিবলে, অলৌকিক পাণ্ডিত্যবলে সভ্যতা প্রসারিত করেন, তাঁহাদিগের নিমিত্ত ভারত অচিরাৎ সুসভ্য হয়, এবং তাঁহাদিগের নিমিত্ত ভারতীয় মহিমা অতীতসাক্ষী ইতিহাসের পূজনীয় হইয়া উঠে।

এক্ষণে ভারতের সে মহত্ত্ব বিগত হইয়াছে, সে জ্ঞান, সে ধর্ম্ম, সে নীতি, সে সদাচার, সে সভ্যতা, সে উদারতা অনন্ত সময়ের সহিত বিলীন হইয়াছে। যে পঞ্চ-

* ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ২৪এ জুন শনিবার কলিকাতাস্থ "যুব-জন-সম্মিলনী" নামক সভার বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত "ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন" নামক প্রবন্ধ।

নদবাহিনী সিন্ধু সরস্বতীর তীরে বসিয়া আর্য্যমহর্ষিগণ জলদগম্ভীর মধুরস্বরে সাম গান করিতেন, সে সিন্ধু সরস্বতী আজও পঞ্চনদ বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, যে অভ্রংলিহ হিমাদ্রির নির্জ্জন গহ্বরে সমাসীন হইয়া যোগরত আর্য্যতাপসগণ সৃষ্টির প্রাণরূপিণী অনন্ত-শক্তির ধ্যানে নিবিষ্টচিত্ত থাকিতেন, সে গিরিশ্রেষ্ঠ গিরিগহ্বর আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে, যে হলদিঘাটে প্রচণ্ড আর্য্যতেজ, আর্য্যসাহস বিকশিত হইয়া শত্রুর মর্ম্মভেদ করিয়াছিল, সে হলদিঘাট আজও ভারতমানচিত্রে শোভা পাইতেছে। যে পশ্চিম শৈলের শিখরে দণ্ডায়মান হইয়া অদীনপরাক্রম শিবজী বিজয়ভেরী বিজয়দুন্দুভির গভীর নির্ঘোষে মেদিনী বিকম্পিত করিয়াছিলেন, সে পশ্চিম শৈল আজও বিস্তৃত রহিয়াছে। কিন্তু ভারতের সে জ্ঞান ধর্ম্ম নাই, সে জীবনী শক্তি নাই, সে একতা নাই, সে আত্মত্যাগ নাই। প্রাচীন ভারতের সভ্যতার স্রষ্টা আর্য্য মহর্ষিগণের বিলাসভূমি গিরিকন্দর অবিকৃত রহিয়াছে, পুণ্যসলিলা সিন্ধুসরস্বতী যথাগতি প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু অদ্য ভারত শ্মশান। ভারতের সে গৌরব-সূর্য্য এক্ষণে অনন্ত জলধিতলে নিমগ্ন হইয়াছে। সে সাহস, সে বীর্য্যবত্তা, সে রণোন্মাদ, সে একতা, সে আত্মত্যাগ এক্ষণে কেবল আভিধানিক শব্দে পরিণত হইয়াছে। অদ্যতন ভারত এইরূপ দুরবস্থায় পতিত।

অদ্যতন ভারতীয় সন্তানগণ এইরূপ নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রিয় ও নিস্পৃহ হইয়া জড়তায় সমাচ্ছন্ন। যে ভারত এক সময়ে জগতের শিক্ষা ভূমি ছিল, সেই ভারত এক্ষণে একটি সামান্য বিষয়ের জন্য অন্যের দ্বারে লালায়িত! এইরূপ, এক সময়ে ভিক্ষাদাতা অন্য সময়ে ভিক্ষাপ্রার্থী, এক সময়ে লোকারণ্যের হৃদয়োদ্দীপক কোলাহলপূর্ণ, অন্য সময়ে বিকট শ্মশানের বিকট মূর্ত্তির প্রতিরূপ ভারতের সমুদয় অবস্থা আনুপূর্ব্বিক জানিবার উপায় নাই। ভারতের একখানি প্রকৃত ইতিহাস অদ্যাপি লোকসমাজে প্রচারিত থাকিয়া এইরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে আলোকবর্ত্তী হয় নাই। ভারতের ইতিহাসের অভাব দেখিয়া এক্ষণে অনেকে ভারতীয় ব্যক্তিদিগকে কুহকিনী কল্পনার কুপোষ্য বলিয়া ধিক্কার দিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মতে, ভারতের কেহ ইতিহাস লিখিতে জানিত না, ভারতে ইতিহাসের ন্যায় প্রকৃত ঘটনাপূর্ণ কোন বিষয় কোন সময়ে বিরচিত হয় নাই, সকলেই কেবল কল্পনার পরিচর্য্যায় নিয়োজিত থাকিয়া স্বীয় গ্রন্থ অমানুষিক অদ্ভুত ঘটনায় পরিপূর্ণ করিত। যে ভারতীয় ব্যক্তিগণ এক সময়ে সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতিতে জগতের পূজনীয় ছিলেন, এক্ষণে তাঁহারাই অনৈতিহাসিক ও অসত্যবাদী বলিয়া সাধারণ্যে অপদস্থ হইতেছেন।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, আমাদি-

গর শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্তবাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন সম্বন্ধে একটি মনোহর মৌখিক বক্তৃতা করিয়া ভারতীয় ব্যক্তিদিগকে এই অপমানের হস্তহইতে বিমুক্ত করিতে যথোচিত প্রয়াস পাইয়াছেন। সুরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতাটি ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা উহা পড়িয়া প্রীত হইয়াছি। বক্তৃতার প্রতি পৃষ্ঠায় প্রতি পংক্তিতে বক্তার সত্যপ্রিয়তা,উদারভাব ও স্বদেশ-হিতৈষণা জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে।

সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যক্ষেত্রের মধ্যে কেবল রাজতরঙ্গিণী নামক একখানি কাশ্মীর দেশের ইতিহাস বর্ত্তমান রহিয়াছে। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কহ্লন পণ্ডিত এই ইতিহাস আরম্ভ করেন। পরে অপরাপর লেখককর্ত্তৃক ইহার পরিসমাপ্তি হয়। এই কাশ্মীর ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীই সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডারের অদ্বিতীয় ইতিহাস। তবে কি সমগ্র ভারতবর্ষে ইতিহাসস্থানীয় আর কিছু লিখিত হয় নাই? আর্য্যঐতিহাসিকের সত্যপ্রিয়তা ও কর্ত্তব্যজ্ঞান কি কেবল এক কাশ্মীর দেশে সমুদিত হইয়া কাশ্মীরেই বিলীন হইয়াছে? সুরেন্দ্র বাবু বিশিষ্ট সমীচীনতাসহকারে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। তাঁহার মতে কল্পনাসহচরী কবিতার ন্যায় প্রকৃত ঘটনাপূর্ণ ইতিহাস-স্থানীয় বিষয় লিখিবার পদ্ধতিও প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল। এই লিখিত বিষয়গুলি কালক্রমে বিপ্লবপরম্পরায় অথবা কীট ও ঋতুবিশেষের সাংঘাতিক আক্রমণে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

সুরেন্দ্র বাবু এই মতের সমর্থন জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন:—আকবরের সুপ্রসিদ্ধ মন্ত্রী আবুলফাজেল প্রাচীন ভারতের একখানি ইতিহাস রচনা করেন। মস্যুর আবে রেমসেট্ এ সম্বন্ধে এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, আবুল ফাজেল কোথাহইতে স্বপ্রণীত ইতিহাসের বিষয় সংগ্রহ করিলেন? ইহা কি তাঁহার মস্তিষ্কের উদ্ভাবনা? না ইতিহাসস্থানীয় পূর্ব্ববর্ত্তী বিষয়পরম্পরার সংগ্রহ? যদি আবুল ফাজেলের ইতিহাস প্রকৃত ইতিহাসপদের বাচ্য হয়; তাহা হইলে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, আবুল ফাজেল পূর্ব্বতন হিন্দু ঐতিহাসিকদিগের নিকট হইতে স্বীয় ইতিহাসের বিষয়গুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বতন ভারতে ইতিহাসলেখার পদ্ধতি প্রচারিত না থাকিলে আবুল ফাজেলের ইতিহাস প্রণীত হইত না।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে জনৈক সুপ্রসিদ্ধ জৈনিক পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আগমন করেন। পরিব্রাজকের নাম হোয়েন্থ সাঙ্, ধর্ম্ম বৌদ্ধ। পবিত্র বৌদ্ধ তীর্থদর্শন, পবিত্র বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থের সংগ্রহ এবং পবিত্র সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন প্রভৃতিই তাঁহার ভারতবর্ষে আসিবার প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত প্রায় পঞ্চদশ বর্ষ ভারতবর্ষে অতিবাহিত

করেন। এই বৌদ্ধ পরিব্রাজক স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া ভবিষ্য বংশীয়দিগের অতীতজ্ঞানের পথ অনেকাংশে পরিষ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত ষ্টানিস্‌লেস্ জুলিয়ান কর্ত্তৃক ফরাসী ভাষায় অনুবাদিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। এই বিখ্যাত ভ্রমণকারীর বিখ্যাত ভ্রমণবৃত্তান্তে আমরা ভারতীয় ইতিহাসের নিদর্শন দেখিতে পাই। হোয়েন্থ্ সাঙ্ লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষে ব্যক্তি বিশেষের প্রতি কেবল দৈনন্দিন ঘটনা লিখিবার ভার সমর্পিত ছিল। এই দৈনিক বিবরণ নীলপীঠ নামে প্রসিদ্ধ। ঘটনাবলীর বিবরণ ইতিহাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং নীলপীঠ যে ইতিহাসের সম্মানিত পদে অধিরূঢ় হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। হোয়েন্থ্ সাঙ্ বর্ণিত নীলপীঠের বিবরণে আমরা স্পষ্ট জানিতে পারি, ভারতে ইতিহাস লেখার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, এবং ভারতীয় আর্য্যগণ কাব্য, দর্শন প্রভৃতির ন্যায় ইতিহাসও লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

তৃতীয় এবং সর্ব্বশেষ প্রমাণ, চাঁদ কবির "পৃথ্বীরায় রাঁসো"। যিনি দুর্দ্দান্ত যবনকবল হইতে জন্মভূমির রক্ষার জন্য পুণ্যক্ষেত্র ত্রিরোরিতে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন,যিনি অবিচলিত অধ্যবসায়, অবিচলিত উদারভাব ও অবিচলিত দেশহিতৈষিতার জন্য সহৃদয় সমাজে হৃদয়গত শ্রদ্ধা, হৃদয়গত প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি পাইতেছিলেন, যাঁহার নিমিত্ত পবিত্র ইতিহাসের আদরের ধন পাণীপথ অতুলপরাক্রম হিন্দুজাতির বিজয়ভেরীনিনাদিত সমরলীলাভূমি বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইতেছে, চাঁদ কবি সেই হিন্দুকুল-গৌরব, হিন্দুরাজচক্রবর্ত্তী পৃথ্বীরায়ের বিবরণ লইয়া "পৃথ্বীরায় রাঁসো" প্রণয়ন করিয়াছেন। চাঁদ, কবির মধ্যে পরিগণিত, এবং তৎপ্রণীত গ্রন্থও কাব্য বলিয়া পরিচিত। কিন্তু কাব্য বলিয়া চাঁদ কবির গ্রন্থ ইতিহাস-সম্বন্ধের বহিশ্চর নহে। ব্যক্তিবিশেষের অবদান-পরম্পরা যাহাতে ধারাবাহিকরূপে বর্ণিত থাকে, তাহা তদানীন্তন সময়-প্রসিদ্ধ ইতিহাসের অংশ বিশেষ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সুতরাং চাঁদ কবির "পৃথ্বীরায় রাঁসো" কাব্য হইলেও যে অপরিপক্ক ও অসম্পূর্ণ ইতিহাসের অঙ্গস্থানীয় তদ্বিষয়ে মত দ্বৈধ নাই। এই "পৃথ্বীরায় রাঁসো" এবং পূর্ব্বকথিত আবুল ফাজেলের ইতিহাস ও নীলপীঠের বর্ণনায় স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, প্রাচীন ভারতে ইতিহাস লেখার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, এবং ভারতীয় আর্য্যগণ কাব্য, দর্শন প্রভৃতির ন্যায় ইতিহাসও লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

এই ইতিহাস-স্থানীয় বিষয়গুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল, এক্ষণে তাহার অনেকাংশ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুরেন্দ্র বাবু বলেন, এই ইতিহাস-স্থানীয় ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিবার ভার রাজ্যশাসন সং-

ক্রান্ত কর্ম্মচারীর উপর ছিল এবং উক্ত লিখিত বিষয়গুলি রাজ্যশাসন সম্বন্ধীয় কাগজ পত্রের মধ্যে সংরক্ষিত থাকিত। সময়ের পরিবর্ত্তনশীল লহরীলীলার সহিত এক রাজ্যের পর অপর রাজ্য সংগঠিত হইয়াছে, এক আক্রমণের পর অন্য আক্রমণে সমুদয় বিষয় পর্য্যুদস্ত করিয়াছে, এইরূপ পুনঃ পুনঃ রাজবিপ্লবে ও বৈদেশিক জাতির পুনঃ পুনঃ আক্রমণে রাজ্যশাসন সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজ পত্রের সহিতও উক্ত লিখিত ঘটনাবলীও বিনষ্ট হইয়াছে।

যদি কেহ এই যুক্তিতে অনাস্থা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলেও বক্তার তাদৃশ ক্ষোভ নাই। বক্তা অন্যস্থলে গর্ব্বসহকারে বলিয়াছেন, আর্য্য পূর্ব্বপুরুষগণের লিখিত ইতিহাস না থাকিলেও তাঁহাদিগের সুনাম অপহৃত হইবে না। কারণ যে ইউরোপ এক্ষণে আপনাকে সভ্যতাভিমানী ও পাণ্ডিত্যাভিমানী বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচয় দিতেছে, কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে সেই ইউরোপে ইতিহাসের অবস্থা কিরূপ ছিল? যাহা প্রকৃত ইতিহাসপদে বাচ্য, তাহা কেবল গত শতাব্দী হইতে ইউরোপে পরিজ্ঞাত হইয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী বিপ্লবের সংঘাতে ইউরোপীয় জনগণের মানসিক বৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত হয়। এই উৎকর্ষ হইতেই ইউরোপে প্রকৃত ইতিহাসের উৎপত্তি। যখন অষ্টাদশ শতাব্দীর সভ্যতাস্পর্দ্ধী ইউরোপে ইতিহাস বাল্যলীলাতরঙ্গে দোলায়িত, তখন বহু প্রাচীন আর্য্যগণের তদ্বিষয়ক অনভিজ্ঞতা বড় অপমানের কথা নহে। স্বদেশবৎসল বক্তার তেজস্বিনী বক্তৃতা নিবদ্ধ এইরূপ সগর্ব্ব জ্বলন্ত বাক্য কি মনোহর! হৃদয়ের স্তরে স্তরে যাঁহার স্বদেশ বাৎসল্য, স্বদেশ মমতা লীলা করিয়া বেড়াইতেছে, তিনি বক্তার এইরূপ গর্ব্বোক্তিতে অবশ্যই আনন্দে উৎফুল্ল হইবেন।

আর্য্য-পূর্ব্ব-পুরুষগণ ঐতিহাসিক বলিয়া পরিচিত হউন বা না হউন, এক্ষণে তদ্বিষয়ের অনুশীলন অপেক্ষা আমাদিগের স্বদেশীয় ইতিহাসের অনুশীলনেরই অধিকতর আবশ্যকতা লক্ষিত হইতেছে। যদি কেহ স্বদেশের ব্যথায় ব্যথিত-চিত্ত হইয়া নির্জ্জন প্রদেশে নীরবে বসিয়া এক বিন্দু অশ্রুপাত করিয়া থাকেন, যদি কেহ অত্যাচার-পীড়িত জন্মভূমিকে সুখ শান্তির ক্রোড়ে লালিত করিতে কায়মনোবাক্যে যত্নপর হয়েন, যদি কেহ মহাজন মুখ বিনিঃসৃত "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" বাক্যের প্রকৃত মর্ম্মজ্ঞ হইয়া স্বদেশের হিতের তরে স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ করেন, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার স্বদেশের ইতিহাস অধ্যয়ন করা বিধেয়। স্বদেশের ইতিহাস না পড়িলে তিনি স্বদেশের বেদনার প্রকৃত কারণ অনুভব করিতে পারিবেন না। বেদনার প্রকৃত কারণ না বুঝিলে ঔষধপ্রয়োগ ব্যর্থ হইবে। স্বদেশের অতীত বিষয়ক জ্ঞান ও তাহার সহিত বর্ত্তমান বিষয়ক

জ্ঞানের সামঞ্জস্য বিধানই ঈদৃশ শোকসন্তাপ প্রতীকার করিবার অমোঘ উপায়। এই উপায়ের অনুসরণ করিতে হইলে স্বদেশীয় ইতিহাসের অনুশীলন অবশ্য কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়তঃ স্বদেশের ইতিহাস অধ্যয়নের অন্যরূপ সার্থকতা লক্ষিত হইয়া থাকে। এক্ষণে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের রাজনীতির সহিত স্বদেশের মঙ্গলামঙ্গল সম্পূর্ণরূপে অনুস্যূত রহিয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে স্বদেশের হিতকর ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হইলে প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ক্রমে ব্রিটিস রাজনীতির সহিত পরিচিত হওয়া বিধেয়। মনোযোগ সহকারে স্বদেশের ইতিহাস অধ্যয়ন না করিলে ব্রিটিস রাজনীতির কৌশল অবগত হইবার সম্ভাবনা নাই।

স্বদেশের ইতিহাস অধ্যয়ন কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু যে ইতিহাস বৈদেশিক জাতির হস্তে পড়িয়া বিকৃত হইয়াছে, তাহার অনুশীলন করিয়া মনোমালিন্যের উৎপাদন বিধেয় নহে। ইংরেজ চিত্রকরের হস্তে ভারতের ঐতিহাসিক চিত্র কোথাও অরঞ্জিত, কোথাও বা অতিরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। অরঞ্জিত বা অতিরঞ্জিত চিত্র দ্বারা যেরূপ আলেখ্যের প্রকৃতভাব হৃদয়ঙ্গম হয় না, সেইরূপ অতিবর্ণিত বা অবর্ণিত ইতিহাস পড়িয়া ঐতিহাসিক জ্ঞান পরিস্ফুট হয় না। ইংরেজ ঐতিহাসিকের হস্তে ভারতীয় ইতিহাসের যে যে ঘটনা বিপর্য্যস্ত হইয়াছে বক্তা এইস্থলে তাহার কয়েকটির উল্লেখ করিয়াছেন। যথাক্রমে তদ্বিষয় নিম্নে লিখিত হইতেছে।

মরে, সুয়েন প্রভৃতি ইংরেজ লেখকগণ সিরাজউদ্দৌলাকে অন্ধকূপ-হত্যার প্রধান অধিনায়ক বলেন। সিরাজ উদ্দৌলা শত অপরাধে অপরাধী হউন, জন সমাজে প্রজাপীড়ক প্রজাঘাতক বলিয়া ধিক্কৃত হউন, ঐতিহাসিকের কঠোর লেখনীর সংঘাতে তাঁহার চারিত্রপট ক্ষত বিক্ষত হউক, কিন্তু সিরাজ অন্ধকূপ হত্যার পাপে পাপী নহেন। ন্যায়ের পক্ষপাত বিবর্জ্জিত বিচার এই আরোপিত অপরাধহইতে তাঁহাকে বিমুক্ত করিবে সমুদয় বিষয়েই ন্যায়বিচরণ বিধেয়। সিরাজ এক বিষয়ে ঘোরতর অপরাধী বলিয়া যেরূপ ন্যায়ের কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইবার যোগ্য, অপর বিষয়ে দোষ-শূন্য বলিয়া সেইরূপ ন্যায়ের পক্ষপাতশূন্যবিচারে বিমুক্ত হইবার পাত্র।

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ জুন ইংরেজহস্তহইতে ফোর্ট উইলিয়মের পতন হয়। দুর্গ অধিকৃত হইলে হলওয়েল প্রভৃতি ১৪৬ জন ইংরেজ বন্দী শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া সিরাজ উদ্দৌলার সমক্ষে সমানীত হয়েন। সিরাজ, হলওয়েল প্রভৃতিকে শৃঙ্খল-বিমুক্ত করিয়া দৃঢ়তা সহকারে বলেন যে, কেহ তাঁহাদিগের কেশাগ্রও স্পর্শ করিবে না। রাত্রিতে নবাব বিশ্রাম-ভবনে গমন করিলে জনৈক সেনাপতি এই ইংরেজ বন্দিদিগকে প্রায় ১৮ ফীট্ বর্গ পরিমিত একটি ক্ষুদ্রায়তন গৃহে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন।

যাঁহারা অন্ধকূপ-হত্যার ইতিহাস পড়িয়াছেন, তাঁহারা এই কারারুদ্ধ ব্রিটিস বন্দিদিগের দুরবস্থা অনেকাংশে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। প্রচণ্ড নিদাঘ-সন্তপ্ত রাত্রিতে স্বল্পপরিসর নির্ব্বাত গৃহে ষড়চত্বারিংশাধিক একশত মনুষ্যের ঘন-সন্নিবেশ, কি ভয়ঙ্কর! কি লোমহর্ষণ!!

কাল-রাত্রি প্রভাত হইল। অরুণ-সহচরী উষা ধীরে ধীরে জগতীতল আশ্রয় করিল। নবাবসেনাপতি কারা গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। তখন কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! স্তূপীভূত ১২৩ জন মৃত দেহের মধ্যহইতে ২৩ জন বিবর্ণ, বিশীর্ণ, কঙ্কালাবশিষ্ট জীবিত শরীর বাহিরে আসিল। নবাব এই সাংঘাতিক ব্যাপারের কিছুই অবগত ছিলেন না। তিনি সেনাপতিদিগের হস্তে দুর্গ-রক্ষার ভার দিয়া বিশ্রামভবনে বিশ্রাম করিতে ছিলেন, সুতরাং দোষভার বন্দিরক্ষক সেনাপতির স্কন্ধেই অর্পিত হইতেছে। এরূপ স্থলে সিরাজউদ্দৌলাকে দোষী করা ন্যায়সঙ্গত নহে। তবে সিরাজ অপরাধীর প্রতি দণ্ড বিধান করেন নাই। এ অংশে অবশ্য তাঁহার ক্রটী লক্ষিত হইতেছে। সিরাজউদ্দৌলা সর্ব্বদা তোষামোদ-প্রিয় কুপোষ্য সম্প্রদায়ে পরিবেষ্টিত থাকিতেন। অতিচাটুবচনে তাঁহার গর্ব্ব উত্তরোত্তর স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল। অমিতাচার ও অতিবিলাসের ক্রোড়ে লালিত হইয়া এইরূপ চাটুকারগণের সংসর্গে থাকাতে সিরাজের হৃদয় নিতান্ত সহানুভূতি-শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। বলা বাহুল্য, এই সহানুভূতির অভাব বশতঃই তিনি বন্দিঘাতক অপরাধীর প্রতি দণ্ড বিধান করেন নাই।

বক্তা এইস্থলে ইংলণ্ডাধিপতি তৃতীয় উইলিয়মের রাজ্যকালীন গ্লেনকোর হত্যার সহিত অন্ধকূপ হত্যার তারতম্য করিয়াছেন। সিরাজের প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে এই হত্যাকাণ্ড সঙ্ঘটিত হয়। যে ইংলণ্ড সভ্যতাভিমান ও পাণ্ডিত্যাভিমানে স্ফীত হইয়া প্রাচ্য বিষয়ের সমালোচন করিয়া থাকে, সেই ইংলণ্ডের অধিপতিই যখন এই লোমহর্ষণ নরহত্যার পাপে পাপী, তখন সিরাজ যদিও অন্ধকূপহত্যার অপরাধে অপরাধী হয়েন, তাহা হইলেও তাঁহাকে তৃতীয় উইলিয়ম অপেক্ষা অধিকতর নৃশংস বলা সর্ব্বথা অসঙ্গত।

দ্বিতীয় ঘটনা; দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ ও পঞ্জাব অধিকার। ইংরেজ লেখকগণের অনেকে দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই। অনেকে কেবল মুলতানের শাসন-কর্ত্তা মুলরাজের অভ্যুত্থানকেই উহার প্রধান হেতু বলিয়া নীরব হইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের কারণ নির্দ্দেশ করিতে এই কয়েকটি ধরিতে হয়, ১ম মহারাজ রণজিৎ সিংহের বিধবা মহিষী মহারাণী ঝিন্দনের নির্ব্বাসন, ২য় দলীপ সিংহের বিবাহের দিন ঠিক করিতে ব্রিটিস রেসিডেণ্টের অমত, এবং ৩য় হাজারার শাসন-কর্ত্তা সর্দ্দার ছত্রসিংহের

প্রতি দুর্ব্যবহার। এই কারণত্রয় হইতেই দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধের উৎপত্তি। ব্রিটিস্ জাতি ইহার প্রত্যেকটিতেই যথেচ্ছাচারিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে। এই শিখযুদ্ধের পর ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট সন্ধির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া পঞ্জাব আত্মসাৎ করেন। ইহাতে দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ দুর্ব্বার শিখ জাতির অন্যায়পরতার ফল ও পঞ্জাব অধিকার ন্যায়-সঙ্গত বলিয়া নির্দ্দেশ পূর্ব্বক পবিত্র ইতিহাসের সম্মান অপলাপ করা নিতান্ত বিগর্হিত।

তৃতীয় ঘটনা অযোধ্যা অধিকার। অন্ধকূপ হত্যা ও দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের ন্যায় ইহাও অধিকাংশ ইংরেজ লেখকের পক্ষপাতিনী লেখনীর সংঘাতে বিকৃত হইয়া ভারত ইতিহাসে স্থান পরিগ্রহ করিয়াছে। এই লেখকদিগের মতে অযোধ্যা অত্যাচার ও অবিচারের বিলাসভূমি ছিল। ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্ট ইহার প্রতীকার বিধানার্থ নবাব ওয়াজিদ আলীকে পদচ্যুত করিয়া অযোধ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বিসপ হেবার, হারমান্ সেরিভেন প্রভৃতি অযোধ্যাকে সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর আধার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে রাজ্য সৌভাগ্যের ক্রোড়ে লালিত, সে রাজ্যে অত্যাচারের প্রাদুর্ভাব সম্ভাবিত নহে। *

সকল ইংরেজ লেখকই যে ভারতীয় ঐতিহাসিক ঘটনা এইরূপ বিপর্য্যস্ত করিয়াছেন, তাহা নহে। অনেকানেক লেখক পক্ষপাতশূন্য হইয়া এ বিষয়ে ন্যায়ানুমোদিত পক্ষ অবলম্বন করিতে ত্রুটী করেন নাই। ভারতবর্ষ এই মহাপুরুষদিগের নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

যাহাহউক; সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ ও প্রমাদরহিত স্বদেশের ইতিহাস পাঠ করা স্বদেশীয় ব্যক্তি মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। স্বদেশের ইতিহাস পাঠ করিলে মনে স্বদেশের প্রতি গভীর হিতৈষণার উৎপত্তি হয়, গম্ভীর উদাত্ত ভাবের সঞ্চার হয় এবং গভীর সহৃদয়তায় হৃদয় আপ্লুত হইয়া থাকে। বাল্মীকি, ব্যাসের ন্যায় কবি, পাণিনি, পতঞ্জলির ন্যায় বৈয়াকরণ ও গৌতম, শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় ধর্ম্ম প্রচারকের নাম মনোমধ্যে উদিত হইলে কোন্ সহৃদয় ভারতবাসীর হৃদয় হিতৈষিতা ও উদাত্ত ভাবে উন্নত না হয়? কেনা এই মহাপুরুষদিগের ইতিহাস পাঠে সমুদাত্ত হয়েন? মহামনাঃ আর্য্য পূর্ব্বপুরুষগণ এক সময়ে জগতের পূজনীয় ছিলেন। তাঁহারা কোমল বিষয়ের কোমল সৌন্দর্য্যের সম্ভোগেই ব্যাসক্ত থাকিতেন না, তাঁহারা কেবল ভ্রমরচুম্বিত প্রভাতকমলের অঙ্গবিলাস দেখিয়া অথবা কাব্য নাটকের অনুশীলন করিয়াই কালাতিপাত করিতেন না। তাঁহারা গভীর বিষয়ের গভীর চিন্তায় সর্ব্বদা সংযত থাকিতেন, তাঁহাদি-

* বর্ত্তমান প্রস্তাবলেখক প্রণীত সিপাহিযুদ্ধের ইতিহাসের অবতারণিকায় পঞ্জাব ও অযোধ্যা অধিকারের আনুপূর্ব্বিক ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত পুস্তক এক্ষণে যন্ত্রস্থ।

গের হৃদয় সুখে দুঃখে, বিপদে, সম্পদে অভ্রংলিহ গিরিবরের ন্যায় সদা উন্নত থাকিত। তাঁহারা সাহিত্য বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রে অদ্বিতীয়, সমরকৌশলে অদ্বিতীয় এবং ধর্ম্ম-নীতিতে অদ্বিতীয় ছিলেন। এক সময়ে ভারতভূমি এইরূপ মহাতেজস্বী, মহাসত্ত্ব আর্য্য পুরুষগণের লীলাস্থল ছিল, এক সময়ে এইরূপ আর্য্যতেজ, আর্য্যসাহস, আর্য্য জ্ঞানের মহিমায় ভারতবর্ষ মহীয়ান্ হইয়া উঠিয়াছিল।

আর্য্য হিন্দুগণ দশগুণোত্তর সংখ্যা নিয়মের স্রষ্টা। আর্য্য হিন্দুগণ ক্ষেত্রতত্ত্ব, ত্রিকোণমিতি, বীজগণিতের উৎকর্ষ-কারক। আর্য্য হিন্দুগণ প্রভাববতী চিকিৎসা বিদ্যার প্রধান অনুশীলনকারী। আরব, গ্রীস দেশীয়গণ আর্য্য হিন্দুদিগের নিকট-হইতেই গণিতাদি শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছে। যে গ্রীস হইতে ইউরোপের ইয়ত্তী শ্রীবৃদ্ধি, সেই গ্রীসই প্রাচীন ভারতের মন্ত্র-শিষ্য।

আর্য্য হিন্দুগণ গণিতাদি শাস্ত্রের ন্যায় যুদ্ধ বিদ্যাতেও পারদর্শী। এক সময়ে হিন্দুদিগের সমর-কৌশলে সমস্ত পৃথিবী চমকিত হইয়াছিল। বক্তা বক্তৃতার এস্থলে আগ্নেয়াস্ত্র সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা এক্ষণে এ বিষয়ে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলাম। প্রাচীন ভারত ও আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র প্রস্তাব লিখিবার বাসনা রহিল। সাহিত্য, দর্শন, যুদ্ধ বিদ্যা প্রভৃতিতে আর্য্য হিন্দুগণ যেরূপ শ্রেষ্ঠ, ধর্ম্ম নীতিতে তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতম। শাক্য সিংহের ধর্ম্মভাব অদ্যাপি সমস্ত পৃথিবীর বরণীয় হইয়া রহিয়াছে। রাজ্যেশ্বরের স্নেহাস্পদ পুত্র ও আজন্ম সৌভাগ্য সম্পত্তির ক্রোড়ে লালিত হইয়াও শাক্য সিংহ কেবল ধর্ম্মের জন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রকার উদাসীনতা, সর্ব্বপ্রকার বিষয়-নিবৃত্তি তাঁহার জীবনের অবলম্বন ছিল। তিনি "নলিনীদলগত" জলের ন্যায় জীবনের ক্ষণস্থায়িতা, বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর চঞ্চলতা, এবং চক্রনেমির ন্যায় অদৃষ্টের পরিবর্ত্তনশীলতা জানিয়া সংসার-পাশচ্ছেদন পূর্ব্বক নির্জ্জন গিরিকন্দরে বা নির্জ্জন অরণ্যে নীরবে বসিয়া অন্তিমে অনন্তপদ প্রাপ্তির আশায় অনন্ত-শক্তির ধ্যানে নিবিষ্ট-চিত্ত ছিলেন। এইরূপ ধর্ম্মভাব জগতে অতুল্য ও অমূল্য। শাক্য সিংহের প্রচারিত ধর্ম্ম এক্ষণে মধ্য-আসিয়া অতিক্রম করিয়া চীনে লব্ধপ্রসর হইয়াছে, অত্যুন্নত হিমগিরির অভ্রংলিহ শৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া তিব্বতে প্রবেশ করিয়াছে। সংক্ষেপতঃ সুবিস্তীর্ণ তুষার-ক্ষেত্রশালী কামস্কট্কার উপকূল হইতে জলধি-হৃদয়-বিলসিত সিংহল দ্বীপ পর্য্যন্ত ছাঁইয়া পড়িয়াছে। ঈদৃশ অলৌকিক ধর্ম্মভাবসম্পন্ন শাক্যসিংহ ভারতের স্নেহাস্পদ সন্তান।

প্রাচীন আর্য্য-গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ কর, তাহাতেও আর্য্যগণের ধর্ম্মভাব দেদীপ্যমান দেখিবে। রামায়ণ ও মহাভার-

তের রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠির ধর্ম্মভয়ের জন্য অদ্যাপি সকলের হৃদয়গত শ্রদ্ধা ও ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি পাইয়া আসিতেছেন। অধিক কি, আর্য্য হিন্দুগণের ধর্ম্মনীতি বৈদেশিক গণকেও বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক এরিয়ান্ এবং বিখ্যাত পরিব্রাজক হোয়েন্থ্ সাঙ্ উভয়েই মুক্তকণ্ঠে হিন্দুদিগকে সত্যবাদী, উদার-স্বভাব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতভূমি এইরূপ বিদ্যাবত্তা, তেজোবত্তা ও ধর্ম্মনীতির বিলাসক্ষেত্র।

আইস ভ্রাতৃগণ! আমরা একবার সেই মহামনস্বী আর্য্য পূর্ব্বপুরুষগণের চরণে প্রণত হই; আইস একবার সেই পূর্ব্ব পুরুষগণের ধর্ম্মনীতির আলোচনা করিয়া চিত্তের উদারতা, হৃদয়ের সরলতা সাধন করি; যতদিন পবিত্র আর্য্য শোণিতের শেষবিন্দু আমাদিগের ধমনীতে প্রবাহিত থাকিবে, আইস, ততদিন আমরা পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় কায়মনোবাক্যে জীবনের শান্তিময় উৎকৃষ্টতম পথে অগ্রসর হইতে থাকি।

বক্তা এইরূপ অবনত-মস্তকে পূর্ব্ব পুরুষগণের মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া স্বীয় বক্তৃতার পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। বক্তৃতার প্রারম্ভে যেরূপ হৃদয়োদ্দীপক স্বদেশ বৎসলতা, উপসংহারেও সেইরূপ হৃদয়োদ্দীপক স্বজাতি-প্রিয়তা। বক্তার হৃদয় যে স্বদেশ-হিতৈষিতা ও স্বজাতি-প্রেমে পরিপূর্ণ, এই বক্তৃতাটি তাহার পরিচায়ক।

উপসংহার সময়ে আমরা সুরেন্দ্রবাবুকে ভারতের একখানি সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ ইতিহাস প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করি। যাঁহার বক্তৃতার প্রতিবাক্যে গভীর সহৃদয়তা উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে, তাঁহার নিকট এ বিষয়ে কেন আশা না করিব?

শ্রীরঃ—

পার্সিজাতি।।

ভারতের পশ্চিমপ্রান্তবাসী পারস্যজাতি রূপে, গুণে, কার্য্যদক্ষতা ও অপরাজিত উৎসাহশালিতায় ইদানীং অনেকেরই লক্ষ্যস্থল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা এই প্রবন্ধে তাহাদিগের বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

এই জাতি পার্সি, গুইবার বা ঘিবার এই তিন সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। প্রাচীন পারস্যজাতিহইতে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। অষ্টম খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা তাহাদিগকে স্বদেশ হইতে সংগ্রামে তাড়াইয়া দেয়। সুতরাং পার্সিরাও

তাহাদিগের সহিত প্রস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইহারা মুসলমানদিগের ক্রমিক উৎপীড়নে পারস্য দেশের কোন অঞ্চলে নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান করিতে না পারিয়া সপ্তম শ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তস্থিত গুজরাটে আগমন পূর্ব্বক আশ্রয় গ্রহণ করে। যে সময়ে ইহারা কথিত প্রদেশে আগমন করে, তখন ইহাদের সংখ্যা তত অধিক ছিল না। কিন্তু ক্রমশঃ সন্তান সন্ততি দ্বারা সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে ইহাদের মধ্যে অনেকে সুরাট, বোম্বাই, বরোচ ও ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমার অন্যান্য স্থলে বাস করিতে বাধ্য হয়। ইহারা প্রথমতঃ পারস্যহইতে তাড়িত হইয়া পারস্যখাড়ির অন্তর্গত অরমস দ্বীপে ১৫ বৎসরকাল অবস্থিতি করিয়াছিল। কিন্তু একদিকে জীবিকা নির্ব্বাহের নিরুপায় দেখিয়া ও অন্যদিকে শত্রুবর্গের উৎপীড়নে ক্লান্ত হইয়া, কতিপয় ক্ষুদ্র জলপোতারোহণে ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তে আগমন করিল। আসিবার সময় ইহারা ইহাদিগের ধর্ম্মের বীজস্বরূপ "পূতাগ্নি" সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। প্রাচীন রোমকদিগের ভেস্তাল (দেবমন্দির) স্থ চিরপ্রজ্বলিত পবিত্র অগ্নির ন্যায় এই অগ্নিও নির্ব্বাণ করা নিসিদ্ধ। এই অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে পার্সিদিগের ধর্ম্মের একেবারে অঙ্গহানি ঘটিয়া উঠে। এই জন্য বহুযুগের পূতাগ্নি এখনো ইহাদিগের দেবমন্দিরে সমভাবে প্রজ্বলিত হইয়া আসিতেছে। সত্য মিথ্যা ঈশ্বর জানেন; কিন্তু ইহাদিগের যেরূপ অগ্নির প্রতি ভক্তি ও যত্ন, তাহাতে এরূপ হইলেও হইতে পারে। আমাদিগের বিবেচনায় প্রাচীন রোমানদিগের দেবমন্দিরে চিরপ্রজ্বলিত অগ্নিপূজার প্রথা এই পার্সিদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের অগ্নিপূজার অনুকরণেই প্রচলিত হইয়াছিল। যেহেতু রোমের বহুকাল পূর্ব্বে পারস্যের ধর্ম্ম, সমাজ, ও অন্যান্য বিষয়ের যে উন্নতি হইয়াছিল, পুরাবৃত্ত আমাদিগকে সে কথা বলিয়া দিতেছে। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তীয়দিগের অনুকরণ করিয়া পরবর্ত্তীয়েরা অনেক বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পার্সিরা গুজরাটে উত্তীর্ণ হইয়া কাম্বে খাড়ির তীরস্থ ডিউ নামক নগরে প্রথমতঃ অবস্থান করিয়াছিল। পরবর্ত্তী সময়ে পর্ত্তুগিজেরা এস্থান অনেক দিন পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল। পার্সিরা কিছুকাল এই স্থানে অবস্থান করতঃ খাড়ি পার হইয়া সুরাটের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে গিয়া অবস্থিতি করিল। তদঞ্চলের হিন্দু-রাজা তাদৃশ সঙ্গতিপন্ন ও সমরনিপুণ ছিলেন না, সুতরাং অপরিচিত আগন্তুকদিগকে কোন মতে দূরীকৃত করিতে না পারিয়া অগত্যা বসবাস ও অগ্নিদেবতার মন্দির নির্ম্মাণ করিবার অনুমতিপত্র প্রদান করিয়াছিলেন।

অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত হইতে না হইতে কেবল বোম্বাইতে পার্সিজাতির সংখ্যা

২০০০০ সহস্র হইয়াছিল। এক্ষণ উক্ত স্থানে ইহাদের সংখ্যা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অপরাপর প্রদেশেও এই জাতির সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে। পূর্ব্বে যে জাতি গ্রীষ্মকালের ক্ষীণ স্রোতের ন্যায় ভারতবর্ষে আগমন করে, সেই জাতি এক্ষণে বর্ষাকালীন স্রোতের আকার ধারণ করিয়াছে। অধুনা ভারতবর্ষের লোকসংখ্যাসম্বন্ধে এই জাতি অনেকটা পুষ্টিসাধন করিতেছে।

পার্সিগণ নিরতিশয় পরিশ্রমী, কার্য্যদক্ষ ও সুচতুর। ইহারা অর্থার্জ্জনের জন্য দেশ দেশান্তরে অনায়াসে যাতায়াত ও বসবাস করিয়া থাকে। এরূপ কথিত আছে যে, যেখানে অন্য কেহই আহার্য্যাহরণ করিতে পারেনা, সেখানে একজন পার্সি অনায়াসে উহা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। ফল কথা, পরিশ্রম, কার্য্যদক্ষতাপ্রভৃতির গুণে পার্সি যেখানে যাউক না কেন, কিছু না কিছু অর্থলাভ করিতে অশক্ত হয় না। ইহারা দীর্ঘ ও শক্তিবিশিষ্ট অবয়বসম্পন্ন। সৌন্দর্য্য বিষয়েও ইহাদিগকে প্রশংসা করিতে হয়। কিন্তু পার্সিজাতীয়া বালিকাগণ শৈশবকালে যাদৃশী রূপবতী ও মাধুর্য্যশালিনী থাকে, বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম হইবার পূর্ব্বেই সে রূপ ও মধুরতা হইতে বঞ্চিত হয়। তখন পুরুষজাতির ন্যায় অনেকাংশে তাহাদের আবয়বিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যায়। সুতরাং বিংশতিবর্ষীয়া একটি পার্সিরমণী অপেক্ষা একজন ঐরূপ বয়ঃস্থা হিন্দু বা মুসলমান কামিনী যে অধিকতর সুন্দরী, তাহা বলা বাহুল্য।

হিন্দুজাতির বেদ, মুসলমান জাতির কোরাণ, খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বিগণের বাইবেল যেরূপ মৌলিক ও সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ, সেইরূপ পার্সিদিগের "জেন্দ্ আভেস্তা" আদি ধর্ম্মপুস্তক। প্রাচীন পারস্য জাতীয় জোরোস্তর নামক জনৈক মহর্ষিকর্ত্তৃক সেই ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পার্সিরা অগ্ন্যুপাসক। এতদ্ব্যতীত ইহারা সূর্য্যেরও আরাধনা করিয়া থাকে। জোরোস্তর প্রণীত ধর্ম্মগ্রন্থে যে সকল ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিধি আছে, পার্সিরা তাহার কতক কতক স্বেচ্ছানুসারে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়াছে। প্রাচীন পারস্যবাসী অগ্নিপূজকদিগের সহিত অধুনাতন পার্সি অগ্নিসেবকগণের ধর্ম্মশাসন দেখিলেই তাহা এক প্রকার প্রতীয়মান হয়। গ্রোস্ নামক একজন ভ্রমণকারী বলেন যে, প্রাচীন পারস্যবাসীরা সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের পূজা করিত, কিন্তু অগ্নি ও সূর্য্যকে ঈশ্বরজ্ঞানে কখনই সেবা করিত না। কেবল ঐ দুই তেজস্কর জড়পদার্থ ঈশ্বরের সৃষ্টিমধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া বর্ণিত এই মাত্র, তাঁহার মতে জোরোস্তরের "জেন্দ্ আভেস্তা" এইরূপ শাসনে রচিত; কিন্তু পরবর্ত্তী পার্সিগণে অজ্ঞতা ও অকল্পনাদোষে সূর্য্য ও অগ্নিকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিয়া আসিতেছে। এই জড় প-

দার্থদ্বয়ের পূজাপ্রচলনবিধি বড় আধুনিক নহে, বহু প্রাচীনকাল হইতে, ইহা চলিয়া আসিতেছে। কথিত আছে, যখন দেরায়ুস্ সেকেন্দর সার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন, তখন তাঁহার সম্মুখে রৌপ্য বেদীতে করিয়া এই "অনন্ত অগ্নি" লইয়া গিয়াছিলেন। যাইবার সময় মেগাইগণ (পুরোহিত মণ্ডলী) অগ্নির স্তব গান করিতে করিতে সঙ্গে গিয়াছিলেন এবং বৎসরের দিনসংখ্যা সূচনার্থ ৩৬৫ জন যুবা রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সমভিব্যাহারী হইয়াছিল। পাঠক, শেষোক্ত ঘটনাটির নিগূঢ় তত্ত্ব কি কিছু বুঝিতে পারিলেন? আমিতো পারিলাম না। যাহা হউক, বৈদিক সময়ের পরবর্ত্তী হিন্দুঋষিগণ যেমন স্বেচ্ছানুসারে পুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ জেন্দ আভেস্তিক সময়ের উত্তরবর্ত্তী প্রাচীন পার্সিরা জোরোস্তরের ধর্ম্মবিধির উপর স্ব স্ব অভিমতে ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে অগ্নি ও সূর্য্যকে পরমদেবতা করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং প্রাচীন-পারস্য-বংশীয় আধুনিক পার্সিরা যে সেই পথের অনুসরণ করিবে, তাহাতে বৈচিত্র কি?

গ্রীসদেশীয় প্রাচীনইতিহাসবেত্তা হিরোদতস্ বলেন যে, পূর্ব্বতন পারস্যেরা ঈশ্বরজ্ঞানে অগ্নির পূজা করিত। তাৎকালিক মেগাইগণ অন্যান্য দেবমূর্ত্তিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিত না, কেবল অগ্নিই তাহাদিগের মতে ঈশ্বরের দ্বিতীয় মূর্ত্তি বলিয়া তাহারা শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিত। মেগাইগণ দুইটি মূল সূত্র সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই দুইটির মধ্যে একটি মঙ্গল ও অপরটি অমঙ্গলের কারণ। প্রথমটির নাম 'অরসুমাদিস্' ও দ্বিতীয়টির নাম 'অহমান'। আলোক ও অন্ধকারকে লক্ষ্য করিয়া এই দুইটি সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। পাঠক, বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, প্রাচীন মেগাইগণ মানবজগতের উপকারার্থ কেমন কৌশলে এই দুইটি সূত্র বা মূল বাক্য শিখাইয়া গিয়াছেন। এখানে আলোক অর্থাৎ ঈশ্বরে বিশ্বাস, দয়া, হিতৈষিতা, পরোপকার প্রভৃতি এবং অন্ধকার অর্থাৎ নাস্তিকতা, পাপাচারিতা ইত্যাদি এই সূত্রদ্বয়ের মধ্যে কৌশল সহকারে প্রদর্শিত হইয়াছে। মহর্ষি জোরোস্তর-কৃত নীতিগুলি অতি উৎকৃষ্ট। সেগুলি এক একটি করিয়া দেখাইতে গেলে বান্ধবে স্থান হইবে না, সুতরাং তাহার কএকটি মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।

১। "যে ব্যক্তি মানস-ক্ষেত্রে পরিশ্রমরূপ বীজ বপন করে, সে দশ সহস্র মৌখিক প্রার্থনা অপেক্ষা যথেষ্ট পরিমাণে ধর্ম্মরূপ শস্য লাভ করিতে সক্ষম হয়।"

২। "যে ব্যক্তি একমাত্র সত্যরত্নকে চিত্তাধারে রাখিতে সক্ষম হয়, তাহার নিকট অচিরস্থায়ী মণি মুক্তাদি ভস্মের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।"

৩। "যে ব্যক্তি আস্তিকতা-রূপ আলোকে অবস্থান করে, তাহাকে অমাবস্যার অন্ধকার ভীত করিতে পারে না।"

৪। "যাহার চিত্ত নাস্তিকতা অবলম্বন করে, সে বিদ্যুতালোকের পরক্ষণজাত গাঢ়তর তমসে পড়িয়া মরে।"

৫। "আহার্য্য যেমন শরীরকে জীবিত রাখে, সেইরূপ ধর্ম্ম চিত্তকে তেজস্বি করে।"

৬। "ধর্ম্মে অবিশ্বাস করা আর আত্মহত্যা করা উভয়ই সমান।"

৭। "যে পিতা, মাতা, শিক্ষক প্রভৃতি গুরুজনকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে, সে ঈশ্বরের দর্শন পায়।"

৮। "পরোপকারই জীবন ও পরাপকারই মরণ।"

৯। "অর্থের বশীভূত হইয়া পরমার্থ ত্যাগ করা আর নক্ষত্রালোক প্রিয় জ্ঞান করিয়া চন্দ্রালোকে অবহেলা প্রদর্শন করা উভয়ই তুল্য।

১০। "পরনিন্দা করিলে আপনার নিন্দা করা হয়। এ জগতে আত্মপর কেহই নহে।" ইত্যাদি।

জোরোস্তরের এইরূপ বিবিধ প্রকার ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি আছে।

পার্সিরা প্রভাতে পূর্ব্বমুখ এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে পশ্চিম মুখ হইয়া সূর্য্যের আরাধনা করে। ইহাদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে চিরপ্রজ্বলিত পবিত্র অগ্নির সম্মুখে বসিতে হয়। হিন্দুদিগের পুরোহিত যেমন 'অপবিত্রঃ পবিত্রোবা' ইত্যাদি মন্ত্রে যজমানের চিত্তশুদ্ধি করিয়া থাকেন, ইহাদিগের পুরোহিত সেরূপ কোন মন্ত্র না বলিয়া যজমানদিগকে স্বহস্তে কিঞ্চিৎ জলপান এবং তৎসঙ্গে দাড়িম্বের পত্র চর্ব্বণ করিতে দেন। এইরূপ করিলে চিত্তশুদ্ধি সংসাধিত হইয়া থাকে। পার্সিদিগের মতে উপবাস করা নিষিদ্ধ।

এই জাতির মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা যেমন প্রচলিত নাই, সেইরূপ আবার অবিবাহিত অবস্থায় অবস্থান করাও ব্যবহার বিরুদ্ধ। পূর্ব্বে পার্সিদিগের উদ্বাহ প্রথা স্বতন্ত্ররূপ ছিল, এক্ষণে কিয়দংশ হিন্দুপ্রথার সহিত মিশ্রিত হইয়াছে দেখা যায়।—কিন্তু ইহাদিগের শব-সৎকার-প্রণালী হিন্দুদিগের সঙ্গে কোন রূপেই মিলে না; পাঠকের পক্ষে নূতনবোধে উক্ত জাতির শবদাহপ্রথা সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে।

সাংঘাতিক পীড়ায় বা আকস্মিক ঘটনায় প্রাণবিয়োগ হইবামাত্রই প্রায় ইহারা মৃতব্যক্তিকে সমাধিস্থলে লইয়া যায়। এই জাতির শববহনের জন্য কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট লোক নিযুক্ত আছে। তাহারা মৃতদেহ বহনকালে বাক্য উচ্চারণ বা কাষ্ঠ স্পর্শ করে না। সুতরাং লৌহ, তাম্র প্রভৃতি ধাতুময় আধারে করিয়া মৃতদেহ লইয়া যাইতে হয়। যদি সমাধিস্থলে যাইবার সময় কোন কাষ্ঠনির্ম্মিত সেতু উত্তীর্ণ হইতে হয়, তাহাহইলে তাহার উপর

তাম্রপত্র বা মৃত্তিকা বিশেষরূপে বিছাইয়া দিতে হয়। শববহনাধারে শ্বেতবস্ত্র বিছাইয়া, শ্বেতবস্ত্রে মৃতদেহ আচ্ছাদিত করিয়া তাহাতে স্থাপন করিতে হয়। শ্বেতবস্ত্র পরিহিত ছয় ব্যক্তি সেই শবসমেত শবাধার বহন করিয়া লইয়া যায়। তাহাদিগের পশ্চাতে দুই দুই জন পার্শ্বাপার্শি করিয়া অনেকগুলি আত্মীয় ব্যক্তি ধীরে ধীরে গমন করিতে থাকে। পার্সিজাতির সমাধিভুমি উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত হইয়া গোলাকারে নির্ম্মিত। প্রাচীরের মুলহইতে সমাধিভূমির মধ্যস্থল পর্য্যন্ত ক্রমশঃ ঢালুভাবে নির্ম্মিত। ঠিক মধ্যস্থলে একটা গভীর কূপ আছে। ঢালুভাগ এত মসৃণ যে, মৃতদেহ গড়াইয়া দিলে একেবারে সেই কূপের ভিতর গিয়া পতিত হয়। শব নিক্ষেপের সময় ইহারা শবকে উলঙ্গ করিয়া ফেলে। ইহাদিগের এরূপ বিশ্বাস যে, শকুনি, গৃধিনী প্রভৃতি শবখাদক পক্ষিগণ শবের সমুদয় মাংস খাইয়া ফেলিলে মৃত ব্যক্তির পরলোকে যথেস্ট মঙ্গল সংসাধিত হইয়া থাকে। যাহা হউক এতদ্দারা মৃত ব্যক্তির মঙ্গল হউক আর না হউক,সমাজের কতকটা মঙ্গল হয়,তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জাতির সমাধি ভুমি তিনভাগে বিভক্ত। মৃত স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুদিগের জন্য এরূপ করা হইয়াছে। সমাধি কার্য্য সমাধা হইবার পর সকলে চলিয়া গেলে কেবল একজন মৃতব্যক্তির আত্মীয় সমাধিস্থলের কিঞ্চিদ্দূরে দণ্ডায়মান হইয়া নিক্ষিপ্ত শবের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকে। এরূপ করিবার মর্ম্ম এই যে, শবখাদক পক্ষী নিক্ষিপ্ত শবের কোন্ চক্ষু অগ্রে উৎপাটন করে। দক্ষিণ চক্ষু অগ্রে উৎপাটন করিলে মৃত ব্যক্তির আত্মা সুখী, কিন্তু বাম নেত্র প্রথমে ঐরূপ করিলে উহার আত্মা দুঃখী। পক্ষিদিগের দ্বারা ক্রমান্বয়ে শবরাশির মাংস ভক্ষিত হইয়া অস্থিস্তূপে সমাধিকূপ পরিপূর্ণ হইয়া যায়, সুতরাং মধ্যে মধ্যে অস্থিরাশি অপসারণ করিবার জন্য ঐ কূপহইতে একটা স্বতন্ত্র সুড়ঙ্গ আছে, তাহাতেই ঐ কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। পার্সিদিগের সমাধিভূমি ও সমাধিক্রিয়া সম্বন্ধে টমসন্ হার্বর্ট বলেন যে, " পার্সিদিগের এই অপরিস্কৃত ও বিভীষণ সমাধিভূমি স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করা অপেক্ষা কর্ণে শ্রবণ করাই ভাল। ইহারা শব সমাধিস্থ করিবার পর আর সেখানে গমন বা তদ্বিষয়ে কোন অনুসন্ধান করে না, কেবল গৃহেতেই অনবরত বিলাপ করিয়া থাকে। কাষ্ঠদ্বারা ইহাদিগের পবিত্র অগ্নি প্রজ্বলিত হয় বলিয়া ইহারা মৃত-দেহ লৌহাধারে করিয়া লইয়া যায়।" অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় পার্সিরা কোন ইউরোপীয়কে সমাধি-স্থলের ঘটনা দেখিতে দেয় না; এমন কি, (এলফিনিস্টোন বলেন) যদি তাহাদিগের ধর্ম্মবহির্ভূত অন্য কোন ব্যক্তিকেও সমাধি কার্য্যের সময়ে তথায় দেখিতে পায়, তাহা হইলে তাহারা তাহাকে

যৎপরোনাস্তি পীড়ন করে। পূর্ব্বে প্রাচীন পারস্যবাসী মেগাইগণ এই প্রণালীতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিত। আধুনিক পার্সিগণ তাহাদিগের সেই প্রথা ও পূতাগ্নি প্রভৃতি ভারতবর্ষে আনয়ন করিয়াছে।

বোম্বে দ্বীপের মধ্যে মালাবার নামক একটা ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে। সেইখানেই উক্ত দ্বীপস্থ পার্সিদের সমাধি ভূমি, ইউরোপীয় ও মুসলমানদিগের সমাধি মন্দির আছে। এতদ্ব্যতীত সে স্থলে হিন্দুজাতিরও শবদাহ হইয়া থাকে। দেখিতে গেলে মালাবার পর্ব্বত একটা ভীষণ শ্মশান!

শ্রীরাজ—

রুল ব্রীটানিয়া।

১

প্রমোদ-কানন, শোভার আধার,
বীরত্বের খনি, বিদ্যার ভাণ্ডার,
রত্ন-আভরণা রাজেন্দ্রাণীপ্রায়
শোভে শ্বেতদ্বীপ সলিল-শয্যায়;
রাজবর্ত্মে বহে বাণিজ্যের স্রোত,
পোতাশ্রমে শোভে শত শত পোত;
শাল-বৃক্ষ-সম গুণ-বৃক্ষ-চূড়ে
সারি সারি কেতু ধীরে ধীরে উড়ে;
চতুর্দ্দিকে বায়ু ভ্রমিছে গাইয়া,—
'সাগর-বাসিনী রুল ব্রীটানিয়া!'

২

শত-স্বর্ণ-সৌধ-মালিনী লণ্ডন
টেমস-সলিলে হেরিছে আপন
বিচিত্র চিত্রিত সুন্দর মুরতি,
যেন রূপবতী ষোড়শী যুবতী
হীরা, মুক্তা, মণি, মাণিক্যে আদরে
সাজাইয়া দেহ, গরবের ভরে,
স্বচ্ছ দরপণে হেরিছে বদন;
বক্ষে সেই ছায়া করিয়া ধারণ
স্রোতঃ ছলে যেন নাচিয়া নাচিয়া
গায় স্রোতস্বতী,—'রুল ব্রীটানিয়া!'

৩

শ্বেত-দ্বীপ, তব মহিমা অপার!
দুর্জ্জয় জলধি পরিখা তোমার,
ঝড় ঝঞ্ঝাবাত তব আজ্ঞাবহ,
বিদ্যুৎ তোমার দূতী অহরহ;
চতুর্দ্দিকে তব নীল বারি-রাশি
মধ্যে তুমি,—যেন পূর্ণিমার শশী
শারদ অম্বরে—কিবা মনোহর!
তব পদ সদা চুম্বিছে সাগর;
আপনি বরুণ তরঙ্গ তুলিয়া
গায় প্রতি দিন,—'রুল ব্রীটানিয়া'!

৪

দ্রুতগতি তরী করি আরোহণ,
হেলায় তরঙ্গে করিয়া দলন

নির্ভীক নাবিক দূর দেশে যায়,
ব্রীটনের নামে দিগন্ত জাগায় ;
প্রকাণ্ড মূরতি রণতরী ভরি
ব্রীটন-তনয় যুদ্ধ সজ্জা করি
চলে শত শত, ঝম্ ঝম্ ঝম্
'রুল ব্রীটানিয়া' বাজে অনুপম ;
দূরশৈলমালা আকাশে মিশিয়া
করে প্রতিধ্বনি,—'রুল ব্রীটানিয়া !'

৫

বীর অবতার ব্রীটন তনয়,
মহা বীর্য্যবান, কেশরি-হৃদয় ;
তেয়াগিয়া সুখ, সংসারের মায়া,
পিতা, পুত্র, ভাই, প্রাণাধিকা জায়া,
স্মরি জন্মভূমি, স্মরি শেষবার
প্রিয়জনমুখ,—বাজে বারংবার
ভীষণ বাজনা—প্রবেশে সমরে,
পদভরে ধরা টলমল করে ;
বীরবক্ষে যেন বিদ্যুৎ ঢালিয়া
বাজে ঘোর রোলে—'রুল ব্রীটানিয়া !'

৬

রত্নগর্ভা, শত-বীর-প্রসবিনী,
ওয়েলিংটন, ব্লেক, নেল্‌সন-জননী !
নীলের সমরে যে দিন নেল্‌সন
ভীম প্রসরণে করিল বেষ্টন
ফরাসীর সেনা ; কাঁপায়ে মিশর,
কাঁপায়ে জলধি, মহাভয়ঙ্কর
শত শত তোপ গরজি উঠিল,
গন্ধকের ধূমে জগত গ্রাসিল ;
সেই অন্ধকারে রহিয়া রহিয়া
বাজিল গম্ভীরে—'রুল ব্রীটানিয়া !'

৭

হুতাশে বিষাদে আকুল হৃদয়,
যে কুলগ্নে নেপোলিয়ান দুর্জ্জয়,
—(যেন মুছিবারে ললাট-লিখন)
ওয়াটলু'র ক্ষেত্রে আরম্ভিলা রণ ;
দুই সৈন্যে ঘোর সংগ্রাম বাধিল,—
সিংহে সিংহে যেন যুঝিতে লাগিল ;
ঘোর ঝণাৎকার হেষা হোরুরা রবে
নরসল-বাসী সশঙ্কিত যবে,
প্রুসীয় সংগীত সহিত মিশিয়া
বাজিল সে দিন,—'রুল ব্রীটানিয়া !'

৮

হৈমবতী চারু উষার কিরণে
যে দিন শোভিল পলাসি-প্রাঙ্গণে
সিরাজ সমক্ষে ইংরেজের বল ;
ঘন ঘন করি ঘোর কোলাহল
বাজিল দামামা, শিঙ্গা, ঢাক, ঢোল,
উঠিল চৌদিকে ভয়ঙ্কর রোল ;
পড়িল মদন ; কামান ধ্বনিল,
ইংরাজের জয় ঘোষণা করিল ;
গভীর উচ্ছ্বাসে উঠিল বাজিয়া
বিজয়ী সংগীত,—'রুল ব্রীটানিয়া !'

৯

শুনি প্রতিদিন শুইয়া শয্যায়
'রুল ব্রীটানিয়া' সৈনিকেরা গায় ;
রুল ব্রীটানিয়া ?—কোথায় ?—ভারতে ?
আর্য্যের নিবাস এ আর্য্যাবরতে ?
ভাবি মনে মনে, বুঝি ঘুম ঘোরে
স্বপন সুন্দরী প্রতারিছে মোরে ;
পরক্ষণে, হায়, গরজিয়া ওঠে

প্রাক্কালিক তোপ ; প্রতিধ্বনি ছোটে,
দ্বিগুণ দাপটে দিক্ ডুবাইয়া
বাজে ঘন ঘন,—'রুল ব্রীটানিয়া !'

১০

মেলিয়া নয়ন অপরূপ হেরি,—
হাসে কলিকাতা সোণার নগরী ;
সৌধমালা-শিরে সৌরকর খেলে ;
দুর্গ-চূড়ে কেতু ধীরে ধীরে দোলে ;
ফিট্ পরিচ্ছদ পরিধান করি,
অঙ্গের সৌরভে চতুর্দ্দিক ভরি,
ফেটিঙ্গে চড়িয়া চলেছে ইংরাজ.
বামে বিধুমুখী করেন বিরাজ,
বৈতালিক গীত সহিত মিশিয়া
বাজয়ে ইডনে,—'রুল ব্রীটানিয়া।'

১১

সূর্য্যবংশীয়ের সিংহাসনে আজ
ব্রীটানিয়া, তুমি করিছ বিরাজ ;
আজি অযোধ্যায় কি শুনিছি হায় !
কোথা রঘুবীর ! সৌমিত্রী কোথায় !
রাজরাজপুরী আজ অন্ধকার !
মুছি নয়নের, হায়, শতধার,
চারিদিকে চাই, শূন্য সব ঠাঁই !
'কোথায় এলাম্'—স্মৃতিরে—সুধাই ;
অমনি শুনিয়া উঠি চমকিয়া,
দূর দুর্গে বাজে 'রুল ব্রীটানিয়া !'

১২

কেঁদনা লেখনি ! ফেল দুঃখসাজ,
হস্তীনায় মহারাজসূয় আজ ;
ভিক্টোরিয়া আজ ভারত-ঈশ্বরী !
রত্ন সিংহাসনে, আহা মরি মরি,
চেয়ে দেখ দেখ, আসীন লিটন !
মহা মহিমায় উজ্জ্বল বদন !
চতুর্দ্দিকে বসি রাজন্যমণ্ডল,—
আখণ্ডলে বেড়ি যেন দেবদল !
আর্য্যসূতে যেন স্তম্ভিত করিয়া
মন্ত্রে বাজিতেছে,—'রুল ব্রীটানিয়া !'

১৩

দুরন্ত প্রতাপ ব্রীটন তোমার !
তব নামে যেন কাঁপে চারিধার !
হিন্দু রাজত্বের ভগ্নশেষোপরি
মোগলের যেই অর্দ্ধ-শশী মরি
বর্ষ পঞ্চশত করিল বিরাজ,
অস্তাচলশায়ী সেই শশী আজ !
সীক, রাজপুত, সবে ম্রীয়মাণ,
পাদ্য অর্ঘ্য দেয় নেপাল ভোটান,
নিয়তির গতি কে রাখে রোধিয়া ?
আর্য্য-ভূমে বাজে—'রুল ব্রীটানিয়া !!'

শ্রীদী—

সংক্ষিপ্তসমালোচন।

১। জীবনালেখ্য। শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন দাসের পরলোকগতা সহধর্ম্মিণী ব্রহ্মময়ীর সংক্ষেপ জীবন বৃত্তান্ত। আমরা এই গ্রন্থখানি অত্যন্ত আদরসহকারে পাঠ করিয়াছি, এবং পাঠসময়ে অনেক স্থলেই অশ্রুজলে আপ্লুত হইয়াছি। গ্রন্থকার একজন প্রশস্তমনা সহৃদয় মনুষ্য। তাঁহার লেখাতেও সেই সহৃদয়তা প্রতি পংক্তিতেই প্রতিফলিত হইয়াছে।

চরিতাখ্যায়কেরা সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণির ব্যক্তি। তাঁহারা প্রায়শঃ যশোধ্বনিরই পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধাবিত হইয়া থাকেন। যে সকল সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিরা সতত লোক-কোলাহলে অভিনন্দিত রহেন, উত্থানে ও উপবেশনে স্তুতির অভ্যর্থনা পান, এবং ইঙ্গিতমাত্রেই লোকের সুখদুঃখসম্পর্কে প্রভুত্ববিস্তারে সমর্থ হন, চরিতাখ্যায়কদিগের ধূমাক্ত চক্ষু তাঁহাদিগের প্রতিই আকৃষ্ট থাকে। তাঁহারা ঐ সকল আপাতমনোরম উজ্জ্বলদৃশ্য পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত মণিমুক্তার মলিন প্রভায় মোহিত হন না। কিন্তু যিনি যথার্থরূপে মানবজীবন পাঠ করিতে পারিয়াছেন, তিনি বুঝিয়াছেন যে, সিংহাসনের প্রান্তদেশেও যে প্রবাহ, পর্ণকুটীরের অভ্যন্তরেও সেই প্রবাহ;—কীর্ত্তির কারুকার্য্যময় ঝল ঝল দীপালোকেও যে জ্যোতিঃ, কীর্ত্তিবিরহিত অজ্ঞাতজীবনের অকৃত্রিম আলোকেও সেই জ্যোতিঃ। জীবনালেখ্যের রচয়িতাকে আমরা এই শেষোক্ত শ্রেণির একজন নিপুণ ব্যক্তি বলিয়া বোধ করিলাম। একটি সাধুহৃদয়া সরলপ্রাণা অবলা, সংসারে অপরিচিত রহিয়াও, অলক্ষিত দেবতার মত কত লোকের দুঃখভার মোচনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তিনি এই অযত্নসম্পন্ন আলেখ্যে তাহা অতি বিশদরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাকে আমরা অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দি।—

২। সতীপরিণয়ম্। ময়মনসিংহ, সেরপুরাধিবাসি শ্রীচন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারপ্রণীতম্।—ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয় যে, যে বঙ্গীয় সমাজে ইদানীং কাব্যের এত আদর, এত অনুশীলন, সতীপরিণয়ের মত উপাদেয় ও মনোহর বস্তু অদ্যাপি সেখানে লোকের নিকট অপরিচিত! আমাদিগের বিবেচনায় ইহা একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য, এবং ইহার রচয়িতা সর্ব্বথা যশস্বী হওয়ার উপযুক্ত। এইক্ষণ যাঁহারা সংস্কৃত লিখেন, তাঁহাদিগের অনেকেই ব্যাকরণশাস্ত্রের সহায়তায় শব্দের সহিত

শব্দমাত্র গ্রন্থন করিয়া থাকেন; কিন্তু কোথায় কিরূপ শব্দবিন্যাসে কিরূপ রসের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হন না। আধুনিক অনেক সংস্কৃতকবিতায় সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের এই জন্যই অবজ্ঞা। সতীপরিণয়ের সংস্কৃত প্রায় প্রাচীন সংস্কৃতের ন্যায়,—প্রাঞ্জল, মধুর, মদালস; পাঠমাত্রেই অর্থ প্রতীতি হয়, এবং পাঠমাত্রেই পাঠকের প্রাণ কবির প্রাণের সুখদ সংস্পর্শে শীতল হইতে থাকে। ইঁহার লেখা বাঙ্গালিজাতির গৌরবকর। কারণ বৃটিশ-ইণ্ডিয়াবাসী বর্ত্তমান বাঙ্গালির দ্বারা এইরূপ সদ্ভাবভূষিত সুললিত সংস্কৃত কাব্য রচিত হওয়া সামান্য আহ্লাদ এবং সামান্য অভিমানের বিষয় নহে।—আমরা পাঠকবর্গের তৃপ্তির জন্য সতীপরিণয়ের দুই একটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। আমাদের ভরসা আছে, যাঁহারা সংস্কৃতে অনুরাগী, তাঁহারা ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন। এই কাব্যের অনেক স্থলেই কুমারসম্ভবের অনুকৃতি দৃষ্ট হইবে; কিন্তু কালিদাসের এইরূপ অনুকরণ-চেষ্টা যশেরই কথা, অপযশের কথা নহে।—

" বামেন, বামাক্ষি! বিলোকয়োচ্চৈঃ
কৈলাসমালোকয়িতুং দিগন্তম্।
শৃঙ্গৈরনেকৈককভির্ব্বরোক!
ধ্রুবং স্থিতং মস্তকমুন্নময্য। "

* * *

" অস্মিন্ শশঙ্কোপলভিত্তিভাগে
নিশাসু মূর্চ্ছন্মধুকৌমুদীকে।
সিদ্ধাঙ্গনানামভিসারিকাণাং
চলন্তি পাদাঃ কলশিঞ্জিতানাম্॥
নিশাসু তারানিকরস্য শশ্বৎ
সমন্ততোঽসৌ প্রতিবিম্বিতাঙ্গঃ
শাখীব সংলগ্নতুষারগৌরঃ,
খদ্যোতমালা খচিতো বিভাতি॥ "

৩। রামের বিয়ে। প্রহসন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ মজুমদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। এইরূপ কদর্য্য পুস্তক বাঙ্গালা যন্ত্রালয়সমূহ কর্ত্তৃক অদ্যাপি উদ্গীরিত হইতেছে দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। কিছু দিন হইল, বান্ধবকার্য্যালয়ের একজন কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক 'কলির বৌ ঘরভাঙ্গানী' নামে একখানি নাটক প্রকাশিত হইয়াছিল। সে খানি যেমন নাটক, রামের বিয়ে তেমনই প্রহসন। পাঠকবর্গের কৌতুহল নিবারণার্থে এই একটি কথা বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, এই প্রহসনের রাম সৌভাগ্য বশতঃ অযোধ্যার রামচন্দ্র নহেন। ইঁহার নাম রামতারণ মুখোপাধ্যায়; নিবাস কলিকাতা।

৪। এর উপায় কি। শ্রীমীর মশাররফ্ হোসেন প্রণীত। ইহাও আর একখানি প্রহসন। এদেশের মুসলমান ভদ্রলোকেরা সাধারণতঃ সাহিত্যে বীতস্পৃহ; বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত তাঁহাদিগের কোন সম্বন্ধ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং যখন তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কদাপি সখ্ করিয়া বাঙ্গালা লিখিতে ইচ্ছা করেন, তখন আমরা নিতান্ত সুখী হই,

এবং তাঁহাদিগের প্রশংসা করিতেই প্রাণপণে যত্ন করি। কিন্তু যদি তাঁহারা, যশোলাভের এমন সহজ পথ থাকিতেও, কল্পনায় ও ভাষায় যার পর নাই জঘন্য রুচির পরিচয় দেন,—অশ্লীল পদাবলীর ছড়াছড়িকেই কাব্যরসে রসিকতা মনে করেন, তখন এই গ্রন্থকারের ন্যায় আমরাও বিপন্ন হইয়া ইহাই জিজ্ঞাসা করি,—এর উপায় কি?

৫। রত্নাবতী। পতিব্রতা-উপাখ্যান। বেনারসনিবাসিনী শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী প্রণীত। এই ছন্দোবদ্ধ উপাখ্যানটি পাঠ করিয়া আমরা অপ্রীত হই নাই; প্রীত হইয়াছি, এমনও বলিতে পারি না। ইহার কোথাও কবিত্বের ক্রীড়া নাই, কিন্তু লেখা বালিকার পক্ষে নিতান্ত নিন্দনীয় নহে।

৬। সরলা। প্রথমভাগ। শিশুদিগের উপযোগি কবিতা। শ্রীহরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশক। ইহাতে ঊষা, মহাকাল, শরতের শশী, মৌমাছি ইত্যাদি শীর্ষক কতক গুলি অসংযুক্ত বর্ণে রচিত সুললিত কবিতা আছে, আর কবিতাপাঠে শিশুদিগের উপকার হয়, এমন অনেক সুমধুর উপদেশ আছে। আমরা শিশুশিক্ষার উপযোগিনী কবিতা না দেখিয়া সর্ব্বদা দুঃখ প্রকাশ করিয়াছি। সরলার রচয়িতা বহুপরিমাণে আমাদিগের সেই দুঃখ অপনোদন করিয়াছেন। এই পুস্তক খানি এদেশীয় বিদ্যালয়সমূহের নিম্নতম শ্রেণির বালকদিগের নিতান্তই উপযুক্ত।

৭। শিশুপ্রবেশ। অর্থাৎ অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদিগের নিমিত্ত প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ। শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র চক্রবর্ত্তি প্রণীত।—আমরা বাঙ্গালার শিশুশিক্ষার ব্যাকরণ যতখানি দেখিয়াছি, এখানি তন্মধ্যে সর্ব্বাংশে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার রচনাপ্রণালীতে গ্রন্থকারের বিশিষ্ট বুদ্ধিমত্তা ও নিপুণতা প্রদর্শিত হইয়াছে। সাধারণের সংস্কার এই যে, বালকদিগকে যে সে ব্যক্তিই শিক্ষা দিতে পারে, এবং যে কোন পুস্তক হইতেই তাহাদিগের বিদ্যালাভ সম্ভব। ইহা ভ্রম। সরলমতি বালকদিগের শক্তির পরিমাণ বুঝিয়া তাহার সমতলবর্ত্তী হওয়া নিতান্তই কঠিন। প্রসন্ন বাবু এই ব্যাকরণ রচনায় সেই কাঠিন্য অনুভব করিতে পারিয়াছেন, এবং সেই হেতুই এত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

৮। হেলেনাকাব্য। প্রথমখণ্ড। সটীক। আনন্দচন্দ্র মিত্র প্রণীত। যে সকল আধুনিক কাব্য বাঙ্গালাভাষার কণ্ঠমালায় আভরণ স্বরূপ গ্রথিত হইয়াছে, এখানি নিশ্চয়ই তন্মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য। ইহার দ্বিতীয়খণ্ড যখন প্রকাশিত হইবে, তখন আমরা ইহার বিস্তৃত সমালোচনা করিব, এবং সেই সমালোচনায় কাব্যের আদর্শে উত্থান করিয়া অনুকৃতিতে অবতরণ করিতে যত্নপর হইব। এইক্ষণ এইমাত্র বলিতে পারি যে, যাঁহারা অভিনিবেশসহকারে ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন, তাঁহারা স্থানে স্থানে কল্পনার কম-

নীয় লীলাচাতুরী দেখিয়া যেমন পুলকিত হইবেন, সেইরূপ শ্রুতিসুখাবহ পদবিন্যাস দর্শনেও নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিবেন।

ইহার ভাষা মেঘনাদবধের ভাষা অপেক্ষা অনেক গুণে তরল। এইজন্যই ইহার রচনায় রসগত গাম্ভীর্য্যের কিছু অভাব দৃষ্ট হয়, এবং এইজন্যই আবার ইহাতে মাধুর্য্যের ভাগ কোথাও কিঞ্চিৎ অধিক। নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলির তুলনা করিলে, এ-কথার অর্থগ্রহ হইতে পারে।

মেঘনাদবধে,—

"একাকিনী শোকাকুলা, অশোককাননে,
কাঁদেন রাঘববাঞ্ছা আঁধার কুটীরে
নীরবে! দুরন্ত চেড়ী সতীরে ছাড়িয়া,
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসব-কৌতুকে,—
হীনপ্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয়হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে!
মলিনবদনা দেবী, হায়রে, যেমতি
খনির তিমির গর্ভে, (না পারে পশিতে
সৌর-কর-রাশি যথা) সূর্য্যকান্ত মণি,
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি-তলে!"

হেলেনা কাব্যে,—

" * * একাকিনী ধনী—
মানিনী কণিনী যথা!—কাঁদেন নীরবে।
বিমুক্ত কবরী, কটি; কুঞ্চিত বিষাদে
সে রুচির মুখচ্ছবি! হায়রে যেমতি
বিন্ধ্যাচলে মহামায়া, পঞ্চবটীবনে
জনম-দুখিনী সীতা; ইন্দ্রাণী সুন্দরী
নৈমিষ কাননে কিম্বা একাকিনী যথা
অসুরের অত্যাচারে ইন্দ্রালয় ছাড়ি।"

পুনশ্চ মেঘনাদবধে,—

" * * হাসি, কহিলা ললনা;
ও পদ-প্রসাদে, নাথ, ভব-বিজয়িনী
দাসী, কিন্তু মনমথে না পারি জিনিতে।
অবহেলি শরানলে; বিরহ-অনলে
(দুরূহ) ডরাই সদা; তেঁই সে আইনু,
নিত্য নিত্য মন যারে চাহে, তাঁর কাছে।"

হেলেনা কাব্যে,—

" উত্তরিলা ইন্দুমুখী পূর্ণেন্দুবদনা
প্রিয়ম্বদা;—প্রাণেশ্বর! কাতর কি দাসী
সংগ্রামে? বিমুখ কবে নবীনা যুবতী
উদ্বাহ-উৎসব-রঙ্গে? বীর কুলাঙ্গনা
আমরা, আজন্ম দেব বীরধর্ম্মে রত।"

৯। মিত্রকাব্য। এখানিও হেলেনা কাব্যের রচয়িতা শ্রীযুক্তবাবু আনন্দচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক প্রণীত। শ্রীযুক্তবাবু শ্রীনাথ চন্দ ইহার এক ভূমিকা লিখিয়াছেন, এবং সেই ভূমিকায় হেলেনা কাব্যকে কবির ডমরুধ্বনি বলিয়া এখানিকে কবির বংশীধ্বনিরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমাদিগের বিবেচনায় হেলেনা কাব্যে ডমরুধ্বনির সাদৃশ্য আছে, কিন্তু যদিও মিত্রকাব্য অন্যাংশে একখানি উপাদেয় গ্রন্থ,—কবির যশস্কর এবং ভাষার পুষ্টিবর্দ্ধক, তথাপি বংশীধ্বনিতে হৃদয় যেরূপ ঔদাস্য ও আবেশে শ্লথ ও অবশ হইয়া পড়ে, ইহার কোন কবিতাতেই হৃদয়ে তেমন এক ঔদাস্য ও আবেশ জন্মে না। মিত্রকাব্যের একটি গীত এইরূপ,—

" ওরে মন তুমি গৃহে ফিরে চলে যাও।

কেন আশার ছলে সকল ভুলে,
ও মন! গণ্ডগোলে কাল কাটাও॥
শোন শোনরে অজ্ঞান,
তোর কি নাইরে কাণ্ডজ্ঞান
দেশে দেশে ঘুরে কেন হচ্ছ অপমান;
এরা ধূর্ত্ত অতি অল্প মতি
ওরে দেখে কি না দেখ্‌তে পাও।"

যাঁহারা কবিতায় প্রকৃত বংশীধ্বনি শ্রবণ করিতে চান, তাঁহারা ইহার সহিত মাধবী বংশীর নিম্নোদ্ধৃত পদ কয়টির তুলনা করুন।

"আশার ছলনে ভুলি, কি ফল লভিনু হায়!
তাই ভাবি মনে।
জীবন প্রবাহ বহি, কাল-সিন্ধু পানে যায়,
ফিরাব কেমনে?
দিন দিন আয়ু হীন; হীনবল দিন দিন,
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না? একি দায়!

রে প্রমত্ত মন মম, কবে পোহাইবে রাতি?
জাগিবিরে কবে?
জীবন উদ্যানে তোর যৌবন কুসুম ভাতি
কতকাল রবে?
নীরবিন্দু দুর্ব্বাদলে, নিত্য কিরে ঝল ঝলে?
কেনা জানে অম্বুমুখে অম্বুবিম্ব সদ্যঃপাতি!"

মিত্রকাব্যের বিজয়া দশমী ও লুক্রেসিয়া অতি সুন্দর কবিতা। ইহার শরদ্বর্ণনা এবং কমলে কামিনী আরও সুন্দর;—পড়িবার সময়ে মনে আনন্দ সঞ্চার হয়।

১০। বঙ্গাঙ্গনা কাব্য। প্রথমখণ্ড। শ্রীরজনীনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ইহা অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কতিপয় স্তুতিপত্রিকায় গ্রথিত। গ্রন্থকার যাঁহাদিগকে বঙ্গদেশের ভূষণস্বরূপ মনে করিয়াছেন, ঐ সকল পত্রে অবলা-মুখে তাঁহাদিগের স্তুতিপাঠ হইয়াছে। অমিত্রাক্ষর ছন্দ গ্রন্থকারের অভ্যস্ত হইয়াছে এমন বোধ হইল না। তিনি হেলেনা কাব্যের কোন অংশের সহিত তাঁহার লেখার কোন এক অংশ মিলাইয়া পড়িলেই ইহা বুঝিতে পাইবেন। আর, স্তুতিবাদের জন্য যেরূপ সাবধানবিন্যস্ত সুমার্জ্জিত শব্দের আবশ্যকতা, তাহাও তাঁহার এই কাব্যে দৃষ্ট হইল না। পণ্ডিতবর দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের স্তোত্র হইতে আমরা দ্বাদশটি পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম। যদি বিদ্যাভূষণ মহাশয় ইহা পড়িয়া থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি লজ্জিত হইয়াছেন।

" একটি রতন মাত্র এবঙ্গ-গোকুলে—
তুমিহে দ্বারকানাথ! উজ্জ্বল চৌদিগ—
তব কীর্ত্তি—স্যমন্তক—মঞ্জুল-ময়ূখে।
মধুর মলয়ানিলে দোলয়ে মাধবী—
বসন্ত-ভসন্তে যথা; কিম্বা ভুজঙ্গিনী—
ডমরুর ধ্বনি শুনি করিয়া যেমতি—
উর্দ্ধফণ; দোলিছে মোদের হিয়া দেব,
তোমার সোমপ্রকাশ বাঁশরী সুস্বরে।
বিরক্ত প্রকাশি—কিন্তু নব্য দল তাহে,
শুনিতেছে স্বাধীনতা—কাল-বিষ-ধরী—
গরজন! মাতিতেছে—মাতঙ্গিনী যথা—
মধুপানে! কি ভাবিছ বসি গুণ নিধি!"

বঙ্গদেশকে গ্রন্থকার কি অর্থে এবং কোন্ ভাবের আবেশে গোকুল বলিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না, এবং বসন্ত শব্দের সহিত 'ভসন্ত' কি হসন্ত, কি ঝসন্ত অথবা লসন্ত শব্দের একত্র বিন্যাস হইলে কিরূপ মধুর অনুপ্রাস হয়, তাহাও আমাদিগের বুদ্ধিতে প্রবেশ করিল না। দ্বারকানাথ-স্তোত্রের আর একস্থলে বৃদ্ধ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কিরূপ সম্মাননা অথবা বিড়ম্বনা হইয়াছে, তাহাও পাঠক দেখুন। গ্রন্থকারের কল্পিত অবলা বলিতেছেন।—

"কে না জানে,--এ অখণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলে--
রসিক দ্বারকানাথ—কুঞ্জবন-প্রিয়"।

হা! বিদ্যাভূষণ! আপনার কপালে কি এই ছিল! আপনি কি এই জন্য এত দিন বঙ্গভাষার সেবা এবং বঙ্গীয় নব্য কবিসম্প্রদায়ের শিক্ষকতা করিয়াছিলেন! আর সোমপ্রকাশ! তুমিও কি এতদিনের পর ব্রজের 'বাঁশরী' হইলে?

১১। নীতিশিক্ষা; প্রথমভাগ। শ্রী-ঈশানচন্দ্র রায় প্রণীত।—আমরা ইহার দ্বিতীয়ভাগের সমালোচনায় গ্রন্থকারের বিশেষ প্রশংসা করিতে পারি নাই; কিন্তু নীতিশিক্ষা প্রথমভাগের জন্য তাঁহাকে অন্তরের সহিত সাধুবাদ দিতে প্রস্তুত আছি। বালকদিগের জন্য সরল ভাষায় সুপাঠ্য পদাবলীতে ভাল ভাল পুস্তক রচিত হইলে, আমাদিগের বড়ই আহ্লাদ জন্মে। নীতিশিক্ষা প্রথম ভাগ বালকদিগের যে উপকারে আসিবে, তাহাতে আমাদিগের অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

১২। বঙ্গসংগীত। শ্রীবিরিঞ্চিলাল শর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রণীত।—হা! হেম বাবুর ভারত সংগীত কিংবা ভারতশিক্ষার সামান্য একখানি অনুকৃতি। গ্রন্থকারের সরস-শব্দ-গ্রন্থনে ক্ষমতা আছে। কিন্তু তাঁহার বঙ্গসংগীতের এক অংশের সহিত আর এক অংশের ভাবে ও পদবিন্যাসে বড়ই বিচিত্র বিরোধ। সংগীতের আরম্ভ এইরূপ।—

"মরি কি সুন্দর! স্তিমিত নক্ষত্র
মিশিছে ঊষার তিমির বাসে,
অরুণ তপন,—কোমল কিরণে
হাসিছে মধুর তাহার পাশে।
নিশির শিশিরে কুলবধূগণ
ফোট ফোট ভাব ধরেছে সবে,
তা দেখি ভ্রমর অধর চুম্বিতে
ছুটিছে ঝঙ্কারি মধুর রবে॥

সংগীতের আর এক স্থলে আছে,—

"খাজানা, করজ, সেলামি, নজর,
তার পরে আছে পথের কর,—
আগে ধান গরু, পরে ভিটা বেচে
তথাচ উদ্ধার নাহিক তার।
সর্ব্বস্বান্ত হয়,—পেটে অন্ন নাই
তখন মামলা বিপাকে ফেলে,
কেঁদে কেঁদে মরে,—কেহ না শুধায়,
অগত্যা শেষেতে যায় হে জেলে।"

জীর্ণোদ্ধার।

অর্থাৎ

প্রাচীন আর্য্যদিগের জ্ঞান সমালোচনা

সলিল

জল, বায়ু, তেজঃ, পৃথিবী, চন্দ্রমণ্ডল, সূর্য্যমণ্ডল, গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকা প্রভৃতি জ্ঞাতব্য পদার্থে আর্য্যদিগের জ্ঞান কি পরিমাণে প্রবিষ্ট হইয়াছিল এবং তাঁহাদের মনন শক্তিই বা কিরূপ ছিল—এই সকল প্রকট করাই এই 'জীর্ণোদ্ধার' শীর্ষক প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

সকলেই অবগত আছেন যে, আর্য্যদিগের জ্ঞানে জল একটি প্রধান ভূত অর্থাৎ মৌলিক পদার্থ। আর, নব্য বৈজ্ঞানিকদিগের মতে জল একটি যোগোৎপন্ন মিশ্র পদার্থ। এই মতে দুই প্রকার গ্যাস্ সংযুক্ত হইলে জল উৎপন্ন হয়, সুতরাং উহা ভূত বা মূল বস্তু নহে। এই মতদ্বয়ের তারতম্য সুমেরু সর্ষপের তুল্য। যদিও প্রথমোল্লিখিত মতটি পর-মতের নিকট ভ্রম-কলুষিত বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে, তথাপি আমরা একবার ঐ মতের সমালোচনা করিব। কাকদন্ত পরীক্ষা অর্থাৎ কাকের দাঁত আছে কি না? জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে যে ব্যক্তির গালে হাঁসি ধরে না, তাঁহাকে এ প্রস্তাব সুখী করিতে পারিবে না। যাঁহারা পুরাতন তত্ত্বের প্রেমিক—ভরসা করি তাঁহারা এই প্রস্তাবে সুখী হইবেন। উন্নিনীষু অথচ বালবৎ নিতান্ত সরল-হৃদয় আদিম পিতামহগণের জ্ঞান সম্বন্ধে অনেক আলোচ্য না থাকিলেও প্রথমতঃ সলিল বিষয়ক জ্ঞানের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া গেল। তাঁহারা এই সলিল সম্বন্ধে কি কি বিষয় কি কি রূপে জানিতে পারিয়াছিলেন, ক্রমে প্রকাশ করা যাইতেছে।

অনেক আর্য্যজ্ঞানে ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ প্রকারই ভূত, "ন্যূনং নাতিরিক্তম্" ন্যূনও নহে, অতিরিক্তও নহে। কিন্তু কোন কোন আর্য্যের মতে আকাশের বস্তুত্ব নাই, "আবরণাভাবোহি আকাশঃ" আবরণ অর্থাৎ কিছু না থাকিলেই তাহা আকাশ নামে ব্যবহৃত হয়; সুতরাং এমতে ভূত চারি প্রকার মাত্র। ভূত ও পরমাণু নামান্তর মাত্র, পদার্থান্তর নহে। এই চতুর্বিধ পরমাণুর উৎপত্তি বিনাশ নাই—ইহাদের সংযোগ বি-

য়োগে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত। ইহা ন্যায় ও বৈশেষিক সম্মত; কিন্তু বেদ ও বেদানুগত উত্তরমীমাংসা ও সাংখ্যদর্শনের মতে পরমাণু সকলের সৃজনকর্ত্তা ঈশ্বর। সুতরাং উহারা সাংসিদ্ধিক বা চিরনিত্য নহে, কল্পান্ত সময়ে পরমাণুও বিনষ্ট হইবে। পরমাণু সকল উৎপন্ন দ্রব্য হইলেও প্রক্ষিপ্ত বদরমুষ্টির ন্যায় যুগপৎ উৎপন্ন হয় নাই। ক্রমশঃ হইয়াছে। সে ক্রমএইরূপ—অগ্রে আকাশ, তৎপরে বায়ু, তৎপরে তেজঃ, তৎপরে জল, অবশেষে পৃথিবী। ইহা পৃথক্ পৃথক্ রূপে উৎপন্ন হয় নাই—পরস্পরের সংযোগেই হইয়াছে। যথা, আকাশসংযুক্তবায়ু হইতে তেজঃ—তন্ত্রিতয়ের পরিণাম জল—তচ্চতুষ্কের পরিণামে পৃথিবী। এই সকল ভূত, উৎপত্তিকালে পরমাণুরূপেই উৎপন্ন হইয়াছিল—পরে তাহা ভাগে ভাগে সংহত বা সম্বদ্ধ হইয়া স্থূল হইয়াছে এবং ব্যবহারের উপযোগী হইয়াছে।

উপাদান বা কারণ-দ্রব্যের গুণ কার্য্যদ্রব্যে সংক্রান্ত হয়—এবং সেই উৎপন্ন দ্রব্যের স্বতন্ত্র নূতন গুণও জন্মে। এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থ জন্মিলে তাহা কথিত নিয়মের অধীন হয়। অতএব কথিত নিয়মানুসারে জল, আকাশ, বায়ু ও তেজের অনন্তরোৎপত্তি বলিয়া উহাতে আকাশ, বায়ু ও তেজের গুণ কিছু কিছু আছে এবং নিজের সাংসিদ্ধিক গুণও আছে। এই সাংসিদ্ধিক বা বিশেষ গুণটি রস বা আস্বাদ নামে বিখ্যাত। এতাবতা আর্য্যদিগের সিদ্ধান্ত এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, জলের প্রধানতঃ শব্দকারিত্ব, স্পর্শ, রূপ ও আস্বাদ গুণ আছে। এতদ্ভিন্ন বেগ প্রভৃতি যে সকল অবান্তর গুণ আছে তাহা পশ্চাৎ বিবেচ্য।

অপিচ, শব্দ যেমন শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়ক, স্পর্শ ত্বকের, রূপ চক্ষুর, সেইরূপ রস রসনার বা জিহ্বার বিষয়। ঈশ্বরই হউন, আর ঈশ্বরীই (প্রকৃতি) হউন, যিনি এই জগতের সমাবেশ কর্ত্তা, তাঁহার সমাবেশশক্তি অত্যাশ্চর্য্য। জীবকে শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা ও নাসিকা প্রদান করিয়া এবং বাহিরে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের অধিকরণীভূত পদার্থের সৃষ্টি করিয়া যে ঐ সকলকে সফল বা সপ্রয়োজন করিয়াছেন—এতদপেক্ষা সুসমাবেশ আর কি হইতে পারে? এই সিদ্ধান্ত দ্বারা আর্য্যদিগের আর একটি সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত হইতেছে যে যেমন বস্তু গ্রাহক ইন্দ্রিয় পাঁচটির অতিরিক্ত নাই—তেমনি মূল বস্তুও পাঁচ প্রকারের অতিরিক্ত নাই। সুতরাং পাঁচটিই ভূত, চতুঃষষ্টি বা পঞ্চষষ্টি ভূত ভূত নহে, তাহা ভৌতিক।

ইন্দ্রিয়গুলি যেমন প্রত্যেকে বিশেষ বিশেষ গুণ বা শক্তি সম্পন্ন, ভূতগুলিও তেমনি বিশেষ বিশেষ গুণ সম্পন্ন। এই বিশেষ বিশেষ গুণ দ্বারাই পদার্থ সকল পরিচিত হয়। যে সকল গুণ অনন্যসাধারণ, সেই সকল গুণই বিশেষ গুণ। আকাশের বিশেষ গুণ শব্দ, বায়ুর বিশেষ গুণ

স্পর্শ, তেজের বিশেষ গুণ রূপ, আর জলের বিশেষ গুণ রস বা আস্বাদ ও পৃথিবীর বিশেষ গুণ গন্ধ। আকাশ, বায়ু, তেজঃ, এই তিন ভূতের কোন প্রকার আস্বাদ নাই, কিন্তু তাহা জলের আছে। এই জন্যই আস্বাদ গুণটি জলের বিশেষ গুণ বলিয়া পরিচিত। কার্য্যপদার্থ কারণে অতিসামান্য আকারে অবস্থিতি করে, এই নিয়ম অনুসারে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে যে জলে নীলপীতাদি পার্থিব গুণও অতিসামান্যাকারে (অব্যক্তভাবে) আছে, এবং কটু তিক্তাদি নানাপ্রকার পার্থিব ধর্ম্ম তৎকারণীভূত সলিলে অতিসামান্যাকারে লুক্কায়িত আছে।

"রূপমাত্রাদিকুর্ব্বাণাত্তেজসো দৈবচোদিতাৎ।
রসমাত্রমভূত্তস্মাদম্ভোজিহ্বারসগ্রহঃ॥
কষায়ো মধুরস্তিক্তঃ কট্বম্ল ইতি নৈকধা।
ভৌতিকানাং বিকারেণ রস একো বিভিদ্যতে॥"
(শ্রীভাগবত)

অর্থাৎ বায়ু-সংযুক্ত বিক্রিয়া-প্রাপ্ত রূপতন্মাত্র বা তেজ বিশেষ হইতে রসতন্মাত্র বা জল ভূতের উৎপত্তি হয়। রস গ্রাহক ইন্দ্রিয় জিহ্বা। প্রথমোৎপন্ন রস এক প্রকার কিন্তু ঐ এক প্রকার রস নানা বিধ ভৌতিক বিকারের সংযোগে কটু, তিক্ত, কষায়াদি ভাব প্রাপ্ত হয়।

বৈশেষিক দর্শনের সিদ্ধান্ত এই যে, জলের কারণীভূত বায়বীয় অংশ সম্বলিত তৈজস অংশের রূপ বা আস্বাদ কিছুই নাই। কিন্তু তদুৎপন্ন জলের রূপও আছে, আস্বাদও আছে, আস্বাদটি মধুর এবং রূপটি ভাস্বরশুক্ল। তৈজস ও বায়বীয় অংশ থাকাতে জল রূপ, রস ও স্পর্শ বিশিষ্ট হইয়াছে। বায়ুর স্পর্শ অনুষ্ণাশীত কিন্তু জলের স্পর্শ শীত।

আর্য্যদিগের এই সিদ্ধান্ত আর শ্বেতদ্বীপীয় বৈজ্ঞানিকদিগের সিদ্ধান্ত (অক্সীজেনও হাইড্রোজেন গ্যাস জলের উপাদান, ঐ দুই গ্যাসের কোন বর্ণ নাই এবং আস্বাদ নাই) প্রায় একরূপ হইতেছে। তবে ধ্যাননিমীলিতনেত্রে দেখা আর বিকসিত নেত্রে যন্ত্র সংযোগে দেখার যেরূপ প্রভেদ হওয়া উচিত—সেইরূপ প্রভেদ থাকিতে পারে। জল মিশ্রপদার্থ এবং সংযোগোৎপন্ন জানিয়াও ঋষিরা যে জলকে ভূত বলিয়াছেন তাহার ভাব এই,—জল আপনার কারণীভূত বায়বীয় অংশ-সংযুক্ত তৈজস অংশ হইতে সম্পূর্ণ তত্ত্বান্তর এবং জলের পরিণামেও অপর এক তত্ত্বান্তর জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যে পদার্থ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থের কারণ, তাহাই ভূত "ভবন্ত্যস্মাৎ তত্ত্বান্তরাণি"। জল যে আপনার কারণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন তাহার পরিচায়ক আস্বাদ। এই আস্বাদ নামক গুণ জল-সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল না এবং ইহার গ্রাহক জিহ্বা ভিন্ন অন্য ইন্দ্রিয়ান্তর নাই। এই হেতুক, এবং উহা হইতে পৃথিবীনামক তত্ত্বান্তরের জন্ম হইয়াছে এই হেতুক, জল

চতুর্থ স্থানের ভূত। আমরা এখন জল জমাইয়া মৃত্তিকা করিতে পারি না, কিংবা জল হইতে পার্থিব পরমাণু নিষ্কাশিত করিতে পারি না বলিয়া "জলের পরিণামে পৃথিবী" এই কথায় অবিশ্বাস হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা কতদূর যোগ্য সহসা বলা সুকঠিন। যাহা হউক আর্য্যদিগের মতে ভূতের লক্ষণ "অমিশ্র মৌলিক পদার্থ ভূত" এরূপ নহে। তাঁহারা বলেন এরূপ লক্ষণে অনেক দোষ আছে। অতএব যে তত্ত্বান্তরের জনক, তাহাই ভূত। পৃথিবী কি জল হইতে যাহা অতত্ব পদার্থ, অর্থাৎ ঘট,পট, পতঙ্গ, কীট, তৃণ, গুল্ম,বৃক্ষ প্রভৃতি পদার্থ জন্মে—তাহা সেই পৃথিব্যাদি হইতে তত্ত্বান্তর নহে। কেননা, তাহাতে পৃথিব্যাদির বিশেষ গুণ ভিন্ন কোন স্বতন্ত্র বিশেষ বা অসাধারণ গুণ নাই,এবং তাহার গ্রহণের নিমিত্ত ইন্দ্রিয়ান্তরও নাই। যে যে পদার্থ দ্বারা এই জগৎপিণ্ড নির্ম্মিত হইয়াছে—সেই সেই পদার্থ নির্ব্বাচন আরম্ভ করিলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ পদার্থ পাওয়া যায় না,সুতরাং তাহার অতিরিক্ত পদার্থ থাকিবার সম্ভাবনা নাই।

তির্ষ্ঠতু। এই জলের যে দ্রবভাব দৃষ্ট হয়,তাহা সাংসিদ্ধিক "জলে সাংসিদ্ধিকো দ্রবঃ"। সাংসিদ্ধিক শব্দের অর্থ স্বাভাবিক। যিনি জলের পিতা, তিনিই পুত্রের ঐ সাংসিদ্ধিকত্ব রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার অনুগ্রহের ত্রুটী হইলে জল বিকৃতভাব ধারণ করে [অর্থাৎ উষ্ণাংশযুক্ত বায়ুর সংসর্গ রহিত হইলে জল বিকৃতভাব (কাঠিন্য) প্রাপ্ত হয়, ।] এই সকল বিকৃত জল করকা (বর্ষোপল), হিমানী (বরফ) নামে প্রসিদ্ধ।

"উষ্ণাংশযুক্ত বায়ু জলের দ্রবত্ব রক্ষা করিতেছে, এবং সেই উষ্ণাংশযুক্ত বায়ুর সংসর্গ রহিত হইলে জল জমিয়া যায়।" আর্য্যদিগের এই সিদ্ধান্তকে শ্বেত দ্বীপীয় সিদ্ধান্ত বড় অতিক্রম করিতে পারিতেছে না। তবে কি না আর্য্যদিগের জানা না জানা সমস্তই বহিঃ-স্রোত-নিরুদ্ধ হৃদয়ের অধীন, সে জন্য তাঁহারা "যেখানে ৩২ তাপাংশ বা তন্ন্যূন সংখ্যাত গ্রীষ্ম হয়,সেখানকার জল জমিয়া যায়,এ কারণ যে সকল দেশে সূর্য্য কিরণ সরলভাবে পতিত না হয় সেই সকল দেশে গ্রীষ্মের বা তাপের অল্পতা প্রযুক্ত সর্ব্বদাই জল সকল জমিয়া বরফ হইয়া থাকে এবং পৃথিবী অপেক্ষা পৃথিবীর ঊর্দ্ধের অধিক শীতলতা নিবন্ধন ঊর্দ্ধস্থিত মেঘের জল কখন কখন কঠিন হইয়া শিলা বৃষ্টির উৎপাদন করে" এইরূপ করিয়া ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। অহিফেনভোজীর মতন, চক্ষু মুদিত করিয়া, বলিয়া গেলেন "জলে সাংসিদ্ধিকো দ্রবঃ।" "দ্রবত্বপ্রতিরোধস্তু বৈজাত্যাদুপপদ্যতে।"

অপিচ, "উষ্মসংযোগেন দিব্যতেজঃ সংযোগবিগমে পুনর্দ্রবত্বমুৎপদ্যতে"।

(পদার্থতত্ত্ব)

এস্থলে 'দিব্যতেজঃ' শব্দের অর্থপার্থিব উ-

ষ্মতার বিপরীত শৈত্যাবিকার বায়ু বিশেষ। এই দিব্যতেজের সংসর্গে জলের দ্রবত্ব প্রতিরোধ হয়—আবার উষ্মতা সংযোগ হইলে তাহা দূরীভূত হয় অর্থাৎ পুনশ্চ দ্রব হয়।

কথিত নিয়মানুসারে উষ্মতা বা তাপ, পিণ্ডীভূত বস্তু মাত্রেরই লঘুতা ও স্ফীততা বা প্রসারিত হইবার কারণ হইতেছে। পরন্তু সাংসিদ্ধিক দ্রব বা স্বভাব তরল পদার্থ তাপসংযোগে যে পরিমাণে স্ফীত হয়, সংহত কঠিন বস্তু সে পরিমাণে স্ফীত হয় না। অপিচ, কোন কোন বস্তুর এরূপ বিশেষ স্বধর্ম্ম আছে যে, যাহা থাকায় তদ্বস্তুর উপরিভাগস্থ পরমাণুসমূহ অন্তর্ভাগস্থ পরমাণুর তাপাংশ সমাহরণ এবং নিকট বায়ুর তাপাংশ সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং বাষ্পভাব প্রাপ্ত হইয়া যায়। এই কারণে কর্পূর প্রভৃতি কতিপয় দ্রব্য তাপসংযোগবশতঃ সর্ব্বদাই বাষ্প হইয়া থাকে। জলও ঐরূপ কারণ অবলম্বন করিয়া বাষ্পীভূত হয়। জলের বাষ্পীভূত হইবার প্রধান কারণ সূর্য্য। সৌর উষ্মতা সংযোগে জলের বাষ্পভাব প্রাপ্ত হওয়ার বিষয় আর্য্য শাস্ত্রে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। সৃষ্টিকালে যে জল জন্মিয়াছিল তাহাই আবহমান চলিয়া আসিতেছে। এখন আর নূতন জলের সৃষ্টি হয় না। সমুদ্রাদির জল ও পার্থিব রস সূর্য্যকিরণ দ্বারা বাষ্পতা প্রাপ্ত হইয়া বায়ুকর্ত্তৃক উর্দ্ধে উদ্গত ও প্রসারিত হয়—আবার তাহাই উপরিস্থিত অনুষ্ণ বায়ুর দ্বারা শীতল ও উপযুক্ত ঘনতা প্রাপ্ত হইয়া বৃষ্টির আকারে পৃথিবীতে নিপতিত হয়। এই নিমিত্তই বেদে এবং মনু প্রভৃতি স্মার্ত্তগ্রন্থে সূর্য্য হইতে বৃষ্টি হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। যথা ;—

" আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ। " (শ্রুতি ও মনু)

"গত্বোত্তরায়ণং তেজোরসানুদ্ধৃত্য রশ্মিভিঃ।
দক্ষিণায়নমাবৃত্তো মহীং নিবিশতে রবিঃ॥
ক্ষেত্রভূতে ততস্তস্মিন্ ওষধীরোষধীপতিঃ।
দিবস্তেজঃ সমুদ্ধৃত্য জনয়ামাস বারিণা॥"

(বনপর্ব্ব, ৩ অধ্যায়)

" ঐরাবত হস্তিকর্ত্তৃক শুণ্ডদ্বারা সমুদ্র হইতে জল উত্তোলিত হইয়া বৃষ্টি হয়" এই জন-প্রবাদ যে কিং-মূলক, তাহা জানিনা। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, কোথাও একথা লেখা নাই। বরং সর্ব্বত্রই পূর্ব্ব প্রণালী ক্রমেই বৃষ্টির কারণ বর্ণিত আছে।

"অষ্টৌমাসান্নিপীতং যদ্ভূম্যা উদময়ং বসু।
স্বগোভির্মোক্তুমারেভে পর্য্যণ্যঃ কাল-আগতে॥"

(শ্রীভাগবত)

অর্থাৎ যেরূপ ভূপতি এক সময়ে প্রজাদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়া অন্য সময়ে আবার তাহাই তাদের প্রতি বিতরণ করেন, সেইরূপ সূর্য্যদেবও আট মাস ব্যাপিয়া আপন রশ্মি দ্বারা পৃথিবী হইতে জলময় ধন আহরণ করিয়া কালে তাহাই আবার পৃথিবীতে বৃষ্টিরূপে বিতরণ করেন। যদিচ সকল মাসেই সূর্য্যের কিরণ আছে এবং সকল সময়েই জল বাষ্প হইয়া থাকে,

তথাপি শীত ও উষ্মকালে যেরূপ ও যে পরিমাণে বাষ্প হয় এবং তাহা ঊর্দ্ধে উদ্গত হয়, বর্ষাকালে তদ্রূপ ও সে পরিমাণে হইতে পারে না। কারণ, উত্তাপ দ্বারা যে বাষ্প জন্মে তাহা বায়ুর দ্বারা ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। অতএব বায়ু যে সময়ে সিক্ত থাকে, সে সময়ে বায়ু অধিকতর বাষ্প উদ্বহন করিতে পারে না। শীত সময়ের বায়ু অত্যন্ত শুষ্ক থাকে সুতরাং উক্ত কালে সূর্য্যের লঘুতাপ-জন্য উদ্ভূত বাষ্প সকল যত অধিক উৎক্ষিপ্ত হয়, গ্রীষ্মাদিকালে আদিত্যের প্রখর কর দ্বারা ততোধিক বাষ্প জন্মিলেও তত্তাবৎ সম্পূর্ণ উৎক্ষিপ্ত হয় না। তাহার প্রধান হেতু এই যে, শীতকালের সঞ্চিত বাষ্প দ্বারা সিক্ত থাকায় বায়ুর উদ্বহন শক্তি তৎকালে হ্রাস থাকে। অতএব শীতকালে সরোবরাদির জল যেরূপ শুষ্ক হয়, গ্রীষ্মকালে তত হয় না। বর্ষাকালের ত কথাই নাই। এই জন্য প্রস্তাবিত ভাগবত পুরাণের বচনে আট মাস পর্য্যন্ত বাষ্প সঞ্চিত হওয়ার কথা উল্লেখ হইয়াছে এবং চারি মাস বর্ষার কথা বলা হইয়াছে। বর্ষা যদিও চারিমাস ব্যাপক নিয়মিত নহে, তথাপি প্রায়িক অথবা বর্ষার মুখ্যকাল বলিয়া ঐরূপ বলা হইয়াছে। অতএব ঐরাবত হস্তীর জলবর্ষণ-কর্তৃত্ব প্রবাদ কোথা হইতে উত্থিত হইল নির্দ্ধারণ করিয়া বলা যায় না। বোধ হয়

"মেঘস্যোপরি যো মেঘঃ স ঐরাবত উচ্যতে।" (মল্লিনাথধৃত বচন)

এই অংশ হইতে ঐ জনপ্রবাদ উত্থিত হইয়াছে। এই শ্লোকের সংক্ষেপ অর্থ এই যে, মেঘ সকল স্তরে স্তরে উদয় না হইলে ফাঁকা মেঘে জল হয় না। মেঘ যখন বায়ু কর্তৃক পরিচালিত হইয়া স্তরে স্তরে জমিয়া যায়, সেই সময়েই উপরিস্থিত মেঘের সংঘর্ষ-জন্য উষ্ম-বলে নিম্ন স্তরের মেঘ গুলি গলিয়া গিয়া বৃষ্টিরূপে পতিত হয়। অতএব উপরিস্থিত মেঘের নাম ঐরাবত এবং ঐ ঐরাবতই বৃষ্টির কারণ।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

বোপদেব ও শ্রীমদ্ভাগবত

বোপদেবকে সংস্কৃত-বিদ্যা-বিশারদ উইলসন সাহেব দেবগিরির (দেওঘর বা দৌলতাবাদের) অধীশ্বর হেমাদ্রির সভাসদ্ স্থির করিয়াছেন * এবং আমরাও তাহাই প্রামাণিক বিবেচনায় বহু দিবস হইল একটি প্রস্তাবে লিখিয়াছিলাম। কিন্তু সেটি এক্ষণে ভ্রমপূর্ণ বোধ হইতেছে। আমরা অদ্য এজন্য বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ আলোচনা দ্বারা, বোপদেবের বিবরণ স্বতন্ত্ররূপে লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

উইলসন সাহেবের ন্যায়, পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি বোপদেবকে হেমাদ্রির দানখণ্ডের ভূমিকায়, হেমাদ্রির পার্ষদ বলিয়াছেন। যথা "হেমাদ্রিরপি-স্বয়ং নৃপতিঃ, যস্য সভাপণ্ডিতো মহা-মহোপাধ্যায়ঃ শ্রীবোপদেব আসীৎ, অনুমীয়তে পঙ্কবসুধরেন্দুমিতে শকসম্বৎসরে দ্বিত্রাদিবৎসর ন্যূনাধিকোন সমজনিষ্ট।" শিরোমণি মহাশয় পুনশ্চ লিখিয়াছেন "সাম্প্রতং বিজ্ঞাপ্যতে হেমাদ্রিস্তু, দেবগিরিস্থ-যাদববংশ-মহারাজাধিরাজ-মহাদেব চক্রবর্ত্তিনো রাজ্যোধর্ম্মাধিকরণ-পণ্ডিত আসীৎ।" ইহাতে হেমাদ্রিকে যাদববংশাবতংশ মহারাজ মহাদেবের ধর্ম্মাধ্যক্ষ বলা হইয়াছে এবং ইহা চতুর্ব্বর্গ চিন্তামণি মধ্যে হেমাদ্রি যে স্বীয় পরিচয় দিয়াছেন তাহার সহিত ঐক্য আছে; হেমাদ্রি কোন স্থলেই আপনাকে রাজা বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন নাই। উইলসন সাহেব ও পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় তাঁহাকে নৃপতি স্থির করিয়া বোপদেবকে যে তাঁহার সভাসদ বলিয়াছেন, এবিষয় কোন প্রামাণিক সংস্কৃত গ্রন্থে দেখিতে পাইলাম না; সুতরাং আমরা ইহাতে কিছুমাত্র ঐতিহাসিক সত্য প্রাপ্ত হইতেছি না। হেমাদ্রি দানখণ্ডের প্রারম্ভে, তাঁহাকে মহারাজ মহাদেবের ধর্ম্মাধ্যক্ষ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, এবং চতুর্ব্বর্গ চিন্তামণি প্রতি অধ্যায়ের শেষে এইরূপ লিখিয়াছেন; যথা "ইতি শ্রীমহারাজাধিরাজ শ্রীমহাদেবস্য সমস্ত-করণাধীশ্বর-সকল-বিদ্যাবিশারদ-শ্রী-হেমাদ্রি-বিরচিতে চতুর্ব্বর্গ চিন্তামণৌদান-খণ্ডে" ইত্যাদি হেমাদ্রি স্বীয় পরিচয় এই পর্য্যন্ত প্রদান করিয়াছেন। এই গ্রন্থে বোপদেবের কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। বোপদেবকৃত মুক্তাফল গ্রন্থের টীকা নির্ম্মাণ-কালে হেমাদ্রি প্রথমতঃ বোপদেবকৃত গ্রন্থাবলীর এইরূপ গণনা করিয়াছেন, যথা,

"যস্য ব্যাকরণেবরেণ্যঘটনাঃ স্ফীতাঃ প্রবন্ধাদশ,

* Vide Wilson's Vishnu Purana vol. 1, Preface, page L (Trubner & Co.)

প্রখ্যাতানব বৈদ্যকেহপ্যতিথি নির্ধারার্থ মেকোহ-
দ্ভুতঃ। সাহিত্যে ত্রয় এব ভাগবত্তত্বোক্তি
ভূরন্তর্বাণী শিরোমণেরিহগুণাঃ কে কে ন
লোকোত্তরাঃ॥

অর্থাৎ যাহার ব্যাকরণের কীর্ত্তি অদ্ভুত, ব্যাকরণ বিষয়ে যাহার ১০ টি প্রবন্ধ,—বৈদ্যক গ্রন্থের উপর ৯টি প্রবন্ধ, তিথিনির্ণয় নামক ধর্ম্মশাস্ত্র সাহিত্য ৩খান, ভাগবতের উপর ৩টি প্রবন্ধ—সেই অন্তর্বাণী মহামহোপাধ্যায় বোপদেবের কোন্ গুণ না অলৌকিক? বোপদেবও হেমাদ্রির উল্লেখ করিয়াছেন এবং কহিয়াছেন “আমি হেমাদ্রির সন্তোষের নিমিত্ত হরিলীলাখ্য ভাগবতব্যাখ্যা করিলাম।” যথা,

“শ্রীমদ্ভাগবত স্কন্ধাধ্যায়ার্থাদি নিরূপ্যতে।
বিদুষা বোপদেবেন মন্ত্রিহেমাদ্রিতুষ্টয়ে॥
(বোপদেবকৃত হরিলীলা টীকা)

হেমাদ্রি বোপদেবকৃত হরিলীলা টীকার টীকা লিখিয়াছেন। হেমাদ্রি ও বোপদেব সমসাময়িক এবং এই হেমাদ্রি দাক্ষিণাত্যের দেবগিরীশ্বর মহাদেবের মন্ত্রী ছিলেন। মহারাজ মহাদেবের আশ্রয়ে হেমাদ্রি ও বোপদেব উভয়েই দেবগিরিতে বাস করিতেন।

হেমাদ্রির সহিত বোপদেবের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল, এজন্য তিনি হরিলীলাটীকায় “মন্ত্রি-হেমাদ্রি-তুষ্টয়ে” এরূপ লিখিয়াছেন, নতুবা তিনি হেমাদ্রির সভাসদ্ হইলে কিঞ্চিৎ নত হইয়াই বলিতেন।

করহাট ক্ষেত্রবাসী গোপালাচার্য্য বলেন বিট্‌ঠলভক্ত-কৃত প্রাকৃত গ্রন্থে লিখিত আছে—“সচায়ং হেমাদ্রিঃ দ্বাদশাধিক দ্বাদশ শত (১২১২) শকোদ্ভব-দাক্ষিণাত্যালন্দী-গ্রামস্থ-জ্ঞানেশ্বর সংজ্ঞক-ভগবদ্ভক্ত-কৃত-গীতা-ব্যাখ্যানোত্তর-কালিকঃ,“অর্থাৎ হেমাদ্রি ১২১২ শকাব্দে দাক্ষিণাত্যের অলন্দী গ্রামের জ্ঞানেশ্বরকৃত গীতা ব্যাখ্যানের পরভাবিক” এবং তদাশ্রিত-তৎসমকালিক-বোপদেব-প্রাক্কালিক-একাদশশতে শাকে বিংশত্যব্দ-দ্বয়ে সতে অবতীর্ণমধ্বমুনিং সদা বন্দে মহাগুরুম্, ইতি স্মৃত্যর্থ-সাগরাদি-মহানিবন্ধ-মহিত-শ্রীসদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্যৈঃ—” অর্থাৎ হেমাদ্রির আশ্রিত এবং সম সাময়িক বোপদেবের পূর্ব্বে ১১২৫ শকে মধ্বাচার্য্য জন্মিয়াছিলেন। ইত্যাদি, পুনরায় বোপদেব সম্বন্ধে নন্দমিশ্রকহেন “শঙ্করাচার্য্য-সময়াদুত্তরে বৎসরশতদ্বয়ে ব্যতীতে বোপদেবোহভূৎ” অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্যের সময়হইতে ২০০শত বৎসর অতীত হইলে বোপদেবের জন্ম হয়। পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি বোপদেবের ১১৮২ শকে জন্ম হইয়াছিল অনুমান করেন। উইল্‌সন অফ্রেকট্ * ওএন্টারগার্ড্ † কর্ণেল কেনিডি,কোলব্রুক, গোলড্‌ষ্টুকর ও বর্ণেল সকলেই বোপদেবকে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লোক স্থির করি

* Aufrecht, “Catalogus” p. 174 b etc.

† Radices Linguæ Sanskritæ.

য়াছেন, কেবল বর্ন্ফের মতে তিনি ১৩০০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

মুক্তাফল গ্রন্থে বোপদেব নিজের পরিচয় যাহা দিয়াছেন, তদনুসারে তিনি চিকিৎসক কেশবের পুত্র ও ধনেশ মিশ্রের শিষ্য। যথা;—

"বিদ্বদ্ধনেশ-শিষ্যেণ ভিষক্কেশব-সূনুনা।
হেমাদ্রি র্বোপদেবেন মুক্তাফলমচীকরৎ॥"

বোপদেব ভিষক-নন্দন বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে অনেকে তাঁহাকে ভ্রমক্রমে বৈদ্যজাতীয় মনে করিতে পারেন, কিন্তু বোপদেব ব্রাহ্মণ ছিলেন। যথা;—"বোপদেবশ্চকারেদং বিপ্রোবেদপদাস্পদং" পূর্ব্বে এবং এক্ষণে দাক্ষিণাত্য ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ব্রাহ্মণগণ চিকিৎসা ব্যবসা করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশেও আত্রেয় গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে চিকিৎসা ব্যবসা একাল পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে।

প্রাজ্য ভট্টকৃত ২য় রাজতরঙ্গিণীতে এক বোপদেবের কথা উল্লেখ আছে, তিনিও পণ্ডিত-শিরোমণি এবং তিনি ৯ বৎসর কাশ্মীরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাঁর ভ্রাতার নাম জম্মদেব। এই বোপদেব আমাদিগের আলোচ্য মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ-প্রণেতা বোপদেবহইতে পৃথক্ ব্যক্তি।

বোপদেব ভাগবতের উপর প্রবন্ধ ত্রিতয় (হরিলীলা, মুক্তাফল, ও পরমহংসপ্রিয়া,) শতশ্লোকচন্দ্রিকা, মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, কবিকল্পদ্রুম ও তৎ টীকা,কাব্যকামধেনু, রামব্যাকরণ প্রভৃতি লিখিয়াছেন। তাহার মধ্যে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ প্রসিদ্ধ। ধাতু পাঠের আরম্ভে তিনি ইন্দ্র,চন্দ্র, কাশকৃৎস্ন, আপিশালী, শাকটায়ন, পাণিনি,অমর ও জৈনেন্দ্র এই অষ্ট প্রসিদ্ধ শাব্দিকের নামোল্লেখ করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন।

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ এতসংক্ষেপে নির্ম্মিত যে,বোপদেব পাণিনির সমুদয় সূত্রের মর্ম্ম ইহার ১১১ শত সূত্রে নিহিত করিয়াছেন। বোপদেব বৈয়াকরণিক সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম ও পরিভাষার অক্ষর পর্য্যন্ত কর্ত্তন করিয়াছেন। যথা; বৃদ্ধির--ত্রী,গুণের-ণু, দীর্ঘের--ঘ, সমাসের--স ইত্যাদি ; লট-লোট, লুঙ ইত্যাদি পরিভাষার স্থানে কি, খি, গি, ঘি ইত্যাদি। এক অক্ষরে নামের সঙ্কেত করিয়াছেন, দ্ব্যক্ষর সংজ্ঞা প্রায় নাই।

"আদিগেচোণুত্রী" এই সূত্র দ্বারা বোপদেব পাণিনির দুইটি সূত্র সঙ্কলন করিয়াছেন। "যলায়বায়াবোহচীচঃ" এই সূত্রে পাণিনির দুইটি সূত্র নিবিষ্ট আছে। এইরূপ কোথাও দুই,কোথাও তিন,কোথাও চারি পর্য্যন্ত সূত্রের কার্য্য বোপদেবের এক সূত্রে নির্ব্বাহ হয়। এইরূপ সংক্ষেপ করাতে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে ; তাহাতে টীকা ব্যতীত সংস্কারলাভের আশা নাই। মুগ্ধবোধের সূত্রগুলির উচ্চারণ অতি কঠোর ক্লেশজনক। তাহার কারণ,২।৩।৪ বর্ণ একত্রে এবং একযোগে, এক প্রযত্নে উচ্চারণ করিতে হয়। যথা ;

"র্নমচ্ত্রযীকোখো র্ষাহ্বৃর্ছ্বুরোহথেঃ"

" ব্রূর্ণাহদাস্তেনোহব কূপান্তরেহপ্যতদাস্তু-পকনুবাঙ্কঃ। সসেপ্ন্যাদেবৈ কাচকোস্ত বা।" ইত্যাদি।

বোপদেব বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এজন্য উদাহরণসমস্ত বিষ্ণুনামঘটিত করিয়াছেন। সংস্কৃতশিক্ষা এবং হরিনামকীর্ত্তন এই দুইটি একস্থানে পাওয়া সুদুর্লভ। মুগ্ধবোধ ব্যতীত উহা লাভ হয় না, এজন্য মুগ্ধবোধ ব্যাকরণই পাঠ্য। যথা—

" গীর্ব্বাণ বাণী বদনং মুকুন্দ-
সঙ্কীর্ত্তনঞ্চেত্যুভয়ং হি লোকে।
সুদুর্লভং তচ্চন মুগ্ধবোধা-
দলভ্যতেহতঃ পঠনীয় মেতৎ ॥"

বোপদেব " যস্মৈদিৎসাসূয়া—" ইত্যাদি সূত্রের উদাহরণ কেবল হরিনাম ঘটিত করিয়াছেন ; 'দদাতু সম্ভাঃ' ইত্যাদি।

মুগ্ধবোধে বৈদিক প্রক্রিয়া নাই। যে সকল পদ সাধারণতঃ কবিগণ প্রয়োগ করেন না, এমন সকল পদনিষ্পাদক সূত্র, যাহা অন্যান্য ব্যাকরণে আছে, তাহা মুগ্ধবোধে প্রায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। এমন কতক গুলিপদ আছে যাহা বৈকল্পিত অর্থাৎ একবার হয়, একবার হয় না ; এমন দুই একটি পদনিষ্পাদক সূত্র একবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সুপদ্ম, পাণিনি, সংক্ষিপ্তসার প্রভৃতি ব্যাকরণের দ্বারা (ঔজ্জড়ৎ) পদ সিদ্ধ হয়, মুগ্ধবোধ মতে হয় না, (ঔড়িড়ৎ) হয়। দধি দধি, মধু মধু ইত্যাদি বিবিধ প্রয়োগ অন্যান্য ব্যাকরণের মতে হয়, কিন্তু মুগ্ধবোধের মতে হয় না। এইরূপ অনেক প্রকার প্রয়োগ মুগ্ধবোধ মতে হয় না ; সুতরাং তাহা অসম্পূর্ণ ব্যাকরণ বলিতে হইবে। গ্রন্থকার স্বয়ং ইহার বৃত্তি করিয়াছেন।

মুগ্ধবোধের দুর্গাদাস, রামতর্কবাগীশ, রামানন্দ, মধুসূদন, দেবীদাস, রামভদ্র, রামপ্রসাদ তর্কবাগীশ, শ্রীবল্লভাচার্য্য, দয়ারাম বাচস্পতি, ভোলানাথ মিশ্র, কার্ত্তিক সিদ্ধান্ত, রতিকান্ত তর্কবাগীশ, গোবিন্দরাম প্রভৃতির টীকা আছে। এই সকল টীকার মধ্যে দুর্গাদাস ও রামতর্কবাগীশের টীকা উৎকৃষ্ট ও এক্ষণে প্রচলিত। কাশীশ্বর ও নন্দকিশোর মুগ্ধবোধের পরিশিষ্ট লিখিয়াছেন।

প্রস্তাবের শীর্ষ দেশে " বোপদেব ও শ্রীমদ্ভাগবত " লিখিয়াছি। কিন্তু এতক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবতের বিষয় কিছুই বলি নাই এবং বোপদেবের সহিত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের নাম কি জন্য সংযুক্ত করিয়াছি, তাহারও আভাস পাঠকবর্গকে প্রদান করি নাই। উপসংহারকালে তাহার বিবরণ লিখিতেছি। ভাগবতের ন্যায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পুরাণের মধ্যে নাই। ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জলাদি সমস্ত দর্শনের সার ইহাতে গৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থ এত গাম্ভীর্য্যপূর্ণ যে, অনায়াসেই উহার মর্ম্মোদ্ভেদ করা যায় না। এজন্য পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন " বিদ্যাবতাং ভাগবতে পরীক্ষা " বিদ্বান্ ব্যক্তির পরীক্ষা একমাত্র ভাগবত দ্বারা হয়। এতাদৃশ উৎকৃষ্ট গ্রন্থের

প্রতি অনেকে সংশয় করিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ ইহা বোপদেব প্রণীত বলিয়া হতাদর করেন। অনেক পণ্ডিত সেই সংশয়ের কারণ ছেদ করত ভাগবত ব্যাস-প্রণীত সপ্রমাণ করিয়া, বিবিধ ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। আমরা অদ্য ভাগবত ব্যাস-প্রণীত সিদ্ধান্ত করিতে প্রয়াস পাইতেছি না এবং সকল পুরাণই যে বেদব্যাসের দ্বারা রচিত, ইহাও আমরা বিশ্বাস করি না; তবে এই সকল গ্রন্থ যে আধুনিক এবং মুসলমানদিগের রাজ্যশাসনকালে রচিত হইয়াছে, ইহা আমাদিগের বলা উদ্দেশ্য নহে। আমরা এক্ষণে ভাগবত বোপদেব প্রণীত নহে এবং তাহা অতিপ্রাচীন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ, ইহাই সপ্রমাণ করিতে যত্ন পাইতেছি।

যাঁহারা বলেন শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাসদেব কৃত নহে, উহা বোপদেব-প্রণীত, তাঁহাদিগের তর্কের প্রণালী এইরূপ, যথা ;—

শঙ্কাপঙ্কবিলিপ্তস্থ নিবন্ধামুদাহৃতত্বদৃঢ়বন্ধত্ব পদলালিত্যাহেতুকপ্রামাণ্যানধিকারণমেতৎ

অর্থাৎ ভবিষ্যৎবাণী কথনকালে কতকগুলি আধুনিক রাজা ও ঘটনাবলীর উল্লেখ দেখা যায়। কোন মান্য সংগ্রহকারেরা ইহার বচন উদ্ধার করেন নাই। আর্ষ গ্রন্থের ন্যায় ভাগবতের রচনা প্রাঞ্জল নহে, অত্যন্ত আধুনিক শ্লিষ্ট শব্দের দ্বারা এই গ্রন্থের নির্ম্মাণ এবং যেরূপ পদলালিত্য ও পদবিন্যাসচ্ছটা দৃষ্ট হয়, এরূপ পদবিন্যাস ও লালিত্য আর্ষ সময়ে ছিল না। এই সকল কারণে ভাগবত ব্যাসকৃত নহে, উহা বোপদেব কৃত, কারণ বোপদেবের রচনা প্রণালী এইরূপ দেখা যায়।

"ভাগবতভূষণ" কার এই সকল আপত্তির অকিঞ্চিত্করত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত এইরূপ বলিয়াছেন ;—

১ম—কাঠক, কালাপক, মৌদ্গল, মৌগল প্রভৃতি বেদভাগের নাম থাকিলেও তাহা যেমন জৈমিনি, তত্তৎঋষিকৃত শঙ্কা করিয়া তাহার পরিহার করিয়াছেন—অপৌরুষের বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন, এখানেও সেইরূপ কর। ২য়—মান্য গ্রন্থকারেরা ভাগবতের প্রমাণ একবারে ধরেন নাই, এমত নহে ; আবশ্যকমতে বোপদেবের পূর্ব্বভাবিক চিৎসুখ মুনি প্রভৃতি অনেক মান্য গ্রন্থকারেরা ভাগবতের প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন। তবে যাঁহারা ভাগবতের প্রমাণ গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদিগের প্রবন্ধ ভিন্নপ্রকার। অর্থাৎ তাঁহাদের গ্রন্থ সকল তত্ত্বপ্রতিপাদক নহে, কেবল মাত্র বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা বা প্রাধান্যরূপে জ্ঞানমার্গ প্রকাশক গ্রন্থ বলিয়া তাঁহারা ভাগবতকে আপনাদের গ্রন্থমধ্যে আনয়ন করেন নাই। ৩য়—যদি ছান্দোগ্য উপনিষৎ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবতীয় অষ্টাবক্রাখ্যান, সনৎসুজাত প্রভৃতি যথেষ্ট সম্পূর্ণ কঠিন, গাম্ভীর্যার্থ, পদলালিত্য ও বিন্যাসপরিপাটীযুক্ত হইলেও তাহা আর্ষ হয়, তবে ভাগবত আর্ষ না হইবে কেন ? অপর সংস্কৃত প্রাকৃত ভাষা-

ভিজ্ঞ ত্রিকালদর্শী ভগবান বেদব্যাসের নিকট সকলই সম্ভব, অসম্ভব কিছুই নহে। তিনি অস্মদাদির ন্যায় ক্ষুদ্র জ্ঞানের পাত্র নহেন। বিশেষ তিনি এক সময়ে সকল গ্রন্থ রচনা করেন নাই--যখন সময়ভেদ আছে, তখন লিপির প্রকার ভেদ না হইবে কেন? আমরা অদ্য যে রীতিতে গ্রন্থ লিখিতেছি, পরশ্ব লিখিতে হইলে তাহা ভিন্ন প্রকার হইবে। ইত্যাদি বিচার দ্বারা ভাগবত-ভূষণকার আপত্তিকারিগণের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া ভাগবত প্রাচীন গ্রন্থ, বোপদেব কৃত নহে, সপ্রমাণ করিয়াছেন।

শঙ্করাচার্য্যের সময়ের ২০০ শত বৎসর পরে বোপদেবের জন্ম হয়, এবং শঙ্করাচার্য্য বিষ্ণুসহস্র নাম ভাষ্যে ও চতুর্দ্দশ মত বিবেকে ভাগবতের উল্লেখ করিয়াছেন। পুনরায় শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী হনুমৎ ও চিৎসুখ মুনি ভাগবতের টীকা করিয়াছেন। তাহা হইলে ভাগবত বোপদেব প্রণীত বলা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? সিদ্ধান্ত দর্পণ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে--

"বোপদেবকৃতঞ্চেচ বোপদেবপুরাতনৈঃ।
কথংটীকাঃকৃত বৈশ্যর্হনুমৎচিৎসুখাদিভিঃ॥"

অর্থাৎ যদি ভাগবত বোপদেবের কৃত হয়, তবে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী চিৎসুখাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মারা তাহার কি জন্য টীকা করিবেন? গৌড়পাদ ভাগবতের প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। কেন না বৈদান্তিকেরা অদ্যাপি পাঠকালে সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকগণের নমস্কার করিয়া থাকেন। তাহাতে আদি পুরুষ ব্রহ্মা হইতে পরপর শঙ্কর শিষ্য পর্য্যন্ত উল্লেখ আছে। যথা—

"নারায়ণং পদ্মভবং বশিষ্ঠং শক্তিঞ্চ তৎপুত্র পরাশরঞ্চ।
ব্যাসংশুকং গৌড়পদং মহান্তং গোবিন্দযোগেন্দ্রমথাস্য শিষ্যম্।
শ্রীশঙ্করাচার্য্য মথাস্য শিষ্যং * * * *।

রামানুজের গ্রন্থে ভাগবতের প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।—স্মৃতি কালতরঙ্গের মতে রামানুজ ১০৪৯ শকাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং তিনি বোপদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী।

কাশ্মীর দেশীয় ক্ষেমেন্দ্র-প্রকাশে, ক্ষেমেন্দ্র ভাগবতের উল্লেখ করিয়াছেন। এই ক্ষেমেন্দ্র রাজতরঙ্গিণীকার অপেক্ষা প্রাচীন,কেন না তিনি "ক্ষেমেন্দ্রস্য নৃপাবলৌ" এই কথা বলিয়া ক্ষেমেন্দ্রকৃত রাজাবলীর কথা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতেও ভাগবতের প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। ভাগবত বোপদেবের বহুকাল পূর্ব্বের গ্রন্থ না হইলে কি জন্য হেমাদ্রি বোপদেবের সমসাময়িক হইয়া তাহার প্রমাণ সাদরে চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন? তিনি যদি ভাগবত বোপদেবকৃত কৃত্রিম পুরাণ জানিতেন, তাহা হইলে ভাগবতের প্রমাণ কখনই গ্রহণ করিতেন না। ভাগবত বোপদেব প্রণীত আধুনিক গ্রন্থ হইলে, তাহা কখনই চৈতন্যদেব, রূপ, সনাতনজীব গোস্বামীর দ্বারা আদৃত হইত

না ? ভাগবত বোপদেব প্রণীত গ্রন্থ হইলে তাহার সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন ও মান্য লেখক গণ কি জন্য টীকা করিলেন ? নিম্নে ভাগবতের টীকাসমূহের উল্লেখ করা গেল, ইহার মধ্যে বোপদেব কৃত ৩ খানি টীকা আছে।—

শ্রীধরীয়, বিজয়ধ্বজ, হরিলীলা মুক্তাফল,পরম হংসপ্রিয়া,বিদ্বৎ কামধেনু, সম্বন্ধোক্তি, তত্ত্বদীপিকা, শুকহৃদয়, সুদর্শনী, মুনি প্রকাশিকা, প্রহর্ষণী, যাদুপতী, বৃহত্তোষিণী, চক্রবর্ত্তীয়া সন্দর্ভ, বোধিনীসার, মাধবীয়, বামনী, একনাথী, পুরুষোত্তমী, মধুসূদনী ইত্যাদি ১।

যে যে প্রসিদ্ধ গ্রন্থে ভাগবতের নামোল্লেখ আছে, তাহার নামগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল। গৌরীতন্ত্র ২ পটল, পদ্ম-পুরাণ, গরুড়-পুরাণ, নারদ-পুরাণ, স্কন্ধ-পুরাণ, তত্ত্ব-প্রকাশিকা, তাৎপর্য্য চন্দ্রিকা, দিনত্রয় মীমাংসা, ক্ষীরনিধি, সদাচার বৃহস্পতি ব্যাখ্যা, স্মৃতি-কৌস্তুভ, স্মৃত্যর্থ-সাগর, নির্ণয়রত্ন, বিদ্যারণ্যমুনিকৃত জীবন্মুক্তি প্রকরণ, হেমাদ্রিকৃত ব্রতখণ্ড ওদানখণ্ড, নির্ণয়-সিন্ধু, ভট্টোজীদীক্ষিত কৃত পূজা প্রকরণ, নাগোজি ভট্টকৃত আহ্নিক শেখর, সংস্কার কৌস্তুভ, মথুরাসেতু, শ্রাদ্ধময়ূখ, ব্যবহার ময়ূখ, কালদিনকর, বিধানপারিজাত, ভোজন প্রকরণ, প্রয়োগ পারিজাত, আচার-রত্ন, সংবৎসর প্রদীপ, কলিধর্ম্ম প্রকরণ, অদ্বৈতানন্দ সাগর, কালনির্ণয়, কালনির্ণয়-দীপিকা, কালনির্ণয় বিবরণ, শঙ্করাচার্য্য কৃত বিষ্ণু সহস্র নামভাষ্য,ও তৎকৃত চতুর্দ্দশ মত বিবেক, মহারাষ্ট্রীয় গৌড়পাদকৃত পঞ্চীকরণ ব্যাখ্যা, নন্দমিশ্র কৃত গোবিন্দাষ্টক, রামায়ণ চন্দ্রিকা,রামতাপনী ব্যাখ্যা, বল্লভাচার্য্য নিবন্ধ, উৎসব প্রতান, শুদ্ধাদ্বৈত মার্ত্তণ্ড, বিদ্বন্মণ্ডল, পুরুষোত্তম মহারাজকৃত সুবর্ণসূত্র, নিম্বার্কীয় স্বমত নির্ণয়-সিন্ধু, হরিভক্তি বিলাস, রামানুজীয়,ও তৎকৃত সারসংগ্রহ, অপ্যয়দীক্ষিত কৃত শিব-তত্ত্ব বিবেক, বাচস্পতিকৃত ভক্তি প্রকাশ, অদ্বৈতসিদ্ধিকার কৃত ভক্তিরসায়ন, নাম-কৌমুদী, সচ্চরিত মীমাংসা, ভক্তিরত্নাবলী, ক্ষেমেন্দ্র প্রকাশ, ভাস্কর-রাজকৃত ললিতা টীকা, নীলকণ্ঠকৃত দেবী ভাগবত টীকা, ভক্তিসূত্র ইত্যাদি। এক্ষণে সুবিজ্ঞ পাঠক-গণ দেখুন ভাগবত যদি আধুনিক বোপদেব প্রণীত গ্রন্থ হইত, তাহা হইলে এতগুলি প্রসিদ্ধ গ্রন্থে তাহার নামোল্লেখ কখনই থাকিত না ; এবং তাহা হইলে তাহার প্রমাণ প্রসিদ্ধ মান্য ও প্রাচীন গ্রন্থকারগণ সাদরে কখনই গ্রহণ করিতেন না। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে আবার অনেকগুলি বোপদেবের পূর্ব্বের রচিত গ্রন্থ আছে। এই সকল আলোচনায় ভাগবত কখনই বোপদেব প্রণীত বলিতে সাহস হয় না। "প্রবাদো বোপদেবী তু বন্ধ্যা পুত্রায়তে তরাং" ভাগবত বোপদেব প্রণীত একথা বলা আর বন্ধ্যার পুত্র সমান। আমরা গোঁড়ামীর পক্ষপাতী নহি, কতকগুলি লেখক কেবল বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি

বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করিবার জন্য অসার ও অযৌক্তিক তর্ক উত্থাপন করিয়া ভাগবত পুরাণ বোপদেবপ্রণীত বলিতে সাহসী হইয়াছেন। আমরা ভাগবত সম্বন্ধে অন্যান্য বিচার স্বতন্ত্র প্রস্তাবে লিখিব। এই প্রস্তাবে বোপদেবের প্রসঙ্গ ক্রমে ভাগবত সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহাই বলিলাম।

শ্রীরামদাস সেন

রণরঘুর প্রলাপ।

৩। পরিতাপ ও পরিণাম ;—দোষ কাহার ?

মনে বড়ই ব্যথা পাইয়াছি ; দুঃখে, ঘৃণায়, লজ্জায় আর ইচ্ছা হয় না যে সংসারে কাহাকেও মুখ দেখাই। বস্তুতঃ আমার মত অপদার্থ অকর্ম্মণ্য জীব বোধ হয় ভারতে আর নাই। "সাধিলেই সিদ্ধি" বলিয়া, সদর্পে আস্ফালন করিয়া প্রকৃত কর্ম্মশীল কত পুরুষ অসাধ্য সাধন করিতেছেন ; আর আমি ?—দূর হউক, সে কথা মুখে আনিতেও কষ্ট বোধ হয়।

কষ্ট বোধ হয় বটে ; কিন্তু না বলিয়াই বা থাকিতে পারি কৈ ? বলিলেও কাহারও ক্ষতি দেখিতেছি না, বরং মঙ্গলের সম্ভাবনা। তবে, লোকে দুষিবে, দুষুক। লোকে যেমন বুঝে তেমনি বলে, তাহাতে লোকের ত দোষ নাই। আমি কেন হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া, তাহাতে যথাসম্ভব আলোক সম্পাত করিয়া, তাহার গূঢ়তম গুহার অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখাই না। তখনও যদি লোকে আমার দোষ দেয়, মস্তক অবনত করিয়া দোষ স্বীকার করিব, দ্বিতীয় বার বাক্যব্যয় করিব না, স্থির নিশ্চিত জানিব, কোথায়ও না কোথায়ও আমার ত্রুটি আছেই আছে। এখন যে আমার ত্রুটি নাই মনে করি, তাহা নয় ; কিন্তু আত্মচক্ষে আত্মদোষ দেখিতে পাই নাই, তাই সময়ে সময়ে স্বভাব-সুলভ বা শিক্ষা-সুলভ ভ্রান্তি যেন আপনা আপনি আসিয়া চিত্তকে উদ্বেল করিয়া তুলে, নিজদোষের অস্তিত্বের সম্বন্ধেও সন্দেহ জন্মাইয়া দেয়। তখন প্রাণ ব্যাকুল হয়, হৃদয় উৎক্ষিপ্ত হয়, জ্ঞান মোহাচ্ছন্ন হইয়া যায়, উদারতা আত্মাভিমানে মিশাইয়া যায়। তখন ভাবিতে ইচ্ছা হয়, অন্ততঃ ভাবিতে কুণ্ঠা বোধ হয় না যে দোষ আমার নহে, দোষ বধূরই। মনে হয়, বুঝি ঈর্ষাপ্রণোদিত—

ধিক্ আমায় ! এমন গরলও আমার হৃৎশোণিতে মিশ্রিত রাখিয়াছি ! অবসাদে এতদূর আত্ম বিভ্রম জন্মিতে দিয়াছি ! যাঁহাকে বুঝাইতে যত্ন করি নাই, যাঁহার

কার্য্য পরম্পরা আমি বুঝিতে সমর্থ হই নাই, স্বীয় অজ্ঞতায় নির্ভর করিয়া সেই বধূঠাকুরাণীর সম্বন্ধে এমন ভয়ঙ্করী কল্পনা একবারের তরেও আমি করিতে সাহসী হইয়াছি! আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, আমার আত্মঘাতী হওয়া উচিত।

আত্মঘাতী হওয়া উচিত, কিন্তু, আত্মহত্যা করি নাই, করিব না। যাহা উচিত, তাহাই কি কর্ত্তব্য? যাহা প্রতিদান করিতে আমার সামর্থ্য নাই, আমি তাহা লইবার কে? যাহা গড়িতে পারি না, আমি তাহা ভাঙ্গিবার কে? জরায়ুতে আমি যখন প্রথম প্রাণ পরিগ্রহ করি, তখন ত তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র কৃতিত্ব ছিল না। ভূমিষ্ঠ হইলে আমার সজীবতায় ত আমার কৃতিত্ব ছিল না। জননী আমায় স্তন্য দিয়াছিলেন; ধাত্রী আমার অঙ্গ সংস্কার করিয়া আমার সেই উচ্ছলিতানন্দ নয়নে কজ্জল রেখা পরাইয়া ক্ষণে পীঠোপরি, ক্ষণে সেই পরম-সুখ-শয্যা মাতৃঅঙ্কে প্রহরে প্রহরে, দিনে দিনে, মাসে মাসে, অতি যত্নে, অতি আদরে সাবধানে রাখিয়া দিয়াছিল; গোপ-তনয় আমার জন্য গাভী দোহন করিয়াছিল; গোপবালা আমার জন্য গাভী-বৎস পৃথক্ রাখিয়াছিল; পিতা আমার ক্রীড়নকের নিমিত্ত বিহ্বল হইয়াছিলেন; স্বর্ণকার, সময়ে আমার শোভা সম্বর্দ্ধন করিয়া উঠিতে পারে নাই বলিয়া, তিরস্কার সহিয়াছিল; তন্তুবায় আমার জন্য ভাবিয়া ব্যস্ত হইয়াছিল; কৃষক আমার জন্য বৈশাখের রৌদ্র, শ্রাবণের বৃষ্টি, মাঘের শীত সমভাবে, অকাতরে সহ্য করিয়াছিল; গুরু আমার জন্য সংসার-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানের সহিত অভেদ জ্ঞান করিয়া, কাব্য-ব্যাকরণে সমান রুচি দেখাইয়া সটীক হযবরল কণ্ঠস্থ করিতে কষ্ট বোধ করেন নাই; বসন্ত কুমার আমাকে ভালবাসা শিখাইয়াছিল; দাদা আমাকে সমাজ শাসনের মূলসূত্র বুঝাইয়া দিয়াছিলেন; আর, বধূঠাকুরাণী আমাকে সংসার চিনাইয়াছিলেন;—এতগুলি ব্যাপারের মধ্যে, কবে, কোন্‌টীতে আমি কৃতী? এই যে এত কাল লোক হাসাইলাম, এই যে এতবার প্রণয়ী কাঁদাইলাম, ইহা কি আমার কৃতিত্ব গুণে? এত যে কাব্যে আনন্দ ভোগ করিলাম, বিজ্ঞানে বিমোহিত হইলাম, গণিতে চিন্তা করিলাম, ইতিহাসে জীবন্মৃত হইলাম; আবার আলস্যে আত্ম-বিস্মৃত হইলাম, বিলাসে বিভোর হইলাম, রাগে টলিলাম, মত্ততায় ঢলিলাম,—ইহাতে আমার কৃতিত্ব-বল কোথায়? দেহ আমার; প্রাণ আমার; কিন্তু আমি কাহার? কোটি কোটি মানবে কোটি কোটি যুগ আমার মঙ্গল কামনায় তদ্গত চিত্ত থাকিয়া আমার অদ্যকার অবস্থায় আমাকে উপস্থাপিত করিয়াছে। অতএব আমি আমার নহি, আমি সংসারের। এতজনের যত্নের, এতজনের লালন পালনের ফল আমার এই দেহ প্রাণ কেং

লায় হারাইতে আমার অধিকার নাই। "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"। আমি আপনা আপনি মরিব না, আত্মহত্যা করিতে পারিব না। আবার, সর্ব্বোপরি গরীয়সী কথা, আমি মরিলে, লোকে বুঝে না, কিন্তু বলিবে, বধূ আমার মৃত্যুর কারণ। বধূর ইহাতে নিন্দা হইবে, আমার দোষে আমার জন্য নিন্দা হইবে; আমি মরিব না। মরিব কেন? আমি যাহার চক্ষুঃশূল, সে মরুক!

মরিব না; কিন্তু মনে বড় ব্যথা পাইয়াছি; এত করিয়াও বধূর মনস্তুষ্টি, আমার কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারিলাম না, এই দুঃখ আমার মর্ম্মভেদ করিতেছে। বধূকে আমার ব্যবহার বুঝাইতে পারিলাম না, বধূও দয়া প্রকাশিয়া তাঁহার মনের কথা আমায় ভাঙ্গিয়া বলিলেন না। আমি অন্ধকারে যত পাদবিক্ষেপ করিতেছি, ততই স্খলিতপদ হইতেছি। এখন ইহার উপায়? না বুঝিয়াও যেন মানিলাম যে দোষ আমারই; বিশ্বাস না করিয়াও যেন স্বীকার করিলাম আমার ত্রুটি বহুতর। কিন্তু সে ত এখনকার কথা, এখনি ফুরাইবে; তাহার পর ভবিষ্যতের পন্থা কি?

যাহা হউক, যে জন্য আমার দুঃখ, তাহা আমি বলি; যে গুলি মূল ঘটনা, আমি তাহা যে ভাবে দেখিয়াছি, যথাবৎ প্রকাশ করি। আমার সাধ যে বধূও সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, গাড়িয়া পিটিয়া, যেমন হউক, মনের কথা একবার মুখে বলুন। লোকে শুনুক, আমার কথা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলুক, বধূ প্রসন্ন হউন, আমি সুখী হই। কিন্তু বধূ কি তাহা বলিবেন? বধূই যদি বলিবেন, তবে আমার এত দুঃখ কেন? ফলে বধূ বলুন আর নাই বলুন, আমি বলি। লোকে তাহাতে আমার দোষ আমায় দেখাইয়া দিলে, আমি সংশোধন করিব, বধূর চরণে ধরিয়া ক্ষমা চাহিব, তথাপি সুখী হইব। আমি বলি।—

উপর্য্যুপরি বধূঠাকুরাণীর দুইটি সন্তান জন্মিয়া, প্রথমটি তিন দিন পরে, অপরটি দশমাস পরে মরিয়া যায়। ইহাতে বধূর ও দাদার বিষম মনোবেদনা; আমিও তাঁহাদের দুঃখে দুঃখিত।

আমি যে দুঃখিত, বধূঠাকুরাণী তাহা বিশ্বাস করেন না, আমি ইহার চাক্ষুষ প্রমাণ দিয়াছি, তথাপি তিনি বিশ্বাস করেন না। আমাদের প্রতিবেশিনীদের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে একাধিক বার বলিয়াছিলেন—"ছি! রণরঙ্গু, এমন করাটা তোমার উচিত নয়, ভাল দেখায় না। তোমার বিবাহ হয় নাই; তাহা বলিয়া যাহার হইয়াছে, তাহার হিংসা করাটা কি ভাল? প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ, যখন ঘটিবার তখন ঘটিবে; তোমার দাদার ত ইহাতে দোষ নাই। আর দাদার অমনোযোগ, অযত্নই যদি ভাব, সে ভাল মানুষের মেয়ে ত কোন কিছুতেই নাই; তাহার মনে কেন কষ্ট দেও? আর বি-

বেচনা করিয়া দেখ,তোমার দাদার ছেলে-ও ত পর নয়; সে বাঁচিলে তোমাদেরই বংশ থাকিবে,তোমাদেরই নাম থাকিবে।" ইত্যাদি অনেক কথা, অনেক বার, স্থির ভাবে আমি শুনিয়াছি কিন্তু কখনই বাঙ্‌-নিষ্পত্তি করি নাই। যিনি যখন বলিয়াছেন, তাঁহার কথা না ফুরাইতেই হাসিতে আরম্ভ করিয়াছি, শেষে অট্টহাসি হাসিয়াছি। তখন যে তাঁহারা মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতেন, এখন, এত দিনে বুঝিতেছি, যেঁ আমার সেই হাসি তাঁহারা অনুদার দৃষ্টিতে দেখিতেন, তাহার দোষ ভাব গ্রহণ করিতেন; করিয়া বিরক্ত হইয়া শেষে হয় ত বধূর নিকট গিয়া বধূর প্রতি তাঁহাদের ভালবাসা জানাইতেন। সংসারে এ ভালবাসার সৃষ্টি কে করিল? তোমার আমোদে যে আমার সর্ব্বনাশ হয়, লোকে ইহা কবে শিখিবে?

যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহা করিয়াছে, সে তাহা বলিয়াছে। কিন্তু বধূর দুঃখে যে আমি দুঃখ পাইয়াছি, তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ আমি দিতে ত্রুটি করি-নাই। তাঁহার সেই প্রথম সন্তান নষ্ট হইলে, সেই মাঘ মাসে, সেই অমানিশিতে, সেই স্থূলান্ধকার-বিদারি ঘন ঘন বিদ্যুতের বিকট কুটিল হাস্য উপেক্ষিয়া, সেই শূন্যতাবাহি পবনের ভীতিসঞ্চারী শুষ্কশ্বাসে কর্ণপাত না করিয়া, সেই প্রাণশূন্য জ্ঞানশূন্য বিকলাঙ্গ একমাত্র নরদেহের অভ্রভেদী দুর্গন্ধ পরিবর্জ্জন করিতে গিয়া সেই বীভৎস কঙ্কাল-রাশির প্রতিঘাতে সেই শবদেহোপরি পতিত হইয়া, আবার সেই সখা-শূন্য, প্রেমশূন্য, অশ্রুশূন্য সেই পরকাল প্রতিবিম্ব প্রেতভূমি অতিক্রম করিয়া, আর্দ্র বস্ত্রে, কম্পিত-কলেবরে বধূর জন্য কেও ঔষধ আনিয়া দিয়াছিল? দূরে, নিকটে, গ্রামে, নগরে, একক অপরিচিত, এ দেবতার পুষ্প, ও দেবতার স্নাতোদক, বধূর জন্য কে আহরণ করিয়াছিল? অগণিত অমানুষের তোষামোদ, চণ্ডালের পরিচর্য্যা বধূর জন্য কে করিয়াছিল? এত করিয়াও দ্বিতীয়বার সন্তান নষ্ট হইল বটে, কিন্তু সে কি আমারই দোষে? বধূ বলিয়া ছিলেন "ভক্তি করিয়া আনে নাই"—তিনি আমার নাম করেন নাই, কিন্তু এই কথা গুলি বলিয়াছিলেন,আর অকপটে কাঁদিয়া ছিলেন। পুত্রশোকে তিনি কাঁদিতেছেন, তাঁহার চিত্ত তখন উৎক্ষিপ্ত, আমি তাঁহার কথা গ্রাহ্য করি নাই, বরং নির্জ্জনে, নীরবে দুই বিন্দু অশ্রুমার্জ্জন করিয়াছি। যাহা হউক,আমার কর্ত্তব্য আমি করিয়াছি, আমার যাহা সহিতে হয়,তাহা সহিয়াছি। আমি না করিলে কে করিবে? আমি না সহিলে কে সহিবে? এবারেও তাহাই ভাবিয়া করিলাম এবং সহিলাম; তথাপি হা দৈব! বধূর মন পাইলাম না।

এবারে আয়ুষ্মান্ পুত্রকামনায় বধূর সঙ্কল্পমতে দাদা মহাশয় যজ্ঞ করিয়াছেন। অদ্য সেই যজ্ঞ ক্রিয়া; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পরিচর্য্যা, অতিথির সৎকার, আগন্তুকের

অভ্যর্থনা,এই সকল ব্যাপারে আজি সকলেই ব্যস্ত। আমিও বসিয়া নাই।

সপ্তাহ ব্যাপিয়া এই ব্যাপারের আয়োজন হইতেছে। বিষয় কার্য্যে অমনোযোগ করিলে সকল দিকেই ক্ষতি,সুতরাং অগ্রজ মহাশয় তাহাতেই ব্যাপৃত ; আমাদের ভৃত্য ও কৃষাণ সংপ্রতি বহুলীকৃত গৃহ কার্য্যে ব্যস্ত, আর আমি নানা স্থান হইতে নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সংযোগ করিতেছি। এই সাত দিন, দিনমানের মধ্যে বাটীতে আহার করি নাই ; প্রত্যুষে বাহির হইয়াছি, হাটে বাজারে যাহা পাইয়াছি, কিনিয়া লইয়া ক্ষুন্নিবারণ করিয়াছি,সন্ধ্যার পর গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছি। কেবল গত কল্য একবার মধ্যাহ্নে বাটী আসিয়াছিলাম, কার্য্যসমাধান করিয়া আসিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, স্নানাহার সমাপন করিয়া একবার বসন্তকুমারকে দেখিয়া আসিব। স্নানাহার করিলাম, আমার সেই চণ্ডীমণ্ডপের কুঠরী হইতে বাহির হইতেছি, এমন সময়ে দাদার দৃষ্টি পথে পতিত হইলাম। দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথায় যাইতেছ ?" কি জন্য বলিতে পারি না, আমি বলিয়া ফেলিলাম "কোথায়ও না"। সুতরাং আর যাওয়া ঘটিল না ; ক্ষণকাল পরেই দাদা মহাশয় আমাকে কার্য্যান্তরে, গ্রামান্তরে পাঠাইয়া দিলেন। দূরে যাইতে হইয়াছিল, কল্য প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারি নাই ; অদ্য বেলা এক প্রহর না হইতেই আসিয়াছি।

তখন আমাদের বহির্ব্বাটীতে লোক সমাগম হইয়াছে, সুতরাং বাহিরেই রহিলাম, তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া লইলাম, তাহার পর সেইখানেই উপস্থিত মত, কার্য্য করিতে লাগিলাম। মধ্যাহ্নে একবার বাটীর মধ্যে গেলাম, বধূর নিকট যাহা আবশ্যক হইয়াছিল, চাহিলাম। যাহা চাহিলাম, তাহা তিনি দিলেন না, কিছু বলিলেন। তখন বুঝিয়াছিলাম যে তিনি বলিতেছেন "তোমায় আজি কিছু করিতে হইবে না।" এখন বুঝিতেছি তিনি বলিয়াছিলেন "তোমায় 'আমার' কিছু করিতে হইবে না!"

তখন ভাবিয়াছিলাম, কয় দিন আমার কষ্ট হইয়াছে মনে করিয়া বধূ আমায় বিশ্রাম করিতে বলিতেছেন। সেই ভাবে, আনন্দে আপ্লুত হইয়া,আমার শরীর মনের ক্লেশাবসান হইল বিবেচনা করিয়া সত্য সত্যই বিরাম করিতে আমার সেই ঘরে গেলাম।

আমার তৎকালের সে আহ্লাদের গৌরব অনির্ব্বচনীয়; অপরে তাহা অনুভব করিতে পারিবে না। তামাক সাজিলাম, সকল ভুলিয়া সেল্‌কার্কের কথা লইয়া বলিলাম, আমিই সর্ব্বে সর্ব্বা, আমি মহারাজ চক্রবর্ত্তী,আমি অনুপম, আমি শরীরবদ্ধ সুখ। আমার মুখ-বিনির্গত ধুমপুঞ্জ যেমন ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল, আমার অন্তর তেমনি লঘু, ততোধিক লঘুভাবে উৎফুল্ল হইতে লাগিল। তখন আমার মনে কত

ভাবেরই উদয় হইতে লাগিল। মনে হইল যে কতকাল পরে আজি আমার সাধের সুখ পাইলাম; তখনই আবার মনে হইল প্রকৃত সুখের এই নিয়ম, প্রকৃতি আমাদিগকে দেখাইতেছেন। ভাবিলাম যাহা সুখ, তাহা এমনি দুর্লভ বটে! বর্ষে কয়টি পৌর্ণমাসী রজনী? আবার পুর্ণিমাতিথি সত্ত্বেও বৎসর মধ্যে যামিনী সুন্দরী কত বার সুধা-নিস্যন্দিনী কৌমুদীতে অভিষিক্তা হয়? কিন্তু হায়! আমারই সুখচন্দ্র যে মেঘাচ্ছন্ন হইবে, তখন আমি তাহা ভাবি নাই। সুখের দিনে কে কবে দেব দুর্য্যোগের কল্পনা করিয়া থাকে? ভ্রান্তিই সুখ, নহিলে সংসারে হাসি কান্না থাকিত না; এ সংসার এমন সংসার হইত না।

বসিয়া ধূমপান করিতেছি, বাহির হইতে এক ব্যক্তি অপরিচিত স্বরে আমার নাম ধরিয়া ডাকিল। আমি বাহিরে আসিলে, এক ব্যক্তি আমার হস্তে এক খানি পত্র দিল। শিরোনামার হস্তাক্ষর অপক্ক, এবং আমার অপরিচিত; অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলাম, কিন্তু কাহার লেখা, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। পত্র বাহককে জিজ্ঞাসা করি, মনে করিলাম; কিন্তু চাহিয়া দেখি সে ব্যক্তি সেখানে নাই। কাহার লেখা, ভাবিতে আমার কতক্ষণ লাগিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারি নাই।

পত্র পাঠ করিতে ঔৎসুক্য হইল; কিন্তু যেই পত্র খুলিতে যাইব, অমনি দাদা ডাকিলেন। আমি প্রায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাটীর মধ্যে গেলাম। গিয়া দেখিলাম দাদার মুখ গম্ভীর; আর যাহা শুনিলাম, তাহাতে আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। শুনিলাম বধূ বলিতেছেন "আমার ছেলে বাঁচে আর না বাঁচে, তাঁহার কি? তোমার ভাই—" আর শুনিলাম না, বাহিরে চলিয়া আসিলাম। সঙ্গে সঙ্গে দাদাও বাহিরে আসিলেন। আসিয়া সেই লোকসমারোহের মধ্যে আমাকে বলিলেন "রণরঘু, তুমি সহোদর, ভাল বাসিবার বস্তু; কিন্তু আর বুঝি ভালবাসা রাখিতে পারি না। আমার সন্তান হউক না উহক, বাঁচুক না বাঁচুক, আমার তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। বরং তুমি বাঁচিয়া থাকিলেই আমার পরম সুখের বিষয়। কিন্তু স্ত্রীলোকে তাহা বুঝে না; বিশেষতঃ তাহার এত কষ্টে তাহার না বুঝাতেও আমি দোষ দিতে পারি না। তথাপি তুমি অজ্ঞানের মত, মূর্খের মত, বর্ব্বরের মত, নিষ্ঠুরের মত, তাহার সেই দুঃখের জ্বালা দ্বিগুণিত করিতেছ"

আমি নিরুত্তর, অবাক্। অবসর দেখিয়া দাদার অগোচরে গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছি।

এখন আমি একাকী, একবস্ত্র, কপর্দ্দকহীন, সহায়হীন, নিরাশ্রয়, নিরুদ্দেশ্য। কোথায় চলিলাম, আমিই জানি না। আমার এই পরিণাম; দোষ কাহার?

এই রাত্রিকালে, এই প্রাণিশূন্য প্রান্তরে প্রতিধ্বনি বলিবে—“কাহার?”

আমি এখন কি করিব? জ্যোৎস্না আছে, একবার সেই পত্র খানি পড়িবার চেষ্টা করি।

শ্রীরণরঘু গোস্বামী

অধ্যয়ন বিষয়ে কএকটি উপদেশ।

“ভালর অল্পও ভাল,”—কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে অধ্যয়ন বিষয়েও এই প্রবাদ খাটিত। কদর্য্য অসার গ্রন্থাদি বহুল পরিমাণে অধ্যয়ন করা অপেক্ষা দুই একখানি সদ্গ্রন্থ পাঠ করা অধিকতর বাঞ্ছনীয়; এখন একখানি নাটক, তখন একখানা ইতিহাস, অপর সময়ে একখানা সংবাদ-পত্র এরূপ পাঠে কোন ফল নাই; ভাল এক খানি গ্রন্থ ভাল করিয়া পাঠ করিয়া স্মরণ রাখ, তবেই কাজ চলিবে; অধিক কিছু পড়িবার প্রয়োজন নাই। যখন মুদ্রাযন্ত্র প্রচলিত ছিল না; যখন সাধারণ-পুস্তকালয় স্থাপিত হয় নাই; যখন মাসে মাসে দিনে দিনে নূতন নূতন গ্রন্থ, মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক সংবাদ পত্র, সাহিত্যিক পত্রিকা ও সমালোচনা প্রভৃতি প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয় নাই; তখন “ভালর অল্পও ভাল” একথা শোভা পাইত এবং এই প্রবাদানুসারে চলিলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু আজি কালি সে দিন নাই; এখন নিতান্ত মূর্খ ও অলস ভিন্ন এরূপ উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া কেহই চলিতে পারে না। কাল-ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; কাল-স্রোত উন্নতি-বর্ত্মে ক্রমে অগ্রসর হইতেছে, কালচক্র নিয়ত ঘুরিতেছে, পৃথিবী ঘুরিতেছে, গ্রহ উপগ্রহ ঘুরিতেছে, সকলেই উন্নতির পথে অগ্রসর। কালের তাড়নে অগ্রসর—তুমি কেমন করিয়া “অল্পে” সন্তুষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবে? যদি পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে নিতান্ত প্রতিজ্ঞারূঢ় না হইয়া থাক, তবে তোমাকেও কাল-স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইতে হইবে, হয় অগ্রসর হইবে, নতুবা তুমি জড়ভরতের মত পড়িয়া থাকিবে, পৃথিবী তোমার উদ্দেশ লইবে না—কারণ কালের সঙ্গে যোগ না দিলে তুমি পৃথিবীর কেহ নও, পৃথিবীও তোমার কেহ নয়। মোট কথা, তোমাকে অল্প সময়ে নানা বিষয় অধ্যয়ন করিতে হইবে, এক সময়ে নানাবিধ বিষয়ে তোমার মনঃসংযোগ করিতে হইবে, অন্যথা সমাজ তোমাকে নিতান্ত জড় পদার্থবৎ মনে করিবে,—লোকের নিকট নিতান্ত হেয় হইয়া তোমাকে থাকিতে হইবে। এরূপ যখন হইল, তখন কি কি বিষয় পড়িতে হইবে,

এবং কি প্রকারে পড়িতে হইবে, এসম্বন্ধে যদি আমরা কএকটী নিয়ম নির্দ্ধারণ করি, তবে বোধ হয় পাঠকের নিকট "বান্ধবের" অকর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

আমরা উপরে যে কর্ত্তব্যের উল্লেখ করিলাম, তাহা আপাততঃ যেরূপ সহজ বোধ হয়, বাস্তবিক তাহা নহে। সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকের প্রীতিকর ও প্রয়োজনীয় সাধারণ নিয়ম বিধিবদ্ধ করা অসাধ্য ব্যাপার। ভিন্ন ভিন্ন পাঠকের ভিন্ন ভিন্ন স্পৃহা, ভিন্ন ভিন্ন রুচি, ভিন্ন ভিন্ন সুযোগ ইত্যাদি। সুতরাং পাঠবিষয়ে সাধারণ নিয়ম কেমন করিয়া হইতে পারে? পাঠের নিয়ম পাঠকের হাতে। ফলতঃ যে পাঠক স্পৃহা, রুচি, সুযোগ প্রভৃতি অনুসারে আপনার জন্য স্বয়ং অধ্যয়ন বিষয়ে নিয়ম নির্দ্ধারণ করিতে অসমর্থ, তিনি পাঠকনামের যোগ্যই নহেন, এবং তাঁহার অধ্যয়ন বাল্যক্রীড়া মাত্র। সাধারণ নিয়ম নির্দ্ধারণ করা একপ্রকার অসম্ভব হইলেও, আমরা একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি?

১মতঃ। তুমি এক সময়ে নানা বিষয় ঘটিত নানা পুস্তক পত্রিকা ইত্যাদি পড়িতে চাও ক্ষতি নাই—বরং না পড়িলে চলিবে না। কিন্তু একখানি সদ্গ্রন্থ নির্ব্বাচন করিয়া লইবে। উক্ত গ্রন্থ তোমার অধ্যয়নের প্রধান সামগ্রী হইবে। অপরাপর ক্ষুদ্র গ্রন্থ পত্রিকাদি তাহার আনুসঙ্গিক মাত্র। নিবিষ্টচিত্তে কোন সদ্গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে মনের ভাব ক্রমশঃ সংস্কৃত ও উন্নত হইবে; বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইবে; হৃদয় প্রশস্ত হইবে; বিচার শক্তি দৃঢ়ীভূত হইবে; এবং গ্রন্থ অধ্যয়নে যে ফল তাহা সম্পূর্ণ রূপ ফলিবে। কিন্তু কোন বৃহৎ গ্রন্থ যত উৎকৃষ্ট ও জ্ঞান-গর্ভ হউক না কেন, এক বিষয়ে অনেকক্ষণ অভিনিবেশ থাকে না। বহুক্ষণ কোন এক বিষয় পাঠ করিলে মনে এক প্রকার বৈরক্তি জন্মে। প্রত্যহ এক প্রকার আহার করিলে যেরূপ ভাল লাগে না এবং স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত জন্মে; এক প্রকার পুস্তক পাঠেও তদ্রূপ বৈরক্তির উৎপাদন করে, এবং মনের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। যিনি প্রত্যহ পলান্ন ভোজন করেন, তাঁহার যেমন কখন কখন লুচি, রুটী, ভাত খাওয়া আবশ্যক; যিনি কোমত, মিল, বা বেকন অধ্যয়নে নিয়ত নিযুক্ত, তাঁহার পক্ষে তেমনি উপন্যাস, নাটক সংবাদ পত্র ও সাহিত্যিক পত্রিকা মধ্যে মধ্যে পাঠকরা আবশ্যক। পক্ষান্তরে নিয়ত শাকান্ন ভোজনে যেরূপ শরীর রুগ্ন ও ভগ্ন হয়; নিয়ত উপন্যাস নাটকাদি পাঠে মনও তেমনি নিস্তেজ হইয়া পড়ে। অতএবই বলি কোন চিন্তা-সাধ্য সদ্গ্রন্থ প্রধান পাঠ্য স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট করিবে; অনাবিষ্ট চিত্ততা ও বৈরক্তি অপনয়নের জন্য কেবল সহজ বোধ্য নাটক উপন্যাস প্রভৃতি পাঠ করিবে। আমাদের বক্তব্য বিশদ করিয়া বুঝাইবার জন্য সহজ একটি উদাহরণ দিতেছি। মনে কর তুমি এলিসন

ক্বত "ফরাসিবিপ্লব" পাঠ করিয়াছ। সংপ্রতি যে রুসিয়ার ভারত-আক্রমণ আ-শঙ্কা হইতেছে, তাহা সত্য কিনা; তাহা সম্ভব কিনা, সম্ভব হইলে তাহার কি কি কারণ আছে; আক্রমণ করিলে তাহার ভাবি ফল কি হইবে ? ইত্যাদি বিষয় তুমি যেরূপ অনুমান করিতে পারিবে; যে সকল পাঠক শুদ্ধ দৈনিক বা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র পাঠ করিয়া রাজ-নীতি, সৈনিক বিদ্যা, বা বার্ত্তাশাস্ত্রের আভাস মাত্র অবগত হইয়া থাকেন, তাঁহারা এবিষয়ে কোনও মতামত প্রকাশে আদৌ সক্ষমই হইবেন না। বালক যেমন উপকথা শু-নিতেং "তার পর কি ?" বলিয়া উৎসুক হয়, সংবাদ পত্র পাঠকেরা তেমনি "আ-জিকার কাগজে যেন কি খবর আছে" বলিয়া ডাকের হরকরার জন্ম পথ পানে তাকাইয়া থাকেন। যে পাঠক নেপোলি-য়ান বোনাপার্টির পতনের আনুপূর্ব্বিক ঘটনা অবগত আছেন, বিগত ফরাসী প্রু-সীয় যুদ্ধে কাহার পতন হইবে, তিনি অ-গ্রেই জানিতেন। কিন্তু সংবাদ পত্র মাত্র পাঠ করিয়া যাঁহারা উক্ত যুদ্ধের বিবরণ অবগত হইতেছিলেন, তাঁহারা শেষ ফলের বিষয় বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবেন নাই। বিগত সিপাহী যুদ্ধে সামান্ত ইংরেজেরা ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়িয়াছিলেন, লর্ডক্যানিং ইংরেজের ভাবিজয় নিশ্চয় রূপে বুঝিতে পারিয়া অচলবৎ অটল ছিলেন।

২য়তঃ। যেগ্রন্থ তোমার প্রধান পা-ঠ্যরূপে নির্ব্বাচন করিয়াছ, তদ্গ্রন্থকার স্বীয় মত বা বক্তব্য সমর্থন জন্ম যে সকল ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, বা যে সকল লেখকের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা সত্য কি না সে বিষয় নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিবে। অনেক লেখকের রোগ আছে, তাঁহারা স্বকপোল-কল্পিত মতকে অন্যের মত বলিয়া উল্লেখ করেন; অথবা কখন কখন এমন এক একটি বচন বা, বাক্য উদ্ধৃত করেন যাহার একাংশমাত্র তাঁহার বাক্যের প্রতিপোষকে,কিন্তু সম্পূর্ণ বাক্যটির ভাব অন্যরূপ; আবার অনেকে অন্যের মত, বা বাক্য চুরি করিয়া আপনার বলিয়া প্রকাশ করেন। এ সকল বিষয় ধরা সকল পাঠকের পক্ষে সহজ নহে; কিন্তু দুই-চারিটি স্থান ধরিয়া বিচার করিলেই বু-ঝিতে পারা যায়, আমরা যে গ্রন্থ পড়ি-তেছি, তাহার মত ও বাক্য কতদূর বিশ্বস-নীয়, যদি শতেকের মধ্যে একটি স্থানেও এইরূপ জুয়াচুরি ধরিতে পারি, তবে নিরনব্বই স্থানেও যে ঐরূপ জুয়াচুরি আছে, তাহা একরূপ অনুমান করিয়া লওয়া যায়। এরূপ গ্রন্থ যত কেন উৎকৃষ্ট হউক না, একমাত্র এরূপ "অসাধুতার" জন্য উহা সর্ব্বথা অপাঠ্যও পরিবর্জ্জনীয়। মনে কর কোন গ্রন্থকার বলিতেছেন "গালিলিও পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়াছে, তাহার হেতু এই এই"। হেতু গুলি ন্যায় সঙ্গত ও বিজ্ঞানসম্মত হইতে পারে, কিন্তু নিউটনের স্থলে গালিলিওর নামের উল্লেখ

করাতেই গ্রন্থকারের বিদ্যাব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ পাইয়াছে। পুনশ্চ, মনে কর, কোন ধর্ম্মোপদেষ্টা বলিয়া গিয়াছেন "যত তীর্থ-পরিশ্রম, সকলি মনের ভ্রম, সারকর শ্রীগুরুচরণ।" এস্থলে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, গুরুরূপী ভগবানের পাদ পদ্ম যিনি সার জ্ঞান করিয়াছেন,তাঁহার তীর্থ পর্য্যটনাদি-বাহ্য ধর্ম্মকর্ম্মের কোন প্রয়োজন নাই,ইহা বলাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য, অন্যথা তীর্থপর্য্যটন নিষিদ্ধ বলা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু যিনি তীর্থ পর্য্যটনাদির বিপক্ষ, তিনি স্বীয়-মতসমর্থন করিবার জন্য, শেষ চরণটি বাদ দিয়া প্রথম দুটি চরণ উদ্ধৃত করিয়া আপনার মনোমত মীমাংসা করিয়াছেন। আর উদাহরণের প্রয়োজন নাই; পাঠককে এইমাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি যে এরূপ গ্রন্থ পাঠে ক্ষতি ব্যতীত লাভ নাই। এই উপদেশ মত চলিলে শীঘ্রই পাঠকের " সমালোচনশক্তির " বিকাশ হইবে।

৩য়তঃ। পাঠ্য বিষয়ানুসারে দ্রুত বা ধীরে পড়িতে হইবে। যে বিষয় বুঝিতে অধিক চিন্তার প্রয়োজন করে না, তাহা শীঘ্র শীঘ্র পড়িবে; যাহা বুঝিতে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, চিন্তা ও বিচার শক্তির আবশ্যক, তাহা যত ধীরে হয় পড়িবে, কেবল পাত উল্টাইয়া গেলে হইবে না। গত কল্য ৫০ পৃষ্ঠা পড়িয়াছ বলিয়া অদ্যও যে ৫০ পৃষ্ঠাই পড়িতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। কেহ কেহ বলিতে পারেন, এ নিয়মের কোন আবশ্যকতাই নাই; কারণ, প্রত্যেক পাঠক স্বতঃই এ নিয়মানুসারে চলিয়া থাকেন। যদি যথার্থই পাঠকমাত্রে এরূপ নিয়মে চলিতেন, তাহা হইলে এরূপ নিয়মের যে প্রয়োজন ছিল না,তাহা কে অস্বীকার করে? কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অতি অল্প পাঠকই এ নিয়মে পড়েন; তাতেই আমাদের এ উপদেশ। পড়িতে পড়িতে অনেকের এক প্রকার বৈরক্তি জন্মে, তখন তাড়াতাড়ি পাত উল্টাইয়া গেলেই তাঁহারা রক্ষা পাইলেন মনে করেন। অনেকে বিষয়ের প্রতি মনোযোগ বড় একটা না দিয়া জলস্রোতের ন্যায় এক নিশ্বাসে এক এক পৃষ্ঠা পড়িয়া ফেলেন। এরূপ করা যে অন্যায় তাহা বলাই বাহুল্য। লেখক যে বিষয়টি চিন্তা করিয়া লিখিয়াছেন, তাহা চিন্তাশীলের ন্যায় না পড়িলে বুঝা যাইবে কেন? আর না বুঝিয়া পড়িলেই বা ফল কি? অন্ন ব্যঞ্জনাদি যেরূপ শরীর রক্ষার সামগ্রী, মনের আহার তেমনি জ্ঞান। মন্দাগ্নিসত্ত্বে আহার করিলে যেমন জীর্ণ হয় না, অনিচ্ছাসত্ত্বে পড়িলেও তদ্রূপ ভুলিয়া যাইতে হয়। পঠিত বিষয় কার্য্যোপযোগী করিতে হইলে, তাহা অভিনিবেশপূর্ব্বক পড়িতে হইবে; এবং পড়িয়া স্মরণ রাখিতে হইবে। লর্ড বেকন কহেন " কোন কোন গ্রন্থের আস্বাদমাত্র লইতে হইবে; কোন কোন গ্রন্থের রস পান করিতে হইবে; কোন কোন গ্রন্থ গ্রাস করিয়া জীর্ণ করিতে হইবে।" শে-

ষটি করিবার ইচ্ছা না হইলে, প্রথম দুটি করিতে ক্ষতি নাই। কিন্তু যে সময় অধ্যয়নে একেবারে অভিনিবেশ না থাকে, তখন "স্বাদগৃহ পর্য্যন্ত" নিষিদ্ধ। জ্বর হইলে গুরু আহার না করিয়া সাগু, এরাকট খাওয়া বিহিত; কিন্তু প্রবল নূতন জ্বরে "লঙ্ঘনং পথ্যং"। আমরা তৃতীয় নিয়মের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি নিয়মেরও উল্লেখ করিয়াছি। অতএব দুইটি নিয়ম সংক্ষেপে পৃথক করিয়া বলিতেছি। (১) বিষয় বিশেষে দ্রুত বা ধীরে পড়িতে হইবে। (২) বৈরক্তি জন্মিবামাত্র পুস্তক বন্ধ করিয়া অন্য বিষয়ে ক্ষণকাল মনঃসংযোগ করিতে হইবে। দ্বিতীয়টি আমাদের চতুর্থ উপদেশ। সংপ্রতি আমরা পঞ্চম নিয়মের উল্লেখ করিতেছি।

৫মতঃ। পাঠ্যগ্রন্থে যে সকল নূতন শব্দ, নূতন ভাব, অথবা ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের উল্লেখ থাকে, তাহা তৎক্ষণাৎ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য নিকটে একটি পেন্সিল, শাদা কাগজ বা নোটবুক এবং একখানি অভিধান রাখা প্রয়োজন। অপরিজ্ঞাত শব্দের অর্থ এইরূপে শিখিলে ক্রমে ভাষাতে অধিকার জন্মে। নূতন ভাব লিখিয়া রাখিয়া অবসরক্রমে শিখিলে ক্রমে মন প্রশস্ত হয়। এবং ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত প্রভৃতি সুন্দররূপে বুঝিতে পারিলে পাঠ্যবিষয়ও সুন্দররূপে বুঝা যায়; ও চিত্তপটে উক্ত বিষয়টি স্পষ্টভাবে চিত্রিত হইয়া থাকে। লর্ড মেকলে কত পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই; সুতরাং তদীয় রচনায় ইতিহাস, জীবনচরিত ও অন্যান্য বিষয়ের যত উল্লেখ আছে, অন্য কোন গ্রন্থকারের রচনায়ই তত দেখা যায় না। তিনি যে স্বীয় বিদ্যাপ্রকাশের জন্য এরূপ করিতেন তাহা নহে; লিখিতে লিখিতে স্বতঃই সে গুলি তদীয় লেখনীমুখে উপস্থিত হইত। ওয়ারণ হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে যে বিচার হয়, তাহার সমালোচনা করার উপলক্ষে, লর্ড মেকলে এক স্থানে কহিয়াছেন "বার্ক ভারতবর্ষের বিবরণ এরূপ অবগত ছিলেন যে, জর্জ্জ গর্ডনের বিদ্রোহের ন্যায় বারাণসীর বিদ্রোহ, এবং ডাক্তর ডডের প্রাণদণ্ডের ন্যায় রাজা নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড বিবরণ তাঁহার নিকট প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইয়াছিল।" জীবনচরিত-ঘটিত একখান অভিধান খুলিলেই পাঠক ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের জর্জ্জ গর্ডনকৃত কেথলিক-মুক্তি সম্বন্ধীয় বিদ্রোহের বিবরণ জানিতে পারিবেন। এবং যিনি বসোএলকৃত জন্সনের চরিত পাঠ করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে জাল করা অপরাধে ডড নামক একজন যাজকের উপরোক্ত সময়ে ফাঁসি হইয়াছিল, এবং জন্সন তাহার প্রাণরক্ষার্থে অনেক যত্ন করিয়াছিলেন। এই দুটি বিবরণ অবগত হওয়াতে যে বিশেষ ফল আছে, তাহা আমরা বলি না। কিন্তু এই দুটি বিষয় জানা থাকিলে যেরূপ লর্ড মেকলের উল্লিখিত বাক্যের [illegible] ভাবের উপমানের সাদৃশ্য দেখিয়া

মনে পুলক উপস্থিত হইবে, তেমনি এই ঘটনা চতুষ্টয় চিরদিনের তরে মনোমধ্যে অঙ্কিত হইয়া থাকিবে। বিশেষতঃ এই-রূপ ভাবে পড়িলে, বৎসরান্তে পাঠক যত জ্ঞান লাভ করিবেন, অন্যথা পঞ্চাশৎ বৎ-সরেও তাহা করিতে সমর্থ হইবেন না।

৬ ষ্ঠতঃ। এক বিষয়ে যতগুলি গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে যেখান সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহাই পাঠ করা উচিত। হইতে পারে কোন গ্রন্থকারের প্রতি কোন কারণে তোমার বিদ্বেষ আছে; অথবা কোন বিষয়ে তো-মার কোনরূপ স্থির মত আছে; কিন্তু গ্র-ন্থকার বিশেষের গ্রন্থবিশেষ পাঠ করিলে সে মত আর বজায় রাখিতে পার না। এসকল সত্ত্বেও তদীয় গ্রন্থ যদি উপস্থিত বিষয় সংক্রান্ত গ্রন্থ মধ্যে উৎকৃষ্ট হয়, তবে তাহাই পাঠ করিবে। মনে কর, তুমি আদ্যোপান্ত ইংরাজদিগের ভারতাধিকা-রের বিস্তারিত বিবরণ জানিতে চাও; মরে, মার্সমেন ও মিল এই তিন জনের ইতিহাসই তোমার সম্মুখে বর্ত্তমান। এই তিন জনের মধ্যে মিলের ইতিহাসের প্রতিপক্ষাতিতা ও জাতিবিদ্বেষিতা দোষের জন্য তোমার ঘৃণা আছে; অথচ মিল না পড়িলে সকল বৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে জানিবার সম্ভাবনা নাই; এমত স্থলে বিদ্বেষ সত্ত্বেও মিল প-ড়াই তোমার উচিত।

৭মতঃ। কেবল সমাজে আলাপ ক-রিতে সক্ষম হইবে বলিয়া পড়িও না। অ-নেকের ভ্রম আছে যে,যে কোন বিষয় উ-পস্থিতহউক,তাহাতে দুই চারি কথা কহিতে পারিলেই বিদ্যার যথার্থ উদ্দেশ্য সংসাধিত হইল। সর্ব্ববিষয়ে বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়-প্রচলিত সাধারণ আলোচ্য বিষয়ে কিছু কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক বটে,কিন্তু সেই জ্ঞানটুকুই একমাত্র জ্ঞান নহে। অনেকে কোন গ্রন্থই পড়েন না, কেবল দৈনিক বা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র পড়িয়া লোকস-মাজে বিদ্বান্ বলিয়া পরিচিত হইতে সাধ করেন। ইহাদের মধ্যে অনেকে আবার সংবাদ পত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভ পর্য্যন্ত পাঠ করেন না; সংবাদ-স্তম্ভই তাঁহাদের একমাত্র পাঠ্য। এরূপ পাঠক নিতান্ত অন্তঃসার-বিহীন। বর্ত্তমান ঘটনাবলী প-ত্রিকাপাঠে জানা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে প্রকৃত জ্ঞানলাভ কোথা? আইভানহোর কএক পৃষ্ঠা পড়িয়া বলিতে পারিবে বটে যে, আয়েসা রিবেকার ছায়া ও বঙ্গাধিপ-পরাজয়ের "সৈনিক প্রদর্শন" টুর্ণেমে-ণ্টের অনুকরণ; কিন্তু তাহাতে ফল কি? কোন দৈনিকপত্র পড়িয়া বলিতে পারিবে বটে "ইনস্পেক্টর—সাহেব আত্মহত্যা করিয়াছেন" এবং পরদিন অন্য একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা পড়িয়া সে কথার প্র-তিবাদ করিতে পারিবে বটে, কিন্তু তেমন খবরে জগতের বা তোমার নিজের কিছু উপকার কি আছে? উপকার দূরে থা-কুক যথেষ্ট অপকারই সাধিত হইবে। এ-রূপ পল্লব-গ্রাহী অভ্যাস হইলে চিন্তা-সাধ্য কোন বিষয়ে মন আর যাইবে না, ক্রমে

মন অসার ও নিস্তেজ হইবে। বর্ত্তমান শতাব্দীর একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার * বলিয়াছেন "সকল বিষয়ে কিছু কিছু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন বটে, কিন্তু কোন এক বিষয়ে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি থাকা আবশ্যক।" একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দেখ। প্রায় সকলেই দুই চারিটি ভাল কথা জানে; দুই একটি খোস গল্প জানে; দুই একটি তাল বাজাইতে পারে; দুই একটি গান করিতে পারে; একটুকু নাচিতে—অন্ততঃ লম্ফ ঝম্প দিতে সমর্থ; একটুকু চিত্র—অন্ততঃ একটা পেঁচা আঁকিতে জানে; দুই একটা আঁক কসিতে পারে; এবং একটুকু ব্যায়াম—অন্ততঃ এক খান লাঠী ঘুরাইতে জানে। কিন্তু কে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে? অপর পক্ষে, এই সকল বিষয়ে সার উইলিয়ম জোন্সের কিছু কিছু জ্ঞান ছিল। তাহার সঙ্গে ভাষা বিষয়েও প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। সুতরাং এই শেষ কারণে তাঁহার নাম দিগন্ত-ব্যাপী। তাই বলি কেবল বহুভাষিত্ব লাভের জন্য অধ্যয়ন করিও না। শত শত নাটক পড়িলে সমাজে আলাপ করিবার অনেক কথা পাইবে। কিন্তু তাহাতে ফল যত না হইবে, সেক্সপিয়রের একখানি নাটকে তাহার সহস্র গুণ ফল পাইবে—নাটক কি বুঝিতে পারিবে—মানবচরিত্র বুঝিতে পারিবে—ঘটনা বৈচিত্র বুঝিতে সমর্থ হইবে—নাটকীয় জ্ঞানের সহিত অপর সহস্রবিধ জ্ঞান লাভ হইবে।

৮মতঃ। এইটি আমাদের শেষ উপদেশ। কোন গ্রন্থপাঠ শেষ করিয়া সমগ্র গ্রন্থে,বা প্রতি অধ্যায়ে গ্রন্থকার কি বিষয় বর্ণন করিয়াছেন,যত দূর পার, গ্রন্থকারের ভাষায় তাহা প্রকাশ করিতে, গ্রন্থকার যে সকল হেতু দর্শাইয়াছেন তাহার সমর্থন বা প্রতিবাদ করিতে অথবা গ্রন্থকারের বক্তব্যের সারসংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিবে। এরূপ করিলে উক্ত গ্রন্থপাঠে যে উপকার তাহা সম্যক্ প্রকারে লাভ করিবে। অধ্যয়ন কোন উদ্দেশ্য নহে, জ্ঞানরূপ উদ্দেশ্য লাভের সোপান মাত্র। লিপিদ্বারা সেই জ্ঞান কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে, তোমারও উপকার, জগতেরও উপকার। চিন্তা ও বিচার শক্তির উন্নতি সাধনই জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের প্রধান উপায়ই অধ্যয়ন। যত বড় বড় জ্ঞানী বা বাগ্মী এপর্য্যন্ত জন্মিয়াছেন, তাঁহারা প্রথমে এই শেষোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রমাণ বার্ক এবং জনষ্টুয়ার্ডমিল। শ্রীজ—

* সার আর্থর হেল্পস্।

পরিত্যক্ত-পল্লী।

১

অস্তযায় দিনমণি পশ্চিম গগনে,
জলদের গিরিরাজি রঞ্জি থরে থরে,
সোহাগে রঞ্জিত করি তরল কিরণে
নীল কিশলয় দাম তরুর শিখরে।

২

ভানুর কিরণে গঙ্গা সুবর্ণ-বসনা
কলকল রবে বয় মৃদু কল্লোলিনী,
সলিল অলকে মরি! চঞ্চল-চরণা,
কনক-কুসুম-দাম পরি সুহাসিনী।

৩

ধীরে ধীরে শ্যাম সন্ধ্যা ভুবন-মোহিনী
উতরে মরত ভূমে কানন বাসরে,
ফুটিছে মল্লিকা যুই সন্ধ্যা-সুশোভিনী,
ফুটিছে নীরবে তারা বিকচ অম্বরে।

৪

ফুলময়ী বনদেবী প্রফুল্ল অন্তরে
জোনাকির মালা বাঁধে শ্যাম লতিকায়,
ফুটিছে কলঙ্কী চাঁদ নীল জলধরে,
তালতরু-শ্যামশিরে সমীর খেলায়।

৫

মরি কিবা শ্যাম সন্ধ্যা অম্বরে ভূতলে,
রঞ্জিত সন্ধ্যার শ্যাম কান্তি মনোরম,
দিবি উজ্জ্বলিনী তারা গগনে বিরলে,
প্রফুল্ল কুসুম জালে শোভিত ভুবন।

৬

অস্ফুট তিমির জালে এই সন্ধ্যা কালে
অই যে সম্মুখে পল্লী পরি-দৃশ্যমান,
মনোহর শ্যাম-রুচি বৃক্ষ অন্তরালে,
প্রকৃতির কমনীয় লাবণ্য নিদান।

৭

কেন আজি অই পল্লী বিষণ্ণ বদনে,
প্রকাশিছে প্রকৃতির মূর্ত্তি বিভীষণ?
নিস্তব্ধ নিশীথে ম্লান চন্দ্রের কিরণে,
অনন্ত বিষাদ বেশ করিছে কীর্ত্তন!

৮

সকলি নীরব শুধু প্রান্তরে প্রান্তরে
হুহু করে অবিরল অনিল-নিস্বন,
সকলি নীরব শুধু তরুর শিখরে।
পাতায় পাতায় নিশি-নীহার পতন!

৯

যে দিকে ফিরাই আঁখি নিরখি কেবল
অনন্ত-অনন্ত বন তরুলতা ময়,
কোথা আজি হায় সেই শোভা নিরমল,
আরণ্য শোভায় এ যে পূর্ণ সমুদয়!

১০

অই যে সম্মুখে শত ভগ্ন নিকেতন,
অন্ধকার পরিত্যক্ত বিষাদ ভাণ্ডার,
কেন আজি জনহীন করি দরশন,
কে নাশিল হায় তার সুষমার হার!

১১

এই ত হাসিছে মরি ! নক্ষত্র-কুণ্ডলা
সলজ্জ কুসুমময়ী সন্ধ্যা সুহাসিনী,
বঙ্কিম রজত টিপ ধূসর-অঞ্চলা,
কোমল নীলাভ ভাসে পরিয়া রঙ্গিণী।

১২

নেহারিয়া এই সন্ধ্যা, প্রমোদে মাতিয়া,
এক দিন অই শত ভগ্ন নিকেতনে,
সুকোমল করে শংখ যতনে ধরিয়া,
কত শত কুল-বধূ সহাস্য বদনে

১৩

বাজাইত, জিনি নব কমলিনী-দল
বিকচ কপোল দুটি উৎফুল্ল নয়নে,
করিয়া মৃদুল স্ফীত পুনঃ অবিরল
চম্পক বরণ রঞ্জি রক্তিম রঞ্জনে।

১৩

এই ত রে সেই চারু সন্ধ্যা সুকোমল,
দাঁড়াইয়া এই আমি অবাক্ বদনে,
কোথা আজি সেই সব—হায় রে কেবল
গুটী কত শংখ ধ্বনি পশিছে শ্রবণে !

১৫

জনহীন আজি পল্লী দিনেকের তরে,—
হাসিল যথায় মরি নন্দন কানন ;
নিরখিয়া সেই পল্লী হৃদয় বিদরে,
আজি হায় সেই পল্লী অরণ্য বিজন !

১৬

সরল অন্তর সেই গ্রামবাসিগণ,
চিরলজ্জাশীলা সেই পল্লী-নিবাসিনী,
সরলতা প্রতিকৃতি কোথায় এখন,
কোথা সেই পল্লী শোভা নয়নরঞ্জিনী ?

১৭

সকলি ঘুমায় অই তরঙ্গিণী তীরে—
কালের অনন্ত অঙ্কে জন্মের মতন,
পার্থিব পিঞ্জর সবে ত্যজিয়া অচিরে,
সুখময় পুণ্য লোকে করেছে গমন।

১৮

হাসিলে হেমাঙ্গী ঊষা পূরব অম্বরে,
প্রভাতের সুকোমল অনিল নিস্বনে
কুজিলে কাননে পাখী সুমধুর স্বরে,
ঝঙ্কারিলে পিকেশ্বরী ললিত পঞ্চমে,

১৯

শুনি সেই মধুময় বিহঙ্গ-কুজন,
পরশিয়া প্রভাতের অমৃত আসার,
কোন দিন পুনঃ তারা পাবে না জীবন,
মুহূর্ত্তেক তরে কিম্বা জাগিবে না আর।

২০

অস্তে গেলে দিনমণি গোধূলি-চুম্বনে,
পল্লী-বিনোদিনী-মালা যাইবে না আর,
কলসী ধরিয়া কক্ষে বারি অন্বেষণে,
বদনে মধুর হাঁসি মাখি অনিবার।

২১

সারাদিন পরে অই কুটীর প্রাঙ্গণে
নাচিয়া নাচিয়া আর ফুল্লশিশুগণ,
যাবেনা জনকে হেরি চঞ্চল চরণে,
লভিবারে জনকের সস্নেহ চুম্বন।

২২

চারু সন্ধ্যা কালে ক্লান্ত বিশুষ্ক অন্তরে
পরিশ্রম-জীবী কিম্বা ভেটীবে না আর,
শ্যামাঙ্গিনী প্রেয়সীরে, কুটীরের দ্বারে,
চুম্বি মুখ খুলিবে না স্বর্গের দুয়ার।

২৩

দরিদ্র যুবক কিম্বা দেখিবে না আর
বসি সুখময় পর্ণকুটীর সদনে,
লক্ষ্মীস্বরূপিণী কান্তা,—শত সুখাধার,
পবিত্র-সরল-প্রেম-পূর্ণিত নয়নে।

২৪

অইত কুটীর সেই শুষ্ক-পত্রময়,
এই সেই মনোহরা সন্ধ্যা মধুমতী,
কিন্তু আজি কোথা সেই অভিন্ন-হৃদয়—
যুগল প্রণয়-পদ্ম—দরিদ্র দম্পতী ?

২৫

কালের সাগরে আজি হায় রে সকল
ডুবিল অনন্ত জলে ;—ভগ্ন নিকেতন,
আর অই পর্ণগৃহ, সমীরে চঞ্চল,
রহিয়াছে তাহাদের চিহ্নের মতন।

২৬

একদিন এই স্থানে কত অভাগার
খুলিল স্বর্গীয় প্রেমে পবিত্র অন্তর,
ক্ষণ অভিনয় পুনঃ ফুরাল আবার,
মাটীতে সোণার অঙ্গ মিশিল সত্বর।

২৭

বিজন বিপিন বন কুসুমের প্রায়—
কত শত কালিদাস জন্মিল এখানে,
হল না বিকাশ কিন্তু ধীরে ধীরে হায় !
হল ভস্মে পরিণত কৃতান্ত-কৃপাণে।

২৮

কত শত মহামতি উন্নত-জীবন,
স্বদেশমঙ্গল যার চির ইচ্ছা হায় !
কত শত দেব-আত্মা শ্রীমধুসূদন
ঘুমাইছে হায় এই পল্লীমৃত্তিকায় !

২৯

জীব জন্তু তরু গিরি সকলি নশ্বর !
মাটীর সৃজন চির অসারতাময় !
সকলি কালের করে ঘোরে নিরন্তর,
একদিন হবে পৃথ্বী তিমির-নিলয়।

৩০

সাধের মানব জন্ম, এই কলেবর
মৃত্তিকার অঙ্গে মাখা চন্দ্রের কিরণ ;
অংশুমালী রবি কিম্বা তারা শশধর,
সকলি কালের করে হবে নিপতন।

৩১

হায় আজি কোথা মম শৈশব সরল,
বোধ হয় যেন আজি সুদূর স্বপন !
স্মৃতির কৃপায় সেই দিন নিরমল,
দূর নক্ষত্রের প্রায় হতেছে স্মরণ।

৩২

আজি এই জীবনের প্রথম যৌবন,
উন্মত্ত জীবন মম নাহি বাহ্য জ্ঞান,
চরণের তলে বিশ্ব করি দরশন,
অতুল ঐশ্বর্য্যে আমি রাজেন্দ্রসমান।

৩৩

কিন্তু যবে সেই দিন, আসিবে আমার,—
কোথায় রহিবে এই চারু নিকেতন,
কবিত্ব-রূপিণী প্রিয়া প্রেম পারাবার,
কিম্বা সেই সুখময় বিলাস কানন।

৩৪

পার্থিব জনমে যেই প্রমোদ কানন
একপ্রাণে একমনে উন্মত্ত জীবনে,
বিশ্বের বিলাস দ্রব্য করি আহরণ
নন্দন-কানন-সম সাজানু যতনে।

৩৫

আমিও আবার ঐই পল্লীবাসী সম
বসুমতী জননীর অঙ্কে অনিবার,
ঘুমাইব একদিন জম্মের মতন,—
যেই নিদ্রা কোনকালে ভাঙ্গিবে না আর।

৩৬

লো প্রকৃতি, কহ মোরে কহ সুহাসিনি
এই কি মানব লীলা ? এই পরিনাম ?
সৌদামিনী-সম ক্ষণ বিকাশি রঙ্গিণী
লভিল, লভিবে সব অনন্ত বিরাম !! শ্রীহঃ--

সম্বন্ধ নির্ণয়।

বঙ্গদেশীয় আদিম জাতিসমূহের সামাজিক বৃত্তান্ত। *

'সম্বন্ধ নির্ণয়' বঙ্গভাষায় একখানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এবং ইহাতে লিখিত বিষয়গুলি বঙ্গবাসী হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষে অবশ্য জ্ঞাতব্য। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক, মধ্যশ্রেণী ও ঔপনিবেশিক ব্রাহ্মণের এবং কায়স্থ ও বৈদ্য জাতির বিবরণ বিস্তৃতরূপে লিখিয়াছেন। গ্রন্থখানা বহুদিন যাবৎ আমাদের নিকট সমালোচনার জন্য প্রেরিত হইয়াছে, কিন্তু গ্রন্থোক্ত বিষয়গুলিতে আমাদের পূর্ণ অভিজ্ঞতা না থাকায় আমরা এপর্য্যন্ত ইহার সমালোচনে হস্তক্ষেপ করি নাই। এত দিন নানাবিধ কুলশাস্ত্রের গ্রন্থ পাঠ করিয়া এবং কুলজ্ঞ পণ্ডিতগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া অদ্য সম্বন্ধনির্ণয়ের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, কুলশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বিক্রমপুরের শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন ঘটক মহাশয়ের নিকট আমরা অনেকগুলি অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাত হইয়াছি।

আমাদের বিবেচনায় সকলগুলি বিষয়ের সমালোচন একবারে করিতে গেলে বহু বিস্তৃত হইয়া উঠে, তাহাতে পাঠকের বিরক্তি হওয়াও অসম্ভব নহে, অতএব অদ্য কেবল আমরা গ্রন্থের আদিভাগ সহিত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের বিষয়েই মতামত প্রকাশ করিব। কোন কোন স্থলে বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতের সঙ্গে আমাদের মতের অনৈক্য ঘটিলেও বহু গবেষণার জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিব।

যিনি বাঙ্গালার বর্ত্তমান জাতিসমূহের আদিম বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি অবশ্যই সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন। গ্রন্থ লিখিবার উদ্দীপ্তা প্রবৃত্তি এইরূপ সদুদ্দেশ্যে পরিচালিতা হইতে দেখিলে সহৃদয় পাঠকমাত্রই সন্তোষ লাভ করিবেন সন্দেহ নাই ; কিন্তু এই ঐতিহাসিক বিবরণে পু-

* কৃষ্ণনগর নর্ম্মালস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

রাণাদি গ্রন্থসম্মত শাস্ত্রীয় কথা যোগ করা কিয়ৎপরিমাণে হইলেও অনুচিত হইয়াছে। গ্রন্থের ৫৬ পৃষ্ঠা হইতে ৭৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেবলোক, গন্ধর্ব্বলোক ও নাগলোকের উপন্যাসগত বংশাবলী অনাবশ্যক। "রাক্ষস, বানর, যক্ষ, কিন্নর প্রভৃতি জাতি পুলস্ত্য ঋষির সন্তান।" "শলভ, সিংহ, কিম্পুরুষ, ব্যাঘ্র, ঋক্ষ, ঈহামৃগ পুলহ-ঋষির সন্তান।" "অশ্বিনী, ভরণী প্রভৃতি ২৭টি নক্ষত্র দক্ষের কন্যা।" এই কথাগুলির সত্যতা স্বীকার করিয়া ইতিহাসে সন্নিবেশ করা আমাদের বিবেচনার বড় ভাল দেখায় না; এখন আর বঙ্গীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় এই অলৌকিক বিবরণে বিশ্বাস করিতে চাহেন না। বাস্তবিক আমাদের পুরাণ সম্পূর্ণ ইতিহাস নহে; উহার মধ্যে গূঢ় ভাবার্থ সংযুক্ত অনেক কথা সংযোজিত রহিয়াছে। কীর্ত্তি, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, মতি, লক্ষ্মী, ইহাদিগকে দক্ষের কন্যা ও ধর্ম্মপত্নী বলিবার কি কোন গূঢ়ার্থ নাই? যদি থাকে তবে তাহা ভাঙ্গিয়া বলাই কর্ত্তব্য; ঐতিহাসিক বংশাবলীতে উহাদিগকে দক্ষসুতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যুক্তিযুক্ত নহে।

বিদ্যানিধি মহাশয়, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই বর্ণ বিভাগের যে সকল কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমরা তাহাতেও সন্তোষ লাভ করিতে পারিলাম না; কারণ ইহাতেও তিনি পৌরাণিক কবিকল্পনারই অনুগমন করিয়াছেন। আমরা বলিতে পারি এই পথ পরিত্যাগ করিয়া যুক্তি অবলম্বন করিলেই ভাল হইত; অন্যথা ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন মতে লেখকেরও ভ্রম জন্মাইতে পারে। যথা;—লেখক এক স্থানে বলিয়াছেন "প্রজাপতিদিগের দুহিতৃ-সন্তান দৌহিত্রগুলিই ব্রাহ্মণপদবাচ্য হইলেন, পৌত্রগুলি ক্ষত্রিয় বা রাজন্য আখ্যা ধারণ করিলেন।" (৭৯ পৃ-স)। আবার অন্যত্র ক্ষত্রিয়জাতি শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন "ইহাঁরা ব্রহ্মার বাহু হইতে জন্মপরিগ্রহ করেন বলিয়া ব্রাহ্মণের নিম্নে ও অন্য বর্ণের উপরিভাগে আসন প্রাপ্ত হন। (৮৭ পৃ-স)। পরস্পর বিরোধি এই উভয় বাক্য কখনই অবিসংবাদিতরূপে স্বীকার করিতে পারা যায় না।

সম্বন্ধনির্ণয়ে গোত্রপ্রবরগুলি অতি বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে। গোত্র কি? তাহার সংখ্যা কত? প্রবর কাহাকে বলে? প্রবরের আবশ্যকতা কি? কোন্ গোত্রে কত প্রবর? ইত্যাদি অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি পাঠকালে আমরা গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি নাই। বিদ্যানিধি মহাশয় গ্রন্থের এই অংশ এমনি শৃঙ্খলাবদ্ধ ও স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন যে, অল্পবয়স্ক বালক বালিকারাও পাঠমাত্র সমস্ত বিবরণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। কর্ত্তব্য হইলেও আমরা এই অংশের কিছু উদ্ধৃত করিলাম না। পাঠকগণ একবার গ্রন্থখানা ক্রয় করিয়া পাঠ করুন।

এখন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের কথা কিছু বলিব। সম্বন্ধনির্ণয় রচয়িতা অনুসন্ধানে যতদূর পারিয়াছেন, তাহাই এই গ্রন্থে সংকলন করিয়াছেন। এই নিমিত্ত আমরা তাঁহার অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তির প্রশংসা করিব, কিন্তু সংকলিত বিষয়গুলি একেবারে নির্দ্দোষ বলিয়া স্বীকার করিতে পারিব না। তবে সংসারের কেহই অভ্রান্ত নহেন, এই সূত্রানুসারে বিচার করিলে ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, গ্রন্থকারের কিছু কিছু ভ্রম থাকিলেও তাঁহার গ্রন্থ হিন্দুসমাজে আদরণীয়। আমরা রাঢ়ী শ্রেণীর কথা অতি সংক্ষেপে ভিন্ন একটি প্রবন্ধে লিখিয়া যে যে স্থলে আমাদের মতের সঙ্গে গ্রন্থকারের মতের অনৈক্য ঘটে, তাহাই দেখাইয়া দিব।

এরূপ প্রবাদ যে বিক্রমপুরান্তর্গত রামপাল নামক স্থানে মহারাজ আদিশূরের রাজধানী ছিল। যথাকালে তাঁহার পুত্র সন্তান না হওয়ায় তিনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিতে সংকল্প করেন। ঐ সময়ে বঙ্গে ৭০০ ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ ছিল। বর্ত্তমান সময়ে উহাদের সন্তানগণই সাতশতী নামে পরিচিত। উহাদের অষ্টগোত্র এবং সপ্তবিংশতি গাঁই প্রসিদ্ধ। যথা—

গোত্র।

শনকঃ শুনকঃ কাস্যো গৌতমশ্চ পরাশরো।
বশিষ্ঠোহারিসোবৎসশ্চাষ্টৌ গোত্রাঃপ্রকীর্ত্তিতাঃ।”

গাঁই।

১	২	৩	৪	৫
সাগাঁই	পুরাই	মালসী	ভগাই	হাসাই
৬	৭	৮	৯	১০
কালাই	ধাই,	বান্সী	বাণ্টুরী	ধান্সী

১১ ১২ ১৩ ১৪
কাটানী কুশলোত্ত্বলোগাঁই,কাশ্যপকাঞ্জারী

১৫ ১৬ ১৭ ১৮
বাতারি পীতারি নাতারি যার, বেক

১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩
বাগরাই উলূক ঝর্ঝর্, মুলুক ফর্ফর্

২৪ ২৫ ২৬ ২৭
কম্বু কক্ল চেরচেরি বাল্থোপি গাঁই।

(কুলাচার্য্যের কারিকা।)

কিন্তু বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন “সাতশতী ব্রাহ্মণগণও চল্লিশটি পৃথক্ (প্রাচীন) গাঁই বলিয়া বিভক্ত ছিলেন। প্রত্যেকের গোত্র পৃথক্ অর্থাৎ সাতশতীগণের প্রত্যেক গাঁই পৃথক্ পৃথক্ গোত্রসম্ভূত।”

“লোকের কৌতূহল নিবারণ জন্য কুলজ্ঞেয় কুলশাস্ত্র হইতে সাতশতীদিগের গাঁইগুলি লিখিত হইল। পাঠকগণ মিলাইয়া দেখুন।”

১ ২ ৩ ৪
নগড়ি দহড়ি হামু বাপি কাশ্যপকাঞ্জিকা

৫ ৬ ৭ ৮
বাপাড়ি গুসিকা কেমু গাঁইচ সুখদাসিকঃ

ইত্যাদি। “মিশ্রগ্রন্থ।”

বিদ্যানিধি মহাশয়ের উদ্ধৃত এই শ্লোকাবলী মিশ্রগ্রন্থে অপ্রাপ্য, অন্য কোন

গ্রন্থে আছে কি না তাহাও জানি না। সুতরাং আমরা মিলাইয়া দেখিতে পারিলাম না। "অপিচ সাতশতীগণের প্রত্যেক গাঁই পৃথক্ পৃথক্ গোত্র সম্ভূত" এই কথারও কোন সন্তোষ জনক প্রমাণ পাইলাম না। যাহা হউক উক্ত সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে তৎকালে কেহই এমন বেদজ্ঞ ও পরিশুদ্ধ ছিলেন না, যে তাঁহারা মহারাজ আদিশূরের সংকল্পিত পুত্রেষ্টি যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিতে পারেন। অগত্যা মহারাজ উপযুক্ত ব্রাহ্মণের জন্য কান্যকুব্জাধিপের নিকট পত্র লিখিলেন। তদনুসারে কান্যকুব্জেশ্বর পঞ্চ গোত্রের পঞ্চজন ব্রাহ্মণ এদেশে পাঠাইয়াদেন। (৯৯৯ সংবৎ)

"ভট্টনারায়ণোদক্ষো বেদগর্ভোথ ছান্দড়ঃ।
অথ শ্রীহর্ষনামাচ কান্যকুব্জাৎ সমাগতাঃ॥"

ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ, ছান্দড়, শ্রীহর্ষ, এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে আগমন করেন।

"শাণ্ডিল্যগোত্রজশ্রেষ্ঠো ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ।
দক্ষোপি কাশ্যপশ্রেষ্ঠো বাৎস্যশ্রেষ্ঠোপি ছান্দড়ঃ॥
ভরদ্বাজৈকগোত্রশ্রীশ্রীহর্ষো হর্ষবর্দ্ধনঃ।
বেদগর্ভোপি সাবর্ণে যথাবেদ ইতি স্মৃতঃ॥"

উহাঁদের মধ্যে ভট্টনারায়ণ শাণ্ডিল্য গোত্র, দক্ষ কাশ্যপ গোত্র, ছান্দড় বাৎস্য গোত্র, শ্রীহর্ষ ভরদ্বাজ, গোত্র এবং বেদগর্ভ সাবর্ণ গোত্র।

"কামকোটি ব্রহ্মকোটি র্হরিকোটি স্তথৈবচ।
কঙ্কগ্রামো বটগ্রামস্তেষাং স্থানানি পঞ্চচ॥" (কুলরমা)

বঙ্গাধিপ আদিশূর যজ্ঞ সমাপনান্তে উহাঁদের পাঁচজনের বাসের নিমিত্ত কামকোটি, ব্রহ্মকোটি, হরিকোটি, কঙ্কগ্রাম, বটগ্রাম, এই পাঁচ খানা গ্রাম দান করেন। এই সকল গ্রামের আধুনিক নাম পরিজ্ঞেয় নহে, এই বিষয়ে সম্বন্ধ-নির্ণয়ে নিম্ন লিখিত বচনটি উদ্ধৃত আছে।

"পঞ্চকোটিঃ কামকোটির্হরিকোটি স্তথৈবচ।
কঙ্কগ্রামো বটগ্রাম স্তেষাং স্থানানি পঞ্চচ॥" (১৮ পৃ)

আমরা কুলরমা গ্রন্থে পঞ্চকোটির পরিবর্ত্তে ব্রহ্মকোটি দেখিলাম।

কালক্রমে উক্ত দ্বিজপঞ্চকের উনষষ্টি সন্তান জন্মে।—

"ভট্টতঃ ষোড়শোদ্ভূতা দক্ষতশ্চাপি ষোড়শঃ।
চত্বারঃ শ্রীহর্ষাজ্জাতা ভরদ্বাজকুলোদ্ভবাঃ।
দ্বাদশ বেদগর্ভাচ্চ ছান্দড়ৈকাদশ স্মৃতাঃ।" (কুলরমা)

ভট্টনারায়ণের ষোড়শ, দক্ষের ষোড়শ, শ্রীহর্ষের চারি, বেদগর্ভের দ্বাদশ এবং ছান্দড়ের একাদশ।

বিদ্যানিধি মহাশয় কান্যকুব্জাগত পঞ্চবিপ্রের ষট্ পঞ্চাশৎ সন্তান স্বীকার করিয়া, প্রমাণার্থ নিম্নলিখিত শ্লোক লিখিয়াছেন।

"ভট্টতঃ ষোড়শোদ্ভূতা দক্ষতশ্চাপি ষোড়শঃ।

চত্তারঃ শ্রীহর্ষজাতা দ্বাদশ বেদগর্ভতঃ।
অষ্টাবথ পরিজ্ঞেয়া উদ্ভূতা শ্ছান্দড়াম্মুনেঃ॥'
(মিশ্রিগ্রন্থ ধ্রুবানন্দকৃত।)

আমরা যতদূর জানিয়াছি তাহাতে বলিতে পারি ধ্রুবানন্দ মিশ্রে এই শ্লোক অদৃশ্য।

ভট্টনারায়ণ বংশ।

"আদৌ বন্দ্যো বরাহঃস্যাৎ রামো গড়্গড়িকোমতঃ।
হৃপঃস্যাৎ কেশরশ্চৈব নানোঃ কুসুম কুলিকো-
বাটুঃস্যাৎ পারীহালোসৌ কুলডিঃ গুয়িনামকো।
গণো ঘোষলিতাং প্রাপ্তঃ সেয়ুঃ শাণ্ডেশ্বরিস্তথা॥
বুড়ো মাশ্চরকশ্চৈব বটব্যালো বিকর্ত্তনঃ।
বসুয়ারি স্তথানীলোঃ কয়ড়ালো মধুসূদনঃ॥
কুশীচ কোয়নামা চ কুলিসাচৈব বাসুকঃ।
আকাশো মাধবো দীর্ঘগ্রামীচৈষমহামতিঃ॥
এতে ষোড়শশাণ্ডিল্যাঃ কথিতা রাজপূজিতাঃ॥"

	নাম	গাঁই
১	বরাহ	বন্দ্য
২	রাম	গড়্গড়ি
৩	হৃপ	কেশরকুলী
৪	নানো	কুসুমকুলি
৫	বাটু	পারীহাল
৬	গুয়ি	কুলডি
৭	গণ	ঘোষাল
৮	শাণ্ডেশ্বরি	সেয়ু
৯	বুড়ো	মাশ্চরক
১০	বিকর্ত্তন	বটব্যাল
১১	নীলো	বসুয়ারি
১২	মধুসূদন	কয়ড়াল
১৩	কোয়	কুশারি
১৪	বাসু	কুলিসা(কুলকুলী)
১৫	আকাশ	আকাশ
১৬	মাধব	দীর্ঘগ্রামী(দীঘাল)

দক্ষ বংশ।

"ধীরোদ্ভবৎ গুড়িগ্রামী নীরঃ স্যাদামরুলিকঃ।
ভূরিগ্রামী সুভশ্চৈব শম্ভুঃস্যাৎ তৈলবাটিকঃ॥
কৌতুকঃ পীতমুণ্ডীস্যাৎ চট্টগ্রামী সুলোচনঃ।
পলশায়ী পালুনামা হড়ঃ কাকোমতস্তথা।
পোড়ারিঃ কৃষ্ণসংজ্ঞোসৌ পালধী রামনামকঃ।
কোয়ারিঃ স্যাজ্জননামা পর্কটি বর্ণমালিকঃ
সিমলায়ী শ্রীহরিঃস্যাৎ জটোপুষলিকস্তথা।
ভট্টগ্রামী শশিধরো মুলগ্রামীচ কেশবঃ॥
এতে ষোড়শ ভূদেবা জ্ঞেয়াঃ কাশ্যপ-সংজ্ঞকাঃ॥"

	নাম	গাঁই
১	ধীর	গুড়িগ্রামী
২	নীর	আম্বলী
৩	সুভ	ভূরিগ্রামী
৪	শম্ভু	তৈলবাটী
৫	কৌতুক	পীতমুণ্ডী
৬	সুলোচন	চট্টগ্রামী

৭	পালু	পলশায়ী
৮	কাক	হড়
৯	কৃষ্ণ	পোড়ারি
১০	রাম	পালধি
১১	জন	কোয়ারি
১২	বনমালী	পাকড়াসী
১৩	শ্রীহরি	সিমলায়ী
১৪	জট	পুষলি (পুষিলাল)
১৫	শশিধর	ভট্টগ্রামী
১৬	কেশব	মুলগ্রামী

শ্রীহর্ষ বংশ।

"ধাঁদুর্নামা মুখৈটিঃস্যাৎ জনঃস্যাৎ দীন-
শায়িকঃ।
নান্দোঃ সাহরিকো জ্ঞেয়ো রায়ীচ রামনা-
মিকঃ॥
শ্রীহর্ষস্য সুতা এতে ভরদ্বাজকুলোদ্ভবাঃ।"

	নাম	গাঁই
১	ধাঁদু (শ্রীগর্ভ)	মুখৈটি
২	জন	দীনশায়ী(ডিংসাই)
৩	নান্দো	সাহরী
৪	রাম	রায়ী (রাইগাঁই)

বেদগর্ভ বংশ।

"হলনামাচ গাঙ্গুলী কুন্দো রাজ্যধরস্তথা।
বশিষ্ঠঃ সিদ্ধলো জ্ঞেয়ো দায়ীচ মদনোভবৎ॥
বিশ্বরূপস্তথা নন্দী কুমারো বালী গ্রামকঃ।
যোগী সিয়ারিকো জ্ঞেয়ঃ পুংসিকো রাম-
নামিকঃ॥
দক্ষঃ শাটকঃ সংজ্ঞোসৌ পারীচ মধুসূদনঃ।
ঘণ্টেশ্বরী মাধবশ্চঃ নায়ারীচ গুণাকরঃ॥
এতে পুত্রা মহাপ্রাজ্ঞাঃ সাবর্ণাদ্দ্বাদশস্মৃতাঃ।"

	নাম	গাঁই।
১	হল	গাঙ্গলী
২	রাজ্যধর	কুন্দ
৩	বশিষ্ঠ	সিদ্ধল
৪	মদন	দায়ী
৫	বিশ্বরূপ	নন্দী
৬	কুমার	বালী
৭	যোগী	সিয়ারিক
৮	রাম	পুংসিক
৯	দক্ষ	শাট
১০	মধুসূদন	পারীহাল
১১	মাধব	ঘণ্টেশ্বরী
১২	গুণাকর	নায়ারী

ছান্দড় বংশ।

"রবির্মহিন্তাঃ সুরভিশ্চ ঘোষঃ।
কবিঃপৃথিব্যাং খলু শিম্বলালঃ॥
মহাযশো বাপুলিঃ পিপ্পলিশ্চ।
ধীরশ্চ পূতি র্নমু শঙ্করাখ্যঃ॥
বিশ্বম্ভরোভূৎ খলু পূর্ব্বগ্রামী।
বাৎস্যাশ্চ তাদর্থ-নিবাস-দেশাঃ॥
শ্রীশ্রীধরোভূৎ খলু কাঞ্জিবিল্লী।
নারায়ণো নামচ কাঞ্জিলারী॥
চৌৎখণ্ডিকো নাম গুণাকরঃস্যাৎ।
মনো দীঘালো ভুবি রুদ্রতুল্যঃ॥
বাৎস্যস্য এতে কথিতাশ্চ পুত্রাঃ॥"

(কুলরমা)

	নাম	গাঁই
১	রবি	মহিন্তা
২	সুরভি	ঘোষ
৩	কবি	শিম্বলাল (শিমলাই)

মহাযশ
ধীর পিপ্পলী(পিপলাই)
শঙ্কর পুতিতুণ্ড
বিশ্বম্ভর পূর্ব্বগ্রামী
শ্রীধর কাঞ্জিবিল্লী(কাঞ্জিলাল)
নারায়ণ কা
১০ গুণাকর চৌৎখণ্ডি
১১ মন দীঘাল।

এতদ্দ্বারা স্পষ্ট দেখা যায় যে, পঞ্চগোত্রে উনষষ্টি গাঁই নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু বহুদিন পরে লুলাপঞ্চানন নামক জনৈক ঘটক বাৎস্য গোত্র হইতে পূর্ব্বগ্রামী, দীঘাল আর চৌৎখণ্ডি পরিত্যাগ করিয়া ছান্দড়ের অষ্ট পুত্র এবং তাঁহাদের আটটি গাঁই কল্পনা করেন। তদবধিই সাধারণ লোকে বলিয়া থাকে যে "পঞ্চগোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই, তা ছাড়া বামুন নাই।" কিন্তু বিজ্ঞমণ্ডলীতে এই কথা গ্রাহ্য নহে। আমাদের বিদ্যানিধি মহাশয় এই অকারণসম্ভূত মতের পরিপোষণ করিয়া কুলদীপিকা হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।—

"কাঞ্জিবিল্লী মহিন্তাচ পূতিতুণ্ডশ্চ পিপ্পলী
ঘোষাল বাপুলিশ্চৈব কাঞ্জারীচ তথৈবচ॥
সিমলালশ্চ বিজ্ঞেয়ো ইমে বাৎস্যাক সংজ্ঞকাঃ॥" (স—২৫ পৃ)

আমরা বুঝিতে পারিলাম না লুলাপঞ্চাননের মত রক্ষা অর্থাৎ ছাপ্পান্ন গাঁই ঠিক রাখিবার জন্য এই শ্লোকের একটি চরণ পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন কি? তবে ইহাই দেখা যায় যে, এই স্থলে অষ্টাধিক গাঁই স্বীকার করিলে "অষ্টাবথ পরিজ্ঞেয়া উদ্ভূতা শ্ছান্দড়ান্মুনে;" এই বাক্য রক্ষা পায় না, যাহা হউক আমাদের বিবেচনায় একটা অমূলক কথার সত্যতা দেখাইতে এত গণ্ডগোল করা ভালবোধ হইল না। আমরা কুলদীপিকা পাঠ করিয়া উপরোক্ত শ্লোকটি এইরূপ দেখিলাম।

"কাঞ্জিবিল্লী মহিন্তাচ পুতিতুণ্ডশ্চ পিপ্পলী।
ঘোষালো বাপুলিশ্চৈব কাঞ্জারীচ তথৈবচ॥
পূর্ব্বগ্রামী দীর্ঘাঙ্গীচ চৌৎখণ্ডী শিমলালকঃ
বাৎস্যাগোত্রজাতা ইমে বিখ্যাতাঃ পৃথিবীতলে॥"

আদিশূরের দৌহিত্র বংশীয় সপ্তম সন্তান বল্লালসেন, উক্ত মহাত্মাগণের বংশধর দিগের গুণ বিচার করিয়া, আচার বিনয়াদি নবগুণান্বিত দিগকে কুলীন এবং অষ্টগুণবিশিষ্টদিগকে শ্রোত্রিয় আখ্যা প্রদান করেন। ১০৬৬ হইতে ১১০১ খৃঃ পর্য্যন্ত ৩৬ বৎসর বল্লালের রাজত্বকাল নির্ণীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন্ সময়ে যে তিনি কুলীন শ্রোত্রিয় বিভাগ করিয়াছিলেন তাহা নিশ্চয় করা সুকঠিন। তবে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া অনেকেই অনেক কথা বলেন বটে, কিন্তু আমরা ওরূপ আনুমানিক কথা লিখিতে ইচ্ছা করিনা।

বল্লালসেন, উক্ত উনষষ্টি ব্যক্তির সন্তানগণের মধ্যে ৩৭ ঘর সুসিদ্ধ শ্রোত্রিয় আর ২২ ঘর কুলীন করেন।

সুসিদ্ধ শ্রোত্রিয় ।

১ ২ ৩ ৪ ৫
"পূর্ব্বং পালধি সিদ্ধলো কুশারি বাপুলি-
৬ ৭ ৮ ৯ ১০
কাঞ্জারিকাঃ। মাষ সাহিয়াল নন্দি কুসুমাঃ
১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫
ভুরি বটব্যালকৌ ॥ অম্বুলী কুলিসা সিয়ারী
১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০
কড়লা সিমলীয়সী পর্কটিঃ। পোড়া তৈলকঃ
২১ ২২ ২৩ ২৪
পোশলাশ্চ পলশো নাইয়ারিদীর্ঘাঙ্গিকৌ ॥
২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯
মূলগ্রামিকঃ পারী বালী শিমলা শাণ্ডেশ্বরি-
৩০ ৩১ ৩২ ৩৩
ভট্টকঃ ॥ সেয়ুঃ পুংসিকিয়ুর্ব্বসুস্তদপরো
৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭
দাইয়াবিকো ঘোষলী। আকাশশ্চ কোয়ারি-
কোপি গণনাৎ ত্রিংশজ্জনঃ সপ্তচ ।।"

কুলীন ।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
বন্দ্য চট্ট মুখৈটি ঘোষ পুতিকা গাঙ্গোথ
৭ ৮ ৯ ১০ ১১
কাঞ্জিভায়ঃ। কুন্দো রায়ী গুড়ো মহিন্তা
১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬
কুলডি শোৎখণ্ডিকঃ পিপ্পলী ॥ ঘণ্ট পারী
১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২
হড়ো গড়োপি পীতমো দী কেশ দীর্ঘা-
ঙ্গিকাঃ। শ্রীবল্লাল নৃপেণ হি পুরা দ্বাবিং-
শাতস্থাপিতাঃ।

কাঞ্জিভায়=কাঞ্জিলাল; ঘট=ঘণ্টে-শ্বরি; পীতম=পীতমুণ্ডী; দী=ডিংসাই; কেশ=কেশবকুলি; রায়ী=রাই গাঁই। উক্ত দ্বাবিংশৎ কুলীনের মধ্যে ৮ ঘর মুখ্য-কুলীন আর ১৪ ঘর গৌণ কুলীন।

"———————বন্দ্য মুং ঘোষ চট্টকাঃ।
পূতিচ গাঙ্গলী কাঞ্জি কুন্দেন সহ চাস্টমাঃ॥"

বন্দ্য, মুখৈটি, ঘোষাল, চট্ট, পূতিতুণ্ড, গাঙ্গলী, কাঞ্জিলাল, কুন্দ, এই আট ঘর মুখ্য; অবশিষ্ট ১৪ ঘর গৌণ।

পরে বল্লালের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ লক্ষ্মণ সেন, আবার তদ্বংশীয়দের দোষ-গুণ নির্ব্বাচন সময়ে, আটঘর মুখ্যকুলীনের মধ্যে ১৯ জনকে কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রদান কারন।

"বহুরূপঃ সুচো নাম্না অরবিন্দো হলায়ুধঃ।
বাঙ্গালশ্চসমাখ্যাতাঃ পঞ্চৈতেচট্টবংশজাঃ॥
পূতিগোবর্দ্ধনাচার্য্যঃ শিরো ঘোষালসম্ভবঃ।
গাঙ্গুলীয়ঃ শিশোনাম্না কুন্দো রোষাক-
রোপিচ ॥
জাহ্লনাখ্য স্তথা বন্দ্যো মহেশ্বর উদারধীঃ।
দেবলো বামনশ্চৈব ঈশানো মকরন্দকঃ॥
উৎসাহ গরুড়াখ্যাতৌ মুখবংশসমুদ্ভবৌ।
কানু কুতূহলাবেতৌ কাঞ্জিকুল প্রতিষ্ঠিতৌ
ঊনবিংশতি সংখ্যাতা মহারাজেন পূজিতাঃ॥"

(ধ্রুবানন্দ মিশ্রোক্ত ।)

স—১৬৩ পৃ।

চট্টবংশজ—বহুরূপ, সুচ, অরবিন্দ হলায়ুধ, বাঙ্গাল।

পূতিতুণ্ড—গোবর্দ্ধনাচার্য্য। ঘোষাল—শির। গাঙ্গলী—শিশো।

কুন্দ- -রোষাকর।

বন্দ্য—শাণ্ডিল্য, মহেশ্বর, দেবল, বামন, ঈশান, মকরন্দ।

মুখৈটি—উৎসাহ, গরুড়। কাঞ্জিলাল—কানু, কুতূহল।

এই সময়েই তিনি গৌণ কুলীনদিগকে শ্রোত্রিয় সংজ্ঞাদিয়া সিদ্ধ, সাধ্য, অরি এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন।

১ ২ ৩
"পিপ্পলী দিঘারী চৈব দীনশায়ি স্তথৈবচ এতে সিদ্ধাঃ।"

১ ২ ৩ ৪
"মহিন্তা হড় গুড় পারীহালা এতে সাধ্যাঃ।"

১ ২ ৩
"কেশরঃ পীতমুণ্ডীচ রায়ী গায়িশ্চ

৪
গড়্গড়িঃ।

৫ ৬ ৭
ঘণ্টেশ্বরি শেচাংখণ্ডিশ্চ কুলডিররস্তীমে যৎকন্যা লাভ মাত্রেণ সমূলস্তু বিনশ্যতি।" (কুলরমা)

সম্বন্ধ নির্ণয় রচয়িতা প্রমাণ করেন "লক্ষ্মণ সেন রাজ্যভ্রষ্ট হইবার কিছু পূর্ব্বেই কুলীনদিগের মর্য্যাদার সমীকরণ হয়। অর্থাৎ ১২০৩ খৃষ্টাব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বে এইরূপ বিভাগকরা হইয়াছিল।" পাঠকগণ উক্ত গ্রন্থের (১৬৪পৃ) পাঠ করিয়া দেখিবেন।

এখন আমরা বংশজের কথা বলিব। বর্ত্তমান সময়ে কোন কুলীন, বংশজের কন্যা বিবাহ করিলেই ভঙ্গ হয় এবং ৭।৮ পুরুষান্তে এই ভঙ্গ কুলীনের বংশধর গণই বংশজত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু আদিতে বংশজ না থাকিলে বংশজ কন্যাই সম্ভবে না। তবে আদি বংশজ কিরূপে হইল এখন তাহাই নির্ণয় করিতে হইবে। আমাদিগকে নিতান্ত ক্ষোভের সহিত বলিতে হইল যে, গ্রন্থের এই অংশে বিদ্যানিধি মহাশয় যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার একটিও আমাদের মনঃপূত হইল না; সুতরাং আমরা ভিন্নপথ অবলম্বন করিয়া "কুলার্ণব" গ্রন্থের কয়েকটি শ্লোক পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিব।—

"ধেনুং স্বর্ণময়ীং কৃত্বা দদৌ বিপ্রায় ধার্ম্মিকঃ।
সা চ স্বর্ণময়ী ধেনুশ্ছেদনে প্রজগৌ মুহুঃ॥
ছিন্না বহিষ্কৃতা রাজ্ঞা স্বর্ণানাং বণিকোভবৎ।
বিপ্রাঃ প্রতিগ্রহাজ্জাতাঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ॥"

মহারাজ বল্লাল স্বর্ণ ধেনু নির্ম্মাণ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন এবং উহা ছেদন করিতে অনুমতি দেন। তদনুসারে যাহারা ছেদন করিয়াছিল, তাহারা স্বর্ণ বণিক আর দানগ্রাহী ব্রাহ্মণগণ সর্ব্ব-ধর্ম্ম বহিষ্কৃত প্রতিগ্রহ সংজ্ঞাক্রান্ত হয়েন।

প্রতিগ্রহ নির্ণয়।

"শঙ্করঃ পীতমুণ্ডীচ গড়োপিচ দিবাকরঃ।
গুড়ো ডাউকনামাচ দোকড়িশ্চৈবপিপ্পলী॥
বন্দ্যো মার্ত্তণ্ডনামাচ তপোমিষ্ঠ-দৃঢ়ব্রতঃ।
আনারিশ্চগণারিশ্চ হাড়ো গোপীচবন্দ্যজাঃ॥

মাধো দোকড়িনামাচ রায়ীচ মধুসূদনঃ॥
কুশিকো যবনামাচ হড়ো নারায়ণোপিচ।
মহিন্তা দ্বিবিধনামা দায়ারিশ্চৈব কেশবঃ॥
চট্টঃ শকুনী নামাচ তৈলবাটী নয়ারিকঃ।
কুন্দো বিশ্বেশ্বরো জ্ঞেয়ো বন্দ্যাজ্ঞা বিঠু-
সংজ্ঞকঃ॥
ঘোষজৌ ভ্রাতরাবেতৌ মদনবিশ্বরূপকৌ।
গাঙ্গোস্তবোহাস্যনামা পুতির্গৌতমসং-
জ্ঞকঃ॥
শিমলী পরাশরো খ্যাতঃ শঙ্করো ডিন্তি
সংজ্ঞকঃ।
অমীকুলোদ্ভবাশ্চৈব গোদানঃ কগৃহুর্দ্বিজাঃ॥
তেষাং সম্বন্ধমাত্রেণ পঙ্কে গৌরীব সীদতি।
সম্বন্ধে ভোজনেচৈব দানে যজ্ঞে তথৈবচ॥
বিবুদ্ধিঃ শ্রাদ্ধকালেচ বর্জ্জ্যা এতে পুনঃপুনঃ।"

নাম	গাঁই
১ শঙ্কর	পীতমুণ্ডী
২ দিবাকর	গড়গড়ি
৩ ডাউক	গুড়
৪ দোকড়ি	পিপ্পলী
৫ মার্ত্তণ্ড	বন্দ্য
৬ আনায়ি	বন্দ্য
৭ গণায়ি	বন্দ্য
৮ ঝাড়	বন্দ্য
৯ গোপা	বন্দ্য
১০ বিঠু	বন্দ্য
১১ দোকড়ি	মাশ্চরক
১২ মধুসূদন	রায়ী
১৩ যব	কুশারি
১৪ নারায়ণ	হড়
১৫ দায়ারি	মহিন্তা
১৬ কেশব	মহিন্তা
১৭ শকুনি	চট্ট
১৮ নয়ারী	তৈলবাটী
১৯ বিশ্বেশ্বর	কুন্দ
২০ মদন	ঘোষাল
২১ বিশ্বরূপ	ঘোষাল
২২ হাস্য	গাঙ্গলী
২৩ গৌতম	পূতিতুণ্ডি
২৪ পরাশর	শিমলাই
২৫ শঙ্কর	ডিংসাই

সংকুলজাত এই সকল দ্বিজগণ গোদান গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁদের সম্বন্ধ মাত্রই কলঙ্কিত। সম্বন্ধে, ভোজনে, দানে, যজ্ঞে, এমন কি শ্রাদ্ধকালেও উহাঁরা বর্জ্জনীয়।

"গণোকন্যা বশিষ্ঠেন ঠেঠৈন শকুনি-সুতা।
হাড়ো কন্যাদায়িকেন কুবেরোহাস্যজাপতিঃ॥
চক্রপাণিনাপি কন্যা গৃহীতা ধনলোভতঃ।
বিঠুসুতা পতির্ভূত্বা চট্টজঃ কুলভূষণঃ॥
প্রতিগ্রহ সুতোদ্বাহাত্ যড়েতে বংশজাঃ
স্মৃতাঃ॥"

বশিষ্ঠ গণায়ির কন্যা, ঠেঠ শকুনির কন্যা, দায়িক হাড়োর কন্যা, কুবের ও চক্রপাণি হাস্যের কন্যা, এবং কুলভূষণ বিঠুর কন্যা। বিবাহ করিয়া প্রথম বংশজত্ব প্রাপ্ত হন; যে হেতুক গণায়ি প্রভৃতি প্রতিগ্রহ হইয়াছিলেন। অতএব—

"প্রতিগ্রহ-সুতোদ্বাহী বংশজঃ।"

কুলরমার এই বাক্যও যুক্তি-মূলক হইল।

এখন দেখাযাউক ঘটক কি? ঘটকের মূল নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া বিদ্যানিধি

মহাশয় বলিয়াছেন "ইহাও সম্পূর্ণ সম্ভব বোধহয়, এই আদি বংশজেরা বল্লালের নিকট ঘটক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" (২২৮পৃ—স)। আরও বলেন "যাহাদিগের কোনরূপ কলক্ষয় হইয়াছিল, তাঁহারা বংশজত্ব পাইলেন। কালক্রমে ইহাঁদিগের মধ্যে যাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধির বিশেষ লক্ষণ স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল তাঁহারা ঘটক বা কুলাচার্য্য হইলেন।"

আমরা যতদূর জানি তাহাতে বলিতে পারি, সকল ঘটকই বংশজ নহেন; ঘটকের মধ্যেও অনেক কুলীন শ্রোত্রিয় আছে। কাঁচাদিয়ার ঘটক রামগঙ্গা বিশারদের সন্তান, পারীহাল মেলের কুলীন। উহাদের মধ্যে অনেকেই এপর্য্যন্ত ভঙ্গ হয় নাই। উহাদের আদি পুরুষ হলগাঙ্গলী। আবার কোলা, বাইশারি ও সুন্দরদির ঘটকগণ মাশচরক শ্রোত্রিয়, উহাঁরাও এপর্য্যন্ত শ্রোত্রিয় সমাজে উচ্চ আসনে আসীন আছেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কুলীন, শ্রোত্রিয়, বংশজ এই তিনই ঘটক হইতে পারে। বাস্তবিক মহারাজ বল্লাল, উক্ত তিন শ্রেণী হইতেই কয়েক জনকে মনোনীত করিয়া ঘটকাখ্যা-প্রদান করেন। ঘটকদিগের প্রতি শ্রোত্রিয় কুলীনের দোষগুণ বিচারের ভার অর্পিত হয়। যথা—

"বংশাংশভাবগুণদোষবিচারকর্ত্তা,
ন্যূনাতিরিক্তপরিমাণযথার্থবক্তা,
পর্য্যা-বিপর্য্যা-গণনঞ্চ করোতি যশ্চ,
শশ্বন্নৃপেণ গদিতো ঘটকঃ সএব।"

অংশ সমুদয়ে পঞ্চদশ। "আর্ত্তিস্ত্রিধা ত্রিধাঃ ক্ষেম্যা মধ্যাংশো নবধাঃ স্মৃতাঃ,"—

ত্রিধা আর্ত্তি যথা—আর্ত্তি, সদার্ত্তি, পূর্ণার্ত্তি

ত্রিধা ক্ষেম্য, যথা—ক্ষেম্য, সৎক্ষেম্য, পূর্ণক্ষেম্য।

নবধা মধ্যাংশ যথা—কিঞ্চিৎক্ষেম্য, কিঞ্চিদার্ত্তি, লভ্য, অতিলভ্য, কিঞ্চিৎলভ্য, কিঞ্চিন্ন্যূন, গ্রহ, ন্যূন, তুল্য।

এই সকল বিষয়ে বিশেষ পরিজ্ঞাত ব্যক্তিগণই ঘটক উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। আমরা এতৎ সম্বন্ধে আর অধিক লিখিয়া প্রস্তাব দীর্ঘ করিতে বাসনা করি না। যাহার অংশ, বংশ, পর্য্যা এবং বিপর্য্যা জানিতে ইচ্ছাহয়, তিনি "ধ্রুবানন্দমিশ্র" পাঠ করিবেন।

ঘটকের মধ্যে দেবীবর অতি প্রসিদ্ধ। দেবীবরই মেলবন্ধন করিয়া রাঢ়ীয় কুলীন কন্যাদিগকে চিরদিনের নিমিত্ত জ্বলন্ত অনলে আহুতি প্রদান করেন; দেবীবরই কুলীন সমাজ রসাতলে নিক্ষেপ করেন; দেবীবরই ভীষণ পাপপ্রবাহে সমস্ত বঙ্গ ভাসাইয়াছেন; দেবীবরই মূর্খ কুলীন সম্প্রদায়ের জন্য ঘোরতর নরক প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন এবং দেবীবরই কুলীনদের ইহ পরকাল খাইয়াছেন। এমন গুণের সাগর দেবীবরের পরিচয় শুনিতে কেনা উৎসুক হইবেন? কেনা অনন্য মনে তাহার কথায় কাণ পাতিবেন? যদিচ মাননীয় বিদ্যানিধি মহাশয় দেবীবরের বিবরণ

বিস্তৃতরূপে লিখিয়াছেন,তথাপি পাঠকের ঔৎসুক্য নিবারণার্থ আমরা এইস্থলে উহাঁর বংশাবলী উল্লেখ করিলাম।

দেবীবরের পূর্ব্বপুরুষদের
পুরুষানুক্রমিক নাম।

ভট্টনারায়ণ, বরাহ, বৈনতেয়, সুবুদ্ধি, বিবুধেশ, গাউ, গঙ্গাধর, পহশ, শকুনি, মহেশ্বর, মহাদেব, দুর্ব্বলী, সঙ্কেত, অনন্ত, লক্ষ্মীনাথ, সর্ব্বানন্দ, দেবীবর।

দেবীবর বন্দ্যবংশজ; পিতা সর্ব্বানন্দ হইতে ঘটকাখ্যা প্রাপ্তহন। ইহাঁর ঊর্দ্ধতন নবম পুরুষ শকুনির ভ্রাতা পিঠু প্রতিগ্রহ ছিলেন। বোধহয় তাঁহার সঙ্গে শকুনির কোনরূপ সংশ্রব থাকাতেই তদ্বংশীয় দেবীবর কুলগৌরবহীন বলিয়া প্রসিদ্ধ। দেবীবর কুলীন দিগের দোষ নির্ব্বাচন করিয়া উহাঁদিগকে ৩৬ মেলে বিভাগ করেন।

১ গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্যে ফুলিয়া মেল; ২ যোগেশ্বর পণ্ডিতে খড়দহ মেল; ৩ বন্দ্য বল্লভাচার্য্যে বল্লভী; ৪ বন্দ্য সর্ব্বানন্দে সর্ব্বানন্দী; ৫ মুখৈটি দেবকীনন্দনে পণ্ডিতরত্নী; ৬ চট্টমুকুন্দে বাঙ্গাল; ৭ পুতিতুণ্ড সুরাই ঘটকসিংহে সুরাই; ৮ বন্দ্য ত্রিলোচনাচার্য্য শেখরে আচার্য্য, শেখরী; ৯ মুখ গোপাল ঘটকে গোপালঘটকী; ১০ চট্টরাঘবে চট্টরাঘবী; ১১ বিজয় পণ্ডিতে বিজয়পণ্ডিতী; ১২ বন্দ্যমাধবে মাধাই; ১৩ চট্ট অবসতি বিদ্যাধরে বিদ্যাধরী; ১৪ অবসতি চট্টরাঘবে পারীহাল; ১৫ পুতিতুণ্ড শ্রীরঙ্গভট্টে শ্রীরঙ্গভট্টী; ১৬ মুখ জিতামিত্রে প্রমোদিনী; ১৭ অবসতি চট্টকেশবে বালী; ১৮ মুখ চন্দ্রপতিতে চন্দ্রাপতি; ১৯ মুখ শ্রীবর্দ্ধনে শ্রীবর্দ্ধনী; ২০ মুখ শতানন্দখানে শতানন্দখানী; ২২ খুইনার চট্টছয়িতে ছয়ী; ২২ মুখ চক্রপাণিতে আচম্বিতা; ২৩ মুখ দশরথ ঘটকে দশরথ ঘটকী; ২৪ আখণ্ডলবংশ মাধবশুভরাজখানে শুভরাজখানী; ২৫ মুখ মালাধর খানে মালাধর খানী; ২৬ ঘোষ রাঘবে রাঘব ঘোষলী; ২৭ চট্টদেহাটা শ্রীপতিতে দেহাটী; ২৮ গাঙ্গ গঙ্গাধরে নৈড়া; ২৯ চৈতল কাকুস্থে কাকুস্থী; ৩০ ঘোষ ধরাধরে ধরাধরী; ৩১ কাঞ্জিলাল শতানন্দে রায়; ৩২ বন্দ্য ভৈরব ঘটকে ভৈরব ঘটকী; ৩৩ বন্দ্য পরমানন্দ মিশ্রে পরমানন্দ মিশি; ৩৪ মুখ সুঙ্গোবংশীয় সর্ব্বানন্দে সুঙ্গোসর্ব্বানন্দী; ৩৫ চট্ট নৃসিংহ বংশীয় হরি মজুমদারে হরি মজুমদারী; এবং ৩৬ চাঁদাই মেল।

এই ৩৬ মেলের মধ্যে যে যে মেলে ন্যূনদোষ দৃষ্ট হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠত্বে গণ্য; তদনুসারে ফুলিয়া ও খড়দহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কোন্ মেলে কত দোষ, কাহারও জানিবার ইচ্ছা হইলে "মেলমালা" দেখুন।

এই মেল বন্ধনে এক মেলীয় কুলীন কন্যা, অন্য মেলীয় পাত্রে দেওয়া নিষিদ্ধ হইল। তদবধিই কুলীন কন্যাগণের বিবাহের 'বর' দুর্ঘট হইয়াছে এবং অহরহ অপাত্রে কন্যাদান ঘটিতেছে। বিদ্যানিধি

মহাশয় বহু যুক্তিতে প্রমাণ করেন যে মেলবন্ধন সম্ভবতঃ ৫১৯ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল। এ বিষয়ে তাঁহার যুক্তি গুলি নিতান্ত সারগর্ভ ও অনুসন্ধান মূলক। বাস্তবিক সম্বন্ধ নির্ণয় যে একখানা প্রশংসার্হ গ্রন্থ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে মধ্যে মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে দোষ থাকিলেও তাহা ধর্ত্তব্য নহে। আমরা ভরসা করি পুনর্ম্মুদ্রাঙ্কণে গ্রন্থখানা সর্ব্বাংশে শুদ্ধি লাভ করিবে, আর কায়স্থাদির অতীত ইতিহাস ও বর্ত্তমান সামাজিক বিবরণ সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া গ্রন্থকার যে সকল ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইয়াছেন, তাহা পরিত্যক্ত হইবে।

ভারতবর্ষের প্রাচীন বাণিজ্য।

(বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়)

রত্নগর্ভা ভারত ভূমি সাগরমেখলা সমন্বিতা পৃথিবীর অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র পৃথিবী। ভারতভূমির উর্ব্বর গর্ভে প্রসূত না হয়, এমন পদার্থই প্রায় দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতিমূলপ্রবিষ্ট হয় নাই। এদেশীয়দিগের কথা দূরে থাকুক, দেশদেশান্তরের মানবগণ ইহার প্রসাদে জীবনযাপনোপযোগী অপর্য্যাপ্ত সামগ্রী প্রাপ্ত হয়। বশিষ্ঠ মুনির কামদুহা নন্দিনীর ন্যায়, স্বর্গীয় কল্পতরুর ন্যায় ভারতভূমি আবহমানকাল উদ্ভিজ্জ, খনিজ, প্রাণিজ প্রভৃতি প্রভূত দ্রব্য নিচয় উৎপাদন করিয়া জগতীতলে সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছে; একথা কেহই অসঙ্গত বলিয়া সন্দেহ করিতে পারিবে না। জগতের সৃষ্টি হইতে আজি পর্য্যন্ত প্রকৃতি দেবী ভারতের প্রতি সুপ্রসন্ন ও মুক্তহস্ত রহিয়াছেন, এবং উত্তরকালেও যে এইরূপ থাকিবেন, তাহা অনুভূতি দ্বারা আমাদিগের বশেবরূপ হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। যদিও কালের অপ্রতিহতপ্রভাবে ভারতভূমি প্রাক্তন সৌভাগ্যসুখে বঞ্চিত হইয়াছে; যদিও স্বাধীনতা রত্ন হারাইয়া আজি সপ্তশত বর্ষাধিক পরাধীনতার চিরক্লেশসম্ভূত উৎপীড়নে শক্তিহীন হইয়াছে; এবং যদিও সুখশশাঙ্কজাত অমৃতময়ী, বিশ্বশোভিনী, জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর সহবাস পরিবর্ত্তে চিরদুর্ব্বিষহ অসুখময়ী অমাবস্যাতামসীর অতি প্রগাঢ় তমিস্রজালে আচ্ছন্ন হইয়াছে; তথাপি বহুরত্নপ্রসবিনী। ঈদৃশী অবস্থাতেও যখন "যা চাই, তাই পাই"; তখন সাত শত বৎসরের পূর্ব্বে ভারতভূমি যে কত রত্ন, কত জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী দ্রব্য এবং কত অমৃতময় ভোজ্য প্রদান করিত, তাহা অভিনিবিষ্টচিত্তে একবার চিন্তা

করিলেই চূড়ান্তরূপে মীমাংসিত হইয়া যায়।

প্রতীচ্য মিসরীয় এবং ফিনিসীয় জাতিই প্রথমে ভারতবর্ষজাত দ্রব্যনিচয় বিদেশে লইয়া যায় *; তাহাদিগের ঈদৃশী ব্যবহারের পুর্ব্বে ভারতের ধন ভারতেই থাকিত—সুখসৌভাগ্যেরও ইয়ত্তা ছিল না। কিন্তু কালক্রমে ভারতভূমিজাত অপরিমিত উৎকৃষ্টতর সামগ্রীসমূহ পররাজ্যে নীত হওয়াতে, বিদেশীয়দিগের নেত্রে মীলিত হইল। সেই সময় হইতে তাহারা ক্রমে ক্রমে ইহার সহিত স্থায়ি বাণিজ্য আরম্ভ করিল। মিসরীয় ও ফিনিসীয়দিগের পরে, পারস, গ্রীক এবং রোমানেরা পর্য্যায়ক্রমে ভারতবর্ষে আগমন করে। রোমাণেরা এদেশ হইতে নানাবিধ বহুমূল্য রত্ন, উৎকৃষ্ট রেসম, সুগন্ধি দ্রব্য প্রভৃতি অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে গ্রহণ করিয়া, তাহাদিগের স্বদেশের বহুল উন্নতি সংসাধন করিয়াছিল। † এতদ্দ্বারা ইহাই সপ্রমাণিত হইতেছে যে, রোম সভ্যতা ভূষণে ভূষিত হইবার বহুকাল পুর্ব্বে ভারতবর্ষ সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরূঢ় হইয়াছিল। ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছে যে,রোম সভ্যতা সম্বন্ধে গ্রীকজাতির নিকট অনেকাংশে ঋণী ; সেই ইতিহাসের উজ্জ্বল বর্ণমালায়ই আবার গ্রীকজাতি ঐ বিষয়ে ভারতবর্ষ ও মিসরের সমীপে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় ; ভারতবর্ষে আসিয়া পিথাগোরসের দর্শন শাস্ত্র এবং গণিতবিজ্ঞান শিক্ষা করাও তাহার অন্যতর নিদর্শন দেখা যাইতেছে ; সুতরাং তৎসম্বন্ধে অণুমাত্রও সন্দেহ করা যাইতে পারে না। যে সকল রাজ্যকে আমরা প্রাচীনকালে সভ্যতাসোপানারূঢ় হইয়াছিল বলিয়া জানিতে পারিয়াছি, তাহাদিগের মধ্যে সকলেই কোন না কোনপ্রকারে আমাদিগের ভারতবর্ষের নিকট বহুল শিক্ষা ও উপকার লাভ করিযাছিল। কিন্তু ভারতভূমি কাহারও নিকট তৎকালে কোন বিষয়েই কিছু গ্রহণ করে নাই। রোমের বহুকাল পূর্ব্বে মিসরই যখন বাণিজ্য স্রোতের সহিত মিশাইয়া এদেশ হইতে কি গণিতাদি বিদ্যা, শিল্প বিদ্যা, কি রাজ্-

* পুরাবৃত্তে প্রথিত অতি প্রাচীন মিসরীয় এবং ফিনিসীয় নাবিকদিগের ভূমধ্যস্থসাগরেই প্রথম সমুদ্রযাত্রা হইয়াছিল। কিন্তু কেবল মাত্র ভূমধ্যস্থসাগরের তটস্থিত প্রদেশসমূহেই তাঁহাদিগের বাণিজ্য সীমাবদ্ধ ছিল না। আরব সাগরের উপকূলস্থিত বন্দর সকল অধিকার করিয়া প্রথমেই তাহারা বাণিজ্যের সীমা বিস্তৃত করিয়াছিল। এবং পাশ্চাত্য জাতিদিগের মধ্যে যাহারা ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য স্থাপন করিয়াছিল, উহারা তাহাদিগের সর্ব্ব প্রথম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

(রবার্টসনকৃত প্রাচীন ভারতের ইতিহাস। প্রথম অধ্যায়, ৫। পৃষ্ঠা)

† রবার্টসনকৃত প্রাচীন ভারতের ইতিহাস। দ্বিতীয় অধ্যায়। ৩৫ পৃষ্ঠা।

নীতি, কি সমাজনীতি, সকল বিষয়েরই কিছু কিছু অংশ লইয়া গিয়াছিল, তখন পরবর্ত্তী সভ্যতারূঢ় রোমের কথায় প্রয়োজন কি? যাহা হউক, রোম বাণিজ্য সম্বন্ধে তাৎকালিক অন্যান্য সভ্য দেশাপেক্ষা ভারতবর্ষের নিকট বিশেষরূপে উপকৃত ইহা অবশ্য বলিতে হইবে। যখন ভারতবর্ষের বাণিজ্যজাত দ্রব্য দ্বারা রোমই ঈদৃশ উন্নীত ও গৌরবান্বিত হইয়াছিল, তখন অপর কোন দেশই যে সেরূপ হইতে সক্ষম হয় নাই, তদ্বিষয়ে আর বক্তব্য কি?

এক্ষণে একটি কথা উত্থাপিত হইতেছে, রোম কি কেবল ভারতবর্ষের প্রসাদেই সুসভ্য হইয়াছিল? অন্যান্য দেশের সহিত কি তাহার উন্নতি সম্বন্ধে বাণিজ্য বিষয়িণী ঘনিষ্টতা ছিল না? উত্তর,—ছিল; কিন্তু ভারতবর্ষই রোমের প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে মুক্তহস্ততা প্রদর্শন করিয়াছিল। *

পাশ্চাত্য প্রাচীন পুরাতত্ত্ববিৎ এরিয়ান্ (Arrian) বলেন, গ্রীক্, রোমীয় প্রভৃতি প্রাচীন ইউরোপীয়েরা তাৎকালিক ভারতীয়দিগের কতকগুলি অজ্ঞাত স্বল্প মূল্য বিশিষ্ট দ্রব্যের বিনিময়ে নানাবিধ উৎকৃষ্ট নীলকান্ত মণি, অয়স্কান্ত মণি, পদ্মরাগ মণি, হীরক প্রভৃতি রত্ন; বিবিধ সুগন্ধি দ্রব্য; নানাবিধ চিত্রিত কৌশিক ও সূত্র বস্ত্র; রেসমী সূত্র; হস্তিদন্ত প্রভৃতি দ্রব্য সমূহ লইয়া গিয়াছিল। † ফলে ভারতবর্ষের প্রসাদেই রোমেশ্বর জুলিয়স সিজার, ব্রুতাসের মাতা সার্ভিলিয়াকে ৪৮৩৫৭০) টাকা মূল্যের একটি বৃহৎ মুক্তা উপঢৌকন দিয়াছিলেন। রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা প্রসিদ্ধ মৌক্তিক কর্ণভূষণের মূল্য ১৫১৪৫৮০) টাকা লইয়াছিল। ‡ সুতরাং যে ভারত ভূমির কৃপায় পাশ্চাত্য জাতীয়েরা এতাদৃশ মূল্যবান রত্ন সমূহ লাভ করিয়াছিল, সে ভারত ভূমি যে কত দূর ঐশ্বর্য্যশালিনী, তাহা আর বাহুল্য রূপে বলিবার প্রয়োজন নাই। ভারত ভূমির ঐশ্বর্য্য প্রাচীনকালাবধি আজি পর্য্যন্ত স্বার্থপর প্রতীচ্য জাতিরা ক্রমান্বয়ে দোহন করিতেছে, তথাপি নিঃশেষ করিতে সমর্থ হয় নাই। শত শত বিদেশীয় ভূপতি ভারতের অতুল ঐশ্বর্য্য দর্শনে ইহার প্রতি বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন, তথাপি ভারত ভূমি রত্ন প্রসবে বিরত নহে। যে ভারত পুরাকালে মিসর, গ্রীস, পারস্য, রোম প্রভৃতির সমৃদ্ধি ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিল, সেই রত্নপ্রসবিনী ভারত ভূমি অধুনা ক্ষুদ্রোদরা অথচ সর্ব্বগ্রাসিনী ইংলণ্ড ভূমির দেহ পুষ্টি সংসাধন করিতেছে। এক ভারতের সহিত প্রথমসূত্রে বাণিজ্য-সম্বন্ধ বন্ধন করিয়া ইংলণ্ড ভূমি সর্ব্বাপেক্ষা অতুল ঐশ্ব-

* । রবার্টসনকৃত প্রাচীন ভারতের ইতিহাস। ২ অ, ৫৮ এবং ৫৯পৃষ্ঠা।

† রবার্টসনকৃত প্রাচীন ভারতের ইতিহাস। ২ অ, ৬১ এবং ৬২ পৃষ্ঠা।

‡ ঐ ইতিহাস ২ অ, ৫৮ পৃ।

র্য্যেশ্বরী হইয়াছে, ইহা কে না মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবে ? কোন আধুনিক ইতিহাস না ইহা দেখাইয়া দিবে ?

এক্ষণ দেখা যাউক, পাশ্চাত্য জাতীয়েরা বাণিজ্য বলে যে ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য্যে স্ব স্ব দেশের মহতী উন্নতি বর্দ্ধন করিয়াছেন ও করিতেছেন, সেই ভারতের প্রাচীন বাণিজ্য কিরূপ ছিল। বাণিজ্য দুই প্রকার ;—বহির্বাণিজ্য এবং আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য। এতদুভয়ের মধ্যে প্রাচীন ভারতবর্ষ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেই লিপ্ত ছিল। ভারত কেন যে বহির্বাণিজ্য পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্বাণিজ্য করিত, অনুসন্ধান করিলে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বকাল প্রভৃতি সুবিজ্ঞ পণ্ডিতগণের মতে যে দেশে প্রকৃতি মুক্তহস্তা, যে দেশে প্রকৃতির প্রসাদে অনতি ক্লেশে আশানুরূপ প্রয়োজনীয় সর্ব্বপ্রকার সামগ্রী হস্তগত হয়, সে দেশের অধিবাসী বিদেশজাত দ্রব্যের আশা করে না। * সুতরাং এই কারণেই প্রভূত রত্ন প্রসবিনী ভারত ভূমির বহির্বাণিজ্যে ঘনিষ্ঠতা না থাকিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এই জন্যই এদেশে প্রাচীনকাল হইতে বাণিজ্য সম্বন্ধে যাহা কিছু দেখা যায়, তাহা কেবল আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য। যে দেশে " এক আছে আর নাই " সেই দেশ, দেশ দেশান্তর হইতে আশানুরূপ প্রয়োজনীয় দ্রব্যলাভের জন্য স্থলপথেই হউক, বা জলপথেই হউক বাণিজ্য ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষীয়েরা স্বদেশ ভিন্ন বিদেশজাত কিছুরই উপযোগিতা বা আবশ্যকতা স্বীকার করিতেন না। বিশেষতঃ, স্বভাবোৎপন্ন দ্রব্য ব্যতীত এ দেশীয় শিল্পিমণ্ডলী লৌকিক ব্যবহারের নিমিত্ত এত উৎকৃষ্ট শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত করিত † যে, তদ্রূপ দ্রব্য পৃথিবীর অন্য কোন দেশে পাওয়া সুকঠিন হইত। কোন দেশই প্রাচীন সময়ে ভারতবর্ষীয় শিল্পনৈপুণ্যের অংশ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় নাই। প্রাচীন ভারতবাসিগণ এইরূপে আপনাদের অপরাপর দ্রব্যে আপনারাই অনায়াসে কালাতিপাত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কেবল কয়েক প্রকার ধাতু, রৌপ্যপাত্র, সঙ্গীত যন্ত্র প্রভৃতি দ্রব্য অপর দেশ হইতে

* বকলের সভ্যতার ইতিহাস।

† ভারতবর্ষীয় অধিকাংশ শিল্পজাত দ্রব্যসমূহে যে সর্ব্বাবয়ব সম্পন্নতা প্রত্যক্ষীভূত হয়, তাহা এতৎ সংঘটিত। যদিও পৌরাণিক অভ্রান্ত কার্য্যের সম্মান নাই, এতদ্দেশীয়দিগের আবিষ্ক্রিয়াবৃত্তির প্রতিরোধক, তথাপি নিবিষ্টচিত্তে তৎপ্রতি নিযুক্ত হওয়াতে তাহাদিগের মধ্যে আশ্চর্য্য কার্য দক্ষতা ও চাতুর্য্য সমুৎপন্ন হইতেছে। এমন কি, ইউরোপীয়েরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিজ্ঞান এবং যন্ত্রাদির সাহায্যেও কার্য্যক্ষেত্রে তাহাদের তুল্য ফলোৎপাদন করিতে সমর্থ হয় নাই।

(রবার্টসনকৃত প্রাচীন ভারতের ইতিহাস। পরিশিষ্ট ২০১ পৃষ্ঠা।)

প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু ঐ সকল দ্রব্য বিদেশীয়েরা স্বয়ং আনিয়া যোগাইত, ভারতবাসিগণকে তজ্জন্য কোন স্থানে যাইতে হইত না। কোন কোন ব্যক্তি বলেন যে, আলেকৃজেন্দ্রিয়ার বণিক্‌সমূহ মিসর দেশ হইতে রঙ্গতপাত্র,সাইপ্রস্ দ্বীপ হইতে একপ্রকার সুরা এবং পাশ্চাত্য অন্যান্য দেশ হইতে নৃত্যগীত নিপুণা সুন্দরী যুবতীদিগকে ভারতবর্ষে আনয়ন করিয়া বিক্রয় করিত। * কিন্তু কোথাও এমন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না যে, প্রাচীন ভারতীয়েরা স্বদেশজাত কোন দ্রব্য সামগ্রী স্বয়ং ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য কোন দেশে বিক্রয় করিয়া আসিতেন। বিদেশীয়েরা এইরূপ কএক প্রকার স্বল্প মূল্যের দ্রব্য বিনিময়ে ভারতবর্ষেস্তূত বহু মূল্যের অপর্য্যাপ্ত দ্রব্য লইয়া যাইত। এই ব্যাপারটি দেখিলে কবিবর কবি কঙ্কণের কবিতার্দ্ধ " জীরার বদলে হীরা " সহসা মনোমধ্যে উদ্ভাসিত হয়। যাহা হউক, ফল কথা এই যে, তাৎকালিক ভারতবর্ষবাসিগণের সাধারণতঃ যাহা কিছু আবশ্যাক হইত, তাহা " পায়ের উপর পা দিয়া " ঘরে বসিয়াই অনায়াসে প্রাপ্ত হইতেন ; সুতরাং কোন মতেই বিদেশে যাইবার প্রয়োজন হইত না।

যাহাহউক এক্ষণে ভারতবর্ষ বহির্বাণিজ্যও অন্তর্বাণিজ্য এতদুভয়ের মধ্যে কেবল মাত্র শেষোক্ত বাণিজ্যই যে কেন আসক্ত ছিল, তাহারই সমালোচনা করা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, যে, কোন অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর প্রয়োজন হইলেও, ভারতবর্ষকে পরদেশের মুখাপেক্ষা করিতে হইত না ; প্রকৃতিই তত্তাবতের পূরণ করিয়া দিতেন। সুতরাং ভারতবাসিগণের সুদূরবর্ত্তী প্রদেশে যাইয়া বহির্বাণিজ্যে লিপ্ত হইবার আবশ্যক হইত না। আবার " জননী জন্ম ভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী " এই অমূল্য কবিতার্দ্ধ প্রত্যেক ভারতীয়ের হৃদয়-ফলকে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত ছিল। আমাদের বিবেচনায় শ্রেষ্ঠতম মাতা এবং জন্মভূমির প্রতি বিশুদ্ধ ও অটল ভক্তি, শ্রদ্ধা, মমতা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বৃত্তিচয় দৃঢ়ীভূত ও চিরস্থায়ী করিবার জন্যই এইরূপ অপূর্ব্ব কবিতার সৃষ্টি হইয়াছে, এবং এই কবিতার মাহাত্ম্যেই প্রাচীন ভারতবাসী আর্য্যগণ স্বদেশের প্রভূত পরিমাণে উন্নতি ও গৌরব সংবর্দ্ধন করিয়া গিয়াছেন। বোধ হয় তৎকালে এইরূপ না করিলে, ভারতে যে প্রাচীন গৌরব আজি পর্য্যন্ত দেদীপ্যমান এবং যাহার প্রতিবিম্ব অধুনাতন ইয়ুরোপীয় পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মানস-মুকুরে প্রতিফলিত হইয়া অশেষ বিধ উপকার সাধন করিতেছে, তাহা এত অধিক পরিমাণে হইতে পারিত না। কেহ হয়ত বলিবেন যে, প্রাচীন মিশর, গ্রীক্ ও রোমীয়েরা তবে কিরূপে দূর দেশে গমন করিয়া স্ব স্ব দেশের ভু-

* বোছামকৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস। ৪৭ পৃষ্ঠা।

য়সী উন্নতি বর্দ্ধন করিয়াছিলেন? তদুত্তরে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে,তত্তৎ দেশে যে যে বিষয়ের অভাব পরিলক্ষিত হইত, তাহারা সেই গুলির পরিপূরণ করিবার জন্যই দেশ দেশান্তরে বাণিজ্য করিত। যদ্যপি ভারতের ন্যায় ঐ সকল দেশেও প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গীন প্রসন্নতা ও মুক্তহস্ততা প্রদর্শিত হইত, তাহা হইলে, বোধ করি, তাহারা কোন ক্রমেই বিদেশ পর্য্যটন করিত না। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রকৃতিগত অবস্থা অত্যুৎকৃষ্ট; সুতরাং প্রাগ্‌ভারতীয়েরা স্বদেশের উন্নতির জন্য বিদেশীয়দিগের দ্বারে অভাবপূরণের প্রার্থী হইতেন না। ফলকথা, ভারতবর্ষের উন্নতির পথ ভারতবর্ষেই ছিল; তাহা না থাকিলে,প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যগণ অবশ্যই বহির্বাণিজ্যে লিপ্ত হইতেন।

কিন্তু ইহাও দৃষ্ট হইতেছে যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে কতকগুলি লোক বহির্বাণিজ্যে সংবদ্ধ হইয়া পোতারোহণে অপরাপর দেশে গমনাগমন করিতেন। সুমাত্রা, জাবা, বালী প্রভৃতি দ্বীপ সমূহে এখনও তাহার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। জাবাদ্বীপে হিন্দুদিগের কতকগুলি দেব মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে এবং এখনও বালীদ্বীপে প্রাচীন হিন্দুবংশীয়গণ বাস করিতেছেন। তাঁহাদিগের আচর ব্যবহার,রীতি নীতি এবং ধর্ম্মাদি ভারতবর্ষীয় হিন্দুদিগের ন্যায় সর্ব্বাংশে একরূপ না হউক, অনেকাংশে সমীভূত দেখা যায়। * বোধ করি, বহুকাল তথায় অবস্থান করাতে এতাদৃশ বিশৃঙ্খলা ও অসামঞ্জস্য ঘটিয়াছে। অতএব তত্তৎ স্থানে বহির্বাণিজ্য বশতঃই অবশ্য হিন্দুবসবাস ঘটিয়া থাকিবে। এক্ষণে এরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, পূর্ব্বতন হিন্দুগণ ভারতবর্ষ ব্যতীত কোন কোন দেশে গিয়া বহির্বাণিজ্যব্যাপারে পরিলিপ্ত ছিলেন। কিন্তু এদিকে আবার মনু প্রভৃতি মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে আর্য্যজাতির বিদেশ গমন, তথায় বাণিজ্যাদি করিবার বিধান অথবা শাসন দেখা যায় না। যদিও মনুসংহিতার বাণিজ্যাধ্যায়ের মধ্যে একস্থানে লিখিত আছে যে, অত্যন্ত প্রয়োজন হইলে শূদ্র পরদেশে গিয়া বাণিজ্য করিতে পারে; কিন্তু তাহারা, বোধ হয়, আর্য্যগণের ভারত প্রবেশের পূর্ব্বকালীয় আদিম জাতি। সুতরাং তাহাদিগের সহিত তাদৃশ আত্মীয়তা বা ঘনিষ্ঠতা না থাকাতেই মহাত্মা মনু এরূপ আদেশ করিয়া থাকিবেন; নতুবা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও দ্বিজ সেবক শূদ্র বর্ণের প্রতি এরূপ আদেশ করেন নাই কেন? অথবা আমাদিগের সামান্য বুদ্ধিতে যতদূর পারিয়াছি, অনুসন্ধানের ত্রুটি করি নাই, কিন্তু শেষোক্ত বর্ণ চতুষ্টয়ের ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য দেশে গমন বা তথায় যাইয়া বাণিজ্য করিবার অধিকার-বিধি কোন শাস্ত্রেই দেখিতে পাই নাই। যে সকল হিন্দু ভারতবর্ষ ব্যতীত দেশে অর্থাৎ অনার্য্য বা ম্লেচ্ছ দেশে গিয়া

* ক্রফ এবং টমসনের বিজ্ঞাপনী।

বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের তথায় গমন শাস্ত্র সম্মত নহে, কেবল স্বেচ্ছাচারিতা বা নির্ব্বাসন নিবন্ধনই তাহা ঘটিয়াছিল। ব্রাত্য (পতিত অর্থাৎ উপনয়নাদি দশ সংস্কার বর্জ্জিত) প্রাচীন হিন্দুগণই ভারতবহির্ভূত অনার্য্য দেশে যাইয়া বাস করিতেন। কারণ, সমাজচ্যুত হইয়া প্রতিবেশীদিগের নিকট অবস্থান করা নিতান্ত কষ্টকর ও অসহ্য; তদপেক্ষা স্বদেশ ত্যাগ করিয়া অপরিচিত দেশে বসতি করা অনেকাংশে শ্রেয়স্কর। একজন সুবিজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, রোমনগরে সর্ব্বনিকৃষ্ট হওয়া অপেক্ষা কোন সামান্য গ্রামে সর্ব্বপ্রধান হওয়া সুখের বিষয়। ব্রাত্য হিন্দুগণও এইরূপ অভিপ্রায়ে স্বীয় জন্মভূমি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া জাবা, বালী প্রভৃতি অনার্য্য দ্বীপে যাইয়া বাস করিতেন। অধুনা বালী দ্বীপে যে সকল হিন্দু অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা প্রাচীন ব্রাত্য হিন্দুগণের বংশোদ্ভব। অতএব এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতীতি হইতেছে যে, পুরাকালে যে সকল হিন্দু বিদেশে যাইয়া বাস করিতেন, তাঁহারা পতিত হইয়া লজ্জা ও ঘৃণাবশতঃই দেশত্যাগী হইতেন;—শাস্ত্রানুসারে বা বহির্বাণিজ্য করিবার জন্য নহে। আবার দেখা যায়, যে সকল ব্রাহ্মণ কোন অলঙ্ঘনীয় অপরাধ বা নরহত্যাদি করিতেন, মনু সংহিতা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধানানুসারে তাঁহাদিগকে জীবনদণ্ডে দণ্ডিত না করিয়া যাবজ্জীবনের জন্য নির্ব্বাসিত করা হইত। সুতরাং প্রাচীন আর্য্যদিগের বিদেশবাসী হইবার ইহাও একটি বলবৎ কারণ।

কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, প্রাচীন হিন্দুদিগের কি সমুদ্রগমনোপযোগী অর্ণবপোত ছিল? তদুত্তরে এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, তাঁহাদিগের সমুদ্রপোত নির্ম্মাণের প্রয়োজন ছিল না; কারণ যে অভিপ্রায় উহা নির্ম্মিত হইয়া থাকে সেই বহির্বাণিজ্য তাঁহাদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। কিন্তু অনার্য্যজাতিরা প্রাচীন ভারতে অর্ণবপোতে বাণিজ্য করিতে আসিত বলিয়া তাৎকালিক হিন্দুগণ উহার কার্য্য ও আকারাদি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া ছিলেন। পতিত হিন্দুগণ স্বেচ্ছায় কিংবা নির্ব্বাসিত হইয়া সেই সকল অনার্য্যজাতিদিগকে পার হওয়ার মূল্য প্রদানান্তর তাঁহাদিগের পোতারোহণে জাবা প্রভৃতি দ্বীপে গমন করিতেন। অতি প্রাচীনকালে অর্থাৎ বৈদিক সময়ে নবাগত আর্য্যদিগের মধ্যে সামাজিক পাপের প্রবলতা একপ্রকার ছিল না বলিয়াই বোধ হয়। কারণ, তখন তাঁহারা প্রচুর আদিমনিবাসিপরিপূরিত ভারতে অনধিক সংখ্যায় আগমন করিয়াছিলেন; সুতরাং তাহাদিগের ভয়ে সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত থাকিতেন এবং কি কৌশলে তাহাদিগকে পরাজিত ও তাড়িত করিয়া রত্নভূমি ভারতবর্ষে চিরাধিপত্য সংস্থাপন করিবেন, কেবলমাত্র ইহাই চিন্তা করিতেন। এই

জন্যই তৎকালে আর্য্যদিগের মধ্যে সামাজিক পাপের স্রোত প্রবাহিত হয় নাই। বুকল প্রভৃতি পণ্ডিতদিগের মতে যেখানে লোক সংখ্যা অধিক নহে, সেখানে পাপের পরিমাণও অতি অল্প। সুতরাং ভারতবর্ষে নবাগত আর্য্যদিগের মধ্যে তৎকালে কোন গুরুতর পাপ সংঘটিত হইত না, এবং নির্ব্বাসনের বিধি প্রভৃতিও প্রচলিত ছিল না। মনু বৈদিক সময়ের অনেক পরবর্ত্তী লোক। তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণরূপে আর্য্যদিগের করতলগত হইয়াছিল এবং তাঁহাদের সংখ্যাও বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সুতরাং তখন আর্য্যমণ্ডলীতে বিবিধ প্রকার সামাজিক পাপের সংখ্যাও ন্যূনছিল না। এই জন্যই মনুসংহিতায় পাপ বিশেষে প্রায়শ্চিত্ত, অর্থদণ্ড, জীবনদণ্ড এবং নির্ব্বাসনাদির বিবিধ প্রকার অনুশাসন লিখিত হইয়াছিল। মনুর সময়ে যাহারা নির্ব্বাসিত হইত, তাহারা মান্দ্রাজ প্রভৃতি দক্ষিণাঞ্চলে যাইয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিত। কিন্তু মনুর পরসময় হইতেই, বোধ হয়, অতি প্রাচীন পাশ্চাত্য জাতীয়েরা ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আগমন করে। সেই সময় হইতেই পতিত বা দণ্ডিত হিন্দুগণ জাবা প্রভৃতি দ্বীপে গমন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

যাহা হউক, আবার কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, বঙ্গেশ্বরের পুত্র বিজয় সিংহ পোতারোহণে সিংহলে গমন করিয়াছিলেন, তিনি ত পতিত হইয়া গমন করেন নাই? উত্তর, তিনি পতিত হইয়া সিংহলে যান নাই বটে, কিন্তু পিতার সহিত বিবাদ করিয়া দেশত্যাগী হইয়াছিলেন। সুতরাং বিজয় সিংহের সিংহল যাত্রা শাস্ত্র সম্মত নহে। এতদ্ব্যতীত রামায়ণ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থের মতে সিংহল (Ceylon) বা লঙ্কা এবং ভারতবর্ষের যদিও মধ্যে সমুদ্র ব্যবধান আছে, তথাপি উহা ভারতবর্ষের বহির্ভূত নহে। ইহা স্বীকার করিলে বিজয়ের সিংহল-যাত্রা দোষাবহ বলিয়া বোধ হয় না।

প্রাচীন হিন্দুগণ জলপথে যেরূপ বহির্বাণিজ্য করিতে অনার্য্য দেশে গমন করিতেন না, সেইরূপ স্থলপথেও তাঁহাদিগের সেই অভিপ্রায়ে কোন ম্লেচ্ছদেশে গমন করিবার বিধি ছিল বলিয়া কোন শাস্ত্রাদিতে প্রমাণ নাই।—তবে মহাভারতাদিতে এইমাত্র দেখা যায় যে, রাজ্য বিস্তারের জন্য অর্জ্জুন প্রভৃতি শূরগণ হিমালয়ের উত্তর দিকস্থ কোন কোন ম্লেচ্ছদেশে যুদ্ধার্থ গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু বাণিজ্য বিস্তৃতির নিমিত্ত কেহই যান নাই। কেহ কেহ বলিতে পারেন,ভারতবর্ষীয় প্রাচীনভূপতিগণ এইরূপে অনার্য্যদেশে পদার্পণ করিলে পতিত হইতেন না কেন? যাঁহারা এরূপ আপত্তি উত্থাপন করেন, সেই মহাভারতাদি গ্রন্থে তাঁহারা একবার অভিনিবেশ পূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারিবেন, যে, রাজাদিগের ঈদৃশ কার্য্যে

পাতিত্য দোষ ঘটে না এরূপ অনুশাসন উল্লিখিত আছে। সুতরাং এবিষয়ে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। প্রাশ্চাত্য প্রাচীন ইতিহাসে লিখিত আছে যে, গ্রীসাধিপতি সেকন্দর সাহ যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন তিনি শর্ম্মণাচার্য্য নামক জনৈক হিন্দু তপস্বীকে বল পুর্ব্বক গ্রীসে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শর্ম্মণাচার্য্য ব্রাহ্মণ,তিনি জানিতেন যে,ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য দেশে পদার্পণ করিবা মাত্রই পতিত হইতে হয়। সুতরাং এই আশঙ্কায় তিনি গ্রীসের নিকটবর্ত্তী কোন স্থলে চিতানল প্রজ্বলিত করিয়া জীবন বিসর্জ্জন পুর্ব্বক পাতিত্য পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছিলেন। এখনও দেখা যায় যে, হিন্দু ধর্ম্মের মতে সিন্ধু নদের পুর্ব্ব পারে স্নান করিলে পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে, কিন্তু উহার পশ্চিম পারে অবগাহনে পুণ্যের লেশমাত্রও নাই, বরং পতিত হইয়া পাপগ্রস্ত হইতে হয়। এইরূপ প্রথা যে অতিপ্রাচীন কালহইতেই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে সংশয় নাই। আবার কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, রোমীয় প্রাচীন মহাকবি বার্জ্জিলের ‘ইনেয়স’ নামক মহাকাব্যে ভারতবর্ষীয়েরা ট্রয় প্রভৃতি দেশীয় ভুপতিদিগের নিকট সৈন্যসংক্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল, * ইহাতে কি বোধ করা যাইতে পারে? এস্থলে বিবেচনা করিতে হইবে, যে সময়ে শাস্ত্রানুসারে ভারতবর্ষীয়দিগের অনার্য্য দেশে গমন করা নিষিদ্ধ হইয়াছে, তৎকালে যাহারা অনার্য্য দেশে যাইত, তাহারা নিশ্চয়ই পতিত বা ভারতবর্ষের অন্তর্গত পর্ব্বতনিবাসী পুলিন্দ,কিরাত প্রভৃতি ম্লেচ্ছজাতি হইবে। তাহারা ভারতবর্ষের লোক বলিয়া বার্জ্জিল তাহাদিগকে ভারতবর্ষীয় বলিতে পারেন, তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই, কিন্তু তাহারা অপতিত ব্রাহ্মণ প্রভৃতি প্রাগুক্ত জাতিচতুষ্টয়ের অন্তর্ভুক্ত নহে। এই প্রকার যে কোন বিষয়েই হউক না কেন, প্রাচীন ভারতবর্ষবাসী আর্য্যগণ শাস্ত্রসম্মত হইয়া কখনই ভারতবর্ষ ব্যতীত অনার্য্য দেশে গমন করিতেন না; সুতরাং কি স্থলপথে, কি জলপথে তাঁহাদিগের অনার্য্য দেশে বাণিজ্য করিতে যাইবার প্রমাণ প্রদর্শন করা এক প্রকার বিড়ম্বনামাত্র।

যাহা হউক, আমরা যতদুর জানিতে পারিয়াছি, তদ্দারা ইহাই মীমাংসিত হইতেছে যে,পুরাতন ভারতীয় আর্য্যগণ বহির্বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন না; অতএব এবিষয়ে আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই। এক্ষণে প্রাচীন ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বিষয় কথঞ্চিৎ আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

প্রাচীন আর্য্যগণ এতাদৃশ স্বদেশপ্রিয় ছিলেন যে,জন্মভুমিকে স্বর্গাপেক্ষাও গরীয়সী জ্ঞান করিতেন। বাস্তবিক, জন্মভুমি

* ড্রাইডেনকৃত বার্জ্জিলের অনুবাদ; ১৪২ পৃষ্ঠা। টি ডাবিসন হোয়াইট ফ্রায়ার কর্তৃক ১৮২৪ সনে মুদ্রিত।

যে কিরূপ আদর ও মায়ার সামগ্রী, তাহা বলিয়া শেষ করা দুঃসাধ্য। জন্মভূমির ক্রোড়শূন্য হইয়া জীবন যাপন করা এক প্রকার মৃত্যু বলিলেও অসঙ্গত হয় না। ইহার তাৎপর্য্য প্রবাসীমাত্রই অবগত আছেন। যদিও অবস্থা এবং কার্য্যোপলক্ষে অনেককে প্রবাসী হইয়া বাঞ্ছিত দ্রব্যের আহরণ করিতে হয়, তথাপি স্বদেশে থাকিয়া আবশ্যকীয় দ্রব্যের সম্পূর্ণ লাভাংশে কষ্ট সহ্য করিয়াও মনের যেমন একপ্রকার অতুল ও অভূতপূর্ব্ব আনন্দ লাভ হইয়া থাকে, বিদেশে তাহা কখনই সম্ভবিতে পারে না। বিধাতা যে কি এক স্বর্গীয় পদার্থে জন্মভূমির সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেই পদার্থ যে কীদৃশ মূল্যবান্ তাহা তিনিই জানেন। জন্মভূমির সহিত মানবহৃদয়ের নিরতিশয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ইহার জন্য প্রাণ দিতেও কিছুমাত্র কষ্টানুভব হয় না। এই নিমিত্তই প্রাচীন আর্য্যগণ জন্মভূমির এতদূর পক্ষপাতী ছিলেন। বর্ত্তমান সময়েও সেই আর্য্যদিগের উত্তর বংশীয়েরা তাঁহাদেরই অনুসরণ করিতেছেন। ভবিষ্যতেও তাহাই অবিচলিত থাকিবার সম্ভাবনা। পৃথিবীতে এমন কোন স্থানই নাই, যেখানকার মানবজাতি জন্মভূমির জন্য কাতর না হইয়া দূরদেশে নিশ্চিন্তমনে অবস্থান করিতে পারে। সকল ভাষার কাব্যগ্রন্থ খুলিয়া দেখ, কবিগণ জন্মভূমির কতদূর মহিমা ও স্নেহ কীর্ত্তন করিয়াছেন। হিন্দুদের প্রাচীন গ্রন্থসমূহ উন্মোচন কর, জন্মভূমির স্নেহময়ী মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখিতে পাইবে। প্রাচীন হিন্দুজাতি গর্ভধারিণী মাতাকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন, তাঁহারই সহিত জন্মভূমিকে সমাবস্থ করিয়া অকপটচিত্তে " জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী " বলিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, জননীর তুলনা জন্মভূমি এবং জন্মভূমির তুলনা জননী ; সুতরাং তদিতর যাহা কিছু সকলই নিম্নগণ্য।

এক্ষণে কেহ কেহ এইরূপ আপত্তি করিতে পারেন যে, যদি প্রাচীন আর্য্যগণ জন্মভূমির এতদূর পক্ষপাতী ও অনুরাগী ছিলেন, তবে কি জন্য আবার " বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী স্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি। তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াংনৈব নৈবচ॥ " এই কথা বলিতেন। অর্থাগমের সকল প্রকার উপায় অপেক্ষা বাণিজ্যেই প্রকৃষ্টরূপ ধনোপার্জ্জন হইয়া থাকে। এদিকে আবার বাণিজ্যাবলম্বন করিতে গেলে দূর দেশে যাইতে হয় ; নচেৎ স্বদেশে থাকিয়া এমন কি ব্যবসায় আছে যে, তদ্দ্বারা আশানুরূপ অর্থ লাভ হইতে পারে ? যাঁহারা এবংবিধ আপত্তি তুলিয়া প্রাচীন আর্য্যদিগকে জন্মভূমির প্রতি ভক্তি ও দৃঢ়তাশূন্য করিতে চেষ্টা করেন, তাহা তাঁহাদের অভ্রান্ত বিচার বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। কেন না বাণিজ্য দুই প্রকার—বহির্বাণিজ্য এবং অন্তর্বাণিজ্য। সুতরাং স্বদেশে থাকিয়া অন্তর্বাণিজ্য অবলম্বন করিলেই " জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এবং "বা-

নিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ” এই উভয় মহামূল্য কবিতাংশেরই সার্থকতা সম্পাদিত হইতে পারে। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা শেষো-ক্তটির অনুগামী হইয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রাচীন ভারতের প্রতি প্র-কৃতিদেবী এতদূর সুপ্রসন্না ছিলেন যে, ত-দানীন্তন হিন্দুদিগকে সাগর উল্লঙ্ঘন ক-রিয়া বাণিজ্যের জন্য কোন দূর দেশেই যাইতে হইত না।

আমরা কেবল জন্মগ্রহণের স্থানকেই জন্মভূমি বলিব না। ভৌগোলিক মতের অনুসরণ করিয়া সীমাবদ্ধ এক একটি দে-শকে এক একটি জাতির জন্মভূমি বলিব এবং ইহাই সাধারণ মত। যেমন লণ্ডন নগরে যে ব্যক্তি জন্মপরিগ্রহ করে,তাহার জন্মভূমি শুদ্ধ লণ্ডন নহে, সমুদয় ইংলণ্ড। সেইরূপ কলিকাতা, কাশী, বোম্বাই, লা-হোর বা মান্দ্রাজ প্রভৃতি ভারতবর্ষের অ-ন্তর্গত যে কোন স্থানে যাহারই জন্ম হউক না কেন,ভৌগোলিক নিয়মে সমুদয় ভারত-ভূমি তাহার জন্মভূমি। তবে বিশেষ এই যে, জন্মাইবার স্থান মুখ্য জন্মভূমি ও সমু-দয় ভারতবর্ষ গৌণ জন্মভূমি। অতএব প্রাচীন ভারতীয়েরা স্বদেশে থাকিয়া উ-ল্লিখিত কবিতার্দ্ধদ্বয়ের অর্থ পালনে যে স-ফলমনোরথ হইয়াছিলেন, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ করা যাইতে পারে না।

ভারতবর্ষের নানা স্থানে নানা প্রকার উদ্ভিজ্জ,ধাতুজ,প্রাণিজ ও শিল্পজ বস্তু উৎ-পন্ন হইয়া থাকে। পৃথিবীতে এমন কোন দেশই নাই, যাহাকে ভারতবর্ষের সহিত এবিষয়ে সমকক্ষ বলিয়া প্রতিপন্ন করা যা-ইতে পারে। সুতরাং ভারতভূমির যাহা কিছু আবশ্যকীয়, তাহা এই ভারতেই জন্মিত, কিন্তু ভিন্ন দেশীয়েরা বিশেষ বি-শেষ প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব দূরীকর-ণার্থে ভারতে আগমন করিত। প্রাচীন ভারতের সহিত তদানীন্তন পরদেশীয়েরা স্বয়ংই বাণিজ্যসূত্রে বদ্ধ হইয়াছিল। তা-হারা যে সকল দ্রব্য আনয়ন করিত, প্রাচীন ভারতবাসীরা তত্তাবতের বিনিময়ে স্বদেশ-জাত বস্তু প্রদান করিতেন। অতএব বি-বেচনা করিয়া দেখিলে, প্রাচীন ভারতব-র্ষের বাণিজ্যকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ব্য-তীত আর কি বলা যাইতে পারে? এইরূপ বাণিজ্যকে পরদেশ-সংশ্লিষ্ট অন্তর্বাণিজ্য বলে। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন ভারতবর্ষের আর একপ্রকার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ছিল, তাহাকে স্বদেশ-সংশ্লিষ্ট অন্তর্বাণিজ্য ব-লিয়া অভিহিত করা যায়। উহা নিম্নলি-খিতরূপে সম্পাদিত হইত; ভারতের এক সীমার দ্রব্য অপর সীমায় নীত হইয়া আ-বার সেই সীমার আবশ্যকীয় দ্রব্য পূর্ব্ব সীমায় আনীত হইত। পুনশ্চ কেবল বি-নিময়ে আদান প্রদান না হইয়া প্রয়োজন মতে মুল্য দ্বারাও ক্রয় বিক্রয়ের প্রথা ছিল।

বিদেশীয়েরা ভারতবর্ষীয়দের সহিত যেরূপ বাণিজ্যোপযোগী দ্রব্যের বিনিময় করিত, সেইরূপ মুল্য দিয়াও ভারতবর্ষজাত বিবিধ বস্তু ক্রয় করিত। পুরাতত্ত্ববিৎ উই-

লিয়ম রবার্টসন্ সাহেব বলেন যে, বহু প্রাচীন কালাবধি ভিন্ন দেশীয়েরা স্বর্ণ রৌপ্য নির্ম্মিত মুদ্রাদ্বারা ভারতবর্ষজাত বিবিধ দ্রব্য ক্রয় করিত। ভারতবর্ষ প্রায় পৃথিবীর সকল দেশের নিকট মূল্য লইয়া ভূরি ভূরি দ্রব্য প্রদান করিয়াছে এবং এখনও করিয়া আসিতেছে; ইহার প্রতি প্রকৃতিদেবীর এতদূর দয়া যে, ইহা ভবিষ্যতেও এইরূপ করিতে থাকিবে। * উক্ত সাহেবের সহিত আমাদেরও মতভেদ হয় না। ভারতবর্ষে প্রাচীন কালে স্বর্ণ রৌপ্য যে পরিমাণে ছিল, তাহাতে বোধ হয় যে, বিদেশীয়েরাই উহা মূল্যস্বরূপ প্রদান করিত এবং তদ্ব্যতীত ভারতবর্ষীয়েরা বিদেশীয়দের নিকট হইতে দ্রব্যের বিনিময়ে অনঙ্কিত (মুদ্রা নহে) স্বর্ণ রৌপ্যাদিও প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করিতেন। যদিও ভারতবর্ষ অন্যান্য ধাতু বহুল পরিমাণে জন্মাইয়া থাকে, তথাপি স্বর্ণ রজতাদির ভাগ তাদৃশ দেখা যায় না। † কিন্তু এদিকে আবার ভারতবর্ষের আপাদ মস্তক স্বর্ণ রৌপ্যে মণ্ডিত। তবে ইহা কোথা হইতে আসিতে পারে? উত্তর, পরদেশ-সংশ্লিষ্ট অন্তর্বাণিজ্য। কতবার কত কত বিদেশীয় রাজারা আসিয়া ভারতবর্ষের বিপুল ঐশ্বর্য্য হরণ করিয়াছে, তথাপি ইহা অসীম রত্নের আকর। গিজ্নির মামুদ প্রভৃতির অত্যাচার ইতিহাসপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। ঐ সকল অসুরেরা সাধ্যাতীত ভারতরত্ন লুণ্ঠন করিয়াছে, তথাপি ভারতভূমি বিশিষ্টরূপ ধনশালিনী। এতাদৃশ ধনবত্তার কারণ উল্লিখিত বাণিজ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। বিখ্যাত পুরাবেত্তা প্লিনি তাৎকালিক ভারত ভূমিকে যেরূপ অপর্য্যাপ্ত অর্থশালী বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পরবর্ত্তী পুরাবিদেরাও তাহাই স্বীকার করিয়াছেন। এবং এক্ষণও তাহাই দেখা যাইতেছে। অতএব এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, বহু প্রাচীন কাল হইতে বিদেশীয়েরা স্ব স্ব দেশের স্বর্ণ রৌপ্যাদি মূল্যস্বরূপ দিয়াও ভারতবর্ষের স্বভাবজাত দ্রব্যাদি গ্রহণ করিত। কিন্তু ভারতীয়েরা স্বদেশে থাকিয়াই উহা গ্রহণ করিতেন, কদাপি বিদেশে যাইতেন না।

প্রাচীন হিন্দুদিগের পোতনির্ম্মাণপ্রণালী যে প্রকার ছিল, তাহাতেও স্পষ্ট বোধ হয় যে, তাঁহারা সমুদ্রগর্ভে বিচরণ করিয়া দেশদেশান্তরে বাণিজ্য করিতে যাইতেন না। সমুদ্রে যাইতে হইলে অবশ্য সুদীর্ঘ ও তরঙ্গাভিঘাতসহনীয় জলযানের প্রয়োজন; কিন্তু তাৎকালিক হিন্দুজাতির তাদৃশ তরণী ছিল না। অধুনা ভারতবর্ষে যে সকল নৌকা দৃষ্ট হয়, প্রাচীনকালেও সেইরূপ থাকিবার অধিক সম্ভাবনা। তবে গঠনপ্রণালীর কিছু ইতর বিশেষ ছিল। যদি তৎকালে অর্ণব বিচ-

* রবার্টসনকৃত প্রাচীন ভারতের ইতিহাস। পরিশিষ্ট ২০৩ পৃষ্ঠা।

† খাজে আবদুল গণিমিঞা নামক কাশ্মীর দেশীয় একজন প্রধান ব্যক্তির জীবনচরিত। ৪২ পৃষ্ঠা।

রণোপযোগী বৃহৎ বৃহৎ জলযান থাকিত, তাহা হইলে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণও পাওয়া যাইত। কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, সমুদ্রতীরবর্ত্তী উড়িষ্যা, সরকার প্রভৃতি প্রদেশ হইতে আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে কলিকাতায় যে সকল স্লুপ আইসে, তাহা সাধারণ নৌকা অপেক্ষা অনেক বড় এবং সমুদ্রগমনোপযোগী। যাঁহারা এই আপত্তি তুলিয়া প্রাচীন ভারতীয়দের সমুদ্রগমনোপযোগী বৃহৎ বৃহৎ নৌকার স্থায়িত্ব দেখাইতে যত্নবান্, আমরা তাঁহাদিগের বাক্যে আস্থা প্রদর্শন করিতে পারি না। কেন না, স্লুপনিচয় যদিও নৌকা অপেক্ষা অনেকাংশে বৃহৎ বটে, তথাপি তাহাদিগের আকার প্রকার, যিনি একবার নিবিষ্টচিত্তে অনুধাবন করিয়া দেখিয়াছেন, তিনি কখনই সে সকলকে দূরসমুদ্রগামী বলিবেন না। ঐ সকল জলযানযোগে যে সমস্ত বাণিজ্য দ্রব্য নীত এবং আনীত হয়, তাহা কেবল ভারতবর্ষেরই উপকূলে; সুতরাং ভারতবাসীরা ভারতবর্ষেই থাকেন এবং ভারতের বাণিজ্য ভারতেই সংসাধিত হয়। আমরা পুর্ব্বেই বলিয়াছি, এবংবিধ বাণিজ্যকে অন্তর্বাণিজ্য কহে। অতএব নৌকার প্রমাণ লইয়া ভারতীয় বহির্বাণিজ্যসম্বন্ধে স্থিরসিদ্ধান্ত করিবার আয়াস বিড়ম্বনামাত্র।

প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে এক্ষণে আর কিছু না বলিয়া নিরস্ত হইতেছি। উপসংহারকালে আমাদিগের এইমাত্র বক্তব্য যে, প্রাচীন কালে ভারতবর্ষীয় হিন্দুগণ বহির্বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন না, ইহা শাস্ত্র সম্মত। এবং অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে যে নিরত ছিলেন, ইহাও শাস্ত্রের প্রমাণ। প্রাচীন পাশ্চত্য হিরোদতস, এরিয়ান, প্লিনি, ডিওডোরস, সিকিউলস্ প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও প্রাচীন হিন্দুদিগের অন্তর্বাণিজ্য ব্যতিরেকে বহির্বাণিজ্যের কোন প্রমাণ দেখা যায় না। যাহা হউক, এক্ষণে আমাদিগের ভারতবর্ষের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়া উঠিয়াছে, প্রাচীন কালের স্বাধীন ভারতের সেরূপ শোচনীয় অবস্থা ছিল না। সুতরাং সেই এক দিন আর এই এক দিন! এক্ষণে আমাদিগের জাত্যভিমান, পাতিত্যদোষ প্রভৃতিকে সমুদ্রগর্ভে বিসর্জ্জন দিয়া, সেই সমুদ্রগর্ভে হিন্দু বাণিজ্য-পোত ভাসমান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে প্রবল পরাক্রান্ত জাতি একমাত্র বহির্বাণিজ্যসূত্রেই সোণার ভারত করতলগত করিয়াছেন, সেই পরম হিতকর বহির্বাণিজ্যের কায়মনোবাক্যে অনুসরণ করা আধুনিক ভারতবর্ষবাসী প্রত্যেক হিন্দুরই কর্ত্তব্য। এবং তৎসঙ্গে মন্দীভূত অন্তর্বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করাও নিতান্ত উচিত। ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তবাসী পার্সিজাতি যে কেবল এই একমাত্র বহির্বাণিজ্যের প্রভাবেই উন্নত হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তবে অধুনাতন হিন্দুমাত্রেরই কি তাহাদিগের ব্রতে

ব্রতী হওয়া উচিত নহে? অধুনা প্রাচীন ভারতীয়দিগের স্বাধীন অবস্থার সহিত আমাদিগের অবস্থা তুলনাই হইতে পারে না। সুতরাং এখন আর বহির্বাণিজ্যে লিপ্ত হওয়া শাস্ত্র সম্মত নহে বলিয়া অদূরদর্শিতা দেখান আমাদিগের বিবেচনায় নিতান্ত অযৌক্তিক। আমাদিগের অধুনাতন অবস্থানুরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্ম এই, যে হিন্দু জাহাজে চড়িয়া বিদেশবাণিজ্য করিতে গেলে পতিত হইবার আশঙ্কা করে, সেই পতিত ও জন্মভূমির পরম শত্রু। অতএব হে বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী, মধ্যবিত্ত অথবা দরিদ্র হিন্দুসন্তানগণ! আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বর্ত্তমান অবস্থানুরূপ ধর্ম্ম শাস্ত্রের আদেশে বহির্বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হই। তাহা হইলে আমাদিগের দগ্ধভাগ্যের কণামাত্রও কি প্রশমিত হইবে না?

শ্রীরাজ-

অশিক্ষিত ইন্দ্রিয়ের ভ্রম ও প্রমাদ।

বাহ্য জগতের সমুদয় বিষয়ই ইন্দ্রিয়জ্ঞেয়। কিন্তু বাহ্যজ্ঞানলাভার্থ বাহ্য বস্তু এবং ইন্দ্রিয়চয় থাকিলেই যথেষ্ট হয় না, আত্মজ্ঞানেরও আবশ্যক। শকুন্তলা করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া দুষ্মন্তচিন্তায় গাঢ় নিমগ্না ছিলেন, কোপন স্বভাব দুর্ব্বাসা তাঁহাকে বারংবার ডাকিলেন, তিনি শুনিতে পাইলেন না। এস্থলে দুর্ব্বাসার তারস্বর এবং শকুন্তলার শ্রবণেন্দ্রিয় উভয়ই বিদ্যমান ছিল, কিন্তু শকুন্তলা এক চিন্তায় এত নিমগ্না যে অন্য সমস্ত বিষয়ে তিনি আত্মজ্ঞানপরিহীনা হইয়াছিলেন, এবং এই আত্মজ্ঞানশূন্য হওয়াতেই তিনি শুনিতে পাইলেন না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বহির্জগতের জ্ঞান উপলব্ধি জন্য তিনটি বিষয়ের আবশ্যক; প্রথমতঃ বাহ্যকারণ, দ্বিতীয়তঃ পূর্ণবিকসিত ইন্দ্রিয় এবং তৃতীয়তঃ আত্মজ্ঞান। ইহার একতমের অভাব হইলেই আমরা বাহ্যজ্ঞান লাভে অশক্ত হই। উল্লিখিত উদাহরণে তৃতীয় কারণের অভাব ছিল; তাহা না হইয়া যদি প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় কারণের অভাব হইত অর্থাৎ যদি দুর্ব্বাসা না ডাকিতেন কিম্বা শকুন্তলা বধির হইতেন তাহা হইলেও শকুন্তলার শব্দজ্ঞান হইত না। কারণাভাবে যেরূপ জ্ঞানাভাব, কারণভ্রমেও তদ্রূপ জ্ঞানবিভ্রম হইয়া থাকে।

ইন্দ্রিয়ের অগোচর পদার্থের সত্ত্বা যে সহসা দৃষ্টকার্য্যের কারণ বলিয়া মানিয়া লয়, সে যেরূপ কুসংস্কারী বলিয়া আখ্যাত হয়, ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থে যে সহসা বিশ্বাস করিতে চাহে না, সেও তদ্রূপ অবিশ্বাসী অভিধা প্রাপ্ত হয়। অবিশ্বাসী নামে ঘৃণার কটাক্ষ থাকিলেও ইহা

অক্ষুব্ধহৃদয়ে বলা যাইতে পারে যে, অবিশ্বাসীরা জগতের মহোপকারী। তাহাদের অবিশ্বাসেই বাহ্যজগতের অনেকগুলি সত্য প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এই প্রবন্ধে কতকগুলি ইন্দ্রিয়লব্ধ বাহ্যজ্ঞানের ভ্রান্তি দেখাইব এবং তত্তৎ কারণ নির্দ্দেশ করিতেও সচেষ্ট হইব। পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, বিনা পরীক্ষায় অনেক সময়ে যাহা তিনি ইন্দ্রিয়লব্ধ নিশ্চিত জ্ঞান মনে করিতেন তাহা কিরূপ ভ্রমসঙ্কুল, এবং অশিক্ষিত ইন্দ্রিয় কত সহজে ভ্রমপ্রমাদে পতিত হয়।

ইন্দ্রিয়মধ্যে দর্শনেন্দ্রিয়ই সর্ব্বপ্রধান এবং চাক্ষুষজ্ঞানের উপর সকলেরই অত্যন্ত বিশ্বাস। কিন্তু পদার্থের কি কি গুণ দর্শনেন্দ্রিয়লব্ধ তদ্বিষয়ে পণ্ডিতদিগের ঘোর মতদ্বৈধ রহিয়াছে। এক পক্ষ কহেন পদার্থের কেবল বর্ণ এবং প্রভাই দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। অপরেরা তদতিরিক্ত আকার ও পরিমাণ, এবং আকার ও পরিমাণের সঙ্গে সঙ্গে দূরতাও চক্ষুর্গোচর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। উভয় পক্ষই কৃতী এবং বলী, এবং উভয় পক্ষেই প্রথিতযশা বহুসংখ্যক দার্শনিকের নাম দৃষ্ট হয়। ইঁহাদিগের কূটতর্কজাল বিলোড়ন করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। সংক্ষেপতঃ ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রাথমিক * চক্ষুঃ কেবল বর্ণ এবং প্রভা জানিতে পারিলেও অভিজ্ঞ চক্ষুঃ তদতিরিক্ত পরিমাণ, আকার এবং দূরতাও বুঝিতে পারে! কিন্তু এই পঞ্চগুণ মধ্যে এমন একটিও নাই যে,তৎসম্বন্ধে অশিক্ষিত চক্ষুঃ মধ্যে মধ্যে ভ্রমে পতিত না হয়। উদাহরণ ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে।

প্রথমতঃ বর্ণসম্বন্ধে দৃষ্টিবিভ্রমের উদাহরণ। যদি একখানি তাসের এক পৃষ্ঠা গাঢ় উজ্জ্বল লোহিত এবং অপর পৃষ্ঠা গাঢ় উজ্জ্বল হরিত বর্ণে চিত্রিত করিয়া নাসিকার উপর এরূপভাবে ধারণ করা যায় যে, এক চক্ষুঃ লোহিত পৃষ্ঠা এবং অন্যতর চক্ষুঃ হরিত পৃষ্ঠা দেখিতে পায় এবং কিয়ৎকাল এইভাবে রাখিয়া যদি সহসা উক্ত তাসের পরিবর্ত্তে উভয় পৃষ্ঠাই শ্বেত এরূপ আর একখানি তাস ধারণ করা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বে যে দিকে লোহিত ছিল শ্বেত তাসের সেইদিক হরিত এবং পূর্ব্বে যেদিকে হরিত ছিল শ্বেত তাসের সেই দিক লোহিতবর্ণ দৃষ্ট হইবে। বজ্রের ঘোরঘর্ঘরনিনাদ কিয়ৎকাল শ্রবণ করিলে যেরূপ তৎপর মুহূর্ত্তে ঘটিকাযন্ত্রের টিক্ টিক্ শব্দ কর্ণে অনুভূত হয় না, গাঢ় লোহিত কিয়-

* এক ব্যক্তি আজন্ম নেত্রমন্থ (ছানি) রোগগ্রস্থ ছিল। সে বয়স্ক হইলে ডাক্তর চিছলডন তাহাকে আরোগ্য করেন। প্রথমে সে পদার্থের বর্ণ ও প্রভা ব্যতীত কিছুই বুঝিতে পারিত না; সমুদয় পদার্থই তাহার চক্ষে আসিয়া লাগিতেছে এইরূপ মনে করিত এবং স্পর্শ না করিয়া কোন পদার্থের আকার কিম্বা পরিমাণ বুঝিতে সক্ষম হইত না।

ৎকাল দেখিলে চক্ষুঃ শ্বেত আলোকের লোহিতভাগ * সেইরূপ অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। শ্বেত আলোকের লোহিত ভাগ অনুভূত না হইলে অবশিষ্ট ষষ্ঠ বর্ণের সমবায় হরিত দৃষ্ট হয়। আবার অপর পৃষ্ঠায় পূর্ব্বে গাঢ় উজ্জ্বল হরিত ছিল,তজ্জন্য শ্বেত আলোকের হরিত ভাগ অন্যতর চক্ষে অনুভূত হয় না, অবশিষ্ট ষষ্ঠ বর্ণের সমবায় লোহিত দৃষ্ট হয়।

রক্তসন্ধ্যাকালে দুইখানি লোহিত মেঘের মধ্যস্থান হরিদ্বর্ণ দেখায়। বাস্তবিক উহা নীল আকাশমাত্র। উভয় পার্শ্বে লোহিত মেঘ থাকাতে হরিদাভ অনুভূত হয়। বালসূর্য্য কিয়ৎক্ষণ স্থিরনয়নে নিরীক্ষণ করিয়া যদি নয়ন মুদ্রিত করা যায়, তাহা হইলে কএক মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত একটি নীলসূর্য্য অনুভূত হইয়া থাকে। লাল কালি দ্বারা কএক পৃষ্ঠা লিখিয়া যদি কাল কালি দ্বারা লিখিতে আরম্ভ করা যায়, তাহা হইলে উহা ঈষৎ নীলবর্ণ দেখায়। লাল যবনিকার ছায়া শ্বেত প্রাচীরে পতিত হইলে উহা রক্তিমাভ দৃষ্ট হয়,কারণ যবনিকা সম্পূর্ণ অস্বচ্ছ নহে, আলোক কিয়ৎ পরিমাণে উহার মধ্য দিয়া যাইতে পারে। যদি যবনিকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে তাহা হইলে ছায়ায় ঐ স্থান গুলি ঈষৎ নীল বোধ হইবে। উদাহরণ আরও অনেক সংগৃহীত করা যায়, কিন্তু যে কএকটি উদাহরণ দেওয়া হইল তাহাতেই পাঠক বর্ণ সম্বন্ধে দৃষ্টিবিভ্রম সম্যক বুঝিতে পারিবেন।

দ্বিতীয়তঃ প্রভা সম্বন্ধে দৃষ্টি বিভ্রমের উদাহরণ। রাত্রিকালে যদি সহসা প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, তাহা হইলে বোধ হয় গৃহ ঘোর তমসাচ্ছন্ন। গবাক্ষ এবং কবাট দ্বারা যে আলোক গৃহে প্রবিষ্ট হয় তাহাতে গৃহস্থিত কোন বস্তুই দৃষ্ট হয় না; কিন্তু কিয়ৎপরে পার্শ্বস্থ পদার্থ সমূহ ক্রমে ক্রমে দৃষ্ট হইতে থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, চক্ষুর এক অবস্থায় যে স্থান ঘোর তমসাবৃত ব-

* শ্বেত আলোক সপ্তবর্ণের সমবায়ে উৎপন্ন; যথা—লোহিত, নারঙ্গ (পাটল), পীত, হরিত, নীল, বেগুণী এবং বায়লেট। জলকণায় সূর্য্যের শ্বেত আলোক বিশ্লিষ্ট হইয়া রামধনু উৎপন্ন হয় এবং উহাতে এই সপ্তবর্ণই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে লোহিত, হরিত এবং বায়লেট এই তিনটি মূলবর্ণ। পূর্ব্বে লোহিত, নীল, ও পীত এই তিনটি মূলবর্ণরূপে গৃহীত হইত, কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক উন্নতি সহকারে এই মত ভ্রান্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে। নারঙ্গ, পীত, নীল এবং বেগুণী মূল বর্ণ নহে; উহারা মিশ্রবর্ণ। নারঙ্গ বর্ণ গাঢ় লোহিত এবং ঈষৎ হরিতযোগে; পীতবর্ণ গাঢ় লোহিত এবং গাঢ় হরিতযোগে; নীলবর্ণ, গাঢ় হরিত এবং গাঢ় বায়েলেটযোগে; এবং বেগুণীবর্ণ ঈষৎ হরিত এবং গাঢ় বায়লেটযোগে উৎপন্ন হয়।

লিয়া অনুমিত হয় এবং যৎস্থানীয় পদার্থ সমূহ দৃষ্টি গোচর হয় না, চক্ষুর অবস্থান্তরে তৎস্থানীয় পদার্থ সমূহ দৃষ্ট হয় এবং গৃহও তত অন্ধকার বোধ হয় না। ইহাকেই, আমরা প্রভা সম্বন্ধে দৃষ্টি বিভ্রম বলিতেছি। এইক্ষণে ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিব। চক্ষুর যে ভাগকে তারা কিম্বা কনীনিকা কহে; তন্মধ্য দিয়াই আলোক প্রবিষ্ট হইয়া দৃষ্টি কার্য্য সম্পাদন করে। উহা তারকামণ্ডল, কিম্বা কনীনিকাপরিধি দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই তারকা মণ্ডল ক-একটি পেশীর সহিত সংলগ্ন এবং তাহাদিগের সাহায্যে উহা আকুঞ্চিত কিম্বা বিস্ফারিত করিয়া আলোক প্রবেশ দ্বার ক্ষুদ্র কিম্বা বৃহৎ করা যায়। যখন গৃহে প্রদীপ থাকে তখন তারকা মণ্ডল এরূপ কুঞ্চিত হয়, যে দর্শনোপযোগী আলোক মাত্র চক্ষুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে। প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইলে কবাট-গবাক্ষাগত ক্ষীণ আলোক মাত্র থাকে; কুঞ্চিত-দ্বার-প্রবিষ্ট সেই ক্ষীণ আলোক দৃষ্টি কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হয় না। এই-জন্য তারকা মণ্ডল বিস্ফারিত করিয়া আ-লোক প্রবেশ দ্বার বৃহত্তর করিতে হয়। বিস্ফারিত করিতে যে কতিপয় মুহূর্ত্ত অতিবাহিত হয়। সেই অত্যল্পকাল গৃহ ঘোর তমসাচ্ছন্ন বোধ হয় এবং বিস্ফারিত হইলে ক্রমে দৃষ্টিজ্ঞান জন্মিতে থাকে। এইক্ষণে পুনরায় যদি গৃহে প্রদীপ আনয়ন করা যায়, তাহা হইলে বিস্ফারিত-দ্বার-প্রবিষ্ট আলোক চক্ষুর অসহ্য হয় এবং চক্ষুঃ স্বতঃই মুদিত হইয়া আলোক-প্রবেশ-দ্বার কুঞ্চিত হইলে পুনরায় উন্মীলিত হয়। সূর্য্যের প্রখর আলোক হইতে অল্পালোক গৃহে প্রবেশ করিলে কিম্বা অল্পালোক-গৃহ হইতে সূর্য্যের প্রখর আলোকে বহির্গত হইলেও এইরূপ প্রভা সম্বন্ধে দৃষ্টি বিভ্রম জন্মিয়া থাকে।

তৃতীয়তঃ। পরিমাণ বিষয়ক দৃষ্টিবিভ্রমের উদাহরণ *। মধ্যাহ্নের সূর্য্য অপেক্ষা প্রভাতের এবং সায়ং কালের সূর্য্য বৃহত্তর বোধ হয়, এবং পৌর্ণমাসী নিশিতে উদয়শীল এবং অস্তোন্মুখ চন্দ্রও মধ্যগগণের চন্দ্র হইতে বৃহত্তর অনুভূত হইয়া থাকে। কিন্তু মানযন্ত্র দ্বারা মাপিলে সকল সময়েই সূর্য্যের কিম্বা চন্দ্রের একই ব্যাস দৃষ্ট হয়। এখানে চক্ষুঃ চক্ষুর বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বিনা যন্ত্রে চক্ষুঃ যাহাকে বৃহত্তর বলিতেছিল, যন্ত্র সাহায্যে সেই চক্ষুঃই তাহাকে সমান বলিয়া স্বীকার করিল। শুদ্ধ চক্ষুঃ অপেক্ষা মানযন্ত্র এবং চক্ষুঃ অধিকতর বিশ্বস্য সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রভাতে এবং সায়াহ্নে সূর্য্য এরূপ বৃহত্তর দেখায় কেন? এই প্রশ্নের উত্তর পাঠকবর্গের হৃদয় গ্রাহী হইবে কি না বলিতে পারি না। কিন্তু

* এই উদাহরণটী মানসিক বিভ্রম মধ্যে গণ্য হওয়া উচিত, কিন্তু সাধারণ নামকরণ অনুসারে আমরা ইহাকে দৃষ্টি-বিভ্রম বলিয়াই উল্লেখ করিলাম।

এযাবৎ পণ্ডিতেরা ইহার এক মাত্র উত্তরই দিয়া আসিতেছেন এবং তাহাই প্রকটিত হইতেছে। অন্যান্য পদার্থের সহিত তুলনা করিয়াই আমরা পদার্থের পরিমাণ নিরূপণ করিয়া থাকি। যদি দুইটী বৃক্ষ সমান উচ্চ বোধ হয় তাহা হইলে যেটী অপেক্ষাকৃত আমাদিগের নিকটস্থ তাহা হইতে যেটী অপেক্ষাকৃত দূরে অবস্থিত সেইটী যে উচ্চতর ইহা আমরা স্বতই নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে আমরা মনে মনে যে যুক্তি পরম্পরা অবলম্বন করিয়াছিলাম তাহা বুঝিতে পারি না। এক্ষণে সূর্য্য সম্বন্ধে এইরূপ তর্ক অবলম্বন করিলে দেখা যাইবে যে উদয়শীল কিম্বা অস্তমুখ সূর্য্য অবলোকন করিবার সময়ে সূর্য্য এবং চক্ষুর মধ্যে নানা পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে; তাহাদিগের সহিত তুলনা করিয়া আমরা সূর্য্যের পরিমাণ অনুভব করি, কিন্তু মধ্যাহ্নে সূর্য্য এবং চক্ষুর মধ্যে কোন পদার্থই দৃষ্ট হয় না। তুলনা করিবার পদার্থের এই অভাবেই মধ্যাহ্নতপন ক্ষুদ্রতর অনুভূত হয়। যাঁহারা দার্শনিকদিগের সূক্ষ্ম তর্কে অনভ্যস্ত তাঁহাদিগের এই ব্যাখ্যাটি হৃদয়গ্রাহী হইবে না; কিন্তু তাঁহারা মনে রাখিবেন যে প্রাতঃ সূর্য্যমধ্যাহ্নসূর্য্য অপেক্ষা বৃহত্তর না হইয়াও বৃহত্তর দেখায় এবং পণ্ডিতেরাও তাহার এই একমাত্র ব্যাখ্যাই দিয়া আসিতেছেন।

চক্ষুঃ দ্বারা সংখ্যাজ্ঞানও জন্মে। সংখ্যাজ্ঞান ও পরিমাণজ্ঞান উভয়ই একবিধ, অতএব পরিমাণ সম্বন্ধে দৃষ্টিবিভ্রম শেষ করিবার পূর্ব্বে আমরা সংখ্যাসম্বন্ধে দৃষ্টিবিভ্রমের একটি উদাহরণ প্রদান করিব। উদাহরণটি অতীব বিস্ময়কর। নির্ম্মল নৈশ নভোমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে বোধ হয় যেন অসংখ্য তারকা উদিত হইয়াছে। বাস্তবিক যে সমস্ত তারকা আমরা দেখিতে পাই তাহা অসংখ্যও নহে, অধিক সংখ্যকও নহে, তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প। অনিয়মে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকাতেই এরূপ অধিক সংখ্যক বলিয়া বোধ হয়। দুরবীক্ষণের সাহায্যে পর্য্যবেক্ষণ করিলে তারকাসমূহ যে যথার্থই অসংখ্য তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু শুদ্ধ চক্ষে যে তারাগুলি দৃষ্ট হয় তাহার সংখ্যা অনধিক পঞ্চ সহস্র। আমরা নভোমণ্ডলের অর্দ্ধাংশ মাত্র দেখিতে পাই বলিয়া সার্দ্ধ দ্বিসহস্রের অধিক নক্ষত্র কখনও দৃষ্ট হয় না; তথাপি বিশৃঙ্খল ভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকাতে অসংখ্য বলিয়া বোধ হয়। দুরবীক্ষণের সাহায্য বিনা যে সমস্ত তারা দৃষ্টিগোচর হয় তাহা পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদেরা গণনা করিয়াছেন। আকার এবং উজ্জ্বলতা ভেদে উহা ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত।

১ ম শ্রেণীর—২০
২ য় শ্রেণীর—৬৫
৩ য় শ্রেণীর—২০০
৪ র্থ শ্রেণীর—৪০০

৫ ম শ্রেণীর—১১০০

৬ ষ্ঠ শ্রেণীর—৩২০০

৪৯৮১

এই তালিকাতে দৃষ্ট হইবে যে সমস্ত নভোমণ্ডলে চক্ষুর বিষয়ীভূত পঞ্চ সহস্রের অধিক নক্ষত্র নাই; তাহারও অর্দ্ধেক অর্থাৎ সার্দ্ধ দ্বিসহস্র মাত্র একবারে দেখা যাইতে পারে।

চতুর্থতঃ, আকার সম্বন্ধে দৃষ্টি বিভ্রমের উদাহরণ। চক্ষুঃ $\frac{১}{৮}$ অণুপল ($\frac{১}{১০}$ সেকেণ্ড) পর্য্যন্ত দৃষ্ট পদার্থের সংস্কার রক্ষা করে অর্থাৎ পদার্থ অপসারিত হইলেও $\frac{১}{৪}$ অণুপল পর্য্যন্ত উহা অনুভূত হইতে থাকে। বহ্নিমুখ একটী শলাকা বেগে ঘূর্ণিত করিলে একটী বহ্নিচক্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা সকলেই দেখিয়াছেন এবং সকলেই জানেন যে চক্রের সমুদয় স্থানে বহ্নি নাই, বেগে ঘূর্ণিত হওয়াতে এরূপ দেখায়; মৃদু ঘূর্ণনে এরূপ দেখায় না। কত বেগে ঘূর্ণিত হইলে এরূপ দেখা যাইবে তাহা উপরোক্তসূত্রানুসারে সহজেই গণনা করা যাইতে পারে। অভিন্ন চক্র দৃষ্ট হইবার জন্য শলাকা প্রতি অণুপলে চারিবার (অর্থাৎ প্রতিসেকেণ্ডে দশবার) ঘূর্ণিত হওয়া আবশ্যক; বেগ অধিক হইলে হানি নাই, অল্প হইলে চক্র অভিন্ন হইবে না। এই সূত্রের উপর নির্ভর করিয়া নানাপ্রকার খেলনা প্রস্তুত হইয়াছে। উহার একটীর বৃত্তান্ত আমরা প্রকটিত করিতেছি। ইহাকে নর্ত্তকচিত্র (Waltzing figure) কহে। চক্রের প্রশস্ত পরিধিতে একটী মনুষ্য কিম্বা একটী বানর নানাভাবে চিত্রিত থাকে। চক্র বেগে ঘুরাইলে বোধহয় মনুষ্য কিম্বা বানরটী নাচিতেছে। এক ভাবের চিত্র নয়ন হইতে অপসারিত হইবার $\frac{১}{১০}$ সেকেণ্ডের মধ্যেই যদি তৎপরবর্ত্তী চিত্রটী নয়ন গোচর হয়, তাহা হইলে সর্ব্বদাই দৃষ্টিজ্ঞান হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চিত্রিত থাকাতে বোধ হয় যেন একটী চিত্রই আমরা দেখিতেছি এবং উহা নাচিতেছে।

প্রতিভগ্ন কিরণমালাও আকার সম্বন্ধে ভ্রম জন্মাইয়া থাকে। কিরণমালা (প্রায়শই) সরল রেখায় গমন করে। ইহা অতি সহজেই প্রমাণ করা যায়। একখান তাসে একটী ছিদ্র করিয়া যদি বাহ্য বস্তু এবং চক্ষুর মধ্যে ধারণ করা যায়, তাহা হইলে ছিদ্র, চক্ষুঃ এবং বাহ্যবস্তু এক সরল রেখায় না হইলে বাহ্যবস্তু দৃষ্ট হইবে না। অর্থাৎ বাহ্যবস্তু হইতে আগত কিরণমালা সরল রেখায় আসিতে থাকে এবং ছিদ্র যদি ঐ সরলরেখায় স্থাপিত হয় তাহা হইলেই কিরণমালা ছিদ্র মধ্য দিয়া আসিতে পারে এবং দৃষ্টিজ্ঞান জন্মে। তাসের ছিদ্র অন্য কোন ভাবে স্থাপিত হইলে কিরণমালার সরলগতি রুদ্ধ হয় এবং দৃষ্টি জ্ঞান হয় না। কিন্তু কিরণমালা যে সরল রেখায় গমন করে উহা কেবল এক-

বিধ পদার্থে। অর্থাৎ শুদ্ধ জলে কিম্বা শুদ্ধ কাচে, কিম্বা সমঘন বায়ুতে কিরণমালা সর্ব্বদাই সরল রেখায় গমন করে। পক্ষান্তরে একবিধ পদার্থ হইতে অন্য বিধ পদার্থে, কিম্বা লঘু বায়ু হইতে ঘন বায়ুতে যাইতে কিরণমালা বক্র হইয়া অন্য সরল রেখায় গমন করে। ইহাকেই প্রতিভগ্ন কিরণমালা কহে।

জলে প্রবিষ্ট হস্ত কিম্বা যষ্টি কিরূপ বিকৃত দৃষ্ট হয়, তাহা সকলেই জানেন। জল হইতে বায়ুতে আসিতে কিরণমালা নিম্ন দিকে প্রতিভগ্ন হয়, এই জন্য দৃষ্ট পদার্থের আকার বিকৃত বোধ হয় এবং স্বাভাবিক স্থান হইতে উচ্চতর স্থানে আছে বলিয়া অনুভূত হয়। শেষোক্ত বিষয়ের একটী সুন্দর এবং অতি সহজ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। একটী পাত্রে একটী মুদ্রা রাখিয়া এরূপ স্থানে বসিতে হয় যে আর মুদ্রাটী দেখা যায় না, একটু নিকটে আসিলেই দেখা যাইত। এরূপ স্থানে বসিয়া যদি পাত্রটী জলপূর্ণ করা যায় তাহা হইলে মুদ্রাটী দৃষ্টিগোচর হয় অর্থাৎ কিরণমালা জল হইতে বায়ুতে আসিতে প্রতিভগ্ন হইয়া নয়নে পতিত হয় এবং এই জন্য মুদ্রাটী স্বাভাবিক স্থান হইতে উচ্চতর স্থানে আছে বলিয়া অনুমিত হয়। অতিপ্রাতে এবং অতি সায়াহ্নে যে আমরা সূর্য দেখিতে পাই এবং তৎপ্রতি অক্ষুব্ধনয়নে দৃষ্টিপাত করিতে পারি তাহারও কারণ এই। তখন সূর্য্য বাস্তবিক অস্তগত থাকে; প্রতিভগ্ন কিরণমালায় গঠিত সূর্য্যের বিম্ব মাত্র আমরা দেখিতে পাই। বায়ু স্তরে স্তরে ঘনতর অর্থাৎ উপরিস্থিত বায়ু হইতে নিম্ন স্থানের বায়ু ঘনতর এবং নিম্নতর স্থানের বায়ু তদপেক্ষা ঘনতর। বায়ুর স্তরে স্তরে প্রতিভগ্ন হওয়াতে সূর্য্যের কিরণমালার গতি ক্রমশঃ নিম্নদিকে হইতে থাকে। এইজন্য ব্যোমযান সাহায্যে ঊর্দ্ধে না উঠিলে আমরা যে সূর্য্য দেখিতে পাইতাম না, ভূমিতে থাকিয়াই তাহা দেখিতে পাই এবং অল্পসংখ্যক কিরণমালা প্রতিভগ্ন হইয়া নয়নে পতিত হয় বলিয়া সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে কোন কষ্ট বোধ হয় না।

পঞ্চমতঃ। দূরতা এবং স্থান সম্বন্ধে দৃষ্টি বিভ্রমের উদাহরণ। পরিমাণ সম্বন্ধে দৃষ্টিবিভ্রমের মধ্যে লিখিত হইয়াছে যে, অনেক সময়ে দূরতা তুলনা করিয়া আমরা পরিমাণ জ্ঞান লাভ করি। আবার জ্ঞাত পদার্থের পরিমাণ তুলনা করিয়া অনেক সময়ে দূরতা সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। যদি একখানি চিত্র পটে দুইটী পূর্ণবয়স্ক মনুষ্য অঙ্কিত থাকে, তাহা হইলে যেটী ক্ষুদ্রতর সেটী আমাদিগ হইতে দূরতর স্থানে রহিয়াছে, আমরা এইরূপ সিদ্ধান্ত করি। মায়া প্রদীপ (magic lantern) অগ্রে কিম্বা পশ্চাতে সরাইলে পটনিক্ষিপ্ত বিম্ব ক্ষুদ্র কিম্বা বৃহৎ হইয়া থাকে এবং পটস্থ পদার্থ কিম্বা প্রাণী সমূহ অগ্রসর হইতেছে কিম্বা পশ্চাদ্গমন করিতেছে বলিয়া আমাদিগের ভ্রম জন্মে।

প্রতিভগ্ন কিরণমালা যেরূপ পদার্থ সমূহকে বিকৃত দেখায় সেইরূপ তাহাদের দূরতা এবং স্থান সম্বন্ধে ভ্রম জন্মাইয়া থাকে। মরীচিকা বা মৃগতৃষ্ণিকা ইহার সুন্দর উদাহরণ। বায়ু উষ্ণ ভূভাগের সহিত সংলগ্ন হইলে তাপ-সাম্য হেতু উষ্ণ হয় এবং উষ্ণ হইলেই লঘু হয়। মরুভূমি অত্যন্ত উষ্ণ এইজন্য মরুপৃষ্ঠ বায়ু অত্যন্ত লঘু। উপরিস্থিত বায়ু তদপেক্ষা গুরুতর। এই লঘু এবং গুরু বায়ুর স্তরে স্তরে কিরণমালা প্রতিভগ্ন হওয়াতেই এক স্থানের পদার্থ অন্য স্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং অনভিজ্ঞ পথিক নিদারুণ ভ্রমে পতিত হয়।

দৃষ্টিবিভ্রমের পঞ্চ প্রকারেরই নানা উদাহরণ দেওয়া হইল। বাহুল্য ভয়ে এবিষয়ের আর একটী মাত্র উদাহরণ দিয়াই আমরা অন্যান্য ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের ভ্রম দেখাইতে চেষ্টা করিব। "কাটামুণ্ড কথা কয়" ইহা অনেকে দেখিয়াছেন। লেখকের একজন বন্ধু একবার কাটামুণ্ড দেখিতে গিয়াছিলেন। দেখা গেল যে একটী টেবলের মধ্যস্থানে একটা মাথা কথা কহিতেছে। গলা পর্য্যন্ত টেবলের উপরে; টেবলের নীচে দৃষ্টি করিলে বোধ হইল যে অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে কিন্তু মুণ্ডের শরীর দৃষ্ট হইল না। কিয়ৎকাল সাবধানে দর্শন করিলে বুঝা গেল যে, টেবলের নীচে দুইখানি দর্পণ তির্য্যগ্‌ভাবে এমন সুন্দররূপে স্থাপিত যে দর্পণ আছে বলিয়া শীঘ্র বোধ হয় না। তির্য্যগ্‌ভাবে স্থাপিত হওয়াতে সম্মুখস্থ পদার্থসমূহ প্রতিফলিত না হইয়া, দর্পণ দুই খানিতে পার্শ্বস্থ পদার্থসমূহ এরূপ প্রতিফলিত হইয়াছে যে, সাধারণতঃ বোধ হয় টেবলের নীচ দিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে; এই দর্পণদ্বয়ের অন্তরালে কাটামুণ্ডের শরীর লুক্কায়িত। দর্পণ দুইখানি যে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সহিত স্থাপিত তাহা বলা বাহুল্য। হয় ত অনেক পাঠক, যাঁহারা "কাটামুণ্ড" দেখেন নাই, তাঁহারা মনে মনে বলিতেছেন "এত টুকু বুদ্ধিও কি দর্শকদিগের নাই যে এইটা বুঝিতে পারে"। তাঁহাদিগকে আমরা দুর্য্যোধনের কথা স্মরণ করিতে বলি। দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে দর্পণ বুঝিতে না পারিয়া কিরূপ লজ্জায় পতিত হইয়াছিলেন তাহা একবার মনে করুন। আরও বলি কলম্বসের সঙ্গীরা কেহ ডিম বসাইতে পারিল না, কিন্তু তিনি বসাইয়া দিলে সকলেই বলিতে লাগিল যে ঐরূপে তাহারাও পারিত। কলিকাতায় যে সকল বিদেশীয় ঐন্দ্রজালিকেরা প্রতি বৎসর আগমন করে, তাহাদের অনেক কৌশলই দৃষ্টিবিভ্রমেরই উপর নির্ভর করে।

পাঠক এযাবৎ দর্শনেন্দ্রিয়ের নানাবিধ ভ্রমপ্রমাদ দেখিলেন। এইরূপ নাসিকা, জিহ্বা এবং স্পর্শেন্দ্রিয়ও মধ্যে মধ্যে ভ্রমে পতিত হইয়া থাকে। জ্ঞানলাভ সময়ে যদি ইন্দ্রিয় অস্বাভাবিক অবস্থায় থাকে

কিম্বা স্বাভাবিক অবস্থায় না থাকে, তাহা হইলে বাহ্যবিষয়ে ভ্রম হয়। নাসিকা বন্ধ করিয়া যদি দারুচিনি চর্ব্বণ করা যায় তাহা হইলে সাধারণ দেবদারু কাষ্ঠ চর্ব্বণ করা যাইতেছে বোধ হইবে। কেবল দারুচিনি সম্বন্ধেই যে এইরূপ তাহা নহে; নাসিকা বন্ধ করিলে অনেক পদার্থেরই স্বাদ পাওয়া যায় না। এই জন্য শিশুদিগকে অপ্রিয় ঔষধাদি খাওয়াইতে নাসিকা বন্ধ করিয়া লওয়া উচিত। ভিন্ন কিম্বা বিপরীত স্বাদের দুইটি পদার্থ যদি উপর্য্যুপরি আস্বাদন করা যায়, তাহা হইলে কিয়ৎকালপরেই দুইটিই একরূপ বোধ হইবে, উহাদিগের পার্থক্য অনুভব হইবে না। যদি চক্ষুঃ বন্ধ করিয়া তক্র এবং ক্লেরেট সুরা উপর্য্যুপরি আস্বাদন করা যায় তাহা হইলে কএক বারের পরে উভয়ই একবিধ বোধ হইবে, আস্বাদের কোন পার্থক্য অনুভূত হইবে না।

ইন্দ্রিয় মধ্যে নাসিকা সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষীণতেজ। অল্পায়াসেই নাসিকা স্বকার্য্য সাধনে অক্ষম হইয়া পড়ে। সর্ব্বদা তীব্রবর্ণের নানাবিধ পদার্থ দর্শন করিয়াও নয়ন কার্য্যকুশল থাকিয়া যায়, কিন্তু অত্যল্পসময় মাত্র উগ্র গন্ধ অনুভব করিলে নাসিকা আর কোন গন্ধের উপলব্ধি করিতে পারে না। মৃদু মিষ্ট গন্ধও অল্প সময়মাত্র উপভুক্ত হইতে পারে। গোলাপ জল ও আতর প্রস্তুত করিবার জন্য প্রশস্ত ক্ষেত্রসমূহে গোলাপ বৃক্ষরাজি রোপিত হয়। যাহারা এই গোলাপক্ষেত্রে বাস করে তাহারা উহার আমোদলহরী উপভোগ করিতে সক্ষম হয় না। যাহারা সর্ব্বদা সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করে, তাহাদের ব্যবহারই সার; ভোগ পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণের হয়।

নয়ন দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম জ্ঞানলাভ হয় বটে, কিন্তু স্পর্শেন্দ্রিয় উহা অপেক্ষাও বিশ্বস্য। পাশ্চাত্য ভূতের * আবির্ভাব হইল; লোকে সহসা বিশ্বাস করিতে চাহিল না। ক্রুক সাহেব মহা বৈজ্ঞানিক। তিনি সংকল্প করিলেন স্পর্শ করিতে না পারিলে বিশ্বাস করিবেন না। ভূতেরা তাহাতেই স্বীকার। ক্রুক সাহেবকে তাহাদের শরীর স্পর্শ করিতে দিল। তদবধি ক্রুক সাহেব ভূতবিশ্বাসী। এইরূপে দেখা যাইবে যে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের প্রমাণ পাইলেও যে বিষয়ে বিশ্বাস হয় না, স্পর্শেন্দ্রিয়ের প্রমাণ সে বিষয়ে বিশ্বাস উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু স্পর্শেন্দ্রিয়ের প্রমাণও ভ্রমশূন্য নহে। বিশেষতঃ

* পাশ্চাত্য সকল বিষয়ই যে সমশ্রেণীর প্রাচ্য বিষয় অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ইহা একটী আধুনিক স্বতঃসিদ্ধ। অতএব (Spirit) কে ভূত বলাতে অনেকে চটিতে পারেন। যাহা হউক আমরা এই প্রবন্ধে পাশ্চাত্য ভূতে বিশ্বাস করা না করা সম্বন্ধে কিছুই বলিতেছি না। সময়ান্তরে এবিষয়ে আমাদিগের মত প্রকটিত করিবার ইচ্ছা রহিল।

উহা প্রায়শই অবহিত জ্ঞানোৎপাদনে অক্ষম। দুইটি পদার্থ হস্ত দ্বারা পরিমাণ করিলে অনেক সময়ে কোনটি গুরুতর তাহা বুঝা যায় বটে কিন্তু একটি অপরটির কত গুণ ভারী তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না, এবং প্রায় সমভারী হইলে কোন্‌টি গুরুতর তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন। তাপ বিষয়েও এইরূপ। দুইটি পদার্থের কোন্‌টি উষ্ণতর তাহা কখন কখন নির্দ্দেশ করা যায় বটে কিন্তু একটির তাপ অপরটির তাপের কত গুণ তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না এবং প্রায় সমতপ্ত দুইটি পদার্থের কোনটি উষ্ণতর তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন। এমন কি তাপ বিষয়ে অনেক সময়ে স্পর্শেন্দ্রিয়ের প্রমাণ অতীব ভ্রমসঙ্কুল। শরীরের তাপ সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বস্থানেই শতকীয় বিভাগের ৩৭ ডিগ্রি। যদি বস্ত্র, কাষ্ঠ এবং প্রস্তর এই তিনটি পদার্থ শরীর অপেক্ষা হিমতর হয় এবং যদি তাহাদের তাপ সমান হয়, তাহা হইলে বস্ত্র অপেক্ষা কাষ্ঠ এবং এবং কাষ্ঠ অপেক্ষা প্রস্তর হিমতর বোধ হইবে। এই জন্য শীতকালে কাষ্ঠ এবং প্রস্তর বস্ত্রাপেক্ষা হিমতর বোধ হয়। আবার বিছানার চাদর কিম্বা সাদা পিরণ, লেপ কিম্বা ফ্লানেল অপেক্ষা হিমতর বোধ হয়। ইহার কারণ এই যে, বস্ত্র ফ্লানেল কিম্বা তুলা অপেক্ষা অধিকতর তাপপরিচালক, তদপেক্ষা কাষ্ঠ এবং তদপেক্ষা প্রস্তর। শরীরের তাপ যে পদার্থ যত পরিমাণে চালন করে তাহা তত শীতল অনুভূত হয়। আবার রৌদ্রস্থিত তপ্ত বস্ত্র, কাষ্ঠ এবং প্রস্তরের মধ্যে প্রস্তর উষ্ণতম বোধ হয়। কারণ উহা শীতল হইলে যদ্রূপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম তাপ শরীর হইতে গ্রহণ করে, উষ্ণ হইলে তদ্রূপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম তাপ শরীরে প্রদান করে; কাষ্ঠ প্রস্তরাপেক্ষা অল্পতর তাপ প্রদান করে বটে, কিন্তু বস্ত্রাপেক্ষা অধিকতর তাপ প্রদান করে, এই জন্য বস্ত্রাপেক্ষা উষ্ণতর এবং প্রস্তরাপেক্ষা হিমতর অনুভূত হয়। গ্রীষ্মকালে যদি বায়ু শরীর অপেক্ষা হিমতর থাকে, তাহা হইলে পাখা দ্বারা বায়ু সঞ্চালন করিলে শীতলতা অনুভূত হয়। গাত্রস্পৃষ্ট বায়ু তাপসাম্য হেতু গাত্র হইতে তাপ গ্রহণ করিয়া গাত্রের সমান উষ্ণ হইতে চায়, কিন্তু পুনঃ পুনঃ নবীকৃত হইলে তত উষ্ণ হইতে পারে না, সুতরাং শীতল বোধ হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে যদি বায়ু শরীর অপেক্ষা উষ্ণতর হয়, তাহা হইলে পাখা দ্বারা বায়ু সঞ্চালন করিলে পুনঃ পুনঃ উষ্ণতর বায়ু গাত্রসংলগ্ন হওয়াতে গ্রীষ্মাধিক্য হইয়া থাকে। স্পর্শেন্দ্রিয় মধ্যে মধ্যে সংখ্যাজ্ঞান সম্বন্ধেও ভ্রম জন্মাইয়া থাকে। তর্জ্জনী অঙ্গুলির উপরে মধ্যমা অঙ্গুলি তুলিয়া, চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া যদি ঐ দুই অঙ্গুলি দ্বারা একটী মটর কিংবা তদ্রূপ কোন একটী ক্ষুদ্র পদার্থ স্পর্শ করা যায়, তাহা হইলে বোধ হইবে যে দুইটী পদার্থ রহিয়াছে।

ইন্দ্রিয় স্বীয় স্বাভাবিক অবস্থায় না থাকিলে যে এইরূপ ভ্রান্তি জন্মাইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। চক্ষুর নীচে বল পূর্ব্বক অঙ্গুলি বসাইলে সকল দৃষ্ট পদার্থই যে দুইটি দুইটি বোধ হয়, তাহাও এইরূপ ইন্দ্রিয়ের স্বস্থানচ্যুততার জন্য ঘটিয়া থাকে।

আমরা শ্রবণেন্দ্রিয়ের কএকটি ভ্রম দেখাইয়াই প্রস্তাবের উপসংহার করিব। রাত্রিতে দ্বিতলগৃহবাসী ভয়াতুর ব্যক্তিরা নিম্নতলের শব্দাদি ছাদে হইতেছে ভাবিয়া ভূতভয়ে কিরূপ আড়ষ্ট হয়, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। প্রতিশব্দ দ্বারা বহুসংখ্যক ভ্রম উৎপাদিত হয়। দূরে প্রতিঘাতী কোন পদার্থ বিদ্যমান থাকিলে শব্দতরঙ্গ তাহাতে প্রতিহত হইয়া পুনর্ব্বার কর্ণে প্রবেশ করে। বোধ হয় যেন দূরে আর একটি শব্দ হইল। নদীর একতীরে যদি একটি কুকুর শব্দ করে, অপর তীরে তাহার প্রতিশব্দ হয় এবং বোধ হয় যেন আর একটি কুকুর অপর তীর হইতে ডাকিল। কুকুর ভ্রান্ত হইয়া অপর তীরস্থ কুকুরের সহিত বিরোধ করিবার আশয়ে বারংবার ডাকিতে থাকে।

প্রতি অণুপলে দুই অক্ষর অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে পাঁচ অক্ষর উচ্চারিত এবং শ্রুত হইতে পারে এবং শব্দ প্রতি অণুপলে ৩০০ হস্ত অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে ৭৫০ হস্ত ভ্রমণ করে। অতএব যদি ৭৫ হস্ত দূরে উচ্চ প্রাচীর কিংবা অন্য কোন প্রতিঘাতী পদার্থ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে শব্দতরঙ্গ গমনাগমনে ১৫০ হস্ত ভ্রমণ করে তাহাতে অর্দ্ধপল সময় লাগে। অতএব কোন কথা কহিলে শেষ অক্ষর উচ্চারণ হইবার এবং শব্দ প্রতিহত হইয়া প্রত্যাগমন করিবার মধ্যে অর্দ্ধপল সময় অতিবাহিত হয়; তাহাতে এক অক্ষর শ্রুত হইতে পারে। এরূপস্থলে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে " করিবে না " প্রতিশব্দ উত্তর করিবে " না "। প্রাচীর কিংবা তদ্রূপ প্রতিঘাতী পদার্থ যদি ১৫০ হস্ত দূরে অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে শেষ দুই অক্ষর পুনরায় স্পষ্ট শ্রুত হইবে। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে "এখানে কি কেহ আছে ?" প্রতিশব্দ উত্তর করিবে " আছে "। ২২৫ কিম্বা ৩০০ হস্ত দূরে প্রতিঘাতী পদার্থ থাকিলে শেষ তিন কিংবা চারি অক্ষর পুনরায় স্পষ্ট শুনা যাইবে। প্রতিশব্দের এই গুণের উপর নির্ভর করিয়া নানা ভাষায় গদ্য পদ্যময় বহুবিধ সাহিত্যরত্ন রচিত হইয়াছে।

খণ্ড কবিতা।*

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা পরস্পর-নিরপেক্ষ কবিতানিচয়কে লক্ষণভেদে মুক্তক, কুলক, কোষ, সংঘাত প্রভৃতি বিবিধ সংজ্ঞা দিয়াছেন, এবং ইতিহাস-কথাশ্রিত অষ্টাধিক সর্গসমন্বিত কাব্যগ্রন্থকে মহা কাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা এই প্রবন্ধে পরস্পর সম্পর্কশূন্য কবিতা মাত্রকেই সাধারণতঃ খণ্ড কবিতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিব, এবং কাব্যের সর্গ-সংখ্যা ঠিক অষ্টাধিক না হইলেও যদি উহার আদি অন্ত মধ্য সর্ব্বত্র কোন একটি ঐতিহাসিক কাহিনীর সূত্রবন্ধন থাকে, তাহা হইলেই উহাকে আমরা মহাকাব্য বলিয়া গণনায় আনিব। পলাসির যুদ্ধ কাব্যে সর্গ-সংখ্যা আটের অধিক নহে, উহার অধিনায়কও দেবতা কিংবা শাস্ত্রসম্মত ক্ষত্রিয় নহেন, এবং সর্গে সর্গে ছন্দোবন্ধনেরও বৈচিত্র্য নাই, তথাপি উহা মহাকাব্য; আর কবিকাহিনী কি অবসর-সরোজিনী প্রভৃতিতে বহুবিষয়ের বর্ণনা, বহুরসের অবতারণা এবং বহুবিধ ছন্দের রচনা থাকিলেও এ গুলি খণ্ডকাব্য।

আমাদিগের বিবেচনায় মহাকাব্য রচনায় যে শক্তির পরীক্ষা ও পরিচয় হয়, খণ্ডকাব্যরচনায় তাহা কখনও হইতে পারে না। খণ্ডকাব্যের কবি আপনার ভাবে আপনি বিভোর, আত্মকথা লইয়াই ব্যস্ত। তাঁহার কবিতা দুঃখের গীত, কি হর্ষের উচ্ছ্বাস। উহাতে শুদ্ধ কবিহৃদয়ই প্রতিবিম্বিত হয়, কিন্তু মানবহৃদয়রূপ অনন্ত জগতের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় না। কবি প্রণয়ে নিরাশ হইয়া প্রীতির মর্ম্ম-স্থলে আঘাত করেন, প্রণয়ে প্রতারিত হইয়া মনুষ্য জাতিকেই শঠ, কপট, নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর বলিয়া বাষ্পগদ্গদ রুদ্ধকণ্ঠে তিরস্কার করিতে থাকেন। মহাকাব্যের কবি আত্মচিন্তারহিত, আত্মবিস্মৃত এবং আপনা হইতে দূরে অবস্থিত। তাঁহাকে তাঁহার কাব্যে আমরা দেখিতে পাই না। তাঁহার সুখ দুঃখ হর্ষ বিষাদ, তাঁহার ঘৃণা

* ১। মানস বিকাশ। কলিকাতা প্রাচীন ভারতযন্ত্রে মুদিত।
২। কবিকাহিনী। শ্রীদীনেশচরণ বসু প্রণীত।
৩। পুষ্পমালা। শ্রীযুক্ত শিবনাথ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী এম, এ, প্রণীত।
৪। অবসর সরোজিনী। শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত।
৫। বনকুসুম। কলিকাতা ইষ্টইণ্ডিয়া প্রেসে মুদ্রিত।
৬। অবকাশ গাথা। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বসু প্রণীত।

তাঁহার দ্বেষ, তাঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হয় এবং তিনি পরের প্রাণে আপনার প্রাণ ঢালিয়া দিয়া, পরের হৃদয়কে আপনার করিয়া, একেবারে সর্ব্বময়ত্ব লাভে যত্নপর হন। তাঁহার ভাষা ভীমের জিহ্বায় করকাভিঘাতের ন্যায় গর্জ্জন করে, * দ্রৌপদীর অভিমানপূর্ণ উদ্বেল অন্তরে ক্রোধ-তরঙ্গের ন্যায় উথলিয়া উঠে, রাজা যুধিষ্ঠিরের মুখে "সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্," ইত্যাদি সদর্থযুক্ত হিতকথা ক্ষরণ করিতে থাকে, এবং প্রকৃতির সারস্তন শোভামুগ্ধ দিব্যাঙ্গনাদিগের স্ফুরিতাধরে শৈলপ্রস্থবাহিনী স্রোতস্বিনীর ন্যায়, অথবা প্রেম কি বিরহের কণ্ঠধ্বনির ন্যায়,আপনার ভরেই ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে।

বাঙ্গালা ভাষা এইক্ষণ খণ্ড কবিতায় পরিপ্লাবিত। এদেশে মনুষ্যের সংখ্যা যত, বোধ হয় এইক্ষণ কবির সংখ্যাও প্রায় তত হইয়াছে। বালকেরা শ্মশ্রুদাম কিংবা দন্তোদ্ভেদ না হইতে হইতেই "প্রেয়সি আমার" বলিয়া কবিতা লিখেন; যুবজনেরা পার্থিব ভোগে বীতরাগ হইয়া তপোবন, উদাসীনতা এবং বৈরাগ্যের গুণ গাণ করেন, অর্দ্ধ প্রাচীন বিষয়ী ব্যক্তিরা কবিতা লিখিয়া রসিকতার পরিচয় দেন; আর কাহাকেও স্তুতি করিতে হইলে অথবা নিন্দা করিতে হইলে,ভুগোলের বিজ্ঞাপন লিখিতে হইলে অথবা ব্যাকরণের উপসংহার লিখিতে হইলে, অধিক আর কি,—কিছু না লিখিতে হইলেও আধুনিক, বঙ্গবাসী দেবী বীণাপাণির ত্রিলোকদুর্ল্লভ দুরারাধ্য পদারবিন্দে আশ্রয় লন।

বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের এই অবস্থাকে অনেকে দেশের সৌভাগ্য বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বলেন যে, যুগান্তের আরাধনাতেও যে ফল না ফলে,যদি কোন দেশের সপত্র, নিষ্পত্র, সজীব, নির্জ্জীব, সমস্ত পাদপই সেই ফলে পরিশোভিত হয়, তবে ইহাকে সৌভাগ্য লক্ষণ না বলিয়া আর কি নামে উল্লেখ করিব? কিন্তু দুঃখ এই,অশিক্ষিত হৃদয় যে সকল কথায় প্রতারিত হয়,শিক্ষিত বুদ্ধি অনেক সময়েই তাহা প্রলাপ বাক্য বলিয়া অগ্রাহ্য করে, এবং হৃদয় যে সকল আপাত-মনোরম সুচারু দৃশ্যে বিমোহিত হয়, বুদ্ধির কঠোর দৃষ্টি প্রায়শঃই তাহার মর্ম্মোদ্ভেদ করিয়া একবারে বস্তুর প্রকৃত অবস্থার পরীক্ষা লইতে থাকে। চিন্তাক্ষম বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা উল্লিখিত কাব্যপ্লাবন কিংবা পদ্যপ্লাবনের কএকটি কারণ নির্দ্দেশ করেন। এই কারণ গুলি আমাদিগের নিকটও নিতান্ত কল্পিত বলিয়া বোধ হয় না।

ইহা আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পাইয়াছি, এবং পাঠকবর্গও একটুকু চিন্তা করিলেই স্বীকার করিবেন যে,বঙ্গে এই কবিতা বৃষ্টির এক কারণ বাঙ্গালির ভ্রমর-প্রকৃতিতা। বর্ত্তমান সময়ের বাঙ্গালিকে যদি কিছুর সহিত তুলনায় আনা যায়, সেই তুলনাস্থল ভ্রমর। ভ্রমর যেমন বসন্ত-বায়ু-হিল্লোলে

* যথা মহাকাব্য কিরাতার্জ্জুনীয়।

ফুলে ফুলে বিচরণ করে, ফুলে ফুলে মধু আহরণ করে, এবং সুখে দুঃখে সকল সময়েই গুণ গুণ ধ্বনি করে, বঙ্গবাসীও ইনীং সেইরূপ হৃদয়গত ভাবের হিল্লোলে ফুলে ফুলে বিচরণ করেন, ফুলে ফুলে মধু আহরণ করেন, এবং সুখে দুঃখে সকল সময়েই গুণ গুণ ধ্বনি করিয়া চিত্ত বিনোদনে যত্ন করেন। তাঁহার স্থৈর্য্য নাই, তাঁহার গাম্ভীর্য্য নাই, কিছুতেই মনঃসন্নিবেশে তাঁহার ক্ষমতা নাই, এবং একটুকু উর্দ্ধে যে উড্ডীন হইবেন, তাঁহার দুর্ব্বল পক্ষপুটেও এমন সামর্থ্য নাই। তিনি সর্ব্বাংশেই একটি ভ্রমর। যে দেশের লেখক এইরূপ ভ্রমর, পাঠক এইরূপ ভ্রমর, সে দেশে ভ্রমর-গীতি ভিন্ন আর কোন্ গীত শ্রুতিগোচর হইবে, বল। ভারত-বিখ্যাত রঘুনাথ শিরোমণি বঙ্গদেশে জন্মিয়াছিলেন এবং বঙ্গবক্ষেই লালিত, পালিত, শিক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। প্রবাদপরম্পরায় এইরূপ কথিত হইয়া থাকে যে, তিনি সূর্য্যের অভ্যুদয় হইতে সূর্য্যের অস্তগমন পর্য্যন্ত কোন একই বিষয়ের চিন্তায়, পরমার্থ-চিন্তামগ্ন তাপসের ন্যায়, একবারে নিমগ্ন হইয়া থাকিতে পারিতেন। আধুনিক বঙ্গে কাহাকে কি প্রহর কালও কোন একই তত্ত্বের চিন্তায় গাঢ়মগ্ন দেখিয়াছ? যদি দেখিয়া থাক, তবে তাহা দৃষ্টিবিভ্রম। বাঙ্গালি এইক্ষণ চিন্তা-বিমুখ, পরিশ্রম-বিমুখ, ক্লেশ-বিমুখ। কালের তরঙ্গে ভাসিয়া, আপনা হইতে যাহা গায়ে আসিয়া না ঠেকিল, সে তাহা উপার্জ্জন করিবার জন্য যত্নপর হইবে না।

বঙ্গীয় সাহিত্য যে সমুচিত বিকাশের পূর্ব্বেই বিকার প্রাপ্ত হইতেছে, ইহার আর এক কারণ বাঙ্গালির অসহিষ্ণুতা। অসহিষ্ণুতাকে অনেকে সামান্য দোষ বলিয়া মনে করেন, কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় পুরুষের পুরুষার্থসাধনে অসহিষ্ণুতার ন্যায় প্রতিবন্ধক আর নাই। যদি অসহিষ্ণুতাদোষে অধঃপাত না ঘটিত, তবে বাঙ্গালি এতদিনে পৃথিবীর জাতীয় সমাজে অতি গৌরবের আসন গ্রহণ করিত, সন্দেহ নাই। কিন্তু এক অসহিষ্ণুতাই তাহার অশেষ আশার মুলোচ্ছেদ করিতেছে। ইয়ুরোপ ও আসিয়ায় কোন্ জাতি বাঙ্গালির ন্যায় যশোলালসার অধীন? বাঙ্গালির হৃদয়-যন্ত্র নিতান্ত শ্লথ হইয়া পড়িলেও যশোলিপ্সা উহাতে অনির্ব্বচনীয় তাড়িত বেগ প্রদান করিতে পারে; বাঙ্গালির প্রাণ একবারে যখন দেহ ছাড়িয়া দেয়, যমুনার উজান জলে বংশীধ্বনির ন্যায়, যশের মৃদু-মোহন ধ্বনি, অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্য হইলেও, উহাকে ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হয়। যে জাতি এইরূপ যশোলিপ্সু, সেই জাতির অবশ্যই নিতান্ত যশস্বী হওয়া সম্ভব, এবং যশস্কর কার্য্যসম্পাদনে তাহার অটল উৎসাহ থাকাই উচিত। কিন্তু বাঙ্গালির তাহা হয় না। তাহার অসহিষ্ণুতা তাহাকে যশঃসঞ্চয়ের সুপ্রশস্ত পথেও ক্ষণকাল তিষ্ঠিয়া থাকিতে দেয় না। অন্যান্য দে-

শের গ্রন্থকারেরা বয়সের একার্দ্ধ অধ্যয়নে যাপন করিয়া এবং বহু দিন চিন্তায় ডুবিয়া রহিয়া গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু বাঙ্গালির আকাঙ্ক্ষা ও তৃষ্ণা এতকাল অতৃপ্ত রহিতে পারে না। সুতরাং শিক্ষিত হইবার পূর্ব্বেই বাঙ্গালি, গ্রন্থকার;—এবং কাব্য কাহাকে বলে তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবার পূর্ব্বেই বাঙ্গালি, কবি!

ক্রমিক অধোগতির এত কারণ সত্ত্বেও যে আমরা বঙ্গে মধ্যে মধ্যে প্রকৃত কবিতার রসাস্বাদে অধিকারী হই, ইহা সামান্য আহ্লাদের বিষয় নহে।—আমরা ইতঃপূর্ব্বে পাঠকবর্গের নিকট কতিপয় উৎকৃষ্ট কাব্যের পরিচয় দিয়াছি। আমরা আজ যে কএকখানি কবিতা সংগ্রহ উপলক্ষ করিয়া এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি, তাহাও সর্ব্বথা কাব্য নামেরই উপযুক্ত এবং আর কিছু না হউক, বাঙ্গালার অযুতকোটি খণ্ড কবিতা হইতে একটুকু দূরে স্থান পাইবার যোগ্য।

কোন এক ছলগ্রাহী কবি ভগবান্ পাণিনিকে এই বলিয়া তিরস্কার করিয়াছেন যে, যে সকল বস্তু একসূত্রে গ্রথিত হইলে নিতান্ত অরসিকতার পরিচয় দেয়, তদীয় অষ্টাধ্যায়ীর অনেক স্থলেই তাদৃশ বহুবিধ বস্তু একসূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। মানস বিকাশ, কবিকাহিনী, অবসর সরোজিনী, পুষ্পমালা, বনকুসুম এবং অবকাশ গাথাকে একই প্রবন্ধে নিবদ্ধ এবং একত্র গ্রথিত দেখিয়া আমাদিগকেও অনেকে ঐরূপ অরসিক বলিতে পারেন। কিন্তু ফলতঃ আমরা তাদৃশ অপবাদের বিষয় নহি। আমরা এই ছয়খানি কাব্যকে গুণ-গরিমায় সমান বলিয়া স্বীকার করি না। পুষ্পমালার রচনায় আমরা যে রূপ পরিপক্কতা, প্রগাঢ়তা, যেরূপ সাবধানতা ও সুললিত পদবিন্যাস দেখিতে পাই, অবসরসরোজিনী কি বনকুসুমে তাহা দেখিতে পাই না; এবং আমরা কবিকাহিনীতে কাব্যের যেরূপ বৈদ্যুত-স্পর্শ অনুভব করি, পুষ্পমালা কি মানসবিকাশেও তাহা অনুভব করিতে পাই না। রূপের সহিত রূপে, লাবণ্যের সহিত লাবণ্যে কিরূপ বিভিন্নতা আছে, পাঠকবর্গ তাহা জানেন। রসগত মাধুর্য্যেও সেইরূপ বিভিন্নতা আছে। এই কাব্য সংগ্রহের প্রত্যেক খানিই রসমাধুর্য্য বিশিষ্ট, এই অংশে ইহারা পরস্পর সমান, অথচ স্বাদগত পার্থক্যে ইহার একখানির সহিত আর একখানির তুলনা হয় না।

কাব্যের প্রধান গুণ দুই, সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি আর উদ্দীপনা। ইহা পূর্ব্বেই প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে যে, খণ্ড কবিতায় মানব-প্রকৃতিগত পূর্ণ সৌন্দর্য্যের চিত্রদর্শন অসম্ভাবিত; কিন্তু খণ্ড কবিতায় বহিঃপ্রকৃতির সর্ব্ববিধ সৌন্দর্য্যই অনায়াসে চিত্রিত হইতে পারে; এবং কবির শক্তি থাকিলে তিনি উহাতে উদ্দীপনার উগ্র মদিরাও অনায়াসে ঢালিয়া দিতে পারেন। উদ্দীপনা বিষয়ে বঙ্গে দুই তিনটি অভিনব কবির উপমাস্থল নাই, আমরা তাঁহা-

দিগের পরই বাবু দীনেশ চরণ বসুর নামোল্লেখ করিতে পারি। দীনেশ বাবুর লেখা মর্ম্ম-স্পর্শিনী, মৃত-সঞ্জীবনী। তিনি যে পরিমাণে মাদকতা জন্মাইতে পারেন, যদি তদীয় লেখায় সেই পরিমাণে প্রগাঢ়তার পরিচয় দিতে পারিতেন, তবে তাঁহার বয়সের অল্পতা বিস্মৃত হইয়াও আমরা তাঁহাকে প্রবীণ বলিয়া পূজা করিতে সম্মত হইতাম। তাঁহার " উদাসীনের বিদায় " এবং " জাগো মা আমার " প্রভৃতি দ্রব-বহ্নি-সদৃশ কবিতা নিচয় বান্ধবের পাঠকবর্গ ভূয়োভূয়ঃ পড়িয়াছেন। আমরা নিম্নে তাঁহার "প্রত্যাগত প্রবাসী" হইতে কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম। ইহা পাঠ করিবার সময়ে কাহার শরীর না কণ্টকিত হয়, তাহা বলিতে পারি না।

* * *

" যাই এবে যাই দেখি হেরি গো নয়নে
ধৈরয ধরিয়া যদি পারিরে হেরিতে,
কি খেলা খেলেছে কাল সে সুখ সদনে
যথায় প্রিয়ারে সদা পেতাম দেখিতে;
দেখি এবে কোন্ স্থানে রয়েছে কেমনে
প্রেয়সীর প্রিয় দ্রব্য প্রেয়সী বিহীনে।

এই ত আরশি সেই যাহার অন্তরে
(খেলে যথা শশীকলা সলিল ভিতর)
প্রস্ফুটিত, হায়, যেন যৌবনের ভরে,
খেলিয়াছে প্রেয়সীর বদন সুন্দর;
তরল লাবণ্য, মরি, রূপের মাধুরী
ভাসিত আরশি অঙ্গে কনকলহরী।

হায়! দেখি ওকি লেখা প্রাচীরের গায়;—
' প্রাণনাথ! বড় দুঃখ রহিল এ মনে
নাহেরে তোমার মুখ বুঝি প্রাণ যায়,
হ'লনা সাক্ষাৎ আর এ ভব জীবনে;
বিদায়, বিদায়, নাথ বিদায় এখন,
জীবনের যবনিকা হইল পতন!'

যথা কোন হীনবল অগ্নির কুণ্ডেতে
ঢালিলে আহুতি, করি ভীষণ গর্জ্জন
উঠে জ্বলি বৈশ্বানর, দেখিতে দেখিতে
সধূম-অনল-ধ্বজ পরশে গগন;
তেমতি শোকের অগ্নি উঠিল জ্বলিয়া
প্রেয়সীর বাক্যরূপ আহুতি পাইয়া!

ঘুরিল মস্তক, হায়, ঘুরিল নয়নে
সারশি, আরশি, দ্বার, গৃহের প্রাচীর;
ভাবিলাম মনে আমি, হায়, কি কুক্ষণে
ধরিলাম ভবে এই মানব শরীর!
মারিনু ডুবায়ে বৃথা বিচ্ছেদ পাথারে
শরদিন্দু-মুখী সেই স্বর্ণলতিকারে!

না জানি বিরলে বসি (জানকী যেমতি
লঙ্কায় অশোকবনে করিতা ক্রন্দন)
কত দিন সুকুমারী সুনেত্রা যুবতী
অশ্রুজলে আর্দ্রিয়াছে অঙ্গের বসন;
কত দিন মম এই নিষ্ঠুরতা স্মরি,
ভাবিয়া বিবর্ণ মরি, হয়েছে সুন্দরী!

না জানি বসিয়া এই গবাক্ষের দ্বারে
চাহিয়াছে কত দিন পশ্চিম-গগনে,

দেখি ক্রমে বসুধারে ডুবিতে আঁধারে
সুদীর্ঘ নিশ্বাস এক ত্যজেছে ললনে ;
ডুবেছে আঁধার-কূপে মানস আবার
বহিয়াছে অশ্রু-জল চক্ষে অনিবার !

অস্থির হইল মন ; শিথিল শরীর ;
ধীরে ধীরে বসিলাম পালঙ্ক উপরি,
একি দেখি !! কে রয়েছে নিদ্রিত গভীর,
আপাদ মস্তক জীর্ণ বসনে আবরি !
শব যথা রহে পড়ি স্থির কলেবর,
রহিয়াছে লম্বমান পালঙ্ক উপর ।

বিস্মিত অন্তরে ধীরে উঠায়ে বসন
যেমন চাহিব আমি সে মুখের প্রতি,
সহসা অমনি, হায়, ফিরায়ে বদন,
'নাথ' বলি পুনরায় নীরবিলা সতী ;
মুদিল নয়ন হায়, সহজে আবার
রাখিয়া শেষের অশ্রু মুকুতার ধার !

যথা বিদ্যুতের স্রোত প্রবেশিলে গায়
সমস্ত শরীর উঠে সঘনে কাঁপিয়া,
কাঁপিল এ দেহ মম শোকের জ্বালায়,
পড়িনু ভূতলে হায়, আছাড় খাইয়া ;
শোকের সঙ্গিনী মূর্চ্ছা করিয়া যতন
করিল এ অভাগারে পুনঃ অচেতন !

লভি সংজ্ঞা চাহিলাম চতুর্দ্দিকে মরি,
দেখিলাম প্রেয়সীর প্রাণশূন্য কায়া
পড়িয়া রয়েছে, হায়, পালঙ্ক উপরি,
ত্যজিয়াছে অভাগিনী সংসারের মায়া !
এ শূন্য ভবনে আর ভ্রমিয়া কি ফল !
আজ হ'তে আশা মোর ফুরাল সকল !"

দীনেশ বাবুর লেখনী প্রকৃতির লীলা-তরঙ্গবর্ণনেও অনিপুণা নহে। তিনি মানব-হৃদয়ের ভাবলহরী আঁকিতে গিয়া যেরূপ রসের উচ্ছ্বাস তুলিতে পারেন, প্রকৃতির শোভারাশি চিত্র করিবার সময়েও কোন কোন স্থলে প্রায় সেইরূপ কৃতকার্য্যতা লাভ করেন। তাঁহার ধবল শেখরে নামক কবিতার আরম্ভেই ইহার সুচারু নিদর্শন আছে।—

"ভাসিতেছে জ্যোৎস্না নিথর অম্বরে ;
হিমাদ্রির শুভ্র শেখরে শেখরে
খেলিছে তরঙ্গ—রজত তরল
নির্ঝরিণী-নীরে পাতায় পাতায়,
শতপুষ্প শিরে শত লতিকায়
কৌমুদীর কায়া করে ঝলমল।"

যে সকল খণ্ডকবিতা পুষ্পমালায় গ্রথিত হইয়াছে, তৎসমুদয়কে পুষ্পমালা নাম দেওয়া কোন অংশেই অসঙ্গত হয় নাই। এদেশে যাঁহারা কাব্যশাস্ত্রের অনুশীলন করেন, তাঁহাদিগের নিকট শিবনাথ বাবুর কবিত্বশক্তির নূতন পরিচয় দেওয়া বিফল। তাঁহারা জানেন যে শিবনাথ বাবুর হস্ত হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রকৃতই নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে। তাঁহার কএকটি গুণ অনন্যসাধারণ। তিনি যেখানেই যে ভাবে প্রীতির বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হিমাদ্রিবক্ষোনিঃসৃত পবিত্র গঙ্গোদকের ন্যায় সুখদ হইয়াছে ; তা-

হাতে তৃষ্ণার পরিতৃপ্তি হয়, অথচ আকণ্ঠ-পানেও হৃদয় আবিল হয় না। ফুল, ফল, লতা, পাতা, বনের পাখী, স্রোতের জল, ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর বর্ণনাতেও শিবনাথ বাবু যার পর নাই প্রশংসনীয়। তিনি যাহা কিছু দেখেন, তাহাই যেন মধুময়, অথচ সে মধুতে নিতান্ত বিকৃতচিত্তেরও চিত্তবিকার জন্মে না। বস্তুতঃ পুষ্পমালার কবিতাচয়ে, যেরূপ মাধুর্য্য, যেরূপ রসবত্তা আছে, যদি সেইরূপ আবেগ, তরঙ্গ ও তর তর প্রবাহ থাকিত, তাহা হইলে ইহাকে আমরা খণ্ডকবিতার আদর্শ বলিয়াই ব্যাখ্যা করিতাম। আমরা তাঁহার পরিত্যক্তা রমণীর গুটিকত কথা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। তিনি যখন পরদুঃখে কাতর হইয়া কাঁদিতে চাহেন, পরদুঃখকাতরা কবিতাও তখন কিরূপ কাঁদিতে পারে, পাঠক তাহা দেখিয়া বিমোহিত হইবেন।

"অভাগীর কেউ নাই! কার কাছে কাঁদিব?
এ সব দুঃখের কথা কার কাছে বলিব?
তাই বলি বিভাবরি!
অভাগীকে কৃপা করি
আঁধার অঞ্চলে ঢাকো প্রাণ-ভরে কাঁদিব,
তোমারি নিকটে সখি! অশ্রুজলে ভাসিব।

কত শত অশ্রু তুমি রেখেছ ত ঢাকিয়া,
সহস্র নিশ্বাস যায় বায়ু সনে বহিয়া।
মোর অশ্রু সেই সনে,
রাখ সখি! সংগোপনে;
জুড়াই তাপিত প্রাণ প্রাণ ভরে কাঁদিয়া,
তোমার অঞ্চল যাক্ অশ্রুজলে ভিজিয়া।

অয়ি! সুখময়ি নিশি! তারা-হার পরিয়া,
বসুধার সিংহাসনে রয়েছ ত বসিয়া।
চেয়ে দেখ পদতলে
পড়ে লতা ভাসে জলে,
তুলে লও প্রাণ-ফুল, দয়া করে ছিঁড়িয়া,
নিরমল ফুল থাক তারাসনে মিশিয়া।

অথবা পারলো যদি হাহাকার বহিতে,
অভাগীর হাহাকার লও তথা ত্বরিতে,
যথা সেই নিরদয়,
ঘুমাইছে এ সময়;
যাও তথা হাহাকারে নিদ্রাভঙ্গ করিতে,
নিদ্রাভঙ্গে অভাগীর দুঃখ-কথা কহিতে।

অভাগীর হাকাকারে যেই আঁখি মেলিবে
অমনি রজনি! তুমি ধীর-স্বরে বলিবে,
'ঘুমাও, এ রবে কেন
নয়ন মেলিলে হেন?
অবলার হাহাকার কেন বৃথা শুনিবে?
ঘুমাও কাঁদুক তারা চিরকাল কাঁদিবে।'

রে দীপ! তোমার তৈল ফুরাইয়া আসিছে,
তাই মরি শিখা তব নিবু নিবু করিছে;
আশা-তৈল পামরার
বিন্দুমাত্র নাহি আর,
তবু কেন প্রাণশিখা এতক্ষণ জ্বলিছে?
দুর্ব্বল হৃদয়বর্ত্তি হুহু করে পুড়িছে?

পুড়িতে পুড়িতে শেষ অবশ্যই হইবে ;
তখন এপাপ শিখা একেবারে নিবিবে।
হাহাকার, অশ্রুজল,
ঘুচে যাবে এ সকল ;
নির্দ্দয় পতির আশ সেই দিন মিটিবে,
সেই দিন কমলের শতদল ফুটিবে।

বিপন্নের বন্ধু তুমি চির দিন ঘোষণা,
তবে কেন মৃত্যু! আজ অভাগীরে লওনা ?
নারী প্রাণে কত সয়,
তাই যদি দেখা হয়,
যথেষ্ট হয়েছে ! সত্য আর প্রাণে সয় না,

একা ছিনু, ছিনু ভাল একাকিনী পড়িয়া
কাঁদিতাম এ বিজনে অশ্রুজলে ভাসিয়া,
কত কষ্ট আছে ভালে,
কেন এলি হেন কালে ?
নিজে মরি তোমাকে লো কি করিব লইয়া।
যাই যদি কার কাছে যাইব লো রাখিয়া ?"

অবসর সরোজিনীর রচয়িতা শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় খণ্ডকবিতার এক অক্ষয়-প্রস্রবণ-স্বরূপ হইয়াছেন ; কবিতার ভাষাই এইক্ষণ তাঁহার স্বাভাবিক ভাষা হইয়াছে, এবং বোধ হয় তিনি সকল বিষয়েই কবিতা লিখিতে পারেন। এদেশে খণ্ড-কবিতার দুইটি যুগ গিয়াছে। একযুগের প্রতিষ্ঠাতা প্রসিদ্ধনামা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ; আর এক যুগের প্রতিষ্ঠাতা আধুনিক দুইটি কবি। ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে কবিতার যেরূপ শব্দালঙ্কার থাকিত, সেইরূপ কাব্য থাকিত না ; এইক্ষণকার কবিতায় কাব্যসৃষ্টির জন্য যেরূপ যত্ন পরিলক্ষিত হয়, শব্দালঙ্কার গ্রন্থনে তাদৃশী চেষ্টা দেখা যায় না। রাজকৃষ্ণ বাবু এই উভয় যুগের মধ্যবর্ত্তী। তাঁহার কবিতার শব্দসম্পদ ও রসবৈভব দুইই প্রশংসনীয়। বোধ হয় রসবৈভব অপেক্ষা শব্দসম্পদ একটুকু অধিক। তিনি প্রেমের বিশ্বব্যাপিতা বর্ণন করিতে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"ধনীর প্রাসাদে, দীনের কুটীরে,
ভূধর-শেখরে, নীরধির নীরে,
বিজন বিপিনে, মেদুর পবনে,
রবির, বিধুর উজ্জ্বল কিরণে,
মরুভূ মাঝারে, কুসুম নিকরে
জলের প্রপাতে, খনির ভিতরে,
অচল গহ্বরে, তটিনীর তটে,
জলধরজালে, নীল নভপটে,
পাদপ, তুষারে, সাগর-পুলিনে,
সর-সুশোভিত কুমুদ, নলিনে,
উজ্জ্বল জ্বলিত বিজলী-কোলে ;
অশনি নিনাদে, মুষল ধারায়,
মেঘ-গরজনে, অনল-শিখায়,
সমীর-দুলিত গাছের পাতায়,
বিকচ কুসুম-ভূষণা লতায়,
আরো কত আছে,—কব তা কেমনে ?
যা জানি,—না জানি নিখিল ভুবনে
সমভাবে তুমি সকল স্থলে।"

বঙ্গে যাঁহার নবীন প্রতিভা এইক্ষণ এত সমাদৃত হইয়াছে, অতি অল্পাক্ষরে তিনি এই বিষয়টির কিরূপ বর্ণনা ক-

রিয়াছেন, আমরা পাঠককে তাহাও দেখাইব।

"বুঝি নাই
যেই প্রেম বিরাজিছে অন্তরে অন্তরে
হৃদয় শোণিতসহ হৃদয়ে সঞ্চরে,
আদি নাই, অন্ত নাই,
বিরাম বিশ্রাম নাই,
মানব হৃদয় গঙ্গা, সুধা প্রবাহিনী
শান্তভাবে,বিলোড়নে বিশ্ববিপ্লাবিনী।"

লোকের রুচি বহু প্রকারের ;—আমাদিগের এই বোধ হয় যে, কবিতা বহুভাষিণী না হইলেই অধিকতর হৃদয়গ্রাহিণী হয়। রাজকৃষ্ণ বাবুর স্বরস্বতার বর্ণনা এই জন্যই তাঁহার অন্যান্য কবিতা অপেক্ষা আমাদিগের নিকট অধিকতর মনোরম বোধ হইল।

বনকুসুম কবি-হৃদয়ের প্রথম কুসুম ; অপূর্ণ বিকসিত, অযত্নরক্ষিত, অকৃত্রিম। আমরা ইহার সৌরভে পুলকিত হইয়াছি। গ্রন্থকার আমাদিগের নিতান্ত স্নেহাস্পদ। আমাদিগের বিবেচনায় তিনি আরও কিছু কাল অপেক্ষা করিলেই ভাল হইত। তথাপি, তিনি প্রথম উদ্যমেই যাহা উপহার দিয়াছেন, আমরা আদরের সহিত তাহা গ্রহণ করিলাম। যাহাকে লোকে ললিতকবিতা বলে এবং যে সকল খণ্ডকবিতার সহিত ললিতবনিতার উপমা হইয়া থাকে, বনকুসুমের রচয়িতা একটি পাখির প্রতি সম্বোধনে ব্যতীত তাদৃশ কবিতায় কৃতকার্য্য হন নাই। কিন্তু যে সকল কবিতায় হৃদয়ের অন্তর্গূঢ় গম্ভীর বেদনা, দ্বেষ, ক্রোধ, অভিমান এবং কালকূট হলাহল ঢালিয়া দিতে হয়, এই অভিনব কবি এখনই তাহাতে দক্ষতা দেখাইয়াছেন। তাঁহার "বৈকুণ্ঠনিবাসে বহে না রে আজ, আনন্দ হিল্লোল" ইত্যাদি পংক্তি পাঠ সময়ে চিত্ত উদ্বেল হয়। আমরা নিম্নে তাঁহার একটি শ্লোকমাত্র তুলিয়া দিলাম। ইহা পাঠ করিয়া সকলেই হয় ত স্বীকার করিবেন যে, রচয়িতার আত্মনাম গোপনে প্রয়োজন নাই।

"দুর্ব্বার জলধি মরি ! ভারত বেষ্টিয়া
উচ্চে করিল রোদন !
হিমাংশু শিশিরচ্ছলে
ত্যজিলেক অশ্রুজলে
বরষিল অগ্নি রবি আরক্ত বদন
কাঁদিলেক চরাচর ভারত কারণ !"

অবকাশ গাথা শব্দের লালিত্য ও রচনার মাধুর্য্যে বনকুসুম অপেক্ষাও অধিকতর আদরণীয়। কিন্তু বনকুসুমের ভাষায় যেরূপ ওজস্বিতা আছে, অবকাশগাথার কোন কবিতায়ই তাহা নাই। আমরা ইহার নিদ্রা, কাননে ধ্রুব ও দময়ন্তী প্রভৃতি কতিপয় কবিতা পাঠে মোহিত হইয়াছি ; আবার শারদীয় মহোৎসবের আরম্ভে কবিবর রায় গুণাকরের সেই নাচানো ভাষার জঘন্য অনুকরণ দেখিয়া নিতান্ত লজ্জা অনুভব করিয়াছি।

বিনয়ে বাধা।

এজগতে বিনীত বলিয়া লোকের নিকট প্রশংসিত হইতে কাহার না সাধ হয়? কত কঠোর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও যে কীর্ত্তি উপার্জ্জন করা যায় না, যদি দুটি কথা বিক্রয় করিলেই, সেই কীর্ত্তি সঞ্চয় করা যায়, তবে কাহার প্রবৃত্তি না তাহাতে উন্মুখ হয়? তবে সকলেই বিনয়ে অবনত হয় না কেন? ইহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য, এবং ইহা হৃদয়রহস্য অথবা প্রকৃত দর্শন শাস্ত্রের কথা।

আমরা যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে এই বোধ জন্মিয়াছে যে, বিনয়ের পক্ষে অনেকেরই কতকগুলি বাস্তব,কি অবাস্তব, কল্পিত কি অকল্পিত বাধা আছে। মনুষ্য সেই বাধাগুলিকে যতক্ষণ না অতিক্রম করিতে পারে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার প্রকৃত বিনয়ী হওয়া অসম্ভব।

কাহারও মন স্বভাবতঃ বিনয়ের দিকে, কিন্তু তিনি বিনীত হন না,—লজ্জায়। লোকের নিকট বিনীত হইলে, পাছে লোকে তাঁহাকে ছোট মনে করে, খাট মনে করে, অথবা শক্তিহীন, সামর্থ্যহীন ও ক্ষমতাশূন্য কি সমাজের নিম্নশ্রেণিস্থ বিবেচনায় উপেক্ষা করে, এই লজ্জাতেই তিনি সর্ব্বদা সঙ্কুচিত থাকেন, এবং যেখানে ঔদ্ধত্যে কিছুমাত্র সার্থকতা নাই, সেখানেও ঔদ্ধত্য দেখাইয়া, যেখানে দুরক্ষরের কোন প্রয়োজন নাই, সেখানেও দুরক্ষর বলিয়া, যেখানে ভ্রূকুঞ্চন, বিষদৃষ্টিবর্ষণ, ও সদর্প-পদ-বিক্ষেপে, কোন আবশ্যকতা নাই সেখানেও কুঞ্চিতভ্রূ, কঠোর চক্ষু এবং দাম্ভিক ভাবভঙ্গি ও কঠিনতা প্রদর্শন করিয়া বৃথা দুর্ব্বিনীত হন। এই শ্রেণিস্থ ব্যক্তিরা প্রকৃত দীনাত্মা, প্রকৃত দরিদ্র। বিধাতা যাঁহাদিগের অঙ্গে জ্যোৎস্নারাশির ন্যায় রূপরাশি ঢালিয়া দিয়াছেন,রূপের কৃত্রিম ছটা দেখাইবার জন্য তাঁহাদিগের যত্ন থাকে না; এবং বিধাতা যাঁহাদিগকে শক্তি,সামর্থ্য, ক্ষমতা ও অন্য প্রকারের বৈভব দিয়াছেন, কৃত্রিম অভিমানের আবরণ দিয়া অঙ্গ ঢাকিয়া রাখিতেও তাঁহাদিগের মতি জন্মে না। যাঁহাদিগের আছে, তাঁহাদিগের আবার প্রদর্শন কি? প্রদর্শন দরিদ্রের জন্য। যাঁহাদিগের অন্তরে অভিমানের অমলজ্যোতিঃ,সাগরগর্ভনিহিত অমূল্যরত্নের ন্যায়, লোকচক্ষুর অগোচরে লুক্কায়িত রহে, বিনয়ে তাঁহাদিগের আবার লজ্জা কি? লজ্জা হীনজনের জন্য।

বিনয়ের আর এক বাধা ভয়। অনেকের বিনয়ী হইতে লজ্জা নাই। তাঁহারা জানেন যে, গরিমা আর বিনয়, কাঞ্চনময়ী প্রতিমার কান্তি ও দৃঢ়তার ন্যায় অনায়াসে ও অতিসুখে একত্র অবস্থান করিতে পারে। তথাপি তাঁহারা বিনীত হন না,—ভয়ে।

ভয় এই, পাছে বিনয়ের দিকে নাবিতে নাবিতে ক্রমে আত্মাবমাননা হয়, এবং অ-ভ্যন্তরীণ সামর্থ্য দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এই ভয়ের অর্থ, আপনাতে অবিশ্বাস। হা! বিড়ম্বনা! মানবপ্রকৃতির যে সমস্ত ক্ষমতাকে পৃথিবী 'শক্তি' বলিয়া পূজা করিয়াছে, লোকসন্নিকর্ষে ও সৌজন্য শিক্ষায় তাহার ক্ষয় হয়, না বৃদ্ধি হয়? বুদ্ধির স্বাভাবিকী প্রতিভা, মনস্বিতার অপরিহার্য্য গৌরব, আ-ত্মার উচ্চতা, উদার হৃদয়ের মহিমা, এ সকল যদি বিনয়েই কমিবার বস্তু হয়, তবে আর ইহাদের দুর্ব্বহ ভারবহনের প্রয়োজন কি? তুমি যদি যথার্থ বড় লোক হও, নিশ্চয় জানিও যে, লোকের পাদপ্রান্তে পড়িয়া থাকিলেও তুমি মুকুটমণির ন্যায় শোভা পাইবে, এবং সকলকে আপনার ক্ষমতায় বাঁধিয়া রাখিবে। আর যদি তুমি যথার্থ ক্ষুদ্র লোক হও, তাহা হইলে ইহাও নিশ্চয় জানিও যে, তোমায় লোকের মস্তকে কি স্বর্ণসিংহাসনের শীর্ষস্থলে তুলিয়া দিলেও, তোমার স্বাভাবিক ক্ষুদ্রতা সমস্ত আচ্ছাদন ভেদ করিয়া, বাহির হইয়া পড়িবে। অ-দীনসত্ব খ্রীষ্ট তাঁহার শিষ্যদিগের পদপ্র-ক্ষালন করিয়াছিলেন; তাঁহারা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তদীয় আজ্ঞা পালন করিতেন এবং তাঁহাদিগের পরবর্ত্তীরা অদ্যাপি তাঁহাকে জগতে অতুল, অনন্যসাধারণ দেবত্ব-সম্পন্ন বলিয়া আরাধনা করেন। নীরো রোম-বাসীদিগকে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি পূজা ক-রিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। লোকে অ-দ্যাপি তাঁহার নাম হইলেই, ঐ নামের উ-পরে, অন্ততঃ কল্পনায়ও পাদুকাঘাত করে। বড় আর ছোট, লৌহ আর চৌম্বক; চৌম্বককে উর্দ্ধে রাখ, অধোতে রাখ, উ-ত্তরে রাখ, দক্ষিণে রাখ, লৌহ অবধারিতই উহার আকর্ষণীর অধীন হইবে। কারণ, চৌম্বকে অন্তর্নিহিত শক্তি আছে। বড় আর ছোট, বহ্নি আর তৃণস্তূপ;—বহ্নিস্ফু-লিঙ্গকে তৃণস্তূপের উপরে রাখ আর নীচে রাখ, তৃণসংযোগে বহ্নি আপনা হইতেই জ্বলিয়া উঠিবে। কারণ, বহ্নিতেও চৌম্ব-কের মত অদৃষ্ট শক্তি আছে।

বিনয়ের তৃতীয় বাধা স্বার্থচিন্তা। মনে লজ্জাও নাই, ভয়ও নাই অথচ এই বিশ্বাস আছে যে, বিনয়ের অধীন হইলে স্বার্থরক্ষা হইবে না। যখন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, বজ্রের ন্যায় ভয়ঙ্কর আঘাত না করিলে, কার্য্যোদ্ধার হয় না, তখন বিনয়ের মধুধারা সিঞ্চনে কি পুণ্য আছে, বল।

বিনয়ের পক্ষে এই প্রতিবন্ধককেও আমরা উপযুক্ত প্রতিবন্ধক বলিয়া স্বী-কার করি না। লৌকিক কার্য্যক্ষেত্রে বজ্রের ন্যায় আঘাত যে সময়ে সময়ে অনিবার্য্য, তাহা আমরা মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বজ্র কি দুর্ব্বিনীত? বজ্রপাতের প্রথমে মেঘঘটা,—কি সুন্দর, কি সুখদর্শন, কি সুশীতল ছায়াপ্রদ! তার পর সৌদা-মিনীর মৃদু হাস্য। কাহার মন না উহা কাড়িয়া লয়? তার পর জলদমালার মি-

নতি, অবনতি ও অবিরামবারিধারা ; এবং তারপর উদ্ধতমস্তকে মুহুর্মুহুঃ অশনিপাত। তবে কেন বজ্রে বৃথা আর অবিনয়ের অপবাদ দাও ? যদি বাহুতে বল থাকে, তবে পুরুষের মত দৃঢ়ভাবে কার্য্য কর,অথচ পুরুষের মত বিনীত হও। ইহাতে স্বার্থরক্ষার কখনও বিঘ্ন ঘটিবে না।

বীরসমাজে বোনাপার্টি নিতান্ত বিনীত ছিলেন। তাঁহার এই রীতি ছিল,তিনি, সমরাবসানে বিজয় বৈজয়ন্তী দোলাইয়া দিয়া, তৎক্ষণাৎই শত্রুপক্ষের নিকট অতি কাতরকণ্ঠে সন্ধিসংস্থাপনের জন্য প্রার্থী হইতেন। ইংলণ্ডের চতুর্থ জর্জ এবং অষ্ট্রীয়ার সম্রাটের নিকট, পুনঃ পুনঃ জয়লাভের পরেও তিনি স্বহস্তে যে সকল বিনয়পূর্ণ কাতরোক্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন,হীনতর কোন ব্যক্তি তদনুরূপ বিনীত হইতে সাহস পায় না।

পুরুষসিংহ প্রথম রিচার্ডও সামাজিকদিগের সহিত কথোপকথনে ও ব্যবহারে যার পর নাই বিনয়াবনত থাকিতেন। তিনি আপনার অমিত পরাক্রমকে এমনই এক দুর্ভেদ্য বর্ম্ম বলিয়া জানিতেন, যে, স্বকীয় দৃঢ় দুই ভুজ এবং প্রশস্ত ললাট ভিন্ন রাজপরিচ্ছদের কিছুই আর আবশ্যক জ্ঞান করিতেন না। কিন্তু ইহাতেই তাঁহার সিংহের প্রতাপ সর্ব্বত্র অনুভূত হইত এবং সকলে আপনা হইতে আসিয়া তাঁহার চরণোপান্তে গড়াইয়া পড়িত। অতি দুর্দ্ধর্ষ অভিমানীরাও তাঁহার বিনয়াবৃত অভিমানের নিকট পরাভব স্বীকার করিত। এদিগে তাঁহার কনিষ্ঠ, শৃগাল জন, মানের কাল্পনিক অনুরোধে দুর্ব্বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াও, লোকের নিকট অপমানিত রহিতেন। অগ্রজের অনবদ্য পৌরুষদেহে যে মাধুরী রূপমুগ্ধা কামিনীর ন্যায় একবারে মিশিয়া থাকিত, তিনি মণি মুক্তার মালা পরিয়াও তাহার ছায়া পাইতেন না।

পুরাকালে রোমের এক তেজঃপুঞ্জ সম্রাট্ একদা পারিষদবর্গ সমভিব্যাহারে রাজপথে বায়ু সেবন করিতেছিলেন। একটি দীনমূর্ত্তি ভদ্রসন্তান দূর হইতে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিলেন। তিনি তাঁহা হইতেও অধিকতর অবনত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যাভিবাদন করিলেন। পারিষদদিগের মধ্যে একজন এই আচরণের অর্থগ্রহ করিতে না পারিয়া একটুকু হাঁসিতে ছিলেন। সম্রাট্ সেই হাঁসির তাৎপর্য্য বুঝিতে পাইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—"আপনার কি এই অভিলাষ যে সকল বিষয়ে ইহাঁ অপেক্ষা উচ্চতর স্থানে অবস্থিত রহিয়া এইক্ষণ বিনয়ে আমি ইহার নিকট অধঃকৃত হইব ?"

বিনয়ে যাঁহাদিগের লজ্জা হয়,ভয় হয় অথবা সাহসের অভাব হয়, বুদ্ধি থাকিলে তাঁহারা এই মহানুভাব-সম্রাটের নিকট শিক্ষা লইবেন। আর, যাঁহাদিগের প্রকৃতিই বিনয়বিরোধিনী,—বিষবর্ষিনী,—ছিন্নতার বীণার মত বিসংবাদিনী, তাঁহারা আত্মোৎকর্ষচিন্তায় এবং অধ্যাত্মসৌন্দর্য্যের গৌরবধ্যানে নিমগ্ন হইবেন।

সংক্ষিপ্তসমালোচন

১। বঙ্গবধূবিলাপ। শ্রীপ্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন প্রণীত। আমরা এই পুস্তকখানি উপহার পাই নাই, কিন্তু সমালোচনার জন্য আদর সহকারে ক্রয় করিয়া আনিয়াছি। এই আদরের বিশিষ্ট কারণ আছে। গ্রন্থকারের সহিত বান্ধবের কোন রূপ সম্পর্ক নাই, তিনি কখনও বান্ধবে কিছু লিখেন নাই। তথাপি তিনি গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে ভঙ্গিক্রমে আপনাকে বান্ধবের একজন লেখক, এবং বান্ধবের কতকগুলি কবিতাকে আপনার বলিয়া পরিচয় দিয়া আমাদিগের প্রতি যার পর নাই বন্ধুতা ও আদর দেখাইয়াছেন। বান্ধবের দ্বিতীয়খণ্ডে প্রেমোন্মাদিনী নামে একটি কবিতা আছে, ঐ কবিতা নবীন বাবুর; এবং বাঙ্গালার বর্ষা নামে আর একটি কবিতা আছে; উহা যমুনালহরী নামক গীতি কবিতার রচয়িতা গোবিন্দ বাবুর। গ্রন্থকার এই কবিতা দুটিকে আপনার বলিয়া তুলিয়া নিয়াছেন। আমরা এতদিনে বুঝিলাম যে, বাঙ্গালা সাহিত্য সমাজে সকল লেখকই লঘুচেতা নহেন। অন্ততঃ বঙ্গবধূবিলাপের রচয়িতার এই অপবাদ দেওয়া অসঙ্গত। কারণ শাস্ত্রে আছে।

'অয়ং নিজঃ পরো বেত্তি গণনা লঘু-
[চেতসাম্।']

অর্থাৎ ইনি আমার নিজ, উনি আমার পর এইরূপ যাঁহাদিগের গণনা তাঁহারা লঘুচেতা। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের লেখায় এইরূপ আত্মপর গণনার চিহ্ন মাত্রও দেখা যায় না। তিনি বঙ্গদর্শনকেও নিজ বিলাসক্ষেত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সে কথার সহিত বঙ্কিম বাবুর সম্পর্ক, আমাদিগের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু আমাদিগের আশঙ্কা হইতেছে, আত্মপর-গণনা-রত অনুদারচেতা নবীনচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র গ্রন্থকারের উদারতার মাহাত্ম্য না বুঝিয়া একটা গোলযোগ বাধাইতে পারেন।

২। কবিতাকুঞ্জ। শ্রীবরদাচরণ গুহ প্রণীত। বরদা বাবুর কবিতাকুঞ্জে কোকিলের কলকণ্ঠ কি ভ্রমর গুঞ্জন ইহার কিছুই আমাদিগের শ্রুতিগোচর হইল না। কিন্তু বঙ্গে যে সকল ভেক আজি কালি নিরন্তর বিকটশব্দ করিয়া লোকের নিদ্রাসুখে ব্যাঘাত জন্মাইতেছে, তাহাদিগের কণ্ঠধ্বনি অপেক্ষা সুমধুর ধ্বনি শুনিয়া আমরা সুখী হইলাম। কিন্তু এই স্বরমাধুর্য্য, মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে। কুঞ্জের দ্বারদেশে দুরাশার অতি কঠোর দুরক্ষর গীত;—

"যথা ধূর্ত্তা নীচা নারী প্রতারণা-পরা,
সদা ঈর্ষ্যা-হিংসাযুত, কভু নহে মনঃপুতা
লোলুপ অন্তরা।"

৩। মানসকুসুম। দ্বিতীয়ভাগ। শ্রীরামদয়াল ঘোষ প্রণীত। নামেই পরিচিত হইতেছে যে মানসকুসুম একখানি পদ্য গ্রন্থ। ইহাতে কাম, ক্রোধ, লোভ, এই তিন বিষয়ে তিনটি সুদীর্ঘ কবিতা এবং আলেকজাণ্ডার ও দস্যু নামে আর একটি সংক্ষিপ্ত কবিতা আছে। এই শেষোক্ত কবিতাটিই আমাদিগের নিকট অপেক্ষাকৃত ভাল লাগিল।

৪। দুরাশা-কাব্য। প্রথমভাগ। শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর আচার্য্য চৌধুরী প্রণীত। ইহার লেখা পড়িয়া আশা অথবা আশঙ্কা হইল, ইনি নানা ফুলের মধু আহরণে এবং গীতে ভ্রমরাণুকরণে যত্নশীল হইবেন। বোধ হয় কাব্যের প্রকৃতি বিষয়ে সমুচিত শিক্ষা ও উপদেশ লাভ করিলে, ইনি খণ্ড কবিতা রচনায় কিঞ্চিৎ ক্ষমতা লাভও করিতে পারেন। এত দীর্ঘকালের পরেও কবিতায় জগদানন্দ বাবুর কলঙ্ক করা ইহাঁর পক্ষে শিষ্টতা সদাশয়তা,ও সুরুচিশালিতার কার্য্য হয়,নাই।

৫। স্বপ্নদূত। শ্রীকিশোরীলাল রায় বিরচিত। এখানিতে স্বপ্নদর্শন-বর্ণনাচ্ছলে পরমার্থতত্ত্ব ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ে কবিতায় উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আমাদিগের বিবেচনায় ইহার অর্থ নারিকেলের অভ্যন্তরস্থিত সুস্বাদু অম্বুর ন্যায়, নিতান্ত কঠিন আবরণে সমাবৃত রহিয়াছে। একথা কতদূর সত্য পাঠকবর্গ নিম্নোদ্ধৃত চারিটি পংক্তি পড়িলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

"হাস্য হয় ক্রন্দনের অরুক যেমন।
যুক্তবাকে প্রলাপের রিপুতে গণন॥
হুড্ডরিপু যথা হুড্ড গ্রাসী পক্ষীবর।
মধুর অরাতি হয় যেমন ভ্রমর॥"

বোধ করি, সাধারণ পাঠকবৃন্দ অরুক হুড্ড হুড্ডগ্রাসী প্রভৃতি শব্দের অর্থ জানেন না; জানিলেও এই সকল শব্দ চর্ব্বণ করিয়া ইহাদের অভ্যন্তরস্থিত রস নিষ্কর্ষণ করা ভাল বাসেন না।

৬। স্তবমালা। শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত। অবসর-সরোজিনীর রচয়িতা স্তবমালায় লক্ষ্মী নারায়ণের বন্দনা করিয়াছেন। ইহার ভাষা স্তবের উপযোগিনী।

৭। কুসুমকাননে কণ্টকতরু। ইহাতে বিরলে শিশিরবিন্দু, নির্ব্বাসিতের বিলাপ, স্বপ্নসুন্দরী, পতিহীনা কামিনী, নিশীথে কমলিনী, ও প্রিয়তমারে আমার এইরূপ কএকটি কবিতা আছে। ইহার ভাষা কবিতা ও মানসকুসুমের ভাষা অপেক্ষা সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট, ভাবও অপেক্ষাকৃত সরল ও তরল। কিন্তু তথাপি দুই এক স্থানের শব্দবিন্যাস দেখিয়া আমরা প্রকৃত স্তম্ভিত হইয়াছি। একটি কবিতায় লেখা আছে,—

"প্রিয়তমারে আমার!—
সংসার সাহারা মাঝে তুমিই ওসিস,
শোক শিরোকায় যবে,দেহ মন দগ্ধ হবে
তুমিই সান্ত্বনাবারি দাও দিবানিশ।"

আমরা ভাগ্যবশতঃ কোন দিন একটুকু ইংরেজী পড়িয়াছিলাম, তাই যেন সাহারা আর ওসিস শব্দের লালিত্য ও অর্থ-

গত মাধুর্য্য কোন প্রকারে আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইল ; কিন্তু প্রিয়তমারা ইহার তাৎপর্য্য পরিগ্রহে সমর্থা হইবেন কি না, সে বিষয়ে অতি গভীর সন্দেহ আছে। বলিতে লজ্জা হয়, অথচ না বলিয়া ও পারি না ; শিরোকায় শব্দের অর্থ এখনও আমাদিগের বোধগম্য হয় নাই। ইহা কি সংস্কৃত শব্দ না ইংরেজী অভিধানে উল্লিখিত সিরক্কো নামক বিষাক্ত বায়ু, পাঠক তাহার মীমাংসা করিবেন।

৮। ভারতেশ্বরী কাব্য। শ্রীপ্যারীচরণ দাস প্রণীত।—

৯। ইংলণ্ড-ঈশ্বরী আজ্ঞ ভারত-ঈশ্বরী। শ্রীরাধাবল্লভ দে প্রণীত।—

অর্থানুসারে নাম করিতে হইলে, এদ্রুখানের নাম রাজসূয় কাব্য। যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থে ব্রটেনিয়ার রাজপ্রতিনিধি এবার যে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, এদ্রুখানি ত'হাই অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। রাধাবল্লভ বাবু বয়সে বালক। তাঁহার ক্ষমতার সহিত প্যারীবাবুর ক্ষমতার তুলনা করা অসঙ্গত। কিন্তু তথাপি বলিতে হইবে যে, তাঁহার প্রথম কবিতাটি বড়ই মনোজ্ঞ হইয়াছে। প্যারীবাবুর লেখা আদ্যোপান্ত শ্লেষপূর্ণ। তাঁহার বন্দনায় শ্লেষ, বিলাপে শ্লেষ, আবেদনে শ্লেষ এবং অভিনন্দনেও শ্লেষ। এইরূপ শ্লিষ্ট কবিতা রচনায় তিনি স্পষ্টতঃ হেমবাবুর অনুকরণে যত্নপর হইয়াছেন, কিন্তু উপ: কার্য্য না হইয়া থাকিলেও । নাই। ভারতের বর্ত্তমান অ প্যারীবাবুর অভিজ্ঞতা আছে।

১০। মিত্রোদয়। মাসি সমালোচন। শ্রীহিরণ্ময় মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ইহাতে যে সকল বিষয়ের সন্নিবেশ দেখিলাম, এবং সেই সকল বিষয় যেভাবে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় ইহার দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের উপকার বই অপকার হইবে না। ইহার ষষ্ঠসংখ্যায় চিতোরের যুদ্ধ নামে যে একটি কবিতা আছে, তাহা সুখপাঠ্য হইয়াছে। পত্রিকা আকারে ক্ষুদ্র, কোন একটি দীর্ঘপ্রবন্ধ ইহাতে একবারে পরিসমাপ্ত হইতে পারে না, তথাপি আবার ইহার মধ্যে ইংরেজী প্রবন্ধ প্রকটিত হয়। ইহা কেন? বাঙ্গালির দ্বারা কি ইংরেজী ভাষারও উৎকর্ষ সাধন হইবে?

১১। দিবাকর। মাসিক পত্র ও সমালোচন। শ্রীরাজেন্দ্রলাল সিংহ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। এই পত্রিকাখানি বর্দ্ধমান হইতে প্রচারিত হইতেছে। আমরা ইহার প্রথম দুই সংখ্যা পড়িয়া সুখী হইয়াছি। ইহার সম্পাদক কাব্যে অনুরাগী ; কাব্যরসজ্ঞ এবং কাব্যের দোষ গুণ বিচারে অভিজ্ঞ কি না, তাহা এখন পর্য্যন্তও পরীক্ষিত হয় নাই।

রামায়ণ*।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

রামায়ণশীর্ষক প্রথম প্রস্তাবে ইতালীয় পণ্ডিত গোরেসিওর মত যথাযথ বিবৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান দ্বিতীয় প্রস্তাবে ইংলণ্ডীয় পণ্ডিত মণিয়ার উইলিয়েম্‌সের মত সমালোচিত হইতেছে।

ভারতীয় সাহিত্যসংসার স্বভাবতঃ নিতান্ত বিপুল ও আয়ত। গম্ভীরদর্শন হিমগিরির গম্ভীর প্রকৃতির ক্রোড়ে ভারতীয় কবিতা পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত। ভারতভূমির ন্যায় ভারতীয় কবিতাও স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের অদ্বিতীয় লীলাস্থল। কল্পনা যত্নপূর্ব্বক এই সৌন্দর্য্যরাশি কবিতার গায় গায় সাজাইয়া দিয়াছে। পবিত্রহৃদয় গঙ্গার সহিত অনায়াসে এই ভারতীয় কবিতার তুলনা হইতে পারে— উভয়ই বহুধাপ্রসারিণী, রসবহুলা ও মার্দ্দব, প্রসন্নতা প্রভৃতিতে আতট পূর্ণা। রামায়ণ ও মহাভারত এই কবিতা-ক্ষেত্রের অনির্ব্বচনীয় শ্রী সম্পাদন করিতেছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই দুই মহাকাব্যের গুণে এতদূর মোহিত হইয়াছেন যে, তাঁহাদিগের অনেকেই ইহার গুণগরিমার বর্ণনায় স্ব স্ব প্রবন্ধ পল্লবিত করিতে ক্রটি করেন নাই। মণিয়ার উইলিয়েম্‌স্ এই পণ্ডিতসম্প্রদায়ের অন্যতম ব্যক্তি। তিনি রামায়ণসংক্রান্ত প্রস্তাবের অনেক স্থলেই স্বীয় পাণ্ডিত্য ও বিচারদক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। রামায়ণের গুণে মোহিত হইয়া কোন কোন স্থলে তাঁহার লেখনী অজস্র প্রশংসা-ধারা বর্ষণ করিয়াছে। রামায়ণ যখন বৈদেশীক পণ্ডিতগণের হৃদয় এইরূপ আকর্ষণ করিয়াছে, তখন যে উহা পৃথিবীর মধ্যে একটি উৎকৃষ্টতম রত্ন তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই।

আর্য্যগণ বেলুর্তাগের তুষারমণ্ডিত প্রদেশ অতিক্রম করিয়া সর্ব্বাদৌ সপ্তসিন্ধুর প্রসন্ন-সলিল-বিধৌত পঞ্চনদে অবস্থিতি করেন। কালক্রমে তাঁহাদিগের বংশ শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া ইতস্ততঃ বিস্তৃত হয়। এই বিস্তৃত বংশের সন্ততিবর্গ যখন গাঙ্গপ্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন, তখন একদল সাহসিক, যুদ্ধকুশল অসভ্য জাতি বিজয়োন্মত্ত হইয়া দাক্ষিণাত্য হইতে সিংহলদ্বীপ পর্য্যন্ত আপনাদিগের অধিকার বিস্তার করে। মণিয়ার উইলিয়েম্‌সের মতে এই গাঙ্গপ্রদেশ-

* Indian Wisdom. By Monier Williams, M. A.

বাসী আর্য্যসন্ততিগণের সহিত দাক্ষিণাত্য-বিজয়ী অনার্য্যদিগের সামরিক সংঘর্ষেই রামায়ণের উৎপত্তি। রামায়ণে বিন্ধ্য ও তন্নিকটস্থ শৈলমালার অধিবাসিগণ বানর এবং দাক্ষিণাত্যের আর্য্যেতর অসভ্যগণ নরশোণিত-লোলুপ বহুমস্তক বহুহস্ত রাক্ষস শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইয়াছে। বোধ হয় বাল্মীকি বানরগণের জিগীষাবৃত্তি ও শত্রুদমন স্পৃহা দেখিয়াই রামের সৈন্যদিগকে বানরীবৃত্তিতে পরিনত করিয়াছেন। ঐতিহাসিক বিশেষের লিখিত বিবরণ এই অনুমানের পোষকতা করিতেছে * ।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, রামায়ণ যুদ্ধকুশল আর্য্য ও অনার্য্য জাতির অবদান পরম্পরার সংগ্রহ। বেদের ন্যায় ইহা আদৌ লিপিবদ্ধ ছিল না। সাধারণ সমাজে ইহা মৌখিক বক্তৃতায় বিবৃত হইত। মণিয়ার উইলিয়েম্‌স্ বলেন,রামায়ণ-প্রতিপাদ্য এই ঘটনা সমূহ সম্ভবতঃ প্রথমে গদ্যে বিবৃত হইয়া পরে সময় অনুসারে সহজবোধ্য অনুষ্টুভ্‌চ্ছন্দে নিবদ্ধ হইয়াছে।

রামায়ণের পরিবর্ত্তন সময় দুটি। এক সময়ে উহা পদ্যে গ্রথিত হয়, অন্য সময়ে বহুপরিবর্দ্ধিত ও বর্ত্তমান অবস্থায় স্থাপিত হইয়া উঠে। মণিয়ার উইলিয়েম্‌সের মতে রামায়ণের প্রথম অবস্থা ব্রাহ্মণ্যকালের পূর্ব্ববর্ত্তী। এই সময় খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর পরবর্ত্তী নয়। তিনি স্বমতের সমর্থন জন্য নিম্নলিখিত কএকটী যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন ঃ—

১। রামায়ণে সতীদাহের কোনও বিবরণ লক্ষিত হয় না। মহাভারতে দৃষ্ট হয়, পাণ্ডুপত্নী মাদ্রী এবং বসুদেব ও কৃষ্ণের সহধর্ম্মিনীগণ স্বামীর সহগমন করিয়াছিলেন কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধে যে সমস্ত যোদ্ধা গতাসু হয়, তাহাদিগের পত্নীগণ এই রীতির অনুসরণ করে নাই। ইহাতে প্রতীত হইতেছে সতীদাহ প্রথা ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তরবর্ত্তী পঞ্জাবের নিকটস্থ প্রদেশে প্রথমে প্রবর্ত্তিত হয়। রামায়ণের প্রথম প্রচার সময়ে ইহা অপেক্ষাকৃত প্রাচ্য প্রদেশে প্রসৃত হয় নাই। পঞ্জাবে খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতেই এই প্রথা প্রচলিত হইয়া উঠে। মেগাস্থিনিস্ উল্লেখ করিয়াছেন যে, উক্ত সময়ে ঐ প্রথা মগধ পর্য্যন্তও বিস্তৃত হইয়াছিল। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, রামায়ণ খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রণীত হইয়াছে (*)।

* স্ত্রাবো এক স্থলে লিখিয়াছেন, একদা বহু সংখ্য বানর বন হইতে বহির্গত হইয়া সদলে মাসিদনীয় সৈন্যের সম্মুখভাগে দণ্ডায়মান হয়। যুদ্ধসজ্জিত শত্রুসম্মুখীন সৈন্যের অবস্থানের সহিত তাহাদিগের অবস্থানের অনুমাত্র বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় নাই। ইহাতে মাসিদনীয় সৈন্যের এরূপ মতিভ্রম হয় যে, তাহারা প্রকৃত শত্রুসেনা ভাবিয়া এই দলবদ্ধ বানরদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যোগ করে।

* মনিয়ার উইলিয়েম্‌স্ রামায়ণ ও

২। রামায়ণের প্রথম প্রণয়ন সময় ব্রাহ্মণ্যকালের ন্যায় বৌদ্ধকালেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। রামায়ণের স্থলবিশেষে বুদ্ধের বিষয় উল্লিখিত আছে বটে, কিন্তু উহা মূল গ্রন্থের অন্তর্গত নয়। সময়ান্তরে উক্ত বিষয় রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার হয়। সুতরাং রামায়ণ এই সময়ের অপেক্ষাও প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

৩। মহারাজ অশোকের খোদিত লিপি পাঠে স্পষ্ট অবগত হওয়া গিয়াছে, খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতবর্ষের সাধারণ লোকের ভাষা অমিশ্র সংস্কৃত ছিল না; তখনকার ভাষা বিমিশ্র সংস্কৃতের প্রকার ভেদমাত্র। সচরাচর এই ভাষা "প্রাকৃত" সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। রামায়ণে এই প্রাকৃতের লেশমাত্রও দৃষ্ট হয় না। যদি রামায়ণ তৃতীয় শতাব্দীতে বিরচিত হইত, তাহা হইলে অবশ্যই উহাতে সংস্কৃত নাটকাদির ন্যায় কোন প্রকার প্রাকৃতের সংস্রব থাকিত। কিন্তু রামায়ণ সরল, সহজবোধ্য ও পরিশুদ্ধ সংস্কৃতে লিখিত। ইহাতে কোন প্রকার কষ্টকল্পনা অথবা কাঠিন্যের চিহ্ন নাই। ইহাতে প্রতীত হইতেছে, সাধারণের ভাষা প্রাকৃতে পরিণত হইবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষের প্রায় সকলেই সরল সংস্কৃত বুঝিতে পারিত। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রায় পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতবর্ষের সাধারণের এইরূপ সংস্কৃত ভাষায় অধিকার ছিল।

৪। রামায়ণের বিবরণ পাঠে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়, দাক্ষিণাত্য ও তাহার দক্ষিণ পশ্চিমবর্ত্তী প্রদেশে আর্য্যগণের অধিবাস ছিল না। সুতরাং রামায়ণ যখন প্রণীত হয়, তখন উক্ত প্রদেশে আর্য্যসন্ততির উপনিবেশ স্থাপিত হয় নাই। কিন্তু অশোকের অনুশাসন লিপি অনুসারে বোধ হয়, খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে মগধের আধিপত্য ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছিল। পঞ্জাব, দিল্লী, কটক এবং গুজরাটে মগধসাম্রাজ্যের খোদিত লিপি সমূহ পাওয়া গিয়াছে। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর বহুপূর্ব্বে রামায়ণ প্রণীত হইয়াছে।

৫। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর ডিওনক্রিসস্তোমস্ নামক জনৈক গ্রীক লেখক উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাঁহার সময়ে হিন্দুদিগের বিস্তৃত মহাকাব্যের বিবরণ বর্ত্তমান ছিল। এই বিবরণ হোমারের ইলিয়াদ হইতে লিখিত অথবা অনুবাদিত হইয়াছিল। অধ্যাপক লাসেন্স প্রমাণ করিয়াছেন যে, ডিওনক্রিসস্তোমস্ মেগাস্থিনিসের লিখিত বিবরণ অবলম্বন করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন। মেগাস্থিনিস্ সুপ্রসিদ্ধ চন্দ্রগুপ্তের

মহাভারত উভয়ই এক প্রস্তাবে নিবদ্ধ করিয়া ইলিয়াদ ও ওদিসির সহিত তাহার তুলনা ও সমালোচন করিয়াছেন। আমরা বর্ণনীয় প্রবন্ধের অনুরোধে রামায়ণ হইতে মহাভারত বিযুক্ত করিয়া লইলাম।

সভায় অনেক কাল ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষে খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় অথবা চতুর্থ শতাব্দীতে ইনিয়াদের সদৃশ কাব্য বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু হিন্দুগণ যে এবিষয়ে হোমার হইতে কোন ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন, মেগাস্থিনিসের এই বিবরণে তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় না।

মণিয়ার উইলিয়েম্‌স্ এই পাঁচটী যুক্তি দেখাইয়া স্থির করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সময়ের পূর্ব্বে খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে রামায়ণ প্রথম প্রণীত হয়। প্রথম অবস্থায় রামায়ণের যে সমস্ত প্রণেতা ছিলেন,তাঁহাদিগের নাম এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে। এটি না হইলে বাল্মীকিকেই প্রণেতা বলা উচিত। কিন্তু মণিয়ার মতে বাল্মীকি কখনই সমস্ত গ্রন্থের প্রণেতা নহেন।

ভারতবর্ষের যে অংশ কোশল নামে অভিহিত হইত, মণিয়ার উইলিয়েম্‌সের অনুমান অনুসারে বাল্মীকি সেই অংশে জন্ম পরিগ্রহ করেন। কোশলরাজ্যের প্রধান নগর অযোধ্যা। সূর্য্যবংশপ্রভব মহারাজ দশরথ এই স্থানে রাজত্ব করিতেন। এই কোশল রাজ্যের নিকটেই রাজর্ষি জনকাধিষ্ঠীত বিদেহ রাজ্য অবস্থিত। বাল্মীকি কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের মতানুবর্ত্তী ছিলেন। রামায়ণঘটিত গল্পও তৈত্তিরীয়ক সমূহের মধ্যে যত্নপূর্ব্বক সংরক্ষিত ছিল। কলিকাতা রিভিউতে (১) কষ্ট্ সাহেব লিখিয়াছেন বাল্মীকি গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থল এলাহাবাদের নিকটে যমুনাতটে অবস্থিতি করিতেন। কিম্বদন্তী অনুসারে বুন্দেলখণ্ডস্থ বান্দা বিভাগের একটি পাহাড়ও তাঁহার আবাসস্থান বলিয়া নিরূপিত হইয়া থাকে। অনেকে স্থির করিয়াছেন, বাল্মীকি জীবনের প্রথমাবস্থায় ক্রূরকর্ম্মা দস্যু ছিলেন, পরিশেষে আপনার পাপকার্য্যে অনুতপ্ত হইয়া এই বান্দা বিভাগের পাহাড়ে মুনিবৃত্তি অবলম্বন করেন। এই স্থানেই রামপরিত্যক্ত সীতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সীতা বাল্মীকির আশ্রমে অবস্থিতি করিয়া কুমারযুগল প্রসব করেন। বাল্মীকি এই কুমারদ্বয়কে স্বপ্রণীত রামচরিত শিক্ষা দেন। কষ্ট্ সাহেবের মতে বাল্মীকি রামের সমকালবর্ত্তী নহেন।

রামায়ণের গল্প নিতান্ত হৃদয়াকর্ষক এবং লোকপ্রসিদ্ধ ঘটনা অবলম্বনে বিরচিত। ইহা অতি বিস্তৃত, দোসরহিত ও বক্তব্য বিষয়ে সংযত। ইহার গল্পাংশ পরস্পরের সহিত সমঞ্জসীভূত। ইহার ভাষা সরল সুখবোধ্য ও সর্ব্বপ্রকার কাঠিন্য বিবর্জ্জিত। এই সমস্ত গুণ থাকাতে রামায়ণ সহজেই মনে রাখিতে পারা যায়। স্মৃতির এইরূপ অনুকূলতার জন্য রামায়ণ যখন শেষাবস্থায় স্থাপিত হয়, তখনও ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানে মুখে মুখে কীর্ত্তিত হইত। রামায়ণ প্রায় অনুষ্টুভ্ ছন্দে বিরচিত। এইক্ষণে যে রামায়ণ লোকসমাজে প্রচলিত আছে তাহাতে প্রায় ২৪ সহস্র শ্লোক দৃষ্ট হয়।

1 Calcutta Review XLV.

মণিয়ার উইলিয়েম্‌সের মতে রামায়ণের দ্বিতীয় অবস্থার সময় খ্রীঃ পুঃ তৃতীয় শতাব্দী। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে রামায়ণ প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে সংগৃহীত ও সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই ব্রাহ্মণ্যসাময়িক রামায়ণই এক্ষণে সর্ব্বত্র প্রচলিত।

রামায়ণের সহিত ইলিয়াদের অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। বাল্মীকি ও হোমার উভয়েই সুনিপুণ চিত্রকরের ন্যায় ঘটনাপট চিত্র করিতে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। পরন্তু রামায়ণের সহিত ইলিয়াদের সাদৃশ্য থাকিলেও বিষয় বিশেষে পরস্পরের সহিত পরস্পরের বহু বিভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। যদিও উভয়ে আর্য্যজাতীয়, তথাপি দেশ কালাদির দূরতা অনুসারে আচার ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে উভয়ের কাব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। যাহা হউক, মানবজীবনের প্রকৃত চিত্র অঙ্কণে ও প্রাচীন সময়ের ব্যবহার বর্ণনায় রামায়ণ হোমারের কাব্য অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। রামায়ণ প্রাচ্যদেশ-পরিদৃষ্ট অমানুষী কল্পনায় পরিপূর্ণ, ইলিয়াদ সরল মানবী ঘটনায় সংযত। সুতরাং যেস্থানে ইউরোপীয় প্রকৃতি অল্প বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকিত, সেস্থলে ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি কঠোর অত্যুক্তির পরিচয় দিয়া কল্পনাসামর্থ্য প্রকাশ করিত।

এই কারণে সময়, স্থান ও কার্য্য অংশে ইলিয়াদ অতি অপ্রশস্ত সীমায় সঙ্কুচিত; কিন্তু রামায়ণে ইহাদিগের ক্ষেত্র অসীম। এক একটি চরিত্রের অঙ্কণ বিষয়ে রামায়ণ ওদিসির সহিত তুলনীয় হইতে পারে, কিন্তু গল্পসংযোজন ও রচনাসারল্য প্রভৃতিতে রামায়ণ ইলিয়াদের তুল্য লক্ষণাক্রান্ত। রামায়ণে যে সমস্ত হৃদয়গ্রাহিণী বর্ণনা আছে, হোমারের কাব্য কোন অংশেই তাহার গুণাতিক্রমী হইতে পারে না। ভাবের সরলতা ও সুপরিচ্ছন্নতা এবং রচনার গাম্ভীর্য্য ও পরিপুষ্টি বিষয়ে রামায়ণ ইলিয়াদ অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু রামায়ণ প্রাচ্যদেশপ্রসিদ্ধ রূপক, উপমা প্রভৃতিতে ভারাক্রান্ত। এইরূপ অলঙ্কারপ্রিয়তা অনেক সময়ে উদ্দীপনার ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকে।

হিন্দু মহাকাব্যের প্রায় সমস্ত উপমাই আসিয়াজাত জন্তু অথবা বৃক্ষ লতা প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থ বিশেষ হইতে আহৃত। পরন্তু স্বাভাবিক দৃশ্যের বর্ণনাস্থলে হিন্দুকবিগণ স্বীয় রচনা যেরূপ আলেখ্যবৎ রমণীয়তা ও স্বভাবোক্তিতে পরিশোভিত করিয়াছেন, গ্রীক অথবা লাতিন কবিগণ সেরূপ করিতে পারেন নাই। প্রাচ্যদেশের বহিঃপ্রকৃতি নিতান্ত রমণীয়; ফল-পুষ্প-সুশোভিত-বৃক্ষাবলী, উজ্জ্বল আকাশ, নবীকৃত বর্ষাকাল, প্রচণ্ড ঝটিকা, সুস্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণ প্রভৃতিতে প্রাচ্যভূমির যে অপরূপ শোভা হয়, তাহা ইউরোপীয় দিগের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয় না। এই কারণে তাঁহারা অনেক স্থলেই স্বভাব

বর্ণনে হিন্দুদিগের পশ্চাতে পড়িয়া থাকেন। আচার ব্যবহারের বিষয় বিবেচনা করিলেও রামায়ণ অপেক্ষা হোমারের কাব্য উচ্চসভ্যতার পরিচয়স্থল নহে। যদিও রামায়ণের যুদ্ধক্ষেত্র ও অস্ত্রাদি প্রয়োগ নিতান্ত অত্যুক্তি এবং অমানুষী বিষয়ে পরিপূর্ণ, তথাপি তৎসমুদয়ে অসভ্যতা বা নির্দ্দয়তার লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। হেকৃতরের প্রতি একিলিসের ব্যবহারের সহিত রাবণের প্রতি রামের ব্যবহারের তুলনা করিলেই এবিষয়টি পরিস্ফুট হইবে। একিলিশ্ পতিতশত্রুর প্রতি নির্দ্দয়তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন; রাম পতিত শত্রুর প্রতি সৌজন্যের একশেষ দেখাইয়াছেন। এইরূপ উদারতাগুণে রামায়ণ, ইলিয়াদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সুখ সমৃদ্ধির বর্ণনাতে রামায়ণ ইলিয়াদের নিম্ন গণ্য নয়। বাল্মীকির অযোধ্যা ও লঙ্কা হোমারের স্পার্টা ও টয় অপেক্ষা অনেক অংশে ভোগবিলাস এবং সৌভাগ্যসম্পদের বিলাস ক্ষেত্র।

অনেক অবান্তর গল্প বর্ত্তমান থাকাতে রামায়ণের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়ে ধারাবাহিকত্বের অভাব দৃষ্ট হয়। এটি হিন্দু মহাকাব্যের একটি প্রধান বিঘ্ন এবং ইহাই কাব্যান্তরের সহিত তারতম্য করিবার একটি বিশেষ লক্ষণ। এঅংশে ইলিয়াদ যদিও সমালোচকগণকৃত দোষারোপ হইতে বিমুক্ত নহে তথাপি উহা রামায়ণ অপেক্ষা অনেকাংশে মার্জ্জনীয়। অনেকে বিশ্বাস করেন, ইলিয়াদ বিভিন্নস্থান-প্রচলিত একবিষয়ক গীতি-কবিতার সংগ্রহ মাত্র। এই সংগ্রহে পরিশেষে মহাভারতের ন্যায় অন্যান্য কবিতা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। গ্রীক সংযোজনী শক্তি এইরূপ বিভিন্ন অংশ ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক প্রক্ষেপ সমুহকে এক সূত্রে গ্রন্থণ করিয়া একাবয়বী করিয়া তুলিয়াছে। ইলিয়াদের স্থলবিশেষে গল্পান্তর দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহা ভারতীয় কাব্যগত অবান্তর গল্পের ন্যায় অতি বিস্তৃত ও বর্ণনীয় বিষয়ের বাধাজনক নহে। যদিও এ গুলি মহাকাব্যের সমাপ্তি পক্ষে অবশ্যপ্রযোজ্য নহে, তথাপি একবার দেখিলেই বোধ হয় যেন উহা প্রধান গল্পগত বিষয়ের সহিত আপনা হইতেই উত্থিত হইয়াছে। এতন্নিবন্ধন হোমারের অবান্তর গল্পের সহিত প্রধান গল্পের বিশেষ অনৈক্য দৃষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে প্রাচ্য লেখক ও কথকগণোক্ত গল্পের ধারাবাহিকত্ব অনেক স্থলেই ব্যাহত হইয়া থাকে। এই সম্প্রদায় পরস্পর সংস্রবশূন্য ভিন্ন ভিন্ন গল্প সমুহ এক সূত্রে গাঁথিতে সুখ বোধ করেন, এবং ইচ্ছানুসারে প্রত্যেকটিরই সমাপ্তি ভঙ্গ করিয়া থাকেন। এইরূপে একটি গল্প শেষ না হইতেই অন্য একটি গল্পের আরম্ভ হয়, এবং এই আরব্ধটি সমাপ্ত না হইতেই আর একটি তাহার সহিত সংযোজিত হইয়া থাকে। এইরূপে গল্প রাশির শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইয়া বর্ণনীয়

বিষয়টিকে সমাচ্ছন্ন করিয়া তুলে। ইহার দৃষ্টান্ত স্থলে হিতোপদেশ ও আরব্যোপন্যাসের উল্লেখ করা যাইতে পারে। যে অবান্তর গল্পপ্রিয়তা হিতোপদেশ ও আরব্যোপন্যাসের গ্রন্থনে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই রামায়ণের রচনায় পরিস্ফুট হয়। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারতেই এই অবান্তর গল্পের আধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ

দেবোপাখ্যান।

(গ্রীস ও ভারতবর্ষ)

অষ্টম প্রস্তাব।

কিয়ুপিড্, এফ্রোডাইট্, চেরিটেস্

কাম, রতি, ষষ্ঠি।

পূর্ব্ববর্ত্তী প্রস্তাব সকলে যে সমস্ত দেব দেবীর তুলনা করা গিয়াছে, উভয় দেশীয় দেবোপাখ্যানেই তাঁহাদের রূপবর্ণনা আছে। কিন্তু কাম ও রতির আকৃতি ও স্বরূপ যথাযথ বর্ণন করিতে কেহই প্রয়াস পান নাই—যাঁহারা পাইয়াছেন তাঁহারাও অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন লেখকের হস্তে পড়িয়া তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর কবিগণ কএকটি মাত্র পেনসিলের চিহ্ন স্থাপন করিয়া দিয়া, সেই চিহ্ন অবলম্বনে রং ফলাইয়া সমগ্র দেহকে সুঠাম এবং সুসজ্জিত করিবার ভার পশ্চাদ্বর্ত্তী কবি এবং ভাবুকদিগের স্ব স্ব রুচি এবং অভিপ্রায়ের উপর রাখিয়া দিয়াছেন। যে বিষয়ে ব্যাস, বাল্মীকি, মাঘ, ভারবি, কালিদাস, ভবভূতি, সেক্সপিয়ার, মিল্টন হস্তার্পণ করিতে অসমর্থ অথবা অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড উলটিয়া গেলেও কি তাহা অন্যের সাধ্যায়ত্ত হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে? হোমার বর্জ্জিল, ডান্টি যাহাতে অকৃতকার্য্য তাহাতেই বা কে হস্তার্পণ করিবে? এজন্যই তাঁহাদের স্বরূপ বর্ণনা সাধ্যাতীত।

সংস্কৃত কবি কারণ বুঝিয়াই, মদনকে অনঙ্গ, অতনু, অশরীর, মনসিজ প্রভৃতি নিরাকারসূচক নাম প্রদান করিয়াছেন। তিনি বিবেচনা করিয়াই মহাদেবের কোপানলে কামকে দগ্ধ করিয়া নাম গুলির

সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। নিরাকার মনে ধারনা করা যায় না, সুতরাং কামনা বা বাসনা সমস্টি জগতের সকল সৌন্দর্য্য, সকল কোমলতা সহ মিলিত করিয়া শিব-পার্ব্বতীর বিবাহ সময় কামকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছেন। যে সকলকে অহোরাত্র দগ্ধ করে তাহাকে দগ্ধ করিয়া ঈশ্বরের শক্তিমত্তাও প্রমাণ করিয়াছেন।

সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন এবং স্তম্ভন এই পাঁচটি কামের পঞ্চশর। আবার তাঁহার ধনু পুষ্পময়, তিনি পুষ্পধনু, নবচূতাঙ্কুর সেই ধনুর নায়ক। বসন্ত তাহার চিরসহচর এবং হৃদয়সখা। তিনি 'ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে, মধুকর নিকর করম্বিত কোকিল কুজিত কুঞ্জ কুটীরে' বাস করেন। তরুরাজি যখন নবপল্লবে সুশোভিত হয়; প্রকৃতি নাতিশীতোষ্ণ ভাব ধারণ করেন; বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র সকল নবোপ্ত সবুজশস্যে মণ্ডিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে; যখন কুজ্ঝটিকাবিনির্ম্মুক্ত নীল নভোমণ্ডল শশীনক্ষত্রের বিমল কৌমুদীতে পরমরমনীয় হইয়া উঠে; পরম প্রীতিপ্রদ নিকুঞ্জবনে বিবিধ পাদপ সমূহ পুষ্পিত ও মুকুলিত হইয়া সুষমা বিস্তার করে, অশোক কিংশুক কেশরাদি কুসুম সকল মলয় সমীরণে ঈষদান্দোলিত হইয়া সুবাস বিস্তার করে; ব্রততী সকল উজ্জ্বল পীতবর্ণে রঞ্জিত হইয়া কান্তকণ্ঠবিন্যস্ত ললনার ক্ষীণা বাহুবল্লীর ন্যায় আশ্রয়বৃক্ষ অবলম্বন করে; যখন কোকিলকুজনে সমস্ত স্থলে অমৃত বর্ষণ করিতে থাকে এবং 'নন্দা ও হর্ষ' 'শম ও প্রাপ্তি' সহ বিরাজ করিতে আরম্ভ করে তখন জগতে মদনের আবির্ভাব। যেমন কোন দেশের আভ্যন্তরিক দুর্ব্বলতা বুঝিবা মাত্রই সতর্ক বিদেশীয় ভূপতি আপন অধিকার বিস্তার করিতে লোলুপ হইয়া অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করেন, সেই রূপ জীবগণের হৃদয়-রাজ্য বিলাস বাসনায় দুর্ব্বল হইয়াছে দেখিবা মাত্রই বিশ্ববিজয়ী অনঙ্গদেব আপন অধিকার বিস্তার করিয়া বসেন। অপধৃষ্য শুক্রশিষ্যও তাঁহার অধিকার বহির্ভূত হইতে পারেন না। মনুষ্যের ত কথাই নাই দেবগণও তাঁহার অধীন।—

কামপরমবশং নবিপ্রকুর্য্যু
র্বিভুমপিযদমীপ্সি়তভাবাঃ।

কাম মনসিজ, কারণ বাসনা মনেই উৎপন্ন। বাসনার প্রাবল্যে চিত্তের বিবেক শক্তি থাকে না, ভ্রান্তি আসিয়া সকল আলোড়িত করিয়া ফেলে, সুতরাং মদনের শর সম্মোহন, উন্মাদ। লৌহাদি উপাদানে নির্ম্মিত শায়কে শরীর বিদীর্ণ করিতে পারে, কিন্তু মনের কিছুই করিতে পারে না। মদনশর হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দৃঢ় বিদ্ধ করে। তাঁহার সন্ধান অব্যর্থ।

প্রকৃতিতে যেখানে যাহা সুন্দর আছে একত্র কর, যেখানে কোমলতা পাও তাহাতে আনিয়া সংযুক্ত কর, কল্পনাতে মনে উপযুক্ত রূপ অবয়ব গঠিত এবং যথা

যথ রঞ্জিত কর মন্মসিজের মনোমোহিনী মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে। সে এত সুন্দর, তাহাতে মার্দ্দব এত অধিক যে কুসুমসুবাসবাহী মলয়মারুতের সুমন্দহিল্লোলও তাহাতে সহ্য হয় না। আবার আক্রমণ এত ভয়ানক যে দেবমানব কাহারও নিষ্কৃতি নাই।

পৃথিবীতে চিরবসন্ত থাকে না, সখা ব্যতীতও কামদেব একাকী থাকিতে ভাল বাসেন না। সুতরাং চিরবসন্তবিরাজিত বাসবপ্রভুনিকেতন অমরাবতীতে, পারিজাতসুবাসিত, অপ্সরা ও বিদ্যাধরী পরিবৃত নন্দন কাননে সখাসহ মনের আহ্লাদে অনঙ্গদেব বাস করেন। আবার নিমেষ মাত্রে সমস্ত জগৎ পরিভ্রমণ করিয়া একবার সকলের হৃদয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আইসেন।

গ্রীসের কিয়ুপিড্ অন্যান্য দেবগণের ন্যায় আকৃতিতে মনুষ্য। তিনি অন্ধ, অল্পবয়স্ক বালক। আবার কেহ কেহ এরূপ বলেন তাঁহার একটি মাত্র চক্ষু। তাঁহার পৃষ্ঠে তূণ, হস্তে ধনু। তিনি এবিষয়ে কামের অনুরূপ। তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত ও নিষ্ঠুরবৎ। হাসিতে হাসিতে একবার এদিক, একবার ওদিক যাইতেছেন আর সুযোগ বুঝিয়া অতর্কিতভাবে, স্বয়ং অলক্ষ্য থাকিয়া, অসতর্ক দেবদেবী মানবমানবী-হৃদয়ে দৃঢ়তর শর সন্ধান করিতেছেন। প্রণয় ভাল মন্দ বুঝে না, সুন্দর কুৎসিত বিবেচনা করে না সুতরাং ভিনস্‌-হৃদয়বিহারী প্রণয়রূপী কিয়ুপিড্ অন্ধ। আবার প্রণয় অকারণে ব্যক্তিবিশেষের পক্ষপাতী, সুতরাং কিয়ুপিড্ এক চক্ষুহীন।

আর্য্যকবি বলেন অন্য কোন চক্ষু দ্বারা যাহা দেখা যায় না, অথবা দেখাগেলে ভ্রমান্ধতা প্রযুক্ত যাহা বুঝিতে পারা যায় না, প্রণয়চক্ষে তাহা দেখা যায় এবং বুঝা যায়। প্রণয়নেত্রে অলৌকিক জ্যোতি, অলৌকিক ক্ষমতা। প্রণয়চক্ষু দিব্যচক্ষু। সুতরাং মদনের নয়ন সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্বী

এই দুইটি মতের কোনটি উত্তম তাহা সদ্বিবেচকের বিবেচনার উপর নির্ভর করে। এবিষয়ে কবির কল্পনা দুইদেশে দুইরূপ সৌন্দর্য্য বিকাশ করিতেছে। বাস্তব, সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় সৌন্দর্য্য ও বাসনা প্রায় একত্র চলে। সুন্দরতাকে অন্ধ করিয়া সৌন্দর্য্যের অবমাননা এই জন্যই আর্য্যকবি উপযুক্ত বোধ করেন নাই

রতি ও ভিনসের স্বরূপ বর্ণন করা আরও কঠিন। উভয়েই রূপ এবং প্রণয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। যাঁহার ইচ্ছারূপ উৎস হইতে সৌন্দর্য্য উচ্ছসিত হইয়া সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত করে; যিনি তরু, লতা, ফুল, ফল, পত্র, পল্লব, এবং শ্যামল দূর্ব্বাদল প্রভৃতিকে স্তরে স্তরে মনোহর বেশে সাজাইয়া রাখেন; যিনি বালকের প্রাতঃসূর্য্যসদৃশ প্রফুল্ল বদন, এবং যুবক যুবতীর বিলাসপরিপূর্ণ রূপরাশি বিকশিত করেন; যিনি চন্দ্রের কৌমুদী, সূর্য্যের রশ্মি এবং

নক্ষত্রের শোভাকে প্রাণারাম এবং মনোমদ করেন তাঁহার সৌন্দর্য্য কেমন করিয়া কল্পনার বিষয়ীভূত হইবে ! এখানে কবি হার মানেন, বিজ্ঞান বিবশ হন, গণিতশাস্ত্র বসিতেও আসন পান না। ন্যায়শাস্ত্রের কূট প্রশ্ন যাঁহার মর্ম্মোদ্ধারে অসমর্থ, যাঁহার প্রকৃতিনির্ণয়ে দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন পরমপুরুষ দেবগণও অসমর্থ, তাঁহার প্রকৃতি কিরূপে নির্ণীত হইবে ? তিনি সমস্ত জগতের সৌন্দর্য্যসমষ্টি। ঝটিকান্দোলিত, উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল মহাসাগরের অনন্তজলরাশিতে অথবা ললিত-লবঙ্গলতা-পরিবৃত নিকুঞ্জবন-বিহারিণী ক্ষুদ্র কল্লোলিনীর মন্দ প্রবাহে ; হিমাচলের তুষারমণ্ডিত গম্ভীরাকৃতি শীর্ষদেশে অথবা হরিৎ-শস্যশোভিত শমতল ক্ষেত্রে ; পূর্ণায়ত রামধনুতে কিংবা কদলী, কেতকী, গুবাকগর্ভপত্রে,অর্দ্ধপক্ক পনস বা কুরুবক পত্রে ; যোগীর যোগাবাস গিরিগহ্বর-মধ্যবর্ত্তী শূন্য প্রদেশের আলোক ও অন্ধকারের মিশ্রণোৎপন্ন গম্ভীর অথচ রমণীয় দৃশ্যে ; কৌমুদীস্নাত নবদূর্ব্বাদলে, প্রখররবিকীরণোদ্দীপ্ত মরুভূমি মধ্যস্থিত ওয়েসিসে এবং ঘনঘটাচ্ছন্ন বিদ্যুন্মালায় যে সৌন্দর্য্য,রতি ও ভিনসে তাহার সকলই আছে। তাঁহাদের রূপে মানিনীর মলিন অথচ প্রণয়পূর্ণ মুখচ্ছবি এবং বর্ষাকালের পূর্ণায়ত নদীর অথবা পুত্রক্রোড়ে পুত্রবতীর শোভা বিরাজ করে। সেতার ও এস্রাজের সুমধুর বাদ্য, কোকিলের কলকণ্ঠ, ললনার মধুর প্রণয়াভিবাদন, শিশুর আধ আধ মধুরকথা সকল, এবং যোগ্য পুত্রের বৃদ্ধ জনকের প্রতি আশ্বাস বাক্যে যে মধুরতা উৎপাদন করে তাঁহাদের মধ্যে সে সমস্তই আছে। গ্রীষ্মের মৃদুমন্দ মারুতহিল্লোল, বর্ষার দূরবর্ত্তী মেঘরব ও বারিসিক্ত পাখীর ধ্বনি, শরতের ফলপূর্ণ বৃক্ষ, হেমন্তের শস্যশোভা, শীতের সুখশয্যা ও বসন্তের পুষ্পসুষমা অন্তঃকরণে যে সুখ উৎপাদন করিতে পারে, ভিনস্ ও রতির অনবদ্য সৌন্দর্য্যে সেই সুখ উৎপাদন করে। কি ভয়ঙ্করে, কি মনোহরে, কি মধ্যবর্ত্তী মিশ্রণোৎপন্ন অবস্থায়, যেখানে যাহা কিছু সুন্দর দেখ তাহার সকল গুলিই এফ্রোডাইটে এবং রতিতে পাইবে। জ্যোতির্ব্বিদের গ্রহনক্ষত্রবিন্যস্ত চক্ষু যে সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় অথবা বিলাসীর রসালস চক্ষে যে কোমলতা আবিষ্কার করে তাহার সকলই একাধারে বিরাজ করে। সেই রূপ-সমুদ্রের এক বিন্দু একবার পতিবিরহবিধুরা ললনার নিদ্রিত নয়নসমক্ষে প্রাণকান্তের সহাস্য প্রেমপূর্ণ মুখচ্ছবি আনয়ন করিতেছে, আবার বৈজ্ঞানিক সমক্ষে সমস্ত জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, প্রলয়রূপে উপস্থিত হইয়া অন্য একপ্রকারের শোভা ধারণ করিতেছে।

ভিনস্ ও রতি উভয়েই এরূপ সুন্দরী যে, তাঁহারা সমস্ত জগতের সৌন্দর্য্যের উপমাস্থল। যে অত্যন্ত সুন্দরী সে রতি বা এফ্রোডাইটি,

তাঁহাদিগকে কাহার সহিত তুলনা করিব? তাঁহারা "অনির্ব্বাচ্যা নিরুপমা, আপনি আপনা সমা"। এতদ্ব্যতীত আর কি বলিব?

এক রূপ বলিতেই অস্থির,—চতুর্দ্দিকে যাহা কিছু সুন্দর দেখিয়াছি একত্র করিতে ত্রুটি করি নাই—ভালবাসা কেমনে প্রকাশ হইবে? হৃদয়ের যে নিগূঢ় ভাব কিছুতেই প্রকাশ হইবার নয়, যাহার প্রকৃত অবস্থান মাত্র কবির কল্পনায়, তাহা কিরূপে প্রকাশ হইবে। যিনি এক দিনের জন্যও নিঃস্বার্থ ভাল বাসিয়াছেন, যিনি মুহূর্ত্তজন্যও আত্মসুখ, আত্মজীবন অন্যের জন্য উৎসর্গ করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন অন্য কেহই প্রণয়ের সত্ত্বা ও স্বরূপ বুঝিবেন না। যিনি প্রকৃত প্রণয়াধার, তিনি আপন হৃদয় পর্য্যবেক্ষণ করিলেই বুঝিবেন, রতি ও ভিনস্ যে প্রণয়-উপাদানে নির্ম্মিত তাহার এক কণামাত্র, এক পরমাণু প্রমাণ পদার্থ তাঁহাতে আছে বলিয়াই তিনি অন্যগতপ্রাণ। যে হৃদয় সম্পুর্ণ সেই উপাদানে নির্ম্মিত তাহাতে কত সুখ ও কত দুঃখ। অনলের স্ফুলিঙ্গ মাত্রে সমস্ত দগ্ধ করে, কিন্তু অনল স্বয়ং জ্বলে না। কারণ অনল অচেতন পদার্থ। কিন্তু যে অনলে অমৃতাভিষেক এবং দাহ্য গুণ একত্র অবস্থান করে সজীব হৃদয়ে সেই অনল জ্বলিয়া উঠিলে কত সুখ ও কত দুঃখ।

ভিনস্ ও রতি একই প্রকার, রূপে ও গুণে উভয়েই অতুল্যা। তবে কি তাঁহাদের কোন প্রভেদ নাই? অবশ্যই আছে। দুই কখনও এক হইতে পারে না। যাহা অনেকাংশে একরূপ তাহারও কিছু না কিছু প্রভেদ থাকে। যদি প্রভেদ থাকিল তুলনায় কে শ্রেষ্ঠা দেখা যাউক।

ভিনস্ বসন্তের কুসুমরেণু,—কুসুমসমষ্টির সৌন্দর্য্য,—সৃষ্টির সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুন্দর বস্তু, অতি সুগন্ধ, এবং দেখিতে যার পর নাই মনোহর, কিন্তু প্রত্যেক বায়ুতে কলঙ্কিত ও বিঘটিত এবং প্রতি প্রদোষে পর্য্যুসিত। রতি নক্ষত্রের বিমল জ্যোতি, শরৎ শশীর কৌমুদী ছটা,—উচ্চতমা, পরম পবিত্রা এবং নয়ন ও মনের তৃপ্তি সাধিনী। ভিনস্ও রতি, রতিও রতি; কিন্তু রতির সতে আশক্তি, ভিনসের সদসৎ সকলেই আশক্তি। রতি পতিব্রতা সতী, ভিনস্ পরস্পৃহা বতী। রতি গৌরবিনী, ভিনস্ কলঙ্কিনী।

হরকোপানলে মদন ভস্মাবশেষ হইলেন। রতি দেখিলেন তাঁহার জীবনে প্রয়োজন কি? বিলম্বে পাপ হইতেছে। অতএব সমস্ত জগৎকে বুঝাইলেন, অগ্নি প্রবেশ করিয়া শীঘ্র স্বামী সন্নিধানে গমন করা কর্ত্তব্য, স্ত্রীর স্বতন্ত্র জীবন ও অবস্থান সম্ভবে না।

"শশিনাসহ যাতি কৌমুদী
সহ মেঘেন তড়িৎ প্রলীয়তে।
প্রমদাঃ পতিবর্ত্মগা ইতি
প্রতিপন্নংহিবিচেতনৈরপি।"

তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন যে

স্বামী বিনা স্ত্রীর জীবন দীপশূন্য দশার ন্যায় নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ও অকিঞ্চিৎকর। আশ্রয় বৃক্ষের পতনে আশ্রিতা লতার অন্য গতি নাই। অতএব স্বামীসখা বসন্তের নিকট বলিলেন।

" গত এব নতে নিবর্ত্ততে
সসখা দীপইবানিলাহতঃ।
অহমস্য দশেব পশ্যমা
মবিসহ্য ব্যসনেন ধূমিতাম্॥
বিধিনা কৃতমর্দ্ধবৈশসম্
ননুমাং কামবধে বিমুঞ্চতা
অনপায়িনি সংশ্রয় দ্রুমে
গজভগ্নে পতনায় বল্লরী।"

ভিনসের কুকর্ম্মা কলুষিত আত্মায় এরূপ ভাব কখনও উদয় হয় নাই। তিনি স্বকীয় স্বামী বর্ত্তমানে, সেই নিরীহ প্রকৃতি ভদ্রলোক ভলকান্‌কে অবজ্ঞা ও অনাদর করিয়া দেব মানব মধ্যে যাহাকে যখন মনে হইত তাহাকেই পতিত্বে বরণ করিতেন। দেবসেনাপতি মার্চ এবং অজাত শ্মশ্রু অনাগতযৌবন এডনিসের সহিত তাঁহার গুপ্ত প্রণয়ের বর্ণনায় ইয়োরোপীয় সকল দেশের কাব্যই কলঙ্কিত। ভলকান্ যখন টের পাইতেন তখন ক্রোধে অধীর হইয়া ভিনস্‌কে প্রহার করিতেন। ভিনস্ অনেক সময় পলায়ণ করিয়া আত্মরক্ষা করিতেন। এত তাঁহার নিজের চরিত্র। জগতে যত দুষ্কর্ম্ম যত অত্যাচার সকলই ভিনস্ কর্ত্তৃক সংসাধিত। মেনিলসের হেলেন্ পারিস্‌কে দিয়া যে বিষম অনর্থ সংঘটন করিয়াছিলেন, তাহাতেই ট্রয় নগর ধ্বংস হইল, এগামেম্‌ননের পরিবারের শোচনীয় দুর্গতি হইল, এবং গ্রীস্ ও ট্রয়ের বীরকুল নির্ম্মূল হইল।

কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিলেই বুঝা যায় যে গ্রীক কবি প্রণয়কে স্বাধীন করিতে গিয়া, স্বাধীন মকরকেতুকে বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া এরূপ করিয়াছেন। যাহাকে ইংরেজীতে 'ফ্রিলভ্' অর্থাৎ স্বাধীন প্রণয় বলে তাহা গ্রীক কবির অনুমোদিত। কিন্তু আর্য্য কবির মত সেরূপ নহে। যেমন এক উৎসের জল চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইলে তাহার বেগ, গভীরতা, তরঙ্গ, তর্জ্জন কিছুই থাকে না, সেইরূপ হৃদয়ের তরলতা, প্রণয়ের উৎসের পবিত্রবারি এক স্রোতে প্রধাবিত না হইলে কখনই নিত্য, গম্ভীর, অবিরামবাহী এবং 'তটাভিঘাতী' হইতে পারে না। এমতটি যে কেবল যুক্তিদ্বারা সাধ্য এমন নয়; এটি নীতি শাস্ত্রের ভিত্তিভূমি। প্রণয় বিকৃত হইয়া উদ্ভ্রান্ত ও উন্মত্ত হইলেও আধার পরিবর্ত্তন করিতে পারে না, তাহা করিলে আর তখন ঐ নাম থাকে না। সে প্রণয়ের বিড়ম্বনা মাত্র। যদি ভালবাসা কবির কল্পনা মাত্র না হইয়া প্রকৃত কিছু থাকে তবে সে একের জন্য। প্রণয় 'একমেবাদ্বিতীয়ম্।' ভিনস্ ও রতিতে যে প্রভেদ তাহা প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে বলা বাহুল্য যে রতির শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে দ্বিরুক্তি করা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক হইবে।

চেরিটেস্ (গ্রোস্) সহ ষষ্ঠীদেবীর তুলনাবলে উভয়েই মাতৃস্বরূপা, হৃদয়ানন্দ বিধায়িনী। গ্রীক কবি যতটি দেবমূর্ত্তি ও প্রকৃতি কল্পনা করিয়াছেন চেরিটেস সর্ব্বাপেক্ষা মনোহারিনী হইয়াছে। কবির মনের গতি আর চিত্রকরের তুলি সকল সময়ে একরূপ থাকে না। মনের সুখের অবস্থায় যাহা কল্পনা করা যায় তাহা অপেক্ষাকৃত সুন্দর হয়। চেরিটেস্ সেই সুখের সময় কল্পিত হইয়াছিলেন সংশয় নাই।

ঐ দেখ পিতৃমাতৃহীন বালক বালিকা রোদন করিতে করিতে গমন করিতেছিল, মূর্ত্তিমতী করুণা, স্নেহময়ী জননী তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া দক্ষিণ হস্তে অভয় ও আহার দান করিতেছেন এবং বামহস্তে পরামর্শনে সকলের দুঃখ দূর ও শরীর শীতল করিতেছেন। কি মনোহারিনী মূর্ত্তি! যেন হিন্দুদিগের পাষানময়ী অথচ হৃদয়শীলা করুণাময়ী। তাঁহাকে মিয়ূজও বলে। নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দান, নিরন্নকে অন্ন বিতরণ এবং অশিক্ষিতকে শিক্ষিত করণ তাঁহার নিত্য কর্ম্ম।

আমাদের ষষ্ঠী দেবীও এই প্রকার হৃদয়ানন্দদায়িনী। শিশু মাতৃ অঙ্ক আঁধার করিয়া পরলোক গমন করিতেছে, মাতা ষষ্ঠী তাহাকে সাদরে ধূলাসহ অঙ্কে লইতেছেন—ঘৃণা নাই, অনাদর নাই; আর মিষ্ট বাক্যে বালককে বুঝাইয়া ও নানাপ্রকার আশ্বাস দিয়া পুত্রপ্রার্থিনী সমক্ষে পাঠাইতেছেন। নিঃসন্তান মলিনবদন ললনা মনের বেদনায় ক্রন্দনে চক্ষু ফুলাইতেছে, তাহার হৃদয়ে তনয়াভাবে গুরুতর আঘাত লাগিতেছে; যখন তাহার সমক্ষে অন্যের বালক তাহার আপন জননীকে মা মা বলিয়া আধ আধ সুমিষ্ট সম্বোধন করিয়া তাঁহার শ্রবণ যুগলে অমৃত বর্ষন করিতেছে, প্রবালবৎ অধর অৰ্দ্ধ বিস্তার করিয়া মুক্তাশুভ্র দশনজ্যোতি বিকাশ করিতেছে, এবং কচি কচি মুখ খানিতে মধুর হাসি হাসিতেছে তখন তাহার মনে সন্তানাভাবে কত কি লইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। এক একটি উষ্ণ নিঃশ্বাস নির্গত হইয়া নাসারন্ধ্র পুড়িয়া যাইতেছে, কোনটি বা অন্তর্গমী হইয়া হৃদয় স্তরে স্তরে দগ্ধ করিতেছে, এবং তাহার পুর্ণেন্দু সদৃশ বদন ম্লান করিতেছে। তখন ষষ্ঠীদেবী তাহার প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহার উচ্ছসিত শোকাবেগ প্রশমিত করণার্থ তাহার অঙ্ক নবকুমারে সুশোভিত করিতেছেন।

চেরিটেস্ তিনজন। পার্ব্বতী সহচরী জয়া বিজয়ার ন্যায় তাঁহারা ভিনস্‌সহচরী। সুতরাং জয়া বিজয়া যেমন পার্ব্বতীর অনুকরণ করেন, তাঁহারাও ভিনসের অনুকরণ করেন। গ্রীক কবি গোলাপে কণ্টক, পুষ্পমধুতে বিষ দেখিয়া চেরিটিগণকে ভিনস্‌সঙ্গিনী করিয়াছেন। তাঁহাদের আচরণ সম্বন্ধে কদর্য্য গাণ ও গল্পে দুগ্ধে গোমূত্র প্রক্ষেপ করিয়াছে।

ভারতের তৃতীয় শ্রেণীর অনেক দেব-

দেবীর কার্য্যের সহিত, চেরিটেস্‌দিগের কার্য্য ঐক্য হয় কিন্তু এসকল বিবৃত করিলে পাঠকদিগের বিরক্তি জনক হইবে ভয়ে বিরত রহিলাম। অতঃপর আর তুলনা করা নিষ্প্রয়োজন। যাহা হইয়াছে তাহাতেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইবে এমত ভরসা করা যাইতে পারে।

কি করি ?

কি করি ? জিজ্ঞাসি কারে,কে দিবে উত্তর ?
জাগ্রেতে নিশ্বাস সহ, বহে প্রশ্ন অহরহ,
অজ্ঞাতে, নিদ্রায় উঠি,—স্বপনে সিহরি,
শুনি সনিশ্বাস প্রশ্ন—"কি করি কি করি"?

২

কি করি ? ইহার হায় ! নাহি কি উত্তর ?
স্বর্গ, মর্ত্ত্য,ধরাতলে, পাতালে, জলধিজলে,
জিজ্ঞাসিনু একে একে, কেহ দয়া করি
দিল না উত্তর, তবে বল না কি করি ?

৩

নিষ্ঠুর নক্ষত্রলোক, নক্ষত্র আলোকে
সাজাইয়া নীলাম্বর, চন্দ্রমুখ মনোহর
বিকাশি নীরবে আহা ! রহিল চাহিয়া ;
কি করি কিছুত কই দিল না বলিয়া।

৪

ওই চন্দ্রমুখ আর সেই চন্দ্রমুখ !
ওই চন্দ্র শিলাময়, ওই চন্দ্রে বহ্নিচয়
জ্বলিতেছে, বহিতেছে স্রোতে নিরন্তর,
দূর হতে সেও যদি এত মনোহর !

৫

আমার সে পূর্ণচন্দ্র, অমৃত আধার,
অমৃত অধরে ভাসে, অমৃত নয়নে হাসে,
আমার সে পূর্ণচন্দ্র সুধার আকর,
আজি দুর হতে হায় ! কতই সুন্দর !

৬

কি করি ? নিষ্ঠুর স্বর্গ,—দিলনা উত্তর,
সুশ্যামাঙ্গ ধরাতল, খুলি নিজ বক্ষস্থল,
দেখাইল কত বন, ভীষণ প্রান্তর,
শ্বাসিল সমীরে দীর্ঘ—দিল না উত্তর।

৭

বসুন্ধরে ! যাহা ছিল রয়েছে তোমার,
তথাপি এদুঃখ তব, হয় যদি অনুভব,
আমার কুসুমবন, কণ্টক কানন,
হইয়াছে, মরুময় সুখের জীবন !

৮

কি করি, কেমনে সহি ? তুমি পারাবার
হায় ! তুমি মহাবাতে, ভীষণ তরঙ্গাঘাতে
গর্জ্জিতেছ মহামন্ত্রে বিদারি গগণ,
ক্ষুদ্র মানবের দুঃখ শুনিবে কখন ?

৯

হায় রে সসীম তুমি, তুমি, পারাবার!
অসীম মানব মন, করে যদি বিলোড়ন,
মানসিক ঝটিকায় নাহি তব জ্ঞান
কি ভীষণ দৃশ্য! সেই নির্ব্বাত তুফান!

১০

কাঁদি ভীমকণ্ঠে তুমি যাতনা তোমার
নিবারহে অম্বুনিধি; দারুণ সংসারবিধি,
নাহি দিবে সেই শান্তি আমারে কখন,
একই ভরসা মনে নীরব রোদন।

১১

বাসুকি পাতালে তুমি, সহস্র ফণায়,
ধরিয়াছ এক ধরা;—তুচ্ছভার বসুন্ধরা,
নিরাশ জীবন সঙ্গে তুলনা তাহার?
এক ক্ষুদ্র ধূলাসহ তুলনা ধরার।

১২

কাতর এ তুচ্ছভারে, দিলে না উত্তর?
শতদন্তে চিরি বুক, একাধারে কত দুখ—
চন্দ্রের আগ্নেয় গিরি, ধরার কানন,
সমুদ্র তরঙ্গ ভঙ্গ কর দরশন।

১৩

কিন্তু নাহি সহে আর, কি করি এখন,
কত কাল সয় বল, হায় এই তীব্রানল,
স্মৃতির সহস্র শিখা.—সংসার নির্দ্দয়,
কণ্টকিত, রক্তীকৃত করিবে হৃদয়?

১৪

অতৃপ্ত প্রেমের এই ঝটিকা সংগ্রাম
কতকাল সব আর, হায় এই গুরুভার—
নীরাশ জীবন ভার, কতকাল আর?
বহিতে হইবে দুঃখ অনন্ত, অপার!

১৫

বহি কারতরে বল? সে কি! কার তরে?
ওই আশা মৃদুস্বরে উত্তরিছে—"তার তরে,
যারে তুমি প্রেম, প্রাণ করেছ অর্পণ,
প্রতিদানে প্রেম, প্রাণ দিয়েছে যে জন।"

১৬

কিবা দান, প্রতিদান! কিবা বিনিময়,
হায় এই ধরাতলে; এই এক সুখ ফলে
যে দিয়েছে, যে পেয়েছে দুই পুণ্যবান,
কোথা স্বর্গ? তাহাদের স্বর্গ ধরাধাম!

১৭

হেন স্বর্গ ফলিয়াছে অদৃষ্টে আমার,
যা দিয়াছি অতি ক্ষুদ্র,যা পেয়েছি সে সমুদ্র,
দিয়ে এই তুচ্ছ প্রাণ প্রেয়সী আমার!
পেয়েছি অমূল্য নিধি—প্রণয় তোমার!

১৮

তুমি যারে প্রিয়তমে বলেছ তোমার
তোমারে যে এসংসারে,আমার বলিতে পারে
ধরাতলে সেই সুখী, সেই ভাগ্যবান,
মানব জীবন তার নন্দন উদ্যান।

১৯

তবে কেন কি করিব? আমি দীন হীনে,
হায়রে অমূল্য নিধি, দিয়াও দিলনা বিধি,
স্বপ্নরাজ্যে ভিন্ন নাই হবে দরশন।
"কি করি কি করি" তাই ভাবি অনুক্ষণ।

২০

হায়! হেন রত্নহার পড়িয়া গলায়,
না পারিনু সগরবে,বাঁধিতে বিস্মিত ভবে,
জগত করিতে আলো রূপের প্রভায়,
কি করি কি করি—তাই ভাবি কি সদায়?

২১

শোভিবে না সেই রত্ন গলায় আমার,
নাহি চাহি দরশন, নাহি চাহি পরশন,
একবার বল প্রিয়ে তুমি কি আমার,
ধরাতলে আমি কিছু নাহি চাহি আর।

২২

কি করিব ? আজি যথা দৃষ্টির সীমায়
জলধি হৃদয়ে হায়, স্থাপিয়ছে পূর্ণিমায়,
নবোদিত পূর্ণশশি চারু জ্যোৎস্নায়
বিভাসি অনন্তব্যাপি, সিন্ধুনীলিমায়।

২৩

আশার সুদূর প্রান্তে তেমতি তোমায়
স্থাপিয়া জীবন মম, এই নীল সিন্ধুসম,
ঝলসিব, সুখ দুঃখ তরঙ্গ নিচয়
সচঞ্চল হবে তব প্রতিবিম্বময়।

২৪

জ্বলিবে, নিবিবে, উর্ম্মি হাসিবে নাচিবে
সেই প্রতিবিম্বতলে ; অনন্ত আশার জলে,
সেই নৃত্য, সেই ক্রীড়া, দেখিয়া দেখিয়া
আশা জলে দেহ তরি দিব ভাসাইয়া।

প্রমোদিনী।

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

লুতাতন্তু।

বিস্তীর্ণ জলরাশি। পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় কুজ্ঝটিকা যেন এই রৌদ্রের সময়ও জল এবং আকাশ সংযুক্ত করিয়া রহিয়াছে। শূন্যে, বায়ু-সমুদ্রে কি যেন ঈষৎ কম্পিত হইতেছে, বুঝি এ নিদারুণ গ্রীষ্ম অসহ্য হওয়ায় জলনিধি ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, তাই বায়ু এত কাঁপিতেছে। বেলা এক প্রহরের অধিক নাই। একজন পথশ্রান্ত অশ্বারোহী উপকূলবর্ত্তী একটি বৃক্ষশাখায় অশ্ববন্ধন করিয়া তরুমূলে বসিয়া আছেন, বিশ্রাম করিতেছেন। দেখিতেছেন, একটি নবপল্লবও সঞ্চালিত হইতেছে না, অথচ বীচিমালা-সমাকীর্ণ সাগরাম্বু অনবরত সমীপবর্ত্তী বেলাভূমি ধৌত করিতেছে। দক্ষিণানিল সাগর সলিলে অবগাহন করিয়া মধ্যে মধ্যে শীতল হস্তে পথিকের ললাট স্পর্শ করিতেছে। সহসা একখণ্ড মেঘ আসিয়া সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলিল, অপ্রকৃত জলধির নীল শরীর গাঢ় নীলবর্ণ হইল। বাতাস বহিতে লাগিল ; অশান্ত উর্ম্মিরাজি আরও অশান্ত হইয়া উঠিল ; এক একটি তরঙ্গ পর্ব্বতশীর্ষ হইতেও উচ্চ হইয়া শতধা বিভক্ত হইতে লাগিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেত্রগ্রথিত তরণী সকল কো-

থায় ছুটিয়া গেল তাহার চিহ্ন মাত্রও রহিল না। পথিক তখন দুর্য্যোগের লক্ষণ দেখিয়া আশ্রয়স্থান লাভে ব্যগ্র হইলেন, এবং সত্বর অশ্বারোহণ করিয়া প্রাণপণে ঘোটক চালাইতে লাগিলেন। তিনি এ-প্রদেশে ইতঃপূর্ব্বে আর আইসেন নাই, সুতরাং এত অল্প সময়ে যে আকাশের এত-পরিবর্ত্তন ঘটিবে তাহা বুঝিতে পারেন নাই, এবং এই জন্যই এত আশ্বস্তচিত্তে বসিয়াছিলেন। কিয়দ্দূর গমনের পরই ঝটিকা সহ বৃষ্টি ও করকাপাত হইতে লাগিল। মেঘের ঘন ঘন গর্জ্জনে তাঁহার অন্তঃকরণ নিতান্ত ভীত হইল এবং তিনি অশ্বে তীব্রতর কশাঘাত করিতে লাগিলেন। সহসা একটি অট্টালিকা তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইল। তারাতারি অশ্বটিকে নিকটস্থ বৃক্ষশাখায় বন্ধন করিয়া যেমন কিঞ্চিৎ অগ্রেসর হইয়াছেন অমনি সেই তুরঙ্গের উপর বজ্রপাত হইল। অশ্বের প্রাণ বহির্গত হইল, তথাপি দাঁড়াইয়াই রহিল। সেই ভীষণ শব্দে এবং নয়নান্ধক বিদ্যুতালোকে পথিকও অচেতন হইয়া প্রাচীরপার্শ্বে পতিত রহিলেন।

পরক্ষণেই অট্টালিকার গবাক্ষ এবং কবাট সমূহ উন্মুক্ত হইল, কএকটি লোক আসিয়া মৃতকল্প পথিককে সযত্নে উঠাইয়া লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল এবং তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনে বিশেষ যত্ন করিতে লাগিল। অল্পকাল পরেই তিনি সংজ্ঞা লাভ করিলেন। কিন্তু তখনই তাঁহার মনে হইল যে দীর্ঘপথের একমাত্র সহচর প্রিয় অশ্বটি জীবিত নাই, তাহার উপরই বজ্রপাত হইয়াছে। পথিক অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা অতীত হইলে পর নয়ন উন্মীলন করিলেন। দেখিলেন, দুইটি পরম সুন্দরী ললনা এক-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অনিমেষ নয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। তাঁহার চক্ষে যেন আবার বিদ্যুৎ প্রকাশ পাইল, কিন্তু এবার জ্যোতি স্থির,—সুখদ। একটির বয়স আন্দাজ অষ্টাদশ বৎসর—মোহন যৌবনপূর্ণা। তিনি অপূর্ব্ব অঙ্গজ্যোতিবিশিষ্টা, গৌরবর্ণা, এবং শুভ্রবসনপরিহিতা; দেখিতে যেন উষা দেবীর ললাটদেশস্থ সমুজ্জ্বল নক্ষত্র,সুন্দর অথচ ঈষৎম্লান। অপরা পঞ্চদশবর্ষীয়া, যৌবন সোপানে দণ্ডায়মানা; অতুল্য মুখকমলে, সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অনবদ্য লাবণ্যযুক্ত গঠনে, মনোহর কেশগুচ্ছে রূপমাধুরী যেন উছলিয়া পড়িতেছে। কি সুন্দর সুদীর্ঘ নয়ন, কি মনোহারিনী গ্রীবাভঙ্গী, কি অনির্ব্বচনীয় অধর শোভা! উজ্জ্বল গৌরবর্ণ সুস্নিগ্ধ মুখশ্রীতে এবং লাবণ্যযুক্ত কলেবরে পরম রমনীয়। পথিক বুঝিতে পারিলেন প্রথমা বিধবা, দ্বিতীয়া কুমারী।

'প্রথমা বিধবা'? শোচনীয় চিন্তা! বিধাতার কি বিবেচনা মাত্রও নাই? তিনি গোলাপে কণ্টক দিয়াছেন, ক্ষতি নাই; পুষ্প একদিনেই পর্য্যুষিত হইবে;

চন্দ্র রাহুগ্রস্ত করেন, তাহাতেও বড় আসে যায় না, চন্দ্রের সহিত আমাদের হৃদয়ের অল্প সম্পর্ক; চন্দ্র অচেতন পদার্থ, পৃথিবীবহির্ভূত এবং পূর্ণ অবস্থায়ও কলঙ্ক পরিত্যাগ করে না। কিন্তু যে নয়ন ও মনের তৃপ্তিসাধনের প্রধান সাধন, এমন সুদৃশ্য কমনীয় পদার্থ বালিকায় বৈধব্য অসহ্য! পথিক ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার চক্ষে জল আসিল! তিনি মস্তক উন্নত করিয়া কামিনীদ্বয়কে দেখিলেন। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি পতিত হওয়া মাত্রই বিধবা কক্ষান্তরে অন্তর্হিতা হইলেন। গমন কালে তাঁহার অঙ্গজ্যোতি আবার পথিকের নয়ন স্পর্শ করিল। অপরা দাঁড়াইয়াই রহিলেন।

আমাদের পথিক যুবক। তাঁহার বয়স ত্রয়োবিংশ অতিক্রম করে নাই। বীরোচিত পূর্ণায়ত শরীর চিন্তার আশ্রয়স্থান হইয়া এপর্যান্ত শরীর শীর্ণ অথবা প্রফুল্ল মুখশ্রী ম্লান করে নাই। তিনি যেন নিদাঘের নির্ম্মল আকাশ দেখিতে দেখিতে কালস্রোতে সুসজ্জিতা সুখের জীবনতরনী ভাসাইয়াছেন, একটি নিঃশ্বাসেও সেই জলরাশি আন্দোলিত করে নাই। তাঁহার মানস-সরোবরে যেন স্বর্ণকমল ফুটিয়া রহিয়াছে, মরালবৎ মৃদুমন্দ গমনে স্বর্ণচঞ্চু বিস্তার করিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। বীরত্ব এবং দৃঢ়তা সৌন্দর্য্য ও কোমলতায় মিশ্রিত হইলে যে একটি গাম্ভীর্য্যমিশ্র মনোহর লাবণ্য উৎপাদন করে যুবকশরীরে তাহাই বিরাজ করিতেছে।

অপরা দাড়াইয়াই রহিয়াছেন। দাড়াইয়া কি করিতেছেন? পঞ্চদশ বর্ষীয়া বালিকা যুবকের দিকে একমনে চাহিয়া আছেন,কেবল যুবক যখন সেই প্রফুল্ল মুখকমল সন্দর্শন জন্য বিস্ময়বিস্ফারিত লোচন উত্তোলন করিতেছেন, তিনি তখন আপন নয়ন ভূপৃষ্ঠে রাখিতেছেন। যে বংশে চন্দ্র সূর্য্যের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ অবধি রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন, সেই নির্ম্মল ক্ষত্রিয়কুলেও এমন রত্ন সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। তাই বুঝি প্রমোদিনী সতৃষ্ণনয়নে সেই রূপ সুধা পান করিতেছিলেন; তাই বুঝি মনোনিবেশ করিয়া সৌম্যমূর্ত্তিতে হৃদয়ের অবস্থা পাঠ করিতেছিলেন। অন্যটির এ সংসারের অভিনয় সাঙ্গ হইয়াছে—তাঁহার আর আশা কি, দেখাই বা কি, এবং দেখিয়া প্রয়োজনই বা কি?

যুবকের পাদপ্রান্তে শান্তপ্রকৃতি একটি পুরুষ এবং শয্যাসমীপে একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক উপবিষ্টা ছিল। তিনি ইহাদের দুই জনকে পরিচারক এবং পরিচারিকা বলিয়া বুঝিয়া লইলেন। বর্ষীয়সী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল "আপনার ত কোন শারীরিক অনিষ্ট হয় নাই?"

যুবক। "না। ক্ষণেক মাত্র কষ্ট ছিল, এখনও কাণের নিকট যেন শব্দ হইতেছে। কিন্তু কোন অনিষ্ট ঘটে নাই।"

বৃদ্ধা। "আমরা আহ্লাদিত হইলাম।"

যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন "এ স্থানটির নাম কি?" বৃদ্ধা কহিল "কাঞ্চীপুর ইহার অতি সন্নিকট। ছাতের উপর দাঁড়াইলে রত্নেশ্বরের মন্দির দেখা যায়।" যুবক যেন বিস্ময়ান্বিত অথচ হর্ষিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রকৃতই কি মন্দিরটি ভিত্তি হইতে চূড়া পর্য্যন্ত স্বর্ণমণ্ডিত?"

বৃদ্ধা। "হাঁ, একবার গেলেই স্বচক্ষে দেখিতে পাইবেন।"

তখন বৃদ্ধা আলাপ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণপ্রভাকে আসিতে বলিল। বিধবার নাম ক্ষণপ্রভা। তিনি নিকটে আসিলে 'এখন যাওয়া উচিত, আর বেলা নাই' এই কথা বলিয়া প্রমোদিনীকেও সত্বর হইতে বলিল। তাঁহারা দুই জনেই দাঁড়াইলেন। কিন্তু প্রমোদ যে অমৃতহ্রদে মক্ষিকার ন্যায় সাঁতার দিতে ইচ্ছা করিতেছিলেন, তাহার একবিন্দু সুধা পান না করিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর। সুতরাং অমৃতকণাবর্ষী আর দুই একটি কথা শুনিবার জন্য এবং হৃদয়কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া কর্ত্তব্যের অনুরোধে বলিলেন, "কি! ইনি আজ যার পর নাই কষ্ট পাইয়াছেন, অতএব এরাত্রি এস্থানে বিশ্রাম করিতে বল।"

যুবকের কর্ণে মধুবর্ষণ হইল! নিদাঘশুষ্ক মরুভূমিতে এই প্রথম বৃষ্টি হইল, বারিবিন্দু পতন মাত্রেই শুষিয়া গেল, তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইল না। তখন ধন্যবাদ দেওয়া উপলক্ষে দুই একটি কথা বলা স্থির করিলেন। বলিলেন, "সুচরিত্রে! আপনার সুকোমল হৃদয় যে দরিদ্র পথিকের দুঃখে ব্যথিত হইল এ তাহার পরম সৌভাগ্য, কিন্তু আপনাকে মানসিক কষ্ট দেওয়া তাহার পক্ষে নিতান্ত অনুচিত কর্ম্ম। অদ্য জীবন রক্ষা করিয়া আপনারা তাহার যে উপকার করিলেন তাহার প্রতিদান এ পৃথিবীতে সম্ভবে না। জীবনের মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। যে জীবন রক্ষা করিলেন তাহা দান করিলেও যখন উপযুক্ত প্রতিদান হয় না, তখন আর তাহা চিন্তা করা বৃথা। আপনার কথার অবাধ্য হইতে পারি না, অদ্য রাত্রিতে এই গৃহে অবস্থান করিতে সম্মত হইলাম। জগদীশ্বর আপনাদিগকে সুখে রাখুন, আপনাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক।"

ক্ষণপ্রভা আবার কক্ষান্তরে লুক্কায়িত হইলেন। প্রমোদিনী সুধাবিমুগ্ধমনে পথিকের কথা গুলি শুনিলেন,—ভাবিলেন "জীবন অপেক্ষা মূল্যবান্ কোন বস্তু কি এত বড় পৃথিবীর কোন অংশেই নাই? এ সংসারে অপার্থিব, নিত্য সুখদ এমন বস্তু আছে যাহা জীবন হইতেও মূল্যবান্। আচ্ছা, যুবকের কথা সফল হউক, আমার অভিলাষ পূর্ণ হউক। উপযুক্ত প্রতিদান যদি না থাকে চাই না, অথবা প্রতিদান আবার কিসের?" প্রকাশে বলিলেন—"আপনার জীবন রক্ষা হইয়াছে এই আমাদের যথেষ্ট পুরস্কার।"

প্রমোদিনী এতগুলি কথা কহিলেন।

কেন কহিলেন ? অপরিচিত ব্যক্তির সহিত আলাপ করিতে এত সাহসই বা কোথা হইতে আসিল ? অন্যদিন, যাহাদের সহিত একত্র অবস্থান তাহাদিগের নিকটেও কিছু বলিতে সতর্ক, আজ সে ভাব কেনই বা অন্তর্হিত হইল ? সকল প্রশ্ন নিমেষ মধ্যে মনে মনে আন্দোলন করিলেন, লজ্জিতা হইলেন, মস্তক অবনত করিলেন। মনুষ্যের মনোবৃত্তিগুলি নিতান্ত ভীরু, তাহারা যে কর্ম্ম আপাততঃ মন্দ বলিয়া মনে করে অথচ যাহার প্রতিরোধ করিতে পারে না,তাহা সম্পন্ন হইয়া গেলে পর অধিকক্ষণ মনকে ভৎর্সনাও করিতে পারে না। সেই সময় কৃতকর্ম্মের অনুকূল শতশত যুক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, সুতরাং মনোবৃত্তিগুলি পরাজিত হইয়া নিস্তব্ধ হয়। প্রমোদের মনে হইল ' যুবকের নিকট কিসের লজ্জা?' ' ইনি আমার ! '

প্রমোদিনীর এত আহ্লাদ, এত উৎসাহ ! অবোধিনী ! সংসারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা, তাই এত আশা, এত চাঞ্চল্য। ক্ষণপ্রভার মুখে হাসি নাই, স্বভাবজাত প্রফুল্লতা নাই, কারণ তাহার রঞ্জিল দর্পণ ভাঙ্গিয়াছে, ভবিষ্যৎ অন্ধকার। প্রমোদের ত তাহা নয় ! তাঁহার দর্পণ প্রতিপলে নূতন নূতন বর্ণে রঞ্জিত হইয়া ভবিষ্যৎ পরম সুন্দর ও উজ্জ্বল দেখাইতেছে। মনে করিতেছেন ' অদ্য কি শুভদিন ! দিবসের চিন্তা, রজনীর স্বপ্ন, কল্পনার মনোহর চিত্র সকলই আজ সফল হইল। মনুষ্যে মনুষ্যে কেমন প্রভেদ ! এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে দুই জনও সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয় না, একই অতুল্য ' তিনি কল্পনাবলে ভবিষ্যৎ জীবনবর্ত্মের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিলেন। কিন্তু মধ্যে যে কত বিজন অরণ্য, দুরারোহ পর্ব্বত, অনন্ত সমুদ্র, প্রাণনাশক কণ্টক থাকিতে পারে তাহা একবার মনেও হইল না!

পথিক প্রথম ভাবিয়াছিলেন এই ইহাদের বাড়ী। সুতরাং যাওয়ার কথা শুনিয়া নিরাশ ও চমৎকৃত হইলেন, তথাপি প্রমোদিনীর কথা অতিক্রম করিতে না পারিয়া সে রাত্রি সেই গৃহেই অবস্থান করিতে স্বীকৃত হইলেন। প্রমোদ অতি যত্নের সহিত তাঁহার আহার ও শয্যার যথাসম্ভব সুবিধা করিয়া দিয়া ক্ষণপ্রভা এবং দাস দাসী সহ বহির্গত হইলেন। যতক্ষণ যুবকের মস্তক নত ছিল ততক্ষণ তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে গেলেন, কিন্তু যখন বুঝিলেন, যুবকচক্ষু তাঁহার অনুসরণ করিতেছে তখন আর ফিরিয়া চাহিলেন না। শিবিকারোহণে প্রস্থান করিলেন।

পথিক আহারাদি করিয়া বিশ্রামার্থ শয়ন করিলেন। নিয়োজিত দাসগণ তাঁহার যাহাতে কোন কষ্ট না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিল, তথাপি তাঁহার সুখবোধ হইল না। তাঁহার নিকট সে গৃহ দশমীর পর চণ্ডীমণ্ডপ, অথবা অভিনয় সমাপনান্তে নাট্যশালার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি মনশ্চক্ষুতে

সেই পূর্ণেন্দুবদন, সেই গৌরব ও গাম্ভীর্য্য-মিশ্রিত হাসি হাসি মুখকান্তি, এবং প্রফুল্ল চক্ষু নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যখন নিদ্রাবেশ হইল, দেখিলেন বজ্রপাত হইল, সৌদামিনী বহির্গত হইয়া দুইভাগে বিভক্ত হইল, এবং দুইটি অপূর্ব্ব বামামূর্ত্তি ধারণ করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল—একটি স্থির শুভ্র, কিন্তু জ্যোতি ক্ষণস্থায়ী; অপরটি কিঞ্চিৎ রক্তিমাভ, কিঞ্চিৎ তরল ও চপল অথচ স্থায়ী, এবং বাহ্যিক দাহিকাশক্তি বিহীন হইয়াও অন্তর্দাহী। আবার সহসাই যেন পরিবর্ত্তন। পথিকের বোধ হইতেছে কাহার যেন অনুসরণ করিতেছেন, কিন্তু ধরিতে পারিতেছেন না। তিনি যেন রাশীকৃত বালুকাস্তূপে দণ্ডায়মান হইতে প্রয়াস পাইতেছেন, কিন্তু পদতল হইতে বালুকা সকল সরিয়া যাইতেছে! কিছুই স্থির থাকিতেছে না। মনে আশা ও নিরাশায় ভয়ানক বিবাদ আরম্ভ, কে জয়ী হইবে নিশ্চয় নাই।

যুবক ভাবিতে লাগিলেন "আমি কি ক্ষণেই ঊর্ণনাভের তন্তুনির্ম্মিত জালের এক প্রান্ত স্পর্শ করিলাম, ঊর্ণনাভ সুদূরবর্ত্তী প্রান্তে পলায়ন করিল! যদি হাত না দিতাম, হৃদয়-সূত্রের গাঁথনি দেখিয়া লইতে পারিতাম। প্রণয়-তন্তু স্পর্শ করিয়া নিজের শান্তি সুখ সকলই বিসর্জ্জন দিলাম! না, লূতা স্বজালেই বদ্ধ, যে জাল বিস্তার করিয়াছে সে দূরবর্ত্তী পার্শ্বে পলাইলেও জাল পরিত্যাগ করিবে না। তবে আমার অসুখ কি?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মরুভূমে প্রবাহিনী।

" আপনি আমাদের দক্ষিণ বাহু। বাহমণি রাজ্য আপনা হইতে কত উপকার লাভ করিয়াছে ইয়ত্তা করা যায় না। এরাজ্য কতটুকু ছিল? আপনার বুদ্ধি বলে কঙ্কণ প্রদেশ অতি সহজে আমাদের হস্তগত হইল, পূর্ব্ববর্ত্তী দুইজন নবাব যাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন আপনি তাহা নিমেষ মধ্যে সম্পন্ন করিয়া উঠিলেন। পরাক্রান্ত বিজয় নগরের রাজাকে পরাভূত করিয়া গোয়া প্রদেশ অধিকার করিলেন, উড়িষ্যাধিপতিকে আশ্রয় দান করিয়া সিংহাসনে পুনঃস্থাপন এবং তৎসঙ্গে আমাদের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া তুলিলেন। কন্দাপিলি ও রাজমহেন্দ্রী আমাদের রাজ্যভুক্ত হইল। অল্প দিন মধ্যেই এই বহুবিস্তীর্ণ ভূভাগে সুনিয়ম ব্যবস্থাপিত এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইল, প্রজাদের অনবরত সমরজনিত অসুখ আর রহিল না। পরাক্রান্ত হিন্দুরাজগণ দূর হইতে এদেশ প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও আর সাহসী হয়েন না। ধন্য আমার জননীর বুদ্ধিকৌশল ও বিচারক্ষমতা। শুভক্ষণে আপনার উন্নতিপথের কণ্টক অপসারিত করিয়াছিলেন। আমরা যেমন আপনার নিকট, আমাদের রাজাও সেইরূপ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ নিবারণ এবং উড়িষ্যাবিদ্রোহ দমন করার যে প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন ক-

রিলেন, এসকল বিষয়ে আমি যেন এখনও অপ্রাপ্তবয়স্ক আছি এইরূপ ভাবিয়া কার্য্য করিবেন।” শাহ এই বলিয়া নীরব হইলেন মন্ত্রীশ্রেষ্ঠ মহম্মদ গাওয়ান তখন কহিতে লাগিলেন।

“মহাশয়! আমি আপনার আজ্ঞাধীন ভৃত্য, নিজ ক্ষমতায় কিছুই করিবার সাধ্য নাই। আপনি যখন অপ্রাপ্তব্যবহার ছিলেন আমি তখনও আপনার জননীর অনুমতি না লইয়া কোন কার্য্য করি নাই। তবে যখন সচিবস্থলে নিযুক্ত করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন তখন আমার বুদ্ধিতে যাহা উত্তম বোধ হয় তাহা পরামর্শ দিয়া থাকি মাত্র। আমি ক্ষমতার জন্য লোলুপ নই। যখন যে কার্য্য করি, যদি তাহাতে আপনার মনস্তুষ্টি সাধন করিতে পারি তবেই আমার পরিশ্রম সফল। যখন কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছি এজীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও এ শরীর এবং মন আপনার। শরীরে শোণিতের শেষ বিন্দু থাকা পর্য্যন্ত আপনার হিত সাধনে অবহিত থাকিব। আমি উড়িষ্যার বিদ্রোহে ভীত নহি, ঈশ্বর প্রসাদাৎ অতি শীঘ্রই বিদ্রোহ দমন করিতে পারিব এবং ভরসা করি এই সুযোগে আমাদের রাজ্যের আয়তন আরও বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু নিরন্নদিগের অন্ন কষ্ট নিবারণ চিন্তায় অত্যন্ত চিন্তিত আছি।”

মামুদের আশ্বাস বাক্যে মহম্মদ শাহের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইল। অল্পকাল মধ্যেই স্থির হইল, অনতিবিলম্বে উড়িষ্যার বিরুদ্ধে ধাবমান হইতে হইবে। বৃদ্ধ মন্ত্রীর সাহস দৃষ্টে শাহও সাহসী হইয়া উঠিলেন এবং স্বয়ং এই যুদ্ধে যাইবেন স্থির হইয়া গেল। নির্দ্ধারিত দিবস তিনি সকলের নিকট বিদায় লইতে অন্দরে প্রবেশ করিলেন। মন্ত্রী একটি পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম এসফ্ আদেল্। তিনি বুদ্ধি ও ক্ষমতা বলে ক্রমে ক্রমে মন্ত্রীর অনুকৃতি হইয়া উঠিতে লাগিলেন। তাঁহার সমবয়স্ক আর একটি যুবক মামুদের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র ছিলেন; তিনি ক্ষত্রীয়, নাম ধরনী নাথ। অতি কিশোর বয়সেই তিনি যুদ্ধবিদ্যায় বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিশেষতঃ পারস্য ভাষায় এবং রাজনীতিতে বিলক্ষণ আনুরক্তি থাকায় এবং গৃহপালিত সিংহের ন্যায় নম্র অথচ গৌরবপূর্ণ স্বভাব গুণে তিনি আদেল অপেক্ষাও মন্ত্রীর প্রিয় পাত্র হইয়া উঠেন। গাওয়ান এই দুই তরুণ বয়স্ক প্রশস্ত চিত্ত ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণ এবং বিদ্রোহ দমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথমতঃ, বিবেচনা করিলেন, যুদ্ধ উপস্থিত, এসময় রাজকোষ হইতে অধিক অর্থব্যয় করা যুক্তি যুক্ত নয়। অতএব দুর্ভিক্ষ নিবারণে নিজের ধনাগার উন্মুক্ত করিলেন। তাঁহার প্রচুর পৈত্রিক সম্পত্তি ছিল, নিজের দৈনিক ব্যয়ের জন্য বেতন হইতে দুই টাকা নির্দ্ধারণ করিলেন, তদ্দারাই পরিবারের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ হইত।

দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত প্রদেশ সমুহে প্রথমতঃ পঞ্চাশ লক্ষ, পরে আর পঁচিশ লক্ষ মুদ্রা প্রেরণ করিলেন। ইহার পর সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী এবং গৃহ শয্যা পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া আরব্ধ কার্য্য সম্পাদনে যত্নবান হইলেন। এত অর্থ থাকিতেও তিনি নিতান্ত দরিদ্রবৎ কাল যাপন করিতেন। কারণ, তাঁহার মনে এই ধারণা ছিল পূর্ব্ব পুরুষেরা কোন মহদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য এত অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। উপস্থিত দুর্ভিক্ষ নিবারণ তাহার প্রশস্ত সদ্ব্যবহারের পথ দেখিলেন, তাই সর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়া বসিলেন। তাহার পর রাজসরকারে তাঁহার যে নির্দ্ধারিত জায়গীর ও বৃত্তি প্রভৃতি ছিল অল্প বেতন ভোগী-কর্ম্মচারিগণের মধ্যে সে সমস্ত বিতরণ করিয়া দিলেন। এই সমুদায় দান রাজার নামে করা হইল। এইরূপে অপরিসীম বদান্যতার সহিত দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিয়া উঠিলেন। তাহার নীজের গৃহও একটি অন্নছত্র হইয়াছিল, প্রতিদিন সহস্র সহস্র লোকে আহার পাইত। দেশ বিদেশে সকলেই একবাক্যে বলিত এমন উদার প্রকৃতি প্রশস্তমনা ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নাই।

মহম্মদশাহ যুদ্ধগমন জন্য মাতার অনুমতি চাহিলেন। বৃদ্ধা বেগমের একমাত্র প্রশ্ন মন্ত্রী যাইবেন কিনা? গাওয়ান স্বয়ং সেনাপত্য গ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া আর আপত্তি করিলেন না, আশীর্ব্বাদ করিয়া অনুমতি প্রদান করিলেন। তখন তিনি প্রণয়িনী নূরন্নেহারের নিকট গমন করিলেন।

নূরন্নেহার একাকিনী বসিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্রটি এক পার্শ্বে বসিয়া, মধুর হাসিতে, আধ আধ ভাষে কমনীয় অঙ্গসঞ্চালনে মাতৃহৃদয়ে সুধাবর্ষণ করিতেছিল; মাতা তাই নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। শাহকে আগত দেখিয়া গাত্রোত্থান করিলেন, এবং তাঁহার পদপ্রান্তে পতিতা হইয়া জানু চুম্বন করিলেন। শাহ তাঁহার হস্ত ধরিয়া সাদরে উঠাইলেন। নূরন্নেহার তাঁহার প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন, এবং রণবেশ দেখিয়া ভীতা হইলেন। যুবতী প্রণয়িনীর নিকট হইতে যুদ্ধে যাইবার জন্য বিদায় লওয়া বড় সহজ নয়। মহম্মদ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একটি কথাও বলিতে সাহসী হইলেন না। তাঁহার কল্পনা যেন ক্ষণেকের তরে বালকটিকে পিতৃহীন এবং প্রণয় পুত্তলি নূরন্নেহারকে এই বিস্তীর্ণা পৃথিবীতে একাকিনী দেখিল। অল্পক্ষণ পরেই হৃদয় যেন চমকিয়া সচেতন হইল। একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রিয়তমার হস্তধারণ করিলেন, এবং সেই প্রণয়পূর্ণ বিশ্ববিমোহন মুখের প্রতি স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন 'এখন যাই?' তিনি যে যুদ্ধে যাইবেন একথা এপর্য্যন্ত বলেন নাই, অথচ তাঁহার মনে হইতেছিল বলিয়াছেন; সুতরাং বলিয়া উঠিলেন 'তবে এখন যাই?'

নূরন্নেছারের শরীর শীহরিয়া উঠিল, শাহের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই আপনার অজ্ঞাতসারে শয্যাপার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। প্রফুল্ল কমলে ঈষৎ কালিমা আশ্রয় করিল, স্বামীর প্রতি কিয়ৎকাল স্থির নয়নে চাহিয়া রহিলেন, শরীরে ঘর্ম্ম ছুটিল, ঘন ঘন নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল, অস্পষ্টস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন'কোথায় ? কি জন্য ?' শাহ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সবিস্তার সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন। নূরন্নেছারের পার্শ্বদেশে উপবেশন করিলেন, সুন্দরীর সুকোমল গ্রীবা ঈষৎ হেলিয়া স্বামীর বক্ষঃসংলগ্ন হইল। উভয়েই নীরব রহিলেন। উভয়েই যেন নিদ্রিত। সম্রাট যখন আবার বলিলেন ' এখন বিদায়, বাঁচিয়া থাকিলে সাক্ষাৎ হইবে ' রাজ্ঞী দুস্বপ্ন দেখিতে দেখিতে হঠাৎ সচেতন হইয়াই যেন বলিলেন ' যখন যাওয়া স্থির হইয়াছে তখন আর কি আমার কথায় থাকিবেন ? যাইবেন ক্ষতি নাই,কিন্তু এই বালক—' আর বাক্য স্ফুরণ হইল না। বক্ষঃস্থলের গুরু আঘাত যেন শাহের কর্ণগোচর হইতে লাগিল। যখন তাঁহার কণ্ঠে সুকোমল বাহুবল্লী অর্পিত হইল তখন যেন সকল সঙ্কল্প অন্তর্হিত হইল। অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইলে পর শাহের যুবহৃদয়ে যশোলিপ্সা প্রবল হইয়া উঠিল। আস্তে আস্তে কণ্ঠ হইতে কোমল হাত দুই খানি খুলিয়া রাখিলেন, আর অপেক্ষা করিতে সাহসী হইলেন না। ' তবে এখন ? ' এই বলিয়া বহির্গত হইলেন। তাহার কর্ণ শুনিল ' হৃদয়। '

শাহ দ্রুতপদে নিক্রান্ত হইয়া শিবিরে উপস্থিত হইলেন। তথায় ধরণীনাথ এবং এসফ্ আদেল অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া মন্ত্রী মহাশয়ের এত বিলম্ব কেন তাহার আলোচনা করিতে লাগিলেন। মহম্মদ যখন অন্দরে প্রবেশ করেন তখন মন্ত্রী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন 'পথে যদি গোলাপ পুষ্প কাহারও কার্য্যক্ষম হস্ত আকর্ষণ করে তাহার কণ্টক ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না। ' এই কথাটি মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন। একবার স্থিরভাবে ঈষৎ হাসির সহিত কথাটি প্রকাশ করিয়া বলিলেন। এসফ্ হাসিলেন, কিন্তু কথা যেন ধরণীর হৃদয় স্পর্শ করিল, স্তম্ভিত হইলেন। মনে মনে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন ' কণ্টক ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না। "

অদ্য গাওয়ানের আসিতে এত বিলম্ব কেন ? অন্য দিন যিনি সকলের অগ্রগামী অদ্য কেন তিনি আসিতেছেন না ? কাহার জন্য গৃহে বসিয়া আছেন। স্ত্রী নাই, পুত্র নাই কাহার সহিত আলাপে এত ব্যাপৃত। ঐ যে স্বর্ণলতার ন্যায় ক্ষীণাঙ্গী একটি অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে ওটি কে ? গুল্‌নেয়ার—মন্ত্রী মহাশয়ের বার্দ্ধক্যের সম্বল, একমাত্র অপত্য স্নেহের পুত্তুল। গুল্‌নেয়ারকে এক বৎসর রাখিয়া তাহার মাতার লোকান্তর

হয়। বালিকা তদবধি পিতৃবাৎসল্যে প্রতিপালিত হওয়ায় তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। তাহার জন্যই মামুদের এত বিলম্ব।

মহম্মদশাহ সহজে মাতার নিকট বিদায় হইতে পারিলেন,—মাতা বুদ্ধিমতী, রাজ্যশাসন করিয়াছেন, প্রয়োজন বুঝেন। প্রণয়িনীর নিকট বিদায় লইতে কষ্ট হইল বটে কিন্তু নূরন্নেহারও যুবতী, বুদ্ধিশীলা—তিনি হৃদয়ের অগ্নি গুপ্ত রাখিতে জানেন। কিন্তু মন্ত্রীর বিদায় তেমন সহজ নয়। অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা সুখ চায়, দুঃখ বুঝে কিন্তু প্রয়োজন বুঝে না; হৃদয়ের অনলও গোপন করিতে শিখে নাই। সে মাতৃহীনা জন্মদুঃখিনী। সে কাহার নিকট থাকিবে? পৃথিবী, রাজা, রাজ্য, যুদ্ধ বিগ্রহ এসমস্ত তাহার মনে স্থান পায় না, সে এইমাত্র জানে তাহার পিতাই সকল। লোকে যখন তাঁহাকে প্রশংসা করে সরলা বালা সতৃষ্ণমনে সেই প্রশংসা-সুধা পান করিয়া সুখী হয়।

মন্ত্রী বলিলেন "মা! এখন আসি গিয়ে"। সর্ব্বনাশ উপস্থিত! গুলনেয়ার কিঞ্চিৎ দূরে ছিল, ব্যস্ততার সহিত দৌড়িয়া যাইয়া পিতার গলা জড়াইয়া ধরিল; মন্ত্রীর সাধ্য কি এক পা অগ্রসর হন? হতবুদ্ধি হইলেন। যখন গুলনেয়ার কাঁদিয়া তাহার মা নাই ভাই নাই এই সকল কথা বলিতে লাগিল তখন সচিবশ্রেষ্ঠ গাওয়ান আর অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না, নির্ঝরিনী পর্ব্বত হইতে বাহির হইল। কোথায় তাঁহার পরাক্রম, কোথায় বা বুদ্ধি! তিনি এক্ষণে অবলার অশ্রু অপেক্ষাও দুর্ব্বল, নিদ্রা হইতেও বশীভূত, নিরাশ্রয়া নিদ্রিতা যুবতী অপেক্ষাও আশ্রয়বিহীন এবং অজ্ঞানতাপেক্ষাও নির্ব্বোধ। অষ্টমবর্ষীয়া বালিকার অশ্রুর নিকট সম্পূর্ণরূপ পরাভূত হইলেন! ধন্য পিতৃস্নেহ, ধন্য সন্তানের প্রতি ভালবাসা। যে ব্যক্তির হিমাদ্রিবৎ অবিচলিত হৃদয় বৃদ্ধবয়সে পত্নীবিরহে, উপযুক্ত পুত্রশোকে, পরাজিতের আর্ত্তনাদে কখনও প্রকাশ হয় নাই, যাহার আবেগ, তরঙ্গ, গভীরতা কেহই পরিমাণ করিতে পারে নাই, অদ্য অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা সেই হৃদয় দ্রবীভূত করিল; এতকাল যে স্রোত অন্তরে সঞ্চালিত হইয়া তাঁহাকে দগ্ধ বিদগ্ধ করিয়াছে, আজি তাহা নয়ন পথে বাহির হইল। বৃদ্ধ কন্যাকে অনেক বুঝাইলেন, বালিকা তাহা বুঝিল না, শুনিল না, কোন প্রলোভনেই তাহাকে পিতার সঙ্গে যাওয়ার সঙ্কল্প হইতে বিরত করিতে পারিল না। গাওয়ান বাহ্যিক আকারে এবং পারিবারিক বিপদ সমূহের আক্রমণে মরুভূমির আগ্নেয় পর্ব্বত। জল যে কত বালুকার নিম্ন দিয়া প্রবাহিত কেহই বুঝিতে পারে না। উপরে সহস্র রশ্মি অগ্নিবর্ষণ করিতেছেন, অভ্যন্তরে অগ্নিরাশি অনবরতঃ জ্বলিতেছে। অদ্য কোথা হইতে যেন এক বিন্দু জল সেই

অগ্নিতে পতিত হইল, মন্ত্রীর হৃদয়ানল বর্দ্ধিতশিখায় জ্বলিয়া উঠিল। নির্ঝরিনী বালুকারাশি প্লাবিত করিল, সকলে দেখিল, পাদদেশে শ্যামল শস্যক্ষেত্র! মনের এই সুকোমল অবস্থায় বালিকার সুকোমল প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে স্বীকার করিলেন।

মহম্মদশাহের নিকট উপস্থিত হইয়া সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলিলেন, সকলের হৃদয় আর্দ্র হইল। সকলে গুল্‌নেয়ারকে পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিক স্নেহ করিতে লাগিল। ভক্তগণ যেমন উপাস্য দেবতাকে মধ্যস্থলে রাখিয়া সমারোহপূর্ব্বক লইয়া যায়, সেনাগণও সেইরূপ আলোকলতাসদৃশা, ক্ষীণাঙ্গী, মাতৃহীনা, মূর্ত্তিমতী সরলতা গুল্‌নেয়ারকে সঙ্গে লইয়া চলিল। কিন্তু অবোধিনী কোথায় চলিল?—যেখানে যুদ্ধের ভীষণ শব্দ, অশ্বের হ্রেষারব, গজের বৃংহণ ধ্বনি, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনি ভয়ঙ্কর কোলাহল উৎপাদন করিয়া মাতৃগর্ভস্থ শিশুকেও কম্পিত করিয়া তুলিবে; যে স্থানের মৃত্তিকা রক্তস্রোতে প্লাবিত হইবে, সহস্র শৃগাল গৃধিনী প্রভৃতি মৃতশরীর বিদারণ করিয়া ভক্ষণ করিবে এবং তদ্দর্শনে তাহাদের পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র আত্মীয়বর্গ হাহাকার করিবে। সেখানে কি দেখিবে? কোন্ সুখ লাভ করিবে? আর তাহার পিতা সপ্ততিবর্ষ অতিক্রম করিয়াছেন, ঈশ্বর না করুন যদি তাঁহার যুদ্ধক্ষেত্রে পতন অথবা পথেই আয়ুষ্কাল পূর্ণ হয় তবেই বা তাহার কি দশা হইবে? এ সকল নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথাও তাহার মনে আসিল না। অবোধিনী যুদ্ধে চলিল! তাহার মনে আছে পিতার সহিত যাইতেছে আর কিসের ভয়? কেবল বর্ত্তমানই তাহার বিবেচনা ও আলোচনার বিষয়। রাত্রি প্রভাত হইলে যে কি হইবে অনাগতবুদ্ধি বালিকা কি তাহা চিন্তা করিতে পারে? সে কিছুই ভাবিল না, আহ্লাদে মন্ত্রীর সহিত যুদ্ধে চলিল।

এক দিবস পথে নিশীথ সময়ে মন্ত্রীবর আপন শিবির মধ্যে পটমণ্ডপে শয়ান আছেন, কন্যাটিও নিকটে শুইয়া আছে। মামুদ স্বপ্নে দেখিলেন কন্যা নিকটে নাই, চমকিয়া উঠিলেন। জাগরিত হইয়া শয্যা অনুসন্ধান করিলেন, তনয়া নাই; প্রদীপের আলোকে দেখিলেন সকলই শূন্য, নিস্তব্ধ; তাঁহার প্রাণের গুল্‌নেয়ার বস্ত্রগৃহেও নাই; কি আশ্চর্য্য! চতুর্দ্দিক সৈন্যগণ প্রহরী নিযুক্ত আছে, শিবির রক্ষা করিতেছে, পাখীটি উড়িয়া যাইতে পারে না, ইহার মধ্যে সেনাপতির দুহিতাই নাই! অন্ধকার রাত্রি, আলোক লইয়া সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা হইল, চতুর্দ্দিকে অসংখ্য লোক প্রেরিত হইল সকলেই দেখিল গুল্‌নেয়ার নাই!!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পুনঃ প্রাপ্তে।

যাঁহারা রাজনীতি-সমুদ্র সন্তরণ করিয়া রত্নসংগ্রহে যত্নশীল তাঁহাদের মন কোন্ সময় কোন্ বিষয়ে নিমগ্ন থাকে বুঝিয়া উঠা যায় না। মামুদগাওয়ান একমাত্র অপত্যরত্ন হারা হইলেন, পৃথিবীর মধ্যে আপন বলিবার একমাত্র পাত্রী, সরলতার প্রতিকৃতি তনয়া হারাইয়া বসিলেন, অনেকেই ভাবিল তাঁহার মন নিতান্ত বিকল হইয়া যাইবে, যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কোন কর্ম্মেই মনোনিবেশ করিতে পারিবেন না। যাহারা এরূপ ভাবিয়াছিল, তাহারা রাজনীতি কি পদার্থ এ কথা বুঝিত না, অথবা গাওয়ানকে চিনিত না। তিনি সমস্ত ক্লেশ হৃদয়ে গোপন রাখিয়া শ্রমসহিষ্ণু অধ্যবসায়সম্পন্ন যুবাপুরুষের ন্যায় অবিচলিতচিত্তে সমরে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং অসাধারণ ক্ষমতাবলে অত্যল্প সময়ের মধ্যে উড়িষ্যাধিপকে পরাজিত করিলেন, মছুলিপত্তন তাঁহার প্রতিজ্ঞানুসারে হস্তগত হইল। অনন্তর মহম্মদশাহের কৌতুহল নিবৃত্তি করণার্থ আপনার নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাত্র ছয় সহস্র সৈন্যসহ ধাবমান হইয়া বহুদূরবর্ত্তী কাঞ্চিপুরস্থ রত্নেশ্বরের সুবর্ণমণ্ডিত মন্দির লুণ্ঠন করিলেন। এই কার্য্য এত অল্প সময়ে সম্পন্ন হইল যে রাজা রক্ষার্থ আসিবার পূর্ব্বেই তিনি সৈন্যসহ পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী একটি স্থানে প্রত্যাগত হইয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন।

কতিপয় দিবসের কঠিন পরিশ্রমে অতিশয় ক্লান্ত হওয়ায় সে রাত্রিতে তাঁহার শীঘ্রই নিদ্রাকর্ষণ হইল। অল্পক্ষণ পরেই একটি স্বপ্ন দেখিয়া ব্যস্ত হইলেন। তখনই ধরণীনাথ এবং এসফ্ আদেলকে ডাকাইয়া বলিলেন "আজ এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলাম। আমার বোধ হইল যেন কাঞ্চিপুরের দেব রত্নেশ্বর আমার মস্তকের নিকটে দাঁড়াইয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'রে পাপাত্মা যবন! এতকাল তোর সৎপথে মতি ছিল এজন্য তোর উন্নতি হইয়াছে, এখন কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলি, অহঙ্কারে মত্ত হইয়া আমার মন্দির অপবিত্র করিলি! তোর কন্যাকে আসন্ন বিপদ হইতে আমিই আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিয়াছি, তৎপরিবর্ত্তে তুই আমার সম্পত্তি হরণ করিলি! আর তোর উন্নতি হইবে না। এতকাল কেহ তোর শত্রু ছিল না, এখন আর শোচনীয় পরিণাম সময়েও কেহই মিত্রভাবে নিকটে দাঁড়াইবে না। আজ যে প্রভুর মনস্তুষ্টি সাধনে এই বিগর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলি অদ্য হইতে দুই বৎসর মধ্যে সেই প্রভুই তোর শিরশ্ছেদ করিবে। যে কন্যাকে রক্ষা করিয়াছি, তোর সেই প্রিয় তনয়া গুল্‌নেয়ার তোর সমক্ষেই প্রাণত্যাগ করিবে। আর তোর প্রভুও তোর মৃত্যুর পর বৎসরমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।' এমন আর কখনও

হয় নাই। যদি ইহার কোন অংশ সত্য হয় তবে সে ঘটনা যৎপরোনাস্তি শোচনীয় হইবে। যাহাকে পাওয়া যাইবে না বলিয়া পাষাণে হৃদয় দৃঢ় বদ্ধ করিয়াছি তাহাকে যদি আবার প্রাপ্ত হই আর তখন যদি এই প্রকার ঘটনা হয় তাহা কি সহ্য হইবে? স্বপ্ন সত্য হউক মিথ্যা হউক আমার নিতান্তই বিশ্বাস হইতেছে গুল্নেয়ার কাঞ্চিপুরেই আছে, অতএব তোমরা তাহার অনুসন্ধান করিতে থাক।"

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া দুঃখের ভাবনা ভাবিয়া ধরণীনাথ কাঞ্চিপুরে যাইতে স্বীকার করিলেন। মন্ত্রীর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া সেই ঘোরান্ধকারময়ী রাত্রিতে একাকীই নিক্রান্ত হইলেন। প্রভুর নিয়োগ তাহাতে আবার একটি সৎকার্য্য সম্পাদন, সুতরাং ভয় তাঁহার মনে স্থান পাইল না।

তাঁহার এই প্রযত্নে আরও একটি কারণ ছিল, কিন্তু তাহা বলিলে পাছে কেহ মনে করেন যে ' ধরণীনাথ স্বকার্য্য সাধনে বাধ্য ছিলেন, মন্ত্রীর আদেশ না থাকিলে নিজেই অনুমতি লইয়া কার্য্য সাধন জন্য অপেক্ষা করিতেন ' এই ভয়ে কারণটি প্রকাশ করিলাম না। ধরণী সুধীর পুরুষ, নিঃস্বার্থ পরোপকার তাঁহার শরীরের এক প্রধান ধর্ম্ম। এতাদৃশ মহাপুরুষের সদভিপ্রায়ে যদি কেহ সন্দিহান হয়েন এই ভয়ে প্রকাশ করিতে এত সুতর্ক।

ঘোর অন্ধকার। বনাকীর্ণ পথ। এই বিজন প্রদেশের মধ্যদিয়া কে যুবককে পথ দেখাইয়া গুল্নেয়ারের স্থানে লইয়া সুবিধা করিয়া দিবে? তিনি এই কথা মনে আন্দোলন করিতে করিতে সমুদ্রাভিমুখে চলিলেন, পথিমধ্যে দেখিলেন স্থানে স্থানে মশাল জ্বলিতেছে। ধরণীনাথ বুঝিলেন মুসলমানেরা হঠাৎ আক্রমণ করিতে পারে এই ভয়ে কাঞ্চীরাজ রাত্রিতে সতর্ক হইয়া আছেন। এমত অবস্থায় প্রকাশ্য স্থান দিয়া গমন করিলে বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়া আঁধারে গা ঢাকিয়া পূর্ব্বাভিমুখে চলিয়া গেলেন, কেহ দেখিল না।

ধরণীনাথ মনে করিতেছিলেন, ঐদিকে কেবল একটি নক্ষত্র আছে, তাহার শুভ্র পবিত্র আলোকে গুল্নেয়ার কোথায় আছে দেখাইয়া দিবে। সুতরাং একটি অট্টালিকা সমীপস্থ হইয়া তাহার উচ্চ গবাক্ষ প্রতি চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য! জানেলা ঘোর অন্ধকারে আবৃত, সে গৃহে যে কেহ আছে এমন বোধ হইল না। তথাপি আশা এমনই বস্তু; বস্তু বিশেষের এমনই আকর্ষণ শক্তি যে, পদে পদে তাঁহার ভ্রম হইতে লাগিল। তাঁহার বোধ হইল সৌদামিনী নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ মেঘ ভেদ করিয়া বাহির হইল, এবং অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া গুল্নেয়ারের হস্তধারণ পূর্ব্বক পরপ্রান্তে দাঁড়াইল! পরে বুঝিলেন, ভ্রান্তি! ভ্রম বুঝিলেন অথচ সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার পশ্চাদ্দিক হইতে টপ্ টপাটপ্ টপ্ টপ্ শব্দ হইতে লাগিল। প্রণয়প্রতিমা প্রেয়সীর মুখ-

কমলসন্দর্শনসুধাপান সময়ে হঠাৎ গুরুজন উপস্থিত হইলে যেমন সেই পূর্ণেন্দু হইতে অতৃপ্ত নয়ন অতি কষ্টে অপসারিত হয়, এবং তাহাতে হৃদয় যেমন ছিঁড়িয়া যায় বলিয়া বোধ হয়, সেই শব্দ শুনিয়া যুবকেরও তাহাই হইল, অতি কষ্টে নয়ন অপসারিত করিলেন। শূন্যগবাক্ষ পানে চাহিয়াছিলেন তাহাতে ব্যাঘাত হইল, একষ্টও তাঁহার সহ্য হইল না, হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইল। কিন্তু ঐ গৃহে যাহা দেখিতে আশা করিতেছেন তাহা যদি অন্যের প্রাপ্য হয় তাহা কি সহ্য হইবে?

প্রশ্ন হইল 'কে'? উত্তর নাই। পুনরপি জিজ্ঞাসা হইল "শত্রু, না মিত্র?" উত্তর হইল "যাহা মনে করিতে ইচ্ছা হয়।" ধরণী এই কথা বলিবামাত্র প্রশ্নকারী বলিয়া উঠিলেন "এত আস্পর্দ্ধা ক্ষত্রিয় সহ্য করিতে পারে না। প্রস্তুত হও।" সুতরাং তৎক্ষণাৎ উভয়ে ভয়ঙ্কর দ্বন্দ্ব যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়ের আশ্চর্য্য রণকৌশল, অভূতপূর্ব্ব শিক্ষা এবং আত্মরক্ষাপ্রণালী যদি কেহ তখন দেখিতে পাইত সে অবশ্যই এতদুভয়ের বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিয়া পরস্পর প্রণয় সংঘটন করিয়া দিত; দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হইল না। পরিশেষে ধরণীনাথের কৌশলের নিকট আগন্তুক পরাভূত হইলেন, তাঁহার দৃঢ় আঘাতে অশ্ব হইতে পড়িয়া গেলেন। ধরণীও তখন আপন অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এবার অপরিচিত ব্যক্তি ধরাশায়ী হইলেন, ধরণী তাঁহার বক্ষঃস্থলে উপবেশন করিয়া প্রথমতঃ তাঁহাকে নিরস্ত্র করিয়া পরে যেমন তাঁহার কণ্ঠদেশে নিষ্কোষিত অসি ধারণ করিয়া বলিতেছিলেন "এখনই সংহার করিতে পারি, কিন্তু বীরত্ব দেখিয়া ভক্তি উপস্থিত হওয়ায়, বিশেষতঃ ক্ষত্রিয় বিবেচনায় ক্ষমা করিলাম" অমনি পশ্চাদ্দিক্ হইতে এক ব্যক্তি আসিয়া ধরণীর মস্তকোপরি বিশাল খড়্গাঘাত করিল। সৌভাগ্যক্রমে সেই শক্তি উন্নত তরবারিতে আঘাত করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিলেও কাহারও শরীরে লাগিল না। অপরিচিত ব্যক্তি উঠিয়া সেই কাপুরুষকে যার পর নাই তিরস্কার করিলেন। এই ঘটনায় বিবাদকারী ক্ষত্রিয়দ্বয়ের মধ্যে বিশেষ সৌহার্দ্দ হইয়া উঠিল।

অপরিচিত বলিলেন আপনি বীরের উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছেন। আমার পক্ষীয় একজন লোক আসিয়া আপনার উপর আঘাত করিল, আমরা দুইজনে যুদ্ধ করিতেছিলাম তৃতীয় ব্যক্তি আসিয়া সহায় হইল ইহা বিশেষ লজ্জার কারণ হইয়াছে। আমি পরাজিত হইয়া অন্য একজনের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছি, কোন প্রকার সঙ্কেত করিয়া আপনাকে আক্রমণ করিতে আদেশ করিয়াছি অথবা বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বে পরামর্শ করিয়া আসিয়াছি যদি এই সকল ভাব আপনার মনে উদয় হয় তবে আমাকে ক্ষত্রিয়ের

অনুপযুক্ত জ্ঞানে অবজ্ঞা করিবেন সংশয় নাই '। তিনি আরও বলিতেছিলেন কিন্তু ধরণীনাথ বলিলেন ' ক্ষত্রিয়ের মনে কখনও এরূপ ভাব হইতে পারে না। যদি আপনি কাহারও সহায়তা প্রার্থনা করিতেন তাহা হইলেও আমি ভয় করিতাম না, শত শত বীরপুরুষপরিবৃত হইলেও আমি আত্মরক্ষা করিতে জানি।' উভয়েই আগন্তুকের ভবনাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, যুবক তাঁহার আতিথ্যগ্রহণে ক্ষণেক পুর্ব্বেই সম্মত হইয়াছিলেন। এক্ষণে এই সাহঙ্কার বাক্য শুনিয়া অপরিচিত ব্যক্তি বলিলেন ' তবে কি আপনার ইচ্ছা আছে ?' আর উত্তর প্রাপ্তির অপেক্ষা না করিয়াই একটি শব্দ করিলেন, অমনি সহস্র সহস্র সৈন্য নিমিষমধ্যে আসিয়া সে স্থান বেষ্টন করিয়া লইল। যুবক মশালের আলোকে দেখিতে পাইলেন সকলেই সশস্ত্র, আজ্ঞা পাইলেই হয়। মনে বিস্ময় এবং বীরত্ব যুগপৎ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তখন সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া লম্ফ প্রদান পুর্ব্বক অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং একটি বৃক্ষে পৃষ্ঠরক্ষা করিয়া পদাতিকগণকে বলিতে লাগিলেন 'এক এক জন করিয়া ইচ্ছা হয় অথবা সকলে একত্র ইচ্ছা হয় আক্রমণ কর, ঘাটগিরিকেও যদি স্থানচ্যুত করিতে পার আমার একটি চরণও টলাইতে পারিবে না।' অপরিচিত ব্যক্তি কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন। ধরণীনাথের এতাদৃশ সাহস সন্দর্শনে প্রীত হইলেন। আর একটি শব্দ করিবা মাত্র সৈন্যগণ অবসৃত হইল। যেন পৃথিবী দ্বিধা বিভক্ত হইল এবং সকলে তন্মধ্যে প্রবেশ করিল, কে কোথায় গেল তাহার চিহ্নমাত্রও রহিল না। আগন্তুক ধরণীনাথকে বলিলেন আমার ইচ্ছা নাই যে আপনাকে আর আক্রমণ করি। যখন উভয়ের মধ্যে প্রণয়ভাব সংঘটিত হইয়াছে প্রতিজ্ঞা করিলাম আপনার শরীরে আর কখনও অস্ত্র নিক্ষেপ করিব না। যুবক তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার প্রতি আর কখনও শত্রুতা প্রদর্শন করিবেন না এরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন, এবং উভয়ে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। একটি আলোকসমীপে উপস্থিত হইয়া আগন্তুক বলিলেন 'সেনাপতি ! বিপক্ষেরা কতদূর ?' সেনাপতি কহিলেন ' মহারাজ ! তাহারা প্রায় পাঁচ ক্রোশ ব্যবধানে যাইয়া শিবির সন্নিবেশ করিয়াছে, আর ফিরিয়া আসিবে বোধ হয় না। আপনি এখন রাজধানীতে যাইয়া বিশ্রাম করুন্।' ধরণীনাথ আশ্চর্য্য হইয়া অপরিচিত ব্যক্তির মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বলিলেন ' মহারাজ ! না জানিয়া যে অন্যায় কার্য্য করিয়াছি তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।' রাজা যশোধন বলিলেন ' আপনার কোন অপরাধ হয় নাই সমস্ত অপরাধই আমার, আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।' কাঞ্চীরাজ এই কথা বলিবার পর উভয়ে নানাবিধ কথা কহিতে লাগিলেন; তিনি বুঝিতে পা-

ইলেন, ধরণীনাথ শক্রপক্ষীয়, সুতরাং বিরক্ত হইলেন। তিনি গুপ্তভাবে আসিয়া সমস্ত পথ প্রভৃতি জ্ঞাত হইলেন দেখিয়া নিতান্ত চিন্তিতও হইলেন। ধরণীনাথ তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "আমাকে শত্রুমনে করিবেন না। মুসলমানের পক্ষ হইয়া হিন্দুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণও আমার কার্য্য নয়। মন্ত্রীবর মামুদ গাওয়ান আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, এবং অনুগ্রহপূর্ব্বক যুদ্ধবিদ্যা, রাজনীতি প্রভৃতি শাস্ত্র শিক্ষা দিয়া থাকেন। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ, রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে যদি তাঁহার কোন অনিষ্ট হয় তবে তাহার প্রতিকার করিতে পারিব এই আশয়ে যুদ্ধের সময় তাঁহার অনুগমন করিয়াছি। আপনার শত্রুগণ আর ফিরিবে না, তাহারা গৃহাভিমুখে গমন করিয়াছে। মন্ত্রী জীবিত থাকিতে বাহমণিরাজকে আর হিন্দুরাজ্য আক্রমণ করিতেও দিব না।'

যশোধনের বৈরক্তি অপনীত হইল। তিনি তখন যুবকের সহিত বহুবিধ আলাপ করিতে লাগিলেন। যশোধনও যুবক। তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশ অতিক্রম করে নাই সুতরাং তাঁহারা উভয়েই প্রায় সমবয়স্ক, বন্ধুতাও তজ্জন্যই দৃঢ় হইতে চলিল। পথিমধ্যে ধরণীনাথ মন্ত্রীর গুনকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কঠোরব্রতাবলম্বী মুসলমান মধ্যে এমন লোক আছে কাঞ্চীশ পূর্ব্বে জানিতেন না। কথায় কথায় মন্ত্রীর স্বপ্নের বিষয় জ্ঞাত হইলেন। রাজা বলিলেন "রত্নেশ্বর যে স্বপ্ন প্রদর্শন করেন তাহার সকলগুলিই সত্য হয়, এটি মিথ্যা হইবে সম্ভব নয়। ইহার প্রথমাংশ সত্য হইয়াছে। মন্ত্রীদুহিতা গুল্‌নেয়ার আমার আশ্রয়েই আছে। যদি তাহাকে আপনার নিকট প্রত্যর্পণ করি আপনি বোধ হয় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবেন। ধরণীনাথ তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন, কিন্তু মন্ত্রীর শোচনীয় পরিণাম স্মরণ হওয়ায় নিতান্ত বিষাদ সাগরে মগ্ন হইলেন। তাঁহাকে দুঃখিত দেখিয়া রাজাও ম্লান হইলেন, তখন উভয়ে রাজবাটীতে প্রবেশ করিলেন। রাজার অমায়িক বন্ধুব্যবহারে ধরণী প্রীত হইলেন। চতুর্দ্দিকে প্রহরী, অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা কেমন করিয়া পিতার নিকট হইতে উঠিয়াছিল, এবং কোথায় গিয়াছিল, কিরূপেই বা কাঞ্চীপুরে উপস্থিত হইল তিনি আগ্রহাতিশয় সহকারে রাজার নিকট সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু যত আশ্চর্য্যের বিষয়, সকল অবস্থা জ্ঞাত হইয়া তত প্রকাশ করিলেন না, বরং বলিলেন "এরূপ সম্ভবপর!"

সবিশেষ যত্নে আহারাদি সম্পন্ন হইল। যুবক শয়ন করিলেন, রাজাও বিশ্রামার্থ আপন কক্ষে গমন করিলেন।

বলা বাহুল্য যে এরাত্রি ধরণীর নিদ্রা হইল না, তাঁহার মনে হইতে লাগিল 'বজ্রপাত, অট্টালিকা, গবাক্ষ, ধ্রুব নক্ষত্র, স্থির সৌদামিনী, মন্ত্রীর স্বপ্ন, গুল্‌নেয়ারের আশ্চর্য্য অন্তর্ধান, আর? আর কি?— তাঁহার হৃদয়ের চাঞ্চল্য!"

রাত্রি যেরূপেই হউক প্রভাত হইল।

পরদিবস নগরবাসীগণ দলে দলে দেবমন্দিরের শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিতে আসিল। দেবমন্দিরের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, মুসলমানের প্রতি অভিসম্পাত, ভক্তের ক্রন্দন প্রভৃতিতে অনেক সময় গেল। ধরণীনাথ সকল দেখিতে শুনিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষু ঔৎসুক্যের সহিত কাহাকে যেন অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু দেখিতে পাইল না। একবার ছায়ার ন্যায় দেখিয়া তৎপ্রতি ধাবমান হইলেন, কিন্তু আর তিনি দেখিতে পাইলেন না। মনের আবেগ নিবারণ করিতে একবার সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রাসাদটি দেখিয়া আসিলেন, কিন্তু তাহার দ্বার সকল বাহিরের দিক হইতে বন্ধ! তাঁহার সকল পরিশ্রম বৃথা হইল।

বেলা এক ঘটিকার সময় রাজা যশোধন যবনদুহিতাকে সমভিব্যাহারে লইয়া আসিলেন। গুল্‌নেয়ার ধরণীনাথকে দেখিয়া আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, দৌড়িয়া গিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল। সে হস্ত এমন কোমল, তাহার মসৃণ গৌরবর্ণ লতাকান্তিতে এমন অপূর্ব্ব স্নেহরস যে, ধরণীনাথ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু মনুষ্যের মন এমনই চঞ্চল যে, সেই অকৃত্রিম ভ্রাতৃস্নেহের রসাস্বাদন অনেকক্ষণ ঘটিল না। তাঁহার মনে হইতে লাগিল নগরে অবশ্যই এমন কেহ আছে যে এই ক্ষীণাঙ্গী অষ্টমবর্ষীয়া বালিকাকেও তাঁহার কণ্ঠে সংলগ্ন দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিতা হইবে। গুল্‌নেয়ারের অপরাধ কি? গুল্‌নেয়ার সুন্দরী, কালে আরও সুন্দরী হইবে এই তাহার অপরাধ! ‘কাহারও’ হৃদয়ে ব্যথা দেওয়া অনুচিত বিবেচনায় ধরণীনাথ ধীরে ধীরে হস্ত দুইখানি কণ্ঠ হইতে মুক্ত করিলেন এবং বালিকাকে শিবিকায় স্থাপন করিলেন। রাজার সহিত দুই একটি কথা বলিয়া স্বয়ং অশ্বারোহণে নগরের প্রশস্ত বর্ত্মে বাহির হইলেন। রাজা প্রাসাদের বহির্দ্দেশ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিলেন, পরে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় লইলেন। কিন্তু যুবককে মধ্যে মধ্যে আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করার ভুল হইল না। তাঁহার পরিচয় না পাওয়ায় কিঞ্চিৎ দুঃখিত রহিলেন।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছেন পরেই একটি গৃহের ছাদের উপর ধরণীনাথের চক্ষু ধাবিত হইল, আর ফিরিল না। তিনি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। পশ্চাৎ হইতে গুল্‌নেয়ার সহাস্য বদনে সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ধরণীনাথকে কি দেখাইতে লাগিল। পাঠক বোধকরি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, যিনি ধরণীনাথের দৃষ্টিকে এত শীঘ্র, তাড়িত বেগে দিগ্‌দর্শনের কাটার ন্যায় স্থির রাখিয়াছেন তিনি একটি যুবতি রমণী এবং হয়ত তিনি তাঁহার পূর্ব্বপরিচিতা। বাস্তবিক যাহার অনুসন্ধানে সর্ব্বদা তাঁহার চক্ষু চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতেছিল, যাহার অনুসন্ধানে

তিনি রত্নেশ্বরের মন্দিরে গিয়াছিলেন ও ছায়ার ন্যায় দেখিয়া তৎপ্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন এবং যাহার অনুসন্ধান তাঁহার কাঞ্চীপুর আসাও অন্যতর কারণ, ছাদের উপরে তাহারই মনোহারিণী মূর্ত্তি বিরাজিত। পাঠকও তাহাকে অবশ্যই চিনেন, কারণ রত্নেশ্বরের মন্দিরে প্রথমেই তাহাকে দেখিয়াছেন।

প্রমোদিনীও ধরণীনাথের প্রতি প্রশস্তনেত্রে চাহিয়া রহিয়াছিল। আজ তাহার কেমন আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য। বালার্কের কিরণ পরিহিত রক্তবস্ত্রে এবং স্বর্ণচম্পক শরীরে পতিত হইয়া কেমন অপূর্ব্ব দেখাইতেছিল। অপ্রকাশিতহাস্যপূর্ণ আস্যে কি প্রফুল্লতাই বিরাজ করিতেছিল। আমাদের যুবক স্থিরদৃষ্টিতে সেই রূপরাশি দেখিতেছিলেন এবং একমনে তাহার অন্তর্নিহিত ভাবগুলির আলোচনা করিতেছিলেন।

প্রথম সাক্ষাতের স্তম্ভিত এবং বিস্ময়পূর্ণ ভাব অপসারিত হইলে পর ধরণীনাথ একটু হাসিলেন, প্রমোদ হাসিয়া তাহার প্রত্যুত্তর দিল। কিন্তু সেই সুন্দর বদনের সেই মধুর হাসি লুপ্ত হইতে না হইতেই আবার অঞ্চল নাড়িয়া মাথা নোয়াইয়া, অভিবাদন করিয়া দ্রুতবেগে কোথায় চলিয়া গেল। ধরণী অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট এবং অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন, তাঁহার অন্তঃকরণ যেন ছিঁড়িয়া যাইতেছে এমন বোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই প্রমোদের চলিয়া যাওয়ার কারণ অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিতে পাইলেন যে, অদূরে রাজা যশোধন আসিতেছেন। মনে মনে ভাবিলেন ‘ তবে ইনি কি আমার সুখের পথের কণ্টক ? ’ আবার ছাদের উপরে চাহিলেন, কিন্তু এবার আর কিছুই নাই ; শূন্য, শূন্য, শূন্য ; সমস্ত শূন্য, জগত আঁধার। আর ক্ষণমুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া গুল্‌নেয়ারের শিবিকাবাহকদিগকে শিবিকা চালাইতে আদেশ করিলেন এবং নিজেও অশ্ব চালাইয়া দিলেন। অশ্ব চালাইতে চালাইতে আর একবার ছাদের দিকে চাহিলেন কিন্তু এবারও আর কাহাকে দেখিলেন না।

পাঠক এতদুভয়কে কিরূপ মনে করিতেছেন। যুবককে যেরূপই করুণ, প্রমোদিনীকেত অত্যন্ত চপলা প্রগল্‌ভা জ্ঞান করিতেছেন। আমরাও তাহাকে তাহাই জ্ঞান করি, তবে করা যায় কি ; সত্যের অনুরোধে যেরূপ সেইরূপই রাখা হইল।

অনেক দূর চলিয়া গেলে পর বাহকগণ পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রামার্থ একস্থানে পাল্‌কি রাখিল। গুল্‌নেয়ার বাহিরে আসিল এবং ধরণীনাথ অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন। দুই জনে একত্র হইয়া মনের সুখে আলাপ করিতে লাগিলেন। গুলনেয়ার বলিল ‘ দাদা ! আজ কি আশ্চর্য্য সুখ বোধ হইতেছে। তোমায় দেখিলাম, বাবাকে দেখিব। আবার যিনি আমায় এতদিন ভাল বাসিলেন যাওয়ার সময় তাঁহাকেও দেখিলাম। তুমি তাঁহাকে দে-

খিয়াছ, তিনিও তোমায় দেখিয়াছেন। যদি তোমাদের দুইজনের বিবাহ হয় আমি বড় সুখ বোধ করিব। বৌকে দেখিতে পাইব। তিনি বুঝি তোমায় বড় ভাল বাসেন ?'

যুবকের হৃদয় তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল; বালিকা সমস্ত রহস্য জানিতে পারিয়াছে বলিয়া আশ্চর্য্যান্বিতও হইলেন। ভাবিলেন 'যাহা বিশ্বাস করিতে আমার হৃদয় কদাপিও সাহস করে না, বালিকা তাহাই প্রকাশ করিতেছে ?' সস্মিতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'বাঃ তুমি কি বলিতেছ; প্রমোদিনী যে আমাকে ভালবাসেন তাহা তুমি কেমন করিয়া জানিলে ?'

"তিনি সর্ব্বদাই তোমার কথা আলাপ করিতে ভাল বাসিতেন। যখন দুই জনে একত্র বসিতাম, কি সমুদ্র তীরে বেড়াইতে যাইতাম, কি নিদাঘগৃহে উপবিষ্ট থাকিতাম সর্ব্বদা কেবল তোমার কথাই জিজ্ঞাসা ও আলাপ করিতেন। তোমার কে আছে, একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম কেহ নাই। তুমি বিবাহ করিয়াছ কি না একদিন তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, না, বিবাহ করিলেত বৌ দেখিতাম। তোমার অনেক টাকা আছে কিনা তাহাও জিজ্ঞাসা করিয়াছেন আমি তাহাও নাই বলিয়াছি, কারণ থাকিলেত আমি সকলই জানিতাম।'

যুবক হাসিতে লাগিলেন; হৃদয় কতকটা আশ্বস্ত হইল। গুল্‌নেয়ার বলিল 'দাদা! আর তুমি এখানে আসিও না। প্রমোদিনী পুনঃ পুনঃ আমায় তোমাকে নিষেধ করিতে বলিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন তুমি যাহাকে অত্যন্ত ভালবাস ও বিশ্বাস কর সে তোমার শত্রু, মিত্র নয়। হয়ত সুযোগ পাইলে তোমার প্রাণনাশ করিবে; প্রয়োজন হইলে তোমাকে হত্যা করা তাহার পক্ষে সহজ!' যুবক চমৎকৃত হইলেন, কিছুই বুঝিলেন না। মনে লেশমাত্রও শঙ্কা জন্মিল না, কিন্তু হৃদয় গভীর সন্দেহে আলোড়িত হইতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সংসারে কৃতজ্ঞতা।

কি ঘোর অন্ধকার! প্রকৃতি কেমন নিস্তব্ধ! কোন স্থানে একটি পত্র শাখাচ্যুত হইলে যে পরিমাণে শব্দ হওয়া সম্ভব তাহাও শ্রুতিগোচর হইতেছে না। প্রকৃতি শ্মশানবৎ ভয়ঙ্করী। সকলই নীরব। কেবল অদূরে একটি বালিকার অনতিপরিস্ফুট বিলাপপূর্ণ করুণকণ্ঠধ্বনি শুনা যাইতেছে,—কি কহিতেছে, কাহার নিকট কহিতেছে, কিছুই বুঝা যায় না। রজনী দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। এই সুবিস্তীর্ণ ধরাতল—মনুষ্যলোকের নন্দনকানন—মানবজীবনের নাট্যশালা—নৃত্য গীত বাদ্য প্রভৃতি আমোদজনক ঘটনাপুঞ্জের প্রিয় নিকেতন পৃথিবী—এক্ষণে শ্মশান!

যদি শ্মশানের একাংশ অন্য অংশ অপেক্ষা ভয়ানক হয় তবে সে স্থান আজ, এই অমাবস্যার তামসী নিশীতে, দেবগিরির কারাগৃহ। বহির্দ্বার রুদ্ধ করিয়া সশস্ত্র প্রহরী দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছে। তাহার অভ্যন্তরে, এই যমচক্রের মধ্যস্থলে একজন বৃদ্ধ আবদ্ধ রহিয়াছেন। জীবনে সকল প্রকার অদ্ভুত অভিনয় প্রদর্শন করিয়া এক্ষণে চরম অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আর একটি কুসুমকলিকা সদৃশী বালিকা, গবাক্ষ সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া রোদন করিতেছে। প্রহরীগণ তাহার রোদনে দ্রবার্দ্র হইয়া নিয়ম এবং আদেশের বিরুদ্ধেও তাহাকে রাত্রিতে প্রাচীরাভ্যন্তরে থাকিতে দিয়াছে। নিষেধ করিতে পারে নাই। নিজ নিজ সন্তান স্মরণ করিয়া পরুষ হস্তে তাড়াইয়া দেয় নাই।

" বাবা! বাবা! বাবা!—তুমি সুমুর দিচ্ছ না যে। ও কি, তুমি কান্দিতেছ যে বাবা! তোমাকে এখানে এমন করে আনিয়া বদ্ধ করেছে কেন? আমাকেই বা আসিতে দিতেছে না কেন! আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না বাবা! তুমি ওদিগকে বল আমাকে তোমার নিকট আসিতে দিউক, আমি আসিয়া তোমার কোলে বসি। আমার মন যে কেমন করিতেছে, আমার কান্না আসিতেছে। বাবা! তোমার এরূপ অবস্থা আমার সহ্য হয় না, আমাকে তোমার নিকটে নেও। আমি আর কতক্ষণ বাহিরে অন্ধকারে দাড়াইয়া থাকিব! হীমে আমার শরীর শীতল হইতেছে। আমি আসিয়া তোমার চক্ষু মুছাইয়া দি।" এই বলিয়া লৌহশিক দুইটির মধ্যদিয়া গবাক্ষপথে বালিকা আপনার ক্ষুদ্র হস্ত দুখানি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করাইল। প্রাচীরের বেধ অধিক, হস্ত ক্ষুদ্র। অভাগিনী চেষ্টা করিল কিন্তু তাহার পিতার হৃদয়ে স্থাপন করিয়া, চক্ষু মুছাইয়া দিয়া সুখী হইতে বা সুখী করিতে পারিল না।

বৃদ্ধ কান্দিতেছিলেন। ক্রন্দন সংবরণ করিয়া বাহু প্রসারণ করিয়া সেই ক্ষুদ্র হস্ত দুখানি আপন হস্তে লইলেন। তাহার মনে এক্ষণে কি ভাব, কে বলিবে? নিরাশ্রয়া বালিকা কারাগৃহের প্রাচীরাভ্যন্তরে অথবা গৃহে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। তিনি তাহার পিতা অথচ সাহায্য করিতে পারিতেছেন না। দুঃখ তাঁহার হৃদয় মুখবদ্ধ পাত্রের উত্তপ্ত আধেয়বৎ দগ্ধ করিতে লাগিল। আর সংবরণ করিতে পারিলেন না। আবার কান্দিয়া ফেলিলেন;—তাঁহার ক্রন্দনে বালিকাও উচ্চৈঃস্বরে কান্দিয়া উঠিল।

অভাগিনী আজ রাত্রিতে হতাশ হৃদয়ে ব্যাকুল হইয়াছে, রাত্রি শীঘ্র প্রভাত হউক প্রার্থনা করিতেছে। কিন্তু প্রভাতে তাহার যে কি দশা ঘটিবে তাহা কি সে বুঝিতেছে? ভাবিতেছিল শাহের পায় ধরিবে, বেগমদের পায়ে পড়িবে তাহা হইলে মন্ত্রী অবশ্যই মুক্তিলাভ করিবেন। তাহার পিতা আবার তাহাকে ক্রোড়ে

লইবেন। কিন্তু প্রাতঃকালে শাহের মুখ হইতে যে কি অব্যর্থ নিদারুণ বাক্য বাহির হইবে তাহা সে কি প্রকারে বুঝিতে পারিবে।

সহসা কারাগৃহের দ্বার উন্মুক্ত হইল। একজন লোক গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার রোধ করিল। বালিকা দৌড়িয়া যাইয়াও প্রবেশ করিতে পারিল না। তাহার আর সহ্য হইল না, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বৃদ্ধের হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিল।

পাঠক এতক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন বাহমণি রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী মামুদ গাওয়ান কারারুদ্ধ। তাঁহার অপরাধ কি জানেন না, অথচ তিনি কারারুদ্ধ! তিনি এই সুবিস্তীর্ণ রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াও দরিদ্র, অপ্রমেয় ক্ষমতা সত্বেও দুর্ব্বল, একান্ত প্রভুপরায়ণ হইয়াও প্রভুর নিগ্রহভাজন। ধন্য সংসারের কৃতজ্ঞতা! যিনি আপনার ভুজবলে ও বুদ্ধিকৌশলে, একটি ক্ষুদ্র প্রদেশকে সাম্রাজ্যে পরিণত করিয়া সুশাসন জন্য প্রাচীন রাজ্যের অপেক্ষা সুবৃহৎ আটটি প্রদেশে বিভক্ত করিলেন, নর্ম্মদা হইতে কৃষ্ণা নদী পর্য্যন্ত এবং সাগর হইতে সাগর পর্য্যন্ত, পশ্চিম উপকূল হইতে পুর্ব্বোপকুল পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ অধিকার ও সুশাসিত করিলেন; শাসনকর্ত্তাগণের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়া বিদ্রোহের ভয় দূরীকৃত করিলেন এবং আপন জায়গীর, আপন সম্পত্তি অসন্তুষ্ট ওমরাবর্গমধ্যে বণ্টন করিয়া নিজের মহানুভব উদার প্রকৃতির পরিচয় দিলেন অদ্য তাঁহার এই শোচনীয় দশা!

বালিকা গবাক্ষপথে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া গৃহের অভ্যন্তরস্থ ক্ষীণালোকে ভয়চকিতচক্ষে প্রবেশকারীকে দেখিতে লাগিল। সে ব্যক্তি পরিচিত, এতকাল তাতার পিতার অন্নে প্রতিপালিত। নাম হুসেন বেহারী। হুসেনকে দেখিয়া বালিকা ভীতা হইল। এক একবার আকাশ পানে চাহিতে লাগিল। কিন্তু শ্রাবণের আকাশ মেঘাবৃত, তাহাকে আশ্বস্ত করিতে যদি একটি নক্ষত্র কোথাও বাহির হইতে চেষ্টা করিত অমনি নির্দ্দয় মেঘ আসিয়া তাহা ঢাকিয়া ফেলিত। তাই বুঝি ভীতা হইতেছিল!

হুসেন বলিল 'মহাশয়! যখন একটি স্ত্রীলোকের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম, তখন প্রবল পরাক্রান্ত চিতোরের মহারাণীর হস্ত হইতে আপনিই আমায় রক্ষা করেন। দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলাম বলিয়া মিষ্ট ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আশ্রয় দিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল প্রতিপালন করিয়া আপনিই আমার উন্নতির পথ করিয়া দিয়াছেন, অতএব আপনার বিপদে আমারও বিপদ। রাজার বিপক্ষ হওয়াও মহাপাপ, আমি আপনাকে যে পরামর্শ দিতেছি তাহাতে সম্মত হউন। এই দরখাস্তে নাম সাক্ষর করুন।' এই বলিয়া দরখাস্ত পড়িতে আরম্ভ করিল।

" এতকাল সাধ্যানুসারে আপনার কার্য্য করিয়াছি, এখন বৃদ্ধ বয়সে যদি কোন অন্যায় করিয়া থাকি তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমি ভ্রান্ত হইয়া এরূপ কাজ করিয়াছি, এক্ষণে অনুতাপ হইতেছে। আমি মন্ত্রীত্ব পরিত্যাগ করিলাম, অবশিষ্ট জীবন কারাগৃহে যাপনেও সম্মত আছি, তথাপি যেন আমার শোণিতপাত না হয়।"

স্থিরপ্রকৃতি গাওয়ান আজ ক্রুদ্ধ হইলেন। দরখাস্তখানা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং হুসেনের প্রতি তীব্র দৃষ্টি করিলেন। হুসেন ছিন্ন দরখাস্ত তুলিয়া লইল এবং ভীত হইয়া দ্রুতপদে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। বালিকা আবার এই সুযোগে যেমন গৃহে প্রবেশ করিতে অগ্রসর হইতেছিল, দুরাচার দয়ার মস্তকে পদাঘাত করিয়া সেই সরলা বালিকার গ্রীবা ধরিয়া শূন্যে উঠাইল এবং সেই অবস্থায় তাহাকে প্রবেশ করিতে দিয়াছে বলিয়া প্রহরীগণকে ভয় প্রদর্শন ও গালি প্রদান করিতে লাগিল। গুল্‌নেয়ারকে আরও শূন্যে উঠাইয়া সজোরে প্রাচীরের বহিঃস্থিত বর্ত্মে প্রস্তরোপরি নিক্ষেপ করিল! পাপী উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল "যাহারা অন্যের উপার্জ্জনের ব্যাঘাত জন্মায় তাহাদের এই দশাই ঘটে! হাঃ! আমি যে কালসাপ জান না? দশচক্রে ভগবান ভূত!" মন্ত্রী শুনিলেন, বুঝিলেন, বালিকার যে বিপদ ঘটিল তাহাও জানিতে পাইলেন। একজন প্রহরী কাঁদিয়া গিয়া সকল কথা কহিল, কিন্তু তিনি আর যে মন্ত্রী নহেন, বিষশূন্য বিষধর মাত্র!

কালরাত্রি প্রভাত হইল। মহম্মদ শাহ সিংহাসনে আসীন হইয়া কঠোরস্বরে বলিলেন "পাপীষ্ঠ বৃদ্ধ মন্ত্রীকে আমার সমক্ষে আনয়ন কর।"

আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র মসায়ুদ প্রভৃতি আবিসিনীয় দাসগণ রক্তবস্ত্রে কৃষ্ণকায় সজ্জিত করিয়া সশস্ত্র ধাবমান হইল। ওমরাগণ সকলেই প্রফুল্ল অথচ চিন্তিত এবং বাহ্যিক আকারে কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ। তাহারা 'কি হয়' কেবল এই ভাবনায় অস্থির হইল।

দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। মামুদ গাওয়ান দাতকপরিবেষ্টিত হইয়া প্রাচীরের বাহিরে আসিলেন। কি শোচনীয় দৃশ্য! ইহা যদি গুল্‌নেয়ারের নয়নগোচর হইত? গুল্‌নেয়ার এখন কোথায়?

মন্ত্রী বাহিরে আসিলেন; দেখিলেন বহির্দ্বারের অনতিদূরে একটি বালিকা শয়ান রহিয়াছে। তাহার বাম হস্ত মস্তকের নীচে, দক্ষিণ হস্তে দক্ষিণ চক্ষু আবরিত, যেন সূর্য্যকিরণ চক্ষে বিদ্ধ হইয়া নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইবে বলিয়া এরূপভাবে চক্ষু ঢাকিয়া রাখিয়াছে। কৃষ্ণবর্ণ কেশজাল অর্দ্ধাবৃত শরীরে, অনাবৃত মুখকমলে, এবং হস্তে, অর্দ্ধাবৃত করিয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিকাশ করিতেছে। ক্ষীণ শরীরে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ! অর্দ্ধাবৃত মুখকমলে সৌ-

ররশ্মি পতিত হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন রজনীতে সুন্দরী প্রদীপহস্তে গৃহান্তরে যাইতেছে ! শরীরে অলঙ্কার নাই, কে যেন বলপূর্ব্বক সে সকল অপহরণ করিয়াছে। প্রমোদিনী যে সকল বহুমূল্য রত্নে এই সোনার প্রতিমাখানি সাজাইয়াছিলেন তাহার চিহ্নমাত্রও নাই। মাথার কতকাংশ শোণিতসিক্ত। গাওয়ান সিহরিয়া উঠিলেন। তিনি বুঝিলেন স্বপ্ন সফল হইল, হতভাগিনী জীবিতা নাই ! করুণস্বরে বলিলেন " দেখ ভাই ! এতকাল তোমরা অনুগ্রহ করিয়া আমার কথা শুনিয়াছ আজ সেই পূর্ব্বের কথা মনে করিয়া আমাকে একবার জন্মের মত ভাল করিয়া দেখিতে দেও ! " কেহ কেহ সম্মত হইল। মসাসুদ বিকট হাস্য করিয়া বলিল " রাজবিদ্রোহীর প্রতি আবার অনুগ্রহ ? " অমনি শাণিত তরবারি হস্তে লইয়া তাঁহার চক্ষুর নিকট ধরিল। তখন সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্য হইতে বাধ্য হইয়া অতি কষ্টে চক্ষু ফিরাইয়া লইলেন। একটি উষ্ণ নিঃশ্বাস নির্গত হইল !

মহম্মদশাহ এখন পর্য্যন্ত সুরায় উন্মত্ত। পূর্ব্বদিন প্রাতঃকাল হইতে পান আরম্ভ করিয়াছেন, এপর্য্যন্ত প্রায় বিরতি নাই। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহার পারিষদবর্গ মন্ত্রীর অনুপস্থিতি সময়ে তাঁহার হস্তে এক খানা লিপি প্রদান করিয়াছিল। তাহাতে লিখিত ছিল যে, যদি উড়িষ্যারাজ বিদ্রোহী হইয়া দেবগিরি আক্রমণ করিতে পারেন, মন্ত্রী তাঁহার সহায়তা করিবেন। যুদ্ধে যে রাজ্যলাভ হইবে উভয়ে দ্বিভাগ করিয়া লইবেন। পত্রখানি যেন দৈবাৎ ধৃত হইয়াছে এইভাবে সেই পত্রবাহকসহ শাহের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছিল। লোকটিকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল " কিসের পত্র জানি না। মন্ত্রী মহাশয় মধ্যে মধ্যে অতি গোপনে এই মত আরও লিখিয়া আমার দ্বারা পাঠাইয়া থাকেন, আমিও উড়িষ্যারাজকে দিয়া উত্তর আনিয়া থাকি, আর কিছুই জানি না। " শাহ সাক্ষর দেখিলেন। মোহর গাওয়ানের তাহাতে সংশয় নাই। পারিষদবর্গকর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া মন্ত্রীকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন, অদ্য তাঁহার বিচার। মন্ত্রী গৃহে গমন করিয়াছিলেন, সন্ধ্যার সময় তাঁহাকে কারাগারে আনয়ন করিয়া রাখা হইয়াছিল।

শাহ নিতান্ত কদর্য্য ভাষায় গালিবর্ষণ করিয়া গাওয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন " এ সাক্ষর কার ? " মন্ত্রী লিপিখানি হস্তে লইয়া পাঠ করিলেন, কিছুকাল বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া চাহিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন " হাঁ ! এ মোহর আমারই বটে, কিন্তু এই লিপির বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। "

শাহ ক্রোধকম্পিত কলেবরে তাঁহার প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। হুসেন বলিল " বৃদ্ধ মৃত্যু নিকট বলিয়া ভয় পাইয়াছে, কিন্তু বুঝিতেছে না যে অপরাধ

স্বীকার করিলে দোষের অনেক মার্জ্জনা হইতে পারে!” মহম্মদ তাঁহার প্রাণনাশ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, অন্য কোন রূপ শাস্তি দিবেন ভাবিতেছিলেন। তখন মন্ত্রী হুসেনের ভৎর্সনা অসহ্য হওয়ায় বলিয়া উঠিলেন “ভীরুরা মৃত্যুর পূর্ব্বে সহস্রবার যমযন্ত্রণা ভোগ করে। কিন্তু সাহসীগণ একবার বই মরে না।” শাহ ভাবিলেন মন্ত্রী প্রকৃত অপরাধী না হইলে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন। এক্ষণে সে সাহস নাই বলিয়া মৃত্যুই নিশ্চয় জানিয়াছেন। এমন সময় হুসেন পূর্ব্বরাত্রির ছিন্ন দরখাস্ত খানি তাঁহার হাতে দিয়া কহিল “এই দেখুন অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল, কিন্তু ক্ষমা করিবেন না ভয়ে নিজেই ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে।”

শাহ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি এদরখাস্ত ছিঁড়িয়াছ?” মন্ত্রী বলিলেন “হাঁ! কিন্তু আমি লিখি নাই।”

মাত্র ‘হাঁ’ শাহের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ঘাতকদিগকে আদেশ করিলেন ক্ষণবিলম্ব না করিয়া মন্ত্রীর শিরচ্ছেদ কর। বৃদ্ধ গম্ভীর ভাবে বলিলেন, “আমার মৃত্যু সামান্য কথা, আমি এজন্য অনুমাত্রও ক্ষুব্ধ নহি। কিন্তু যে রাজ্য গঠন করিতে আমার মস্তিষ্ক অহোরাত্র ঘূর্ণিত হইয়াছে আমার মস্তকের সহিত সে রাজ্যও মস্তকহীন হইবে।” শাহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। ঘাতকগণ গাওয়ানকে প্রস্তুত হইতে বলিল। হুসেন অনুচরবর্গের সহিত আহ্লাদে মগ্ন, উপকারীর প্রাণ দণ্ড দর্শন করিতে দাঁড়াইল। একবার মসায়ুদের কাণে কাণে বলিল “শুভ কর্ম্মে বিলম্ব ভাল নয়। ধরনী নাথ এবং এসফ্ আদেল উপস্থিত হইলে বিঘ্ন ঘটিতে পারে।” কৃতঘ্ন পামর তখন বুঝে নাই যে, যে হস্তে উপকারীর শিরচ্ছেদ হইল কএকদিন পরে সেই হস্তই তাহার মস্তক দেহচ্যুত করিবে। ঘাতকও বুঝিল না যে তাহারও সেই দশা ঘটিবে।

ধর্ম্মপ্রচারক মহম্মদের সদ্গুণসমূহের অনুকৃতি, ভারতীয় মুসলমান ইতিহাসের সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিরোরত্ন, দেবগিরির উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ মামুদ গাওয়ান রাজাজ্ঞায় মস্তকদানে প্রস্তুত। তিনি এক একটি কথা বলিয়া গম্ভীর ভাবে সকলের নিকট বিদায় লইলেন, যদি কখনও কোন অপ্রিয় কার্য্য করিয়া থাকেন তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। এসফ্ এবং ধরণীনাথের নিকট যাহাতে এই ঘটনা প্রচারিত হইয়া প্রতিহিংসা লওয়া স্থলে দেশীয় লোকের রক্তপাত না হয় তজ্জন্য প্রত্যেককে অনুরোধ করিলেন। জানুর উপর বসিয়া পশ্চিম দিকে মুখ রাখিয়া ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন। শ্বেতকেশ শ্বেতশ্মশ্রু প্রশান্ত মুখমণ্ডল অনির্ব্বচনীয় সৌম্যভাব ধারণ করিল। মসায়ুদ এই অবস্থায় তাঁহার মস্তকে সুতীক্ষ্ণ খড়্গাঘাত করিল। মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতলে

পতিত হইল!! সকলে স্তম্ভিত হইল! ছিন্নমুণ্ডেও কোন প্রকার ক্লেশের চিহ্ন প্রকাশ পাইল না! তৈলশূন্য দশা-মাত্রাবশিস্ট প্রদীপ হঠাৎ বাতাস আ-সিয়া নির্ব্বাণ করিল, কিন্তু তাঁহাতে ধুঁয়াও নির্গত হইল না!!!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

হরিষে বিষাদ।

একদিন দুইদিন তিনদিন করিয়া স-চিবরত্ন মামুদের শোচনীয় হত্যা কাণ্ডের পর সপ্তাহ গত হইল। এই সময় এসফ্ দক্ষিণে এবং ধরণীনাথ বিজাপুরে ছিলেন। সপ্তাহ পর তাঁহারা উভয়েই আসিয়া উপ-স্থিত হইলেন। দেখিলেন, রাজসভার কার্য্যবন্ধ হইয়া আছে, নগরবাসী এবং প্রজাবর্গ হাহাকার করিতেছে; বিদেশীয় শাসনকর্ত্তারা নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠি-য়াছেন, হিন্দু রাজগণ স্ব স্ব অধিকার বিস্তারে প্রয়াস পাইতেছেন। মহম্মদ শাহ অন্তঃপুরেই অহোরাত্র অবস্থান করেন, এ-কেবার সর্ব্বনাশ উপস্থিত। বাহমণি রাজ্য ছার খার হয়।

কি জন্য এরূপ হইল তাহা আর অনু-সন্ধান করিয়া জানিতে হইল না। শত শত লোক হাহাকার করিয়া মন্ত্রীর শোচ-নীয় পরিণামের বিষয় জ্ঞাপন করিল। ধরনী ও এসফ্ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা জানিতে পাইলেন, মোহররক্ষক-কে সুরাপান করাইয়া তাহাদ্বারা কাগজে সাক্ষর করাইয়া লইয়াছিল, এবং পামর হুসেন সেই কাগজে জাল চিঠি প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা মামুদের সর্ব্বনাশ সাধন ক-রিয়াছে। তাঁহারা আরও অবগত হইলেন যে মন্ত্রীদুহিতাও সেই নির্দ্দয় দুরাচারের হ-স্তেই নিহত হইয়াছেন। আর কে হুসেনকে রক্ষা করে? আর কে আসিয়া ষড়যন্ত্র-কারী ওমরাগণের সহায় হয়। কে ই বা মসায়ুদ প্রভৃতি আবিসিনীয় দস্যুবর্গের দেহ ও মস্তক একত্র রাখে? ফণি মণ্ডলা-কারে বেষ্টন করিয়া নিদাঘসূর্য্যের প্রচণ্ড তাপে নিশ্চল হইয়া আছে, নিদ্রা যাই-তেছে। তাহাকে একবার জাগরিত কর ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া উঠিবে, তৎক্ষণাৎ দংশন করিবে। তীব্র বিষ শীঘ্রই আত-তায়ীর জীবন হনন করিবে। আততায়ী ষড় যন্ত্রকারীগণ কাল সর্প জাগরিত করিল, কে আর তাহাদিগকে রক্ষা করে?

বৃদ্ধা বেগম মন্ত্রীকে পুত্র অপেক্ষাও অধিক স্নেহ করিত, তাঁহার শোচনীয় মৃত্যু সংবাদে যারপর নাই ব্যথিত হইলেন, এবং ইহা যে শুদ্ধ কুলোকের কুচক্র তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন। সুতরাং পু-ত্রকে প্রতিহিংসা লইতে আদেশ দিয়া ম-ন্ত্রীর মৃত্যুর তিন দিবস পরেই পৃথিবী পরি-ত্যাগ করিলেন। প্রতি দিন যে ভাবে স-হস্র সহস্র লোক জলে জল, মৃত্তিকায় মৃ-ত্তিকা বায়ুতে বায়ু মিশাইতেছে তিনিও সেইরূপ মিশাইলেন! শাহ প্রকৃতিস্থ হই-

য়াই গত বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, মাতৃদত্ত উপদেশে আপনার অপরিস্ফুট সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হইল, আবার ধরনীনাথ এবং এসফ্ আসিয়া তন্ন তন্ন করিয়া যখন সকল বিবরণ জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন তখন তিনি উন্মত্তবৎ হইলেন। তৎক্ষণাৎ ষড়যন্ত্রসংলিপ্ত সকলকে হত্যা করিতে আদেশ দিলেন। অনতিবিলম্বে আদেশ কার্য্যে পরিণত হইল। তখন ধরনীনাথ এ পাপ পুরী পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে চলিয়া গেলেন। এসফ্ও বিজাপুরে গমন পূর্ব্বক স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস পাইলেন। দেখিতে দেখিতে বাহমণি রাজ্যের সমস্ত উত্তরাংশ হিন্দুরাজ্যভুক্ত হইয়া গেল।

মহম্মদ শাহ দিন দিন অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। একদিন প্রিয়তমা নূরন্নেহারের সহিত একগৃহে শয়ন করিয়া আছেন, গৃহে প্রদীপ স্তিমিতভাবে জ্বলিতেছে। এমন সময়ে মহম্মদ দেখিলেন, ছায়ারূপী মন্ত্রী আসিয়া প্রদীপের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন "প্রতিহিংসা লওয়া হইয়াছে, আর চিন্তা কেন? রাজ্য শাসন কর। দুই দিন পরে সকলেই একত্র হইব।" মহম্মদ চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন। নূরন্নেহার নিদ্রা হইতেই সেই বজ্রনির্ঘোষবৎ গম্ভীর স্বর শ্রবণ করিয়া জাগরিত হইলেন। উভয়েরই বিশ্বাস হইল মন্ত্রীর আত্মা শরীর ধারণ করিয়া আসিয়াছিল। এই অবধি প্রতিদিন স্বপ্নে ভয়ানক হত্যাকাণ্ড দেখিতেন, দিবসেও "মামুদ গাওয়ান আমাকে খণ্ড খণ্ড করিল, হৃদয় বিদীর্ণ করিল" এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেন। ইহার পর তিনি এক বৎসরমাত্র জীবিত ছিলেন, এই সময়ের মধ্যে তাঁহার আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম কোন বিষয়েই প্রণিধান ছিল না। পরিশেষে তাঁহার অল্পব্যাপী অথচ গৌরবপূর্ণ জীবনের অবসান হইল; জলবুদ্বুদের ন্যায়, আতোষ বাজীর অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায়, নশ্বর জীবনের ক্ষণস্থায়ী ঘটনাবলীতে দর্শকবৃন্দের নয়ন ও মন তৃপ্ত করিয়া অনন্তসাগরে মিশিয়া গেলেন! তাঁহার অভাবে রাজ্যের যে অবস্থা হইয়াছিল, ইতিহাসবেত্তা পাঠকগণ সবিস্তার জ্ঞাত আছেন।

গুলনেয়ার কিরূপে তাহার পিতার নিদ্রিতাবস্থায় শিবিরমধ্য হইতে বাহিরে আসিল এবং কিরূপেই বা সে কাঞ্চিপুরে নীত হইল, সময় অভাবে আমরা এপর্য্যন্ত তাহা বিবৃত করি নাই। এখন এস্থলে তাহা গ্রহণ করিলাম।

গুলনেয়ার মন্ত্রীর পটমণ্ডপে শয়ান ছিলেন। সহসা স্বপ্নে দেখিল যেন তাহার পিতা শয্যায় নাই, কোথায় যাইতেছেন। বালিকা উঠিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। তিনি দ্রুত যাইতে লাগিলেন সেও দৌড়িতে আরম্ভ করিল। অবশেষে তাঁহাকে পশ্চাদ্ভাগে রাখিতে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া দৌড়িয়া তাঁহাকে ছাড়াইয়া

অনেক দূরে গেল। কিন্তু পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া দেখিল তাহার পিতা নাই। চমকে নিদ্রাভঙ্গ হইল। দেখে যে কোথায় শিবির, কোথায় তাহার পিতা, আর কোথায় বা তাঁবু। মাঠের মধ্যে একাকিনী দাঁড়াইয়া আছে! তাহার ক্ষুদ্র শরীর কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রে মণ্ডিত ছিল, অন্ধকারে কোন্ দিক দিয়া কেমন করিয়া বাহির হইয়াছে কেহই দেখে নাই। পূর্ব্বেও এরূপ স্বপ্ন দেখিত কিন্তু কখনও এমন ভয়ানক অবস্থায় পতিত হয় নাই।

অদূরে একটি আলোক দেখিয়া ভাবিল সেই খানে তাহার পিতা থাকিতে পারেন। অগ্রসর হইয়া দেখিল একজন সন্ন্যাসী। সে যোগবলেই হউক, অথবা তাহার অবস্থা দেখিয়াই হউক, সমস্ত বুঝিয়া তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া কাঞ্চীপুরে আনিয়া এবং প্রভাত সময়ে তাহাকে রাজার নিকট রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইল। গুল্নেয়ার এত ভীতা হইয়াছিল যে, কএক দিন একটি কথাও বলিল না। পরিশেষে প্রমোদিনী ও ক্ষণপ্রভার সহিত একত্র অবস্থান করিয়া মনের অনেক কষ্ট ভুবিয়া গেল।

কোমলহৃদয়া ললনাদ্বয় যবনদুহিতাকে সহোদরার মত স্নেহ করিতেন। তাহাকে তাহার পিতৃ পরিবারস্থ সকলের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। বালিকা অন্যান্যের সহিত ধরণীনাথের নাম লইত, এবং শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিত। প্রমোদও শুনিতে ব্যগ্র হইয়া প্রতিদিনই জিজ্ঞাসা করিত এবং সেই কোমলকণ্ঠে প্রিয়তম নামের মধুরতায় তাঁহার শ্রবণের তৃপ্তি সাধন করিত। সর্ব্বদাই শুনিত ধরণীনাথ, ধরণীনাথ। একদিন গুল্নেয়ার জিজ্ঞাসা করিল, আপনার নাম কি? প্রমোদ বলিল 'ধরণী'। বালিকা বুঝিল না, চাহিয়া রহিল। প্রমোদিনী তাহার গাল টিপিয়া ধরিয়া হাসিতে লাগিল, আবার অল্পক্ষণ পরেই একটি নিঃশ্বাস ছাড়িয়া অন্যদিকে তাকাইল।

কুমারী ক্ষণপ্রভা এবং প্রমোদিনী, ধরণীনাথ নাম কিরূপে জানিল তাহা বলিয়া দেওয়া আবশ্যক। প্রথমেই সমুদ্রতীরে যাঁহার সঙ্গে পাঠকের দেখা হইয়াছে, যিনি বজ্রের শব্দে অচেতন হইয়া একটি অট্টালিকার সোপানোপরি পড়িয়া গিয়াছিলেন এবং যিনি অট্টালিকামধ্যস্থিতা রমণীদ্বয়ের সেবায় পুনরায় সংজ্ঞা, বলিতে গেলে এক রকম জীবন, লাভ করিয়াছিলেন, তিনিই ধরণীনাথ। তিনি অনুরুদ্ধ হইয়া সে রাত্রি সেখানে যাপন করিলেন, কিন্তু পরদিন অতি প্রত্যুষে আসিয়াও ক্ষণপ্রভা আর তাঁহাকে দেখিতে পারিল না। দেখিল তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বহুমূল্য পরিচ্ছদ,একখণ্ড বহুমূল্য হীরক, এবং একছড়া উৎকৃষ্ট গজমুক্তাহার একখানি রুমালে বাঁধা আছে, একখণ্ড কাগজে "প্রমোদিনী" নামটিও তাহার মধ্যে লিখিত রহিয়াছে। কারুকার্য্যখচিত স্বর্ণ-

মণ্ডিত একটি শিরস্ত্রাণ নিকটে পড়িয়া আছে, তাহার একপার্শ্বে লেখা আছে ধরণী নাথ।" সকল আছে কিন্তু তিনি কোথায়? উন্মুক্ত গবাক্ষ পথে দৃষ্টি সঞ্চালন করিল, দেখিল, মৃত অশ্বটিকে কাককুকুরে ভক্ষণ করিতেছে। তাঁহার মন নিতান্ত বিকল হইল। কিন্তু কিছু প্রকাশ করিল না। প্রমোদিনীর নাম লিখিত দেখিয়া তাহার সুখ বোধ হইল না, নামটি ছিঁড়িয়া ফেলিল। এমন সময় প্রমোদিনীও সেই স্থানে আসিল। ঐ সমস্ত বস্তু দেখিয়া তাহার মনে নানাপ্রকার ভয়ের উদ্রেক হইল, চিত্ত অধীর হইয়া উঠিল; ক্ষণপ্রভার মুখের দিকে তাকাইল কিছু কহিতে পারিল না; কিন্তু ক্ষণপ্রভা যখন জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি মনে হয়? এসকলের অর্থ কি?" তখন তাহার মাথা ঘুরিতে, নাসিকারন্ধ্র স্ফীত ও বক্ষস্থল একবার উন্নত একবার অবনত হইতে লাগিল, এবং ঘন ঘন নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল। প্রমোদকে বুঝাইতে ক্ষণপ্রভা কত বলিতে লাগিল, কিন্তু যে হৃদয় ক্ষণমাত্র সময়েতে একবারে আত্মদান করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহাকে বুঝান সামান্য কথা নহে। প্রমোদ মাথা ধরিয়া প্রাচীরাবলম্বনে বসিয়া পড়িলেন। এক ঘণ্টা এইরূপে অতিবাহিত হইলে পর আশা আসিয়া তাহার কাণে কাণে মৃদুমধুর স্বরে কি যেন বলিয়া গেল, অমনি উঠিয়া যত্ন পুর্ব্বক পথিকের সকল সংগ্রহ করিয়া লইল। আপনার হৃদয়ের, সতর্ক মনের অজ্ঞাতসারে মুক্তাকণ্ঠী কণ্ঠেধারণ করিল, সমস্ত শরীর সিহরিয়া উঠিল। শিরস্ত্রাণে নামটি দেখিয়া পুনঃ পুনঃ পাঠ করিল। পাঁচ সাতবার মনে মনে পড়িয়া একবার প্রকাশ্যে পড়িল "ধরণীনাথ।" ক্ষণপ্রভা যে নিকট ছিল তাহা তাহার মনেও ছিল না, সুতরাং ক্ষণপ্রভা হাসিয়া উঠিলে প্রমোদ লজ্জিত হইয়া মস্তক অবনত করিল। ক্ষণপ্রভা বলিল "আমাকে দেখিয়া ভয় কি? এজন্মে ভয় করিও না।" প্রমোদিনী মনে মনে বলিল "তবে কি জন্মান্তরে আমাকে বঞ্চিত করিবে?"

কুমারীদ্বয় গৃহগমন করিবার সময় নিদাঘগৃহের রক্ষককে ডাকাইয়া পথিকের বস্ত্রাদি রাখিয়া যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল; সে বলিল, "তাঁহার উদ্দেশ্য কি জানি না। কিন্তু আমাকে দুইটি স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিয়া এবং আমার একখানি রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া ব্রহ্মচারীর বেশে চলিয়া গিয়াছেন। যাওয়ার সময় ঐসকল বস্তু কুমারী প্রমোদিনীকে রাখিতে বলিয়া গিয়াছেন।" প্রমোদের মনে কত সুখ, কত আহ্লাদ! ক্ষণপ্রভা যেন কিঞ্চিৎ বিষণ্ন হইল। তাহারা উভয়েই বুঝিয়াছিল বোধ হয় ছদ্মবেশে যাওয়া কর্ত্তব্য বোধ করিয়াছেন। কাঞ্চীপুরস্থ রত্নেশ্বরের মন্দির প্রভৃতি দেখিবেন, রাজার ন্যায় পরিচ্ছদ দৃষ্টে যদি কেহ সন্দেহ করে এই ভয়ে ছদ্মবেশ অবলম্বন করিয়াছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আশা-মরীচিকা।

কাঞ্চীপুরের দেবমন্দির লুণ্ঠন হওয়ার পর যখন ধরণীনাথ গুল্‌নেয়ারকে আনিতে গিয়াছিলেন তখন প্রমোদিনীকে একটি অট্টালিকার ছাতের উপর দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনা জন্য প্রমোদ যে মস্তক নত করিয়াছিল সেই কমনীয় চিত্র সর্ব্বদা যুবকহৃদয়ে জাগরুক ছিল, এবং তাহাতেই তাঁহার মনও আশ্বস্ত ছিল। প্রথমদর্শনে তাঁহার মনে হইয়াছিল জড়োপাসকের ন্যায় তাঁহার হৃদয়াকাশের নক্ষত্রটিকে দূর হইতে নিরীক্ষণ করিতে এবং মনে মনে অনন্তজীবন পূজা করিতে হইবে, স্পর্শ অথবা অনুগ্রহ প্রত্যাশা করিতে পারিবেন না। কিন্তু দ্বিতীয় বার দেখিতে পাইয়া নিরাশাবস্থা দূর হইয়াছিল। তাহার মনে হইয়াছিল তাঁহার ন্যায় উৎকৃষ্ট জ্যোতির্ব্বিদ এবং তাঁহার চক্ষুর ন্যায় দর্শনযন্ত্র পৃথিবীতে আর নাই। দূরবীক্ষণ কখনও আকাশের নক্ষত্র গৃহের ছাতের উপর আনিতে পারে না, জ্যোতির্ব্বিদও গ্রহনক্ষত্রের হৃদয় পাঠ করিতে পারে না, তিনি দুই কার্য্যই করিলেন।

কিছু দিন পরে আবার কাঞ্চীপুরে উপস্থিত হইয়া প্রমোদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা হইল। গুল্‌নেয়ারের মুখে আশ্বাসপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছিলেন সুতরাং আবার তাঁহাকে দেখিতে চলিলেন। কিন্তু এবার ছদ্মবেশে,একজন সন্ন্যাসী। বৈশাখী পূর্ণিমার দিবস পরিচিত প্রাসাদ সমীপবর্ত্তী সমুদ্রতীরে উপবিষ্ট হইয়া সন্ন্যাসী যুবক তপস্যায় নিবিষ্টচিত্ত হইলেন। কুমারীগণ 'আত্মানমাত্মান্যবলোকয়ন্তম্' সন্ন্যাসীকে গৃহপ্রবেশ সময়ে দেখিলেন। সন্ন্যাসীর চক্ষুও সেই রুণু ঝুনুর শব্দ শ্রবণে তৎপ্রতি বদ্ধদৃষ্টি হইয়া যেন পরমাত্মায় লীন হইল। মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন কি প্রকারে গৃহে প্রবেশ করিবেন। অনেক ভাবনার পর মন উপদেশ দিল 'কাকচরিত্র হইলে কুমারীগণের অদৃষ্ট গণনা করিতে যাইতে পারিবেন। সুতরাং সন্ন্যাসী কাকচরিত্র হইলেন। সংকল্প স্থির হওয়া মাত্রেই গণনা করিবার ইচ্ছা হইল। আপনার অদৃষ্ট প্রথমতঃ আপনিই গণনা করিতে বসিলেন। হৃদয় দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল। দক্ষিণ নয়ন অনবরতঃ স্পন্দিত হইতে লাগিল সকলই অমঙ্গল। গৃহপ্রবেশের দিনই ঝড় বৃষ্টি। সুতরাং গণনায় স্থির হইল 'যুবক! বিরত হও। তোমার অভিলষিত বস্তু সিংহের নখরাভ্যন্তরে!'

যুবক ভীত হইলেন, কিন্তু বিরত হইলেন না। দ্বার সমীপে উপস্থিত হইয়া আঘাত করিলেন, একটি বৃদ্ধা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'কে?' তিনি বলিলেন

একজন কাকচরিত্র।' ক্ষণপ্রভা কাকচরিত্রের কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে গৃহে লইয়া যাইতে আদেশ করিল এবং বৃদ্ধাকে প্রমোদিনীর বিবাহ এবং আপনার মৃত্যু গণনা করাইতে শিখাইয়া দিল। প্রমোদিনী হাসিল, কিন্তু মনে ভাবিল ক্ষণপ্রভা মরিতে চায় কেন?

কাকচরিত্র গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাড়িৎ যেমন মেঘাবৃত আকাশ ভেদ করিয়া বাহির হয়, ক্ষণপ্রভার প্রভাবিশিষ্ট চক্ষুও সেইরূপ যুবকের ছদ্মবেশ ভেদ করিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিল এবং তৎক্ষণাৎ হাসি অথবা লজ্জামিশ্র ব্যগ্রতার সহিত একটি শব্দ করিয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল। প্রমোদিনী কি চিনিল না? হাঁ সেও চিনিল, প্রণয়ের চক্ষু বড় তীক্ষ্ণ, সুতরাং সে সহজেই যুবকের হৃদয় পর্য্যন্ত দেখিতে পাইল। কিন্তু মৃগয়ার্থীর আশা যেমন মৃগের দর্শন লাভেই চরিতার্থ হয় না অনুসরণ করিয়া মৃগটিকে করায়ত্ত করে, সেও তাহাই করিতে যত্নবতী হইল। সুতরাং কাকচরিত্রের নিকটেই বসিল।

আমাদের কাকচরিত্র পণ্ডিত। তিনি কেবল নভোমণ্ডল দেখিয়াই বিদ্যালাভ করিয়াছেন এমন নয়, তাঁহার সামুদ্রিকেও ব্যুৎপত্তি আছে। সুতরাং প্রমোদের হস্ত দেখিতে চাহিলেন। প্রমোদ আস্তে আস্তে কোমল হস্তখানি যুবকের হস্তে স্থাপন করিল; সন্ন্যাসীর গণনা আর মনে রহিল না, হস্ত ধরিয়া বিবশশরীরে ভ্রান্ত মনে বসিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পর প্রমোদ চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'বলত আমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে কি না?'

এবার কাকচরিত্রের আকাশ প্রমোদিনীর গম্ভীরভাবপূর্ণ মুখমণ্ডল। তিনি অনিমেষনয়নে সেই আকাশ দর্শন করিলেন, চমকিত হইলেন। শূন্যমনে বলিলেন, 'যাহা অভিপ্রেত তাহা আপনার হস্তগত। কিন্তু তাহা ধারণ করিবার পূর্ব্বে সিংহের কবল হইতে সেই হস্ত মুক্ত করিতে হইবে।' প্রমোদিনীর শরীর কম্পিত হইল। মনে করিল যথার্থ কথা।

দ্বিতীয় প্রশ্ন। মুক্ত হইবার সম্ভাবনা আছে কিনা?

উত্তর। আমি আশা করি হইবেন। ঈশ্বর এবিষয়ে আপনার সহায় হউন।

তৃতীয় প্রশ্ন। যাঁহাকে একদিন শয্যা পার্শ্বে অচেতন অবস্থায় শয়ান দেখিয়াছিলাম, এবং আর একদিন ছাতের উপর।

উত্তর। আপনার নয়নে সে মূর্ত্তি অঙ্কিত।

প্রমোদিনী চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, লজ্জিতা হইলেন, একটুকু হাসিলেন। ভাবিলেন উঠিয়া যাইবেন। কিন্তু আর যদি দেখা না পান? এই ভাবনা।

যুবক তখন বলিতে লাগিলেন "যে চিনিয়া অপরিচিতের ন্যায় কাহারও প্রতি ব্যবহার করে, তাহার গণনায় যেটির ভাল ফল সেটিও মন্দ হইয়া যায়"

প্রমোদিনী এবার আর থাকিতে পারিল না, আস্তে আস্তে উঠিয়া ছাতের উপর গেল। একবার মস্তক ঈষৎ বক্র করিয়া সন্ন্যাসীকে দেখিল, কিন্তু তাঁহার চক্ষে চক্ষু মিলিত হইল দেখিয়া সুখমিশ্র লজ্জানিমীলিতনয়নে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। ধরণীনাথ তাঁহার অনুগমন করিলেন। উভয়ে ছাতের প্রান্তভাগে দাঁড়াইলেন। প্রমোদ বলিল " এখন পড়িয়া মরিলে কেমন হয় ?

যুবক আর আত্মদমন করিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন, 'সুন্দরি ! তোমার ন্যায় দুর্লভ ললনারত্নের যে কত দূর ক্ষমতা তাহা যদি বুঝিতে চাও একবার মুকুর সমক্ষে দণ্ডায়মান হইও। আমি প্রথম দিন হইতেই তোমার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছি, তাহা যে না বুঝিতেছ এমনও নয়। আমার দিন নাই, রাত্রি নাই, অরণ্য নাই, যখন যে অবস্থায় তোমাকে মনে হয় সকল অতিক্রম করিয়া উন্মত্তের ন্যায় আসিয়া উপস্থিত হই। এই জন্যই আমার এত পরিশ্রম। তোমারই জন্য আমি ছদ্মবেশী। এতদিনের ভালবাসার যদি এই প্রতিদান হয়, যদি তুমি আমায় পরিত্যাগ কর, এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার কর,আর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিব না। এই তুমি, এই সমুদ্র, অট্টালিকা এই সকল দেখিতে দেখিতে পার্থিব জীবন এই স্থানেই বিসর্জ্জন দিব। পরকালে কখনই আমায় এমন ভাবে পরিত্যাগ করিতে পারিবেনা।

ধরণীর চক্ষে জল আসিল। উভয়েই বসিলেন। কিঞ্চিৎ ব্যবধান হইয়া বসিলেন। কিন্তু উভয়ের আত্মবিস্মৃতি আরম্ভ হওয়ায় প্রথমতঃ প্রমোদের হস্ত যুবকের হস্তে, পরে তাঁহার বক্ষঃস্থলে ন্যস্ত হইল। যুবকের চক্ষের জলে হস্তখানি সিক্ত হইতে লাগিল।

প্রমোদিনী কিঞ্চিৎ সুস্থির হইয়া বলিল, আমি কিরূপ বিপন্না যদি তাহা একবার জানিতেন তবে আর আমায় আশ্বস্ত হইতে বলিতে সাহসী হইতেন না। অমৃতকে কে অনাদর করে ? প্রথম দর্শনের দিন হইতে অদ্যপর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ কষ্টময় সময়ের মধ্যে তিলেকের জন্যও যদি আপনার দেবোপম মুখশ্রী বিস্মৃত হইয়া থাকি তবে যেন আমার পরকালেও সুখ হয় না ! আমি কি ছিলাম কি হইয়াছি ! হয়ত আপনি আমাকে চঞ্চলা মনে করিবেন, না হয়ত নির্লজ্জ বলিয়া ঘৃণা করিবেন। কিন্তু সে সকলের কারণ আপনিই, দোষ আপনার। পূর্ব্বে আমি এরূপ ছিলাম না। আশায় ক্ষান্ত হউন, বাস্তবিকই আমি সিংহের কবলগত। এই জন্যই আপনাকে সতর্ক করিতে গুলনেয়ারকে শিখাইয়া দিয়াছিলাম আপনি যেন এ প্রদেশে আর আইসেন না।'

যুবক বলিলেন, 'সুচরিত্রে আমি মৃত্যুকে ভয় করি না, তোমার জন্য যদি মরিতেও হয় তাহাতেও আমার সুখ তথাপি না দেখিয়া থাকিতে পারিব না।

তুমি রাজকন্যা আমি ভিখারী। এত উচ্চ আশা আমার পক্ষে দুরাশা মাত্র একথা আমি বিলক্ষণ জানি। তথাপি মন মানে না, তথাপি হৃদয়কে প্রবোধ দিয়া রাখিতে পারি না, নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। যদি সহ্য করিতে পারিতাম তবে অনলে শরীরসহ মনের অনল ভস্ম হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতাম, আর পারি না। তুমিই আমার হৃদয়, তুমিই সর্ব্বস্ব। তুমি যদি আমায় পরিত্যাগ কর তবে'—আর বলিতে পারিলেন না।

প্রমোদ কাঁদিয়া বলিল 'আপনি কেন আত্মনিন্দা করিতেছেন? ইহাতে যে আমি মনে বেদনা পাইয়া থাকি বুঝেন না? আপনি যে উচ্চবংশজাত একথা যদি শপথ করিয়াও অস্বীকার করেন তথাপি এবিশ্বাস আমার হৃদয়ে থাকিবেই থাকিবে। আমার নিকট আপনার যাহা আছে অনেক রাজার ঘরে তাহা নাই। যদি আপনি পথের ভিখারী হইতেন, তাহা হইলেও কি ভুলিতে পারিতাম? এমন ভিখারী লাভ করিতে কত রাজকন্যা ভিখারী হইবে। আপনি যদি মুসলমান হইতেন তবে ভাল হইত।'

যুবক এই শেষাংশের অর্থ বুঝিতে পারিলেন না জিজ্ঞাসা করায় প্রমোদ বলিল 'সুন্দরী গুল্‌নেয়ারের উপযুক্ত স্বামী আপনা ব্যতীত আর নাই।'

ধরণী বুঝিলেন, এবং সেই জন্মদুঃখিনীর শোচনীয় পরিণাম বর্ণনা করিয়া প্রমোদিনীর হৃদয় ব্যথিত করিলেন। প্রমোদ ভাবিল যে, আপন রূপের আকর্ষণী শক্তিতে আশ্বস্ত হইয়াই যেন মনে করিল 'এখন আর পৃথিবীতে প্রতিদ্বন্দ্বী নাই।' অনন্তর বলিতে আরম্ভ করিল।

'আমাকে রাজকন্যা বলিয়া কেন বৃথা কষ্ট দিতেছেন? একদিন রাজার কন্যা ছিলাম, এক্ষণে ভিখারিণী। পিতা কঙ্কণ রাজ্য হারাইয়া কাঞ্চীরাজের আশ্রয়ে আসিয়া লোকান্তর গমন করিয়াছেন, জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে না পারিয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, আমরা মায়ে ঝিয়ে বন্দিনীর ন্যায় এই রাজার গৃহে আছি। মায়ের ইচ্ছা আমরা চিরদিনই এই গৃহে থাকি, তদনুসারে বিবাহের আয়োজন হইয়াছে।'

আর বলিতে পারিলেন না! দুই বৎসর পূর্ব্বে যে ভয়ঙ্কর অশনিনিনাদ ধরণীনাথকে অচেতন করিয়াছিল, আজ যদি সেই বজ্র তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিত তাহা হইলেও এত বেদনা পাইতেন না। যখন বুঝিলেন রাজা যশোধন প্রমোদকে বিবাহ করিবেন তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, ভয়ানক অগ্নি হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিল, পড়িয়া গেলেন।

প্রমোদিনী কাঁদিয়া উঠিল। ক্ষণপ্রভা দৌড়িয়া গেল, বৃদ্ধা জল আনিল। প্রমোদ যুবকের মস্তক বক্ষঃস্থলে রাখিয়া অঞ্চল দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিল, ক্ষণপ্রভা মস্তকে, চক্ষে, কণ্ঠে জল সিঞ্চন

করিতে আরম্ভ করিল। অনেকক্ষণ পর তাঁহার চৈতন্য হইল, কিন্তু কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন। উন্মত্তবৎ মূর্ত্তি, তাঁহার পৃথিবী শূন্যময়। ক্ষণপ্রভা বলিল 'অভাগিনি! আমিত পূর্ব্বেই বলিয়াছি দুরাশায় প্রবৃত্ত হইও না। নিজেও মরিবে অন্য একজনকেও সঙ্গী করিবে। দাদা জানিতে পারিলে আমাদেরই বা কি উপায় হইবে?'

প্রমোদিনী উত্তর দিল না। যুবক উঠিয়া বসিলেন। তখন প্রমোদ গৃহ গমনের জন্য প্রস্তুত হইল। ধরণীনাথ তাঁহার মুখের দিকে এরূপ মর্ম্মপীড়িত অবস্থায় দৃষ্টিপাত করিলেন যেন তাঁহার সমুদয় আশা ভরসা জন্মের মত বিসর্জ্জিত হইল। তাহা দেখিয়া কুমারী যারপর নাই ব্যথিত হইলেন এবং মুক্তকণ্ঠে বলিলেন 'যখন জ্ঞানে হউক অজ্ঞানে হউক তোমার কণ্ঠের মুক্তাহার হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি তখন যদি এজীবন যায় তথাপি এহৃদয় অন্যের হইবে না। জীবন গেলেও তোমারই থাকিব, পরকালেও তোমারই থাকিব। তুমি আমাকে এত ভালবাস আমি কেবল তোমাকে কষ্টই দিলাম।'

যুবক হতবুদ্ধি হইয়া সেই মহিমাপূর্ণ ভাববিকাশক মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। প্রমোদিনী আর একবার তাঁহাকে অবলোকন করিয়া ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ভবনে প্রস্থান করিল। যুবকও ধীরে ধীরে বাহির হইয়া উত্তরাভিমুখে গমন করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সম্মিলনে।

সায়ংকাল উপস্থিত। পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়া সাগরের জল রজতময় করিলেন, জলরাশি আহ্লাদে নাচিতে লাগিল। একজন গম্ভীর প্রকৃতি চিন্তাশীল ভাবুক একটি প্রস্ফুটিত গোলাপ হস্তে লইয়া উপবিষ্ট আছেন; সমুদ্রের লহরীলীলা অবলোকনেই যেন নিবিষ্টমনে বসিয়া আছেন। কিন্তু মুখশ্রী গম্ভীর হইলেও বিষণ্ন, হস্তস্থিত গোলাপটি একবার নাসিকার নিকট, একবার মস্তকে, একবার অধরে, একবার চক্ষে একবার কর্ণমূলে, একবার গণ্ডস্থলে, এবং অনবরতঃই হৃদয়ে স্থাপন করিতেছেন। সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এত প্রিয়, এত আদরের গোলাপটি সমুদ্রোর্ম্মি মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। যতক্ষণ, যতটুকু দেখা গেল, দেখিলেন, যখন ডুবিয়া গেল বলিলেন, 'আর না, আজ হইতে আমার আশাও বিসর্জ্জন দিলাম।' তখন সে স্থান হইতে উঠিলেন এবং অনিশ্চিতমনে ইতস্ততঃ পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

পথি মধ্যে একটি যুবককে তাঁহার ন্যায় বিষণ্নমনে যাইতে দেখিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভাই অদ্য তোমার এবেশ কেন? রাত্রিকালে কোথায় যাইতেছ?'

যিনি জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি আমাদের পরিচিত যশোধন. যাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি তাঁহার সখা ধরণীনাথ!

ধরণীনাথ বলিলেন 'ভাই ক্ষমা করুণ। বিশেষ প্রয়োজন আছে, অপেক্ষা করিতে পারি না। আপনি আমার এতপ্রকার হিত সাধন করিলেন, আমি অনিস্টভিন্ন আর কিছুই করিতে পারিলাম না। আপনি আমাকে মিত্র বলেন, কিন্তু ভাই! আমি চিরকালই আপনার সহিত শত্রুতা করিয়া আসিতেছি। ভাই! এ পাপিষ্ঠের শরীর স্পর্শ করিবেন না, এ আপনার অনুগ্রহের অযোগ্য। যদি এ পাপ জীবন পরিত্যাগ করিলে আপনার সুখ হইত, করিতাম—কিন্তু তাহাও হইবে না। ক্ষমা করুণ, আমায় ক্ষমা করুণ!' এই বলিয়া ধরণী এত দ্রুত চলিয়া গেল যে যশোধন আর অনুগমন করিতে সাহসী হইলেন না, তাঁহার মনের এতাদৃশ চাঞ্চল্য কাঞ্চীরাজ আর কখনও দেখেন নাই, সুতরাং বিস্মিত হইলেন, এবং আস্তে আস্তে গৃহে গমন করিলেন। কএকজন লোককে যুবকের অনুসন্ধানে যাইতে বলিলেন।

প্রমোদিনী অপরাহ্ণ বেলা দুই ঘটিকা থাকিতে গৃহে গমন করিয়াছিল। অন্তঃকরণ নিতান্ত বিমর্ষ। একাকিনী একটি গোলাপ হস্তে লইয়া পুষ্করিণীর ঘাটে বসিয়াছিল। রাজাও সেই সময় সেই দিকেই গমন করিয়াছিলেন। তিনি সোনার প্রমোদকে তদবস্থ দেখিয়া ভীত হইলেন। কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস পাইলেন না। প্রমোদও তাঁহাকে দেখিয়া নিতান্ত চকিতা ও ভীতা হইল, উঠিয়া দাঁড়াইল, শরীরের কম্পনে গোলাপটি হস্তচ্যুত হইল। যশোধন অতি যত্নের সহিত তাহা তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'প্রমোদ! একি? প্রমোদ কাঁদিয়া তাঁহার পায় পড়িল, বলিল 'মহারাজ! আমায় ক্ষমা করুণ, আপনি আমার অনেক উপকার করিলেন, হতভাগিনী তাহার কিছুই প্রতিদান করিতে পারিলাম না। আমি অবলা, আমার কোন শক্তি নাই। আমি কেবল ঈশ্বরের নিকট আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করিতে পারি। অধিক কি বলিব, এতকাল আপনাকে ভাল বাসিতাম না, আজ হইতে জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় ভালবাসিব, অদ্য হইতে আমাকে ক্ষণপ্রভার কনিষ্ঠা জ্ঞান করিবেন। আমার নির্ব্বুদ্ধিতা যদি কখনও আপনার কোন অনিষ্ট করিয়া থাকে আমাকে ক্ষমা করিবেন। দাদা! বলুন আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

যশোধন অবাক হইলেন। তাঁহার এতদিনের অভিলাষ ছিন্নমূল হইল। তাঁহার সকল আশা, সকল ভরসা গভীর জলধিতলে নিক্ষিপ্ত হইল। একটি নিঃশ্বাস নির্গত হইল। অতি কষ্টে, আপনার সহিত আপনাকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া বলিলেন "ক্ষমা করিলাম, তুমি আজ হইতে আমার সহোদরা কনিষ্ঠা ভগ্নী!"

অনন্তর বাটী হইতে বহির্গত হইয়া সমুদ্রতীরে গমন করিলেন এবং এতদিনের আদরের হৃদয়কুসুম হস্তস্থিত গোলাপসহ সমুদ্রে বিসর্জ্জন দিলেন।

প্রমোদের নিকট ওরূপ বলিয়া আসিলেন সত্য কিন্তু পরস্পরবিরুদ্ধ ভাব গুলিতে তাঁহার হৃদয় আকুলিত করিয়া তুলিল এবং উপস্থিত রহস্য সম্বন্ধে গভীর সন্দেহে তাহার মন দ্বিধা বিভক্ত হইতে লাগিল। এক একবার ক্রোধে এবং প্রতিহিংসায় শরীর জর্জ্জরিত হইতে লাগিল আবার উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলি প্রবল হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে ক্ষমা করিতে বাধ্য করাইল। তিনি প্রমোদকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিলেন। গৃহে গমন করিয়া ক্ষণপ্রভার নিকট প্রমোদিনীর মনের ভাব সবিস্তার জিজ্ঞাসা করিলেন। সে অনেক চেষ্টা করিয়াও জ্যেষ্ঠ সহোদরকে বিরত করিতে না পারিয়া শঙ্কা ও সঙ্কোচের সহিত সকল ঘটনা সংক্ষেপে বলিল; গোপন করা অথবা মিথ্যা বলা তাহার স্বভাববিপরীত, সুতরাং সকলই যথার্থ রূপে বলিল। যশোধন স্তম্ভিত হইলেন। ক্ষণপ্রভা মনে করিয়াছিল আজ যেন কি দুর্ঘটনাই ঘটে। কিন্তু একটি নিঃশ্বাসও শুনিতে না পাইয়া আশ্চর্য্য হইল। মনে মনে বলিল "বালবিধবাগণ যেন দাদার নিকট চিত্তসংযম অভ্যাস করে।"

যশোধন বহির্ভাগে গমন করিয়া সপ্তাহমধ্যে বিবাহের সমস্ত আয়োজন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। আদেশ সম্পাদিত হইল। সকলেই বলিতে লাগিল প্রমোদিনীর সহিত যশোধনের বিবাহ। যশোধন বলিতেন প্রমোদের বিবাহ, সকলে বুঝিত তিনি বিবাহ করিবেন। দশের মুখে শুনিয়া প্রমোদিনী ভীতা হইল। মনে ভাবিল এমন ব্যক্তি কি এমন পাপ কার্য্য করিবে?

দেখিতে দেখিতে সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল। বিবাহের দিন, পশ্চাৎ বিবাহের সময় উপস্থিত হইল। সভায় সকলে উপবেশন করিল, কন্যা আনীত হইল। প্রমোদিনী ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, নিদাঘের কেতকীগর্ভপত্রের ন্যায় তাঁহার রসনা শুষ্ক ও উষ্ণ হইল, নিঃশ্বাস অগ্নিময় হইল। তখনও ভাবিল "সময়ও আছে, উপায়ও আছে।"

পুরোহিত রাজাকে আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন, কিন্তু রাজা বসিলেন না। নির্দ্ধারিত সময়ে একখান বস্ত্রাবৃত পাল্কির মধ্য হইতে বহুমূল্যপরিচ্ছদপরিহিত এক পরমসুন্দর যুবাপুরুষকে বাহির করিলেন। এমন সুশ্রী পুরুষ কেহ কখনও দেখিয়াছে এমন বোধ হইল না। প্রমোদ দেখিল, চিনিল, আহ্লাদে অবশ হইল। ক্ষণপ্রভা দেখিল, দৌড়িয়া আপন কক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক দ্বার রোধ করিল। এমন সময় প্রমোদিনীর নিকট একটি কোলাহল উঠিল। সকলে গিয়া

দেখিল একখান শাণিত ছুরিকা তাহার বস্ত্র হইতে সভামধ্যে পতিত হইয়াছে। যশোধন দেখিলেন, বুঝিলেন। কোন বিপদ ঘটে নাই দেখিয়া জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন “অবোধিনি! তুমি কি কাঞ্চীপুরাধিপতিকে এমন পাষণ্ড অপদার্থই মনে করিয়াছিলে যে, প্রতিজ্ঞা করিয়া সে তাহা ভঙ্গ করিবে? আত্মহত্যার তুল্য মহাপাপ জগতে আর নাই।”

পরে গম্ভীরস্বরে সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “আপনারা হয় ত বিস্মিত হইতেছেন, এ অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি কোথা হইতে আসিলেন?” কিন্তু আমি বিলক্ষণ জ্ঞাত আছি ইনি একজন অদ্বিতীয় বীরপুরুষ। আমি একবার ইঁহার বীরত্বে পরাজিত ও সাহস দর্শনে চমৎকৃত হইয়াছি। আমি ইহাও জানি প্রমোদিনী এই যুবকের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত এবং ধরণীনাথও প্রমোদকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসেন; এমন কি যদি এই দুই জনের মিলন না হইত, পৃথিবী তিনরাত্রিও এ দুই জনকে চক্ষে দেখিত কি না সন্দেহ। প্রমোদ আমার আশ্রিতা, যদি আমার ভয়ে ভীতা হইয়া বিবাহে সম্মতি দিত, তবে পরে উভয়েরই যার পর নাই অসুখ হইত, প্রমোদ আত্মঘাতিনী হইত তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখনই দেখিলেন। আজ আমি যে কার্য্য করিলাম তাহাতে প্রতিপালিতা ও বন্ধু উভয়ের প্রতি কর্ত্তব্য ঋণ হইতে মুক্ত হইলাম, এজন্য আমার মন সর্ব্বদা আনন্দিত থাকিবে। ইঁহার আকার প্রকার হইতেই বংশমর্য্যাদা একরূপ বুঝিয়া লওয়া যায়। আমার বিশ্বাস হয় ইনি কোন ছদ্মবেশী মহাপুরুষ হইবেন। ইনি যে ক্ষত্রিয় তাহা আমি বিলক্ষণ জ্ঞাত আছি। প্রমোদিনীর মাতা ও ভ্রাতা এখানে আছেন, তাঁহারা সম্মত হইলেই বিবাহ নির্ব্বাহ হইতে পারে।”

সকলেই সম্মত হইলেন, বিবাহ সম্পন্ন হইল। তখন রাজা যশোধন তাঁহাদের ভরণপোষণার্থ বিশেষ কোন উপায় বিধানের প্রস্তাব করিলেন। এতক্ষণ পর্য্যন্তও ধরণীনাথ নিস্তব্ধভাবে বসিয়াছিলেন আর থাকিতে পারিলেন না। রাজার এতাদৃশ মহত্ত্ব দেখিয়া [illegible] অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, কৃতজ্ঞতায় সমস্ত শরীর পুলকিত হইল। গদ্গদবচনে কহিলেন “মহারাজ! প্রচুর হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত উপকার করিলেন এই ঋণ পরিশোধ করিতেই আমার কয় জন্ম অতিবাহিত হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই, আর আমায় ঋণী করিবেন না। আমার প্রতিপালনের জন্য আপনার অর্থব্যয় করিয়া আবশ্যক নাই।”

“আমি কে?” এই প্রশ্ন অনেকদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কিন্তু বলি নাই। যে অবধি প্রমোদিনীর প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলাম, সেই অবধিই আত্মগোপন আবশ্যক হইয়াছিল। তাহার দুইটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ, আমার মনে হইয়াছিল আপনার সহিত প্রমোদিনীর বিবাহ হইতে

পারে, আমি যদি আপনার সুখের পথের কণ্টক হই, তবে নিতান্ত কৃতঘ্নের কার্য্য করা হয়। আপনি রাজা আমি পথের ভিখারী এইরূপ সংস্কার হইলে হয়ত প্রমোদের মন আপনার প্রতি ধাবিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। দ্বিতীয়তঃ, যদি তাহা না হয়, তবে প্রমোদ আমাকে ভিখারী জ্ঞানে পতিত্বে বরণ করিয়া পরে সচ্চতিপন্ন জানিলে আরও অধিক সন্তুষ্ট হইবেন; এই দুইটি কারণ মনোমধ্যে উদয় হওয়াতে এত দিন প্রকাশ করি নাই। প্রমোদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা শুনিয়া আপনার বিষয়ে নিরাশ হইলাম, তাই সে দিন সাক্ষাৎ হওয়াতে অনুতপ্ত হৃদয়াবেগ গোপন করিতে পারিলাম না বলিয়া আপনার সহিত আলাপও করিলাম না। পরিশেষে অন্যায় হইল বুঝিতে পারিয়া আপনার প্রেরিত পাল্কিতে আসিলাম।

"শুনিয়া থাকিবেন বুন্দেলখণ্ড বলিয়া একটি প্রদেশ আছে। আমার পিতা সেই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ও রাজা ছিলেন। আমরা দুই ভ্রাতা মেদিনীনাথ রায় ও ধরণীনাথ রায় তাঁহারই সন্তান। পিতার পরলোক প্রাপ্তির পর হইতে মেদিনী রায় চান্দরীতে রাজত্ব করিতেছেন, আমি দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া নির্ম্মুক্তভাবে সুখান্বেষণে এবং জ্ঞানালোচনায় সময় যাপন করিতেছি। অদ্য প্রমোদিনী চান্দরীর সিংহাসনের পাটরাণী হইলেন, আমি গৃহে গমন করামাত্রই ভ্রাতা কোন বিশেষ কারণে সিংহাসন পরিত্যাগ করিবেন। তিনি মহারাণা সঙ্গের সহকারী হইয়া যবন দমনে বাহির হইবেন।

সকলে আহ্লাদে মগ্ন হইল। যশোধন বলিলেন অগ্নি কেহই বস্ত্রের আবরণে গোপন রাখিতে পারে না। আপনি যত কেন ছদ্মবেশ অবলম্বন করুন না, রাজার ন্যায় রূপ কোন ক্রমেই লুকাইতে পারিবেন না। যাহা হউক অদ্য আমি বড় সুখী হইলাম। এমন গৃহে ভগ্নী বিবাহ দিতে আমি শ্লাঘা জ্ঞান করিতাম। প্রমোদ আমার ভগ্নী হইল।

কএক দিন আমোদ আহ্লাদ করিয়া রাজা ধরণীনাথ প্রমোদিনীকে লইয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন। রাজা যশোধন অনেক দূর পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। প্রমোদিনীর মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাদের সঙ্গে গেলেন। ধরণীর জীবনের স্রোত ভিন্ন দিকে ভিন্ন কার্য্যে প্রধাবিত হইল। নবদম্পতি সুখের সংসারে সুখের মিলনে পরস্পর পরস্পরের সুখ সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

রণরঘুর প্রলাপ।

৪। মনোহর হইতে ভয়ঙ্কর ; এই কি সেই ?

নীল আকাশে কলধৌত কলানিধি ; অপূর্ণ, তথাপি শোভায় অতুল। নিকটে নক্ষত্র নাই, থাকিলেও সুধাংশুর ভুবনমোহন রূপরাশীর সম্ভ্রমে সঙ্কুচিত, সুতরাং অদূরবীক্ষণ মানবনয়নের অদৃশ্য ; শ্রাবণের আতটপূর্ণ তরঙ্গিণীবক্ষে দূরস্থিত তরণীর ক্ষুদ্র প্রদীপের ক্ষীণালোক সদৃশ, সেই নভস্তলে, চন্দ্র হইতে দূরে—বহু দূরে—দুই একটি তারকা মিটি মিটি করিতেছে। চন্দ্র থাকিলে তারার জ্যোতির্বিকাশ অসম্ভব,—সতীর অঙ্গে হীরক মলিনপ্রভ হইয়া থাকে।

প্রকৃতিকে সুধাসারে ভাসাইয়া চন্দ্র আপনি আকাশে ভাসিয়া যাইতেছে। আকাশে মেঘ, কিন্তু ছিন্ন ভিন্ন, খণ্ড খণ্ড, এই আছে এই নাই ; এক খণ্ড মেঘ এক পার্শ্বে দ্রবরজতের ভাবে আরব্ধ হইয়া ক্রমে সূক্ষ্মান্তরণবৎ হইয়াছে, তাহার পরেই আবার নীল আকাশ ; আবার সেই মেঘ, আবার সেই আকাশ। ইহাদের উপর দিয়া, ইহাদের মধ্য দিয়া চন্দ্র ভাসিয়া যাইতেছে ; যে মেঘখণ্ডে চন্দ্র-সংস্পর্শ হইতেছে, সে ই হাসিতেছে; তাহার পর ম্লান, ম্লানতর, পাংশুবর্ণ, ক্রমে কালিমাকলুষিত। একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষের শ্যামল পত্রপুঞ্জ পবনের মৃদু হিল্লোলে তর তর নাচিতেছে আর মহোল্লাসে রাশি রাশি জ্যোৎস্না ধরিয়া মাখিতেছে ; ক্ষণে ক্ষণে, মাখিতে মাখিতে তরুতলে সেই জ্যোৎস্না ছড়াইয়া দিতেছে। অদূরে শস্যক্ষেত্র, কৌমুদীর বিলাস জন্য কোমল শয্যা ; তথায় কৌমুদী যেন আবেশে বিলুণ্ঠিত।

ঐ অশ্বত্থমূল হইতে কিছু অন্তরে, তৃণ গুল্মবর্জ্জিত একটা উচ্চ স্থানে বসিয়া আমি নিস্পন্দপ্রায় এই স্নিগ্ধ মধুরিমা নিরীক্ষণ করিতেছি। আকাশে চন্দ্র ভাসিয়া যাইতেছে ; ধরাতলে আমি বসিয়া আছি, তথাপি আমিও ভাসিয়া যাইতেছি ; কেবল সেই মেঘজাল যেমন তেমনি, যেখানকার সেইখানেই রহিয়াছে। চন্দ্র একক, চন্দ্র নিরুদ্দেশ্য, চন্দ্র ভাসিয়া যাইতেছে ; এমন চন্দ্রকে ভাসাইয়া দিয়া প্রকৃতির সুখ হইতেছে। আমিও একক, আমিও নিরুদ্দেশ্য, তাই বুঝি আমিও ভাসিয়া যাইতেছি। আমাকে ভাসাইয়া কি কাহারও সুখ হইয়াছে ? দূর হউক, এ প্রশ্ন তুলিব না, একথা ভাবিব না ; ভাবিলে অনেক কথা

মনে পড়িবে,অনেক ব্যক্তি মনে আসিবে। তাহা হইলে হৃদয় আলোড়িত হইবে, সুধাকরকে ভুলিয়া যাইব ; সুধাকর ভাসিয়া যাইবে আমি একা রহিয়া যাইব। অতএব সে কথা ভাবিব না ; সেই পত্রখানি পড়িতে পড়িতে, চন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়া যাই।

কৈ ! আমার সে পত্র কৈ ! বিধাতঃ ! আমার কি কিছুই থাকিবে না ? তবে আমায় রাখিয়াছ কেন ?

* * * * * * *

আমি কে ?—কোথায় আমি ? কি জন্য এখানে আসিয়াছি ? কেমন করিয়া আসিলাম ?—এখানে বসিয়া কেন ?

ইহার প্রত্যেক প্রশ্নই এক একটি বিষম সমস্যা।

আমি কে ?—জানি না, জানিবার উপায়ও নাই ; কারণ কেহই জানে না। 'আমি,—এই পদার্থের একটি পৃথক্ সত্তা আছে, ইহা বুঝিতে পারি ; পরিচিত অপরিচিত, সুন্দর কুৎসিত, নবীন প্রবীণ এইরূপ অগণিত 'আমি' পদার্থের সমবায়ে 'মানুষ' নামে একটা সম্প্রদায়, সমাজ বা জাতি আছে তাহাও শুনিতে পাই। কিন্তু ইহার অধিক কিছুই জানি না ; আবার এতদূরও যে জানি বলিতেছি, কিন্তু ইহার অর্থ বুঝিতে পারি না। কেমন করিয়া বুঝিব ?—এই তুমি যাহাকে 'ঘোর অমানুষ'—নিতান্ত অপদার্থ—বলিয়া নাসিকাগ্র ভ্রূমধ্যস্থিত করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছ,—সেও "মানুষ"। অতএব আমি কে, না জানিয়াও, না বুঝিয়াও আমাকে বলিতে হইতেছে—আমিও "মানুষ"। শুনিলে পরিহাস করিতে দুর্দ্দম লোভ হয় বটে, কিন্তু কথাটা তথাপি পরিহাসের নয়। তুমি পরিহাস কর, তুমিই পরিহাসের পাত্র হইবে। তথাপি, পুনরায় সেই কথা, তুমি "মানুষ", আমি "মানুষ"। চমৎকার সমস্যা, ইহার পূরণ নাই !

আমি মানুষ, আমার পৃথক্ সত্তা আছে, কিন্তু আমার পার্থক্যের শেষ এই অবধি। স্বাতন্ত্র্য বল, স্বাধীনতা বল, আমার কিছুই নাই ; আমি কোটি কোটি জনের একজন মাত্র। রূপ দর্শনের বিষয়, কিন্তু আমি দেখিতে পাইব না ; রস আস্বাদনের বস্তু, কিন্তু তাহাতে আমার অধিকার নাই। আমার শত্রু আছে, কিন্তু শত্রুতা সাধিতে পাই না ; আমার প্রণয়ী আছে, কিন্তু ভালবাসিতে পাই না। যাহাতে আমার একান্ত প্রবৃত্তি, তাহা দোষ ; যাহার নাম স্মরণ করিলে আমার অন্তর সিহরিয়া উঠে, তাহা গুণ। যখন দেবমন্দিরে থাকিতে আমার সাধ হয়, তখন আমার বাসস্থান কারাগৃহে ; যে মুহূর্ত্তে প্রাণের প্রতি আমার বড়ই মমত্ব, তৎক্ষণাৎ আমাকে ফাঁসীর কাঠে ঝুলিতে হয়। ইহা তোমার আমার বিধান নয়, তোমার আমার নিষেধ নয় ; অথচ,—মানুষের ! যখন আমি জনতামধ্যে, তখন এইরূপ ব্যবস্থা ;

যখন আমি নির্জ্জনে, তখন আমার সঙ্গে সঙ্গে, আমার দেহ মন ব্যাপিয়া, জাগ্রতে স্বপ্নে,ভয়ঙ্করী বিভীষিকা!—আত্মা, পরকাল, স্বর্গ, নরক, ঈশ্বর! বাহিরের কোলাহল যখন মন্দীভূত হয়, তখন অন্তরে ইহারা তুমুল সংগ্রাম করিতে থাকে। তখনও আবার সেই প্রবৃত্তি স্থলে নিবৃত্তি, বিরাগের স্থলে অনুরাগ!—সেই অর্থগ্রাসিনী বশ্যতা, সেই মর্ম্মপেষণী অধীনতা। কিন্তু ইহাতেও মানুষ বাঁচিয়া থাকে, মনুষ্যবংশ উৎসন্ন হয় না, এক জন মরিতে চাহিলেও তাহাকে মরিতে দেয় না; আবার, যদি কেহ একজনের প্রাণহানি করে, সে বাঁচিতে চাহিলেও তাহাকে বাঁচিতে। এ বিষম রহস্য, ইহার মর্ম্মোচ্ছেদ কে করিবে?

প্রত্যক্ষ যাহা দেখিতে পাই, তাহাতে বুঝি, মনুষ্যের ন্যায় অসহায়, নিরুপায়, সাধ্যসামর্থহীন জীব আর নাই;—প্রকৃতির ক্রীড়া জন্য মনুষ্য যেন কাচনির্ম্মিত পুত্তল। প্রকৃতির কোটি কোটি বিশ্বসৃষ্টি আছে, আর সর্ব্বপ্রকার জীবেরই স্বাতন্ত্র্য আছে; তাহাদের প্রত্যেকেই বাঁচিতে মরিতে একা, সুখে দুঃখে একা, স্বপ্নে জাগ্রতে একা, কার্য্যে আলস্যে একা। আবার, এই একের প্রতাপ আছে, বিক্রম আছে, অনন্যাপেক্ষ হইয়া চলিবার অধিকার এবং সাধ্য আছে। কেবল মনুষ্যের ইহা নাই,—সিংহ হস্তী হইতে মশক পিপালিকা পর্য্যন্ত সকলকেই ভয় করিয়া মনুষ্যের চলিতে হয়। মনুষ্যের এ সকল নাই, সুতরাং মনুষ্যের সুখ নাই, শান্তি নাই। কিন্তু মনুষ্যের কল্পনা আছে অভিমান আছে, রাগ আছে। যে প্রকৃতি তাহার এত প্রতিকূল, তাহাকে করায়ত্ত, তাহাকে দাসীত্বে নিযুক্ত, তাহার অনুশাসন উল্লঙ্ঘন করিয়া তৎপ্রতি শাস্তি বিধান করিতে, মনুষ্যের সুতরাং বাসনা আছে। সেই জন্য মনুষ্য আপন আপন ভুলিয়া, জাতীয় দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া, সকলে মিলিয়া এক হইয়াছে; তাই জনে জনে এক নাই, এক এক করিয়া সকল একে মহৈকত্ব লাভ হইয়াছে। এখন, তাহার ফলে মনুষ্য ঘোর অস্বাভাবিক জীব! মনুষ্য আর প্রকৃতির কথা শুনিতে চাহে না, প্রকৃতিই মানুষের কথা শুনে।

অতএব "আমি" একা স্বাতন্ত্র্যহীন, সাধ্যহীন হইলেও ক্রিয়ারূপী; জাতীয় মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া,আমার অহংভাব বিসর্জ্জন দিয়া সেই প্রকৃতিশাসন উদ্দেশে "আমি" কর্ম্মশীল।

যতগুলি প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছি, তাহার এইমাত্র উত্তর সম্ভবপর; এতদ্ভিন্ন স্পষ্টতর, স্থিরতর, অধিকতর সঙ্গত কোনও উত্তর আছে কি না, জানি না; আর ভাবিবও না, কারণ ভাবনার পার নাই।

কিন্তু,—হায়! তথাপি ভাবনা?—কিন্তু, আমি রণরঘু, আমিও কি এই নিয়মের বশে অদ্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি?

আমি জানি, আমার ত নিয়ম নাই, সূত্র নাই, তবে আমি এখানে কেন ?

আমি এখানে কেন ? আকাশের নক্ষত্রমালা নিয়মের অধীন, যথানিয়মে শূন্যে বিরাজ করিতেছে। আর, সেই নক্ষত্র মূর্ত্তিতে নক্ষত্রের রূপকে তিরস্কার করিয়া দর্শকের হৃদয়ে যুগপৎ হর্ষ-বিস্ময়-ভয়ের সঞ্চার করিয়া উল্কা শূন্যপথে ছুটিয়া শূন্যে মিশিয়া যায়।—আমিও মানব জগতের উল্কা, আমার কেহই নাই, কিছুই নাই; আমার স্বাধীনতা নাই, বশ্যতা নাই; আমার ইহকাল নাই, পরকাল নাই। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিতে হাসিতে, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ভাসিয়া যাইতেছি; যতদিন না শূন্যে মিশি, তত দিন এইভাবে ভাসিব। আমি ত মনুষ্য নহি!

সত্য সত্যই কি আমার কেহই নাই? কিছুই নাই? প্রণয়ী নাই! সহোদর নাই? আমার জন্য এক বিন্দু অশ্রুপাত করে, এমন কেহই নাই? নাই থাকুক, যাহার সুখের দিনে আমি একবার হাসিতে পাই, এমন ও কি কেহ নাই?

————আর,——

আমার সুধাকর?—হায়! তুমিও পশ্চিম গগনে চলিয়া গেলে? আমার জন্য অপেক্ষা করিলে না? আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে ভাসিতেছিলাম, সঙ্গে ভাসিয়া যাইতেও দিলে না? সংসার তোমার অভাবে মলিন হইবে, আমি যে সকল হারা হইব?——আর আমার সে পত্র খানি, তাহাও নাই! সত্য সত্যই আমার কেহ নাই! কিছুই নাই?

* * * * * *

আমি কি ভাবিতেছি? কতক্ষণ এভাবে বসিয়া এই সকল অলীক ভাবনা করিতেছি? আমি কি অজ্ঞান হইলাম?

এখনও চন্দ্র আছে; পত্র খানি কোথায় পড়িয়া গিয়াছে, একবার খুজিয়া দেখি।—কিন্তু, কোথায় খুজিব। আমি কোন্ পথে আসিয়াছি?—তথাপি অন্বেষণ করি, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া দেখি। কেন বুঝিতে পারিতেছি না, কিন্তু আমার মন যেন বলিতেছে যে এই পত্রের সঙ্গে আমার ভবিষ্যতের বিশেষ সম্পর্ক। তবে ত দেখিতেই হইল।

আমি গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, সুতরাং মনের বড়ই ব্যাকুলতা হইয়াছে। যে কখনও বিদেশে গিয়াছে, "যাই" বলিয়া একদিনের তরেও গ্রামান্তরে গিয়াছে, সেই জানে যাইতে হইলে চিত্ত কেমন বিকল হয়। বাল্যে যখন বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত প্রবাসে যাইতাম, মাতা, পিতা, ভ্রাতা এবং বয়স্যবর্গের সঙ্গসুখে যখন নিয়মিত কালের জন্য জলাঞ্জলি দিতে হইত, তখনও এই যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি। কিন্তু তখন মনে হইত যে কষ্ট কেবল মাতা ও পিতা, সোদর ও বন্ধুবর্গকে দেখিতে পাইব না বলিয়া; তখন প্রতি পাদক্ষেপে যখন এক একবার ফিরিয়া টল টল লোচনে চাহিতাম, আজিকার জন্ত কেহ আ-

মাকে ফিরাইয়া আরও এক দিন বাড়ীতে থাকিতে দিউক, এই কথা যখন মুহুর্মুহুঃ ভাবিতাম, তখন মনে মনে করিতাম যে তাহাদের সকলকে পাইলেই বুঝি যাইতে ব্যথা পাইব না। আমার যাত্রা কালে মাতার নয়নে ভয় ও ভালবাসা যখন উছলিয়া উছলিয়া পড়িত, তখন নিশ্চয় করিতাম যে এদৃশ্য দেখিতে না হইলেই বুঝি আর কষ্ট নাই। কিন্তু তাহা ত নয় ;— মাতা পিতা স্বর্গে গিয়াছেন, আমি ত এই মায়ার সংসার ছারিতে চাহি না। যখন একে একে একাধিক বাল্য সখা আমার হৃদয়ে তাহাদের জীবিতের রেখা রাখিয়া অকালশুষ্ক, অপরিস্ফুট প্রসূন তুল্য খসিয়া খসিয়া পড়িয়াছে,তখন ত আমি তাহাদের সঙ্গে যাইতে চাহি নাই। তবে আর কোন্ মুখে বলিব যে ইহার জন্য কি তাহার জন্য গৃহত্যাগে কষ্ট ? যখন এতজনে আমায় ভালবাসিত, তখনও যে দুঃখ, আজি যে দাদা পর, বধূ পরাৎ পর, আজিও আমার চিত্ত বৈক্লব্য হইয়াছিল। বস্তুতঃ আমাকে তুমি ভালবাস বলিয়া যে আমি তোমায় ভালবাসি, তাহা নয় ; ভালবাসা কিছু নীরস, সঙ্কুচিত হৃদয়, নীচান্তঃকরণ পণ্যজীবের আদান প্রদানের সামগ্রী নয়। গৃহ বল, জন্মভূমি বল, স্বদেশ বল, ইহারা ভালবাসিতে জানে না, অথচ আমরা ইহাদিগকে ভালবাসি। তাই বলিতেছি, গৃহের জন্যই গৃহত্যাগের কষ্ট।

আমার সেই কষ্ট হইয়াছে ; আবার, এমন গৃহে আমাকে ভালবাসিতে কেহ নাই মনে করিয়া আমার দ্বিগুণ যন্ত্রণা হইয়াছে। সেই জন্য কোন্ পথে বাটী হইতে আসিয়াছি, তাহা দেখিয়াও দেখি নাই ; কতদূর আসিয়াছি তাহা পথশ্রমেও বুঝিতে পারি নাই ; কোথায় আসিয়াছি, তাহা ত জানিই না। তাহার উপর ক্লান্ত হইয়া চন্দ্ররশ্মিতে শরীর স্নিগ্ধ করিতে বসিয়া, পথের একমাত্র সম্বল, সান্ত্বনার একমাত্র উপায় সেই অপরিচিত হস্তের পত্র খানি হারাইয়াছি যখন জানিলাম, তখন কি বলিয়া না অভিভূত হইব ? কেমন করিয়া হৃদয়াবেগে অবিচলিত থাকি ?

সংজ্ঞা হারাইয়াছিলাম, এখন সংজ্ঞা পাইলাম ; অচেতন ছিলাম, এখন চেতনা হইল, সেই জন্য সেই পত্রের উদ্দেশে, অনিশ্চিতে, পূর্ব্বমুখে চলিলাম

সেই পত্রের জন্য অনন্যমনে পাদমূলে, সম্মুখে, পার্শ্বে দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বমুখ চলিলাম ! স্থানে স্থানে গুল্মের ঝোপ;কাহাকেও অর্দ্ধবেষ্টন করিয়া,কাহাকেও বা পদ দলিত করিয়া,কাহারও একটা পল্লব ভাঙ্গিয়া দিয়া, কোথায়ও একটি পাতা ছিঁড়িয়া লইয়া, সেই পাতা খণ্ড খণ্ড করিতে করিতে তাহাকে অঙ্গুলী ঘর্ষণে পেষণ করিতে করিতে, সেই পূর্ব্বমুখ লক্ষ্য করিয়া চলিলাম। কিন্তু মনুষ্য গতায়াতের পথ দেখিতে পাইলাম না। যে দিক্ হইতেই আসিয়া থাকি, আমি পথ ধরিয়াই আসিয়াছিলাম,

তবে আর এদিকে গিয়া কেন বৃথা কালহরণ করি? ক্ষণে ক্ষণে স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইলাম, এদিক্ ওদিক্ দৃষ্টিপাত করিলাম, আবার চলিলাম। কিন্তু আর বড় অধিক দূর যাইতেও হইল না। পত্রের চিন্তায় পথের কথা ভাবিতে ভাবিতে, সেই দিকে যাইতে যাইতে, সহসা দেখিলাম আমার সম্মুখে দূরব্যাপী, ক্রমনিম্ন বালুকাময় প্রান্তর;—দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে নিরবচ্ছিন্ন বালুকার স্তূপ। আমার কৌতূহল জন্মিল,সেই সিকতারাশি অতিক্রম করিলাম, তখন দেখিলাম ভাগীরথী সাগরসঙ্গমে যাইতেছেন। তিনি যে ভাগীরথী, তাহা কাহারও চিনাইয়া দিতে হইল না;— মহাজনের মহত্ত্ব, মহাজনের গৌরব সর্ব্বাঙ্গে প্রতিভাত হইতে থাকে।

ভাগীরথীদর্শনে আবার ক্ষণকালের জন্য সকল ভুলিয়া গেলাম। অনন্তকাল ধরিয়া গঙ্গা অবিচ্ছেদে সাগরসঙ্গমের সুখলাভ করিতেছেন, তথাপি অনন্তপ্রবাহিনী সেই সাগরাভিমুখেই প্রধাবিতা। প্রণয়ের চরমোৎকর্ষের সেই সজীব মুর্ত্তি, সেই পবিত্র জাহ্নবীতীরে দাঁড়াইয়া, কল্পনায় আলোচনা করিতে লাগিলাম। তখন দাদাকে, বউকে আপন বলিয়া মনে পড়িল; আমি কোথায়, তাহা মনে হইল; তাহার পর চক্ষে জল আসিল, আর গঙ্গা দেখিতে পাইলাম না। অমনি মুখ ফিরাইলাম, আবার সেই পত্রের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইল, পুনরপি সেই বালুকারাশির উপর দিয়া চলিলাম। কিন্তু তখন আমার দিঙ্‌নির্ণয় ছিল না।

কতকদূর গিয়া দেখিলাম বালুকা যেন মনুষ্যের পদক্ষেপে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া রহিয়াছে; নিকটে পথ আছে ভাবিয়া একবার চতুর্দ্দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিলাম——ভয়ঙ্কর দৃশ্য!—অনতিদূরে মনুষ্যের মৃতদেহ! তাহার পরিধানে বস্ত্র ছিল, তেমনি রহিয়াছে; কণ্ঠের স্বর্ণাভরণ অস্পৃষ্ট রহিয়াছে। আমি যে স্থানে দাঁড়াইয়া, সেখান হইতে দৃশ্যমান্ কোনও ক্ষত চিহ্নও সে দেহে দেখা গেল না। নিকটে গিয়া ভাল করিয়া দেখিতে সাহস হইল না, কিন্তু বিশ্বাস হইল যে সে ব্যক্তি সদ্যোমৃত। ত্বরিতগতিতে সে স্থান ত্যাগের মানসে অগ্রসর হইলাম, কিন্তু দুই পা না যাইতেই——একখানি পত্র!

এই কি সেই পত্র? আমি ত এ পথে গিয়াছিলাম বলিয়া আমার বোধ হয় না। হউক বা না হউক, কৌতুহলের বশে পত্রখানি কুড়াইয়া লইলাম; ভয় হইয়াছিল, কৌতুহলে তাহার কথঞ্চিৎ উপশম হইল। তথাপি সেই পত্রহস্তে দৌড়িতে লাগিলাম। তীর অতিক্রম করিয়া যখন বুঝিলাম যে গঙ্গা বহুদূরে পড়িয়াছে, তখন চন্দ্রালোকে পত্রখানি পড়িতে লাগিলাম। অতি কষ্টে অতি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পড়িলাম——

"প্রত্যুত্তরনিবেদনঞ্চ বিশেষঃ——

আদৌ বসন্ত সে ধাতুর লোক নহে।

ফলতঃ যাহার জন্য আমি এই ভয়ানক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম, সে ই অদ্য নিরুদ্দেশ হইয়াছে,তাহাতে আমার মনে বড়ই উৎকণ্ঠা হইয়াছে। সুতরাং আর আমার দ্বারা কোনও প্রত্যাশা করিবেন না। যাহা হউক, প্রকাশেরও কোনও আশঙ্কা নাই। আপনার পত্র পোড়াইয়া ফেলিয়াছি, এপত্রও ছিঁড়িয়া ফেলিবেন। ইতি ২৯ এ কার্ত্তিক।"

পত্রের শিরোনামা নাই, কাহারও স্বাক্ষর নাই। বোধ হইল হস্তাক্ষর অপরিচিত নহে!

পাঠকালে, পাঠান্তে বারংবার লোমাঞ্চ হইতে লাগিল, শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইল, বার বার চারিদিকে চাহিতে লাগিলাম। তখন চন্দ্র অস্তগত হইল। ক্ষণকাল পরে দেখিলাম কতকগুলা বৃক্ষের অন্তরালে একটা আলোক; একবার চন্দ্র বলিয়া সন্দেহ হইল, কিন্তু তাহার বর্দ্ধমান আয়তন, উদ্যমশীল ধূমপুঞ্জ এবং চট্‌পট্‌ শব্দে সে সন্দেহ শীঘ্রই দূরীভূত হইল।

লোকালয়ে অগ্নি লাগিয়াছে মনে করিয়া পত্রখানি বস্ত্রাঞ্চলে দৃঢ়বন্ধনপূর্ব্বক সেইদিকে দৌড়িলাম। শ্রীরণরঘু গোস্বামী।

কার্য্য ও কারণ।

এ জগতে কারণ বিনা কার্য্যের উৎপত্তি সম্ভবে না! আকাশের নক্ষত্র অবধি পৃথিবীর নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত যেখানে যে কিছু পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারই কারণ আছে। ঐ যে নদীর জল জোয়ারে ফাঁপিতেছে, ভাঁটায় কমিতেছে তাহারও কারণ আছে। ঐ যে মেঘ উঠিল, শূন্যমার্গ অন্ধকার হইয়া গেল, বৃষ্টি মুসলধারে পড়িল, প্রবল ঝটিকা বহিল, তাহারও কারণ আছে। বায়ুহীন প্রদেশে শব্দ নাই, গন্ধ নাই; তথায় জল বত্রিশ পাদ উর্দ্ধে উঠে ইহারও কারণ আছে। এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে যে কিছু পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়, সকলেরই কারণ আছে। কারণ ব্যতীত কার্য্যের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না।

পণ্ডিতেরা কারণের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন;—যাহা ব্যতীত কার্য্যসিদ্ধি হয় না,তাহার নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিতাই কারণত্ব *। কারণের অভাব হইলেই কার্য্যের অভাব হইবে †। কোন কা-

* অন্যথাসিদ্ধিশূন্যস্য নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তিতা কারণত্বং। ভাষা পরিচ্ছেদ।

† কারণাভাবাৎ কার্য্যাভাবঃ। আহ্নিকঃ।

নৈয়ায়িক ফাউলার সাহেবও কারণের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

See Fowler's Inductive Logic Ch I

র্য্যের কারণ নিরূপণের জন্য এইরূপ বিধি আছে,—ইতর কারণ থাকিলেও যাহার অভাবে কার্য্যের অভাব, তাহাই ঐ কার্য্যের কারণ বলিয়া জানিবে *। কার্য্য ও কারণ মধ্যে এরূপ গাঢ় সম্বন্ধ যে, দ্বিতীয়ের অভাবে প্রথমটির অস্তিত্ব সম্ভবে না; প্রথমটি না হইলে দ্বিতীয়টির ঘটন কোনরূপে স্বীকার করা যায় না। অনেক স্থলে এরূপ ঘটিয়া থাকে যে, কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও কোন প্রতিরোধী ঘটনা ঘটিয়া সেই কারণের কার্য্যোৎপাদক শক্তি নষ্ট করিয়া দেয়। সুতরাং যখনই আমরা বলিব যে, কারণ সত্ত্বে কার্য্যের সত্ত্বা অবশ্য স্বীকার্য্য, পাঠকগণকে বুঝিতে হইবে যে, কার্য্যোৎপত্তি সম্বন্ধে কোন প্রতিরোধী ঘটনা উপস্থিত নাই †।

কারণ তিন প্রকার,—সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত। যাহা সমবেত হইলে কোন দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহাকেই তাহার সমবায়ী কারণ কহে; যাহা তাহাতে আসন্ন, তাহাই অসমবায়ী কারণ; এবং এই উভয় হইতে ভিন্ন যে কারণ, তাহাকে নিমিত্ত কারণ বলা যায়। ঘট প্রস্তুত সম্বন্ধে কপাল সমবায়ী, কপালসংযোগ অসমবায়ী এবং দণ্ডচক্রাদি নিমিত্ত কারণ *। আমরা কোন বিশেষ কারণের উল্লেখ করিব না, কিন্তু যখনই 'কারণ' শব্দের প্রয়োগ করিব, তখনই পাঠকগণকে সকল কারণ একত্র করিয়া যাহা হয় (অর্থাৎ যাহার একটি অভাবে কার্য্যোৎপত্তি সম্বন্ধে ব্যাঘাত ঘটে) তাহাই বুঝিতে হইবে †।

* 'যদ্ব্যতিরেকেণ ইতরকারণসমুদয়সত্ত্বে যস্য অভাবং পশ্যতি তৎ কার্য্যং প্রতি তস্য কারণত্বং নিশ্চিনোতি।'

পণ্ডিতবর জন্‌ষ্টুয়ার্ট মিল তাঁহার কৃত ন্যায়শাস্ত্রে কারণ নিরূপণের অবিকল এইরূপ উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

Oompare Mill's Inductive Logic, 2nd & 3rd Canons.

† See Fowler's Inductive Logic Chap I. ইহাকে ইংরেজীতে Negative conditions বলে।

* নৈয়ায়িকেরা বলিয়া থাকেন;—

ভবেত্তস্য (কারণস্য) ত্রৈবিধ্যং পরিকীর্ত্তিতং। সমবায়িকারণত্বং জ্ঞেয়মথাপ্যসমবায়িহেতুত্বং। এবং ন্যায়নয়জ্ঞৈস্তৃতীয়মুক্তংনিমিত্তহেতুত্বং। যৎসমবেতং কার্য্যং ভবতি জ্ঞেয়ন্তু সমবায়ি জনকং তৎ। তত্রাসন্নং জনকং দ্বিতীয়মাভ্যাং পরং তৃতীয়ংস্যাৎ। পুনশ্চ—তৎপ্রতি (অর্থাৎ কার্য্যের প্রতি) কারণং ত্রিবিধং। সমবায়িকারণং ১যথা ঘটকার্য্যং প্রতি কপালং। অসমবায়ী কারণং ২ যথা ঘটকার্য্যং প্রতি কপালসংযোগাদি। নিমিত্ত কারণং ৩ যথা ঘটং প্রতি দণ্ডচক্রাদি।

ইতি তর্কশাস্ত্রং।

† ইহার জন্য কখন কখন ইংরেজীতে Cause এই শব্দের পরিবর্ত্তে Concause শব্দ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে।

আমরা যাহাকে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বলিয়া উল্লেখ করি, তাহা পরিবর্ত্তন ব্যতীত আর কিছুই নহে। একটি ঘটনা ঘটিল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে একটি পরিবর্ত্তন দেখা গেল—একটি দৃঢ় মুস্ট্যাঘাত করিলাম, তোমার অস্থিগুলি ভাঙ্গিয়া গেল, ইহাই কার্য্যকারণ সম্বন্ধ। কারণের ফলটি যত ভয়ানক বা গুরুতর হয়,সেই পরিমাণে সম্বন্ধটি আমাদিগের হৃদয়ে অঙ্কিত থাকে। একবার দেখিলে আর জন্মে ভুলি না। যে একবার কামানের শব্দ শুনিয়াছে, সে তাহা কখন ভুলিতে পারিবে না। যে শিশু একবার প্রদীপের নিকট খেলা করিতে গিয়া দহনজ্বালা সহ্য করিয়াছে, সে প্রাণ থাকিতে আর প্রদীপের নিকট যাইবে না।

সর উইলিয়ম হ্যামিল্টন কার্য্যকারণের এইরূপ সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করেন,যথা; এ জগতে আমরা যাহা দেখিতে পাই,তাহারই যে কারণ আছে, ইহা আমাদিগের দৃঢ়বিশ্বাস। কিন্তু কার্য্যের কারণ আছে বলিলে আমরা কি বুঝিব? যাহা আমরা এখন দেখিতে পাইতেছি, তাহাই যে ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রথম স্রষ্ট, অর্থাৎ ঈশ্বর শূন্য হইতে (Out of nothing) যে ইহাদিগকে স্রজন করিলেন, তাহা আমরা স্বপ্নেও অনুভব করিতে পারি না! সুতরাং যাহা আমরা দেখিতেছি, তাহা পূর্ব্বে ছিল,—অন্য আকারে থাকুক, অন্য অবস্থায় থাকুক—তাহারা ছিল, এই তাহাদিগের আরম্ভ নহে; ইহা আমাদিগের স্বীকার করা কর্ত্তব্য। এ জগতের পরমাণু কমিবার নহে, বাড়িবার নহে, তাহারা সমভাবেই আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে। সুতরাং যাহা কেন চক্ষে দেখি-না, তাহার পরমাণুগুলি অন্য কোন দ্রব্য হইতে আসিয়াছে; না আসিলে কোথা হইতে পরমাণুর সম্ভব হইতে পারে? সৎ হইতে অসৎ হইতে পারে না, অসৎ হইতেও সৎ হইতে পারে না *। ঈশ্বর শূন্য হইতে এই জগৎ স্রজন করিয়াছেন শুনিলে আমরা কি বুঝিব? তিনি আপন হইতেই এই জগতের সত্ত্বা আবিষ্কার করিয়াছেন; ইহার অধিক আমাদিগের বুদ্ধির অগম্য; চিন্তার অতীত ও স্বপ্নের অগোচর।

সুতরাং কারণের পরমাণু হইতেই কার্য্যের পরমাণুর সম্ভব হইয়া থাকে। কারণে যাহা থাকে কার্য্যেও তাহা থাকিতে দেখা যায়; যাহা কার্য্যে দেখিতে পাই না তাহা কারণেও ছিল না ইহা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা। সম্পূর্ণ আরম্ভ ও সম্পূর্ণ ধ্বংস † আমাদিগের বুদ্ধির অগম্য। সুতরাং কার্য্যকারণ ভাব আর কিছুই নহে, কেবল এই যে, যাহা এখন দেখিতেছি তাহা পূর্ব্বে

* "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।"

† Absolute commencement and absolute annihilations.

অন্য আকারে ও অন্য অবস্থায় বর্ত্তমান ছিল *।

আমরা এরূপ তর্কের অনুমোদন করি না। সম্পূর্ণ আরম্ভ ও সম্পূর্ণ ধ্বংস আমাদিগের বুদ্ধির অগম্য, একথা আমরা স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক। প্রতি দিনই আমরা ইহার শত শত দৃষ্টান্ত পাইয়া থাকি। যখন পাত্রের জলটী শুকাইয়া যায়, তখন কি আমরা ভাবি না যে, জলটী ধ্বংস হইয়া গেল; তখন কে ভাবে যে, বায়ু আসিয়া কণায় কণায় জলকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে; সেই জলে মেঘ হইয়াছে; সেই মেঘে বৃষ্টি পড়ে। এরূপ তর্ক যে সত্য, তাহা আমাদিগের বিশ্বাস আছে, কিন্তু এসত্য কয়জনে জানে? যখন গ্রীষ্মকালে জলাশয় সকল শুকাইয়া যায়, তখন কৃষক কি একবারও ভাবে, এই জল বাষ্পে পরিণত হইয়া মেঘ হইতে আবার বৃষ্টি হইবে? সেই জল যে অন্য আকারে এ জগতে বর্ত্তমান আছে, তাহা তাহার বুদ্ধির অগম্য। জল যে মেঘকণায় পরিণত হয়, এবং এজগতের কোন পরমাণুই ধ্বংস হইবার নহে, ইহা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু হ্যামিলটন্ সাহেব যে বলিয়াছেন যে, এতদ্বিপরীত চিন্তার অগম্য, তাহা আমরা আপনাদিগের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে বুঝিতে অক্ষম। জগতে সকলেই বিজ্ঞানবিৎ বা দার্শনিক হইলে, যে পরমাণু এক্ষণে আছে, তাহার প্রকৃত আরম্ভ ও প্রকৃত ধ্বংস হইতে পারে না একথা একদিন বলিলে খাটিতে পারিত। প্রকৃত আরম্ভ ও প্রকৃত ধ্বংস হইতে পারে না একথার চিন্তা করিলে কি ফল ফলে, আমরা তাহাই দেখাইব।

* Sir William Hamilton's Lectures on Metaphysics.

ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে (হ্যামিলটন্ সাহেবের কথানুসারে) যে, যে জগৎ এক্ষণে আমরা প্রত্যক্ষবৎ দেখিতেছি, তাহা পূর্ব্বেও ছিল, এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। সুতরাং বলিতে হইবে যে, এই জগৎ ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হয় নাই, এবং কিছুতেই ইহা ধ্বংস হইবে না।

হ্যামিলটন্ সাহেব তদুত্তরে এই বলেন যে, পূর্ব্বে 'জগৎ-সৃষ্টির' ক্ষমতা ঈশ্বরে ছিল; সেই ক্ষমতা হইতেই এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। সৎ হইতে অসৎ হয় নাই, ক্ষমতা হইতে জগৎ হইয়াছে। সে হিসাবে সে ক্ষমতা এক্ষণে আর ঈশ্বরে নাই। সে ক্ষমতা জগৎরূপে পরিণত হইয়াছে। অতএব ঈশ্বর যদি এইরূপ আর একটী জগৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি পারিবেন না, কেন না, সে ক্ষমতা আর নাই! এই জগৎ যখন ধ্বংস হইয়া আবার তাঁহার ক্ষমতায় পরিণত হইবে, তখন তিনি আবার জগৎ সৃষ্টি করিতে পারিবেন, এক্ষণে নহে। সুতরাং হ্যামিল্টনের কার্য্য কারণ সম্বন্ধে বিশ্বাস করিতে গেলে মহা গোলোযোগ আসিয়া পড়ে।

অনেকে বলেন যে, কার্য্য হইলেই

কারণ থাকিবে, এইটী আমাদিগের স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস। তাঁহারা বলেন যে, প্রত্যেক কারণেরই কার্য্য থাকিতে হইবে; ইহা প্রমাণের অতীত, প্রমাণ করা যাইতে পারে না। যাহা আপনি আপনাকে প্রমাণিত করিতেছে, তাহার আবার অন্য প্রমাণের প্রয়োজন কি ? পঞ্চমবর্ষীয় বালকও যাহা দেখে তাহারই কারণ অনুসন্ধান করিতে যত্নশীল হয়। পশ্চাদ্দিক হইতে তাহার গাত্রে লোষ্ট্রক্ষেপ কর, অমনি সে সেই দিকে চাহিয়া দেখিবে; না দেখিতে পাইলে কে, কেন, প্রশ্ন করিতে নিকটবর্ত্তী মাতা বা পিতাকে জিজ্ঞাসা করিবে। যদি কার্য্যকারণ সম্বন্ধ স্বতঃসিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে এই ক্ষুদ্র দুধের বালক কেমন করিয়া প্রত্যেক কার্য্যেরই কারণ আছে, এসত্য জানিবে ?

কিন্তু আমরা এমতের পোষকতা করিতে পারি না। আজি পর্য্যন্ত কিছুই যে জগতে স্বতঃসিদ্ধ আছে ইহা আমরা স্বীকার করি না। এক এরূপ স্বতঃসিদ্ধতা সম্বন্ধেও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। আজি দেখিলাম, অগ্নিতে বস্ত্র দিলেই পুড়িয়া যায়, কালিও দেখিলাম, পরশ্ব দিবসও ঐ ঘটনা ঘটিল; এইরূপ যখনই পরীক্ষা করিয়া দেখি, তখনই অগ্নিতে বস্ত্র দিলেই পুড়িয়া যায়। এইরূপে বুঝিতে পারিলাম যে, অগ্নিতে বস্ত্র দিলেই পুড়িয়া যাইবে। তখনও আমার এরূপ জ্ঞান জন্মায় নাই যে, অগ্নিতে যাহা দিব, তাহাই পুড়িয়া যাইবে। তখনও আমার বিশ্বাস হয় নাই যে, প্রত্যেক ঘটনারই কারণ আছে, কারণ ব্যতীত কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। যে শিশু একবার প্রদীপের নিকট গিয়া বিশেষ কষ্ট পাইয়াছে, সে আর প্রদীপের নিকট যাইতে চায় না। কেন ? তাহার কি জ্ঞান জন্মিয়াছে যে প্রত্যেক কারণেরই কার্য্য আছে, বা প্রত্যেক কার্য্যেরই কারণ আছে ? কখনই নহে, সে এই পর্য্যন্ত জানে যে, প্রদীপের নিকট গেলে পূর্ব্বের মত তাহার কষ্ট হইবে, এই জন্য সে যাইতে চায় না; নতুবা যে কারণ ব্যতীত কার্য্য হয় না, এজ্ঞান তখন তাহার হইয়াছে, ইহা আমরা বলি না। এইরূপে পরীক্ষা করিতে করিতে, নানা বিষয় দেখিতে দেখিতে, কার্য্য মাত্রেরই যে কারণ আছে, এই জ্ঞান আমরা লাভ করিয়া থাকি। যখন এরূপ ঘটনা আমরা স্বচক্ষে দেখি, তখন কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আমরা কোন্ সাহসে স্বতঃসিদ্ধ বলি ? *

* সার উইলিয়ম হ্যামিল্টনসাহেব তাঁহার প্রণীত Discussions on Philosophy &c. নামক পুস্তকে কারণত্বের স্বতঃসিদ্ধতা প্রমাণ করিবার বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন। তৎপ্রণীত "Lectures on Metaphysics" তেও ইহার উল্লেখ অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। রিড এবং হিউয়েল (Red and Whewell) ও এই মতের পোষকতা করেন। হার্বার্ট স্পেন্সর (Her-

এতৎ সম্বন্ধে কোন সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক বলিয়াছেন, ' প্রত্যেক কার্য্যের কারণকে থাকিতেই হইবে, অনেকে এই কথা বলিয়া আমাদিগের কার্য্যকারণ ভাবকে স্বতঃসিদ্ধ বলিতে চাহেন। থাকিতেই হইবে, এই কথা বলিবার পূর্ব্বে আমাদিগের দেখা উচিত, প্রত্যেক কার্য্যের কারণ আছে কি না? ইহা আমরা কোন রূপ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিতে পারি না, এবং কখনও পারিব না। সুতরাং কার্য্য হইলেই কারণ থাকিতে হইবে এই কথা বলিয়া এই ভাবকে স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ করিতে যাওয়া ধৃষ্টতার কার্য্য ব্যতীত আর কিছুই নহে।

বিপক্ষীয়েরা বলেন, যদি ইহাকে স্বতঃসিদ্ধ না বল, তাহা হইলে কারণ ব্যতীত কোন কার্য্যকে একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। ভাব দেখি, কার্য্য আছে, তাহার কারণ নাই। আমরা এতদুত্তরে এই বলি যে, কারণ ব্যতীত কার্য্যের সম্ভব আমরা ভাবিতে পারি। আমরা কারণকে মনে স্থান না দিয়া কেবল কার্য্যটী ভাবিতে পারি। তবে কার্য্যের সহিত যে কারণকে ভাবিয়া থাকি তাহা কেবল এই সংসারের গতিতে। আমরা কারণ ব্যতীত কার্য্য কখন দেখি নাই, এই জন্যই একটীর সত্বায় অপরটীর সত্বা আমাদিগের মনোমধ্যে উদয় হয়। যতই আমরা বয়োবৃদ্ধ হইতে থাকি, ততই প্রত্যেক দ্রব্যের নানা রূপ সম্বন্ধ দেখিতে পাই; এই দেখিয়া দেখিয়া আমাদিগের মনে কার্য্যকারণের ভাব দৃঢ় অঙ্কিত হইয়া যায়।

অনেকে আবার বলিয়া থাকেন যে, কারণ যদি কার্য্যকে উৎপন্ন করিতে পারে, তাহা হইলে কার্য্যোৎপত্তির ক্ষমতা কারণে আছে। অগ্নিতে যদি কিছু পুড়িয়া যায়, তাহা হইলে অগ্নির দাহিকাশক্তি আছে বলিতে হইবে; সূর্য্য উত্তাপ দেয়, সুতরাং উত্তাপ দিবার শক্তি সূর্য্যের আছে।

এইরূপে তাঁহারা কারণে একটি শক্তির উল্লেখ করিয়া থাকেন। হ্যামিলটন্ সাহেবই এই মতের একজন প্রধান প্রবর্ত্তয়িতা।

কিন্তু আমরা কারণে কোন রূপ ক্ষমতা বা শক্তি দেখিতে পাই না। অগ্নিতে কোন গুণ আছে (সে গুণ শক্তি নহে) এবং বস্ত্রেও কোন গুণ আছে, এই দুইটী গুণের

Herbert Spenser) বলেন যে, বাস্তবিক বাহ্যজগতের পর্য্যালোচনা দ্বারা আমরা ইহার জ্ঞান লাভ করি। কিন্তু বহু পূর্ব্বপুরুষাবধি এইরূপ বলিয়া আসিতেছে বলিয়া, কারণত্ব এক প্রকার মনের স্বতঃজাত বিশ্বাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মালব্রন্স (Malbranche) ঈশ্বরকেই একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং আমরা জগতে কারণের যাহা কিছু দেখিতে পাই, তাঁহার মতে তাহাতে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ আছে। See also Mill's Logic book chap 3.

Al xander Bain.

সান্নিধ্য হইলেই বস্ত্র আর একরূপ কোন দ্রব্যে পরিণত হইয়া যায়। ইহাতে এরূপ বলিতে পারি না যে,অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে, কেন না তাহা হইলে অগ্নি সকল দ্রব্যকেই ভস্মসাৎ করিতে পারিত; এ জগতে অনেক সামগ্রী আছে যে,অগ্নি তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, যে গুণের অস্তিত্ব থাকাতে বস্ত্র দগ্ধ হইয়া গেল, সেই গুণের অস্তিত্ব সেই সকল সামগ্রীতে নাই; এই জন্যই উহারা অগ্নি সংস্পর্শেও পুড়িল না। *

এতদ্ব্যতীত আমরা বাল্যকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছি যে অগ্নিতে বস্ত্র দিলেই বস্ত্র আর এক প্রকার আকৃতি ধারণ করে। বস্ত্রে অগ্নিসংযোগ, এবং বস্ত্রের আকার-পরিবর্ত্তন এই দুইটী ভাব আমাদিগের মনে শৈশবাবস্থা হইতে এরূপ দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে যে, যখনই বস্ত্রে অগ্নিসংযোগ দেখিব, তখনই সেই পরিবর্ত্তনের কথা মনে পড়িবে। কিন্তু বস্ত্র পুড়িতেছে দেখিতে পাইলে আমরা এরূপ মনে করিতে পারি না যে, অগ্নিতেই বস্ত্র পুড়িয়াছে। কারণ হইতে কার্য্যের অনুমান করা যাইতে পারে, কিন্তু কার্য্য হইতে কোন বিশেষ কারণ নির্ণয় করা যাইতে পারে না।

কোন দার্শনিক বলেন, পূর্ব্বাপর ভাবই কারণত্ব। 'ক' এর পূর্ব্বে যদি 'খ' ও 'গ' ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে 'খ' ও 'গ' কারণ, 'ক' কার্য্য। কিন্তু এটি ঘোর ভ্রমাত্মক। একথা সত্য হইলে, দিনকে রাত্রির কারণ বলিতে হইবে, এবং রাত্রিকে দিনের কারণ বলিতে হইবে। এ তর্কটি অন্যোন্যাশ্রয় দোষ যুক্ত। বিশেষতঃ দিবা এবং রাত্রির মধ্যে যে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ আছে, তাহা প্রায় কোন নৈয়ায়িকই স্বীকার করেন না *।

কারণ সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিলাম, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই;—

১। কারণত্বং অন্যথাসিদ্ধিশূন্যস্য নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তিতা; ব্যতীত আর কিছুই নহে।

২। ইহার স্বতঃসিদ্ধতা সম্বন্ধে কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

৩। অনেকে কারণে কার্য্যোৎপাদক শক্তির উল্লেখ করিয়া থাকেন; এরূপ শক্তি কারণে দেখিতে পাওয়া যায় না।

৪। এক কারণ হইতে এক কার্য্যই হইয়া থাকে, সুতরাং কারণ হইতে আমরা কার্য্যের অনুমান করিতে পারি। কিন্তু এক কার্য্যের বহু কারণ থাকিতে পারে,

* ম্যান্সেল, কোম্‌ত্, জেমস্ মিল এবং জনষ্টুয়ার্ট মিল মহোদয়েরা কারণে যে কোনরূপ ক্ষমতা আছে তাহা স্বীকার করেন না।

* দিন রাত্রির কারণ নহে এবং রাত্রিও দিনের কারণ নহে পরন্তু উভয়ই একটী কারণের কার্য্য। দ্রষ্টব্য জনষ্টুয়ার্ট-মিলের ন্যায় শাস্ত্র। (Mill's Logic—chapter on causation

এইজন্য আমরা কার্য্য দেখিয়া কোন বিশেষ কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি না।

৫। যে কারণ হইতে যে কার্য্যের উৎপত্তি হইতেছে, যত দিন এই জগৎ থাকিবে সেই কারণ হইতে সেই কার্য্যেরই উদ্ভব হইতে থাকিবে ইহার কোনরূপ অন্যথা ঘটিবেনা।

সমালোচনের সমালোচনা

গত কএক বৎসর যাবৎ আদিশূর-কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন ও সেই ব্রাহ্মণদিগের রাঢ়ী বারেন্দ্রে বিভাগ সম্বন্ধে প্রস্তাব এবং গ্রন্থ লিখিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তন্মধ্যে ইউরোপীয় লেখক দ্বারা ইংরেজি ভাষাতে যে দুইখানি গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে তাহার একখানি হণ্টর সাহেবের। তিনি বাঙ্গালার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত লিখিতে লিখিতে প্রসঙ্গক্রমে আদিশূর কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ আনয়ন এবং রাঢ়ী বারেন্দ্রে বিভাগের বিবরণ লিখিয়াছেন। দ্বিতীয় গ্রন্থ সেরিং সাহেব কৃত। উহা ব্রাহ্মণগণের গোত্রনির্ণয় এবং ভারতবর্ষের হিন্দুজাতি বিষয়ক। তিনিও প্রসঙ্গক্রমে উক্ত বিবরণ লিখিয়াছেন। এতৎ সম্বন্ধে তৃতীয় গ্রন্থ গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক বিরচিত লঘুভারত; তিনিও আদিশূর কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ আনয়ন এবং রাঢ়ী বারেন্দ্রে বিভাগের বিবরণ লিখিয়াছেন। শেষোক্ত গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষাতে লিখিত হইয়াছে; সুতরাং উপরোক্ত তিন খানি গ্রন্থের বিবরণ সাধারণের জ্ঞানগোচর হয় নাই। বহুদিন হইল কোল্‌ব্রুক সাহেব আসিয়াটিক রিসার্চ্চ নামক সাময়িক প্রচারিত গ্রন্থে, এবং ডাক্তার কে, এম্, বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতারিভিউতে এই সকল বিষয় সম্বন্ধে প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন কিন্তু তাহাও অনেকেই দেখিতে পান নাই। সম্প্রতি কৃষ্ণনগর নর্ম্মাল স্কুলের পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষাতে সম্বন্ধনির্ণয় নামে একখানি গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। বোধ হয় সাধারণে ঐ গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকিবেন, এবং গত ১২৮৩ সনের পৌষ মাসের আর্য্যদর্শনে উক্ত পুস্তকের সমালোচন উপলক্ষে রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগ সম্বন্ধে যে কিঞ্চিৎ বিবরণ লিখিত হইয়াছে তাহাও বোধহয় সাধারণের গোচর হইয়াছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, কোন গ্রন্থকর্ত্তা কি কোন প্রস্তাব লেখক কি কোন সমালোচকই এবিষয়ের প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই, সকলেই কেবল আপন আপন ইচ্ছানুযায়ী মত প্রচার করিয়াছেন।

লালমোহন বাবু, গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ এবং সেরিং সাহেবের মতে রাঢ়ী বারেন্দ্র উভয় শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণই কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণের সন্তান; যে দেশে তাঁহারা বাস করিয়াছিলেন সেই দেশের নামানুসারে তাঁহাদের শ্রেণীর নাম হইয়াছে। হণ্টর সাহেবের মতে রাঢ়ীয়গণ কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণগণের স্বদেশেবিবাহিত বৈধ পত্নীর সন্তান। বারেন্দ্রগণ—এদেশের ব্রাহ্মণকন্যাতে উক্ত কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণের ঔরসজাত সন্তান। লালমোহন বাবু কহেন "ইহারাও অর্থাৎ বারেন্দ্ররাও আদি পঞ্চগোত্রের পঞ্চ মহাপুরুষের সন্তান"। আর্য্যদর্শনের সমালোচক তদুপলক্ষে লিখিয়াছেন "ইহা লালমোহন বাবুর অনুমান মাত্র, কারণ তিনি ইহার সপক্ষে কোন প্রমাণ প্রদান করিতে পারেন না এবং তাঁহার এই অনুমান অপ্রতিদ্বন্দ্বীও নহে; কারণ কেহ কেহ এবিষয়ের অন্য প্রকার মীমাংসাও করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা সস্ত্রীক বঙ্গে আইসেন নাই, তাঁহারা যতকালীন বঙ্গে আগমন করেন, তখন তাঁহাদের পুর্ব্বোঢ়া ভার্য্যারা বাটীতেই ছিলেন, তাঁহারা বঙ্গে আসিয়া এখানকার ব্রাহ্মণগণের পঞ্চ কন্যাকে বিবাহ করেন ইত্যাদি।" সমালোচক প্রকারান্তরে হণ্টর সাহেবের উক্তির পোষকতা করিতেছেন।

সম্বন্ধনির্ণয়কর্ত্তা এবং তৎসমালোচক উভয়েই কহেন ৯৯৯ অব্দে আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতে ৯৯৯ শকে ব্রাহ্মণ আইসার বিবরণ লিখিত আছে। এই গ্রন্থখানি আধুনিক নবদ্বিপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে প্রস্তুত হয়, সুতরাং ইহার লেখার প্রতি তত বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। সম্বন্ধনির্ণয়কর্ত্তা ঐ ৯৯৯ অব্দের সম্বৎ ব্যাখ্যা করিয়া ৮৬৩ কি ৮৬৪ শকাব্দে আদিশূর কর্ত্তৃক গৌড়ে ব্রাহ্মণ আনয়ন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন *। পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও স্বকৃত বহুবিবাহ নিবারণ বিষয়ক পুস্তকের প্রথম খণ্ডে ৯৯৯ শকাব্দে আদিশূর ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন বলিয়া লিখিয়াছেন। ঘটকদিগের কারিকা দৃষ্টে জানা যায় ৯৯৪ শকের কার্ত্তিক মাসে ব্রাহ্মণেরা আসিয়াছিলেন। (১) কিন্তু কুলাচার্য্য গ্রন্থের লিখা ইহার বিপরীত। তাহাতে লিখিত আছে ৯৫৪ শকে ব্রাহ্মণেরা গৌড়ে আসিয়াছিলেন। (২)। এখন কুলাচার্য্য গ্রন্থের লেখা সত্য কি না তাহাই বিবেচনা করা যাইতেছে; এবং তাহাতে বৌদ্ধ রাজাদের অধিকার সময় এবং আদিশূরের রাজত্ব কাল বিবেচনা করা আবশ্যক হইতেছে।

কনিঙহাম সাহেবের কৃত আর্কিওলজিকেল সার্ভে নামা গ্রন্থে পাল-

---

* সম্বন্ধ নির্ণয় ১৬১ পৃং এবং গ্রন্থের প্রথমে স্থিত ক্রোড় পত্র।

বংশীয় রাজাগণের যে তালিকা প্রকাশ হইয়াছে তাহা এই।

গোপাল	৭৬৫	খৃঃ অব্দ
ধর্ম্মপাল	৭৯০	ঐ
দেবপাল	৮১৫	"
জয়পাল	৮৪০	"
দেবপাল	৮৬৫	"
শূরপাল	৮৯০	"
নারায়নপাল	৯১৫	"
রাজপাল	৯৪০	"
* * পালদেব	৯৬৫	"
বিগ্রহপাল	৯৯৩	"
মহীপাল	১০১৫	"
নয়পাল	১০৪০	"
বিগ্রহপাল	১০৬৫	"

কাশীর নিকটবর্ত্তী শরনাথে একটি নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, উহা প্রাচীন পালি অক্ষরে ও পালি ভাষাতে লিখিত। তদ্দৃষ্টে জানা যায় ১০৮৩ সংবতে মহীপাল কাশী অধিকার করিয়াছিলেন এবং তাহাতে মহীপাল গৌড়রাজা বলিয়া লিখিত হইয়াছে ঐ ১০৮৩ সম্বত্ ১০১৫ খৃঃ অব্দ হইতেছে। কণিঙহাম্ সাহেব ১০১৫ হইতে ১০৪০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত মহীপালের রাজত্বকাল কহিতেছেন। মহীপালের কীর্ত্তি অদ্যাপি দিনাজপুরে বর্ত্তমান আছে। মহীপালের পর নয়পাল রাজা হন। ১০৪০ হইতে ১০৬৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তাহার রাজত্ব কাল। ডাক্তর বকানন কহেন পালবংশের শেস রাজার পরেই আদিশূর বাঙ্গালাতে রাজা হন। অধ্যাপক ল্যাশন সাহেবের বিবেচনা এই ১০৪০ খৃঃ অব্দে বৈদ্যবংশীয় রাজা কর্ত্তৃক পালবংশের রাজত্ব লোপ হয়। সাহেবদিগের মতে আদিশূর বৈদ্যবংশীয় এবং সেনবংশের আদি ব্যক্তি। বাস্তবিক আদিশূর যে বৌদ্ধদিগকে পরাস্ত করিয়া বাঙ্গালা অধিকার করিয়াছিলেন তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই। কুলপ্রদীপ নামা প্রাচীন গ্রন্থেও লিখিত আছে,আদিশূর বৌদ্ধ রাজাদিগকে পরাজয় করিয়া গৌড় অধিকার ও তথাতে বৈদিকধর্ম্ম প্রচার করেন।

লঘুভারত নামা গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে আদিশূর তাঁহার শ্বশুরের সহায়তাতে বীরসিংহকে পরাস্ত করিয়া, পালবংশীয় নৃপতিগণের বংশোচ্ছেদ করিয়া, পালবংশাসনে গৌড়ে স্বাধীন রাজা হন, এবং কলির ৪১৩০ বত্সর গতে (সুতরাং তাহার পুস্তক রচনার সময়ের সহিত ঐক্য করিলে ৯৫১ শক পাওয়া যায়) আদিশূরের রাজ্যারম্ভ হয়। অতএব আদিশূরের রাজ্যারম্ভকাল সম্বন্ধে ডাক্তর বকানন এবং অধ্যাপক ল্যাশনের সহিত লঘুভারতকর্ত্তা প্রায় একমত হইতেছেন। অধ্যাপক ল্যাশনের মতে ৯৬২ শকে এবং বিদ্যাভূষণের লিখামতে ৯৫১ শকে আদিশূর রাজা হন।

বারেন্দ্রকুল গ্রন্থে লিখা আছে আদিশূর কান্যকুব্জাধিপতি চন্দ্রকেতুর কন্যা বিবাহ করেন। কিন্তু কান্যকুব্জ নৃপতিগণের মধ্যে চন্দ্রদেব নাম পাওয়া যায়। সু-

ভরাং চন্দ্রকেতু এবং চন্দ্রদেবকে একব্যক্তি স্থির করিলাম। কাশীর ইতিহাসে লিখিত আছে ১০৭৪ সম্বতে কাশীতে বুনার নামা রাজা ছিলেন। তাহার দশ বৎসর পর কাশী মহীপাল রাজার অধীন হয় এবং তাহার হস্ত হইতে কণৌজের রাজা চন্দ্রদেব কাশী অধিকার করেন। সম্ভবতঃ ১০৯০ সম্বত্‌ অর্থাত্‌ ৯৫২ শকাব্দে চন্দ্রদেব কাশী অধিকার করেন। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণে আদিশূর যে কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক ৯৫০ শকাব্দের সমকালে গৌড়ে রাজা হন ইহা প্রতীয়মান হয়, এবং সম্ভবতঃ তিনি বৌদ্ধ বংশীয় নয়পালকে পরাজয় করিয়াছিলেন। সত্য বটে নয়পালের পরেও আরও কতকটি বৌদ্ধ রাজার নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাদের গৌড়ে রাজত্ব করার কোন প্রমাণ নাই। নয়পাল আদিশূর কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া মগধ দেশে রাজধানী করেন। তদবধি যে পর্য্যন্ত না মুসলমানগণ কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়াছিলেন সে পর্য্যন্ত পালবংশীয় গণ মগধে রাজত্ব করেন।

যদি উপরের লেখা মতে ৯৫০ শকের সমকালে আদিশূর গৌড়ে রাজা হইয়া থাকেন তাহা হইলে তৎসমকালেই ব্রাহ্মণ আনিয়া থাকিবেন। তিনি যৎকালে গৌড়ে রাজা হন তখন এদেশে বৈদিক ধর্ম্মের প্রচার ছিল না। কেন যে ছিল না তাহার সদুত্তর পাওয়া কঠিন। অনেকে অনুমান করেন বৌদ্ধ রাজাগণের দৌরাত্ম্যে বৈদিক ধর্ম্ম গৌড় দেশ হইতে অন্তর্হিত হয়। ইহা তাদৃশ সঙ্গত বোধ হয় না। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেই বৌদ্ধ ধর্ম্মের অত্যন্ত প্রচার হইয়াছিল, অথচ সে দেশে বৈদিক ধর্ম্মেরও প্রচার ছিল। বাঙ্গালার জল বায়ুর এমনই গুণ যে আদিশূরের আনীত ব্রাহ্মণ সন্তানেরাও বৈদিক ধর্ম্মানভিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিলেন। যাহা হউক যখন আদিশূর বাঙ্গালাতে বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশ্যেই উত্তর পশ্চিম দেশ হইতে বেদপারগ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তখন তাহার রাজ্যারম্ভের অব্যবহিত পরেই ব্রাহ্মণ আনয়ন সম্ভব এবং তাহা হইলে "বেদব্রানাঙ্কশাকেতু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ" এই প্রমান সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বোধ হয়। এই প্রমাণ কোন্‌ গ্রন্থের তাহা আমি অবগত নই, জনৈক প্রসিদ্ধ কুলজ্ঞ আমাকে এই প্রমান দিয়াছেন এবং নির্দ্দোষ কুলপঞ্জিধৃত বচন বলিয়া লিখিয়াছেন।

এই বচনের সত্যতা সম্বন্ধে আরও পোষক প্রমান দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু কুলপঞ্জিধৃত স্পষ্ট বচনের আর অধিক পোষক প্রমান প্রদর্শন করা নিষ্প্রয়োজন বোধে বিরত হইলাম। সম্প্রতি সম্বন্ধনির্ণয় কর্ত্তা আপন গ্রন্থে ৯৯৯ অব্দে ব্রাহ্মণ আনয়ন লিখিয়া সেই অব্দ শব্দের যে সম্বত ব্যাখ্যা করিয়াছেন এখন তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে। প্রথমতঃ বিবেচনা কর, ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত বাঙ্গালা দেশে লিখিত, তাহাতে যে অব্দ

লেখা আছে তাহা শকাব্দই হইবেক ; বাঙ্গালা দেশে সম্বত্ প্রচলিত নহে। বিশেষতঃ ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতে শকাব্দ শব্দ স্পষ্টই লেখা আছে। আদিশূর হইতে বল্লাল সেন অস্টম অথবা নবম পুরুষীয় অধস্তন রাজা। লালমোহন বাবু আইন আকবরির প্রমানানুসারে ১০৬৬ খৃঃ অব্দে বল্লাল সেনের রাজত্ব কাল স্থির করেন। যদি ১০৬৬ খৃঃ অব্দে বল্লাল সেনের রাজ্য আরম্ভ কাল হয় তাহা হইলে তাহার অস্টম অথবা নবম পুরুষের পুর্ব্বের আদিশূর ৯৯৯ শকাব্দে (১০৭৭ খৃঃ অব্দে) কি প্রকারে রাজত্ব করিবেন ইহাই লাল মোহন বাবুর আশঙ্কার কারণ হইয়াছে এবং তদনুসারে তিনি ৯৯৯ শককে সম্বত্ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ৯৯৯ সম্বতে ৮৬৩ কি ৮৬৪ শকাব্দ অর্থাত্ ৯৪২ খৃঃ অব্দ হয় ঐ সময়ে বাঙ্গলাতে পাল বংশীয় রাজাগণের অধিকার ছিল। বাস্তবিক বল্লান সেন যে ১০৬৬ খৃঃ অব্দে রাজ্য প্রাপ্ত হন এবিষয়ে সন্দেহ হয়। বল্লাল সেন কৃত দানসাগর নামে এক খানি গ্রন্থ আছে। এই প্রস্তাবলেখক বহু যত্ন করিয়া ঐ গ্রন্থ খানি প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থ খানি কোন্ শকে প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে তাহার কোন নিদর্শন নাই। কিন্তু সময়প্রকাশ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে "নিখিলনৃপচক্রতিলক শ্রীমত্বল্লাল সেন দেবেন। পুর্ণে শশি নবদশম্মিতে শকাব্দে দান সাগরো রচিতঃ।" এই বচনের প্রকৃতার্থে ১০৯১ শকে বল্লাল সেন কর্ত্তৃক দান সাগর রচিত হওয়া প্রমাণ হইতেছে। তাহা হইলে ১১৬৯ খৃঃ অব্দে দান সাগর রচনা হওয়া প্রমাণ হয়। সুতরাং ১০৬৬ খৃঃ অব্দে বল্লাল সেনের রাজ্য আরম্ভ হইতে পারে না। লাল মোহন বাবুও আপন গ্রন্থে সময় প্রকাশের বচনটি উঠাইয়াছেন কিন্তু তিনি উহার ১০১৯ শক অর্থ করেন। "পূর্ণে শশিনবদশম্মিতে" এইরূপ পাঠ থাকাতে বিধের অঙ্কের বামগতি হেতু প্রথমে ১০ তত্পর ৯ এইরূপে অঙ্ক স্থাপন করিয়া ১০৯১ শক অর্থ পাওয়া যায়।

মহারাজা আদিশূর কান্যকুব্জাধিপতির নিকট পঞ্চ গোত্রীয় পঞ্চ ব্রাহ্মণ যাচনা করেন। তদনুসারে কান্যকুব্জাধিপতি গৌড় দেশে আদিশূরের সভাতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া দেন। রাঢ়ীয়গণ কহেন ভট্টনারায়ন, দক্ষ, শ্রীহর্ষ, বেদগর্ব্ব, এবং ছান্দড় এই ৫ জন গৌড় দেশে আসিয়াছিলেন। তাহাদের আধুনিক গ্রন্থে ঐ পাঁচ নামই পাওয়া যায়। বারেন্দ্রগণ কহেন নারায়ন ভট্ট, সুষেণ, কাশ্যপ, ধরাধর এবং পরাশর এই পাঁচজন আসিয়াছিলেন। ইহাতেই সমস্ত বিরোধের উত্পত্তি হইতেছে, কারণ রাঢ়ীয়গণের আধুনিক গ্রন্থোল্লেখিত ভট্টনারায়নাদি পাঁচজন হইতে যে বংশ গণনা করা যায় তাহার মধ্যে বারেন্দ্র শ্রেণীর কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু বারেন্দ্র গ্রন্থে বল্লাল সেন কর্ত্তৃক শ্রেণী ভাগ কালে পঞ্চ গো-

ত্রীয় পাঁচজন ব্রাহ্মণ রাঢ়ী হওয়ার বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। বারেন্দ্রকুল গ্রন্থে রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগের সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিত আছে কিন্তু রাঢ়ীয় কুলজ্ঞ ঘটকগণ তৎপ্রতি আপত্তি করিতে পারেন, এজন্য রাঢ়ীয় নির্দোষ কুলপঞ্জিকা অনুসারে রাঢ়ী বারেন্দ্র বৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে। যথা—

একদিন মহারাজা আদিশূর সভাতে উপবেশন করিয়া পুরোহিত গণকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন "অহং ক্ষত্র কুলেজ্ঞাতঃ নকুর্য্যাম্বৃতযজ্ঞকং। আগ্নিহোত্রীয় যজ্ঞঞ্চ করিষ্যামি দ্বিজোত্তম। কুত্র কুত্র স্থিতা বিপ্রা বেদপারগ সম্ভবাঃ। তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কৃপয়া কথয় প্রভো॥ বিপ্র উবাচ। কান্যকুব্জস্থিতা বিপ্রাঃ সাগ্নিকা বেদ পারগাঃ। তস্মাৎ পঞ্চ দ্বিজাতীয় যজ্ঞ নিষ্পন্নতাং কুরু॥" অর্থাৎ, আমি ক্ষত্রিয় কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু কোন রূপ যাগ যজ্ঞ করিলাম না অতএব অগ্নিহোত্রীয় যজ্ঞ করিব। বেদ পারগ ব্রাহ্মণ কোথায় আছেন তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি; আপনি কৃপা করিয়া তাহা বলুন। তদুত্তরে পুরোহিত কহিলেন কান্যকুব্জ দেশে সাগ্নিক এবং বেদ পারগ ব্রাহ্মণ আছেন তথা হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করুন।

তদনুসারে আদিশূর ৯৫৪ শকাব্দে কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন সেই সকল ব্রাহ্মণের নাম ক্ষিতীশ, তিথি মেধা, বীতরাগ, সুধানিধি এবং সৌবরি। ইহারাই গৌড় দেশে আসিয়াছিলেন। যথা।

বেদ বাণাঙ্ক শাকেতু গৌড়ে বিপ্রা
সমাগতাঃ।
ক্ষিতীশস্তিথি মেধাচ বীতরাগঃ সুধানিধিঃ
সৌবরিঃ পঞ্চ ধর্ম্মাত্মা আগতা গৌড়
মণ্ডলং॥

অনেকের সংস্কার আছে ব্রাহ্মণেরা প্রথমে স্ত্রীসহিত আইসেন নাই এবং এদেশীয় ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন; পশ্চাত্ কান্যকুব্জ হইতে তাহাদের পুর্ব্ববিবাহিতা পত্নীরা আইসেন। বোধ হয় সম্বন্ধ নির্ণয়ের সমালোচকও এই মতের পক্ষপাতী, অতএব তাঁহাদের ভ্রম নিবারণ নিমিত্ত কুলগ্রন্থের নিম্নলিখিত কবিতাগুলি উদ্ধৃত হইল।

আয়াতাঃ পঞ্চবিপ্রাঃ সুচতুর হৃদয়াঃ প-
ঞ্চকোনাচ্চ দেশাত্
সস্ত্রীকা পুত্রযুক্তাঃ পরিজনসহিতাঃ সা-
গ্নয়ঃ কান্তিমন্তঃ॥
বাচষ্পতি মিশ্র কৃত কুলরমা।

হয়যানঃ সমারুহ্য সোপানত্কাঃ দ্বি-
জোত্তমাঃ।
সদারাশ্চ সপুত্রাশ্চ ভৃত্যৈরপি সমন্বিতাঃ॥
বারেন্দ্র কুলপঞ্জি।

মহারাজ রাজাদিশূরোমহাত্মা। তয়া বীরসিংহস্য মেহন্ত্যাদিসখ্যং। তবাজ্ঞানুসারাদ্ধি প্রস্থাপয়ামি দ্বিজান্ পঞ্চ গোত্রান্ সদারাদিভৃত্যান্—
শব্দকল্পদ্রুমধৃত কুলাচার্য্যকারিকা।

ব্রাহ্মণগণ যে স্ত্রীপুত্রাদি সহিত আসিয়াছিলেন, ইহার আরও প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। বাহুল্য ভয়ে তৎসমুদয় উল্লেখ করা গেল না।

ব্রাহ্মণেরা গৌড়ে আগত হইয়া আদিশূরের অভিলষিত যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া গৌড়ে বাস করিতে লাগিলেন। তৎপরে আদিশূরের মৃত্যু হইল, তাহার পুত্র ভূশূর রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া কান্যকুব্জানীত ব্রাহ্মণ পঞ্চকের ৫টি সন্তানকে বাস নিমিত্ত রাঢ়দেশে পাঠাইয়া দিলেন।

শাণ্ডিল্য গোত্রজঃ শ্রেষ্ঠঃ ভট্টনারায়ণো-
কবিঃ।
দক্ষোপি কাশ্যপশ্রেষ্ঠঃ বাৎস্য শ্রে-
ষ্ঠোপি ছান্দড়ঃ॥
ভরদ্বাজক গোত্রেচ শ্রীহর্ষোহর্ষবর্দ্ধনঃ।
বেদ গর্ব্বোপি,সাবর্ণে রাঢ়দেশ গতা অমী॥
দামোদরঃ সদাচার্য্যঃ শাণ্ডিল্যঃ গো-
ত্রজঃ সুধিঃ।
গৌতমোপি ভরদ্বাজ কাশ্যপেচ কৃপা-
নিধিঃ॥
বাৎস্য গোত্র সমুৎপন্নো জয়বুক্কোধরা-
ধরঃ॥
পরাশরোপি সাবর্ণে বারেন্দ্রা ভূমী
ভূশূরঃ॥

রাঢ়ীয় কুলাচার্য্য গ্রন্থোক্ত এই প্রমাণের প্রতি সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। আদিশূরের রাজধানী গৌড়ে ছিল; সকলেই কহেন ব্রাহ্মণেরা প্রথমে গৌড়ে আসিয়াছিলেন। বারেন্দ্র দেশ গৌড়ের একাংশ। মহানন্দার পূর্ব্ব করতোয়ার পশ্চিম পদ্মার দক্ষিণ এই সীমাবচ্ছিন্ন দেশ বারেন্দ্র; অতএব দেখা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণেরা প্রথমে বারেন্দ্রদেশে বসতি করেন, তাহাদেরই পরিজন রাঢ়ে গমন করেন।

কান্যকুব্জ হইতে আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত ব্রাহ্মণ সন্তানেরাই যে রাঢ়ী বারেন্দ্র এই দুই শ্রেণীতে বল্লাল সেন কর্ত্তৃক বিভক্ত হইয়াছিলেন, তাহা শব্দকল্পদ্রুমধৃত কুলাচার্য্য কারিকাতে লিখিত আছে যথা;—

অথ বল্লাল ভূপশ্চ অম্বষ্ঠ কুলনন্দনঃ।
কুরুতেতি প্রযত্নেন কুলশাস্ত্র নিপরূণং॥
আদিশূরানীতাবিপ্রাঃ শূদ্রাশ্চৈব তথা-
পরাঃ।
এতেষাং সন্ততীঃ সর্ব্বা আনয়ৎস নিজা-
লয়ে॥
যত্র যত্র স্থিতা বিপ্রাস্তত্রদেশে নিরূ-
পিতা:।
শ্রেণীদ্বয়ন্তু নির্ণীতং রাঢ়ী বারেন্দ্র সং-
জ্ঞকং॥
তথৈব দ্বিবিধ প্রোক্তং কুলঞ্চ স দ্বিজো-
ত্তমে॥

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের কুলাচার্য্য গ্রন্থে লিখিত আছে, বল্লাল সেন আদিশূরানীত বিপ্র সন্তানগণকে রাঢ়ী বারেন্দ্র এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছিলেন, যাঁহারা রাঢ়দেশে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে রাঢ়ী, যাহারা বারেন্দ্র দেশে বাস

করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে বারেন্দ্র, এই সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। যথা—

প্রতাপেন শূরো মহানাদিশূরো
নৃপঃ পঞ্চগোত্রান্ দ্বিজান্ কান্যকুব্জাৎ।
সমানীতবান্ পঞ্চ পঞ্চানলাভান্
সতাং সৎক্রিয়া সিদ্ধয়ে গৌড়দেশে॥
ততোবহুতিথে কালে গৌড়ে বৈদ্যকুলোদ্বহঃ।
বল্লালসেন নৃপতি রজায়ত গুণোত্তমঃ।
রাঢ়ায়াং গৌড়-বারেন্দ্র-পৌণ্ড্র-বঙ্গোপবঙ্গকে।
অধিকারো ভবেত্তস্য বলবীর্য্য-প্রভাবতঃ॥
কান্যকুব্জান্বয়ান্ বিপ্রান্ দৃষ্ট্বাচাতি গুণোত্তরান্।
আদিশূরস্য নৃপতের্যশো মূর্ত্তিরিব স্থিতান্।
দ্বিধা বিভক্তান্ বিদুষো রাঢ়া বারেন্দ্র বাসিনঃ।
আদিশূরস্য যশসঃ পশ্চাদ্বর্ত্তী যশোমম।
যথা ভ্রম্যাৎ সতাং গেহে তথৈব বিদধামহং।
ইতি সঞ্চিন্ত্য মর্য্যাদাং স্থাপন মকরোত্তয়োঃ।
কৃতবান্ গুণতঃ ধীমান্ কৌলীন্যং শ্রোত্রিয়েচ সঃ।

অর্থাৎ আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে অনল সদৃশ ৫ পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। তাহার বহুকাল পরে বৈদ্যকুলোদ্ভব গুণশ্রেষ্ঠ বল্লাল সেন গৌর দেশে রাজা হন। বলবীর্য্য প্রভাবে রাঢ় বারেন্দ্র, পৌণ্ড্র, বঙ্গ এবং উপবঙ্গ দেশে তাঁহার অধিকার বিস্তার হইয়াছিল। তিনি আদিশূরের যশোমূর্ত্তি স্বরূপ রাঢ় এবং বারেন্দ্রবাসী এই উভয় শ্রেণীভুক্ত কান্যকুব্জাগত বিপ্রগণকে অতিশয় গুণশালী দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, যাহাতে আমার যশ আদিশূরের যশের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া সজ্জনের মধ্যে প্রচলিত থাকে, তদ্রূপ কার্য্য করা আমার কর্ত্তব্য। ইহা বিবেচনা করিয়া উভয় শ্রেণীর বিপ্রগণের মধ্যে কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছিলেন।

আরও

দ্বিজাতীংশ্চতুর্বর্ণানাং সৃষ্টিকর্ত্তা। পৃথক্ কার্য্যসিদ্ধৈযথা সসর্জ।
তথাসোঽত্র বল্লালসেনো বিভক্ত চকারাত্র বারেন্দ্র রাঢ়ী সংজ্ঞকান্॥
স্থিতা রাঢ়দেশে দ্বিজা যে সমেতাঃ কৃতাস্তেন রাঢ়ীসংজ্ঞাস্তয়েব।
তথা বঙ্গদেশাগতা ভূমীদেবাঃ কৃতাস্তেন বারেন্দ্র-সংজ্ঞা-প্রসিদ্ধাঃ॥

অস্যার্থঃ—

যদ্রূপ সৃষ্টিকর্ত্তা চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বল্লাল সেন দ্বিজগণকে রাঢ়ী এবং বারেন্দ্র এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন; যাঁহারা রাঢ়দেশে বসতি করেন তাঁহারা রাঢ়ী, এবং যাঁহারা বারেন্দ্র দেশে বসতি করেন তাঁহারা বারেন্দ্র নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

উপরি উক্ত প্রমাণ সকলে দৃষ্ট হইতেছে,আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে ক্ষিতীশ, তিথিমেধা, বীতরাগ, সুধানিধি এবং

সৌবরি এই ৫জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। আদিশূরের পুত্র ভূশূর ঐ বিপ্র পঞ্চকের ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ, শ্রীহর্ষ ও ছান্দড় এই ৫ জনকে রাঢ়দেশে পাঠান, অবশিষ্টেরা বারেন্দ্র দেশে থাকেন এবং বল্লাল সেন তাহাদের মধ্যে শ্রেণীভাগ করেন। ইহা রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কুলাচার্য্য গ্রন্থের প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হইতেছে। বারেন্দ্র দেশেই প্রথমে ব্রাহ্মণেরা আইসেন এবং তথা হইতে ৫ জনমাত্র রাঢ় দেশে গিয়াছিলেন, এমত স্থলেও রাঢ়ীয় কুলাচার্য্য ও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ কেন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ হইতে আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ কহেন তাহা বুঝিতে পারি না।

এই প্রস্তাব লেখক জনৈক রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইয়াছেন যে তাহাদের মতে আদিশূর সামবেদী ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন যথা;—" সস্ত্রীকান্ শাস্ত্রসংযুক্তান্ আনীতান্ সামগান্ দ্বিজান্ " ইত্যাদি। অতএব যখন বারেন্দ্র শ্রেণীতে যখন ঋক্, যজু, সাম এই তিন বেদী ব্রাহ্মণ দেখা যায়, তখন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা আদিশূরানীত কান্যকুব্জীয় বিপ্রের সন্তান নহেন ইহাই তাহাদের সিদ্ধান্ত। ঘটকগণের এই অনুমান হইতেই রাঢ়ীয়দলে সংস্কার জন্মিয়াছে; বারেন্দ্রগণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ নহেন। রাঢ়ীয়দলে ৫৬ টি গাঞি আছে, তাহা লক্ষ করিয়া তাঁহারা আরও কহেন, " পঞ্চগোত্র ছাপ্পান্ন গাঞি ইহা ছাড়া বামন নাই। "

এই আপত্তিদ্বয়ের উত্তর সহজেই দেওয়া যাইতে পারে। রাঢ়ীয় কুলেও অনেক যজুর্ব্বেদী এক্ষণে আছেন এবং যদি ৫৬ গাঞির অতিরিক্ত গ্রামীকেরা ব্রাহ্মণ না হন, তাহা হইলে রাঢ়ীয় কুলের আর তিনটি গাঞির দশা কি হইবে? কুলরমা গ্রন্থের মতে রাঢ়ীয় কুলে ৫৯ গাঞি।

আদিশূর কেবল সামবেদী ব্রাহ্মণ কি তিনবেদী ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তাহা বিবেচনা করা যাইতেছে।—পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যজ্ঞকরণ নিমিত্ত তিনি সাগ্নিক বেদপারগ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। বাঙ্গলা দেশে বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার করা তাহার উদ্দেশ্য ছিল, ইহাতে কেবল একবেদী ৫ জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করা সম্ভব বোধ হয় না, বিশেষতঃ প্রত্যেক যজ্ঞেই তিনবেদী ব্রাহ্মণের প্রয়োজন যথা ;—

মন্ত্রামননাৎ ছন্দাংসি চ্ছাদনাৎ স্তোমঃ স্তবনাৎ যজুর্যজনাদিতি এবং সতি অধ্বর্য্যু সম্বন্ধি যজুর্ব্বেদ নিষ্পন্নং যজ্ঞশরীর মুপজীব্য তদপেক্ষিতৌ স্তোত্র শস্ত্ররূপাবয়বৌ ইতরেণ বেদদ্বয়েন পুর্য্যত। মাধবাচার্য্যকৃত ঋগ্বেদ ভাষ্য উপক্রমণিকা ১ম অধ্যায়।

অর্থাৎ মনন হেতু মন্ত্র, চ্ছাদন হেতু ছন্দ স্তবন হেতু স্তোম, যজন হেতু যজুঃ। অতএব যজ্ঞের অধ্বর্য্যু সম্বন্ধীয় কার্য্য যজুর্ব্বেদ দ্বারা নিষ্পন্ন। এবং যজ্ঞ শরীর সম্বন্ধীয় কার্য্য অপর দুই বেদ (ঋক্। সাম) দ্বারা পূরণ হয়।

অধ্বর্য্যবং যজুর্ভিঃস্যাদৃগ্ভির্হোত্রং দ্বিজোত্তমাঃ।

উদ্গাত্রং সামভিশ্চক্রে॥

কূর্ম্মপুরাণ ৪৯ অধ্যায়।

অর্থাৎ প্রত্যেক যজ্ঞের অধ্বর্য্যু হোত্র এবং গান এই তিন প্রকার অঙ্গ আছে, তাহার মধ্যে যজুর্ব্বেদ দ্বারা অধ্বর্য্যুর কার্য্য, ঋগ্বেদ দ্বারা হোম এবং সামবেদ দ্বারা উদ্গান কার্য্য সম্পন্ন হয়।

আদিশূর একজন স্বাধীন রাজা ছিলেন। তিনি যজ্ঞ করণের নিমিত্ত একবেদী ব্রাহ্মণ আনাইয়া অনুকল্প ব্যবস্থা করিবেন এমত বোধ হয় না। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণ প্রায়শঃই দেখা যায় না এবং সামবেদীয় সংখ্যা এত অধিক কেন হইল এই প্রশ্ন হইলে, এতাবন্মাত্র উত্তর দেওয়া যাইতে পারে যে, কালে রাঢ়বাসী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিদ্যা চর্চ্চার অভাব এবং ঋগ্বেদিগণের গৃহ কর্ম্ম সকল কঠিন হওয়াতে সামবেদী ব্রাহ্মণের নিকট উপনীত হইয়া বেদভ্রষ্ট হইয়া থাকিবেন।

বিদ্যানিধি মহাশয় রাঢ়দেশবাসী ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষ এবং নৈষধ কর্ত্তা শ্রীহর্ষকে একব্যক্তি বলিয়াছেন। এইমত তাহার উদ্ভাবিত নহে। তাঁহার গ্রন্থ প্রকাশ হওয়ার পূর্ব্বেই এই কল্পনা বাহির হইয়াছে। কিন্তু ইহা সঙ্গত নহে। নৈষধ কর্ত্তা শ্রীহর্ষ আপনাকে শ্রীহীরের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। অথচ রাঢ়ী শ্রেণীয় ভরদ্বাজ গোত্রের আদি ব্যক্তি শ্রীহর্ষ ক্ষিতীশাদি বিপ্র পঞ্চকের অন্তর তিথিমেধার পুত্র। নৈষধ কর্ত্তা শ্রীহর্ষ আপন গ্রন্থে আত্ম পরিচয়ে লিখিয়াছেন, তিনি কান্যকুব্জেশ্বর হইতে তাম্বুল, হয় এবং আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জৈন লেখক রাজ শেখর কৃত প্রবন্ধ কোষে লিখা আছে শ্রীহীরের পুত্র শ্রীহর্ষ বারানসীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া তত্রত্য নৃপতি জয়ন্ত চন্দ্রের আজ্ঞায় নৈষধ কাব্য প্রস্তুত করেন। ডাক্তার বুলার কহেন এই জয়ন্তচন্দ্রই জয়চন্দ্র নামে খ্যাত। জয়চন্দ্র ১১৬৮ হইতে ১১৯৪ খৃঃ অব্দের মধ্যে কান্যকুব্জ ও বারানসীর অধীশ্বর ছিলেন। বাবু রামদাস সেনও প্রবন্ধ-চিন্তামণি ও প্রবন্ধ কোষের লেখা ও ডাক্তার বুলারের মতানুসরণ করিয়া নৈষধ কর্ত্তা শ্রীহর্ষকে ১১৬৩ অব্দে জয়ন্তচন্দ্রের সভাসৎ থাকা স্থির করিয়াছেন। বিদ্যানিধি ৯৯৯ সম্বতে শ্রীহর্ষের এদেশে আইসা কহেন। ৯৯৯ সম্বতে ৮৬৩ শকাব্দ এবং নৈষধ কর্ত্তা শ্রীহর্ষের বর্ত্তমান ১১৬৩ খৃঃ অব্দে ১০৮৫ শকাব্দা। অতএব ১০৮৫ শকাব্দা হইতে ৮৬৩ শকাব্দা বাদ দিলে ২২২ দুইশত বাইশ বৎসর পাওয়া যায়। অতএব যে শ্রীহর্ষ তাহার মতে ৮৬৩ শকে আদিশূরের সভাতে গৌড়ে। তিনি ১০৮৫ শকে কি প্রকারে বারানসীতে থাকিয়া নৈষধ কাব্য প্রস্তুত করিবেন। বিদ্যানিধি অনুমান করেন যখন শ্রীহর্ষ গৌড়ে আইসেন তখন তাঁহার ৯০ বৎসর বয়স ছিল। এমত হইলে নৈষধ প্রস্তুত করার সময়ে তাহার ৩১২ বৎসর বয়স পাওয়া যায়।

বিদ্যানিধি আদিশূর ও বল্লাল সেন উভয়কেই বৈদ্যজাতীয় কহিয়াছেন। তিনি যতদূর জানিতে পারিয়াছেন তাহাই লিখিয়াছেন। দেবীবর ঘটক উভয়কেই অস্পৃষ্ট কহিয়াছেন। বারেন্দ্র কুল গ্রন্থে উভয়কেই বৈদ্য বলিয়া লিখিত। রাঢীয় কোন কুল গ্রন্থে আদিশূরকে ক্ষত্রিয় কোন গ্রন্থে চন্দ্র বংশীয় বলিয়া লিখিত আছে। বিজয় সেন লক্ষ্মণ সেন এবং মাধব সেনের সময়ের যে সকল সমসাময়িক প্রস্তর লিপি ও তাম্রশাসন লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে সেন বংশীয় রাজাদিগকে চন্দ্র বংশীয় বলিয়া লিখিত আছে। অতএব আদিশূর ও বল্লাল সেন যে বৈদ্যজাতি তৎ প্রতি সন্দেহ হয়। এই প্রস্তাব লেখক কর্ত্তৃক যে পুস্তক লিখিত হইবার সম্ভাবনা আছে তাহাতে এবিষয় বাহুল্য রূপ লিখা হইবে এবং তাম্রশাসনাদির সংস্কৃত ভাগ অবিকল প্রকাশিত হইবে।

বিদ্যানিধি কাশ্যপগোত্রীয় হলায়ুধ, যিনি উনিশ জনের মধ্যে একজন কুলীন, সেই হলায়ুধ চট্টকে লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী বলিয়াছেন। বাস্তবিক নাম সাদৃশ্যে তাহার ভ্রম হইয়াছে লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী হলায়ুধ ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া ঐ গ্রন্থে আপনার যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে জানা যায় তাঁহার পিতার নাম ধনঞ্জয় এবং তিনি বাৎস্য গোত্রোদ্ভূত। গ্রন্থ কর্ত্তা লঘুভারতের লিখন মতে নরসিংহ লাড়ুনিকে অদ্বৈতের পিতা কহিয়াছেন। বাস্তবিক তাহা নহে অদ্বৈতের পিতার নাম কুবেরাচার্য্য। গৌর গণোদ্দেশ দীপিকা নামক গ্রন্থ ও জাড়িয়ান গ্রামী ব্রাহ্মণ গণের বংশাবলী গ্রন্থে ইহার প্রমাণ আছে। অদ্বৈতাচার্য্য ভরদ্বাজ গোত্রীয় মাড়িয়ান অথবা লাড়ুনি গ্রামীণ ছিলেন, অদ্যাপি তাহার বংশধরেরা অদ্বৈত বংশীয় গোস্বামী বলিয়া খ্যাত আছেন।

লাল মোহন বাবু লঘুভারতের অনুসরণ করিয়া উত্তর বারেন্দ্রের বিবরণ লিখিয়াছেন তাহাও ভ্রম। আমি উত্তর বারেন্দ্র এবং বারেন্দ্র গণের কুল গ্রন্থ দেখিয়াছি তাহাতে জানাগিয়াছে উত্তর বারেন্দ্রগণ, বারেন্দ্রের এক শাখা মাত্র। উত্তর বারেন্দ্র কুলে শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাস্য, ভরদ্বাজ ও সাবর্ণি এই পাঁচ গোত্র ও ষোলটি গাঁত্রিত আছে। জেলা দিনাজপুর ও মালদহের অধীন গ্রাম সকলে ইহাদের বাস। পূর্ব্বকালে উত্তর বারেন্দ্র এবং দক্ষিণ বারেন্দ্র শব্দ ব্যবহৃত হইত, বর্ত্তমান কালে দক্ষিণ লোপ হইয়া বারেন্দ্র এবং উত্তর বারেন্দ্র নাম চলন হইয়াছে।

গ্রন্থ কর্ত্তা বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণ গণের বিবরণ যে লিখিয়াছেন তাহার অধিকাংশই ভ্রমপূর্ণ, তাহার প্রত্যেক বিষয় আলোচনা করিলে একখানি গ্রন্থ হয় এবং সম্বৎসরেই তদ্রূপ একখানি গ্রন্থ প্রকাশের সম্ভাবনাও আছে। অতএব সংক্ষেপে ২।৩ টি মাত্র ভ্রমের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। লাল মোহন বাবু আপন গ্রন্থের

২৩৪। ২৩৫। ২৩৬ পৃষ্ঠাতে যেসকল কথা লিখিয়াছেন তাহার স্থূল মর্ম্ম এই, " রাজা কংস নারায়ণ উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ির সহিত একত্র হইয়া মধুর কুল রক্ষা করেন। এবং তিনি মধুমৈত্রে কন্যা সম্প্রদান করিয়া নিজে কুলীন হইতে শ্রোত্রীয় হন। উদয়নাচার্য্য তাহার লীলাবতী নাম্মী কন্যাকে মণ্ডল মিশ্রে সমর্পণ করেন, মণ্ডল মিশ্র জলবিন্দু স্পর্শে ছিটা কাপ হন। লীলাবতীর গর্ব্ভে উমাপতি, ভূপতি, ভবানীপতি,রুদ্রপতি, পশুপতি ইহাদের জন্মহয় " কিন্তু এই লেখা সম্পূর্ণ ভ্রম মূলক। প্রথম রাজা কংসনারায়ণ এবং উদয়নাচার্য্য এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন না। উদয়নাচার্য্য ১২৫০ শকের সমকালে বর্ত্তমান থাকিয়া বারেন্দ্র কুলে পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা স্থাপন করেন ; সেই উদয়নাচার্য্যের অধস্তন নবম পুরুষে শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ির জন্ম হয়। এই শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ি কংসনারায়ণের ভগ্নী বিবাহ করেন। পক্ষান্তরে দেখ মধুমৈত্রের অধস্তন ৭ম পুরুষ জাত দুর্ল্লভ মৈত্র কংসনারায়ণের সম সাময়িক ছিলেন। রাজা কংসনারায়ণ এবং উদয়নাচার্য্যে কত পুরুষ ব্যবধান তাহা অন্য প্রকারেও দেখা যায় ; উদয়নাচার্য্য এবং কুল্লক ভট্ট উভয়ে সম সাময়িক এই কুল্লক এবং ময়ুরভট্ট ও মঙ্গল ওঝাকে সহায় করিয়া উদয়নাচার্য্য পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা স্থাপন করেন। কুল্লকভট্ট এবং পুরুষোত্তম বৈদান্তিক এই দুই ভ্রাতা। এই পুরুষোত্তম বৈদান্তিকের বংশে অধস্তন ১০ কি ১১ পুরুষে কংসনারায়ণের জন্ম হইয়াছিল।

রাজা কংসনারায়ণ কখনই কুলীন ছিলেন না, তিনি মধুমৈত্রের সম সাময়িক ব্যক্তি নহেন, তিনি কখনও মধুমৈত্রে কন্যা সমর্পণ করেন নাই। তিনি তাহের পুরের রাজগোষ্ঠীয় ব্যক্তি। এবং নন্দনাবাসী গ্রামীন পূর্ব্ব হইতেই শ্রোত্রিয়।

উদয়নাচার্য্যের লীলাবতী নাম্নী কন্যাকে মণ্ডল মিশ্র বিবাহ করেন নাই। বাস্তবিক লাহিড়ি কুলোদ্ভব বল্লভাচার্য্যে লীলাবতী যে বিবাহ করেন এবং ভূপতি ভবানীপতি, রুদ্রাণীপতি, গৌরীপতি, উমাপতি এই ছয়জন উদয়নাচার্য্যের পুত্র কিন্তু দৌহিত্র নহেন।

বিদ্যানিধি যে উদ্দেশ্যে গ্রন্থ প্রচার করেন তাহা অতি মহৎ, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই প্রকৃত ইতিহাসের অনুসন্ধান না করিয়া লোক মুখে শুনিয়া ইতিহাস লিখিয়া বসিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা বহু লোকের ভ্রম জন্মাইয়াছেন।

উপরে যে কএকটি ভ্রম প্রদর্শন করা গেল, তাহা ভিন্ন আরও ভূরি ভূরি ভ্রম আছে, অবকাশ মতে তাহার সমালোচনা করা যাইবে অথবা ইতিমধ্যে সঙ্কল্পিত গ্রন্থ প্রকাশের সম্ভাবনা হইলে তাহাতেই লিখা যাইবে।

সংক্ষিপ্তসমালোচন

১। সিপাহিযুদ্ধের ইতিহাস। শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত প্রথম খণ্ড। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহি-বিপ্লব ভারতীয় ইতিহাসের এক প্রধানতম ঘটনা। বৃটিশ-বিজিত ভারত সাম্রাজ্যে পূর্ব্বে যে নীতি প্রবর্ত্তিত ছিল, ১৮৫৭ হইতেই তাহা পরিবর্ত্তিত হয়, এবং এদেশের অন্তস্তলে এখনও যে অতি ভয়াবহ আগ্নেয় পর্ব্বত সকল প্রচ্ছন্ন নিহিত রহিয়াছে—১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের চিরস্মরণীয় ইতিবৃত্তই রাজনীতি বিশারদ বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগকে প্রথম তাহা বুঝিতে দেয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই ঘটনাবলী অদ্যাপি বাঙ্গালা ভাষায় বিবৃত হয় নাই। বাঙ্গালায় গজরাজগতিগঙ্গিনী কবিহৃদয়রঙ্গিনী শ্রীমতী কমল কামিনীর পদ নখ ও আলুলায়িত কুন্তল রাশির শোভা বর্ণনায় তিনশত সুললিত কাব্য লিখিত হইয়াছে। বাঙ্গালি শিশুদিগের বিরহ বিধুর দগ্ধহৃদয়ের দুঃখ দুরাশা বর্ণনায়ও অর্দ্ধলক্ষ নূতন গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে। কিন্তু যে ঘটনা ভারতবর্ষের ভূত ভবিষ্যতের গ্রন্থি স্বরূপ, যে ঘটনাতে এক যুগের লয়, আর এক যুগের অভ্যুদয়, পুরুষকার ও স্বজাতি বাৎসল্যের পরীক্ষা, সাহস ও কৌশল এই দুইয়ের তারতম্য নির্ণয়, এবং জাতীয় সংঘর্ষের ফলাফল বিচার দুর্ভাগ্য ভারতে, দুর্ভাগ্য বঙ্গে কাহারও লেখনী সেই ঘটনার আমূল বিবরণ সংকলনে এবং আমূল তত্ত্বনিরূপণে ব্যাপৃত হয় নাই। রজনী বাবু উল্লিখিত কলঙ্কপ্রক্ষালনে যত্নপর হইয়াছেন। তিনি যেরূপ কৃতী, পণ্ডিত, অনুসন্ধানপটু এবং অধ্যবসায়শীল তাহাতে আমাদিগের আশা হইতেছে, তিনি কৃতকার্য্য হইবেন। কিন্তু তথাপি বলি, কার্য্যের শেষদর্শন না হইলে আমাদিগের শঙ্কা দূর হইবে না আর, বাঙ্গলার বর্ত্তমান পাঠকসমাজ যে, গুপ্তকথা ও রসের কথা, প্রেমের কথা ও শ্যামের কথা পরিত্যাগ করিয়া নানা ধুন্দপন্থের অন্তর্গূঢ়-গভীর বেদনার কথায় কর্ণপাত করিবে ফলে পরিচয় না পাইলে আমাদিগের এমনও ভরসা জন্মিবে না।

রজনী বাবুর ভাষা, মত ও সিদ্ধান্ত প্রভৃতি বিষয়ে আমাদিগের অনেক বক্তব্য আছে। কিন্তু বোধ হয়, তাঁহার ইতিহাসের প্রথম খণ্ড মাত্র অবলম্বন করিয়াই তাদৃশ সমালোচন সঙ্গত নহে। তিনি এখন পর্য্যন্ত যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সিপাহি যুদ্ধের উপক্রমণিকা; সিপাহিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিবৃত্ত এখনও বহুদূরে। তবে ইহা অক্ষুব্ধচিত্তে বলিতে পারি যে যদি রজনী বাবু স্বয়ং বৃত্তান্ত সংকলন না করিয়া সং-

কলিত বৃত্তান্তের উপর নির্ভর করেন, তাহা হইলে তাঁহার গ্রন্থ অভিনব একখানি ইতিহাস বলিয়া গৃহীত না হইয়া কে সাহেব প্রভৃতির রচিত পুরাতন গ্রন্থসমূহের স্বাধীন সমালোচনা বলিয়াই পরিগৃহীত হইবে। যাঁহারা সিপাহি যুদ্ধের আতঙ্কজনক অভিনয় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের অনেকে অদ্যাপি জীবিত আছেন। তাঁহাদিগের মুখে যাহা শুনা যায়, তাহাই এক, এবং গ্রন্থপত্রে যাহা দৃষ্ট হয়, তাহাই এক। তাদৃশ লোকদিগের নিকট হইতে বিবরণ সংগ্রহ করিয়া সেই সংগৃহীত বিবরণের সহিত গ্রন্থোক্ত বিবরণের তুলনা করা,রজনী বাবুর একান্ত কর্ত্তব্য হইতেছে।

২। কবিতা কলাপ। দ্বিতীয় ভাগ। শান্তিপুর পুরাতন ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীরামলাল চক্রবর্ত্তী বিরচিত। গ্রন্থকার মৃদুমধুর পদ বিন্যাসে পটু। আমরা নিম্নে তাঁহার কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম। কিন্তু এইরূপ লেখায় বঙ্গীয় সাহিত্যের উন্নতি কি অবনতি হইতেছে, পাঠকবর্গ তাহার বিচার করিবেন। আমাদিগের এইরূপ বোধ হয় যে, জয়দেবের অতি বৃদ্ধ প্রপৌত্রেরা কিছুদিনের জন্য অধ্যয়ন কি বিষয় চিন্তায় নিবিষ্ট রহিলেই ভাল হয়। সেই যে কোন দিন ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলন-কোমল পদাবলী এবং প্রিয়াগুণবর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে, এখন পর্য্যন্তও এদেশে তাহারই তরঙ্গ চলিতেছে। হতভাগ্য বঙ্গবাসী বিশ্রাম করিবারও অবসর পাইল না। একে বাঙ্গালি গ্রহবৈগুণ্য বশতঃ ইদানীং অর্দ্ধ অবলা, তাহাতে আবার গ্রন্থকারবর্গ গুরুর গৌরবান্বিত আসনে উপবিষ্ট হইয়া, নিরন্তর শিক্ষা দিতেছেন,—

প্রিয়া বিনে এবে সব হল অন্ধকার
জীবন দুখের রাতি,
তাহাতে প্রেমের বাতি
নিবাল রে! নিরদয় কাল দুরাচার।
আর না হেরিব তার সে চন্দ্রবদন,
আর না শুনিব সেই পীযূষ বচন,
ফুরায়েছে সুখের স্বপন॥

হেরিলে আমায় যার যে চারু অধরে
মেঘমুক্ত শশি সম,
হাস্যের বিকাশে ভ্রম—
জলদে খেলায় কিম্বা দামিনী অম্বরে,
চকিতে ছেদিল কেরে মৃণাল সহিত
ফুল্লকমলিনী নীরে করিয়ে পাতিত?
দগ্ধ করি প্রণয়ীর চিত॥

খরতেজে দহে চিত বিরহ অনল,
হায় হায় মরি মরি,
কোথা মম প্রাণেশ্বরী,
একবার হেরি, এস হই গো শীতল
হায় রে! করাল কাল কেমন বিচার,
ছিঁড়িলি রে! প্রেমিকের প্রেম-কণ্ঠ-হার।
দহে যাহে বিরহ দুর্ব্বার॥

৩। নীতিমঞ্জরী। প্রথমখণ্ড। শ্রীমহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। এই প্রকারের

কবিতার সহিত আমাদিগের পাঠকবর্গের অপরিচয় নাই। সুতরাং আমাদের নূতন পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। ফল কথা এ-খানি না লিখিত হইলে দোষ ছিল না।

৪। যুধিষ্ঠিরোপাখ্যান। মহাভারতান্তর্গত প্রস্তাব বিশেষ। শ্রীমতী শরৎ শশী গুপ্তা কর্ত্তৃক সংকলিত। আমরা এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিলাম। গ্রন্থকর্ত্রী বাঙ্গলা লেখার রীতি শিখিয়াছেন, বোধ হয় সমুচিত শিক্ষা লাভ করিলে তিনি যশস্বিনী হইতে পারিবেন। কুলমহিলাদিগের পক্ষে সাহিত্য সমাজে যশোলাভ করা বঙ্গে ইদানীং নিতান্ত সহজ। কারণ সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রই তাঁহাদিগকে উৎসাহ দান করিয়া থাকেন।

৫। কুসুম। সচিত্র মাসিকপত্র ও সমালোচন। শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মৈত্র দ্বারা সম্পাদিত। যাঁহারা এই পত্রিকাখানি প্রচার করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাঁহারা আপনাদিগকে অবশ্যই বাঙ্গালা সাহিত্যের সুহৃৎ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। নহিলে অনর্থক এই ক্লেশ স্বীকার কেন? কিন্তু তাঁহাদিগের দ্বারা বাঙ্গলা সাহিত্যের কোন রূপ উপকার দর্শিবে—আমাদিগের মনে মুহূর্ত্তের তরেও এমন আশা স্থান পাইতেছে না। ইহার প্রথম প্রবন্ধের নাম কুসুম, অর্থাৎ কুসুম নামক পত্রিকা অবতরণিকা। ২৬ টি পংক্তিতেই এই প্রবন্ধটি পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব ভ্রমরের মুখবন্ধে যেরূপ লিখিত হইয়াছিল, ইহারও মুখবন্ধে সেই ভঙ্গির কদর্য্য অনুকরণে লিখিত হইয়াছে,—"কুসুম! তুমি আবাল বৃদ্ধ বনিতা হিন্দু মুসলমান ইংরেজ মানব রাক্ষস দেবতা সকল শ্রেণীস্থ লোকেরই আদরের—ধন—"তার পরের প্রবন্ধের নাম দুর্গা দর্শন। এইটি ৫৪ পংক্তিতে পরিসমাপিত। আমাদিগের শারীরিক বল নামক তৃতীয় প্রবন্ধও ঐরূপ। তার পরে কুসুম নামে একটি কবিতা; কবিতার পর দুর্ভাগিনী বিমলা নামে এক উপন্যাস। উপন্যাসের পর মূল্যপ্রাপ্তির জন্য তাগিদ, তাগিদের পর বিজ্ঞাপন, সুতরাং মাসিক পত্র ও সমালোচনের সকলই ইহাতে আছে। নাই কেবল,—থাক্ তাহা আর বলিয়া প্রয়োজন নাই।

৬। ওলাউঠার নিদান ও চিকিৎসা বিষয়ে বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব হস্পিটালসমূহের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল শ্রীযুক্ত জন্ মরে এম্ ডি মহোদয়ের চত্বারিংশৎ বর্ষের ভূয়োদর্শনের ফল। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অনুজ্ঞায় শ্রীযুত কানাইলাল দে রায়বাহাদুরের দ্বারা বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত। আমরা চিকিৎসা ব্যবসায়ী নহি, সুতরাং এই পুস্তকের গুণাগুণ পরীক্ষা আমাদিগের দ্বারা অসম্ভব। অনুবাদের ভাষা সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, উহা সর্ব্বাংশে প্রয়োজনের উপযোগী হইয়াছে।

লোকরঞ্জন।
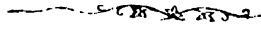
মনুষ্যসমাজে সাধারণতঃ মনুষ্যের প্রশংসা কিসে ?—না, মনুষ্যের চিত্তরঞ্জনে। যিনি লোকানুরঞ্জনে পটু, তিনি পুরুষের মধ্যে পুরুষ, প্রীতিপ্রদ, প্রীতিভাজন, প্রশংসনীয়। আর, যিনি লোকরঞ্জনে অপটু, তিনি যারপরনাই সাধু, যার পর নাই সরল এবং যতদূরসম্ভব মহানুভাব হইলেও সাধারণের অপ্রিয় ও অপ্রশংসনীয়। সকল লোকেই স্বসম্পর্কিত প্রিয়ব্যক্তিদিগকে উপদেশ দিবার সময়ে এইরূপ বলিয়া থাকেন যে,—তুমি যদি মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া মনুষ্যেরই মনস্তুষ্টি জন্মাইতে না পারিলে, দশ জনে যাহা ভাল বাসে তাহা সম্পাদন করিয়া দশজনের মধ্যে গণনীয় ও দশজনের আদরের পাত্র হইতে সমর্থ না হইলে, তাহা হইলে এজীবনে তোমার আর প্রয়োজন কি ? পুত্রের প্রতি পিতার এই উপদেশ, ভ্রাতার প্রতি ভ্রাতার এই উপদেশ, ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের এই উপদেশ, এবং যে যাহাকে উপদেশ দিতে পারে,তাহার প্রতিই তাহার এই উপদেশ।

উল্লিখিতরূপ উপদেশে জগতের কার্য্যক্ষেত্রে কিরূপ ফল সর্ব্বত্র ফলিতেছে, তাহা অনায়াসেই উপলব্ধ হইতে পারে। কারণ, যাঁহার চক্ষু আছে, তিনিই ইহা দেখিতে পাইবেন যে, মনুষ্য যত প্রকারের কার্য্যে সংলিপ্ত রহিয়াছে, এই লোকরঞ্জনপ্রবৃত্তিই তত্তাবতের মূলে সর্ব্বপ্রধান প্রবর্ত্তনা। লোকের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, দান, ধ্যান, শিক্ষা, সাধনা, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, উৎসাহ, উদ্যম, ক্লেশ-ভোগ, কষ্টস্বীকার, সমস্তই যেন লোকরঞ্জনের জন্য। সাধারণতঃ, বহুলোকের যাহাতে অনুরাগ, তাহাতেই লোকের অনুরাগ, এবং বহুলোকের যাহাতে বিরাগ, তাহাতেই লোকের বিরাগ। অপিচ, যে কার্য্যে লোকচক্ষু আকৃষ্ট হইল, এবং আকৃষ্ট হইয়া প্রীত হইল, তাহাই কার্য্য; এবং যে কার্য্যে লোকচক্ষু আকৃষ্ট হইল না, এবং আকৃষ্ট হইয়াও প্রীতি প্রকাশ করিল না, তাহা যত বড় উচ্চশ্রেণির কার্য্য হউক না কেন, আপাততঃ তাহা অকার্য্য।

তুমি যোগী, তুমি কিসের জন্য যোগসাধন করিতেছ ? লোকের নিকট প্রদর্শনের জন্য, না তোমার আত্মার পরিতৃপ্তির জন্য ? যদি আত্মার পরিতৃপ্তির জন্যই তোমার এই যোগব্রত, এই কঠোর তপস্যা, তবে তোমার ভ্রূমধ্যে ঐ তিলক কেন ? তোমার কণ্ঠে ঐ মালা,

কপালে ঐ ত্রিপুণ্ড্রক, অঙ্গে ঐ মৃন্ময়ী রেখা এবং পরিধানে ঐ গৈরিক বস্ত্র কেন? ইহা কি সকলই লোকচক্ষু আকর্ষণের জন্য নহে? তুমি নির্জ্জনে আপনাতে আপনি নিমজ্জিত হইয়া, আত্মার অভ্যন্তরে ক্ষণকালের তরেও প্রবেশ করিতে ভাল বাস না, এবং একমাত্র যাঁহাতেই আত্মার চিরদিনের বিশ্রাম, তুমি তাঁহার অমৃতময় আবেশ উপভোগ করিতে কখনও অভিলাষী হও না;—অথচ যেই তোমার উপর লোকচক্ষু নিপতিত হয়, অমনি তুমি ধ্যানে নিরত হইয়া নেত্র নিমীলন কর, এবং যিনি বাক্যের অগম্য, অচিন্তনীয়, তাঁহাকে শ্রুতিসুখাবহ বহুবাক্যে বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হও। তোমার এই ধ্যান, এই স্তোত্রপাঠ, এবং জিহ্বার এই ব্যায়াম কাহার প্রীত্যর্থে?

তুমি দাতা, দীনপালক, পরদুঃখকাতর, পরোপকারী সাধু, তুমিই বা কি উদ্দেশ্যে বর্ষাকালীন বারিধারার ন্যায় অবিশ্রামধারায় এই দান করিতেছ? ইহা কি লোকমুখে যশোধ্বনির জন্য, না দুঃখীর দুঃখ মোচনের জন্য? যদি দুঃখীর দুঃখমোচনই তোমার অন্তরের প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা, তবে তোমার দানপরম্পরার অগ্রে ও পশ্চাৎ উভয়ত্রই এই ঢক্কানাদ ও পটহবাদ্য কেন? যখন কেহ দেখে না, ও কেহ শুনে না, তখন তোমার হৃদয় পাষাণ হইতেও কঠিন;—তখন তুমি অকুণ্ঠিতপ্রাণে অশ্রুধারাকুলা অনাথা বিধবার সর্ব্বস্ব অপহরণ কর, পিতৃহীন বালকের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লও, অস্থিমাত্রসার দিত দুঃখীকে দূর দূর বলিয়া স্বয়ং পঞ্চদশ ব্যঞ্জনে পরিতৃপ্ত হইতে উপবিষ্ট হও, এবং শীতবাতে কম্পিত অতিদীন ভিখারীকে দ্বারদেশ হইতে বাহির করিয়া দিয়া সুগন্ধিবাসিত সুকোমল শয্যায় সুখসুপ্তি সম্ভোগ কর। অথচ, যখন সহস্র চক্ষু তোমার দিকে তাকাইয়া থাকে, সহস্র রসনা তোমার গুণানুকীর্ত্তনে ব্যাপৃত হয়, এবং সহস্র বাহু তোমার আশীর্ব্বাদে নাচিয়া উঠে, তখন তুমি ধ্বজপতাকা উড়াইয়া এবং লোককোলাহলে দশদিক্ নিনাদিত করিয়া, দান কর আর পরদুঃখে পরিতাপ কর, এবং পরদুঃখে পরিতাপ কর আর দান কর।

আর তুমি কবি, কল্পনার প্রিয়সেবক, দেবী কমলাসনার চির উপাসক। বল দেখি, তুমিও কাহার প্রীতিতে সর্ব্বত্র এইরূপ আকুলতা প্রদর্শন করিতেছ? কাহার পদারবিন্দে চিত্ত সমর্পণ করিয়া সুখে দুঃখে সর্ব্বদা এইরূপ গাইতেছ? তুমিও কি যোগী এবং তাপস, দাতা এবং পরোপকারীর ন্যায় লৌকিক যশেরই কাঙ্গাল নহ? যদি কল্পনার বিভ্রমবিলাস এবং ভারতীর জ্যোতির্ম্ময় রূপরাশিতেই তোমার হৃদয় ডুবিয়া থাকিত, তবে কি তুমি কখনও আত্মবিস্মৃত হইয়া এবং আপনার উচ্চব্রত পরিত্যাগ করিয়া ইতর লোকের দ্বারে দ্বারে নানাবিধ কুৎসিত

পট লইয়া নৃত্য করিতে, এবং অজ্ঞানতিমিরাবৃত অশিক্ষিত লোকের চিত্তবিনোদনের জন্য ভাষার নিরাবিল পবিত্রদেহে কলঙ্কের কালিমা তুলিয়া দিতে? যখন প্রকৃতি, সৌদামিনীর ক্ষণিকবিকাশে হাসিয়া হাসিয়া, এবং নিবিড়কৃষ্ণ জলদমালার ইতস্ততঃপরিচালনে অঞ্চল দোলাইয়া, সেই ভীমা ভুবনমোহিনী মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হন, হে প্রেমিক! তোমার চক্ষু তখন পার্থিব-ক্ষতিলাভ-গণনার অঙ্কপাতে নিবিষ্ট থাকে; আবার যখন প্রকৃতি নৈশসমীরণের গভীরনিঃস্বনে মানবজাতির দুষ্কৃতির জন্য শোকাতুরার মত বিলাপ করেন, তোমার কর্ণ তখনও তৎপ্রতি বধির রহিয়া নিকৃষ্টজনভোগ্য নিকৃষ্ট সুখের আহ্বানই শ্রবণ করিতে রহে। অথচ যেই তুমি লোকবহুল সভাস্থলে প্রবেশ কর, তোমার চক্ষু প্রকৃতির প্রেমে অজস্র বাষ্পবারি বিমোচন করে, তোমার হৃদয় কল্পনার প্রমোদস্পর্শে উছলিয়া উঠে।

বস্তুতঃ, এই প্রকারে দৃষ্ট হইবে যে, লোকজগতের অধিকাংশ ক্রিয়াই লোকমোহনের এইরূপ প্রক্রিয়া মাত্র অথবা প্রাণশূন্য ক্রিয়ার প্রাণপ্রীতিকর সাড়ম্বর প্রদর্শন। কারণ, প্রকৃত ক্রিয়ায় তোমার যে আনন্দ নাই, ক্রিয়ার প্রদর্শনে তাহার শতগুণ আনন্দ, এবং অন্ধকারে তোমার যে উৎসাহ নাই, লোকদৃষ্টির আলোকে তাহার শতগুণ উৎসাহ। লোকে যখন চালায়, তখন তুমি চল, এবং লোকে যখন না চালায়, তখন তুমি নির্জ্জীবের মত পড়িয়া রহ। শুধু ইহাই নহে,—লোকে যাহা ভালবাসে, অতি অপ্রিয় বস্তু হইলেও, তাহাই তুমি ভালবাসিতে চেষ্টা কর, এবং লোকে যাহা ভালবাসে না, অতি প্রিয়বস্তু হইলেও তাহাতে তুমি ঘৃণা প্রকাশ করিতে যত্নশীল হও। যেন লোকের উপাসনাতেই তোমার দীক্ষা, এবং লৌকিক প্রতিষ্ঠাতেই তোমার আশার পূর্ণতৃপ্তি এবং পরাৎপর সুখ।

অতঃপর সহজেই এই জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয় যে, পৃথিবীতে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, বহুদর্শী ও অদূরদর্শী, সকলেই যদি লোকরঞ্জনের অনুকূল ক্রিয়াকলাপ লইয়া এইরূপ ব্যাপৃত, তবে কি লোকরঞ্জনই মানবজীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য ও একমাত্র ব্রত?

এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদিগের প্রথম বক্তব্য এই যে, মনুষ্য যতই কেন চেষ্টা না করুক, যতই কেন আকুল না হউক, সর্ব্বতঃসিদ্ধ লোকরঞ্জন আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক পদার্থ; উহা স্বভাবতঃই অসাধ্য ও অসম্ভব। যুধিষ্ঠির যেমন বলিয়াছেন,—নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং,—আমরাও সেইরূপ বলিতে পারি, নাসৌ জনো যস্য মতি র্ন ভিন্না। সুতরাং, যে কার্য্যে একজনের মনে পরমা তৃপ্তি; সেই কার্য্যেই আর এক জনের মনে যৎপরোনাস্তি অতৃপ্তি, এবং যে কার্য্যে একজনের মুখে যশ, সেই কার্য্যেই আবার আর একজনের মুখে অযশ।

তুমি যাহাকে প্রেমিক বলিয়া আদর কর, আমি তাহাকে স্ত্রৈণ বলিয়া উপহাস করি; এবং আমি যাহাকে প্রিয়ংবদ বলিয়া প্রশংসা করি, তৃতীয় এক ব্যক্তি তাহাকে চাটুকার বলিয়া ঘৃণা করেন। যিনি আমার বিবেচনায় একজন সমাজসংস্কারক সাধু পুরুষ, তোমার বিবেচনায় তিনি ধর্ম্মদ্রোহী, এবং যিনি তোমার বিবেচনায় একজন পরমভক্ত পূজ্যব্যক্তি, আমার বিবেচনায় তিনি একটি ক্রীড়াময় কাষ্ঠপুত্তল। ঐ যে যুবা, বহুবিধ বিচিত্র আভরণে অলঙ্কৃত এবং লূতাতন্তুসদৃশ সূক্ষ্ম-অম্বরে অর্দ্ধ-আবৃত হইয়া, কেবলই হাসিতেছে আর বিলাসভঙ্গী প্রদর্শন করিতেছে, এবং যিনি যে কোন প্রসঙ্গে যে কোন চিন্তাগর্ভ কথার উল্লেখ করিতেছেন, তাহাই গোল্ড-স্মিথের থরণহিলের ন্যায় অসাময়িক হাস্যে উড়াইয়া দিয়া, আপনার আমোদশীলতা ও ইঙ্গিতনৈপুণ্যের পরিচয় দিতেছে, ইহাকেই কি তোমরা অলিভীয়া প্রভৃতি তরলমতি যুবতীদিগের ন্যায় সুরসিক বলিয়া অভ্যর্থনা কর? রসগ্রাহী বিজ্ঞসমাজে ইনি একটি অন্তঃসারশূন্য অকালকুষ্মাণ্ড, কিংবা তাহা হইতেও অপকৃষ্ট। আর ঐ যে বহুপ্রতিষ্ঠান্বিত, পদানত, বিনীত পুরুষ, সকলের নিকটেই বিনয়ে নুইয়া পড়িয়া, সকলের সকল কথাই অবনতমস্তকে অনুমোদন করিতেছেন,—সত্যের অপলাপ কিংবা অসত্যের প্রশ্রয়, ইত্যাদি কিছুরই প্রতি দৃক্পাত না করিয়া, কিংবা চিত্তের অবজ্ঞাজনক অধীরতায় দৃক্পাত করিবার অবসর না পাইয়া, যে যাহা বলিতেছে তাহাই মুখভঙ্গিদ্বারা মানিয়া লইতেছেন, এবং পরিশেষে, পরস্পর মতদ্বৈধদর্শনে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, ইহার ও উহার মুখপানে অতিকাতরনয়নে চাহিতেছেন, ইঁহাকেই কি তোমরা সামাজিক বলিয়া সংবর্দ্ধনা কর? প্রকৃত সামাজিকদিগের চক্ষে ইনি একটি মস্তিষ্কশূন্য মাংসপিণ্ড, অথবা পিণ্ডীভূতভণ্ডতা।

বল এখন লোকরঞ্জন কি? এবং কিরূপে একই কার্য্যের অনুষ্ঠানে কিংবা নীতির একই পথাবলম্বনে মনুষ্য যুগপৎ সকলশ্রেণিস্থ লোকের মনোরঞ্জন করিবে? যে গ্রীকজাতি আজি সক্রেটিসের চিরস্মরণীয় নামে জগতে এত সম্মানিত, সেই গ্রীকজাতিই দ্বিধাবিভক্ত হইয়া সক্রেটিসকে এক হস্তে দেবতার মত পূজা করিয়াছে, এবং তাঁহাকে অসুর ও অপদেবতা হইতেও অধম বিবেচনায় আর এক হস্তে বিষপ্রয়োগ করিয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিয়াছে। যখন নেজারথের সেই লোকবৎসল মহাযোগী চোর ও দস্যুর ন্যায় ক্রুশকাষ্ঠে বিলম্বিত হন, তখন একদিকে লোকে শিরে করাঘাত করিয়া, হাহাকার করিয়া কান্দিয়াছে, আর একদিকে বিদ্রূপের বিকটহাস্য হাহাঃশব্দে সমুত্থিত হইয়াছে। স্টুয়ার্ট আর ক্রমওয়েলকে লইয়া ঐতিহাসিকেরা এই তিন শত বৎসর বিবাদ করিয়া আসিয়াছেন, এবং বোধ হয়

আরও তিন সহস্র বৎসর বিবাদ করিবেন। যাঁহারা ক্রমওয়েলকে রাজদ্রোহী পাষণ্ড বলেন, ষ্টুয়ার্ট তাঁহাদিগের চক্ষে কমনীয়তার প্রস্রবণস্বরূপ; এবং যাঁহারা ষ্টুয়ার্টকে প্রজাপীড়ক পাপাত্মা বলেন, ক্রমওয়েল তাঁহাদিগের চক্ষে ধর্ম্মের অবতার, অথবা সাক্ষাৎ ধর্ম্মপুরুষ। এসকল দেখিয়া শুনিয়া, এবং জগতীর প্রতি যুগের ইতিহাস অথবা সমাজের অহরহঃ পরিলক্ষিত প্রতিদিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাপুঞ্জ পর্য্যালোচনা করিয়া, কে আর লোকরঞ্জনে কৃতার্থ হইবার আশা করিতে পারে? এবং আশা করিবার কারণ থাকিলেও, লোকরঞ্জনের জন্যই লোকরঞ্জনকে মনুষ্য কোন্ সাহসে আর প্রতিভাময় মনস্বিজনের উচিতবর্ত্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করে?

লোকাভিরাম রামচন্দ্র লোকরঞ্জনব্রতে ব্রতী হইয়া অষ্টাবক্র মুনির নিকট বলিয়াছিলেন যে, লোকের আরাধনার নিমিত্ত স্নেহ, দয়া, এবং সর্ব্বপ্রকার সুখসম্ভোগ অথবা জানকীকেও যদি তাঁহার পরিত্যাগ করিতে হয়, তথাপি তাঁহার মনে দুঃখলেশসঞ্চারের সম্ভাবনা নাই *। কিন্তু আমাদিগের বোধ হয়, স্নেহ, দয়া, জীবনের সুখসামগ্রী কিংবা প্রাণাধিকা ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিতে পারিলেও লোকে লোকরঞ্জনব্রতে প্রকৃতপ্রস্তাবে কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হয় না। স্নেহ আর দয়া, সুখ অথবা সুখময়ী প্রাণসহচরী একান্ত প্রিয়পদার্থ হইলেও সর্ব্বথা অপরিহার্য্য নহে। অভিমানদীপ্ত মহানুভাব মনুষ্যেরা অনেক সময়ে এবং অনেক স্থলেই সুখ ও শান্তির এসকল উপকরণ অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যের কঠোর অনুরোধ পালন করেন, এবং দুঃখ ও যন্ত্রণার তপ্তকটাহে অম্লানবদনে ঝাঁপ দিয়া পড়েন। যদি মনুষ্য, মমতার এই সমস্ত সুকোমল বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলেই, লোকের আরাধনায় পূর্ণমনোরথ হইতে পারিত, তাহা হইলে লোকরঞ্জনের কথাপ্রসঙ্গে এইরূপ শঙ্কিত হইবার কারণ ছিল না। কিন্তু হায়! এসকল অতি কঠোর ত্যাগস্বীকারেও লোকরঞ্জনের বৃথাপ্রয়াসে ইষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। মনুষ্যকে লোকরঞ্জনের জন্য ইহা অপেক্ষাও গুরুতর, যে ভয়ঙ্কর ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, তাহা চিন্তা করিলে চিত্ত আপনা হইতেই ভয়ে অবসন্ন হইয়া পড়ে। যাঁহারা সকল তত্ত্বেরই আমূল দর্শন করিতে যত্নপর হন, তাঁহারা অবশ্যই বুঝিয়াছেন যে, আমরা এস্থলে আত্মার স্বাতন্ত্র্যকেই লক্ষ্য করিতেছি। কারণ, লোকরঞ্জনে কৃতসংকল্প হইয়া দীক্ষিত হইলে আত্মার স্বাতন্ত্র্যত্যাগেই ব্রতদক্ষিণা।

মনুষ্যাত্মার স্বাতন্ত্র্য যে কি এক মহামূল্য বস্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেকেই তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। মনুষ্য এই বহিঃস্থ জড়প্রকৃতির অনন্ত বৈভব ও অনন্ত মহিমা দর্শনেই মোহিত ও বিস্ময়ে

---

* স্নেহং দয়াং তথা সৌখ্যং যদিবা জানকীমপি আরাধনায় লোকস্য মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা

অভিভূত রহে, অথচ তাহার আপনারই অভ্যন্তরে অনন্তের পূর্ণ আভা কিরূপ আশ্চর্য্যভাবে নিহিত রহিয়াছে, তৎপ্রণিধানে ক্ষণকালের জন্যও তাহার চিত্তনিবেশ হইয়া উঠে না। সে মেঘমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গের উচ্চতা, সমুদ্রের অসীমবিস্তার, নদীর আবর্ত্ত, সূর্য্যচন্দ্রের উদয় ও লয়, এবং সৌরজগতের অনির্ব্বচনীয় মাহাত্ম্য চিন্তা করিয়াই আপনার কল্পিত ক্ষুদ্রতায় আপনি সঙ্কুচিত রহে ;—অথচ তাহার অন্তরস্থিত আশা যে অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গেরও বহু ঊর্দ্ধে উড্ডীন হয়, তাহার হৃদয়ের বিস্তার যে সমুদ্রবিস্তারকেও লজ্জা দেয়, তাহার তৃষ্ণার আবর্ত্ত যে নদীর ভয়াবহ আবর্ত্তকেও উপহাস করে, এবং তাহার মন যে অনন্ত কোটি সূর্য্যচন্দ্র এবং অনন্ত কোটি সৌরজগৎকেও অবহেলায় গ্রাস করিতে পারে, বহির্ব্যাপারমুগ্ধ মনুষ্য তাহা ধ্যানপর হইয়া ভাবিয়া দেখে না। ফলতঃ এই সৃষ্ট জগতে মনুষ্যের আত্মা হইতে কিছুই উচ্চতর নহে, কিছুই বৃহত্তর নহে, এবং কিছুই প্রকৃত মহিমায় অধিকতর মহিমান্বিত নহে। মনুষ্য সৃষ্টির মুকুটমণি এবং স্রষ্টার প্রতিকৃতি। তাহার নিকট সিংহাসন ও তৃণশয্যা উভয়ই সমান ; এবং সে মানে কি অপমানে, আলোকে কি অন্ধকারে প্রাসাদে কি পর্ণকুটীরে যে ভাবে অথবা যেখানেই অবস্থান করুক, তাহার নাম মনুষ্য, এবং সে তাহার আত্মার অতুল গৌরবেই চির-গৌরবান্বিত। অখিল ব্রহ্মাণ্ডও যদি তাহার প্রতি নির্দ্দয় ও তাহার বিরুদ্ধচারী হয়, সে একাকী এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডেরই বিরুদ্ধে অক্ষুব্ধ দণ্ডায়মান হইয়া আপনাকে আপনি 'অহং' অর্থাৎ 'আমি' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারে ; এবং যদি ন্যায় তাহার অনুকূল ও সত্য তাহার সহায় হয়, সে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোকের সমবেত ইচ্ছার প্রতিকূলে একমাত্র আপনার ইচ্ছাকেই একটি শক্তিরূপে প্রয়োগ করিতে স্বত্ব ও সামর্থ্য রাখে। মনুষ্যের এমন যে অলৌকিক সম্পদ, এমন যে দেবদুর্ল্ভ স্বাতন্ত্র্য, লোকরঞ্জনের অতিসামান্য নটনৈপুণ্য রক্ষার জন্য ইহাকেও তাহার বিসর্জ্জন করিতে হয়! কেননা, আপনার আত্মাকে বলি স্বরূপ অর্পণ না করিলে কেহই প্রায়শঃ লোকের অনুরঞ্জনে একপাদভূমি অগ্রসর হইতে পারে না। জিহ্বা লোকরঞ্জনের জন্য অসত্যভাষিণী, দৃষ্টি লোকরঞ্জনের জন্য অমৃতানুবাদিনী, প্রবৃত্তি লোকরঞ্জনের জন্য বিপথগামিনী, এবং মনুষ্যের চিন্তাস্রোতও লোকরঞ্জনের জন্য নিম্নতলবাহিনী। কাহারও স্বাভাবিক তেজস্বিতা প্রদীপ্তপাবকশিখার ন্যায় ধগ্ ধগ্ করিয়া জ্বলিতেছিল, লোকরঞ্জনলালসা তাহা নিভাইয়া ফেলিয়াছে ; কাহারও রুচি ও চিত্ত হিমাদ্রির নির্ঝরবারির ন্যায় নির্ম্মল ছিল, লোকরঞ্জনলালসায় তাহা ক্রমে ক্রমে পয়ঃপ্রণালীর অস্পৃশ্য পঙ্ক হইতেও আবিল হইয়াছে। পণ্ডিত লোকরঞ্জনের জন্য মূর্খের ন্যায়

ব্যবহার করিতেছে; এবং যে একদিন সিংহের ন্যায় প্রতাপশালী ছিল, সে আজি লোকরঞ্জনের জন্য, নিজ পুরুষকার পরিহার করিয়া, শৃগালের চাতুরী অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে।

সংসারে কপট বিনয়, কপট প্রণয়, এবং কাপট্যের আরও শত সহস্র প্রকারের অভিনয় কেন? তাহা কি লোকরঞ্জনেরই অনুরোধে নহে? অনেকে শিক্ষাবলে স্বর্গবাসেরও উপযুক্ত হইয়া নিরয়নিবাসী কীটের ন্যায় ধিক্কৃত জীবন যাপন করিতেছেন; অনেকে আপনার দেহ, প্রাণ, মন ও মনস্বিতা লোকের বিকৃত প্রবৃত্তির সাময়িকপ্রবাহে ভাসাইয়া দিয়া, ইচ্ছাশূন্য তৃণের ন্যায়, কোথায় কোন্ দিকে জানেন না, ভাসিয়া যাইতেছেন। অনুসন্ধান করিলে তাঁহাদিগের এই অধঃপাতের মূলেও কি লোকরঞ্জনকামনাই কারণ রূপে প্রতীয়মান হইবে না?

তবে কি লোকরঞ্জন পাপ? এই প্রশ্নের আন্দোলন ও মীমাংসার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

লোকরঞ্জনপ্রবৃত্তির ছয়টি প্রধান কারণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যথা, লোকভয়, লোকলজ্জা, যশঃস্পৃহা, দয়া ও প্রীতি, এবং লোকপরায়ণা ভক্তিনিষ্ঠা। আমরা ভয়জন্য লোকরঞ্জনকে পাপ অথবা পাপ হইতেও অবজ্ঞাজনক জ্ঞান করি, এবং যিনি বিঘ্নবিপত্তির শঙ্কায়, কিংবা কোনরূপ স্বার্থনাশ, সাংসারিক অনিষ্ট, কি সমর্থ ও সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের ক্রোধভয়ে কর্ত্তব্যের সরল পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া, লোকচক্ষুর দৃষ্টির পথে অতি জড়সড় ভাবে, কোনরূপে, কক্ষতলে প্রাণটিমাত্র লইয়া অবস্থান করেন, আমরা তাদৃশ ক্ষীণপ্রাণ, নিস্তেজ মনুষ্যকে, মনুষ্যের গণনায়, স্বতঃপ্রবৃত্ত পাপীরও বহুনিম্নে রাখি। ইচ্ছাকৃত পাপ, অতি বড় গর্হিত পাপ হইলেও,তাহার অনুষ্ঠানে মনের নিরঙ্কুশ গতি এবং আত্মার স্বাধীনতা আছে। বিধাতা মনুষ্য ভিন্ন অন্য কোন জাতীয় জীবকেই এই আংশিক বিধাতৃ-শক্তি এবং ভয়াবহ উচ্ছৃঙ্খলতা প্রদান করেন নাই। পশুপক্ষীর জন্য যে রেখা নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, তাহারা সেই রেখাতেই সতত বিচরণ করিতেছে এবং সেই রেখাতেই চিরদিন বিচরণ করিবে। তাহাদিগের সহিত পাপপুণ্যের কোন সম্পর্ক নাই, এবং প্রকৃতির বিদ্রোহাচরণেও তাহাদিগের কোনরূপ অধিকার ও ক্ষমতা নাই। এই সম্পর্ক মনুষ্যের, এবং এই রোমহর্ষণ অধিকার ও ক্ষমতাও একমাত্র মনুষ্যের। সুতরাং মনুষ্যের পাপেও মনুষ্যাত্মার পরিচয় হয়। অনিচ্ছাকৃত পাপ অথবা অনিচ্ছায় লোকানুরঞ্জনের আরম্ভেই পশুপক্ষীর মত সেই অধ্যাত্মস্বাধীনতায় জলাঞ্জলি, এবং একান্ত ঘৃণাকর আত্মবিসর্জ্জন; ইহা অপেক্ষা অবমাননা আর কি? ফলতঃ যাহারা আপনার ইচ্ছায় কি আপনার প্রয়োজনে, কোন নীচবৃত্তি অবলম্বন করে, তাহারা এক শ্রে-

ণির লোক, এবং যাহারা পরের ইচ্ছায় কি পরের প্রয়োজনে, অথবা পরকীয় শাসনে নীচতা কি নিকৃষ্ট পথের আশ্রয় লয়, তাহারা আর এক শ্রেণির লোক। আমাদিগের চক্ষে এই ভ্রুকুটিভঙ্গিভীত শেষোক্ত শ্রেণির মনুষ্যেরাই অধিকতর নিন্দার্হ। একথা সত্য যে, ইহাদিগের দ্বারা জগতের বিশেষ কিছু অনিষ্ট, কিংবা লোকসমাজের বিশেষ কোন অকল্যাণ হয় না; এবং ইহাও সত্য যে, দুষ্ক্রিয়ার মতি থাকিলেও ইহারা শাসনভয়ে তাহাতে প্রায়শঃ প্রকাশ্য হস্তক্ষেপ করে না। বরং ইহারা অনেক সময়ে সাধুর সান্নিধ্যে সাধু, এবং শিষ্টের সান্নিধ্যে শিষ্টবেশ পরিগ্রহ করিয়া সৎকার্য্যেরও আনুকূল্য করে। কিন্তু তথাপি, যখনই মনে হয় যে, ইহাদিগের সুমতি ও কুমতি, উন্নতি ও অবনতি, সমস্তেরই মূলহেতু ভয়, চিত্ত তখনই ঘৃণায় নিবৃত্ত হইয়া ফিরিয়া আসে।

কুসুমে কিংবা কুসুমকোমল বস্ত্রপুটে যেমন কীট, তেমনই মনুষ্য-হৃদয়ে ভয়। মনুষ্যের হৃদয়ে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট ও উপাদেয়, যাহা কিছু সুদৃশ্য ও সুসৌরভযুক্ত, ভয় তৎসমুদয়ই চর্ব্বণের পর চর্ব্বণ করিয়া উহাকে একবারে অসার, অকর্ম্মণ্য এবং অবস্তু করিয়া ফেলে, এবং যৌবনে জরা ও বসন্তে শীত সৃষ্টি করিয়া প্রকৃতিকেই একবারে বিকৃত করিয়া তুলে। ঈশ্বরকে ভয় কর, এই নীতি পুরাতন শাস্ত্রের পুরাতন কথা। যখন ইহা প্রথম প্রচারিত হয়, মনুষ্যজাতি তখন শিশু। তখন মনুষ্য বজ্রবিদ্যুতে ঈশ্বরের মঙ্গল-হস্ত দেখিতে পাইত না, মেঘে তাঁহার মাধুর্য্য অনুভব করিত না, এবং ঝটিকার ভৈরবনাদে তাঁহার সুমধুর উপদেশ শুনিতে সমর্থ হইত না। এইক্ষণকার পূর্ণবিকশিত পরমার্থবিদ্যা ঈশ্বরকে ভয় করিতে বলে না; প্রীতি করিতে বলে। ঈশ্বরকে ভয় করাও যদি দোষ এবং মনুষ্যাত্মার বিকাশের পথে অন্তরায়, তবে কি মনুষ্য মনুষ্যকে ভয় করিবে, এবং মনুষ্যের ভয়ে অধীর, আকুল ও উৎকণ্ঠ রহিয়া লোকরঞ্জনের জন্য একে আর হইবে? রাজা রামচন্দ্র প্রজার বিরাগভয়ে, কি প্রজারঞ্জন কার্য্যই রাজার পরম ধর্ম্ম এই বিবেচনায়, পবিত্রহৃদয়া জানকীকে প্রাণ অপেক্ষা অধিক ভালবাসিয়াও অকাতরে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তাদৃশ তেজোরাশিতে ভয় কি স্বার্থচিন্তার প্রবেশসম্ভাবনা অল্প। যাঁহারা নিবিষ্টচিত্তে রাম-চরিত্র পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের এইরূপ ধারণা যে রামচন্দ্র রাজাকে সর্ব্বতোভাবেই প্রজাবর্গের ইচ্ছাধীন বলিয়া জানিতেন, এবং প্রতিনিধি যেরূপ প্রভুর আজ্ঞাপালনে বাধ্য, তিনিও আপনাকে সেইরূপ প্রজার ইচ্ছাপালনে বাধ্য জ্ঞান করিতেন। সুতরাং তাঁহার এই কার্য্যে কর্ত্তব্যবুদ্ধিরই প্রণোদনা কি প্রমাদ। কিন্তু যদি ইহা না হইয়া, ভয়ে তিনি ঐরূপ করিয়া থাকেন,—সীতাকে গৃহে রাখিলে প্রজা তাঁ-

হার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবে, এবং রাজ্যে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিবে, যদি এই দুর্ভাবনার অধীন হইয়াই তিনি সেই প্রীতির প্রতিমা এবং মূর্ত্তিমতী পবিত্রতাকে, কঠোরগর্ভাবস্থায় ব্যাঘ্রভল্লূকের মুখে বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহলোকেও তাঁহার ক্ষমা নাই, এবং লোকান্তরেও তাঁহার স্বর্গ নাই।

লোকলজ্জা ঠিক ভয় নহে, অথবা লোকের প্রতি দয়াও নহে, অথচ উহাতে ভয় ও দয়া এই উভয়েরই ঈষৎ ছায়া আছে। উহা প্রকৃত প্রস্তাবে ভয় ও দয়ার মধ্যস্থিত এক বিচিত্র ভাব, এবং এই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া অনেকেই অনেক সময়ে লোকবিনোদনে বাধ্য হন। নিতান্ত ঘৃণিতচরিত্র ব্যক্তিও যদি আলাপ করিবার জন্য নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়, ভদ্রলোকেরা মুখের উপরই তাহাকে তিরস্কার না করিয়া মনের ভাব গোপন করেন; এবং সে যে বিষয়ে আলাপ করিতে ভালবাসে, তাহার সহিত তদনুরূপ কোন বিষয়ে আলাপ করিয়া ক্ষণকালের জন্য তদীয় মনোরঞ্জনে যত্নশীল হন। ইহারই নাম লোকলজ্জা। মনুষ্যের চক্ষুতে কি এক মোহিনী শক্তি আছে, উহা যাঁহার উপর নিপতিত হয়, তিনিই, অন্ততঃ তন্মুহূর্ত্তের জন্য, আপনা হইতে একটুকু স্খলিত হন। কৌরবকুল-কলঙ্ক ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগের উপর যেরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন, বোধহয় ঐরূপ সরলস্বভাব ও ধর্ম্মপরায়ণ জাতির উপর কোনদিনও কোন রাজবংশ তেমন অত্যাচার করেন নাই। দ্রৌপদীর ন্যায় লক্ষলোকপূজিতা, রাজসূয়যজ্ঞে অভিষিক্তা, রাজরাজেশ্বরীকে প্রকাশ্য সভায় নিগৃহীত হইতে দেওয়া একপ্রকারে অপমানের পরাকাষ্ঠা। কেহ কল্পনায়ও কাহাকে এইরূপ অপমান করিতে সাহস পায় না। পাণ্ডবগণ এই অত্যাচার, অপমান ও অকথ্য নিগ্রহের প্রতিশোধ দিয়া সর্ব্বাংশেই পুরুষের মত কার্য্য করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। বৈরনির্য্যাতন আর যে ভাবে এবং যে অর্থেই কেন পাতক হউক না, পাণ্ডবকৃত বৈরনির্য্যাতনকে কেহই পাতক বলিয়া গণনা করিতে পারিবে না। কিন্তু যেই পাণ্ডবগণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর, ধৃতরাষ্ট্রপ্রভৃতির সম্মুখীন হইলেন, অমনি তাঁহারা তাঁহাদিগের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, এবং সত্যের আংশিক অপলাপ করিয়া স্বকৃত কার্য্যসমূহকে প্রকারান্তরে পাপ বলিয়া বর্ণনা করিলেন। ইহাও লোকলজ্জা। লোকলজ্জার আরও কত উদাহরণ আমাদিগের চক্ষুর উপরেই নিয়ত ভাসমান রহিয়াছে। আমরা জানি যে, গুরুজনসান্নিধ্যে প্রিয়সম্মিলনে এবং প্রণয়ের রসপূর্ণ পবিত্র কথোপকথনে কিছুমাত্র দোষ নাই। বরং তাহাতে প্রীতি অধিকতর নির্ম্মল হয়, এবং চিত্ত পঙ্কস্পর্শশূন্য নির্ম্মলপ্রেমের সেই অনির্ব্বচনীয়স্বাদ অনুভব করিতে

পায়। কিন্তু আমরা লজ্জায় ইহা হইতে নিবৃত্ত থাকি। আমরা বিলক্ষণরূপে অবগত আছি যে, সম্পর্কভেদে পরিহাস, এবং সমাজের আরও পাঁচ প্রকারের আচারব্যবহার নিতান্ত অর্থশূন্য। কিন্তু লজ্জার শাসনে আমরা তাহাতে প্রবৃত্ত হই। এই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি কি ভয়ে, না দয়ায়? ইহার প্রকৃত কারণ লজ্জা। লজ্জা পরিচ্ছদাদিবিষয়ে আমাদিগের স্বাধীনতা অপহরণ করে, আমোদ প্রমোদের প্রকারবিষয়ে আমাদিগকে পরের অধীন করিয়া রাখে, এবং আরও বহুবিধ লৌকিক কার্য্যে আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে পরমুখপ্রেক্ষী করিয়া তুলে। এই লজ্জাধীন লোকরঞ্জন সাধারণতঃ পাপ নহে, কারণ ইহার সহিত বিবেকের সকল সময়েই বিরোধ ঘটে না। কিন্তু যখন ইহা বিবেককেও অতিক্রম করে, এবং আত্মার স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তিও বিনাশ করিয়া ফেলে, তখন যে ইহাকে পাপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিব, তাহাতে আবার বিচার ও বিতর্ক কি?

প্রভুত্ব, ক্ষমতা, সম্মান, এবং অনন্যসাধারণ সামর্থ্য প্রভৃতি লৌকিক সম্পদের জন্য যে লালসা তাহারই অপর নাম যশঃস্পৃহা। কেননা, যশে সর্ব্বত্রই প্রভুত্বের বিস্তার, ক্ষমতার অনিবার্য্য বৃদ্ধি এবং সম্মান ও সামর্থ্যের অবশ্যম্ভাবিনী পরিপুষ্টি হইয়া থাকে। যশস্বী গ্লাডষ্টোন রাজা না হইয়াও আজি ইংলণ্ডের রাজা। ইংলণ্ড তাঁহার কথায় উত্থিত হয়, তাঁহার ইঙ্গিতে উপবিষ্ট রহে। যশস্বী গ্যারিবল্ডী ইটালীর কোন এক লুক্কায়িত প্রদেশে কৃষিপরিদর্শন প্রভৃতি সামান্য কার্য্যে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত লুক্কায়িত রহিয়াছেন। অথচ সমগ্র ইটালী প্রাতঃসময়ে তাঁহার নাম লইয়া উদ্দেশে তাঁহাকে অভিবাদন করে, এবং যেখানে যে সময়ে জনসাধারণের স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন হয়, তাঁহার প্রতাপ ও প্রভাব সেখানেই সেই সময়ে প্রাতঃসূর্য্যের কিরণরাশির মত ছাঁইয়া পড়ে। যশস্বিগণের অগ্রগণ্য রায়েনজী, রমিও, ভল্‌টেয়ার, লুথর ও মিল্টন, ডুবাল ও গ্যালিলিও, এবং কেপ্লার ও কলম্বস বহুদিন হয়, লোকলীলা সংবরণ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদিগের অমল-যশোমণ্ডিত অবিনশ্বরজীবন অদ্যাপি সহস্রকোটি মানবজীবনে প্রতিভাত ও প্রবাহিত হইতেছে। ঈদৃশী যশঃস্পৃহা হইতে যে লোকানুরঞ্জনে মতি হয়, এবং লোকের মুখে কীর্ত্তির কলধ্বনি শ্রবণে বাসনা জম্মে, তাহাও কি পাপ? মানবজাতির অতীত ইতিহাস এবং মনুষ্যের হৃদয় ধীরে ধীরে, মৃদুমোহনস্বরে, অতিশসঙ্ককণ্ঠে উত্তর করিতেছে,—না।

বস্তুতঃ, যে যশঃস্পৃহা, প্রতপ্তমদিরার ন্যায় দীনস্বত্ব দুর্ব্বল মনুষ্যকেও, অন্ততঃ মুহূর্ত্তকালের জন্য, এক অতিমানুষ বল প্রদান করে; যাহার বংশীনাদ-বিনিন্দি মধুর আহ্বানে উম্মাদিত হইয়া, ভীরু বী-

রের প্রভাবে গর্জ্জিয়া উঠে, যোদ্ধা স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণসাধনে মৃত্যুর করাল-গ্রাসসান্নিধ্যেও অকম্পা অবিচলিত পদে অগ্রসর হয়; যে যশঃস্পৃহা জ্ঞানের অনুসন্ধানে এবং কাব্যাদি সুকুমার বিদ্যার অনুশীলনে উগ্র উদ্দীপনা,পুরুষকারের প্রমত্ত-লীলারঙ্গে চিরপ্রবর্ত্তনা; যাহার জয়-বৈজয়ন্তী সাগরবক্ষে ও অদ্রিশৃঙ্গে সমান দোদুল্যমানা, এবং লোকের হিতসম্পাদনেও যাহার সকল সময়েই অসামান্য উত্তেজনা, সেই যশঃস্পৃহাকে ঘৃণা করা মনুষ্যের পক্ষে নিতান্তই কঠিন। কিন্তু কঠিন কথা হইলেও বলিতে হইবে যে,যশস্পৃহা ন্যায়-পরতার ন্যায় নির্ম্মল নহে, নিঃস্বার্থ অনুরাগের ন্যায় সুদৃশ্য নহে, অভিমানসম্ভবা আসক্তির ন্যায় পুরুষের প্রীতিপ্রদ নহে, এবং মনুষ্যের ধর্ম্মপথেও যথার্থ সহায় নহে। যাঁহারা যশস্পৃহায় অতিমাত্র ব্যাকুল, তাঁহারা জগতে প্রায়ই সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা লোকরঞ্জন করেন, তাঁহারা কখনও বা ঐ ব্যাকুলতায় মনুষ্যত্বের উচ্চতর গ্রামেও আরোহণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ তাঁহারা সুযশ ও কুযশের পার্থক্য না বুঝিয়া, অনেক সময়ে লোকপদবীর অযোগ্য, অপাত্র, অপদার্থের নিকটও যশঃপ্রার্থী হন; এবং যে কোন উপায়ে উপার্জ্জিত যশঃই যে মনুষ্যের সর্ব্বস্ব নহে ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, কেহ বা ক্রমশঃ নাবিতে নাবিতে, পরিশেষে একবারে অধঃপাতে যান। ন্যায়পরতা ও অনুরাগ, অথবা প্রকৃত অভিমান মনুষ্যকে কখনই অধঃপাতের দিকে নিতে পারে না।

দয়া আর প্রীতিতে যে লোকরঞ্জন, তাহা আর এক পদার্থ। তাহা মেঘাবৃত সূর্য্য কি স্তবকাবনত্র বনপাদপের সেই এক মাধুর্য্যের ন্যায় অনেক সময়েই মনোহর, অনেক সময়েই প্রশংসনীয়; এবং যখন মনোহর ও প্রশংসনীয় নহে, তখনও প্রায়শঃই সহনীয় ও ক্ষমাযোগ্য। বাল্মীকি কি বশিষ্ঠের ন্যায় জ্ঞানী ও বৃদ্ধ, সুকুমার-মতি শিশুর নিকট শিশু সাজিয়া ক্রীড়া করেন,দুষ্মন্তের ন্যায় বীর তপোবনবাসিনী সরলা কামিনীদিগের মনোরঞ্জনের জন্য সারল্যে মিশিয়া নানা রূপ আমোদ করেন, মেরেঙ্গো ও জীনার বিজেতা যজিফিন ও তাঁহার নর্ম্মসহচরীদিগের নিকট মৃদু মৃদু হাসিয়া নৃত্য শিক্ষা করেন, এবং শঙ্করাচার্য্য কি নিয়ুটন প্রমোদ পরিহাসে পাঁচজনকে প্রফুল্ল করিবার জন্য করধৃত অক্ষমালা কি করের লেখনী পরিত্যাগ করেন;—এ সকল দেখিতে সুন্দর। তোমার হৃদয় শোকদুঃখে আচ্ছন্ন, তোমার প্রতিবেশীর গৃহে শুভকার্য্যের শুভউৎসব। তুমি যদি দয়ায় কি প্রীতিতে আপনার শোকদুঃখ কিছু কাল বিস্মৃত হইয়া তাহার সেই উৎসবে আনন্দধারা ঢালিতে পার, তাহাও সুন্দর ও প্রশংসাযোগ্য। পিয়ুরিটান সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকেরা যে নীতিই কেন প্রচার না করুন, যাঁহার নাম লইয়া তাঁহাদিগের সম্প্রদায়ের সৃষ্টি, সেই

তপঃসাগরমগ্ন ধীর স্বয়ং অন্যরূপ ছিলেন। তিনি, যে হাসে, তাহার সহিত হাসিতে জানিতেন; যে কাঁদে, তাহার সহিত কাঁদিতে পারিতেন; এবং কোটি লোকের মঙ্গল চিন্তায় ডুবিয়া রহিয়াও পার্শ্বস্থ প্রিয়ব্যক্তিদিগের সামান্য হর্ষবিষাদের ভাবনা ভাবিতে অবসর পাইতেন। দয়ার এমনই রীতি, এবং প্রীতিরও এমনই গতি।

আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধনামা থিয়োডোর পারকার পণ্ডিতের মধ্যে পণ্ডিত, বীরের মধ্যে বীর, এবং পরমার্থনিষ্ঠ সাধুসমাজে পরমসাধু বলিয়া সর্ব্বত্রই অসাধারণ পূজা পাইতেন। তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণা প্রাচীন জ্ঞানিদিগের তত্ত্বসঞ্চয়কে পঞ্চবিংশতি ভাষায় শোষণ করিয়াও অতৃপ্ত রহিত। ইতিহাসে ও দর্শনে এবং সুললিত সাহিত্যশাস্ত্রে তৎকালের কোন ব্যক্তিই তাহার সমকক্ষ ছিলেন কি না, সন্দেহ। কর্ত্তব্যপরায়ণতায় তিনি বজ্র হইতেও কঠোর এবং পর্ব্বত হইতেও অটল ছিলেন। গ্রন্থাদি লইয়া পরিশ্রমে তাঁহার এমন অভ্যাস ছিল যে, তিনি অধ্যয়নে নিয়ত অষ্টাদশ ঘটিকা নিবিষ্ট রহিলেও অণুমাত্র কাতরতা অনুভব করিতেন না। ইহার উপর আবার তিনি এমন বাগ্মী, এমন সুলেখক ছিলেন যে, যে কোন বিষয় তিনি স্পর্শ করিতেন, তাহাই তাঁহার শক্তির প্রভাবে সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল কান্তি ধারণ করিত। কিন্তু আপনাতে আপনি অবস্থান করিবার এ সকল সুখসামগ্রী সত্ত্বেও তাঁহার দয়া আর তাঁহার প্রীতি লোকানুরঞ্জনে ও পরচিত্তবিনোদনে শারদশশীর জ্যোৎস্না এবং নিদাঘকালীন সান্ধ্য সমীরণের ন্যায় ক্রীড়া করিত; এবং যে একবার তাঁহার সংস্পর্শে আসিত, সেই তাঁহার মধুর হাস্যে, মধুর ব্যবহারে, মধুমাখা কথোপকথনে এবং মধু হইতেও মিষ্টতর সরস আহ্বানে মোহিত হইয়া, প্রথমদর্শন অবধিই আপনাকে তাঁহার জ্ঞানে তাঁহার ছায়ায় পড়িয়া থাকিত। নগরের বালকবৃন্দ, আপনাদিগের বাল-জন-সুলভ সুখদুঃখের কাহিনী তাঁহার নিকট কহিতে পারিলেই আহ্লাদে অবশ হইত; সরলস্বভাব যুবকযুবতীরা মনের মর্ম্মবেদনা এবং অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিবার জন্য, যেন আর স্থান না পাইয়া, তাঁহার নিকটে আসিত; এবং চিন্তার কররেখায় চিহ্নিত চিরজীবন-দগ্ধ বৃদ্ধও তাঁহার নিকটে আসিতে পারিলেই অপার শান্তি লাভ করিত। লোকের মনোরঞ্জনে এইরূপ ক্ষমতা সামান্য শক্তি নহে; এবং যিনি ন্যায়ের লৌহবর্ত্ম হইতে স্খলিত না হইয়া এইরূপে লোকরঞ্জন করিতে পারেন, তিনিও সামান্য ব্যক্তি নহেন। তবে কথা এই, এই দুই কূল রক্ষা করিতে গিয়া কৃতকার্য্য হওয়া ইহ জগতে কয়জনের সাধ্যায়ত্ত?

লোকের প্রতি অথবা লোকসমষ্টিস্বরূপ মানবজাতির প্রতি হৃদ্গত ভক্তিবশতঃ যে লোকরঞ্জন, তাহা পাপ কিংবা

পাপের সহিত কোনরূপে সংস্পৃষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, তাহাই পুণ্যের প্রাণ। তাদৃশী লোকপরায়ণতাকে লোকসেবাব্রত বলিলেই বোধ হয় অধিকতর সংগত হয়। ভক্তিতে তাহার আরম্ভ, বিবেক ও প্রীতির পরিমিশ্রণে তাহার পুস্টি এবং ভজনায় তাহার শেষ। তাহাতে পূর্ণমাত্রায় আত্মোৎসর্গ হয়, অথচ আত্মার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা অণুমাত্রায়ও স্পৃস্ট কি বিনস্ট হয় না, এবং লোকরঞ্জনের জন্য হিতকর ও প্রীতিকর উভয়বিধ কার্য্যই সর্ব্বপ্রযত্নে অনুষ্ঠিত হয়, অথচ লোকলজ্জা, লোকভয় অথবা লৌকিকযশঃস্পৃহাদি কিছুই অন্তঃকরণে স্থান পায় না। ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা এইরূপ লোকরঞ্জনব্রতকে জীবনের একমাত্র ব্রত করিতে পারেন। ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা মনুষ্যের পদতলে পড়িয়া রহিয়াও আপনার মনুষ্যত্বকে সর্ব্বতোভাবে অক্ষত রাখিতে সমর্থ হন। তাঁহারা অবনত হইয়াও উচ্ছ্রিত, এবং উচ্ছ্রিত হইয়াও অবনত। তাঁহারাই মহাত্মা, তাঁহারাই প্রকৃত মনুষ্য, এবং তাঁহারাই মানুষ-শক্তির সেবক ও সহায়।

চন্দ্রগ্রহণ।

(১)

নিদ্রিতা জগতী গভীরা রজনী ;
নির্ব্বাত নিস্পন্দ প্রকৃতি নীরব।
সহসা জাগিয়া শুনি হুলুধ্বনি।
ঘোর ঘটা রোলে শঙ্খ ঘণ্টারব।
তাসহ মিশিয়া উচ্চ হরিধ্বনি,
রহিয়া রহিয়া হতেছে ঘন।
শয্যা পরিহরি উঠিনু অমনি,
ভাবিনু কি হেতু উৎসব হেন ?
নিরানন্দ বঙ্গে আনন্দ কেন ?

(২)

পলাসী-প্রাঙ্গণে চির রাহুমুখে,
বঙ্গের সৌভাগ্য-শশী কবলিত।
ভাসি অশ্রুনীরে সিংহলাভিমুখে
গিয়াছে শ্রীমন্ত জনমের মত।
পুন কি সে শশী হইল উদয় ?
পুন কি শ্রীমন্ত আসিল দেশে ?
নহিলে এ বঙ্গ কেন হর্ষময় ?
মৃত প্রায় বঙ্গ জর্জ্জরিত বিষে ;
সে বিষ হরিল—চেতাইল কি সে ?

(৩)

সহসা বাহিরে করিনু গমন,
গ্রহণের কথা পড়িল মনে।
রাহু মুখে চাঁদে করিনু দর্শন,
কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিছে সঘনে।
নীচ হস্তে দেখি মহত লাঞ্ছন,
বিষাদে রজনী হয়েছে মলিন।
কিন্তু বঙ্গবাসী হরষে মগন !

বঙ্গে কি মহত্ত্ব হয়েছে বিলীন!
হায় বঙ্গবাসী এতই কি হীন?

(৪)

ধন্য! নিশাপতি তুমিই মহান্!
আপনি বিপদে হইয়া পতিত;
পরের করিছ মঙ্গল বিধান;
বঙ্গে পুণ্যরাশি করিছ সঞ্চিত।
বুঝিনু বুঝিনু বুঝিনু কারণ,
বৃথা নিন্দা করি বঙ্গবাসীগণে।
শশাঙ্ক-শিবার্থে ধন বিতরণ
করিছে ভিখারী, বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণে।
কর 'মুক্তি' বাঞ্ছা কর কায়োমনে।

(৫)

নিস্বার্থ হৃদয়ে যদি পরহিত
এরূপে নিয়ত পার করিবার;
হইবে জগতে যশ বিঘোষিত;
বঙ্গের সৌভাগ্য ফিরিবে আবার।
তোমাদের পুণ্যে বঙ্গ-সুখ-শশী
দুঃখ-রাহু মুক্ত হউক ত্বরিত;
আঘাত করিয়া পুণ্য তীক্ষ্ম অসী
রাহু-দস্যু-শির কর দ্বিখণ্ডিত;
ধরম-বীরত্ব হউক ধ্বনিত।

(৬)

অই দেখ রাহু চণ্ডাল তস্কর
পরাভূত হয়ে, করিছে প্রস্থান।
রাহুমুক্ত-শশী পুন স্নিগ্ধকর
কৌমদী জগতে করিতেছে দান।
দেও হরি ধ্বনি, কর হুলুরব;
ঘোর রোলে কর শঙ্খ ঘণ্টা নাদ।
রাহুমুক্ত হলো রজনীবান্ধব,
যামিনী সতীর ঘুচিল বিষাদ।
মহতের জয়ে কার না আহ্লাদ?

(৭)

হে শশী, তুমিত মুকতি পাইলে;
বিপদ হইতে পাইলে উদ্ধার।
পুনশ্চ জগতে সুধা বরষিলে,
নিশিসহ সুখে হাসিলে আবার।
কিন্তু এ বঙ্গের সুখ-শশধর,
যে বিষাদ-রাহু করিল গরাস;
গত হলো কত মাস সম্বৎসর,
আর না সে শশী হইল প্রকাশ!
এ গ্রহণস্থিতি রবে বার মাস?

শ্রীজ——

ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশ *

উনবিংশ শতাব্দী (The Nineteenth Century) নামক একখানি প্রথম শ্রেণীর সাময়িক পত্র, অল্প দিবস হইল লণ্ডন হইতে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ লেখক জেমস্ নোলস্ ইহার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছেন ; রাজকবি টেনিসন্ ইহার আগমনী গাইয়াছেন; গ্লাডস্টোন ও গ্রাণ্টডফ্, কার্ডিনাল ম্যানিং ও ম্যাথিউ আরনোল্ড প্রভৃতি রাজনীতিজ্ঞ এবং লেখক চূড়ামণিগণ ইহার নেতা হইয়াছেন। আমরা ভরসা করি যে, "পাক্ষিক" ও "সমসাময়িক" সমালোচন দ্বয়ের প্রতিযোগী "উনবিংশ শতাব্দী" অচিরে উহাদিগের সমকক্ষ হইবে।

সারজন্ লুবকের নাম বোধ হয় অনেকেই শ্রবণ করিয়াছেন। ইনি ইংলণ্ডের এক জন প্রসিদ্ধ লেখক, বক্তা এবং পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য। "উনবিংশ শতাব্দীর" প্রথম সংখ্যায় সারলুবক, ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক রাজনীতি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকটিত করিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধই আমাদিগের অদ্যকার আলোচ্য বিষয়।

ইংলণ্ডের বর্ত্তমান কোন সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী বলিয়াছেন যে, "আমরা আমাদিগের দায়িত্ব বিস্মৃত হইয়া, অর্দ্ধসভ্য, বিজিত রাজ্যসমূহের প্রতি যে নীতির অনুসরণ করি, অতুলশক্তিবৈভবে প্রমত্ত হইয়া যেরূপে তাহাদিগকে ক্রীড়নকের ন্যায় ব্যবহার করি,—সময়ে সময়ে তাহা অন্ধ স্বার্থপরতায় পরিপূর্ণ হইয়া থাকে।" এই মর্ম্মান্তিক আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া, জাতীয় চরিত্রের এই কলঙ্ক অপনয়নার্থ লুবক, ইংলণ্ডীয় অনুদৃষ্ট রাজনীতির সমর্থন করিয়াছেন ; এবং যে নীতিসূত্র অবলম্বন করিয়া ইংলণ্ড, ভারতবর্ষ, কানেডা ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি সুবৃহৎ রাজ্যসমূহ শাসন করিতেছেন, তিনি তাহার সারবত্তা দেখাইতে যত্নপর হইয়াছেন। আমরা অদ্যকার এই প্রস্তাবে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, অন্যান্য উপনিবেশের সহিত তুলনা করিলে, ভারতে অনুষ্ঠিত ইংরাজ রাজনীতি সর্ব্বথা উদার নহে।

ভারতবর্ষকে প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডীয় উপনিবেশ বলা যাইতে পারে কি না, প্রস্তাবের প্রারম্ভেই আমাদিগকে তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। কানেডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতিকে আমরা যে ভাবে ইংল-

* "On the Imperial Policy of Great Britain." The Nineteenth Century No. 1, vol. I.

ণ্ডীয় উপনিবেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করি, ভারতবর্ষকেও কি তাহাই বলিব? আফ্রিকা, আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ভূখণ্ডে যে সকল ইংলণ্ডীয় উপনিবেশ সংস্থাপিত আছে, তাহার প্রায় সকলগুলিই ইয়ুরোপীয়দিগের আগমন কালে, জনমানব সমাগমশূন্য বিজন অরণ্যানী অথবা অসভ্য আদিমনিবাসী পরিপূরিত ঘোরতমসাচ্ছন্ন প্রদেশরূপে অবস্থিত ছিল। কালসহকারে এই আদিম অধিবাসিদিগের সংখ্যা এত ন্যূন হইয়া পড়িয়াছে যে, বর্ত্তমান লোক সংখ্যা গ্রহণ করিলে, উহারা সর্ব্বথা উপেক্ষণীয় হইবার যোগ্য। এই সকল স্থানে বিদেশীয় লোকের সংখ্যাই অধিক, অথবা বিদেশীয়েরাই এখন এই সকল স্থানের প্রকৃত এবং স্থায়ী অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছে। গবর্ণমেণ্ট, এমিগ্রেসন প্রথার অনুমোদন এবং প্রবর্ত্তন করিয়াই এই সকল স্থলে অধিবাসীর সমাবেশ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টই এই সকল রাজ্যের বীজবপন এবং উহাতে জল সেচন করিয়াছেন। বাস্তবিক এই সকল রাজ্য গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃকই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখন কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই প্রতীত হইবে যে, বিভিন্ন প্রদেশ হইতে লোক সংগ্রহ করিয়া জনপ্রাণীহীন নির্জ্জন প্রদেশে বহুজনসমাকীর্ণ গ্রাম নগর চত্বর প্রতিষ্ঠা করা বহু ব্যয় এবং প্রগাঢ় অধ্যবসায় সাপেক্ষ। আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়াতে স্বল্প সময়ে যুগসাধ্য, অভাবনীয় যে সকল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে, তাহাতে সহসা বিশ্বাস স্থাপন করিতে সাহস হয় না। এখন দেখা যাইতেছে যে, যদি আমরা উল্লিখিত রাজ্যসমূহকে উপনিবেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করি, তাহা হইলে সে অর্থে ভারতবর্ষকে কখনও ইংলণ্ডীয় উপনিবেশ বলিতে পারি না। এখানে ইংরেজ বসন্তের কোকিল। পাঁচ, দশ, উর্দ্ধ সংখ্যা পনর বৎসর এখানে অবস্থান করিয়াই ইংরাজ স্বদেশে প্রতিনিবৃত্ত হয়েন। স্থায়ী ইংরাজ এখানে একজনও দৃস্ট হয় না। এদেশকে স্বদেশ বলেন, শ্বেতশরীরে এমন একটি লোকও এখানে বিদ্যমান নাই। তবে ভারতকেও কি উপনিবেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিব?

উপনিবেশ নিচয়ের সাহায্যার্থ ১৮৫৯ অব্দ হইতে ১৮৬৯ অব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ড সর্ব্বশুদ্ধ ৪১০০০০০০০ এক চল্লিশ কোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়াছেন; অর্থাৎ সাকল্যে প্রতিবৎসর ৪১০০০০০০ চারি কোটি দশ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। তাহার পর

১৮৭০ সালে ... ২৭৩৫৯৮০০ টাকা
১৮৭১ ,, ... ২২২৮১০৪০ ,,
১৮৭২ ,, ... ১৯১১০০৭০ ,,
১৮৭৩ ,, ... ১৮১৭৪৭১০ ,,

খরচ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার মধ্যে ইংলণ্ড যে ভারতবর্ষের জন্য একটি মুদ্রাও নিজ কোষাগার হইতে প্রদান করিয়াছেন, এমন দৃষ্ট হয় না। সারলুবকও এই সমস্ত অর্থ হইতে ভারতের জন্য কিছু ব্যয়

হইয়াছে কি না, তাহার উল্লেখ করিতে পারেন নাই। বিগত ২৪ শে জুলাইর ' ইংলিশম্যান ' নামক সংবাদপত্র দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইংলণ্ড সাধারণ ধনাগার হইতে ভারতবর্ষের উপকারার্থ এপর্য্যন্ত একটি পয়সাও ব্যয় করিলেন না। কিন্তু আমরা অবগত আছি যে,১৮৬৭,১৮৬৮ এবং ১৮৬৯ অব্দে প্রতি বৎসর ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের হিসাবে গড়ে ৬৭৫০০০০০ ছয় কোটি পঁচাত্তর লক্ষ টাকা করিয়া ব্যয় করিয়াছেন *। ১৮৬৯ সালের পর হইতে ইংলণ্ড, ভারতসংক্রান্তব্যয়-নির্ব্বাহার্থে প্রতি বৎসর কত টাকা করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন,তাহার বিশ্বাসজনক প্রমাণ এপর্য্যন্ত আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কিন্তু প্রতিবর্ষেই যে উহা বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। সংবাদ পত্রের জনশ্রুতিতে বিশ্বাস করিলে, ইংলণ্ড হোম গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ের নিমিত্ত প্রতি বৎসর ১৩০০০০০০০ তের কোটি মুদ্রা গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই সমস্ত টাকা নির্দ্ধারিত সময়ে নিঃশেষিত হয় না। উদ্বৃত্ত অর্থ ইংলণ্ডে গচ্ছিত থাকে।

সারলুবক বলেন যে উপনিবেশ গুলি ইংলণ্ডের দেওয়ানী আদালতে আপীল করিতে পারে। সেখানে প্রীভিকাউন্সিল রহিয়াছে, তাহার ব্যয় কোন উপনিবেশকেই প্রদান করিতে হয় না। ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের সহিত ইংলণ্ড নিজ ব্যয়ে যে সকল সৌহার্দ্দ সংস্থাপন করিয়াছেন; ভিন্ন ভিন্ন রাজসভায় ইংলণ্ড নিজ ব্যয়ে যে সমস্ত এজেণ্ট, রেসিডেণ্ট কিম্বা কন্সল্ নিযুক্ত রাখিয়াছেন, উপনিবেশগুলি বিনা ব্যয়ে তাহার ফলভোগ করিতেছে। ইংলণ্ডীয় ঔপনিবেশিক আফিসের (The Colonial Office) ব্যয় কোন উপনিবেশকেই প্রদান করিতে হয় না। এখন দেখা যাউক, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই সকল কথা কতদূর যথার্থ।

সার লুবক আপনিই স্বীকার করিয়াছেন, চীনদেশে যে ইংলণ্ডীয় রাজদূত আছেন, তাঁহার ব্যয় ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, পারস্য, জাঞ্জিবার এবং এডেন প্রভৃতি স্থলে যে সমস্ত এজেণ্ট কিংবা কন্সল নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগের ব্যয়ভার ইংলণ্ডকে,না ভারতবর্ষকে বহন করিতে হয় ? সময়ে সময়ে আফ্রিকা কিংবা আসিয়ার কোন রাজা ইংলণ্ডে গমন করিলে, তাঁহার সম্মানার্থে যে সমস্ত অর্থ ব্যয়িত হইয়া থাকে, তাহা ভারতের স্কন্ধে নিক্ষেপ করা ন্যায় শাস্ত্রের কোন্ সূত্রানুযায়ী, বলিতে পারি না। আর আফ্রিকার অসভ্যদিগের সহিত ইংলণ্ডীয় সংগ্রামের ব্যয়ভারই বা ভারতবর্ষ কেন বহন করে, তাহ

* Indian Politics by George Chesney ; First edition, page 451, These sums include the money spent on stones,

কে বলিবে ? পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, উল্লিখিত বর্ষত্রয়ের প্রতি মাসে ইংলণ্ড,ভারতবর্ষের ৫০০০০০০ পঞ্চাশৎলক্ষ টাকা করিয়া ব্যয় করিয়াছেন, এবং এই টাকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছে। অন্যান্য উপনিবেশ হইতে কিছুই প্রেরিত হয় না এবং ভারতবর্ষ ব্যয়ের টাকা প্রদান করে না, এ কথা কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে। সংবাদ পত্রে জ্ঞাত হওয়া যায়, এবার হোম গবর্ণমেণ্ট খরচের যে তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে এক খণ্ড বস্ত্রের নৌকা ভাড়া এবং পাথেয় ২০০০ দুই সহস্র টাকা লাগিয়াছে!

ভারতবর্ষ, চীন দেশস্থ ইংরাজ কন্‌সলের ব্যয় বহন করে ; এখন দেখা যাউক অন্যান্য উপনিবেশ, ভিন্ন দেশের ব্যয় ভার গ্রহণে কতদূর আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে। ১৮৭৪ সালে দেশীয় লোকদিগের প্রার্থনানুসারে এবং অষ্ট্রেলিয়ার আবন্ধে ইংলণ্ড, ফিজী দ্বীপপুঞ্জের শাসন ভার গ্রহণ করেন। ফিজী দ্বীপ নিতান্ত ক্ষুদ্রকায়, এবং দুর্ব্বল শরীর, স্বকীয় ব্যয়ভারবহনে সমর্থ হইল না। সুতরাং ইংলিশ পার্লিয়ামেণ্ট ১৮৭৫ সালে ৪০০০০০ চারি লক্ষ এবং ১৮৭৬ সালে ৩৫০০০০ সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ইংলণ্ডের ধনাগার হইতে প্রদান করিতে বাধ্য হয়েন। অষ্ট্রেলিয়া, চারি প্রধান উপনিবেশে বিভক্ত। লর্ড কারনারভন, উহার জন্য এই উপনিবেশ চতুষ্টয়ের প্রত্যেক হইতে প্রতিবর্ষে ৪০০০০ চল্লিশ সহস্র মুদ্রা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। পাঠক, বিশ্বাস করিবে ? নিউজিলণ্ডের প্রধান কর্ম্মসচিব উত্তর দিয়াছেন যে " মুক্তহস্ত হওয়া কোন গবর্ণমেণ্টেরই কর্ম্ম নহে, " " ফিজীদ্বীপপুঞ্জ ইংলণ্ডের অধীন হওয়াতে নিউজিলণ্ডের অনেক লাভ আছে বটে, কিন্তু ইংলণ্ডের লাভের নিকট নিউজিলণ্ডের লাভ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর *। "

এখন আয়র্লণ্ড সম্বন্ধে গুটীকত কথা বলা আবশ্যক। ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্টে আইরিস সভ্য আছেন। সুতরাং আয়র্লণ্ডের আভ্যন্তরিক শাসনের ভার শুধু ইংরাজের হস্তে নহে। আয়র্লণ্ড সহযোগীভাবে ইংলণ্ডীয় সাম্রাজ্যের শাসনকর্ত্তা। সুতরাং ভারতবর্ষ এবং আয়র্লণ্ডের অবস্থা সর্ব্বাংশে বিভিন্ন। ১৮২২ সালে আলুর ফসলের সাতিশয় ক্ষতি হওয়াতে আয়র্লণ্ডে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। পার্লিয়ামেণ্ট, সাধারণ কোষাগার উন্মুক্ত করিয়া আয়র্লণ্ডের সাহায্যার্থ ৩০০০০০০ ত্রিশ লক্ষ টাকা প্রদান করেন। এই উভয় রাজ্য একত্র সম্মিলিত এবং উভয়ের আয় এক ধনাগারে গচ্ছিত থাকে। সুতরাং একের ক্ষতি হইলে, অন্যের তাহা পূরণ করিতেই হইবে। এই দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে ইংলণ্ড উক্ত টাকা ব্যতীত আরও ২৬০০০০০ ছাব্বিশ লক্ষ টাকা চাঁদা করিয়া দিয়াছি-

* The Nineteenth Century no. I. vol, I, p. 41-42.

লেন। তাহার পর ১৮৪৫ সালে উক্ত কারণে পুনর্ব্বার তথায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এবার উহা ১৮৪৭ সাল পর্য্যন্ত প্রবল থাকে। এডিনবরা রিভিউ অনুসারে, সমগ্রদেশব্যাপি দুর্ভিক্ষ দমনের এমন মহৎ চেষ্টা আর ভূমণ্ডলে কস্মিন কালেও হয় নাই। এবার ইংলণ্ড চাঁদা করিয়া ৩৬০০০০০ ছত্রিশ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। উহা ব্যতীত গবর্ণমেণ্ট ৯৫০০০০০০ নয় কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ধার দিবার ক্ষমতা গ্রহণ করেন। গবর্ণমেণ্ট প্রতিদিন ত্রিশ লক্ষ লোকের আহার যোগাইয়াছেন। ইংলণ্ড প্রথমে আশা করিয়াছিলেন যে, সাধারণ ধনাগার হইতে যে টাকা প্রদত্ত হইল, আয়লণ্ড তাহা একদিন পরিশোধ করিবে। কিন্তু ১৮৫৩ সাল পর্য্যন্ত আইরিসদিগের কষ্টের শমতা হইল না। সুতরাং আবার সেই সালে ৪৫০০০০০০ চারি কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা আয়লণ্ডকে এক কালীন প্রদান করেন। * এই সমস্ত অলোকবিশ্রুতদয়ার কার্য্যে জগৎ ভরিয়া ইংলণ্ডের সুখ্যাতি হইয়াছে; এবং ইংলণ্ড এই খ্যাতি লাভের উপযুক্ত কার্য্যও করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষেও দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। ১৭৭০ সালের ভয়ানকদুর্ভিক্ষে বাঙ্গালার তৃতীয়াংশ লোক কালগ্রাসে পতিত হয়। যাহা হউক, সে সময়ে ইংরাজ বঙ্গদেশের নূতন অধিপতি; সুতরাং এই সকল লোকের মৃত্যুর জন্য তিনি দায়ী হইতে পারেন না।

তাহার পর উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ। এবারও কি বলিব যে, সহস্র সহস্র লোকের অকাল, ও অনাহারমৃত্যুর জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট নিন্দনীয় নহেন? সহস্র সহস্র লোক অনাহারে মরিল, চতুর্দ্দিকের হাহাকার রবে গগন বিদীর্ণ হইল; পিতা, পুত্র বিসর্জ্জন করিয়া, দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিল; মাতা মায়ার দুশ্ছেদ্যবন্ধন ছিন্ন করিয়া, শিশু পুত্রকন্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় জীবন রক্ষায় সচেষ্ট হইল; বৃদ্ধ পিতা মাতা অনন্ত শয্যায় শয়ন করিল; বালক-বালিকা, যুবকবৃদ্ধ কাক, কুকুর ও শৃগালের আহারীয় হইল; ক্ষেত্রের শস্য, বৃক্ষের পত্র, মাঠের তৃণ,—অগ্নি মূল্য—দুষ্প্রাপ্য হইল;——তখনও কি বলিব যে এই অদৃষ্টচর অশ্রুতপূর্ব্ব ভয়াবহ, শোচনীয় ঘটনার জন্য ব্রিটিশগবর্ণমেণ্ট নিতান্ত নিগ্রহনীয় নহেন? যে ইংরাজ জাতি আইরিস দুর্ভিক্ষের জন্য লক্ষ লক্ষ মুদ্রা অকাতরে ব্যয় করিলেন, স্বর্ণসিংহাসনারূঢ়া মহারাজ্ঞী হইতে শৃঙ্খলাবদ্ধ কারাবাসী পর্য্যন্ত যাবতীয় লোকের ব্যয় সঙ্কোচিত করিয়া, আইরিস জাতির সাহায্যের জন্য মুদ্রা সংগ্রহ করিলেন; সেই ইংরাজ জাতি—উড়িষ্যার হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ, মুমূর্ষুর কাতর-চীৎকারধ্বনি শ্রবণ করিয়া কোন্ প্রাণে বধিরপ্রায় নিরুত্তর রহিলেন? " উড়িষ্যা

* The Nineteenth Century no, 1, vol, I. p. 46.

বহুদূরস্থ ” এই যৎসামান্য উত্তরে ইংরাজ জাতির মস্তকহইতে যুগচেষ্টায় অনপনেয়, দুর্ব্বার্য্য কলঙ্ক কখনও অপনীত হইবে না। সমস্ত সভ্যজগৎকর্ত্তৃক ভূরি তিরস্কৃত হইয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা লাভ হইল, কিন্তু ইংলণ্ডের চেতনা হইল না। বেহারের দুর্ভিক্ষ আসিল। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এক মুদ্রার স্থলে শত মুদ্রা ব্যয় করিয়া উহার শমতার পক্ষে যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন; পরিণামে ঐ চেষ্টার সুফলও ফলিল। কিন্তু অগণিতসংখ্যক মুদ্রার অনর্থক ব্যয়ের নিমিত্ত কেহই দায়ী হইলেন না! পরিশেষে মান্দ্রাজ এবং বোম্বাইর বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষে দুচারি জন ইংরাজের দয়া হইয়া থাকিলেও গবর্ণমেণ্ট নীরব। কোন দিনও শুনিতে পাইলাম না যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট স্বকীয় কুবেরের ভাণ্ডারহইতে ভারতবর্ষের উপকারার্থ, উদ্ধারার্থ একটি কপর্দ্দকও প্রেরণ করিলেন। বরং যখন দৈবদুর্ব্বিপাকে সলিল ও অনিলাড়ম্বরে পূর্ব্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ নরনারী অকালে কালকবলিত হইল; যখন মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে সহস্র সহস্র লোক অনাহারে, অল্পাহারে জীবন বিসর্জ্জন করিতে লাগিল; যখন গবর্ণমেণ্ট রাজ্যের ব্যয়লাঘব করিয়া প্রজার জীবনরক্ষায় সচেষ্ট হইবেন বলিয়া সকলে অলীক আশার মোহমন্ত্রে মুগ্ধ হইতেছিল; তখন লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত করিয়া, বিশাল আড়ম্বরে, সমগ্রভারতে বিজয়ভেরী বিজয়দুন্দুভি নিনাদিত করিয়া, ইন্দ্রপ্রস্থের পূণ্যক্ষেত্রে ইংলণ্ডের একচক্রবর্ত্তিত্ব সংঘোষিত হইল। জীর্ণগ্রন্থি-অশ্রুপ্রান্তে দরবিগলিত অশ্রুধারা মুছিয়া, ক্ষুধা তৃষ্ণায় অস্থিরা, ব্যাধিপরিক্লিষ্টা ভারত, শীর্ণবাহু উত্তোলন করিয়া “মাতর্জ্জয়তু, জয়তু” বলিয়া ভারতেশ্বরীকে আশীর্ব্বাদ করিল *।

সার লুবক বলেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ভারতবর্ষকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কিছুই প্রদান করিতে হয় না। ইংলণ্ড নানা বিষয়ে যে প্রভূত অর্থ ব্যয় করেন, তাহাতে বহু উপকৃত হইয়াও ভারতবর্ষ অন্যান্য উপনিবেশের ন্যায় কিছুমাত্র আনুকূল্য করে না। ইংলণ্ডীয় কোন কৃষক কি করপ্রদাতা, ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের অধীন বলিয়া একটি পয়সারও স্বতঃ সাহায্য প্রাপ্ত হয়-

---

* গবর্ণমেণ্ট বলিতে পারেন যে, বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের জন্য ইংলণ্ড লোন খুলিয়া ভারতবর্ষকে অনেক টাকা প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। কিন্তু উপনিবেশের জন্য লোন খোলা ইংলণ্ড এই প্রথম কিম্বা নূতন করেন নাই। সার লুবক যে তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে জানা যাইতেছে যে, ১৮১৫ সাল হইতে ১৮৭৫ সাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ড ৭৮৯০০০০০ সাত কোটি আট লক্ষ নব্বই সহস্র টাকা উপনিবেশগুলিকে প্রদান করিয়াছেন। এই তালিকায় ভারতবর্ষের নাম উল্লিখিত হয় নাই।

না; কিম্বা সেই কারণে রাজকোষে এক পয়সাও ন্যূন রাজস্ব প্রদান করে না। সার লুবকের এই উক্তি দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ ভারতবর্ষ নিতান্ত অকৃতজ্ঞ; ইংলণ্ড হোমচার্জ্জে যে টাকা ব্যয় করেন, ভারতবর্ষ তাহার সাহায্য করে না; অথচ তাহা হইতে যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষ বিজিত দেশ; ইংরাজের অধীন। কিন্তু ইংলণ্ডের ধনাগারে রাজস্বস্বরূপ এক পয়সাও দিয়া থাকে না। প্রথম উক্তি যে নিতান্ত অযুক্ত,অগ্রাহ্য এবং অবজ্ঞেয় তাহা বলা বাহুল্য। প্রতি বৎসর অজস্রধারে কোটি কোটি টাকা প্রদান করিয়াও যদি কিছু মাত্র না দেওয়ার অপযশের ভাগী হওয়া যায়, তাহা হইতে দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? আমরা ইহার উত্তরে ইতিপুর্ব্বেই যথেষ্ট বলিয়াছি। যে তিন বৎসরের কথা আমরা জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে দেখা যায় যে, ইংলণ্ড প্রতিমাসে ৫০০০০০০ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এবং এই সমস্ত অর্থ দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। যদিও এই অর্থের কিয়দংশ ভারতবর্ষের স্থানীয় ব্যয়ে প্রযুক্ত হইয়াছে; তথাপি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষের জন্য ব্যয়িত টাকা ইংলণ্ড নিজ হইতে কদাপি প্রদান করেন নাই। নিঃস্বার্থ উপকার ইংলণ্ড, অন্যান্য উপনিবেশের প্রতি করিতেছেন; কিন্তু ভারতবর্ষের প্রতি নহে।

দ্বিতীয় উক্তিটি বিশেষ বুদ্ধিমত্তার সহিত লিখিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ অন্যান্য বিজিত দেশের ন্যায়, ইংলণ্ডের ধনাগারে রাজস্ব প্রদান করে না। ইংলণ্ডীয় লোক, ভারতবর্ষ হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন উপকার প্রাপ্ত হয় না। ভারতবর্ষ শাসনের মূলমন্ত্র এই যে, 'ভারতবর্ষের টাকা শুধু ভারতবর্ষের জন্যই ব্যয়িত হইবে।'[1] আমরা নিতান্ত বিস্মিত হইলাম যে, এই মূলমন্ত্রের উল্লেখ করিয়াও সার লুবক, ভারতবর্ষ কর দেয় না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রাচীন গ্রীশ-রোম প্রভৃতি রাজ্য সকল অধীনস্থ উপনিবেশ নিচয় হইতে কর গ্রহণ করিত। কিন্তু যে সময়ে ঐ সকল কর গৃহীত এবং প্রদত্ত হইত, সে সময় বহুকাল হইল অতীত হইয়াছে। তখন ইংরাজ বৃক্ষকোটরে বাস করিতেন, বল্কল পরিধান করিতেন, এবং তীরধনুদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। এখন আর সে দিন নাই। উনবিংশ শতাব্দী অতীত হইতে চলিল। যদি রোমগ্রীশ এবং বর্ত্তমান ইংলণ্ডে; খৃষ্ট জন্মের বহুপূর্ব্বসময় আর উনবিংশ শতাব্দীতে কোন প্রভেদ না থাকে, তবে বর্ত্তমান কালের সভ্যতা, ভব্যতা,নব্যতা আর পুরা কালের মূর্খতা, বন্যতা, ও স্থিরতায় প্রভেদ কি? কিন্তু রাজ্ঞীকুলললামভূতাভিক্টোরিয়ার এমত অভিলাষ নহে যে, ভা-

1 Second clause, Act 21 and 22, vict, caps 106.

রতবর্ষ, ইংলণ্ডকে কর প্রদান করে। দ্বিপঞ্চাশৎ প্রকরণে আদিষ্ট হইয়াছে, "যদি কোন স্থলে এমত বোধ হয় যে, ভারতবর্ষের আয়ের টাকা ভারতবর্ষের ন্যায্যব্যয় ভিন্ন, অন্য কোন বিষয়ে ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা হইলে অডিটর উক্ত বিষয় বিশদ করিয়া উল্লেখ করিবেন; ভারতবর্ষের টাকা শুধু ভারতবর্ষ শাসনের নিমিত্তই ব্যয় হইবে।" ভারতবর্ষের টাকা কি প্রকারে ব্যয় করিতে হইবে, তাহার এই স্পষ্ট নির্দ্দেশ রহিয়াছে। ইংলণ্ডের এই ঔদার্য্য ভারত কখনও ভুলিবে না, ভারতবাসী এ বিষয়ে ইংলণ্ডের এই স্বার্থশূন্যতা স্মরণ করিয়া চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকিবে।

'স্বতঃ' কিম্বা 'সাক্ষাৎ সবন্ধে' এই কথাটি ব্যবহার করিয়া সার লুবক সাধারণের চক্ষে মুষ্টি মুষ্টি ধুলি নিক্ষেপ করিয়াছেন। আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, ভারতবর্ষ লাভ করিয়া ইংরেজ যেরূপ সহস্র প্রকারে উপকৃত হইয়াছেন, ইংলণ্ডের আর সকলগুলি উপনিবেশ একত্র করিলেও তাহার সমান হইবে না। ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট ইংলণ্ড সংবৎসরে ২৫০০০০০০০ পঁচিশ কোটি টাকার পণ্য বিক্রয় করেন, এবং প্রতিবর্ষে যার পর নাই অল্প মূল্যে ৩০০০০০০০০ ত্রিশ কোটি টাকার ভারতবর্ষীয় দ্রব্যজাত ক্রয় করিয়া থাকেন। ১ এখন দেখা যাউক, আজ যদি ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের হস্তবহির্ভূত হয়, এই ত্রিশ কোটি টাকার বাণিজ্য দ্রব্য, বিশেষতঃ এত স্বল্প মূল্যে, ইংলণ্ড কোথায় পাইবেন? আর প্রতি বৎসর ভারতবর্ষ যে পঁচিশ কোটি টাকার ইংলণ্ডীয় দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া থাকে এই সমস্ত দ্রব্য ইংলণ্ড কোথায় চালাইবেন? এমন অবস্থা উপস্থিত হইলে, মানচেষ্টার, লিভারপুল, গ্লাশগো এবং ঈদৃশ অপরাপর সমস্ত স্থান একেবারে উৎসন্ন যাইবে; এবং নেপোলিয়ন কর্ত্তৃক সম্যক্ অভিহিত এই বণিক জাতির গৌরব চিরকালের তরে অস্তমিত হইবে। ভারতবর্ষে আজিকালি কৌশলচালিত কয়েকটি তন্তু ব্যবহৃত হইতেছে; এই সকল তন্তু মানচেষ্টারের চক্ষুঃশূল হইয়াছে। ভারতবর্ষ যদি আপনার বস্ত্র আপনি বয়ন করিতে আরম্ভ করিল, তাহা হইলে বিলাতি তন্তুবায়ের উপায় কি? সুতরাং তুলার শুল্ক উঠাইয়া দাও। এই শুল্ক থাকাতে ভারতবর্ষের দুইটি লাভ আছে। প্রথমতঃ, উহাতে ভারতের কএক কোটি টাকা আয় হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ যে রূপ নির্ধন দেশ, তাহাতে এই কয়েক কোটি টাকা তাহার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। মহাত্মা লর্ডনর্থব্রুক এই কারণ বশতঃই সেবার তুলার শুল্ক রহিত করেন নাই। সে দিন তুলা ব্যবসায়ী একজন বিলাতি বণিক লজ্জা দূরে পরিত্যাগ করিয়া অনায়াসে বলিলেন যে 'ভারতবর্ষের আয় কম হউক, তাহাতে

1 Catechism of the Indian suistion,an aricle of the Vanity, fairquoted in the Indian Mirror of the 6th June, 1877,

আমাদের কি? আমাদিগের ইচ্ছানুরূপ, লাভ না হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তজ্জন্য অবশ্য দায়ী।” দ্বিতীয়তঃ, এই শুল্ক থাকাতে বিলাতীয় বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। সহসা হয়ত অনেকে মনে করিতে পারেন যে, ইহাতে ভারতবর্ষীয় দিগেরই ক্ষতি; যে কাপড় দুই টাকা মূল্যে ক্রয় করা যাইতে পারিত, এই শুল্ক থাকাতে তাহা তিন টাকা মূল্যে ক্রয় করিতে হয়। কিন্তু একটুকু অভিনিবেশ সহকারে দৃষ্টিপাত করিলেই প্রতীয়মান হইবে যে, এই শুল্ক দ্বারা ভারতের যথেষ্ঠ লাভ হইতেছে। উহা বর্ত্তমান থাকাতে, বিলাতীয় বস্ত্র সমূহ অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। দেশীয় লোকের যত্নে এখন বোম্বাই প্রভৃতি ভারতবর্ষের কতিপয় স্থানে বস্ত্র বয়ন যন্ত্র সংস্থাপিত, হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই সমুদায়, স্থানে যে সকল বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে, সমষ্টিতে তাহার খরচ অনেক অধিক পড়িয়া থাকে। যদি এই শুল্ক উঠিয়া যাইয়া বিলাতি কাপড় আরও স্বল্প মূল্যে বিক্রীত হইতে আরম্ভ হয়, তাহা হইলে দেশীয় বস্ত্র বিক্রয় একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। ভারতবর্ষ পরমুখপ্রেক্ষী। স্বল্পমূল্য বিলাতি বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যে দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার করিবে এমন আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আয়র্লণ্ড বাসী গণ সভা করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে, যত দিন পর্য্যন্ত ইংলণ্ড বাণিজ্য বিষয়ে আয়র্লণ্ডকে স্বাধীনতা প্রদান না করেন, ততদিন তাঁহারা ইংলণ্ডীয় কোন দ্রব্যই ব্যবহার করিবেন না।

আজি মানচেষ্টারের ইচ্ছা স্বাধীন-বাণিজ্য প্রচার। মনুষ্য ঈশ্বরসৃষ্ট স্বাধীন জীব; সুতরাং স্বাধীনভাবে ব্যবসায় করিয়া সে যাহা লাভ করিবে, তাহাতে প্রতিবন্ধকতাচরণ কেন? স্বাধীনতা প্রার্থনীয়; তাই বলিয়া নির্জ্জীব মেষপালের মধ্যে সিংহ ব্যাঘ্রের স্বাধীনতা প্রদান সমিচীন বুদ্ধির কার্য্য নহে। স্বাধীন বাণিজ্য প্রচারের জন্য মানচেষ্টার আজি কালি এত ব্যতিব্যস্ত, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে মানচেষ্টারই এই উদার নীতি সূত্র পাদদলিত করিতে ক্রুটী করেন নাই। উক্ত শতাব্দীর শেষ ভাগে আয়র্লণ্ড যত কষ্ট ভোগ করিয়াছে, বোধ হয় পৃথিবীতে কোন যুগে কোন সভ্যদেশ এত কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করে নাই। এই উক্তি যে অযথাচিত্রিত নহে, যাঁহারা ঐ সময়ের আইরিস ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাহারা ইহা সবিশেষ অবগত আছেন। উপস্থিত প্রস্তাবের সহিত আয়র্লণ্ডের তদানীন্তন অবস্থার কোন বিশেষ সম্পর্ক নাই, সুতরাং আমরা তাহার বিস্তারিত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব না। কেবল একটি মাত্র কথা উল্লেখ করিব। ইংলণ্ডীয় উপনিবেশ দূরে থাকুক, বাণিজ্যের জন্য আইরিসগণ, লিনেন ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্য

ইংলণ্ডেও প্রেরণ করিতে পারিত না। স্বাধীনবাণিজ্যের জন্য আয়র্লণ্ড এই সময় অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু চিরস্বার্থান্ধ মানচেষ্টার এবং গ্লাসগো প্রভৃতি তাহাতে সম্মত হইল না। আজ স্বাধীনবাণিজ্য প্রচারের জন্য শুদ্ধ, শান্ত, নিরীহ ভদ্রলোকের ন্যায় মানচেষ্টার এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে,কিন্তু সে সময় আইরিস দিগের প্রার্থনায় কর্ণপাতও করিত না! * কিন্তু আয়র্লণ্ড ত আর ভারতবর্ষ নহে। হেনরি ফ্লড এবং হেনরি গ্রেটান আয়র্লণ্ডের প্রাতঃ স্মরণীয় নাম। ইহাঁদিগের প্রযত্নে অবশেষে আয়র্লণ্ডে এমন তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং জাতীয় সৌহার্দ্দ এত প্রবল হইয়া উঠে যে, ইংলণ্ড আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অচিরে স্বাধীনবাণিজ্যে আয়র্লণ্ডের স্বত্ব সংস্থাপিত হইল। যে সমস্ত উপায় আলোচনা করিয়া আয়র্লণ্ড ইংলণ্ডের নিকট হইতে এই স্বাধীনতা গ্রহণ করে,তাহা তৎসাময়িক আয়র্লণ্ডীয় ইতিহাসে অপায়নীয়। এখন দেখা যাইতেছে যে, বকব্রতী, বস্ত্রবিক্রেতা মাঞ্চেষ্টারের অন্ধ স্বার্থপরতা এই নূতন নহে †।

ইংলণ্ড আয়তনে অতি ক্ষুদ্র স্থান। কিন্তু এই ক্ষুদ্র স্থলে লোকের এত ঘন সমাবেশ যে, অধিকাংশকেই রাজকীয় পদের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট এত চাকুরী কোথা হইতে যোগাইবেন? কিন্তু এই চাকুরীর অভাবই ইংলণ্ডের গৌরবের প্রভাব। ভারতবর্ষীয়দিগের ন্যায় গবর্ণমেণ্টের মুখপ্রেক্ষী হইলে ইংরজ জাতি আজিও সভ্য জগতের অপস্তন পদবীতে বিচরণ করিতেন। চাকুরীর আশায় বঞ্চিত হইয়া অধিকাংশ লোকেই স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় অবলম্বন করে। সুতরাং শিল্প শাস্ত্রের যথেষ্ট অনুশীলন এবং বাণিজ্যের ভূয়সী উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে। কেবল বাণিজ্যের প্রভাবেই ইংলণ্ডের এত সম্মান, এত গৌরব, এবং এত প্রতাপ। কৌশল প্রয়োগ পূর্ব্বক বাণিজ্য অবলম্বন করিলেই তদুপযোগি দ্রব্যসামগ্রীর প্রয়োজন হয়। কিন্তু ইংলণ্ডে তাহা উৎপন্ন হয় না, যাহা হয় তাহাতে প্রকৃষ্ট রূপে বাণিজ্য কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে না। সুতরাং বিভিন্ন প্রদেশ হইতে দ্রব্যসামগ্রী আনয়ন করিতে হয়। আবার ইংলণ্ডে যে পরিমাণে বাণিজ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে,

---

* The Leaders of Public Opinion in Ireland by Lecky, pp. 81 83.

† প্রবন্ধের এই অংশ লিখিত হইলে রুটারের তাড়িত বার্ত্তাবহে জ্ঞাত হওয়া গেল যে,পার্লিয়ামেণ্ট অতি শীঘ্রই তুলার শুল্ক রহিত করিবেন, অঙ্গীকার করিয়াছেন! এই নিদারুণ সংবাদে আমরা একান্ত স্তম্ভিত ও মর্ম্মপীড়িত হইয়াছি। এতৎ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কিছু বলিবার বাসনা রহিল।

তাহা ক্রয় করিবার উপযুক্ত সংখ্যক লোক তথায় নাই। সুতরাং এই সকল পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ার্থ ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রেরণ করিতে হয়। বিগত আমেরিকার গৃহবিবাদের সময় তথায় ইংলণ্ডীয় শিল্পজাত দ্রব্য সমূহের বিক্রয় এক প্রকার বন্ধ হইয়া যায় এবং সেখান হইতে ইংলণ্ডে তুলার আমদানী সাতিশয় ন্যূন হইয়া পড়ে। শুধু এই তুলার অভাবেই সহস্র সহস্র ইংরাজ-পরিবার একবারে উৎসন্ন গিয়াছিল। যদি ভারতবর্ষীয় দ্রব্যসামগ্রী ইংলণ্ডের হস্ত বহির্ভূত হইয়া যায় এবং ইংলণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্য ভারতবর্ষ গ্রহণ না করে, তাহা হইলে ইংরাজের যে কি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হয়, তাহা এক্ষণ সহজেই অনুমিত হইতে পারে। সুতরাং ভারতবর্ষ, ইংলণ্ডের অধীনে থাকাতে ইংরাজের 'স্বত্ত' কোন উপকার হইতেছে না, এমন কথা মুখে আনিও না।

স্বাধীনভাবে যাহারা জীবিকানির্ব্বাহের উপায় অবলম্বন করে, তাহাদের সংখ্যা অধিক হইলেও বহু সংখ্যক লোক চাকুরীর প্রত্যাশা করিয়া থাকে। এত চাকুরী ইংলণ্ডে নাই, সুতরাং ভিন্ন দেশে ইহার চেষ্টা করিতে হয়। কিন্তু সকলেই আপনার সুযোগ অন্বেষণ করে। ভিন্ন স্বাধীন দেশ; স্থানীয় লোক পরিত্যাগ করিয়া কেন ইংরেজকে চাকুরী প্রদান করিবে? সুতরাং যেখানে দেশীয় লোকের আপত্তি করিবার ক্ষমতা নাই, সেই স্থানেই বিষয় কর্ম্মের অন্বেষণ করিতে হয়। উপনিবেশ ভিন্ন এমন স্থান আর কোথাও নাই। ইংলণ্ডে থাকিয়া যাহাদের দৈনিক অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করাও নিতান্ত কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে, তাহারা উপনিবেশে আগমন করে; এবং যথেষ্ট সঞ্চিত করিতে পারিলেই পুনর্ব্বার স্বদেশে প্রস্থান করে। কোন্ কোন্ উপনিবেশ এইরূপে ইংলণ্ডের অতিরিক্ত লোকদিগকে চাকুরী প্রদান করিয়া থাকে, এখন তাহার আলোচনা করা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে।

কানেডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলণ্ড প্রভৃতি প্রধান প্রধান ইংলণ্ডীয় উপনিবেশগুলির আভ্যন্তরিক শাসনের ভার ইংরাজের হস্তে নহে। ঐ সকল স্থলে ভিন্ন ভিন্ন পার্লিয়ামেণ্ট সংস্থাপিত আছে। সুতরাং তত্তৎস্থানীয় সমস্ত রাজকীয় পদের নিয়োগ প্রয়োগের ভার স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। তাহারা স্ব স্ব অভিলাষানুসারে আপনাদিগের মধ্য হইতে উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচন করিয়া, রাজকার্য্যে নিয়োগ করিয়া থাকে। ইংলণ্ডের হস্তে কেবল গবর্ণর মাত্র নিযুক্ত করিবার ভার রহিয়াছে। এই সকল গবর্ণর আবার স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনভিমতে কোন কার্য্য করিতে পারেন না। সুতরাং এই সকল স্থানে রাজসংজ্ঞা ধারণ এবং গবর্ণর নিয়োগ ব্যতীত ইংলণ্ডের অন্য কোন ক্ষমতা নিতান্ত বি-

বল ।* বলা বাহুল্য যে, ইংলণ্ডের অতিরিক্ত লোক, এই সমস্ত উপনিবেশে অতি অল্প চাকুরীই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তবে ইহারা কোথায় যায়? যেখানে দেশীয় লোকদিগের কোন বিষয়ে আপত্তি নাই, রাজকীয় কর্ম্মচারীনিয়োগপক্ষে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার কোন ক্ষমতা নাই; থাকিলেও তাহা অগ্রাহ্য, এমন কোন স্থান বর্ত্তমান আছে কি না?

আছে; সে এই হতভাগ্য ভারতবর্ষ। যে সময়, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কেরানী হইয়া ইংরাজ ভারতবর্ষে আগমন পূর্ব্বক পরিশেষে গবর্ণর পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছেন, তাহার কথা বলিব না। যে সময়, ছুরি কাঁচী বিক্রয় করিতে আসিয়া ইংরাজ নবাব হইয়া দেশে প্রতিগমন করিতেন, সে সময়ের কথা বলিব না; তখন ত বিশ্বাস ছিল যে, ভারতবর্ষের উর্ব্বরা ক্ষেত্রে মুদ্রাপ্রসবী বৃক্ষবিশেষ উৎপন্ন হইয়া থাকে; একটুকু বল প্রয়োগ পূর্ব্বক আলোড়ন করিলেই কোষ পরিপূর্ণ করা যায়। লর্ড করণওয়ালিশ, গবর্ণমেণ্টের চাকুরী হইতে দেশীয়দিগকে একবারে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় দেশীয়েরা অতি উপযুক্ত হইলে পঁচিশ টাকা বেতনে দারোগার পদ পাইতে পারিত। করণওয়ালিশের কথাই বা কেন বলি? বর্ত্তমান সময় দেখ। রাজ্যশাসন সংক্রান্ত সমস্ত প্রধান প্রধান কর্ম্ম ইংরাজের হস্তে। দেশীয় লোকের তাহা প্রাপ্ত হইবার আশা, বিড়ম্বনা মাত্র। দেশীয় লোক, প্রধান প্রধান কার্য্য সুচাকরূপে নির্ব্বাহ করিতে আজিও সম্যক শিক্ষা লাভ করে নাই! ভারতহিতৈষী সুরেন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন যে, শতবর্ষ ইংরাজের অধীনে থাকিয়া, ইংরাজের দৃষ্টান্ত দেখিয়া, ইংরাজীশিক্ষা ইয়ুরোপীয় সভ্যতা অভ্যাস করিয়াও যদি ভারতবর্ষীয় লোক রাজ্যশাসন শিক্ষা করিতে পারিল না, তবে এ অপরাধ কাহার? এ রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ কে করিবে? গবর্ণমেণ্টের কার্য্য প্রণালীতে অবশ্যই কোন বিশেষ দোষ আছে; তাহা না হইলে সভ্যতম জাতির অধীনে থাকিয়া,—শ্রেষ্ঠতম শাসনপ্রণালীর অনুবর্ত্তী হইয়া—সূক্ষ্মবুদ্ধি, প্রতিভাশালী ভারতবর্ষীয় লোক আত্মশাসন শিক্ষা করিতে পারিল না কেন? যদি কখনও গবর্ণমেণ্ট উদারতার বশবর্ত্তী হইয়া কোন প্রসন্নভাগ্য দেশীয়কে উচ্চপদে নিয়োগ করেন, তাহা হইলে অমনি পরশ্রীকাতর সিবিল মণ্ডলীর মস্তকে বজ্রসম্পাত হয়। বিজাতীয় আগন্তুকের সমাগমে স্বজাতীর লাভের ক্ষতি আশঙ্কা করিয়া, দলবদ্ধ হইয়া বিকট চীৎকার আরম্ভ করেন। গবর্ণমেণ্ট সাহসী হইলে, তাঁহাদিগকে নীরব করিতে পারিতেন; কিন্তু তত দূর সাহস নাই; সুতরাং আদরে, মিষ্টবাক্যে গাত্রে হস্ত প্রলেপ করিয়া তাঁহাদিগকে শান্ত করিয়া রাখেন।

*Froudes' Short Studies on great subject second series, First Edition," P,157,

আবার দেখ, এই সকল ইংরাজ ভারতবর্ষে আসিয়া কি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইতেছে! কএক মাস অতীত হইল, ভারতবন্ধু ষ্টেটসম্যান যে সকল তালিকা প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে কাহার না প্রত্যয় হইবে যে, ইংরাজ এদেশের অর্থ লোষ্ট্রবৎ আহরণ করিতেছে? রাজকর্ম্মচারীগণ, পৃথিবীর কোন দেশেও এত অধিক পরিমাণে বেতন পাইয়া থাকেন না। কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষতিতে কাহার শোক? দেশীয় লোকের হাহাকার কে শ্রবণ করিবে? দেশীয় লোকের স্বাভাবিক স্বত্বে কে আস্থা প্রদর্শন করিবে? যত পার গ্রহণ কর, মাটির দিকে ফিরিয়া চাহিও না। ব্যয় অধিক হইতেছে বিবেচনা হয়, কএক জন দপ্তরীর বেতন কমাইয়া দাও। অথবা দিল্লী কালেজ উঠাইয়া দাও। কিন্তু কোন ক্রমেই যাঁহারা সহস্র সহস্র টাকা বেতন পাইতেছেন, তাঁহাদিগের একটি পয়সাও কমাইও না! ইংলণ্ডের উদারতা এবং স্বার্থরাহিত্য এমনই প্রশস্ত! সত্যের প্রতি অণুমাত্রও অনুরাগ থাকে ত বলিও না—ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের অধীনে থাকাতে ইংরাজের "স্বতঃ" কোন উপকার হইতেছে না।

রাজ্যের সমস্ত প্রধান প্রধান পদ, অলৌকিক, অপার্থিব বেতন সংযুক্ত হইয়া ইংরাজের হস্তে প্রদত্ত হইয়াছে, আবার ষ্টেটসেক্রেটারী কর্ত্তৃক নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হওয়াতে উচ্চপদপ্রবেশের একমাত্র দ্বারস্বরূপ সিবিল সার্ব্বিস, দেশীয়দিগের পক্ষে সম্পূর্ণ রূপে দৃঢ় অর্গলিত হইয়াছে। কিন্তু কে বলিবে যে তাঁহার হৃদয়ে করুণা নাই? কে বলিবে, তিনি প্রজার লাভালাভ বুঝেন না? কে বলিবে তাঁহার হৃদয় পাষাণ?—যখন দেখিলেন, যে নখরেখায় পরিগণনীয় কএক জন ইংরাজপুত্র একবিংশতি বর্ষ বয়ক্রমের সময় সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইল (!)—যখন দেখিলেন যে, ইহাদিগের আর উপায়ান্তর নাই, একবিংশতি বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া এবৃদ্ধ বয়সে ইহারা কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সক্ষম হইবে না,—দয়ার শরীর, অমনি হৃদয়-উদ্বেগ-সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। যাও তোমরা, ঊনবিংশ বৎসর পর্য্যন্ত এ পরীক্ষার সীমা নির্দ্দিষ্ট হইল, তখনও যদি কৃতকার্য্য না হও, তবে অন্য চেষ্টা করিবার যথেষ্ট সময় থাকিবে; আর যদি কৃতকার্য্য হও, তবে হে অপোগণ্ড, অজাত শ্মশ্রু ইংরাজশিশু, ভারতের রাজ্য ভার গ্রহণ কর। দেশীয় লোকেরা যে সকল আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছিল, তাহাতে কর্ণপাত করিবার, কিছু মাত্র আবশ্যকতা নাই। বিংশতি কোটি লোকের ঊর্দ্ধ্বাস্ত, গলদশ্রু ক্রন্দন, আবাহন, সম্বোধন ভারতের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতার প্রশস্ত কর্ণে প্রবেশ করিল না! দয়ার মহত্বে, উদারতার নিঃস্বার্থতায় যাঁহার হৃদয় নিয়ত বিগলিত

হইতেছে, যিনি ভারতের সুখ স্বচ্ছন্দতার নিমিত্ত শান্তি, সভ্যতার নিমিত্ত অবিরত চিন্তান্বিত রহিয়াছেন,—তাঁহার গদ্গদ হৃদয়ে বিংশতি কোটি লোকের যুগপৎ প্রার্থনা স্থান পাইল না !!!

এই নব প্রতিষ্ঠিত নিয়ম যে কেবল ভারতবর্ষীয় দিগেরই ইচ্ছা এবং স্বার্থের বিরুদ্ধ তাহা নহে। ইহা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে স্কটলণ্ড এবং আয়র্লণ্ড দূরে থাকুক, অক্সফোর্ড ও কাম্ব্রিজ ভিন্ন ইংলণ্ডীয় অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয় গুলিরও সমূহ অনিষ্ট সাধিত হইবে। এসম্বন্ধে গত ২৪শে জুন তারিখের অধিবেশনে ডাক্তার প্লেফেয়ার পার্লিয়ামেণ্টে যে কএকটি কথা বলিয়াছেন, আমরা তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিতেছি। যে সময় ভারতবর্ষীয় সিবিল সার্ব্বিসের দ্বার উন্মুক্ত হয়, তখন গবর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে "উপযুক্ত হইলে রাজ্যের (গ্রেট ব্রিটনের) সকল স্থানের সকলেই ইহাতে প্রবেশ করিতে পারিবেন; প্রবর্ত্তিত নিয়ম গুলি কোন রূপে কাহারও সম্বন্ধে পক্ষপাত করিবে না।" কিন্তু এই নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হওয়াতে স্কটলণ্ডীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, আয়র্লণ্ডস্থ কুইন্স কালেজনিচয় এবং লণ্ডন ও মফঃস্বলে এই প্রকার যে সকল কালেজ প্রতিষ্ঠিত আছে, সে গুলি কার্য্যতঃ বহিঃক্ষিপ্ত হইবে। কেননা এত অল্প বয়সে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার চেষ্টা কার্য্যার্থী দিগের পক্ষে সবিশেষ অপকার জনক। নূতন নিয়ম অনুসারে দুইটি প্রধান প্রথার প্রচলন হইবে। প্রথম কার্য্যার্থীর বয়স ১৯ বৎসরের অনধিক হওয়া আবশ্যক; দ্বিতীয়, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাহাদিগকে সিবিল সার্ব্বিস কমিসনর দিগের অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়বিশেষে অন্ততঃ দুই বৎসর কাল অধ্যয়ন করিতে হইবে। কর্ম্মার্থীর বয়স ২১ হইতে ১৯ বৎসরে পরিবর্ত্তিত করা সম্বন্ধে ষ্টেট সেক্রেটারী, ভারতবর্ষস্থ জজ, কৌন্সিলের মেম্বর, গবর্ণর ও সিবিল সার্ব্বিস কমিসনর হইতে প্রধান প্রধান ১১০ জন উপযুক্ত লোকের মত চাহিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে ৯৫ জন বয়স ন্যূন করার বিরুদ্ধে এবং শুধু ১১ জন মাত্র তাহার সপক্ষে মত প্রদান করেন *। সিবিল সার্ব্বিস কমিসনরগণও ইহার বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন যে, পূর্ব্ব প্রথানুসারেই কার্য্য সুন্দররূপ চলিতেছে। লর্ড সালিসবরী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নূতন প্রথার পক্ষপাতী; এ কথাও সম্পূর্ণ যথার্থ নহে।

* এই ১১০ জনের মধ্যে ৪১ জন পূর্ব্ব নিয়ম, অর্থাৎ ২১ বৎসর স্থির রাখার জন্য, মত দিয়াছিলেন; ৪১ জন ২১ হইতে ২২ বৎসরে বৃদ্ধি করিবার জন্য ১৩ জন, ২০ বৎসর করিবার জন্য মত প্রদান করেন। কেবল ১৫ জন, মাত্র সালিসবরী প্রবর্ত্তিত ১৯ বৎসরের অভিপ্রায় দিয়াছিলেন।

সমস্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ১০টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে; তাহার মধ্যে শুধু অক্সফোর্ড বয়স ন্যূন করা উচিত বিবেচনা করিয়াছেন, অবশিষ্ট নয়টি কোন উত্তর প্রদান করেন নাই। কেন যে অক্সফোর্ড মত দিয়াছেন, তাহা প্লেফেয়ার প্রদর্শন করিয়াছেন; আমরা বাহুল্য ভয়ে তদ্বিষয়ে অধিক কিছু বলিব না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে ভারতবর্ষের বিংশতি কোটি লোকের স্বার্থ, সুবিধা এবং ইচ্ছা সালিসবরীর মনে একবারও উদিত হইল না। স্কটলণ্ড, আয়র্লণ্ডের অসুবিধাও কোন ফলদায়ক হইল না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ষ্টেটসেক্রেটরীর এমনই অখণ্ড প্রতাপ, অথবা যাঁহাদিগের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করা তাঁহার পক্ষেও নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাঁহাদিগের প্রতাপ এমনই অলঙ্ঘ্য যে, লর্ডসালিসবরী কাহারও কথায় কর্ণপাত করা উচিত বিবেচনা করিলেন না। অণ্ডর সেক্রেটরী লর্ড জর্জ্জ হামিল্টন, প্লেফেয়ারকে যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহা নিতান্ত অব্যবস্থিতচিত্ততা পরিচায়ক এবং কৌতুকজনক। এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন যে,ষ্টেট সেক্রেটরী ভারতবর্ষের মঙ্গলার্থই এই নূতন নিয়ম প্রচলিত করিয়াছেন!! স্তাবকতার সীমা কতদূর,তাহা মানব সমাজে আজিও স্থিরীকৃত হয় নাই। সিবিল সার্ব্বিস সম্বন্ধে আজিকালি এদেশে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে; প্রতি জনপদে এই বিষয়ের আলোচনার জন্য সভা সংস্থাপিত হইতেছে, প্রতি সংবাদ পত্র, দেশীয় প্রতি সুশিক্ষিত যুবক ইহার সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করিতেছেন; সুতরাং আমরা এতৎ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিব না।

সিবিল সার্ব্বিস সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ডাক্তারি সম্বন্ধেও সেইরূপ অনেক কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু প্রবন্ধের অতি বিস্তৃতিদোষপরিহারবাসনায় তাহা হইতে বিরত হওয়া গেল। বিলাতে কুপারস্ হিল কালেজ সংস্থাপিত হইয়াছে, বায়, ভারতবর্ষের। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সমস্ত প্রধান পদ ঐ কালেজের উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে প্রদত্ত হইতেছে। প্রতি বৎসর যত লোক উত্তীর্ণ হইতেছে, ভারতবর্ষে তত কার্য্য নাই। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট চাকুরী দিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। অথচ রুরকী এবং কলিকাতা কালেজ হইতে গবর্ণমেণ্ট চাকুরী প্রদানের প্রতিশ্রুতি উঠাইয়া দিবার যত্ন করিতেছেন। এদেশের কালেজে দেশীয় লোক উত্তীর্ণ হয়, সুতরাং তাহারা কার্য্য প্রাপ্ত হইলে কুপারস্ হিলের উপায় কি? ভারতসম্বন্ধে এমনই সুবিচার! আমরা সুখী হইলাম, বঙ্গদেশের বর্ত্তমান লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর, কুপারস্ হিলের প্রতি তীব্রমন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। বাস্তবিক, কি সিবিল সার্ব্বিস, কি ইঞ্জিনিয়ারিং, কি ডাক্তারি, কি পোষ্টাফিস, কি জঙ্গল বিভাগ, কি রেলওয়ে, কি শিক্ষা বিভাগ,—সকল বিভাগেই দেশীয় লোকের উচ্চ

আশা স্থাপন করা বৃথা। বর্ত্তমান সময়ে গবর্ণমেণ্টের কিছু সুদৃষ্টি দেখা যাইতেছে, কিন্তু ভারতের অদৃষ্ট পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে এই সুদৃষ্টি কার্য্যতঃ কতদূর ফলদায়ক হইবে বলা যায় না।

দুর্ভাগ্যক্রমে অদ্য আমরা ভারতীয় ইংরাজ ইতিহাসের কলঙ্কময় পরিচ্ছেদ পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছি বলিয়া, কেহ এমন বিবেচনা করিবেন না যে, আমরা ইংরাজবিদ্বেষী অথবা ইংরাজ ভারতের যে শত সহস্র উপকার সংসাধন করিতেছেন, তাহা বিস্মৃত হইয়াছি। ইংরাজ ইতিহাসে অকলঙ্ক, উজ্জ্বলতর এক পরিচ্ছেদও রহিয়াছে; তাহা অতি বিস্তৃত এবং সম্যক প্রশস্ত। যদি সে ভাগের পর্য্যালোচনা করিতে আরম্ভ করিতাম, তাহা হইলে প্রবন্ধের প্রতি পংক্তি স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত করিতাম; অভিধান তন্ন তন্ন করিয়া, শ্রুতিসুখকর মনোহর শব্দ সংগ্রহ করিয়া, স্তুতি গীত গাইতাম; এবং শাসনের অধীনে থাকিয়া জাতি-কুল-ধন-মান রক্ষা করিয়া শান্তিসুখ ভোগ করিতেছি, লেখক পাঠকে একত্র সম্মিলিত হইয়া জলদগম্ভীরস্বরে যুগপৎ তাহার প্রশংসাবাদে প্রবৃত্ত হইতাম। কিন্তু তাহা বলিয়া সত্যের অপলাপ করিতে পারি না। ভারত হৃদয়ের দগ্ধাংশ আমরা শ্যামলদুর্ব্বাদলপরিশোভিত করিয়া রঞ্জিত করিতে পারি না; সে অন্ধকারে শারদ চন্দ্রমার মধুর প্রফুল্ল হাসি আঁকিতে পারি না। বুদ্ধি দিয়াছ, জ্ঞান দিয়াছ, শান্তি দিয়াছ, সভ্যতা দিয়াছ, আরও দিতে হইবে। ভারত যদি অন্ধ থাকিত,তবে ইহাতেই পরিতৃপ্ত হইত। কিন্তু চক্ষু উন্মিলীত করিয়া দিয়াছ, ভারত কেমন করিয়া নীরব থাকিবে? সেই জন্যই আরও চায়; সেই জন্যই জিজ্ঞাসা করে—আজিও ভারতশাসনে এই সকল কলঙ্ক কেন? আজিও কেন রাজ্যের প্রধান প্রধান কার্য্যে দেশীয় লোকনিযুক্ত হয় না? আজিও কেন বর্ণবৈচিত্র পরিহার হইল না?

এই সকল প্রশ্নের এই কি উত্তর—ভারতবর্ষ জনশূন্য গহন অরণ্য ছিল না, ভারতে মনুষ্য বাস করিত। মানুষ ছিল; কিন্তু তাহারা আফ্রিকার কৃষ্ণকায়, কুঞ্চিতকেশ, সমতলনাসিক,উন্নত চিবুক, স্থূলবিলম্বি-অধরযুক্ত নিগ্রো কিংবা আমেরিকার উৎকট নাম, বিকটমূর্ত্তি, রঞ্জিতদেহ, মনুষ্যভোজী এসকুইমক্স ছিল না। তাহাদের অপরাধ এই যে, তাহারা ধনে মানে, ধর্ম্মে কর্ম্মে, সাহসে উদ্যমে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে, আচারে ব্যবহারে, সৌজন্যে আতিথ্যে একদা সমগ্র ভূমণ্ডলে সর্ব্বজনপূজ্য ও সর্ব্বাগ্রগণ্য ছিল। তাহাদের অপরাধ এই যে, তাহারা জ্যোতিষে গণিতে, কাব্যে নাটকে, সঙ্গীতে সৌহার্দ্দে, সামাজিকতায় চিকিৎসাবিদ্যায় জগতের শিক্ষাদাতা ও দীক্ষাগুরু ছিল।—অপরাধ এই যে, অপ্রমিত শৌর্য্যবীর্য্য সহকারে তাহারা সময়ে স-

ময়ে দুর্দ্ধর্ষ, দুর্ব্বাধ্য ইংরাজসৈন্যগণকে ক্ষুদ্র মেষপালের ন্যায় * দলে দলে বিতাড়িত ও বিপর্য্যস্ত করিয়াছে ।—আমরা যদি বলগারিয়া কিম্বা হার্জিগোবিনিয়াতে বাস করিতাম, তাহা হইলে এই সকল কারণে বিশ্বাস করিতাম ; কিন্তু উন্নত ঊনবিংশ শতাব্দীর উন্নততম জাতির অধীনে অবস্থিতি করিয়া কিরূপে এই সকল অকিঞ্চিৎকর কারণে বিশ্বাস করিব ? ইংলণ্ড ! যে সাম্রাজ্যের উন্নত রাজমুকুট মস্তকে ধারণ করিয়া আজ জগতে এত মহিমান্বিত, এত আদৃত, এত সম্মানিত, এবং এত যশস্বী হইয়াছ ; যে রাজ্য হস্তচ্যুত হইলে এক মুহূর্ত্তেই তোমার সমস্ত রাজগর্ব্ব, রাজমহত্ব ছার খার হইয়া, স্পেন, পর্টুগাল, হলণ্ড, বেলজিয়ম প্রভৃতির সমতলবিরাজী হয় ; সে মহা সাম্রাজ্যের হৃদয়ে ব্যথা দিও না ; জগতে অতুল্য, সে অমূল্য মহানিধি কোহিনুরকলঙ্কলাঞ্ছিত করিও না ।

ভারতবর্ষ হিন্দুস্থান, হিন্দুর আবাস ভূমি ; আমরা কুগ্রহের কোপদৃষ্টিতে বিশ্বাস করি । অদৃষ্টচক্রের স্বাভাবিক আবর্ত্তনে আজি ভারতে কোন কুগ্রহের বিষদৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে ; শনৈশ্চরের নির্ম্মম নিষ্পীড়নে ভারত জর্জ্জরিত হইতেছে ; কিন্তু নিরাশ হইও না, শনির কূটমন্ত্রপ্রভাব শীঘ্রই তিরোহিত হইবে ; ভারতভাগ্যে সুরগুরু বৃহস্পতির শুভমন্ত্রণা স্থান পাইবে ! !

* অবিশ্বাস হয়, কে সাহেবকৃত সিপাহীবিদ্রোহের ইতিহাস, দ্বিতীয়খণ্ড ৪১৯ পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখ !

রণরঘুর প্রলাপ ।

চেষ্টা ;—তিন জন ।

শেষ রাত্রি ; এখন গাঢ় নিদ্রার সময় । এখন দুগ্ধপোষ্য শিশুর স্তন্য মনে থাকে না, প্রসূতীর সন্তান মনে থাকে না, একপ্রাণ দম্পতি পরস্পরকে ভুলিয়া যায়— এমন সময়ে ঘরে আগুণ লাগিলে একবারেই সর্ব্বনাশ ! এইরূপে সশঙ্কে অগ্নির দিকে অগ্রসর হইতেছি, আর যত চটপট শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে, ততই অন্তরের ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পাইতেছে । উৎকণ্ঠায় দৌড়িলাম ।

গ্রামে পৌঁছিয়া দেখি, অগ্নি অন্ধকারকে বিদ্রূপ করিয়া ভীষণ-স্বননে বিরাট-

মূর্ত্তির গরিমা দেখাইতেছে। উচ্চে, অগ্নির আনীল অযুতজিহ্বার স্পর্শ অতিক্রম করিয়া, স্তূপে স্তূপে উদ্গাম্যমান ধূমপুঞ্জ আকাশ ছাইয়া ফেলিতেছে; আর সেই নিবিড় ধূমজাল বিচ্ছিন্ন করিয়া উল্কাকারে স্ফুলিঙ্গের পর স্ফুলিঙ্গ অবিরাম গতিতে দূরশূন্যে উঠিয়া দূরস্থিত গৃহের চূড়ায় গিয়া পড়িতেছে। দূরে, নিকটে, সকল গৃহই ক্রমে ভস্মীভূত হইতেছে। গ্রামে ইষ্টকরচিত গৃহ নাই বলিলেই হয়, ঘন বসতি, তাহার প্রায় সমস্তই তৃণাচ্ছাদিত মাটীর ঘর। সুপ্তোত্থিত সকলেই হতবুদ্ধি, অধিকাংশই নিরুদ্যম; কেহ হাহাকার করিতেছে; আর সমুদয়ে মিশিয়া অমানুষ এক কোলাহল উঠিতেছে। যাহারা উদ্যমশীল, তাহারাও উপকারে আসিতেছে না; কেহ অসাধ্যসাধন করিতে গিয়া আপনাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিতেছে। কেহ দৌড়িতে গিয়া পড়িয়া যাইতেছে, কাহারও পরিধেয় খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে। বিলুপ্ত গণ্ডরাগ নরনারীর তৎকালীন বিকট পাংশুবর্ণে সেই স্থানকে শ্মশানভাবে পরিব্যাপ্ত করিতেছে।

যেখানে এখনও আগুণ লাগে নাই, সেখানে যদি কাহারও কোন উপকার করিতে পারি এই ভাবিয়া, যে দিকে অগ্নির বেগ, আমি সেই দিকে দৌড়িলাম। বড় অধিক দূর যাইতে হইল না।

একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর তীরে—আগুণ এখনও এত দূর আইসে নাই—অনেক স্ত্রী পুরুষ দাঁড়াইয়া, অথচ সকলেই চঞ্চল। আর, লেপ কাঁথা, সিন্দুক পেটরা, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, হাঁড়ি কলসী, শিল যাঁতা, বঁটি কাটারী,—সংক্ষেপে বলি, ধনধান্যপূর্ণ বঙ্গদেশের সুখধাম পল্লীগ্রামে সান্ন গৃহস্থের যাহা কিছু আছে সমুদয় সেই পুষ্করিণীতটে রাশীকৃত।—রক্তলোলুপ রাজার, রক্ষকরূপী সর্ব্বভক্ষ রাজকর্ম্মচারীর, বিচার-বিক্রয়ী ধর্ম্মাবতারের, অর্থি-বন্ধুরূপী রাজানুমোদিত প্রবঞ্চকের, বিজাতীয়শিক্ষাপ্রবীণ সজাতীয় চিকিৎসকের, দুর্ভিক্ষের, মহামারির, লিবারপুলের, মানচেষ্টরের, কুইনাইনের ভুক্তাবশিষ্ট যাহা কিছু আছে, এই পুষ্করিণীর তীরে সমুদয়ের প্রদর্শন হইয়াছিল। তখন অশ্রুমোচনের সময় নাই, অথবা নেত্রে আর অশ্রুই নাই, সেই জন্য তখন কাঁদা হইল না; প্রাণ একবার কাঁদিয়া উঠিলেও আমি কাঁদিলাম না।

আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র একজন বৃদ্ধ বলিয়া উঠিল 'সাবিত্রি! মা, ঐ দেখ গোয়ালের চালে আগুণ পড়্‌ল। কি হবে? গোরু——'

আর বুঝিতে পারিলাম না; কথা কহিতে কহিতে বৃদ্ধ অগ্নির দিকে যথাশক্তি দৌড়িতে লাগিল।

তাহার পশ্চাতে রমণীকণ্ঠ রজততন্ত্রে অমৃততরঙ্গ—সভয়, কাতর, সকম্প; "বাবা তুমি যেও না; বাবা, আমি যাই, তুমি —"। রমণীও দৌড়িতেছে।

আমার কর্ত্তব্য কি, মন তাহা বলিয়া দিল। বৃদ্ধ ও তরুণীর পশ্চাতে আমিও দৌড়িলাম।

গোগৃহের শীর্ষস্থান জ্বলিয়া উঠিল, বৃদ্ধ গৃহমধ্যে; একটি গাভী বেগে বাহিরে আসিল, কিন্তু চকিত হইয়া আবার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল; তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সাবিত্রীও সেই জ্বলন্ত হুতাশনে যেন ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। একটি নবপ্রসূত বৎস ছুটিয়া আসিল, পশ্চাতে তাহার প্রসূতী; আর সেই গাভীর রজ্জু ধরিয়া বৃদ্ধ যেমন বাহিরে আসিতেছেন, আরও দুই তিনটি গাভী সলম্ফে বাহিরে আসিতে গিয়া বৃদ্ধকে ধরাশায়ী করিল, একটা তাঁহার উপর পাড়াইয়া গেল, এবং তিনি যে রজ্জু ধরিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া পায়ে জড়িয়া যাওয়াতে তিনি তদবস্থায় সবলে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন।

বৃদ্ধকে সেই বিপদ হইতে মুক্ত করিতেছি, এমন সময়ে গোগৃহাভ্যন্তর হইতে "বাবা গো!" এই চীৎকার আমার কর্ণে প্রবেশ করিল, সঙ্গে সঙ্গে একখান জ্বলন্ত চাল গৃহের সম্মুখ ভাগ ব্যাপিয়া ভীষণ শব্দে পড়িল। বৃদ্ধ তখন মূর্চ্ছিত, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে রুধির বহির্গত হইতেছে, তথাপি তাঁহাকে টানিয়া একটু দূরে রাখিয়া সেই আগুনের উপর দিয়া সলম্ফে গৃহ মধ্যে পড়িলাম। সাবিত্রীও মূর্চ্ছাগত। গোসেবার নিমিত্ত কতকগুলি বৃহৎ মৃৎপাত্র ছিল, পদাঘাতে তাহা খণ্ড খণ্ড করিলাম; এবং দ্বার দিয়া আগুনের উপর সেই গুলা ফেলিয়া দিলাম। সাবিত্রীকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া কিঞ্চিৎ সাবধানে অথচ ত্বরিতে বাহির হইলাম। যেখানে বৃদ্ধকে ফেলিয়া গিয়াছিলাম, সাবিত্রীকেও তথায় লইয়া আসিলাম,পিতৃপার্শ্বে তাঁহাকেও রাখিলাম। পিতা ও দুহিতা উভয়েই মৃতকল্প।

সমস্ত দিন আমি অনাহারী, সমস্ত দিবারাত্রি প্রায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, সর্ব্বাঙ্গ যেন ঝলসিয়া গিয়াছে, পায়ের স্থানে স্থানে ফোস্কা উঠিয়াছে, জ্বালা করিতেছে, আমি ক্লান্ত এবং কাতর হইলাম। সৌভাগ্য, যে আরও পূর্ব্বে এরূপ হয় নাই। দুইটি জীবন রক্ষার নিমিত্ত হইয়াছি ভাবিয়া অন্তরে সুখ হইল, এবং পার্শ্বে ম্লান সৌন্দর্য্য ও সম্মুখে, অদূরে সেই সুন্দর ও ভয়ঙ্করের সমাবেশ—সেইভীমপরাক্রম অনলের ক্রমশঃ মন্দীভূতভাবে চিত্তে শান্তি উপস্থিত হইল। নিশ্চেষ্ট রূপে সেই স্থানে বসিয়া সাহায্য ও সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

নির্ব্বাণ অগ্নির তাপশান্তি জন্য একজন যুবা পুরুষ এক কলস জল ঐ দিক দিয়া লইয়া যাইতেছিল। যুবার পদদ্বয় কর্দ্দমসিক্ত, সর্ব্বাঙ্গে অঙ্গারসংস্পর্শজনিত কালিমা; যুবক অতিশয় অস্তব্যস্ত। তাহার নিটক একটু জল চাহিলাম, প্রথমে যেন শুনিতে পাইল না, বার বার ডাকিয়া তাহাকে বলিলাম, তখন কলসহস্তে সে আমার নিকট ফিরিয়া আসিল।

যুবক আমাকে বলিল "তুমি কে? কোথায় আসিয়াছ? পূর্ব্বে তোমাকে দেখিয়াছি বলিয়া ত বোধ হইতেছে না। তুমি কাহাদের কুটুম্ব?"

আমি উত্তর দিলাম যে ক্ষুধাপিপাসায় আমার কষ্ট হইতেছে, আগে তৃষ্ণা নিবারণ করি; তদ্ভিন্ন আর দুই জন মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া রহিয়াছে, ইহাদের মুখে একটু জল দিই; তাহার পরে পরিচয় দিলে কি চলিবে না?

যুবক আমার কথায় ভ্রূক্ষেপও করিল না; কিন্তু কলস ভূমিতে রাখিয়া যেখানে সাবিত্রী ও তাঁহার পিতা শয়ান ছিলেন সেই দিকে অগ্রসর হইল। আমি তাহার অনুমতির আর অপেক্ষা না করিয়া যথেষ্ট পরিমাণে জল পান করিলাম; পরে সাবিত্রীর মুখে ও তাঁহার পিতার মুখে জল সেক করিলাম।

যুবক বলিল "এ যে মথুর ঘোষাল; এমন অবস্থায় কেন? ইহাঁর কন্যাকেই বা এখানে কে আনিল?" কথায় এই মাত্র বলিল বটে, কিন্তু ভ্রূকুটিতে যুবক আমাকে বিরক্ত করিল। আমি কথা কহিলাম না।

যেন অর্দ্ধচেতনে, সাবিত্রী বুকের কাপড় একটু টানিয়া দিলেন, সমগ্র পরিধেয় একটু সারিয়া ঘুরিয়া লইলেন। বুঝিলাম, তাঁহার সংজ্ঞার পুনঃ সঞ্চার হইতেছে, আমার বড় হর্ষ হইল। সাবিত্রীর যে মোহভঙ্গ হইবে না, এমন ভাবনা আমার কখনই হয় নাই, তথাপি আহ্লাদ হইল, আত্মপ্রসাদে ক্ষুধার, তৃষ্ণার, আগুনের জ্বালা যেন সব নিবিয়া গেল। যখন পরের কথা ভাবি তখন আপনাকে আপনি অভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়; পরের বেলা অবহেলায় সকল কার্য্যেরই কারণ স্থির করিয়া ফেলি। আমি কিন্তু আমার হৃদয়ের পরিচয় তখন পাইলাম না; আমার আহ্লাদ হইল, তাহা বুঝিলাম, কিন্তু সে আনন্দের কারণ আছে কি না, থাকিলে সে কারণ কি—তাহা ভাবিলাম না, ভাবিলেও স্থির করিতে পারিতাম না।

মুদিতনয়নে অতি মৃদুস্বরে, সাবিত্রী ডাকিলেন—"বাবা"—।

তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য আমি কহিলাম, ভয় নাই, তোমার পিতা এইখানেই আছেন, একটু পরেই সুস্থ হইবেন। সাবিত্রী আমার দিকে চাহিয়া দেখিলেন; আমার স্বর সাবিত্রীর অপরিচিত, আমিও অপরিচিত।

সাবিত্রী ব্যাকুল ভাবে উঠিয়া বসিলেন, পিতার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিলেন, আমাকে দেখিয়া একটু ত্রস্ত হইলেন, আর সেই যুবককে যখন সম্মুখে দেখিলেন তখন যেন অধিকতর কাতর হইলেন।

গোগৃহের ভূপতিত চাল আস্তে আস্তে নিবিয়া গেল। আমরা যেখানে ছিলাম, তথায় অন্ধকার হইল। সাবিত্রীর পূর্ব্বক্ষণের কাতরতা মনে করিয়া তাঁহার পিতাকে ধরাধরি করিয়া তাঁহাদের বাটীতে পৌঁছাইয়া দেওয়া যাউক, যুবকের নিকট

এই প্রস্তাব করিলাম। সাবিত্রীও আমাদিগের সাহায্য করিলেন, তিন জনে মিলিয়া বৃদ্ধকে বাটীতে লইয়া যাওয়া হইল। বৃদ্ধের সংজ্ঞা হইয়াছে, কিন্তু অতিশয় কাতর।

সাবিত্রী সমীপে আমি একটি যাচ্ঞা করিলাম—এই আমার প্রথম যাচ্ঞা। আমি অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত, কিছু আহারীয় চাহিলাম। উৎসুকভাবে, অথচ সসঙ্কোচে গৃহে যাহা ছিল সাবিত্রী আমাকে খাইতে দিলেন। 'কৃতজ্ঞতা' আমার তৎকালীন মনোভাবের প্রচুর সংজ্ঞা নহে।

একটা কথা বলা হয় নাই। অগ্নির বেগ সাবিত্রীদের গোশালা পর্য্যন্ত আসিয়াই প্রশমিত হয়। ইহাঁদের ঘর পোড়েনাই, ইহাঁদের পাড়ার কাহারও পোড়ে নাই।

সাবিত্রী কস্টে লজ্জা পরিহার করিয়া আমাকে জানাইলেন যে তাঁহাদের বহুতর গৃহসামগ্রী সেই পুষ্করিণীর ধারে রহিয়াছে। আমাদের সঙ্গী যুবক সাবিত্রীর সঙ্গে গিয়া তৎসমুদয় দেখিয়া লইতে এবং বহিয়া আনিতে চাহিলেন। সাবিত্রী কথা কহিলেন না। আমি তখন যুবককে তাঁহার পিতার নিকট কিয়ৎকালের নিমিত্ত থাকিতে অনুরোধ করিলাম। যুবক সম্মত হইল, একটু হাসিল, হাসিবার সময়ে তাহার কুঞ্চিত অধরপ্রান্তে ঈষৎ ঘৃণা যেন কুটিতে কুটিতে রহিয়া গেল। আমি তাহা গ্রাহ্য করিলাম না।

সাবিত্রী আমার সঙ্গে পুষ্করিণীর তীরে গেলেন। আমি একে একে সকল সামগ্রী বহিয়া আনিলাম; যতক্ষণে কিছু পড়িয়া ছিল; ততক্ষণ সাবিত্রী সেই কাতর পিতাকে যুবকের হস্তে রাখিয়া, স্বয়ং পুষ্করিণী তটে রহিলেন। পৃথিবীর সকল সামগ্রী হইতে সাবিত্রী পিতাকে অধিকতর ভাল বাসেন তাহা আমি সহজেই বুঝিতে পারিলাম; সাবিত্রী কাঁদিতেছিলেন, তাহাও আমি দেখিলাম। তথাপি সাবিত্রী পিতৃপার্শ্বে না রহিয়া, সেই পুষ্করিণীর তীরেই ছিলেন।

শেষবারে সাবিত্রী আমার সঙ্গে বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। সমস্ত সামগ্রী বাটী আসিয়াছে জানিয়া, যুবক আবার তেমনি হাসিয়া, বিনা বাক্যব্যয়ে তথা হইতে চলিয়া গেল।

সাবিত্রী গৃহমধ্যে পিতার চরণোপান্তে গিয়া বসিলেন। রোয়াকে একটা মাদুর ছিল, আমি বাহুতে মস্তক ন্যস্ত করিয়া শুইলাম। তখন রাত্রি প্রভাত হইতেছে; আমার নিদ্রা আসিল না, চিন্তা আসিল। বাহ্য জগতের অস্তিত্ব ভুলাইয়া চিন্তা আমাকে অভিভূত করিল। সে চিন্তার অবস্থায় আমি নিদ্রিত কি জাগরিত অন্যে তাহা বলিতে পারিত না।

সাবিত্রী যুবতী, সাবিত্রী সুন্দরী, সাবিত্রী বিধবা।

শ্রীরণরঘু গোস্বামী।

দেবোপাখ্যান।

(গ্রীস ও ভারতবর্ষ।)

নবম প্রস্তাব।

সাধারণ সমালোচনা।

পণ্ডিতবর বকল গ্রীকসভ্যতার উৎকর্ষ প্রদর্শন করিতে যাইয়া, গ্রীক দেবদেবী-সমূহকে হিন্দুদিগের দেবদেবী হইতে অধিকতর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার মতে, গ্রীক কবির কবিত্ব এত স্বাভাবিক, দেবগণের আকার প্রকার এবং স্বভাববর্ণনায় কল্পনা এমন হৃদয়গ্রাহিণী যে হিন্দুদিগের ভয়ঙ্কর দেবগণ এবং হিন্দু কবিদিগের অসম্ভব কল্পনা তাহার সহিত উপমেয় নহে। মনুষ্যের মনোবৃত্তি নিচয় এবং দেবচরিত্র এমন সুন্দর ভাবে চিত্রিত হইয়াছে যে, মানবগণ যে দেবগণের অনুকৃতি তাহা বুঝিতে আর বিলম্ব হয় না। তিনি বলেন, " স্ত্রীলোকের অপ্রসাদ ভারেনায়, সৌন্দর্য্য ও ইন্দ্রিয়লালসা ভিনসে, অহঙ্কার জুনোতে; এবং সর্ব্বগুণসম্পন্নতা মিনর্ভায় চিত্রিত হইয়াছে। জুপিটর সুপ্রেমিক, সুরসিক এবং সৎস্বভাব রাজা। অন্যান্য দেবগণ সকলেই প্রয়োজন সাধনের উপযোগী, এজন্য নেপচুন নাবিক; ভলকান্ কর্ম্মকার; এপোলো বীনাবাদক, কবি এবং রাখাল; কাম ক্রীড়াশক্ত অস্থিরমতি বালক; মার্কিয়ুরি বিশ্বাসী দূত আবার সামান্য তস্কর।"

আর্য্যকবি দেবগণকে বাহ্যজগতে এত সংস্পৃষ্ট রাখেন নাই, তাঁহারা মানবগণ হইতে অনেক উচ্চ, অনেক শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা ইচ্ছাময়, সুতরাং কবি তাঁহাদিগকে সামান্য শ্রমজীবীর ন্যায় বর্ণন করেন নাই। তিনি যে সকল দেবচরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, সে সমস্তে দুর্ব্বলতা নিতান্ত অল্প আছে। মরণধর্ম্মশীল মানবের সামান্য মনোবৃত্তির বর্ণনায় দেবের সৃষ্টি, আর্য্যকবির নিকট নিতান্ত উপহাসজনক বোধ হইয়াছিল। তাঁহার দেবগণ সমস্ত গুণের পূর্ণতা ও সম্পন্নতা, কিন্তু সর্ব্বদাই দোষবিবর্জ্জিত। মনুষ্যবুদ্ধি দেবচরিত্রের উচ্চতা নিরীক্ষণে অসমর্থ মনুষ্যের কল্পনাও এত দূর উড্ডীয়মান হইতে সমর্থ হয় না। তাঁহার বর্ণিত দেব

"তৃণেন পর্ব্বতং হন্তুং শক্তোধাতা চ দৈবতঃ

কীটেন সিংহং শার্দ্দূলং মশকেন গজং তথা।
শিশুনাচ মহাবীরং মহান্তং ক্ষুদ্রজন্তুভিঃ,
মূষিকেণ চ মার্জ্জারং মণ্ডূকেন ভুজঙ্গমং।
এবং জন্যেন জনকং ভক্ষ্যেণৈব চ ভক্ষকং
বহ্নিনাচ জলং নষ্টং বহ্নিং শুষ্কতৃণেন চ।
পীতাঃ সপ্তসমুদ্রাশ্চ দ্বিজেনৈকেন জহ্নুনা
ধাতুর্গতির্বিচিত্রাচ দুর্জ্জেয়া ভুবনত্রয়ে।"*

প্রত্যেকের শক্তি অনন্ত। দেবের এইরূপ ক্ষমতা বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া যাঁহারা উপহাস করেন, তাঁহারা, সকলই বলিতে পারেন। একজন দেবতা ইচ্ছা করিয়া সমস্ত কার্য্য করিতে পারেন, ইচ্ছা হইলে শরীর দুই, তিন অথবা বহুভাগে বিভক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেবরূপে উপস্থিত হইতে পারেন; যাঁহারা এ সমস্ত অস্বাভাবিক কবিকল্পনা বলিয়া অবজ্ঞা করেন, তাঁহারা যে কলহপ্রিয়, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, পাপপথপ্রদর্শক গ্রীক দেবদেবীগণকে সমধিক প্রশংসা করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

সহৃদয় হিন্দুপাঠক যখন অভিনিবেশ সহকারে আপনাদিগের দেবচরিত্র পাঠ করেন, তখন

"একোঽপি সন্মহাদেব স্ত্রিধাসৌ সমবস্থিতঃ
সর্গরক্ষালয়গুণৈর্নির্গুণোঽপি নিরঞ্জনঃ।
একঃ সন্ স দ্বিধাচৈব ত্রিধাচ বহুধাপুনঃ
ত্রিধা বিভজ্য চাত্মানং ত্রৈলোক্যে সংপ্রবর্ত্ততে।" †

এইরূপ বর্ণনা দেখিয়া পুলকিত হন, আপনাদিগের দেবোপাখ্যান সারগর্ভ ও দৃঢ় ভিত্তিতে সংস্থাপিত দেখিয়া অতুল আনন্দ উপভোগ করেন। দেবসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার কারণ সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে সক্ষম হয়েন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের প্রকৃতিগত গুণনিচয় অন্য জাতীয় লোকের বোধগম্য হওয়া সুকঠিন। প্রত্যেকে প্রকৃতি ও পুরুষ, সুতরাং প্রত্যেকেই দুই ভাগে বিভক্ত; সত্ব, রজঃ, তমঃ গুণের আধার বলিয়া কার্য্যভেদে প্রত্যেকেই তিন ভাগে বিভক্ত; আবার জীবগণের পরমাত্মাস্বরূপ হওয়ায় প্রত্যেকেই বহুধা বিভক্ত। যে যুক্তিসূত্র অবলম্বন করিয়া আর্য্যগণ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সামান্য কবির কাব্য হইতে অত্যুচ্চ সাংখ্যদর্শন পর্য্যন্ত সকল স্থলেই সুস্পষ্ট বর্ণিত আছে। দেবগণের এতদূর মহত্ব ও ক্ষমতা যে, যাহার হৃদয়ে একবার তাঁহাদের নাম ও মূর্ত্তি প্রবেশ করিয়াছে তাহার আর বিনাশ নাই।

"নচ দুর্ব্বাসসঃ শাপো বজ্রঞ্চাপি শচীপতেঃ
হন্তুং সমর্থোহি সখে! হৃদ্গতে মধুসূদনে*

যিয়স্ গ্রীসের শ্রেষ্ঠ দেব। তিনি অনাদি, অনন্ত, মঙ্গলময়। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রমিথিয়স্ স্বর্গহইতে অগ্নি অপহরণ করিয়া পৃথিবীতে আনয়ন করিল। প্রমিথিয়স্ একজন সামান্য মনুষ্য। যিয়সের আপন দুহিতা সেই চৌ-

* ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

† কৌর্ম্ম পুরাণ, ৪র্থ অধ্যায়।

* গারুড় পুরাণ ২৩৪।

র্য্যের সহায়তা করিলেন। যিয়স্ তাহাকে শাস্তি প্রদান মানসে প্যাণ্ডোরাকে প্রেরণ করিলেন। কেবল তাহাকে নয় তাহার সহিত সমস্ত মানবজাতিকে কষ্টদিবার উপায় উদ্ভাবন করিলেন। মনুষ্যের জন্য কি আশ্চর্য্য সহানুভূতি! কৌতুকের বিষয় এই যে, অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া ফেলিতে, অথবা উদ্ভাবিত উপায় দ্বারা প্রমিথিয়স্‌কে শাস্তি দিতে পারিলেন না। পরিশেষে দয়া, সহানুভূতি ও সহিষ্ণুতার চরমসীমা প্রদর্শন করিতে, সজীবাবস্থায় প্রমিথিয়সের হৃৎপিণ্ড বিদারণার্থ এক গৃধিনীকে নিয়োগ করিয়া, আপনি উঁহাকে এক পর্ব্বতে বাঁধিয়া রাখিলেন। কি চমৎকার ক্ষমাশীলতা!

ভারতীয় দেবোপাখ্যানে বর্ণিত আছে, একবার অগ্নি কোন কারণে আপনা হইতে বিরক্ত হইয়া পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হন, তাহাতে দেবগণ অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁহাকে লোকহিতার্থ পৃথিবীতে প্রেরণ করিলেন।

অসুরের অত্যাচারে পৃথিবী অধঃপাতে যাওয়ার উপক্রম হইল। যেমন প্রত্যেকের শরীর হইতে তিল পরিমাণ পরমাণু প্রদান করিয়া, দেবগণ গ্রীসে প্যাণ্ডোরার সৃষ্টি করেন, ভারতের দেবগণও তাহাই করিলেন। কিন্তু গ্রীসের প্যাণ্ডোরা পৃথিবীকে দুঃখময় ও পাপপূর্ণ করিতে প্রেরিতা হন, ভারতের তিলোত্তমা সৌন্দর্য্যমুগ্ধ অসুর বিনাশ করিয়া ভূমণ্ডলে শান্তি ও সুখ প্রদানে উপস্থিত হন, এই প্রভেদ।

গ্রীককবি, মেনিলসের হেলেনকে প্যারিসের করে সমর্পণ করিলেন। ট্রয় বিনাশের পর, মেনিলস স্বীয় ভার্য্যাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন,কিন্তু কোন ক্রমেই রাখিতে পারিলেন না। ডিউফেলিয়স্ হেলেনকে বিবাহ করিলেন, আবার একিলেস্ মৃত্যুর পর পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া হেলেনের স্বামী হইলেন। ট্রয়েলসের জীবনসর্ব্বস্ব ক্রেসিদা আপন স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। দেবগণ ডায়োমেডের সহায় হইয়া তাঁহার হস্তে ক্রেসিদাকে সমর্পণ করিলেন। এইরূপে একের পত্নী অপরের হস্তে সমর্পণ করা, স্ত্রী কর্ত্তৃক স্বামী পরিবর্জ্জন স্বামী কর্ত্তৃক স্ত্রীর তথাবিধ প্রত্যাখ্যান প্রভৃতি গ্রীক দেবগণের নিত্যকর্ম্ম ছিল। কিন্তু ভারতীয় দেবগণের তদ্রূপ নহে। তাঁহারা চিরকালই ন্যায়ের বন্ধু। রাবণ রামের সীতা অপহরণ করিয়া, সতীর অবমাননার প্রয়াস পাওয়ায় সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইল। এইরূপ সহস্র সহস্র দৃষ্টান্তের অপ্রতুল নাই!

ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন গ্রীসের দেবদেবীগণ নরদেহ ও নরপ্রকৃতি বিশিষ্ট হওয়ায় সহানুভূতি প্রদর্শনে অধিকতর সমর্থ। সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতির প্রাণিগণমধ্যে সহানুভূতি থাকিতে পারে না। হিন্দুদিগের দেবদেবীগণ মানবগণের আকৃতি ও প্রকৃতি বিশিষ্ট নহেন। সুতরাং ইহা সম্ভবপর যে মানবগণ উপাস্য দেবগণের নিকট প্রার্থনা করিতে হইলে ভয়ে বিহ্বল

থাকিবে, উপাসনার উদ্দেশ্যও তজ্জন্যই সংসিদ্ধ হইবে না। দেবমানবে একপ্রকার প্রণয় সংস্থাপিত না হইলে, আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ হইতে পারে না। কবিগণ এজন্য দেইশ্রেষ্ঠ যিয়সকে এবং অন্যান্য দেবগণকে মানবীপ্রিয় এবং দেবীগণকে মানবপ্রিয় করিয়াছেন।

আরিস্ততল নামক গ্রীসের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক প্লেটোর মনোবিজ্ঞানের ভাববিষয় (ideas) সমালোচনার দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিয়াছেন, "যেমন কেহ কেহ (গ্রীক পৌত্তলিকগণ) এমন নির্ব্বোধ যে, তাহারা নরদেহবিশিষ্ট দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করে, মরণশীল অমর নির্ম্মাণ করিয়া আরাধনা করে, অর্থাৎ যাহার অস্তিত্ব নাই, যাহা কিছুই হইতে পারে না (Non entites)তাহার উপাসনা করে।" বাস্তবিক একথা যথার্থ বোধ হয়। যে ব্যক্তি আমার ন্যায় দুইহস্ত, দুইপদ, প্রকৃতি ও শরীরবিশিষ্ট, যাহার সুখ দুঃখ ভালবাসা সকলই আমার মত, তাহার প্রতি ভক্তি কত হইবে ? যে আমার মত শ্রমজীবি,কলহপ্রিয় ও দুর্ব্বল প্রকৃতি যে মানসিক কুপ্রবৃত্তিনিচয় শাসন করিয়া মহাজনের ন্যায় হইতেও অসমর্থ, তাহার প্রতি কেন প্রীতির সঞ্চার হইবে ? আমি মরণশীল, আমার মত শরীরবিশিষ্ট প্রাণী কেন অমর হইবে ? তাহার যত কেন শক্তি থাকুক না, সে দেবতা নয়। তাহার বল ও পরাক্রম তাহাকে কুকর্ম্ম সাধনে সক্ষম করে,তাহার ক্ষমতা কুকর্ম্মেরই অধিক উপযোগিনী সৃষ্ট্যাদি মহৎকার্য্য সম্পাদনে তাহার কিছুমাত্র সাধ্য নাই। যাহার সহিত ক্রীড়া করিতেছি, যাহাকে দুষ্কর্ম্মে সঙ্গী পাইতেছি, যে কুকার্য্যসাধনে সহায়তা করিতেছে, তাহার অপরিজ্ঞাত কার্য্যের জন্য শাস্তি প্রদান করিতেছে ; যে ঈর্ষার বশবর্ত্তী হইয়া বিষাক্ত-বচনে ছলমন্ত্রে, চাতুর্য্যে স্ত্রীহত্যা প্রভৃতি মহাপাপ সাধনে কুণ্ঠিত হইতেছে না, সুরম্য নগরী, সুদৃশ্য পণ্যশালা,মনোহর উদ্যানসমূহ অনায়াসে বিনষ্ট করিতেছে, একের সহধর্ম্মিণী অন্যের হস্তে সমর্পণ করিতেছে, সে দেবতা নয়, তাহার প্রতি কেন ভক্তি হইবে ? অভিসারিণী দেবী, অন্ধকারপ্রিয় দেব, উভয়ই ঘৃণনীয়। আলোকস্বরূপ দেবগণ কুকর্ম্মসাধনে অন্ধকারপ্রিয় ! কি চমৎকার কল্পনা ! কে ইচ্ছা করিয়া কৃষ্ণসর্পের সহিত ক্রীড়া করিবে, যিয়স্ প্রভুর আরাধনা ও সহানুভূতি প্রার্থনা করিবে ? যদি ক্ষমতার পূজা করিতে হয়,গ্রীক যেমন একদিন সেকেন্দরকে, কার্থেজবাসী যেমন হানিবলকে, রোমান যেমন সিজারকে, ফরাশি যেমন নেপোলিয়নকে অথবা শিক যেমন রণজিৎসিংহকে অর্চনা করিয়াছে, কোন্ গুণে যিয়স তদপেক্ষা অধিক সম্মান লাভ করিবেন ? তাঁহার দোষ প্রদর্শনে অথবা দোষ জন্য নিন্দা করিতে কেহই কুণ্ঠিত হইবে না।

এই মত সমর্থনের জন্য আমরা যাহা উল্লেখ করিব তাহা তত কার্য্যকর এবং গ্রীক-

প্রিয় বাঙ্গালি বাবুগণের বিশ্বাসজনক না হইতে পারে, এই বিবেচনায় গ্রীকপণ্ডিতগণের এবং ইংলণ্ডের দুই একজন ভাষাবিৎ প্রসিদ্ধ লেখকের মত নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রসিদ্ধ আর্যজাতির দেবোপাখ্যানলেখক জর্জ্জ কক্স, এম্, এ, তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থে লিখিয়াছেন "যদি গ্রীসের দেবোপাখ্যান অনুযায়ি ধর্ম্ম সাধারণের অন্তঃকরণে এত অনিষ্ট সঙ্ঘটন না করিত, তবে হয়ত সকলে তাহাতে হাস্য করিয়া তাচ্ছল্য প্রদর্শন অথবা তৎপ্রতি দৃষ্টিপাতই করিতেন না। কিন্তু যখন দেখা গেল যে ইহাতে ভয়ানক নৈতিক অনিষ্ট সঙ্ঘটিত হইতেছে, তখন সকলে প্রকাশ্য অবজ্ঞার সহিত তাহা পরিত্যাগ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। বোধ হয় এই জন্যই জিনোফনেস্, প্রেতাগোরাস্, এলেকজাগোরাস, হিরাক্লিটস্ পিণ্ডার ও প্লেটো প্রভৃতি পণ্ডিতগণ দেবোপাখ্যান প্রচলিত উপাসনার বিরুদ্ধে তারস্বরে বক্তৃতা করিয়াছেন। যখন ইয়ুরিপাইডেস্ স্পষ্টরূপে বলিয়াছিলেন, যদি দেবতারা সৎ হয়েন তবে কবিদিগের বর্ণিত গল্প সকল নিতান্ত ঘৃণার্হ ও অমূলক। আর যদি কবিগণ যাহা বলেন দেবতারা সেই সমস্ত কার্য্যই করিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা কখনও দেবতা নহেন" * তখন অনেকে তাঁহার মত সমর্থন করিল। প্লেটো বলিতেন যিয়স্ ও হিরী দেবদেবীর অনুপযুক্ত * তিনি বীরোপাসনা সম্বন্ধে বলেন "থিসিয়স্কে পোসির এবং পিরিথোয়স্কে যিয়স সন্তান বলিয়া আমরা কখনও বিশ্বাস করিব না অথবা কাহাকে একথা উল্লেখ করিতে দিব না, এবং অন্য কেহ যে দেবপুত্র হইয়া কবির বৃথা বর্ণনানুরূপ ব্যভিচার দোষে দূষিত এবং নানারূপ কলঙ্কে কলঙ্কিত একথায় আমরা প্রত্যয় যাইব না। হয় তাহারা দেবপুত্রই নয়, না হয় কখনও উল্লিখিত রূপ কুকর্ম্ম করে নাই এই দুই কথার একটি স্বীকার করিতে সকলকে বাধ্য করিব।† কক্স সাহেব অন্য একস্থলে যিয়স্ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "যিনি সমস্ত উত্তমতা ও পবিত্রতার অত্যুচ্চ শেখর এবং আদর্শ স্বরূপ হইবেন, গ্রীসের দেবোপাখ্যানে তিনি অদম্য ইন্দ্রিয়পরতা ও ব্যভিচারের জীবিত প্রতিমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন।" ‡

এক্ষণে যেমন মুলর বংশীয় জর্ম্মণ পণ্ডিতগণ, এবং গ্ল্যাড্স্টোন্, কক্স প্রভৃতি সুলেখক সকল রূপক ব্যাখ্যা করিয়া দেবতত্ত্ব বুঝাইয়াছেন, গ্রীসের পণ্ডিতগণও তদ্রূপ করিয়াছিলেন। কিন্তু দেবোপাখ্যানে জাতীয় বিশ্বাস এত প্রবল ছিল যে, দেবনিন্দাপরাধে সক্রেটিসের প্রাণদণ্ড হইল, এলেক্জাগোরাস্ দেশ হইতে ব-

* আর্য্য দেবোপাখ্যান ৩৫৩ পৃ

* গ্রোট কৃত গ্রীসের ইতিহাস।

† ঐ প্রথম পুস্তক ৫৮৮ পৃ।

‡ আর্য্য দেবোপাখ্যান ৪৫৭ পৃ।

ছিষ্কৃত ও বিদূরিত হইলেন। কিন্তু ইপিকিয়ুরস্ বহু শিষ্যের সমভিব্যাহারে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া অক্ষত শরীরে ভিনস্ ও ব্যাকসের মান বৃদ্ধি করিলেন। *

ভারতে সেরূপ হয় নাই। ভারতের ইপিকিয়ুরস, চার্ব্বাক রাক্ষস নামে অভিহিত হন। পণ্ডিতগণ তাঁহাকে বিনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন; চার্ব্বাক নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন না। তাঁহার বধবিবরণ ও নিগ্রহ এদেশের অনেকেই জ্ঞাত আছেন সুতরাং বাহুল্যে প্রয়োজন নাই।

আর উদ্ধৃত না করিলেও একথা সকলেই স্পষ্ট দেখিতে পারিবেন যে, ইয়ুরোপীয় বর্ত্তমান শতাব্দীর লেখকগণ মধ্যে অনেকে এবং এদেশীয় কোন কোন যুবক যেমন গ্রীসের দেবোপাখ্যানের পক্ষপাতী, গ্রীকপণ্ডিতগণ তাঁহাদের স্বদেশীয় দেবোপাখ্যানের তত পক্ষপাতি ছিলেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে বিষয় পৌত্তলিকগণও অবজ্ঞা করিয়া গিয়াছেন, খৃষ্টশিষ্যগণ তাহাতে কল্পনার কুসুমবিকাশ দেখিতে পান এবং ঈশ্বরোচিত দৈবীশক্তি সন্দর্শনে পুলকিত হন। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে দেশে পর্ব্বতপ্রমাণ গ্রন্থ নিচয় বিদ্যমান রহিয়াছে, অষ্টাদশ মূলপুরাণ ও সেই পরিমাণে উপপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, মনুসংহিতা প্রভৃতি বর্ত্তমান আছে এবং সর্ব্বোপরি মনুষ্যশক্তির অগম্য বেদচতুষ্টয় বিরাজ করিতেছে, ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত ও সংস্কৃতানভিজ্ঞ ইংরাজের মন্ত্রে দীক্ষিত দেশীয় যুবকগণ সেই আর্য্যদেবোপাখ্যানের বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ,হইয়াও অকুব্ধচিত্তে, দুইপাত ইলিয়ড পাঠ করিয়াই, গ্রীসের দেবগণের উৎকর্ষ প্রদর্শনে ও প্রশংসাকীর্ত্তনে মুক্তকণ্ঠ এবং যত্নশীল। তাঁহাদিগকে আমরা নিম্নোদ্ধৃত কতিপয় ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতের মত পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এতদ্দ্বারা তাঁহারা অন্যান্য দেবোপাখ্যান হইতে আর্য্য দেবোপাখ্যানের যে কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা সম্যক বোধগম্য হইবেক।

গ্রোট সাহেব বলেন "গ্রীকদিগের দেবোপাখ্যান বহুপার্শ্ব বিশিষ্ট ও নানা চিত্রে অনুরঞ্জিত। ইহাতে অনেক দেবদেবী এবং মানবমানবী আছে; তাহাদের চরিত্রও ভিন্ন ভিন্ন। মনুষ্যদিগের প্রত্যেক দোষ ও প্রত্যেক গুণ শরীর ধারণ করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে; মহৎ ও ক্ষুদ্র, কোমলাঙ্গ ও দৃঢ়কায়, নিঃস্বার্থ সাহসী পুরুষ এবং বিলাসপ্রিয় লম্পট, সকলেই দেবতা। † কি উপহাসের কথা! আবার আর্য্য দেবোপাখ্যান সম্বন্ধে কক্স সাহেব লিখেন "বৈদিক কবিগণের এই সহজ বাক্যাবলীদ্বারা একথা স্পষ্ট উপলব্ধ হইতেছে যে যিনি আমাদের পিতা, আমাদের শিক্ষক, এবং বিচারক, তিনিই সর্ব্বশক্তিমান অদ্বিতীয় পরাৎপর পরমেশ্বর,

* গ্রোটকৃত ইতিহাস ৫৪৮ পৃ।

† গ্রোটের ইতিহাস ৫৪৮ পৃষ্ঠা।

এই বিশ্বাস প্রাচীন আর্য্যভূমি হইতেই প্রথম উৎপন্ন হইয়াছে। বাহ্য জগতে তাঁহারা যত কিছু দেখিয়াছেন ও বুঝিয়াছেন, এবং হৃদয়ের সহজজ্ঞানদ্বারা যাহা অনবরত উপলব্ধি করিয়াছেন, তদ্দ্বারাই তাঁহারা এই দৃঢ় বিশ্বাসের পথে নীত হইয়াছিলেন।*”

এ বিষয় সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, ভট্ট মোক্ষমুলর প্রণীত “ চিপস্ ফ্রম্ জর্ম্মন্ ওয়ার্ক সপ ” নামক পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড, রাজমন্ত্রী গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের ভাষাবিষয়ক বক্তৃতা এবং এসিয়াটিক্ রিসার্সেস্ নামক গ্রন্থে সর উইলিয়ম্ জোন্সের বক্তৃতা পাঠ করিতে হইবে।

ভারতবর্ষে যেমন দেবত্রয়ের বর্ণনা আছে, গ্রীসের দেবোপাখ্যানেও সেইরূপ তিনটি দেবতার উল্লেখ আছে। কিন্তু উভয়ে কত প্রভেদ! ভারতের পার্ব্বতী, লক্ষ্মী, সরস্বতী কেমন অতুল্য!—সতী ও সরলা, উপকারিণী ও সুখবিধায়িনী। কিন্তু গ্রীসের হিরি প্রভৃতির প্রকৃতি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ভারতের কৈলাস অতি পবিত্র স্থান, শান্তিনিকেতন ও যোগসাধনের উপযুক্ত স্থল। গ্রীসের অলিম্পাস্ যিয়সের বিলাসগৃহ প্রমোদাগার এবং কলহের রঙ্গভূমি। ভারতে গুণের অর্চ্চনা, গ্রীসে রূপের সম্মান। হিন্দুদিগের প্রার্থনার উদ্দেশ্য মুক্তি, গ্রীকদিগের ঐহিক ও দৈহিক সুখ। ভারতের দেবীগণের নিকট প্রার্থনা, মাতার নিকট বালকের প্রার্থনার মত, কিন্তু গ্রীসে পরীসাধনের ন্যায়।

ভারতের দেবোপাখ্যানে ভিনস্ এডোনিস্ স্থান লাভ করিতে পারে নাই, এবং উহা মার্সের কলঙ্কেও কলঙ্কিত হয় নাই। ফলতঃ গ্রীসের দেবোপাখ্যানে সামান্য মনোবৃত্তির খেলা এত অধিক যে, উচ্চ বিষয়ের জন্য স্থান অতি অল্পই আছে। ভারতের দেবোপাসনায় কিঞ্চিৎ ভয়ের ভাগ থাকায় সামান্য বৃত্তিনিচয় উৎসাহ পাইতে পারে নাই।

গ্রীসের দেবগণের সহিত নির্ভিকহৃদয়ে প্রণয় সংস্থাপনে অবজ্ঞা উৎপাদন করিয়াছে,কিন্তু ভারতবর্ষে সম্মান ও ভয় যুগপৎ উপস্থিত থাকায়,সেরূপ হইতে পারে নাই। এজন্য বলদৃপ্ত উদ্ধত যুবাপুরুষ গ্রীসের দেবোপাখ্যান ভাল বলিলেও সাত্বিকচিত্ত বৃদ্ধ তাহা বলিবেন না। দেবে ও মানবে প্রভেদ না থাকায় সমস্ত, অনর্থ উৎপাদিত হইয়াছে; এই জন্যই গ্রীসের দেবোপাখ্যান অল্পদিনের মধ্যেই বৃথা হইয়া পড়িল। কিন্তু যখন গ্রীস জরায়ুগর্ভেও সংস্থিত হয় নাই, সেই সময়ের পূর্ব্ব হইতে ভারতের দেবোপাখ্যান গঠিত হইয়াছে এবং আজি পর্য্যন্তও স্থিরভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। আর্য্য দেবোপাখ্যানের দৃঢ়তা ও শ্রেষ্ঠত্বের ইহাই প্রচুর প্রমাণ। ইহাতে, এক মাত্র ঈশ্বরোপাসনা, সাকার ও নিরাকার উভয় জ্ঞানই লাভ

* কক্স আর্য্যদেবোপাখ্যান ৩৩২ পৃ

হয়। এজন্যই এপর্য্যন্ত ইহার আদরের ন্যূনতা হয় নাই, এবং লোকের বিশ্বাসের এত দ্রুত পরিবর্ত্তন সত্বেও যে, যাবৎ এই পৃথিবী আপনকক্ষে ঘূর্ণায়মান থাকিয়া, প্রকৃতির নিয়মে চন্দ্রসূর্য্যকর্ত্তৃক আলোকিত হইবে তত দিন ইহা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে না, তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

দশম প্রস্তাব।

উপসংহার।

একদা একটি বালক চিত্র দেখিতে দেখিতে অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া, তাহার বৃদ্ধ পিতামহকে দেখাইল একজন ক্ষীণদেহ ব্যাধ কেমন কৌশলে একটি ভয়ানক সিংহকে বধ করিতেছে। বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন, মনুষ্যেরা চিত্র করিতে জানে, তাই নিজের গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য, নিজের বল বিক্রমপ্রদর্শনের জন্য সিংহ শিকার চিত্রিত করিয়াছে। কিন্তু সিংহ যদি ঐরূপ ছবি আঁকিতে জানিত, তবে দেখিতে, একটি শিশুসিংহও অক্ষুব্ধচিত্তে শত শত মনুষ্যের প্রাণ বধ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে সজোড়ে পাদ বিক্ষেপ করিতেছে, এইরূপ অনেক চিত্র চিত্রিত হইত। ভারতবাসিগণের পক্ষেও এক্ষণে ঠিক তাহাই হইয়াছে। বুদ্ধিবিক্রমকেশরী আর্য্যগণের কীর্ত্তিকলাপ সকল দেশীয় লেখকগণের বধ্য হইয়াছে। ভারতের ইতিহাস নাই, সেই বহ্বায়ত চিত্রফলকে পূর্ব্বতন আর্য্যগণের জ্ঞানগৌরবপ্রভৃতিও সবিস্তার অনুরঞ্জিত হয় নাই; সুতরাং বিদেশীয়গণ ইচ্ছামত চিত্র রচনা করিয়া, স্ব স্ব দেশের গৌরব বৃদ্ধি এবং ভারতের গৌরব হ্রাস করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। অন্যের কথা দূরে থাকুক, পাশ্চাত্য বিদ্যাভিমানী সাহেবীপ্রিয় দুই চারিজন বাঙ্গালিও "ভারতের প্রকৃত অস্তিত্ব নাই, ইহা কেবল ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র প্রদেশ সমূহের একটি সাধারণ নাম মাত্র," বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া থাকেন। যে দেশে ঈদৃশ নরাকারের অবস্থান, বিধাতা সে দেশের কপালে কেন না দুঃখ লিখিবেন?

একেত ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত, তাহাতে তাঁহাদের মত খণ্ডন করিবার উপযুক্ত ইতিহাসও বর্ত্তমান নাই, সুতরাং এদেশের মহত্ব ও গৌরব সম্বন্ধে অনেকের ভ্রম জন্মিবে বিচিত্র কি? যে দুই চারি খানি পুরাবৃত্ত দেখা যায়, তাহাও অপর জাতীয় লোকেরা বিশ্বাস করে না। ভারতের প্রকৃত ইতিহাসই উপন্যাস; কিন্তু

অন্যে তাহা নিতান্ত কবিকল্পনা অথবা অত্যুক্তি দোষে দূষিত বলিয়া অনাদর এবং উপেক্ষা করে। যদি প্রতিপক্ষ না থাকিল, যুক্তি কেহই খণ্ডন করিতে প্রয়াস না পাইল, তবে আর লিখিতে বাধা কি? এইজন্যই বকল্ তাঁহার সভ্যতার ইতিহাসে ভারতীয় সভ্যতা উষাকালীন কুজ্‌ঝটিকার ন্যায় সহজেই উড়াইয়া দিলেন। দেবোপাখ্যানও নিতান্ত অবজ্ঞেয় এবং অশ্রদ্ধেয় বলিয়া সকলের প্রতীতি জন্মাইলেন, তাহাতে কেহই কিছু কহিল না।

তিনি গ্রীস ও ভারতবর্ষ এই দুই দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা ও অবস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া সভ্যতার চরমসীমা পর্য্যন্ত সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ, অথচ এতবড় এবং এত প্রাচীন আদিম সভ্য দেশটিকে তিন কথায় সমালোচনা করিয়া গ্রীসের প্রাধান্য প্রদর্শন করিয়াছেন। যদি তিনি অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় না হউক, কথঞ্চিৎ পরিমাণেও সংস্কৃত অবগত থাকিতেন, এবং ঐ ভাষার প্রধান প্রধান কতিপয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন, তবে বোধ হয় তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতের কখনও ঈদৃশ ভ্রমপ্রমাদ সংঘটিত হইত না। অনুবাদ, রঞ্জিলকাচসদৃশ। উহার মধ্যদিয়া প্রকৃত কিছুই দৃষ্ট হয় না। যে বর্ণের কাচ, দৃষ্ট বস্তুও সেই বর্ণের প্রতীত হয়। তাহাতে আবার সংস্কৃতের প্রধান প্রধান গ্রন্থ সকল এখনও অনুবাদিত হয় নাই। বিজ্ঞানশাস্ত্র এবং গণিতের শত শত গ্রন্থ আজিও অননুবাদিত রহিয়াছে। অথচ দুই পৃষ্ঠা অনুবাদ পাঠ করিয়া সকলেই সমালোচক হইয়া উঠে। গ্রীকগ্রন্থসমূহ যেমন ইংরাজীতে অনুবাদিত হইয়াছে, সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থ সকল সেরূপ হইলে কখনও এরূপ সমালোচনা দেখিতে হইত না। অনেকেই ভারতের সভ্যতা ও পাণ্ডিত্যের বিষয় অপেক্ষাকৃত উত্তম রূপ অবগত হইতেন। তাহা না হওয়াতেই, অনেক ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত ভ্রমান্ধকারে পাদ চারণা করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের অনুগামী এদেশীয় যুবকগণও অনেকেই লজ্জাজনক ভ্রমকূপে নিপতিত হইয়াছেন।

বকল্ সাহেব সংস্কৃতানভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়াই স্বরচিত সভ্যতার ইতিহাসে, সহস্র সহস্র গ্রন্থের নামোল্লেখ করা সত্বেও একখানি সংস্কৃত মূলগ্রন্থের নাম করিতে পারেন নাই; এজন্যই নিরপেক্ষ সমালোচনা হয় নাই। আরও একটি কারণ ছিল। বসোয়েট্ ফ্রান্সের সভ্যতার ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করিয়া সাহঙ্কারে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি পৃথিবীর সভ্যতা জানিতে ইচ্ছা করে, সে ফ্রান্সের সভ্যতার ইতিহাস অধ্যয়ন করুক। বকলের মনেও কার্য্যে সেই ভাবই প্রকাশ পায়। তিনিও ইংলণ্ডকে সমস্ত পৃথিবীর অনুকৃতি স্বরূপ জ্ঞান করিয়া, তাহার সভ্যতায় সমস্ত পৃথিবীর সভ্যতা লীন করিয়াছেন। এই একটি উদ্দেশ্য সর্ব্বদা দৃষ্টিপথে বিরাজমান থা-

কাতেই তিনি পক্ষপাতস্পর্শশূন্য হইতে পারেন নাই। বসোয়েট প্রাচীন সভ্যজাতি সমূহের ইতিহাস প্রকটনে প্রয়াস পান নাই; তিনি ভারতবর্ষ, মিসর ও পারস্য প্রভৃতির আদিম সভ্যতাকে সমধিক নিন্দা করিয়া স্বদেশীয় সভ্যতার উৎকর্ষ প্রদর্শনে সঙ্কোচ জ্ঞান করিয়াছেন, সেই জন্যই ঐ সকল দেশের নামও উল্লেখ করেন নাই। এজন্য বকল্ বলেন "তিনি (বসোয়েট্) পারস্যদেশবাসিদিগের কথা প্রায় কিছুই বলেন নাই; মিসরীয় দিগের বিষয় আরও অল্প বলিয়াছেন। বিশেষতঃ সিন্ধুনদ ও গঙ্গানদীর মধ্যবর্ত্তি প্রদেশস্থ পূর্ব্বোক্ত জাতিদ্বয় হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ অধিবাসিগণের— যাঁহাদের বিজ্ঞান শাস্ত্র আলেকজেণ্ড্রিয়ার বিজ্ঞানশাস্ত্রের মূলস্বরূপ,—যাঁহাদের অতিসূক্ষ্ম ন্যায়শাস্ত্রের সূত্র সকল ইয়ুরোপীয় ন্যায়শাস্ত্রের সমস্ত উদ্যমের পুরোবর্ত্তি এবং যাঁহাদের অত্যুৎকৃষ্ট ভাষায় লিখিত অত্যুচ্চ বৈজ্ঞানিকতত্ত্বের অনুসন্ধানসমূহ, যে সময় ইহুদিগণ সকল প্রকার পাপে কলঙ্কিত হইয়া এক ভ্রাম্যমান দস্যুব্যবসায়ি জাতির ন্যায় পৃথিবীর স্থানে স্থানে বিচরণ করিয়াছিল, যখন সকলের বিরুদ্ধেই তাহারা হস্তোত্তোলন করিত এবং সকলের হস্তই তাহাদের বিরুদ্ধে উত্তোলিত হইত, তাহার সমসাময়িক,—সেই আর্য্য জাতির নামোল্লেখও করেন নাই *।" কিন্তু বকল যখন গ্রীসের সহিত ভারতের তুলনা করিয়াছেন, তখন আর তাঁহার এরূপ ভাব ছিল না। তখন বলেন, "ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ; প্রকৃতি অতিশয় ভয়ঙ্করী। পৃথিবীর মধ্যে অত্যুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী, সুবৃহৎ নদনদীনিচয়, বিস্তীর্ণ মরুভূমিসমূহ, বহ্বায়ত বনরাজী, তরঙ্গায়িত সমুদ্র প্রভৃতি অবস্থিত থাকায়, ভারতবর্ষ প্রকৃতির ভয়ঙ্করী সন্ততি হইয়াছেন। সন্তানগণও প্রকৃতিভয়ে ভীত হইয়া জড়োপাসনায় নিরত হইয়াছে। এই জন্যই ভারতে এত কুসংস্কার। আমরা তাহাদের ধর্ম্মপুস্তকে, দেবচরিত্রে, দেবমন্দিরের আকৃতিতে সর্ব্বত্রই ইহার প্রমাণ দেখিতে পাই। এইরূপে তাহাদের কল্পনাশক্তি জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করায়, তাহাদের সকলই অস্বাভাবিক ও অলীক হইয়াছে। কিন্তু গ্রীসে তাদৃশ কিছুই নাই। গ্রীস প্রকৃতির মধ্যবিত্তা সন্ততি। সেখানে কবির কল্পনা জ্ঞানের অধীন থাকায়, সকলই স্বাভাবিক হইয়াছে। এই জন্যই গ্রীসে অন্যান্য দেশের পূর্ব্বে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও অন্যান্য শাস্ত্রের আবির্ভাব দেখিতে পাই; এবং এই জন্যই দেবমূর্ত্তি সকলও অতি সহজ স্বতঃসিদ্ধ কল্পনার ফল অর্থাৎ মনুষ্যের ন্যায় শরীরধারী। সুতরাং গ্রীসের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিতরূপে প্রতিপন্ন হইল। †"

ভারতবর্ষ গ্রীস হইতে অন্যূন চল্লিশগুণে বৃহৎ। ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য যে সর্ব্বত্রই ভয়ঙ্কর তাহা নহে। যেমন একদিকে

* সভ্যতার ইতিহাস, দ্বিতীয় পুস্তক

† সভ্যতার ইতিহাস, প্রথম পুস্তক।

অভ্রভেদী হিমাচলের অনন্তুতুষারমণ্ডিত ভীষণ দৃশ্য, তেমনই আবার অন্যদিকে, নর্ম্মদাতটে হরিৎ শস্যশোভিত প্রাকৃতিক শোভাসমন্বিত ক্ষেত্র সমুদায় বিরাজমান; যেমন সিন্ধু দেশের মরুভূমি দৃষ্টে অন্তঃকরণে দারুণ আতঙ্ক উপস্থিত হয়, তেমনই আবার বঙ্গদেশের রমণীয় নিকুঞ্জবন শ্যামলশস্যপূর্ণ ক্ষেত্রনিচয়,আনন্দপরিপূরিত বিলাসভবন এবং স্বচ্ছ সরোবরের মধুরিমা অবলোকন করিলে, হৃদয় উৎসাহে ও আনন্দে পরিপুর্ণ হইয়া উঠে। যে দেশে অরণ্যে সিংহব্যাঘ্রাদি বিচরণ করে সে দেশের কুঞ্জবনে কোকিল, শ্যামা, বুলবুলের অভাব নাই। ভারতে ভয়ঙ্কর গ্রীস আছে, মনোহর গ্রীস আছে, এবং মধ্যমাবস্থ গ্রীসও বর্ত্তমান আছে; ভারত প্রকৃতির ক্রীড়ানিকেতন, সমস্ত পৃথিবীর অনুকৃতি। যদি বিয়োসিয়া প্রভৃতি নগরীনিচয় গ্রীসের মধ্যবর্ত্তি থাকিয়াও সমস্ত দেশ হইতে বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট হইতে পারিল, ভারতের অন্তর্ভূত প্রদেশ সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট হইবে বিচিত্র কি? এরূপ হইলে হয়ত কোন অংশ অধিক কুসংস্কারজড়িত এবং কোন স্থল অল্প কুসংস্কারযুক্ত হইতে পারিত, কোন স্থলে নিরাকার উপাসনা হইত, কোথাও বা সাকার উপাসনা হইত অথবা কোন প্রদেশে গ্রীসের ন্যায় ধর্ম্ম প্রচলিত থাকিতে পারিত। গ্রীসের জন্মের বহু পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্য সভ্য হইয়াছে, তাৎকালিক তামেল সাহিত্য যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তাহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, কিন্তু সে সমস্ত প্রদেশেও বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত হয় নাই। সমগ্র ভারতবর্ষে একরূপ দেবোপাসনা প্রচলিত থাকায় একথা স্পষ্ট উপলব্ধ হয় যে, মাত্র দেশের প্রাকৃতিক অবস্থানে ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন বা ঐকমত্য হয় না, অন্যান্য কারণেও অনেক কার্য্য সম্পন্ন করে। যে বিজ্ঞান অবলম্বন করিয়া আর্য্যাবর্ত্তে পৌরাণিক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়, সেইরূপ বিজ্ঞান অনুসরণে দাক্ষিণাত্যেও পুরাণপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল। ইহা বাহ্যজগতে প্রকৃতির হস্ত সন্দর্শনের ফল না হইয়া বরং শত শত বৎসরের মানসিক চিন্তার ফল বলিতে হইবে। নতুবা সমস্ত স্বভাবজ হইলে যে দেশে স্থানভেদে কাব্যে কাব্যে এত প্রভেদ সে দেশে দেবোপাসনাও প্রদেশ বিশেষে নিশ্চয় ইভিন্ন ভিন্ন হইত।

এক্ষণে স্থানের সমাবেশ দেখিতে হইবে। ভারতের দক্ষিণাংশ উষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত, কিন্তু উত্তরাংশ বিশেষতঃ যে প্রদেশে প্রথমতঃ আর্য্যসভ্যতাবিস্তার হইয়াছে সেই সকল স্থল সমমণ্ডলেই অবস্থিত। সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত, তন্মধ্যস্থ সভ্যতার বালশয্যা ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি প্রদেশ সমমণ্ডলমধ্যবর্ত্তি। কাশ্মীর দেশ গ্রীসের সহিত এক অক্ষাংশে অবস্থিত। কাশ্মীরও গ্রীসের জ্যেষ্ঠ, সুতরাং চতুর্দ্দিকে শৈলমালা পরিবেষ্টিত, অন্যান্য প্রদেশহইতে

বিযুক্ত কাশ্মীর রাজ্যে, প্রচলিত দেবোপাখ্যানহইতে স্বতন্ত্র প্রণালীর, সম্ভবতঃ গ্রীসের একরূপ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইতে পারিত। কাশ্মীর ও গ্রীসহইতে অনেক বৃহৎ, প্রকাণ্ড পর্ব্বতনিচয় মাত্র সেস্থলের ভয়ঙ্কর দৃশ্য। লোকে মাত্র পর্ব্বতেরই উপাসনা করিতে পারিত। তাহা না হইয়া যখন ভারতের সর্ব্বাংশ প্রতিষ্ঠিতপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তখন সূর্য্যের অবস্থান অনুযায়ি স্থানের সমাবেশও যে ভারতের ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করে নাই একথা স্বীকার করিতে হইবে।

সভ্যতার তুলনা করিতে স্বকীয় ইতিহাসের প্রথম পুস্তকে বকল যে গ্রীসের বিজ্ঞানপ্রভৃতি শাস্ত্রে প্রাথমিক জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, যদি তিনি ভারতের জ্ঞানোন্নতির বিষয় অবগত থাকিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই আপন মত ভ্রান্তিপ্রণোদিত বলিয়া স্বীকার করিতেন। ভারতীয় জ্ঞানের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা লিখিয়াছেন, এক্ষণে তদ্বিষয়ের বাহুল্য বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলে আমাদের বর্ণনার বিষয় অতিক্রম করিয়া দূরে যাইতে হয়। কিন্তু বর্ণনীয় বিষয়ের সহিত সভ্যতার সম্বন্ধ অতি সন্নিকট বলিয়া দুই একটি কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। জ্যোতিষ, গণিত, পদার্থতত্ত্ব, ভূগোল, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র সমুদয়কে ভারতের সন্তান বলিয়া অনেকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন; যাঁহারা সে সকল সবিস্তারিত অবগত হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা 'বঙ্গদর্শনে' 'আর্য্যজাতির মহিমা' নামক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। এক্ষণে এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে যে সমস্ত বাঙ্গালিসাহেব তাহাতে অনাস্থা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের প্রবোধের জন্য দুই একজন ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত করিতেছি। সাহেবের নামসংযোগ না দেখিলে যাঁহারা বিশ্বাস করেন না কেবল, তাঁহাদের জন্যই উদ্ধৃত করিতেছি।

আসিয়াটিক সোসাইটির তাৎকালিক সভাপতি সংস্কৃতভাষাবিশারদ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত তাঁহার স্বজাতীয় ভাষা ইংরাজীতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অনুবাদ এই। 'যাহা হইতে পিথাগোরসের শিষ্যগণ অনেক মত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া অনুমিত হয়, ভারতের এবং আসিয়ার প্রসিদ্ধ ও সম্মাননীয় অপরাপর প্রদেশের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সেই অংশের বিষয় স্থানান্তরে উল্লেখ করিয়াছি। সিসিরো বলেন যে ইয়ুরোপের প্রাচীন পণ্ডিতগণ কেন্দ্রাভিমুখ বল ও মাধ্যাকর্ষণের সাধারণ নিয়মের কিছু কিছু অবগত ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা তাহা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পান নাই। সুতরাং অমর নিউটনের অক্ষয়কীর্ত্তি কিরীট হইতে একটি পত্রও ছিন্ন না করিয়া একথা সাহস পূর্ব্বক নির্দ্দেশ করিতে পারি যে তাঁহার সমস্ত পরমার্থতত্ব এবং বিজ্ঞানের একাংশ বেদের মধ্যে এবং সফি (পারস্যবাসী) দিগের গ্রন্থেও

প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাও নির্দ্দেশ করিতে পারি যে তিনি কেন্দ্রাভিমুখ ও কেন্দ্রবিমুখ বলের কারণ স্বরূপ যে অতি সূক্ষ্মশক্তি প্রত্যেক জড় পদার্থে নিহিত আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাহা, আলোকের নির্গমন প্রতিফলন ও কিরণরেখাগুলির প্রতিগমন ও ভঙ্গ হওয়ার বিষয়; বিদ্যুতের ধর্ম্ম, তাপের বিষয়, ইন্দ্রিয়দ্বারা বোধ হওয়া, এবং বল ও গতির বিষয় সমস্তই পাঞ্চভৌতিক কার্য্য বলিয়া হিন্দুগণ সবিস্তার বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। বেদেও জড় পদার্থের সাধারণ আকর্ষক এক বলের উল্লেখ আছে, তাঁহারা (হিন্দুরা) সূর্য্যকেই তাহার প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; এজন্য সূর্য্যের নাম আদিত্য (আকর্ষক)" * তিনি আরও বলেন যে 'পিথাগোরসের মনোবিজ্ঞান এবং জিনোর পরমার্থতত্ত্ব ভারতের সাংখ্য দর্শনের অনুকরণ।' † তিনি বলেন 'সুবিজ্ঞ দেবিস্থানের গ্রন্থকার বলেন 'পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে এবং পারস্যাধিকৃত অনেক প্রদেশে এরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে তাহা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কালিস্থিনেস্ তাঁহার পিতৃব্য সমীপে ভারতের যে সমস্ত আশ্চর্য্য বস্তু প্রেরণ করেন তন্মধ্যে এক প্রণালীর ন্যায় শাস্ত্রের গ্রন্থ ছিল, (ন্যায় দর্শন) ব্রাহ্মণেরা অনুসন্ধিৎসু গ্রীকজাতিকে সেই শাস্ত্রে দীক্ষিত করেন।' ঐ মুসলমান লেখক ইহা অনুমান করেন যে এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আরিস্তুতল তাঁহার মনোবিজ্ঞান ও ন্যায় শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। তিনি আরও বলেন যে প্লেটো ও ইপিকার্যস্ বেদান্তদর্শন অবলম্বন করিয়া আপন আপন ন্যায়শাস্ত্র প্রণয়ন করেন।' *

এক্ষণে পাঠক গ্রীসের বিজ্ঞানের প্রাচীনত্ব বিবেচনা করিবেন।

এই দীর্ঘ সমালোচনায় সকলেই দেখিবেন ভারতের দেবোপাখ্যান প্রণেতৃবর্গের প্রতি কি অবিচার করা হইয়া থাকে। যিনি ইংরেজ গ্রন্থকারগণের মন্ত্রে দীক্ষিত, হয়ত তাঁহার মনে হইবে প্রস্তাব লেখক চেষ্টা করিয়া পক্ষপাত করিয়াছে, অন্যায় রূপে ভারতীয় দেবগণের প্রাধান্য সংস্থাপনে প্রয়াস পাইয়াছে। আবার সংস্কৃতজ্ঞ গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মনে করিবেন ইংরাজী ভাষা অধ্যয়ন করায় ইংরাজ লেখকগণের সম্মান ও গৌরব রক্ষা করিতে গিয়া নিরপেক্ষ ভাবে সমস্ত বর্ণন করিতে সাহসী হয় নাই। যেই যাহা মনে করেন, যাঁহারা দুই দেশের দেববৃত্ত সম্মুখে রাখিয়া সমালোচনা করিবেন, এরূপ ভরসা হয় যে, তাঁহাদের মত আমাদিগের মত হইতে বড় বিভিন্ন হইবে না। তবে মনুষ্যের রুচি ভিন্ন ভিন্ন; প্রকৃতিও স্বতন্ত্র

* এসিয়াটিক রিসার্সেস্ চতুর্থ পুস্তক ১৭৭ পৃ।

† ঐ।

* এসিয়াটিক রিসার্সেস্ ১৭৬ পৃ ইত্যাদি।

স্বতন্ত্র, সুতরাং কোন কোন স্থলে প্রভেদ হওয়া আশ্চর্য্য নহে ।

যে সমস্ত বাঙ্গালি বাবুরা ড্যাম ইয়োর দুর্গাকালী বলিয়া সাহেবের ন্যায় ভ্রূভঙ্গী করেন এবং গ্রীসের দেবোপাখ্যান অনেক ভাল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাস্য এই যে তাঁহারা কি দেখিয়া গ্রীসের দেবদেবীর পক্ষপাতী ? যদি যিয়সের ও ভিনসের ব্যভিচার, হিরির ও তাহার সঙ্গিনী আরির ক্রোধ ঈর্ষ্যা ও কৌটিল্য, হার্ম্মেসের প্রতারণা চৌর্য্যবৃত্তি ও শঠতা প্রভৃতি প্রশংসনীয় গুণ বলিয়া তাঁহারা গ্রীক দেবদেবীর পক্ষ অবলম্বন করেন, তাঁহাদের বন্ধুবর্গের ও অভিভাবকগণের কর্ত্তব্য যে মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের কার্য্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি রাখেন । এরূপ বাবুদের জন্য ব্যাকস্ ইপিকিউরস্ আছে, এদেশেও চার্ব্বাকের প্রশস্ত পথ আছে । দুরারোহ ভারতের দেবোপাখ্যানশৈল আরোহণ করিয়া শীর্ষ দেশে কি আছে, তাহা তাঁহাদের দেখিয়া আবশ্যক নাই ।

সমাপ্ত ।

শ্রীব্রজনাথ বিশ্বাস ।

অবেক্ষণশক্তি ।

পাঠক, বড় বিপদে পড়িয়াছি । নানা কারণে কিছু দিন বান্ধবসম্পাদকের কিছু মাত্র অবকাশ ছিল না ; এই হেতু কএক সংখ্যা বান্ধব প্রকাশে বিলম্ব হয় । আপনারাও 'অনবকাশের' ওজর গ্রাহ্য করিবেন না ; সুতরাং সম্পাদক লেখকদিগের নিকট প্রবন্ধ চান । করি কি লেখনী হস্তে কাগজ সম্মুখে লইয়া ভাবিতে ভাবিতে একটি বিষয় নির্ণয় করিলাম ; কিন্তু কি নামে বিষয়টির নামকরণ করি, তাই ভাবিয়াই অস্থির । 'দৃশ্', 'লুচ্' ও 'ঈক্ষ্' তিনটি ধাতু লইয়া একে একে উপসর্গ গুলি যোগ করিয়া দেখিলাম, কিছুতেই ইংরেজী শব্দটির প্রতিশব্দ পাইলাম না । অবশেষে যেটি নির্ব্বাচন পূর্ব্বক উপরে স্থাপিত করিয়াছি, তাহাও মনোমত হয় নাই । তবে ইংরেজী উপসর্গের সহিত বাঙ্গলা উপসর্গটির মিল আছে, এইমাত্র । এস্থলে একটি গল্প মনে পড়িল । গত দুর্ভিক্ষ হইতে গবর্ণমেণ্ট ষ্টাটিষ্টিক্ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন । কোন স্থানের কালেক্টর একজন বাঙ্গলানবিশ ডেপুটীকালেক্টরের প্রতি উহা সংগ্রহ করিতে আদেশ করিবেন, মনে করিয়া, পাছে উক্ত কর্ম্মচারী ঐ শব্দের অর্থ না বুঝেন, এই সন্দেহ করিয়া,

সেরেস্তাদারকে কহিলেন, উহা বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া দেও। সেরেস্তাদারের মহা বিপদ, দিশাহারা হইয়া তিনি উচ্চারণ সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া লিখিলেন 'স্থিতি স্থাপক।' সাহেব সন্তুষ্ট হইলেন, ভাবিলেন সেরেস্তাদার বেশ বাঙ্গলা জানেন। কিন্তু পাঠক আমার অনুবাদটি কি আপনাদের নিকট তদ্রূপ 'পাশ' হইবে? যাহউক, সংপ্রতি মূল প্রস্তাব আরম্ভ করা যাউক।

শ্রীমতী মিস্ নাইটিংগেলের নাম অনেকেই অবগত আছেন। তিনি কহিয়াছেন, 'চিকিৎসালয়ে যে সকল ধাত্রী আছে, তাহাদের অন্যান্য গুণ সত্বেও একটি প্রধান দোষের জন্য রোগীদিগের তত সুবিধা হয় না। সে দোষটি অবেক্ষণের অভাব, এ দোষটি শুদ্ধ ধাত্রীদিগের নহে; প্রায় লোক মাত্রেরই। যদি লোক মাত্রেই এই শক্তিসম্পন্ন হইত, তবে পৃথিবীতে উন্নতি বিষয়ে এতদিন যুগান্তর উপস্থিত হইত। কেহ বলেন, অভিজ্ঞতাদ্বারা লোকে জ্ঞানী হয়, অর্থাৎ কেহ দেখিয়া শিখে, কেহ ঠেকিয়া শিখে, আবার কেহ বা ঠকিয়া শিখে। কিন্তু আমরা বলি এ মত নিরবচ্ছিন্ন ভ্রমশূন্য নহে। কারণ, 'দেখা' 'ঠেকা' দূরে থাকুক, অনেকে পদে পদে 'ঠকিয়াও' যে অজ্ঞ সেই অজ্ঞই থাকে। যাহাদের চরিত্রে স্বাভাবিক দোষ থাকে, কোনরূপ অভিজ্ঞতাই তাহাদিগকে জ্ঞানী করিতে পারে না। যদি তাহা হইত, তবে প্রথম চার্লস ভূপতি রাজ্যচ্যুত ও ছিন্নশির হইতেন না। বোর্‌বন পরিবার কোন কালে জ্ঞানী হইল না; তাহা হইলে আজিও ফরাসের সিংহাসনে তাহারা বিরাজ করিত। কুলাঙ্গার জয়চন্দ্র ঘোরিয়ান মহম্মদকে বৈরনির্য্যাতন মানসে আহ্বান করাতে ভারতরাজ্য ম্লেচ্ছকবলিত হইল; তাহাতে যদি হিন্দুদিগের জ্ঞানোদয় হইত তবে কি পলাসীর অভিনয় হইত? ঐতিহাসিক প্রমাণেরই বা প্রয়োজন কি? আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই অনেক লোক চিরকালই নির্ব্বুদ্ধিতা প্রদর্শন করেন। অনেকে বাল্যকালে বরং একটুকু জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি দেখান, যত বড় হন্ নির্ব্বুদ্ধিতা তত বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অবেক্ষণশক্তিসম্পন্ন লোকই স্বতন্ত্র— বাল্য ও বার্দ্ধক্যের সহিত উক্ত শক্তির কোন সম্পর্ক নাই। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট যখন প্রথম কন্সল হন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম কত? কিন্তু তখন তিনি অস্ট্রিয়ার অনেক বৃদ্ধ ও সমরাভিজ্ঞ সেনাধ্যক্ষকে পরাভব করিতে পারিয়াছিলেন। সেনানী উল্‌ফ্ কেমন বিক্রম প্রকাশ করিয়া সমরক্ষেত্রে শায়িত হইয়াছিলেন! অথচ মৃত্যু সময়ে তদীয় বয়ঃক্রম এত অল্প ছিল যে,তাঁহাকে বালক-সেনানী বলিলেও হয়; কিন্তু তদানীন্তন বয়োবৃদ্ধ সেনানীরাও তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিতেন। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী উলিয়ম পিট অপরিণত বয়সে পার্লিয়ামেণ্ট স-

তাতে তদীয় বিদ্রুপকারিদিগকে কেমন প্রবীণোচিত উত্তর দিয়াছিলেন! বালক—ফার্গুসন এক গাছি সূত্র লইয়া খেলাইতে খেলাইতে নিশ্চল-নক্ষত্রপটলের পরস্পর ব্যবধান পরিমাণ করিয়াছিলেন এবং বায়ুর অবস্থা-নির্ণয় করিয়া কতই প্রাজ্ঞতা দেখাইয়াছিলেন। এই মহাত্মারা সকলেই অবেক্ষণগুণে অপরাপর লোকদিগের অপেক্ষা এত শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। ফলতঃ অবেক্ষণবিশিষ্ট বালক অনেক বয়োবৃদ্ধ অপেক্ষা যে প্রবীণ তাহার আর ভুল নাই।

জ্ঞানকে ঈশ্বরদত্ত গুণ বলিলে অসঙ্গত হয় না। অবেক্ষণই জ্ঞানের প্রসূতি ও ধাত্রী। এই অবেক্ষণশক্তি অন্যান্য শক্তির ন্যায় অভ্যাসে পরিবর্দ্ধিত হয়। মিস্ নাইটিংগেল্স যাদুকর বরার্ট হুডিনের নাম উল্লেখ করিয়া কহেন 'সে অকিঞ্চিৎকর বিষয়ের জন্য বিখ্যাত হইলেও, অবেক্ষণশক্তির পরিচালনার নিমিত্ত স্বীয় পুত্রকে যে পদ্ধতির অনুসরণ করিতে পরামর্শ দিয়াছিল, তাহা অত্যন্ত প্রাজ্ঞোচিত।' সে পদ্ধতিটি এই ;—হুডিন স্বীয় পুত্র সমভিব্যাহারে দ্রুতবেগে কোন বিপণীর নিকট দিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে তাহাকে তন্মধ্যস্থ দ্রব্য সকলের প্রতি মনোযোগ পূর্ব্বক দৃষ্টি করিতে বলিত। পরে পিতাপুত্রে সেই দৃষ্ট বস্তু গুলির একটি তালিকা লিখিত। এইরূপে উক্ত বালকের অবেক্ষণশক্তি এত উন্নতি লাভ করিয়াছিল যে, সে একবার কোন দোকানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, তন্মধ্যস্থ ৬০। ৭০টি বস্তুর আকৃতিস্থিতি প্রভৃতির যথাযথ বর্ণন করিতে পারিত। ইহারা 'দিব্যচক্ষু' বলিয়া লোকসমাজে পরিচয় দিয়া অর্থোপার্জ্জন করিত। বালক হুডিন এরূপ আশ্চর্য্য শক্তি লাভ করিয়া ছিল যে, কোন গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র তাহার চক্ষুর্দ্বয় সম্পূর্ণরূপে বন্ধন করিয়া ফেলিলেও, সে, গৃহস্থিত সমুদয় ব্যক্তি ও সকল সামগ্রীর সূক্ষ্ম বর্ণন করিয়া দর্শকদিগকে চমৎকৃত করিতে পারিত। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিত যে, সে শিরা ও ধমনী সংযোগে সমুদায় বস্তু দেখিতে পায়।

পাঠক মহাশয়দিগকে হুডিন দ্বয়ের ন্যায় যাদুকর হইবার জন্য আমরা পরামর্শ দেই না; কিন্তু অবেক্ষণশক্তির পরিচালনা বিষয়ে তাহারা নিশ্চয়ই অনুকরণীয়। এই শক্তির কত যে মহৎফল তাহা বলা যায় না। প্রাত্যহিক ব্যাপারে ইহার অভাবজনিত কুফল সর্ব্বদাই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। প্রভু অবেক্ষণশক্তি বিরহিত হইলে ভৃত্যের দ্বারা আশানুরূপ কার্য্য পান না; কোন বিষয়ে মধ্যস্থতা করিতে গেলে ভ্রমে পতিত হইতে হয়; একটি সামান্য উদাহরণ প্রদর্শন করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। কিছুদিন হইল কোন বিদ্যালয়ের, একটি বালক সমপাঠীর একখান পুস্তক

অপহরণ করিয়াছিল ; উক্ত পুস্তকের যে যে স্থানে অধিকারির নাম লেখা ছিল, তাহা তুলিয়া ছিল, পুস্তকের মলাট পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিয়া ছিল, কিন্তু অধিকারী পত্রসমষ্টির গাত্রে পেন্সিল দিয়া যে স্বীয় নাম লিখিয়া রাখিয়াছিল, অবেক্ষণাভাব বশতঃ তাহা দেখিতে পায় নাই ; সুতরাং চুরির কএক দিন পরে বিদ্যালয়ে পুস্তক খানি লইয়া আসামাত্র ধরা পড়িল। পাঠক অনেক সময় শুনিয়া থাকিবেন, হতব্যক্তির কোন বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পুলিস কর্ত্তৃক হত্যাকারী ধৃত হইয়াছে।

ইতিহাস মন্থন করিলে এই অবেক্ষণ শক্তির এত ভূরি ভূরি উদাহরণ পাওয়া যায় যে, তৎসমুদয় উল্লেখ করিতে গেলে এই একই প্রবন্ধে অনেক সংখ্যা বান্ধবের কলেবর পূর্ণ হইতে পারে। বালক বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ঘুড়ি উড়াইতে উড়াইতে তাড়িতাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন ; নিউটন আতা ফলের পতন অবলোকনে মাধ্যাকর্ষণ ও শিশুদিগকে সাবানবুদ্বুদ্ লইয়া ক্রীড়া করিতে দেখিয়া বর্ণবিজ্ঞানের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র যখন লিখিয়াছিলেন—

'কাঞ্চীপুর বর্দ্ধমান ছয় মাসের পথ।
ছয় দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ॥'

অথবা ভারতবর্ষে রেলওয়ের কথা হইলে একজন আধুনিক কবিওয়ালা যখন গাইয়াছিল—

'লোকে একদিনে কল্‌কাতা হ'তে সদা
যাবে কাশী।'

তখন লোকে উহা কবিকল্পনা বলিয়া ভাবিয়াছিল মাত্র ; কিন্তু রেলওয়ে তাহা সত্য ঘটনা বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে। অবেক্ষণপ্রভাবে একটি সামান্য ঘটনা দেখিয়া জেমস্ ওয়াট এই বৃহৎ কাণ্ডের আবিষ্কার করেন। কেৎলিতে চা সিদ্ধ হইতেছিল, তখন পাত্রমধ্যস্থ রুদ্ধবাষ্পপ্রভাবে আবরণটি উত্থিত হইতেছে দেখিয়া ওয়াটের অন্তঃকরণে বাষ্পের শক্তির ভাব প্রথম উদিত হয়, এবং তাহারই ফল বাষ্পীয় পোত, বাষ্পীয় শকট প্রভৃতি *। এই যে ঘটিকাযন্ত্রটিতে টক্ টক্ করিয়া দোলকটি ইতস্ততঃ নড়িতেছে, ইহাও অবেক্ষণের ফল। পাইসা নগরীর একটি গির্জাতে একজন ফরাশ সন্ধ্যা সময়ে ঝাড় লণ্ঠন জ্বালিয়া দিতেছিল, একটি শিকে হস্ত লাগিয়া ইতস্ততঃ দুলিতে লাগিল ; তাহা দেখিয়া গালিলিওর মনে হইল, যদি কোন ক্রমে এরূপ ভাবে একটি বস্তু দোলাইয়া দেওয়া যায় যে, তাহা বাধা না পাইলে চির দিন দুলিতে পারে তবেই তদ্দ্বারা সময় নিরূপণ করা যায়। এই সিদ্ধান্ত

* এই স্থলে পাঠককে কিংসিলীকৃত 'মেডাম হাউ লেডী হোয়াই' গ্রন্থের ভূকম্প প্রস্তাবটি ; ও ব্লেনফোর্ডকৃত প্রাকৃত ভূগোলের উপক্রমণিকাটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

হইতেই ঘটিকাযন্ত্রের সৃষ্টি। সামুদ্রিক মানচিত্র ও সামুদ্রিক স্রোত অবেক্ষণ করিয়া কলম্বস নূতন মহাদ্বীপের সত্ত্বা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। পুনশ্চ যখন কলম্বসের সঙ্গিগণ ত্যক্ত ও ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া হতাশচিত্তে তদীয় প্রাণ সংহার করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিল, তখনও তিনি এই শক্তির প্রভাবে একটি সামুদ্রিক তৃণ ও কএকটি পক্ষী দেখাইয়া কহিয়াছিলেন ভূমি অধিক দূর নহে। কলম্বসের নামের উল্লেখ করাতে একটি গল্প মনে পড়িল, তাহা সংক্ষেপে বর্ণন না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারি না *। কলম্বসের বিদ্বেষিরা বলিয়া ফিরিতেন, আমেরিকা আবিষ্কারে তাঁহার অধিক গুণপনা কি প্রকাশ পাইয়াছে? উহা অনেকেই পারিত, অথচ পূর্ব্বে অনেকেই কলম্বসের কথাকে উন্মাদের প্রলাপ বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন †। একদা কোন স্থানে কলম্বসের কএক জন দ্বেষ্টা একত্রিত হইয়া ঐরূপ বিদ্রুপ করিতেছেন, তখন কলম্বস একটি অণ্ড সোজাভাবে বসাইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন 'আপনারা এক আঘাতে এটি ভগ্ন করুন' সকলেই অকৃতকার্য্য হইলেন: তখন কলম্বস অণ্ডটিকে ঈষৎ হেলাইয়া বসাইয়া অল্প আঘাতেই ভগ্ন করিলেন। তখন সকলেই হাসিয়া করতালি দিয়া উঠিলেন 'ওরূপ করিলে আমরাও পারিতাম' তখন কলম্বস গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন 'মহাশয়গণ, হাস্য ও করতালি প্রদান করা সহজ বটে; কিন্তু এই বুদ্ধিটুকু পূর্ব্বে আপনাদের কাহারও ঘটে আসে নাই'। তখন সকলেই লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন।

* চেম্বর্স মিসেলেনিতে দ্রষ্টব্য।

† প্রেস্কটের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

আবিসিনিয়ার যুবরাজ স্বাধীন পশু পক্ষীর সহিত স্বীয় অবস্থার তুলনা করিয়া দুঃখিত হৃদয়ে বসিয়া আছেন। 'সুখনিকেতন' হইতে প্রস্থান করিতে এতদিন কোন যত্নই করেন নাই, এই ভাবিয়া আপনাকে ধিক্কার দিতেছেন; এমন সময়ে একটি দাসী একটা কাচপাত্র ভাঙ্গিয়া দুঃখ করিতেছিল, সহসা বলিয়া উঠিল, 'যাহা গিয়াছে তাহা যখন আর পাওয়া যাইবে না, তখন গতানুশোচনায় ফল কি?' যুবরাজ চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, 'আমি কি অন্ধ! এই সহজ সত্যটুকু আমি অগ্রে বুঝিতে পারি নাই!' * আর একটি গল্প আছে। কোন সময়ে এক জন প্রবলপ্রতাপ নৃপতি কোন দূর দেশ জয় করিবার জন্য সমরসজ্জা করিতেছিলেন, তদ্দৃষ্টে তদীয় একজন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন 'এদেশ জয় হইলে কি করিবেন?' রাজা বলিলেন 'আর এক দেশ জয় করিব।' বন্ধু 'সেটি অধিকৃত হইলে?' রাজা 'অপর একদেশ।' বন্ধু 'তার পর?' রাজা 'এইরূপে ভূমণ্ডল অধিকার করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করিব।' বন্ধু

* জন্সন কৃত রাসেলাস দেখ।

কহিলেন 'এখনই যদি ভাবেন যে, ভূমণ্ডল অধিকৃত হইয়াছে, তবে ত অর্থনাশ, শারীরিক কষ্ট, মানসিক ক্লেশ ও অনিশ্চিত জয়পরাজয়ের চিন্তা ভোগিতে হয় না। সুতরাং সুখে কাল কাটাইতে পারেন।' রাজা চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, 'এই সূক্ষ্ম দর্শনটি আমার এত দিন হয় নাই। আমি যথার্থই অন্ধ।' ফলতঃ রাসেলাস ও এই নৃপতির ন্যায় আমরা সকলেই অন্ধ! অবেক্ষণশক্তির অপরিচালনাই এই অন্ধতার মূল।

কতিপয় বৎসর অতীত হইল জেনার নামে একজন অতি সামান্য ডাক্তর সাড্‌বারি নামক স্থানে চিকিৎসা করিতেন। উদ্ভিদ্‌বিদ্যা বিষয়ে বহু গবেষণাদ্বারা তদীয় অবেক্ষণশক্তি ইতিপূর্ব্বেই বিলক্ষণ উন্নত হইয়াছিল। তখন ইংলণ্ডে বসন্ত রোগের এমন প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছিল যে, প্রতি দিন বহুলোক এই রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিত। এমন কি অনেক পরিবার সমূলে ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। একদা ডর্‌সেটসায়র-বাসিনী এক জন গোপিনী জেনারের নিকট কোন রোগ দেখাইতে আসিলে, জেনার তাহাকে বলিলেন সাবধান বসন্ত রোগে যেন আক্রান্ত না হও। তাহাতে উক্ত গোপিনী কহিল, কিছু দিন হইল আমার 'গোবসন্ত' হইয়া গিয়াছে, সুতরাং বসন্তে আমার ভয় নাই। এরূপ কথা অনেক চিকিৎসকই ইত্যগ্রে শুনিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই গ্রাহ্য করেন নাই। জেনার গোপিনী প্রমুখাৎ এই কথা শুনিবামাত্র স্মরণ-পুস্তকে লিখিয়া লইলেন,এবং ক্রমাগত অনুসন্ধান করিয়া নির্ণয় করিলেন যে, গোবীজ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে বসন্ত রোগের প্রায়ই ভয় থাকে না। সেই হইতে গোমসূর্য্যাধানের প্রচলন হইয়া কত লোকেরই প্রাণরক্ষা হইয়াছে! এবং অবেক্ষণ গুণে জেনারের নামও লোকহিতৈষি বলিয়া চিরস্মরণীয় থাকিবে *। আর প্রস্তাব দীর্ঘ করিবার প্রয়োজন নাই। উপসংহার কালে এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, পণ্ডিত ও মূর্খে যে প্রভেদ, তাহার কারণ একজন অবেক্ষণবিশিষ্ট, অপর জন তাহা নহে।

শ্রীজ—

---

* গোমসূর্য্যাধান নামক চটি পুস্তকে দেখ।

ঘোমটা

এদেশে ঘোমটার ব্যবহার কত কাল যাবৎ? ইতিহাসে এই জিজ্ঞাসার সদুত্তর নাই। অনেকেরই এইরূপ ধারণা যে, হিন্দু রাজাদিগের সময়ে হিন্দু মহিলাদিগের মধ্যে ঘোমটার প্রচলন ছিল না;—যে অবধি ভারতে যবনের অত্যাচার, ভারত-ললনার মুখমণ্ডলেও সেই অবধিই ঘোমটা।

একথা অংশতঃ সত্য হইলেও আমার নিকট সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত বোধ হয় না। ভারতবর্ষে পূর্ব্বেও যদি কোন না কোন রূপ ঘোমটার ব্যবহার না থাকিবে, তবে অবগুণ্ঠন ও অবগুণ্ঠিকা প্রভৃতি শব্দ কোথা হইতে আসিল? বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক সাহিত্যে ইহার ভূরিপ্রয়োগ দৃষ্ট হয়, ব্যাসের মহাভারতে ইহার উল্লেখ আছে, এবং অনুসন্ধান করিলে তৎপূর্ব্ব-বর্ত্তি গ্রন্থাদিতেও যে ইহা দৃষ্ট হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু ইহাও অবধারিত যে, এখনকার ঘোমটা আর তখনকার অবগুণ্ঠন একরূপ কিংবা একই বস্তু নহে। এখনকার কুল-কামিনীরা সূর্য্য চন্দ্র, তরু লতা এবং পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গীর নিকটও ঘোমটা দিয়া থাকেন; তখনকার কুলকামিনীরা অপরিচিত সভাস্থল ভিন্ন প্রায়শঃ কোন স্থলেই মুখে অবগুণ্ঠন দিতেন না, এবং যাঁহাদিগের সহিত স্নেহমমতা কি প্রীতির কোনরূপ সম্পর্ক, কিংবা ভাল পরিচয় থাকিত, তাঁহাদিগের নিকট কখনও অবগুণ্ঠন দিয়া, শারদীয় উৎসবের অবগুণ্ঠনাবৃতা কদলী-বধূর ন্যায় দণ্ডায়মান হইতেন না। তাঁহারা শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজনদিগের নিকট কন্যার ন্যায় থাকিতেন, দেবর ও ননান্দৃ প্রভৃতি স্বসম্পর্কিত প্রিয় ব্যক্তিদিগকে ভ্রাতা ও ভগিনীর মত জানিতেন, এবং কি প্রতিবেশী, কি পৌরবর্গ, কি দূরাগত অতিথি, কি অভ্যর্থিত সাধু সজ্জন, সকলের নিকটই নিরবগুণ্ঠন কথোপকথন ও নির্ম্মুক্তবিচরণে অধিকার পাইতেন।

কালিদাসের শকুন্তলা, দুষ্মন্তের জন-কোলাহলপূর্ণ অদৃষ্টপূর্ব্ব রাজসভায় আসিয়া অবগুণ্ঠন ব্যবহার করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু সেই দুষ্মন্ত যখন তাঁহার পিতার তপোবনে প্রথম উপনীত হন, তখন তিনি এবং তাঁহার সহচরীরা দুষ্মন্তের সমুচিত আদর ও সৎকার করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠিত হন নাই। ভবভূতির জনকতনয়া, পাদপকণ্ঠলগ্ন বাতচুলিত ব্রততীর ন্যায়, রঘুকুলপতির কণ্ঠলগ্ন রহিয়াও,রাজদূত, রা-

ষর্ষি এবং লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্রপ্রভৃতি রাজ-পুরুষদিগের সহিত স্বচ্ছন্দ আলাপ করিয়াছেন। ইন্দুমতী ফুল্লারবিন্দ-সরোবর-সদৃশী স্বয়ংবরসভার রাজহংসীর ন্যায় লীলা করিয়াও অনবদ্যা রহিয়াছেন। দময়ন্তী দেবপ্রেরিত নিষধ-নাথের নিকট অম্লানবদনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রত্যেক কথায় প্রত্যুত্তর দিয়াছেন। পাঞ্চালী কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রভৃতি তেজঃপুঞ্জ তাপসদিগের সান্নিধ্যেও রাজনীতির নানা কথা লইয়া বাদবিতর্ক করিয়াছেন, এবং পুরনারীরা সকলেরদিকেই মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিয়াছেন।

যাহা হউক, সে অতীত কাহিনীর আলোড়ন করা, আমার এইক্ষণকার অভিপ্রেত নহে। ভারতললনার বর্ত্তমান ঘোমটা যবনাচারের অনুকরণ, কিংবা যবন রাজাদিগের অত্যাচারেরই ফলস্বরূপ হউক, অথবা ইহা ভারতসমাজের ক্রমিক অধঃপাত হইতেই সমুদ্ভাবিত হইয়া থাকুক, ইহাকে এখনও যত্নের সহিত রক্ষা করাই উচিত কি না, ইহাই আমার জিজ্ঞাস্য।

প্রাচীন সম্প্রদায়ের পূজ্য ও অপূজ্য, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত অনেকেই হয় ত এই প্রশ্ন শুনিয়া যুগপৎ জ্বলিয়া উঠিবেন, এবং বিবিধ গ্রীবাভঙ্গি সহকারে সমস্বরে বলিবেন যে, কুলের কামিনী ঘোমটা দিবে কি না এবিষয়ে বান্ধবের একজন সহযোগী পণ্ডিতের ব্যবস্থা লওয়ার আবশ্যকতা নাই আমি বলি, আবশ্যকতা আছে। আদৌ ঘোমটা কেন, তাহারই বিচার কর

ঘোমটা কি হিন্দু-ধর্ম্ম-নীতির বিশুদ্ধতা ও পৌরাণিক গৌরবরক্ষার জন্য? এ-কথায় আমার মনে বড় দুঃখ হয়, এবং দুঃখের সঙ্গে হাসি আসে। হিন্দু ধর্ম্ম কি? যে হিন্দুধর্ম্ম পূর্ব্বে আর্য্য-বংশ-তিলক মহানুভাব আচার্য্যদিগের জ্ঞানের অমল জ্যোতিতে সমস্ত জগৎকে আলোকদান করিত, ক্ষত্রবীরদিগের সগর্ব্ব পদনিক্ষেপে পৃথিবীকে কম্পিত রাখিত, —যে হিন্দুধর্ম্ম একদিন সভ্যতার শিরোরত্ন স্বরূপ শোভা পাইত, এবং যোগে ভোগে সদাচারের প্রবর্ত্তনা করিয়া, সমাজে সর্ব্ব প্রকার সুনীতির পথ দেখাইয়া এবং সামাজিকতায় কবিকল্পনার সুধা ঢালিয়া, প্রকৃত সৌরকান্তিতে বিলসিত রহিত, সেই হিন্দুধর্ম্ম কি আজ ব্রহ্মাণ্ডের সকল ছাড়িয়া এবং প্রাচীনা কীর্ত্তির সকল লীলায় জলাঞ্জলি দিয়া হিন্দু-কুল-ললনার ঘোমটায় গিয়া লুক্কায়িত রহিয়াছে? তবে কি ঘোমটা লজ্জার অনুরোধে? ইহাও আমি মানিতে পারি না।

প্রচলিত লজ্জার অনেক প্রকার আছে, এবং উহা এক বিচিত্র বস্তু। আমি বহু চিন্তা করিয়াও উহার অনন্ত চাতুরীর অন্ত পাই নাই, এবং কোন দিনও যে পাইব আমার মনে এমন আশা নাই। ফলতঃ কিসে লজ্জা যায়, আর কিসে লজ্জা থাকে, তাহা মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, দেবতারও বুদ্ধির অগম্য। বিলাতের বিবিরা অর্দ্ধবিবসনা হইয়া অজ্ঞাতচরিত্র পু-

রুষের সহিত প্রকাশ্য স্থলে তালে তালে নাচিতে গাইতে পারেন, পূর্ব্বরাগের পুষ্পিত ছলনায় যে ভাবে ইচ্ছা সেই ভাবে এবং যাঁহার সহিত ইচ্ছা তাঁহার সহিতই প্রণয়ের খেলা খেলিতে পারেন, এবং অশ্বারূঢ়া উগ্রচণ্ডার মত, অশ্বপৃষ্ঠে সমারূঢ়া হইয়া, পুরুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনায়াসে প্রধাবিত হইতে পারেন। ইহার কিছুতেই তাঁহাদিগের লজ্জা বিনষ্ট হইয়া যায় না। কিন্তু চরণতলের আবরণ ক্ষণকালের তরেও উন্মোচন করিলে, অথবা কাহারও অধরে তাম্বুলরাগের রেখামাত্র দেখিলেই তাঁহারা লজ্জায় একেবারে মরিয়া যান।

আমাদিগের মধ্যেও লজ্জার এইরূপ রসবৈচিত্র্য এবং সর্ব্বত্রই সেই বিচিত্রতার অসংখ্য উদাহরণ। যথা, বিনোদবালার শাশুড়ী বড় লজ্জাশীলা। সকলেই বলে, তিনি লজ্জার শাসনে জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ সহোদরেরও মুখের দিকে চাহিয়া কথা কহিতে সমর্থ হন না, এবং তাঁহার স্বামীর সহিতও কোন দিন কথা কহিয়াছেন কি না, তাহা কেহ জানে না। কুলের কামিনী নির্লজ্জা হইলে তাঁহার মনে এমনই ঘৃণা ও 'স্ত্রীযন্ত্রণা' উপস্থিত হয় যে, যদি তাঁহার পুত্রবধূটি, সীমন্তে সিন্দুর দেওয়ার অভিলাষে, দর্পণের সম্মুখেও মুখের ঘোমটা ফেলিয়া বসে, তাহা হইলেই তিনি শিরে শতবার করাঘাত করেন, এবং কলির পাপাচারে আর লেখাপড়ার পাপচর্চ্চায় পৃথিবীর লজ্জা সঙ্কোচ যে একবারে প্রক্ষালিত হইয়া গেল, ইহা চিন্তা করিয়া অতি গদ্গদ কণ্ঠে বিলাপ করিতে থাকেন। কিন্তু এদিগে পাঁচজনের মধ্যে অন্নব্যঞ্জনাদি পরিবেশনের সময় শান্তিপুরের দিগম্বরী পরিয়া বাহির হইতে তাঁহার কষ্ট হয় না, গৃহের ভৃত্যাদির উপর পুরুষের মত তাড়না ও তর্জ্জন করিতে তাঁহার জিহ্বা একটুকুও বাধে না, এবং খিড়কীর ঘাটে কি ছাদের উপরে হাট মিলাইয়া বসিতে—এই আধ বৃদ্ধবয়সেও বাসরগৃহে রাইরঙ্গিণী সাজিতে, কৌতুকপ্রসঙ্গে কথার ছড়া কাটিতে এবং বাসি বিবাহের কাদাখেলা লইয়া, কমলকাননে করিণীর ন্যায় প্রমত্ত ক্রীড়া করিতে তাঁহার চিত্ত কখনও কোনরূপ কাতরতা অনুভব করে না! বাড়ির বহিঃপ্রাঙ্গণে যখন কবিওয়ালার নৃত্য হয়, তখন তাঁহার কৌতূহল সকলের উপরে। তিনি তখন সমবয়স্কাদিগকে লইয়া সখ করিয়া সখীসংবাদ শুনেন, এবং যখন লহরীর আরম্ভ হয়, তখন তিনি তিরস্করণীর অন্তরালে চাতকীর ন্যায় তৃষিত উপবেষ্টা রহেন!

বিরাজ মোহিনীর বড় পিসীও নিতান্ত লজ্জাবতী। তিনি কিয়ৎপরিমাণে সেকেলে লোক। এখনকার কুৎসিত রীতি নীতি তাঁহার চক্ষে বিষ। ঘরের ঝি বউর ত কথাই নাই, পাড়া প্রতিবেশীর মেয়েরাও তাঁহার ভয়ে সতত জড় সড় রহে। তিনি সর্ব্বদাই সকলকে লজ্জার কথা লইয়া

নানা দৃষ্টান্তে উপদেশ দেন ও শাসন করেন; এবং অতি ঘনিষ্ঠ কোন ব্যক্তিও যদি সহসা নিকটে আসে, তিনি তৎক্ষণাৎই আজানুবিলম্বিত ঘোমটা টানিয়া সহর্ষকম্পিত স্ফুরিত কলেবরে এক পার্শ্বে সরিয়া পড়েন। কিন্তু তাঁহার শরীরে ক্রোধ একটুকু অধিক। ঐরূপ ক্রোধ যে নিন্দনীয়, এমন কথা বলিতে আমি সাহস পাইতেছি না। আমার কেবল এইমাত্র বক্তব্য যে, তাঁহার হৃদয় সময়ে সময়েই ক্রোধে ঈষৎ আচ্ছন্ন হয়। তিনি যখন সেই অবলা-জন-সুলভ ক্ষণস্থায়ী ক্রোধের ক্ষণিক উত্তেজনায় বাড়ির ভিতর হুঙ্কার দেন, বহির্বাটীর প্রাচীর চত্বরও তখন থর থর কাঁপিয়া উঠে এবং গ্রাম্য পাঠশালার অনেক গজকণ্ঠ পণ্ডিত এবং দুর্ব্বার বালকবৃন্দও তখন ক্ষণকালের জন্য চিত্রার্পিতবৎ স্তম্ভিত রহে। কেহ পার্শ্বমাণে তাঁহার সহিত বিবাদ বাধাইতে যায় না। কারণ সকলেই সংসারে সন্তানসন্ততি লইয়া সুখে বাস করিতে ইচ্ছা করে। তথাপি, যদি দৈবাৎ ও দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার সহিত সত্য সত্যই কাহারও বিবাদ বাধিয়া উঠে, তবে তাঁহারই একদিন, কি তাহারই এক দিন। তিনি তখন একে একসহস্র এবং মূর্ত্তিমতী মহিষমর্দ্দিনী। তাঁহার আলুলায়িত কেশকলাপ তখন ঝঞ্ঝা-বায়ু-বিতাড়িত কাদম্বিনীর কমনীয় কান্তি ধারণ করে, চক্ষে আগ্নেয় গিরির অভিনয় হয়, অঞ্চলের বস্ত্র কটিবন্ধনে পরিণতি পায়, বাহুবল্লরী নাবিকের ক্ষেপণীর ন্যায় পুনঃ পুনঃ উৎক্ষিপ্ত ও প্রক্ষিপ্ত হইতে থাকে, চরণদ্বয় শস্যনিষ্পেষণ দণ্ডের শক্তি ও মহিমা কাড়িয়া লয়, এবং ফেনায়মান বদনারবিন্দ তটিনীর ফেন-সমাচ্ছন্ন শ্বেত পুলিনকেও বারংবার ধিক্কার দেয়। এ সকল কিছুতেই তাঁহার লজ্জার ব্যাঘাত হয় না, এবং অন্যকে লজ্জাহীনা বলিয়া তিরস্কার করিবার বংশানুক্রমিক অধিকারও ইহাতে কোন ক্রমেই কমায় না!

প্রকৃত লজ্জা আর এক সামগ্রী। উহা বস্তুতঃই অবলার অমূল্য আভরণ এবং আভরণ অপেক্ষাও অধিকতর মূল্যবান্ এক প্রীতিপ্রদ মনোহর আবরণ। উহা অবলার মুখচ্ছবিকে ছায়ার ন্যায় ঢাকিয়া রাখে, দৃষ্টির তীব্রতা ও চাঞ্চল্য বিনাশ করে, অথচ দৃষ্টিতে কবিজনস্পৃহণীয় কি এক অপূর্ব্ব মাধুরী আনিয়া মাখিয়া দেয়, কথার কঠোরতাকে কোমলতায় দ্রবীভূত করায়, এবং ক্রমশঃ বিকশিত, ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া, পবিত্রতারই আর এক মূর্ত্তির মত অঙ্গে একেবারে মিশিয়া যায়। সেই লজ্জা কি এই? যদি লজ্জার জন্যই ঘোমটার আবরণ, তাহা হইলে অণুবীক্ষণেরও অদৃশ্য ঊর্ণনাভসূত্রের পরিচ্ছদ কেন? শরীরের যে সকল অঙ্গ আভরণের ছটায় প্রদর্শন করিতে পণ্যবিলাসিনীরও লজ্জিত হওয়া উচিত, সে সকল অঙ্গে আভরণ কেন? যে মৃদু মধুর মোহন হাস্য অবলার বিম্বাধরে কুসুমের অস্ফুট বিকাশের ন্যায়

সুন্দর দেখায়, সেই হাস্যের এই ভীষণ হিল্লোল কেন ? আর, পুরুষের উপর শ্লেষ পরিহাস, পুরুষেরও অবশ্য-পরিহার্য্য অসঙ্গত আমোদ প্রমোদে উৎসাহ ও আনন্দ এবং বিরোধের ঘনঘটা ও ভৈরব গর্জ্জন কেন ?

ঘোমটা অবলার লজ্জারক্ষার সহায় হওয়া দূরে থাকুক, আমার বিবেচনায় লজ্জার অমন ছদ্মবেশ,নিমন্ত্রিত শত্রু অল্প আছে। যাঁহারা একথার গূঢ়ভাব গ্রহণে অসমর্থ, তাঁহারা, লোকাচারের পঙ্কিল পরিণামে, মানবপ্রকৃতির মর্ম্মার্থ পাঠ করিতে যত্নপর হইবেন, এবং য়িহুদী দিগের পুরাতন ধর্ম্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের যে এক পুরাতন কাহিনী আছে, তাহারও তাৎপর্য্য পরিগ্রহে চেষ্টা করিবেন। এদেশে ঘোমটাই সেই নিষিদ্ধ ফল, সেই রহস্যের রহস্য ; এবং নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, আজও ইহা আর্য্যসমাজ বলিয়া পরিচিত নির্ম্মল হিন্দুসমাজের একার্দ্ধকে কুলকলঙ্কের মত ঢাকিয়া রাখিতে অধিকার পাইতেছে !

আমরা অনেক সময়ে অনেক শুদ্ধচারিণী কুলকামিনীরও চক্ষে কেমন এক চটুলতা, হৃদয়ে কেমন এক তরলতরঙ্গ এবং মনে কেমন এক কৌতূহলের আকুলতা দেখিয়া, অধোবদন হইয়া রহি। প্রকৃত প্রস্তাবে ঘোমটার কৃত্রিম আবরণই এ সকল কৃত্রিম বিভ্রমবিলাস ও কৃত্রিম লীলাচাতুরীর প্রধান কারণ। চক্ষুর স্বাভাবিক লালসা লোকনিগ্রহে নিরুদ্ধ হয় ; এবং নিরুদ্ধ হইয়া, অস্বাভাবিক বর্ত্মে বিচরণ করে। হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রবাহ গতিপথে বাধা পায় ; এবং বাধা পাইয়া অস্বাভাবিক গর্হিত পথে গড়াইয়া পড়ে। মনের অনিবার্য্য জ্ঞানতৃষ্ণা স্বাভাবিক আনন্দে বঞ্চিত হয় ; এবং বঞ্চিত হইয়া অস্বাভাবিক আনন্দে তৃপ্তির অন্বেষণ করিতে থাকে। আমরা অনেক স্থলে আবার অনেক সাধুবৃত্ত যুবজনদিগের মধ্যেও পুরসুন্দরীদিগের প্রচ্ছন্নরূপরাশি দেখিবার মতি ও প্রবৃত্তির পরিচয় পাইয়া ব্যথিত হই। একটুকু চিন্তা করিলেই প্রতীত হইবে যে, ঐ ঘোমটাই তাহার মূল। অবলার সুমার্জ্জিত রুচি, সুশিক্ষিত চক্ষু সামাজিক পবিত্রতার অদ্বিতীয় সুহৃৎ। যাহারা কিছুতেই লজ্জা পায় না, কিছুতেই আচারগত উচ্ছৃঙ্খলতাহইতে নিবৃত্ত হয় না, এবং কিছুতেই আপনাদিগের অসভ্যতা ও অবজ্ঞাজনক ইতরতা অনুভব করিয়া সঙ্কুচিত হইতে শিখে না, অবলার অমৃতাভিষিক্ত গরলময়ী দৃষ্টি তাহাদিগকেও তীব্র কশাঘাতের ন্যায় শাসন করে। ঘোমটা আমাদিগের সমাজকে সেই প্রার্থনীয় শাসনে বঞ্চিত রাখিয়াছে, এবং কতকগুলি কুকবি, কুরসিক, ও সরস্বতীর চিরবিদ্বেষী কুৎসিতচরিত্র নব্য সৌখীনের কাব্যালাপ, কৌতুকরঙ্গ এবং কথকতার এক ক্রীড়া স্থল হইয়া রহিয়াছে।

অপিচ, ঘোমটা এক অপ্রাকৃত দৃশ্য, পুরুষের নির্লজ্জতা ও নিষ্ঠুরতার এক আশ্চর্য্য নিদর্শন। মনুষ্যের চক্ষু এই জগতের সৌন্দর্য্যসাগরে সন্তরণ করিবার জন্য, বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত রাখিবার জন্য নহে। ঐ দেখ, শরতের চন্দ্র তোমার নয়নপথের পথিক হইবার জন্য মেঘের অন্তরালে কতই কি খেলিতেছে, আর হাসিতেছে। ঐ দেখ, মৃদুল মাধবীলতা, তোমার চক্ষু দুটির সহিত প্রণয়ের আলাপ করিবার জন্য কিরূপ দুলিয়া দুলিয়া পড়িতেছে, ও করসঙ্কেত করিতেছে। ঐ দেখ, ধবল গিরির অভ্রভেদি শৃঙ্গ, তোমার কল্পনাকে পৃথিবীর ধুলিকর্দ্দম পরিত্যাগ করিয়া একবার ঊর্দ্ধে উড়িবার জন্য,শ্রবণের অগোচর শ্রুতিগম্ভীরকণ্ঠে কিরূপ ডাকিতেছে ও তোমায় ধিক্কার দিতেছে। প্রকৃতির সহিত এইরূপ কথোপকথনই কাব্যের অমৃত,এবং কাব্যের অমৃতপানেই হৃদয়ের উন্নতি ও বিকাশ। ঘোমটা অবলার চক্ষুকে বস্ত্রে আবৃত রাখিয়া, প্রকৃতির বিড়ম্বনা করে, অবলা-হৃদয়ের উন্নতি ও বিকাশের পথে ভয়ানক অন্তরায় হয়, এবং যিনি প্রকৃতির প্রাণদেবতা ও পবিত্রতার প্রস্রবণ, তাঁহার করলেখায়ও অপবিত্রতার অপবাদ দেয়।

ইতি

শ্রীকল্যাণ ভট্ট শর্ম্মণঃ *

* পরিব্রাজকবর শ্রীযুক্ত কল্যাণ ভট্ট শর্ম্ম আমাদিগের একজন পুরাতন বন্ধু। তিনি বান্ধবের প্রথম বৎসরে, ' কুল বধূ ' প্রভৃতি প্রবন্ধে আমাদিগকে আমোদচ্ছলে বিস্তর উপদেশ দিয়াছিলেন ; আমরা অদ্য তাঁহার এই ঘোমটাশীর্ষক প্রবন্ধহইতেও বিস্তর উপদেশ পাইলাম। কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে হইয়াছে যে, তাঁহার সকল কথায় আমরা সায় দিতে অসমর্থ। ভট্ট মহাত্মা পৌরাণিক সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ। তিনি কিংবা তাঁহার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কেহই কখনও বিলাত যান নাই। সুতরাং, বিলাতী ললনাদিগের পূর্ব্বরাগ, প্রণয়খেলা এবং নৃত্যগীত প্রভৃতি ক্রীড়া প্রসঙ্গে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা শুনা কথা। শুনা কথার উপর তর্ক বিতর্ক এবং বিচারমল্লতা ও শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত আমাদিগের নিকট ভাল বোধ হয় না; এবং শুনা কথার উপর ভর করিয়া জাতি বিশেষের কুলকামিনীদিগকে প্রকারান্তরে লজ্জাহীনা বলিয়া বিদ্রূপ করা আমাদিগের নিকট সঙ্গত জ্ঞান হয় না। বিলাতে নৃত্যাদির যেরূপ প্রচলন আছে, তাহা অতি জঘন্য, কিন্তু বিলাতে প্রণয়িদিগের মধ্যে পরিণয়ের পূর্ব্বে পরস্পরের যেরূপ উপাসনা হইয়া থাকে, সেই পূর্ব্বরাগের পবিত্র লীলাকে কোন অংশেও জঘন্য বলিতে আমাদিগের সাহস জন্মে না। দ্বিতীয়তঃ, ভট্ট মহাশয় অকৃতদার ব্যক্তি। অকৃতদার ব্যক্তি অবলার লজ্জা

সঙ্কোচ ও ' স্ত্রীস্বাতন্ত্র্য ' বিষয়ে অভিজ্ঞের মত কথা কহিতে পারে কি না, সে বিষয়েও আমাদিগের কিঞ্চিৎ সংশয় আছে। তবে ইহা আমরা, সাধারণতঃ, অক্ষুব্ধচিত্তে বলিতে পারি যে, হিন্দুসমাজে হিন্দুর পুরাতন বিশুদ্ধ রীতি নীতি পুনঃ প্রবর্ত্তিত হউক, ইহা আমাদিগেরও ঐকান্তিক কামনা ;—এবং এদেশে ঘোমটা এইক্ষণ যে ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার বিলোপ হওয়া, সহযোগী পণ্ডিতবরের ন্যায় বান্ধবেরও সর্ব্বান্তঃকরণসম্মত ব্যবস্থা।

ইতি সম্পাদকস্য।

আয়ুর্ব্বেদ

আমরা যখনই নিবিষ্টচিত্তে পূর্ব্বতন আর্য্যচরিত পর্য্যালোচনা করি, তখনই দেখিতে পাই যে, আর্য্যগণ কোন বিষয়েই অনুন্নত বা পরপ্রত্যাশী ছিলেন না। তাঁহারা প্রত্যেক বিষয়েই অনন্যসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। এবং প্রত্যেক বিষয়েই অসাধারণ অধ্যবসায়, সুগভীর চিন্তাশক্তি, ও অপ্রতিহত কার্য্যকুশলতার পরিচয় দিয়া পৃথিবীতে আর্য্য নাম পূজনীয় করিয়া তুলিয়াছিলেন।

কিন্তু, নিতান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, প্রাচীন আর্য্যগণ বহুযত্নে ও বহুপরিশ্রমে যে অমূল্য রত্নরাশির সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, কালসহকারে তাহার অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে, যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহাও লুপ্তপ্রায়।

অদ্য আমরা আর্য্যকীর্ত্তিবিটপীর একটি ভগ্নাবশিষ্ট শাখার বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, সেই শাখাটি আয়ুর্ব্বেদ। ক্ষণ-ভঙ্গুর-দেহধারি-মনুষ্যগণের নিত্য প্রয়োজনীয় আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যায় প্রাচীন আর্য্যগণ কিরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, ভারতে উহার কতদূর সমুন্নতি হইয়াছিল, যদিচ ইহাদ্বারা তৎসমুদয় সম্যক্ পরিস্ফুট হইবে না, তথাপি আয়ুর্ব্বেদ বিষয়ে সাধারণের যে কএকটি স্থূল ভ্রম আছে, আশা করি তাহার অপেক্ষাকৃত লাঘব হইবে।

আয়ুর্ব্বেদ কি ? বর্ত্তমান সময়ের অনেকে ইহাও যথার্থরূপে অবগত নহেন। তাঁহাদিগের সংস্কার এইরূপ যে মাধবকর কৃত ' নিদান ' বা চক্রপাণিদত্ত কৃত ' চক্রদত্ত 'ই আয়ুর্ব্বেদ। বস্তুতঃ তাহা নহে।

আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদের এক উপাঙ্গ। শাস্ত্রে আছে, প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রথমতঃ অথর্ব্ববেদহইতে লক্ষশ্লোকাত্মক আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের আবিষ্কার করেন। কিন্তু পরবর্ত্তি সময়ে মনুষ্যগণের আয়ুষ্কাল ও মেধাশক্তির নিতান্ত ন্যূনতা দেখিয়া উপরোক্ত সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রকে সংক্ষেপতঃ

অষ্টভাগে বিভক্ত করেন *। যথা—

১ম, শল্যতন্ত্র (ব্রণবিজ্ঞান এবং যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগের বিধান)।

২য়, শালাক্যতন্ত্র (শলাকা-চিকিৎসা)।

৩য়, কায়চিকিৎসা, (সার্ব্বাঙ্গিক রোগের নিদান ও চিকিৎসা)।

৪র্থ, ভূতবিদ্যা, (গ্রহপ্রতীকারক শান্তিকর্ম্ম ও বলিদানাদি)।

৫ম, কৌমারভৃত্য (শিশুপালন বিধি)

৬ষ্ঠ, অগদতন্ত্র (বিষচিকিৎসা)।

৭ম, রসায়নতন্ত্র (শারীরিক পুষ্টি-সাধন বিধি)।

৮ম, বাজীকরণতন্ত্র (শুক্রদোষসংশোধন ও তদ্বর্দ্ধনোপায়)

ইহার আনুষঙ্গিক পদার্থ নিরূপণ, মনোবিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান, রসায়নতত্ত্ব, আত্ম-নিরূপণ আয়ুস্তত্ত্ব, দ্রব্যগুণবিজ্ঞান স্বাস্থ্যপালনবিধি প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় সমুহও বিবৃত হইয়াছে;

লিখিত আছে—পরম কারুণিক ব্রহ্মা উক্ত প্রকারে আয়ুর্ব্বেদের বিভাগ করিয়া প্রথমতঃ উহা দক্ষ প্রজাপতিকে অধ্যয়ন করান, তৎপরে দক্ষহইতে অশ্বিনী কুমার, অশ্বিনীকুমারহইতে দেবরাজইন্দ্র, ইন্দ্র হইতে ধন্বন্তরি ও ভরদ্বাজমুনি আয়ুর্ব্বেদে শিক্ষা লাভ করেন। *

ধন্বন্তরি ও ভরদ্বাজহইতেই লোক-সমাজে আয়ুর্ব্বেদের প্রথম প্রচার হইয়াছে। অতএব এই সময়কেই আমরা আয়ুর্ব্বেদের প্রথম কাল বলিব।

ধন্বন্তরি ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভূত, এবং কাশীপ্রদেশের অধিপতি ছিলেন। ইঁহার নামান্তর কাশীরাজ বা দিবোদাস। ইনি ধন্বন্তরি সংহিতা প্রভৃতি অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ রচনা করেন।

কাশীরাজ ধন্বন্তরি যখন সংসারবিরাগী হইয়া কাশীর নিকটবর্ত্তি এক অরণ্য-মধ্যে বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করেন, তখন মহামুনি বিশ্বামিত্রের পুত্র সুশ্রুত, এবং ঔপধেনব, ঔরভ্র, বৈতরণ, পৌষ্কলাবত, গোপুররক্ষিত ও করবীর্য্য প্রভৃতি মুনিগণ তাঁহার নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। †

* ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদো নাম যদুপাঙ্গমথর্ব্ববেদস্যানুৎপাদ্যৈব প্রজাঃ শ্লোক শতসহস্রমধ্যায় সহস্রঞ্চ কৃতবান্ স্বয়ম্ভূঃ। ততোঽল্পায়ুষ্ট্বমল্পমেধস্ত্বঞ্চাবলোক্য নরাণাংভূয়ঃ অষ্টধা প্রণীতবান্। তদ্যথা শল্যং শালাক্যং কায়চিকিৎসা ভূতবিদ্যা কৌমারভৃত্য মগদতন্ত্রং রসায়নতন্ত্রং বাজীকরণতন্ত্রমিতি। (সুশ্রুতঃ)

* ব্রহ্মা প্রোবাচ ততঃ প্রজাপতিরধিজগে, তস্মাদশ্বিনাবশ্বিভ্যামিন্দ্র ইন্দ্রাদহং (ধন্বন্তরিঃ) ময়া ত্বিহ প্রদেয়মর্থিভ্যঃ প্রজাহিতহেতোঃ। (সুশ্রুতঃ)

† অধীত্য চায়ুষো বেদ মিন্দ্রাদ্ ধন্বন্তরিঃ পুরা। আগত্য পৃথিবীং কাশ্যাং

ভগবান্ ধন্বন্তরি শিক্ষাদানকালে মৃতশরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া শিষ্যদিগকে শারীরতত্ত্বের শিক্ষা প্রদান করিতেন *।

জাতো বাহুজবেশ্মনি। নাম্নাতু সোঽভবৎ খ্যাতো দিবোদাস ইতি ক্ষিতৌ॥ বালএব বিরক্তোঽভূচ্চচার সুমহত্তপঃ। যত্নেন মহতা ব্রহ্মা তং কাশ্যামকরোন্নৃপং। ততো ধন্বন্তরি র্লোকৈঃ কাশী রাজোঽভিধীয়তে। হিতায় দেহিনাং স্বীয়া সংহিতা বিহিতামুনা অয়ং বিদ্যার্থিনো লোকান্ সংহিতান্তামপাঠয়ৎ।

বিশ্বামিত্রো মুনিস্তেষু পুত্রং সুশ্রুতমুক্তবান্। বৎস বারাণসীং গচ্ছ ত্বং বিশ্বেশ্বরবল্লভাং। তত্র নাম্না দিবোদাসঃ কাশীরাজোঽস্তি বাহুজঃ। সহি ধন্বন্তরিঃ সাক্ষাদায়ুর্ব্বেদবিদাবরঃ। আয়ুর্ব্বেদং ততোঽধীত্য লোকোপকৃতিহেতবে। সর্ব্বপ্রাণিদয়াতীর্থং উপকারোমহামখঃ। পিতুর্ব্বচনমাকর্ণ্য সুশ্রুতঃ কাশিকাংগতঃ তেন সার্দ্ধং সমধ্যেতুং মুনিস্নুশতংযযৌ। অথ ধন্বন্তরিং সর্ব্বে বানপ্রস্থাশ্রমেস্থিতং। ইত্যাদি। ভাবপ্রকাশঃ।

ধন্বন্তরির শিষ্যবর্গহইতে অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে সুশ্রুত, ঔপধেনব, ঔরভ্র ও পৌষ্কলাবত নামক চারিজন শিষ্যের প্রণীত চারিখানি গ্রন্থই প্রধান ও প্রসিদ্ধ *।

সুশ্রুত প্রভৃতির শিষ্য প্রশিষ্যাদি দ্বারাও উত্তরোত্তর অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

ভরদ্বাজ মুনি ব্রাহ্মণ বংশীয়, হিমালয় প্রদেশে ইহার বাসস্থান ছিল। যখন মনুষ্যশরীরে নানাবিধ উৎকট রোগ প্রাদুর্ভূত হইয়া কায়িক ও মানসিক বিবিধ যন্ত্রণা প্রদান করিতে লাগিল, তখন অঙ্গিরা, যমদগ্নি, ভৃগু, আত্রেয়, ভরদ্বাজ প্রভৃতি পরম কারুণিক ঋষিগণ প্রাণিসমূহের স্বাস্থ্যকামনায় হিমবৎ পার্শ্বে সমবেত হইয়া একটি মন্ত্রসভার আহ্বান করিলেন। তাহাতে স্থির হইল যে, দেবরাজ ইন্দ্র অশ্বিনী কুমারের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন।

---

* তস্মান্নিঃসংশয়ং জ্ঞানং হর্ত্রা শল্যস্য বাঞ্ছতা। শোধয়িত্বা মৃতং সম্যক্ দ্রষ্টব্যোঽঙ্গবিনিশ্চয়ঃ। প্রত্যক্ষতোহি যদ্দৃষ্টং শাস্ত্রদৃষ্টঞ্চ যদ্ভবেৎ। সমাসতস্তদুভয়ং ভূয়োজ্ঞান বিবর্দ্ধনং।

তস্মাৎ সমস্তগাত্রমবিষোপহতমদীর্ঘব্যাধিপীড়িতমবর্ষশতিকং নিঃসৃষ্টান্ত্রপুরীষং পুরুষমবহন্ত্যামাপগায়াং নিবদ্ধং পঞ্জরস্থং মুঞ্জবল্কলকুশশণাদীনামন্যতমেনাবেষ্টিতাঙ্গমপ্রকাশে দেশে কোথয়েৎ সম্যক্ প্রকুথিতঞ্চোদ্ধৃত্য ততোদেহং সপ্তরাত্রাদুশীর বালবেণুবল্কলকূর্চানা মন্যতমেন শনৈঃ শনৈরবঘর্ষয়ংস্ত্বগাদীন্ সর্ব্বানেব বাহ্যাভ্যন্তরাঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশেষান্ যথোক্তান্ লক্ষয়েৎ চক্ষুষা। (সুশ্রুতঃ)

* ঔপধেনবমৌরভ্রং সৌশ্রুতং পৌষ্কলাবতং। শেষাণাং শল্যতন্ত্রাণাং মূলান্যেতানিনির্দ্দিশেৎ। (সুশ্রুতঃ)

তাঁহার নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিলে এই দারুণব্যাধিযন্ত্রণা হইতে পরিমুক্ত হওয়া যায়।

অনন্তর সমস্ত ঋষিবর্গের সম্মতি অনুসারে তীক্ষ্মমনীষাসম্পন্ন ও বিপুল মেধাবী মহামুনি ভরদ্বাজ ইন্দ্র সমীপে উপস্থিত হইয়া আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যার শিক্ষা লাভ করেন। এবং শিক্ষিত হইয়া পুনর্ব্বার হিমবৎ প্রদেশে উপস্থিত হইলে আত্রেয় প্রভৃতি মুনিগণ তাঁহার নিকট সমস্ত আয়ুর্ব্বেদজ্ঞান লাভ করেন! *

আত্রেয় বা পুনর্ব্বসু মুনি ভরদ্বাজ সমীপে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া 'আত্রেয়সংহিতা' নামক একখানি অত্যুৎকৃষ্ট আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এবং অগ্নিবেশ, ভেল, হারীত, জতুকর্ণ, পরাশর ও ক্ষারপাণি নামক ছয়জন প্রজ্ঞাবান্ শিষ্যকে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দেন।*

আত্রেয়-শিষ্য উপরোক্ত অগ্নিবেশ প্রভৃতি প্রত্যেকে স্ব স্ব নামে এক এক খানি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে অগ্নিবেশকৃত গ্রন্থই সমধিক প্রসিদ্ধ।

এইক্ষণে অগ্নিবেশকৃতগ্রন্থ চরকনামে অভিহিত হইয়া থাকে। অগ্নিবেশ এই গ্রন্থ রচনা করিলে, চরক নামক একজন মুনি কর্ত্তৃক উহা প্রতিসংস্কৃত হইয়া, চরক নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছে। †

অগ্নিবেশাদির শিষ্যপ্রশিষ্য দ্বারাও উত্তরকালে অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় কাল।

এই সময়ে যে সমস্ত আয়ুর্ব্বেদের গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বা-

---

* বিঘ্নভূতা যদারোগাঃ প্রাদুর্ভূতাঃ শারীরিণাং। * * * তদাভূতেষ্বনুক্রোশং পুরস্কৃত্যমহর্ষয়ঃ। সমেতাঃ পুণ্যকর্ম্মাণঃ পার্শ্বে হিমবতঃ শুভে। * * * সুখোপবিষ্টাস্তে তত্র পুণ্যাং চক্রুঃ কথামিমাং। * * * অথ তে শরণং শক্রং দদৃশুর্জ্ঞানচক্ষুষা। স বক্ষ্যতি শমোপায়ং যথাবদমরপ্রভুঃ। কঃ সহস্রাক্ষভবনং গচ্ছেৎ প্রষ্টুংশচীপতিং। অহমর্থে নিযুজ্যেয়মত্রেতিপ্রথমং বচঃ। ভরদ্বাজোঽব্রবীত্তস্মাদৃষিভিঃ স নিযোজিতঃ। স শক্রভবনং গত্বা * * * প্রোবাচ ভগবান্ ধীমান্ ঋষীণাং বাক্যমুত্তমং। * * * তস্মৈ প্রোবাচ ভগবানায়ুর্ব্বেদং শতক্রতুঃ। * * *—ভরদ্বাজঃ সুখান্বিতং, ঋষিভ্যোঽনধিকং তন্তু শশাসান বশেষয়ন্। ঋষয়শ্চ ভরদ্বাজাজ্জগৃহুস্তং প্রজাহিতং। (চরক সংহিতা)

* অথ মৈত্রীপরঃ পুণ্যমায়ুর্ব্বেদং পুনর্ব্বসুঃ। শিষ্যেভ্যোদত্তবান্ ষড়্ভ্যঃ সর্ব্বভূতানুকম্পয়া। অগ্নিবেশশ্চ ভেলশ্চ জতুকর্ণঃ পরাশরঃ। হারীতঃ ক্ষারপাণিশ্চ জগৃহুস্তন্মুনের্ব্বচঃ। * * * অথ ভেলাদয়শ্চক্রুঃ স্বং স্বং তন্ত্রং কৃতানিচ। শ্রাবয়ামাসুরাত্রেয়ং সর্ষিসঙ্ঘং সুমেধসঃ।

(চরক সংহিতা)

† অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরক প্রতিসংস্কৃতে ইত্যাদি। ঐ

ভট্ট * ভোজ, ভাহুকি, বিদেহ, দৃঢ়বল খরনাদ প্রভৃতির গ্রন্থই প্রধান।

তৃতীয় কাল।

বাভট প্রভৃতির পরবর্ত্তী কালকে সংগ্রহকাল বলা যায়। এই সময়ে মহামতি পণ্ডিতগণ মনুষ্যদিগের আয়ুষ্কাল ও মেধাশক্তির ন্যূনতা দেখিয়া বহুবিস্তীর্ণ চরক সুশ্রুত প্রভৃতি মূলগ্রন্থহইতে সংক্ষেপে সার সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

সংগ্রহ গ্রন্থের মধ্যে ভাবপ্রকাশ, রোগবিনিশ্চয়,সংগ্রহ বা নিদান, † চিকিৎসাসংগ্রহ বা চক্রদত্ত ‡ ও শার্ঙ্গধরসংহিতা প্রভৃতি কএকখানি গ্রন্থই প্রধান।

* বাভটের নামান্তর অষ্টাঙ্গহৃদয় সংহিতা। ইহা বৈদ্যবংশীয় বৈদ্যপতি সিংহগুপ্তের পুত্র বাভট কর্ত্তৃক রচিত। কিম্বদন্তী এইরূপ যে ইনি কুরুবংশীয় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সভাসদ্ ও রাজবৈদ্য ছিলেন।

† ইহা বৈদ্যবংশীয় ইন্দ্রকরের পুত্র মাধবকর বিরচিত।

‡ এই গ্রন্থ বৈদ্যবংশীয় নারায়ণ দত্তের পুত্র চক্রপাণি দত্ত কর্ত্তৃক প্রণীত। নারায়ণ দত্ত, পাল বংশীয় গৌড়াধিপতি নয় পালের সভাসদ ও প্রধান চিকিৎসক ছিলেন, কনিঙ্‌হাম সাহেবের প্রকাশিত তালিকা দর্শনে জানা যায় যে, নয় পাল ১০৪০ খৃঃ অব্দ হইতে ১০৫৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত গৌড় সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন।

চতুর্থকাল।

এই সময়ে বাহুল্যরূপে রস প্রয়োগের * ব্যবহার আরব্ধ হয়। পূর্ব্বে যে সকল আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তৎপ্রযুক্ত ঔষধ সমূহ প্রায়ই উদ্ভিজ্জঘটিত। উহাতে রসপ্রয়োগের বিধান অতি অল্পই আছে। এমন কি নাই বলিলেও হয়। কিন্তু ঐ সমস্ত গ্রন্থে রস প্রয়োগের বিধান না থাকিলেও তৎকালে অন্যান্য রাসায়নিক গ্রন্থের নিতান্ত অসদ্ভাব ছিল না। শাস্ত্রে লিখিত আছে—রসায়নতন্ত্রের প্রথম আবিষ্কর্ত্তা স্বয়ং মহাদেব। তৎপরে অগস্ত্য, নারদ, নাগার্জ্জুন ও কাঙ্কায়ন প্রভৃতি অসাধারণ বিজ্ঞানবিৎ মুনিগণকর্ত্তৃক উহার অনেক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু পূর্ব্বকালে উহা সাধারণ্যে বিশেষ প্রচলিত ছিল না। প্রায়ই সহজসাধ্য বলিয়া উদ্ভিজ্জঘটিত ঔষধ ব্যবহৃত হইত।

অনন্তর চতুর্থ সময়ের ভেষজতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ শিব ও নারদাদিপ্রণীত গ্রন্থে রসপ্রয়োগের অসাধারণ শক্তিমত্তার উল্লেখ দেখিয়া, এবং বন্য ঔষধের বীর্য্য-লঘুতা ও দুষ্প্রাপ্যতা দর্শন করিয়া ক্রমশঃ রস প্রয়োগের পক্ষপাতী হইলেন। এবং সাধারণ্যে যাহাতে বাহুল্যরূপে উহা প্রচারিত হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে অনেক রাসায়নিক

* এস্থলে রসপ্রয়োগ শব্দে পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতির প্রয়োগ বুঝিতে হইবে।

গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল, তম্মধ্যে রসরত্নাকর রসচন্দ্রিকা, রসেন্দ্র চিন্তামণি ও রসেন্দ্র সারসংগ্রহ প্রভৃতি কএক খানি গ্রন্থই বিশিষ্টরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের কত গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছিল এইক্ষণে তাহার সম্যক নিরূপণ করা অত্যন্ত সুকঠিন। আমরা নেপাল, কাশী, কলিকাতা ও বিক্রমপুর এই কয় স্থলে অনুসন্ধান করিয়া বহুপরিশ্রমে যে কতিপয় গ্রন্থের নাম সংগ্রহ করিয়াছি, নিম্নে তাহার একখানি তালিকা প্রদর্শন করিলাম। পাঠকগণ ইহাদ্বারাই বুঝিতে পারিবেন যে, প্রাচীন ভারতে আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যার কত দূর সমুন্নতি হইয়াছিল।

১। ধন্বন্তরি সংহিতা।
২। আত্রেয় সংহিতা।
৩। সুশ্রুত।
৪। চরক সংহিতা বা অগ্নিবেশতন্ত্র।
৫। বাভট বা অষ্টাঙ্গ হৃদয় সংহিতা।
৬। ভাব প্রকাশ।
৭। শার্ঙ্গধর সংহিতা।
৮। চিকিৎসা-সার-সংগ্রহ বা চক্রদত্ত।
৯। দ্রব্যগুণসংগ্রহ।
১০। রোগ বিনিশ্চয় সংগ্রহ বা নিদান।
১১। রস চন্দ্রিকা।
১২। চিকিৎসা সার সংগ্রহ।
১৩। মহা রসায়ন বিধি।
১৪। বৈদ্যক সংগ্রহ।
১৫। বৈদ্য জীবন।
১৬। বৈদ্য বিনোদ।
১৭। বৈদ্য রহস্য।
১৮। বৈদ্য সর্ব্বস্ব।
১৯। বৈদ্যামৃত।
২০। সার কলিকা।
২১। রত্নাবলী (কবিচন্দ্র কৃত)।
২২। তত্ত্ব চন্দ্রিকা।
২৩। ধাতু রত্নমালা।
২৪। গুণ রত্নমালা।
২৫। মদন পাল নির্ঘণ্ট।
২৬। ধন্বন্তরি নির্ঘণ্ট।
২৭। রস মঞ্জরী।
২৮। রসরত্নাকর। (বাণী কবিকৃত)।
২৯। বাণী কবি।
৩০। বীরসিংহাবলোক।
৩১। শতশ্লোকী।
৩২। দ্রব্যগুণ (রাজবল্লভী)।
৩৩। রসেন্দ্র সার সংগ্রহ।
৩৪। গজায়ুর্ব্বেদ।
৩৫। পাষাণ শাসন পত্র।
৩৬। সর্ব্বধর চিন্তামণি।
৩৭। সংক্ষিপ্ত সার।
৩৮। চিকিৎসারত্ন।
৩৯। চিকিৎসার্ণব।
৪০। সার কৌমুদী।
৪১। মুগ্ধ বোধ।
৪২। ভৈষজ্যরত্নাবলী।
৪৩। রত্নমালা।
৪৪। মুক্তাবলী।
৪৫। নাড়ীতত্ত্ব।
৪৬। নাড়ীচক্র।

এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ ছিল, তন্মধ্যে গ্রন্থকারের নামানুসারেই অধিকাংশ গ্রন্থের নাম নির্দ্দেশ দৃষ্ট হয়। অতএব আমরা নিম্নে সেই সেই গ্রন্থকারের নাম লিখিলাম। ইঁহাদিগের মধ্যে অনেক টীকাকারেরও নাম লিখিত হইল।

৮৬। ঔপধেনব।
৮৭। ঔরভ্র।
৮৮। পৌষ্কলাবত।
৮৯। গোপুররক্ষিত।
৯০। করবীর্য্য।
৯১। ভেল।
৯২। ক্ষারপাণি।
৯৩। হারীত।
৯৪। জতুকর্ণ।
৯৫। পরাশর।
৯৬। ভোজ।
৯৭। ভাহুকি।
৯৮। বিদেহ।
৯৯। খর নাদ।

১০০। দৃঢ় বল।
১০১। গয় দাস।
১০২। ব্যাস।
১০৩। নারদ।
১০৪। অগস্ত্য।
১০৫। নাগার্জুন।
১০৬। কাঙ্কায়ন।
১০৭। হরিচন্দ্র।
১০৮। গদাধর।
১০৯। বাপ্পচন্দ্র।
১১০। বকুল।
১১১। ঈশান।
১১২। কার্ত্তিক কুণ্ড।
১১৩। সুকীর।
১১৪। মৈত্রেয়।
১১৫। সুদান্ত সেন।
১১৬। ত্রিশটাচার্য্য।
১১৭। জেজ্জড়।
১১৮। অরুণ দত্ত।
১১৯। উল্লন।
১২০। শিবদাস সেন।
১২১। বিজয় রক্ষিত।
১২২। শ্রীকণ্ঠ দত্ত।
১২৩। ঈশ্বর সেন।

দিন দিন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অবনতি হইতেছে কেন? অনেকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসু হইয়াছেন। আমাদিগের বিবেচনায় নিম্ন লিখিত কএকটি কারণই প্রধান ও প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়।

১ম। যবন দৌরাত্ম্য। ২য়। রাজার অমনোযোগ। ৩য়। বিদেশীয় চিকিৎসার বহুলপ্রচার। ৪র্থ। অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত লোকের চিকিৎসকসম্প্রদায়ে প্রবেশ। ৫ম। বাহুল্যরূপ সংস্কৃত চর্চ্চার অভাব।

১ম। আয়ুর্ব্বেদাবনতির যে সমস্ত কারণ উল্লিখিত হইল, তন্মধ্যে যবনদৌরাত্ম্যে বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। কালান্তরে অন্যান্য কারণের অভাব সম্ভাবিত হইলেও যবন অত্যাচারে আয়ুর্ব্বেদের অঙ্গে যে আঘাত প্রদান করিয়াছে, তাহার পুনরুদ্ধার হইবে না। মুসলমানরাজত্বকালে আমাদিগের অন্যান্য গ্রন্থের সহিত আয়ুর্ব্বেদীয় অনেক গ্রন্থও ভস্মাবশেষ হইয়াছে। তাহা আর কোনও কালেও প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

২য়। আমাদিগের দেশ বিদেশীয় রাজার হস্তগত হওয়া অবধিই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার ক্রমশঃ অবনতি দেখা যায়। ইতঃপূর্ব্বে হিন্দুরাজার সময়ে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার সমধিক গৌরব ছিল। চিকিৎসকগণ রাজসমীপে বিশেষ সম্মান লাভ করিতেন। এবং তাঁহাদিগের যথোচিত বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট ছিল। দেশীয় অন্যান্য লোকও রাজদৃষ্টান্তের অনুকরণ করিত। সুতরাং চিকিৎসকগণ বহুসংখ্যক ছাত্রের ভরণ, পোষণ, ও শিক্ষাদান করিয়া অনায়াসে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন।

বর্ত্তমান সময়ে আয়ুর্ব্বেদের প্রতি রাজ

অনুগ্রহের নিতান্ত অভাব হইয়াছে। লোকে যে কার্য্যেই প্রবৃত্ত হয়, অবশ্যই তৎসম্পর্কে ভবিষ্যতে কোন লাভপ্রত্যাশা অন্তঃকরণে নিহিত থাকে। গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপিত মেডিকল কলেজে তিন বৎসর কি পাঁচ বৎসর অধ্যয়ন করিয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে পারিলেই রাজপ্রদত্ত কর্ম্ম পাইবে, এই ভবিষ্যৎ আশায় প্রোৎসাহিত হইয়াই, শত শত লোক বহু ব্যয় ও বহু ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে। ভবিষ্যতে লাভের প্রত্যাশা না থাকিলে, কেবল বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত কখনই এত লোক উহাতে প্রবিষ্ট হইত না। দুর্ভাগ্য বশতঃ আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থিগণের তদ্রূপ কোন নিশ্চিত আশা নাই। সুতরাং অনন্যোপায় না হইলে প্রায় কেহই আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষায় প্রবৃত্ত হয় না।

৩য়। বিদেশীয় চিকিৎসার বহুলপ্রচারদ্বারাও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অনেক অবনতি হইয়াছে। আপাত সুখকর বলিয়া অধিকাংশ দেশীয় লোকই বিদেশীয় চিকিৎসার পক্ষপাতী। কিন্তু ইয়ুরোপীয় চিকিৎসাদ্বারা আমাদিগের বাহ্য ও আভ্যন্তরিক কত দূর অনিষ্ট হইতেছে তাহা কেহই বিবেচনা করেন না।

পূর্ব্বতন শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ, দেশ, কাল, ও পাত্র অনুসারেই ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইয়ুরোপ অত্যন্ত শীতপ্রধান দেশ, তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধ তদ্দেশীয় লোকের শরীরোপযোগী, এবং তদনুসারেই উহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমাদিগের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান, শারীরাবস্থা ইয়ুরোপীয় লোকের সম্পূর্ণ বিপরীত। সুতরাং ইয়ুরোপীয় তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধ আমাদিগের শরীরোপযোগী হইতে পারে না। এই নিমিত্তই মহামতি বৃদ্ধ বাভট বলিয়াছেন—

" যস্য দেশস্য যোজন্তুস্তজ্জন্তস্যৌষধং হিতং।
দেশাদন্যত্র বসতস্তত্তুল্যগুণমৌষধং ॥ "

যে, যে দেশের লোক, তদ্দেশীয় ঔষধই তাহার পক্ষে হিতকর। স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া দীর্ঘকাল দেশান্তরে বাস করিলে, তদ্দেশীয় ঔষধ ক্রমশঃ তাহার পক্ষে হিতকারক হইতে পারে। যদিচ ইয়ুরোপীয় ঔষধদ্বারা আশু উপকার লাভ করিতেছি, কিন্তু উহাদ্বারা যে আমাদের শারীরতেজ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতেছে তাহার আর সন্দেহ কি।

৪র্থ। অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত লোক চিকিৎসক সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়া আয়ুর্ব্বেদের ভয়ানক অনিষ্ট সাধন করিয়াছে ও করিতেছে। ইহারা যথার্থরূপে রোগ নির্ণয় করিয়া তদুপযোগী ঔষধ প্রদান করিতে পারে না। এক অবস্থার রোগে অন্য অবস্থার ঔষধ ব্যবস্থা করে; এবং যথোচিতরূপে ঔষধ প্রস্তুত করিতেও সমর্থ হয় না, নানা রূপ কৃত্রিমতা দ্বারা ঔষধের গৌরব নষ্ট করে। সুতরাং উহা সেবনে রোগীর উপকার না হইয়া বরং

অপকারই ঘটিয়া থাকে। এই কারণে সা-ধারণের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উপরে বিষম বিদ্বেষ জন্মিয়াছে।

৫ম। বাহুল্যরূপে সংস্কৃত চর্চ্চার অভাব হওয়াতে অনেকেই আয়ুর্ব্বেদের মর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে পারেন না। আয়ু-র্ব্বেদীয় গ্রন্থ সকল দুরূহ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। সংস্কৃত ভাষায় ভালরূপ অধি-কার না থাকিলে, উহার মর্ম্মবোধ করিতে পারা যায় না। এমন কি যাঁহারা অ-ন্যান্য ভাষায় কৃতবিদ্য,তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকের সংস্কার এইরূপ যে আয়ুর্ব্বেদে 'শারীরতত্ত্ব' কিংবা 'অস্ত্রচিকিৎসাপ্র-ণালী' বিবৃত হয় নাই। সংস্কৃতানভি-জ্ঞতাই এরূপ বৃথা সংস্কারের মূল। আয়ু-র্ব্বেদে শারীরতত্ত্ব কি অস্ত্র চিকিৎসাপ্রণালী প্রভৃতি অতি বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ সংস্কৃত চর্চ্চার নিতান্ত অ-ভাব হওয়াতেই আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সমূহের মর্ম্মও ক্রমশঃ সাধারণের অপরিজ্ঞাত হইয়া উঠিতেছে। ইহা নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়।

আয়ুর্ব্বেদের পূর্ব্বাবস্থা, বর্ত্তমান অব-নতির কারণ, এবং প্রাপ্ত গ্রন্থাবলীর নাম উল্লিখিত হইল। এইক্ষণে দেশীয় মহাত্মা-গণ সমীপে জিজ্ঞাস্য এই যে, দিন দিন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার যেরূপ অবনতি হইতেছে, ইহাতে বোধ হয় অচিরকাল মধ্যেই উহা বিলয়দশা প্রাপ্ত হইবে। অত-এব আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার যাহাতে পুন-রুদ্ধার হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করা উচিত কি না? যদি উচিত হয়, তবে এখনও নি-শ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকি কেন? সময়ে কাজ না করিয়া শেষে কাঁদিলে কি হইবে? আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ বন্যফলমূলে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া বহুযত্নে ও বহুপ-রিশ্রমে পৃথিবীমধ্যে যে অত্যুচ্চ কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন; অযত্নবাত্যাঘাতে তাহা ভগ্ন হইয়া কালস্রোতে মিশিতে লাগিল, আর আমরা তাঁহাদেরই বংশধর হইয়া অম্লানবদনে, নিরশ্রু নয়নে, উদা-সীনের ন্যায় তাহা দেখিতে বসিলাম। ইহাই কি আমাদিগের কৃতজ্ঞতা? ইহাই কি আমাদিগের পুরুষকার? ইহাই কি আমাদিগের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা?

অন্যান্য সকল দেশীয় লোকেরই কোন না কোন বিষয়ে গৌরব করিবার অধিকার আছে; কিন্তু আমাদিগের কি আছে? আমরা কি লইয়া গৌরব করিতে পারি? আমাদিগের যদি কোন গৌরবের বিষয় থাকে, তাহা পূর্ব্বতন আর্য্যগ-ণেরই কীর্ত্তিকলাপ। আমরা আর্য্য সন্তান, এই আমাদিগের গৌরব। ইহা ভিন্ন আর কি আছে? যে আর্য্যগৌরবে আ-মরা গৌরবান্বিত, সেই আর্য্যগণের কীর্ত্তি-গুলি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতে চলিল; আমরা কি ইহার সংরক্ষণের জন্য কোন উপায়ই করিতে পারিব না? অবশ্যই পারিব; সম-বেত চেষ্টায় অসাধ্য কি?

পাঠকগণ এইক্ষণে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে কি উপায়ে লুপ্তপ্রায় আয়ু-

র্ব্বেদীয় চিকিৎসার পুনরুদ্ধার হইতে পারে। নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলে আয়ু-র্ব্বেদের পুনরুন্নতির সম্ভাবনা।

১ম। আয়ুর্ব্বেদের প্রতি গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা। ২য়। দেশীয় ধনীদিগের আর্থিক সাহায্য দান। ৩য়। আয়ুর্ব্বেদের পুস্তক সংগ্রহ এবং বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় তৎসমুদায়ের অনুবাদ। ৪র্থ। প্রধান প্রধান নগরে একটি একটি আয়ুর্ব্বেদবিদ্যালয় এবং তৎসঙ্গে এক একটি ঔষধালয় ও এক একটি উদ্ভিজ্জ বাটিকার সংস্থাপন। ৫ম। পল্লীস্থ প্রধান প্রধান ধনীর বাটিতে আয়ুর্ব্বেদপরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের ব্যবসায় ও দেশীয় লোকের উপকারের নিমিত্ত এক একটি আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা।

উপরে যে উপায় নির্দ্ধারিত হইল, তাহা বহুব্যয়সাধ্য বটে। কিন্তু আমাদিগের দেশীয় ধনীগণ অন্যান্য কার্য্যে অকাতরে যে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন, তাহার অষ্টমাংশের একাংশও যদি এই সৎকার্য্যে ব্যয়িত হয়, তবে অল্পকাল মধ্যেই মৃতপ্রায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা পুনরুজ্জীবিত হইতে পারে। এদেশীয় প্রত্যেকে এই বিষয়ে আন্তরিক যত্ন করিলে গবর্ণমেণ্টের বিনা সাহায্যেও কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারে।

শ্রীহরিমোহন দাস গুপ্ত

প্রাপ্ত।

বিনোদপুরস্থিত।

অবলাহিতৈষিণীসভার সাংবৎসরিকবিবরণ।

সভাস্থ সকলে সমবেত হইলে, শ্রীযুতা দেবী পারিজাতসুন্দরী, সকলের শিরোবনমনে সম্মানিত হইয়া, সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন, এবং তৎপর পাশ্চাত্য রীত্যনুসারে দণ্ডায়মান হইয়া, মৃদুমোহনকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—

"হে সভ্যাগণ, হে ভগিনীগণ, হে বঙ্গের অলঙ্কাররূপিণী পুরসুন্দরীগণ, আমি অদ্য তোমাদিগের নিকট হৃদয়ের কবাট খুলিয়া আমার হৃদয়ের অতি গভীর একটি দুঃখের কথা প্রকাশ করিব। এ দুঃখ কহিবার নহে, সহিবারও নহে। কিন্তু যখন তোমরাই আমার চক্ষু কর্ণ, তোমরাই আমার সহায় সম্পদ, এবং তোমাদিগের হস্তেই চিরদুঃখিনী বঙ্গভূমির ভবিষ্যৎ উন্নতির ভার, তখন কথাটি যত কেন অপ্রিয় হউক না, আমি তাহা তোমাদিগের নিকট অদ্য নির্ম্মুক্তচিত্তে ব্যক্ত করিব।

"তোমরা আজি বঙ্গে কি দেখিতেছ? বঙ্গে কি উন্নতি হইতেছে? আমার চক্ষে বঙ্গের বর্ত্তমান উন্নতি, উন্নতি নহে, প্রত্যুত উহা অধঃপাতের প্রশস্ত পথ;—বঙ্গবাসীর বর্ত্তমান সভ্যতা, সভ্যতা নহে; প্রত্যুত উহা অসভ্যতার আদি সোপান। দেশের উন্নতি কিসে? জ্ঞান বিস্তারে? রসস্বাদশূন্য গোপণ্ডিতের মুখেই এমন নীরস কথা শোভা পায়। দেশের সভ্যতা কিসে? সাহিত্যশাস্ত্রের বিকাশে? নিতান্ত অনক্ষর অজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন কেহই এমন কথা বলিতে পারে না। আমার বিবেচনায়, দেশের প্রকৃত উন্নতি, প্রকৃত সভ্যতার মূলবীজ স্ত্রীর প্রতি ভক্তি এবং স্ত্রীজাতির আজ্ঞাপালনে অকৃত্রিম অনুরাগ। ইংলণ্ড যে আজি এত উন্নত এবং সভ্যতার এত ভূষণে বিভূষিত হইয়াছে, স্ত্রীর প্রতি ভক্তিই তাহার নিদান। ফরাসিজাতির উন্নতিও স্ত্রীভক্তিরই ফল, এবং আমেরিকা যে আধুনিক সভ্যতার সীমন্তে সিন্দূর সদৃশ সুন্দরদৃশ্য হইয়াছে, স্ত্রী-ভক্তিই তাহার একমাত্র কারণ। নিতান্ত পরিতাপের বিষয়, এই স্ত্রীশাসিত বঙ্গরাজ্যে সেই সর্ব্বমঙ্গলালয়া স্ত্রী-ভক্তি ইদানীং ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতেছে; এবং বঙ্গদেশ যাহাদিগের দিকে তৃষিত নয়নে চাহিয়া রহিয়াছিল, যাহাদিগের উপর এত আশা করিয়া রহিয়াছিল,সেই নব্যসভ্যতাভিমানী সুশিক্ষিত বঙ্গ-সম্প্রদায়ই স্ত্রীভক্তির মূলদেশে কুঠারের আঘাত করিতেছে। তোমরা কি ইহাদিগকে বিশ্বাস কর? আমার বিশ্বাস বহুদিন হয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমি বুঝিয়াছি ইহারা অন্তরে আমাদের বিদ্বেষী ও বিরুদ্ধাচারী এবং আমাদিগের সম্পদ ও শান্তির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ইহারা যে প্রকাশ্যে আমাদিগের আজ্ঞাধীন, সে কেবল শাসন-ভয়ে। ইহারা যে সম্মুখে আমাদিগের চাটুকার, সে কেবল চটুলনয়নের তীব্র দৃষ্টি, অথবা অঞ্চল তাড়না কি সম্মার্জ্জনীর অপরিহার্য্য শঙ্কায়। কিন্তু ইহাদিগের চিত্ত প্রকৃতপ্রস্তাবে মধুমুখ বিষকুম্ভ স্বরূপ। ইহাদিগের জিহ্বা আমাদিগের কলঙ্ক ঘোষণার ঢক্কা বিশেষ। ইহাদিগের লেখনী আমাদিগের অপযশের পরিচয়-স্তম্ভ স্বরূপ। আমি অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি, ইহারা যখন পারে তখনই আমাদের স্ত্রী-পাট-নীতির নিন্দা করে; যেখানে সেখানে আমাদের গ্লানি করে; আমাদিগের যে সকল দোষ লোকে দেখিতে পায় না ও জানিতে পায় না, ইহারা পঞ্চমুখে তাহা প্রচার করে, এবং যাহাতে সংসারে আমাদিগের প্রভুত্ব ও আধিপত্য না থাকে, অতি প্রচ্ছন্নভাবে নিয়ত তাহারই চেষ্টা করে।

"আমার এসকল কথা কি তোমাদিগের নিকট অলীক বোধ হইতেছে? যদি অলীক বোধ হয়, তোমরা মনোনিবেশ সহকারে আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য পাঠ কর। আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যই আমার উল্লিখিত কথাগুলির প্রত্যক্ষ নিদর্শন। উহার আদ্যন্ত সমস্তই গরলময় এবং স্ত্রীজাতির

দোষাণুকীর্ত্তন ও স্ত্রীর প্রতি অভক্তির ভাবে পরিপূর্ণ। তোমাদিগের মধ্যে অনেকে যারপরনাই শ্রমশীলা, কার্য্যনিপুণা এবং পুরুষ জাতির হিত-চিন্তা-পরায়ণা। কিন্তু আমি বাঙ্গালা সাহিত্যের একখানি গ্রন্থে কি একখানি পত্রেও তোমাদিগের কাহারও কমনীয়চ্ছবি কমনীয় বর্ণে চিত্রিত দেখিতে পাই না। অথচ, তোমরা কে কবে অন্ধকারে কি করিয়াছিলে, কাহার অন্ন কাহাকে দিয়া কাহাকে উপবাসী রাখিয়াছিলে, কাহাকে পদাঘাতে গৃহপ্রাঙ্গণ হইতে দূর করিয়াছিলে, কাহাকে কটুকথা বলিয়া কাঁদাইয়াছিলে, অথবা কাহার কি কাড়িয়া নিয়া আপনি কি করিয়াছিলে, আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের সমস্ত গ্রন্থেই কেবল এই সকল কথার আন্দোলন এবং এই সকল কথার আলোচনা, এমন অকৃতজ্ঞ অধম জাতিকেও কি তোমরা আবার প্রশ্রয় দিতে ইচ্ছা কর? ইহাদিগের সহিতও কি তোমরা আবার আলাপ করিয়া সুখী হইতে ইচ্ছুক হও, এবং এইরূপ ভিক্ষান্নজীবী, প্রসাদভোজী, পরপুষ্ট পামরদিগকেও কি তোমরা সরলহৃদয়ে ভাল বাস? আমার বিবেচনায় ইহাদিগকে সমূলে উচ্ছিন্ন অথবা বিনষ্ট করা উচিত। যদি আমার কথা শুন, তাহাহইলে ইহাদিগকে অন্নজলে বঞ্চিত করিয়া, দেশহইতে দূরীভূত করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যাহাতে পৃথিবী, ইহাদিগের পাপস্পর্শে আর পঙ্কিল না রহে, এবং ইহাদিগের জিহ্বা ও লেখনী আর আমাদিগের নিন্দাবাদে ব্যাপৃত না হয়, তজ্জন্য ইহাদিগের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলোপ করাই সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। নহিলে আমাদিগের মঙ্গল নাই, আমাদিগের নিস্তার নাই। মৃদুশাসনে যাহা ফলে নাই, তাহার জন্য এক্ষণ দৃঢ় শাসন আবশ্যক। কমলদলসদৃশ কোমল হস্তের সুকোমল আবর্ত্তনে যাহা সিদ্ধ হয় নাই, এক্ষণ তাহার জন্য বজ্রমুষ্টির প্রয়োজন। আমার যাহা বক্তব্য, আমি তাহা নির্ভয়েই বলিয়া ফেলিলাম; এক্ষণ তোমরাও এই কথা লইয়া বিচার বিতর্ক ও স্ব স্ব মত প্রকাশ করিতে পার। আমাদিগের সভার আর যাহা কিছু কার্য্য থাকে, তাহা পরে হইবে। এইরূপ সাময়িক শুভ-উৎসবের অশুভ কণ্টক নিচয় যাহাতে একবারে উন্মূলিত ও উৎপাটিত হয়, তোমরা অগ্রে তাহারই উপায় নির্দ্ধারণ কর। (সকলের করতালীর মধ্যে উপবেশন।)

ইহার পর স্বদেশহিতৈষিণী শ্রীযুতা কৃষ্ণকামিনীদাসী গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন,—"আমি সভাপতি মহাশয়ার সকল কথাই সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি। আমি চির দিনই তাঁহার মতের পোষকতা করিয়া আসিয়াছি, আজিও তাঁহারই মতের পোষকতা করিতে পারিয়া, আত্মাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে পারিতেছি। আমার বিবেচনায় তাঁহার বক্তৃতার প্রত্যেক কথাই শুক্তিগর্ভস্থ মুক্তাস্বরূপ। আমাদিগের এ-

দেশে স্ত্রীজাতির প্রতি ভক্তির প্রবাহে যে প্রবল ভাটা লাগিয়াছে, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই, এবং অভক্ত নব্য সম্প্রদায়ের অন্তর্গূঢ় বিদ্রোহিতাই এই অবস্থা-পরিবর্ত্তের নিদান। কিন্তু ন্যায়ের অনুরোধে তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে, নব্য সমাজের সকল ব্যক্তিই এই কলঙ্কে কলঙ্কিত নহে। যেমন কণ্টকবনেও কুসুমলতা দৃষ্ট হয়, নব্যদিগের মধ্যেও সেই রূপ কদাচিৎ কখনও ভক্তিভাবাপন্ন ভদ্রলোক আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এবং ইহার উদাহরণস্থলে আমি সর্ব্বাগ্রে বঙ্গদর্শনের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদকের নাম উল্লেখ করিতেছি। আমার বোধ হয়, এই ব্যক্তির অন্তঃকরণ ভক্তিরসে আওটপূর্ণ। নহিলে, ইহাঁর লেখনী হইতে নিরন্তর এইরূপ অমৃতধারা প্রবাহিত হইবে কেন? ইহার সমস্ত লেখাই আমাদিগের স্তুতিবাদে পরিপূরিত, সুতরাং অভক্তের গণনায় ইহাঁকে পরিগণনা করা কখনও বিচারসঙ্গত নহে।—

এই কথার পর, শ্রীযুতা দেবী চন্দ্রাবলী মুখোপাধ্যায়া, নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, ভ্রূকুঞ্চন সহকারে ভাবগদ্গদস্বরে বলিতে লাগিলেন যে,—"আমি আমার এই উনবিংশতি বৎসর বয়সের মধ্যে অনেক স্থলে অনেক অকথা শুনিয়াছি; কিন্তু কোন দিনও কোন স্থলে কৃষ্ণকামিনীর উক্তির মত,অলীক অমূলক কথা শুনিয়াছি কি না, সে বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ আছে। তিনি ভক্তের গণনায় বঙ্গদর্শনসম্পাদকের নাম উল্লেখ করিলেন! আমার বিবেচনায় সে একটি বিষের হাঁড়ি, এবং তাঁহার মত অভক্ত ত্রিভুবনেও নাই। তাহাকে বিধাতা অসামান্য শক্তি দিয়াছেন। কিন্তু সে শক্তি আমাদিগের সর্ব্বনাশের জন্য। যদি তাহার অন্তরে আমাদিগের প্রতি সত্য সত্যই ভক্তির ভাব থাকিবে, তবে সে লোককললামভূতা আয়েসাকে তুষানলে পুড়িয়া মারিল কেন, এবং প্রভাতকমলসদৃশী পবিত্রহৃদয়া তিলোত্তমারই বা অত নিগ্রহ এবং বিড়ম্বনা ঘটাইল কেন? যদি ভক্তিরসেই তাহার হৃদয় দ্রব রহিবে, তবে সে কপালকুণ্ডলার মত কল্পলতাকে নবকুমারের ন্যায় অশিক্ষিত, অরসিক বনপশুর কণ্ঠে দোলাইয়া দিল কেন? আর সূর্য্যমুখী এবং কুন্দনন্দিনীর ন্যায় দুইটি স্বর্গবিদ্যাধরীকে একটা অকালকুষ্মাণ্ড গ্রাম্য ভূতের প্রতি অনুরাগিণী করিয়া, উভয়েরই এমন লাঞ্ছনা ঘটাইল কেন? ফলতঃ ইহার কথা আমার নিকট আর বলিও না। আমি বুঝিয়াছি, আমি ইহা অশেষ প্রকারে বুঝিয়াছি যে, যে আমাদিগের এত অবমাননা করিয়াও পুনরায় আমাদিগেরই নিকট প্রশংসাভাজন হইতেছে, জগতে তাহার মত মণিমণ্ডিত ফণী দুইটি আর দৃষ্ট হইবে না। (অনেকের করতালি এবং কাহারও কাহারও দীর্ঘ নিঃশ্বাস।)

শ্রীযুতা সৌদামিনী বলিলেন,—"বোধহয় অক্ষয়চন্দ্রের এ অপবাদ নাই। সে

সাধারণের নিকট অনেক সময়ে আমাদিগের গুণানুবাদ করিয়াছে।”

ইহাতে শ্রীযুতা প্রসন্নময়ী বলিলেন,—“তুমি অমন প্রভু-কুল-দ্রোহী নিন্দুকের নাম সভাস্থলে উচ্চারণ করিও না। আমরা উহাঁর হাতে গ্রাবুর তাস আর খেলার খেলেনা। উহাঁর যত গুণপনা তাহা পাঁচলহরীর কাহিনী এবং ফুল্লরার ও কর্কটার ব্যাখ্যানেই প্রকাশ পাইয়াছে।”

ইহার পর একটি আধ-বিবি পোষাকী বউ উঠিয়া বলিলেন,—“তবে মোহিনীমোহন? সে ত ভক্তিপত্রমিদংকার্যাঞ্চাগে এই বলিয়া দলীল লিখিয়া রেজেষ্টরী করিয়া দিয়াছে।”

শ্রীযুতা বগলাসুন্দরীগুপ্তা এই কথার প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—“ মোহিনীমোহনের নিবাস কিষ্কিন্ধায়। কিষ্কিন্ধ্যাবাসীতে আমার প্রত্যয় নাই। ”

দেবী বিলাসমণি ও বসন্তকুমারী বলিলেন,—‘তবে দীনবন্ধু? ’—দেবী আনন্দময়ী বলিলেন,—‘ তাহার যত ভক্তি আছে, তাহা জগদম্বার রূপগুণ বর্ণনায়ই প্রকাশ পাইয়াছে। কুলের কামিনী পাদপ্রহারে কবে কাহার প্লীহা বিদারণ করিয়াছে, একথা লইয়া সে রগড় করিল কেন? যে ভক্ত, সে ভক্তিভাবে আনন্দাশ্রুপাত করিবে, রগড় করিবে না।”

শ্রীযুতা সভাপতিমহাশয়া বলিলেন, ‘ সাবধান তোমরা মৃতের সহিত যুদ্ধ করিও না, ইচ্ছা হয় ত, জীবিতদিগের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করিতে পার। ’

এই সময়ে শ্রীযুতা অনাথবিনোদিনী গুহজায়া গাত্রোত্থান করিয়া, তাঁহার সেই গম্ভীর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—‘ আমি বুঝিতে পারিতেছি না, আমাদিগের মধ্যে কেন আজি এই অভূতপূর্ব্ব কোলাহল, এবং কি জন্যই বা বঙ্গীয় নব্যসম্প্রদায়ের উপর আমাদিগের এই বিদ্বেষ, আর তাহাদিগের সহিত এইরূপ যুদ্ধবিগ্রহের আয়োজন? কে বলিয়াছে, যে সুশিক্ষিত নব্যসম্প্রদায় আমাদিগের বিদ্রোহী? যদি নব্যসম্প্রদায়ের পুরঃসর ব্যক্তিরাই আমাদিগের বিদ্রোহী হইবে, তবে নারীজাতিবিষয়ক প্রস্তাব এবং অবলাবান্ধবের স্তুতিগীত-মালায়,বঙ্গভাষা পরিপুষ্ট হইবে কেন? যদি নব্যসম্প্রদায়ই আমাদিগের বিরোধী হইবে, তবে হেম, নবীন, রাজকৃষ্ণ ও দীনেশ প্রভৃতির কবিতাময় পুষ্পহারে আমাদিগের কবরীগুচ্ছ আজি কিরূপে অলঙ্কৃত হইল?—যদি নব্যসম্প্রদায়ই আমাদিগের অহিতাচরণে প্রবৃত্ত রহিবে, তাহা হইলে, কে আমাদিগকে এই স্ত্রী-পাট-রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা পরিজ্ঞাত করাইল? কাহার নিকট আমরা সুশাসনের উপদেশ পাইলাম? আর, আমাদিগের যে রাজ্য কোন দিন মঘের রাজ্য বলিয়া সর্ব্বত্র ঘৃণিত ছিল, সেই রাজ্য আজি কাহার গুণে স্বর্ণোজ্জ্বল প্রতীয়মান হইতেছে? প্রকৃত কথা এই, নব্যসম্প্রদায় আমাদিগের বিদ্রোহী নহে, আমরাই তাহাদিগের মনের অবস্থা এবং মনোনিহিত ভক্তিভাব বুঝিতে না

পাইয়া, অনেক সময়ে অকারণ তাহাদিগের নিন্দাবাদ করি।—তোমরা কি প্রত্যাশা কর যে, আমরা যাহাদিগের বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিব, তাহারা আমাদিগের পদারবিন্দে পুষ্পচন্দন বৃষ্টি করিবে?—আমরা যাহাদিগকে অস্পৃশ্য অগণ্য বলিয়া অবজ্ঞা করিব, তাহারা পাদ্য অর্ঘ্য লইয়া আমাদিগের পূজা করিতে আসিবে? ধিক্ তোমাদিগের স্বার্থপরতায়, ধিক্ তোমাদিগের চাটুবাদপ্রিয়তায়! যদি তোমরা যশ চাও, তবে যশস্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান কর, কুটিল নীতি পরিত্যাগ করিয়া অবলার যোগ্য সরলতা শিক্ষা কর, এবং ক্ষুদ্র জনের মত আত্মপরগণনা পরিত্যাগ করিয়া, প্রকৃত মহানুভাবতার আশ্রয় লও। তাহা হইলে, দেখিতে পাইবে, আজি এখানে ওখানে যে দুচারি জন তোমাদিগের নিন্দুক রহিয়াছে, দুদিনের মধ্যে তাহারাও তোমাদিগের ভক্ত ও স্তাবক হইয়া, তোমাদিগের অলক্তরঞ্জিত পাদপদ্মে আসিয়া গড়াইয়া পড়িবে, এবং আজি যাহারা প্রকৃত হিতকামনারই বশবর্ত্তী হইয়া, তোমাদিগের জগদম্বা ও শঙ্করী ঠাকুরাণী, তোমাদিগের ফুল্লরা, ও কর্কটার এত ব্যাখ্যান করিতেছে, কালি তাহারাই আবার তোমাদিগের যশোগানে দশ দিক্ পূর্ণ করিবে।

অনাথবিনোদিনীর উল্লিখিত বক্তৃতায় সভাস্থলে এক তুমুল হুলস্থুল বাধিল। দেবী হেমন্তবিলাসিনী, নলিন-সুন্দরী এবং বগলাসুন্দরী ও প্রসন্নময়ী প্রভৃতি কতিপয় ধীরমতি সভ্যা বক্তৃতার পোষকতা করিলেন, অন্যেরা সকলেই ছি ছি! ধিক্ ধিক্ বলিয়া কঙ্কনঝনৎকারের সঙ্গে বক্তৃতার নিন্দা করিতে লাগিলেন। একটি বিলাতের মেম বাঙ্গালি মেয়েদের বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছিলেন, তিনি ক্রোধভরে চলিয়া গেলেন, এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণকামিনী দাসীও সভা মণ্ডপ পরিত্যাগ করিলেন। ইহার পর সভাপতি মহাশয়া ভীত ও বিস্ময়াবিষ্টা হইয়া বলিলেন যে, অদ্য এই সভা স্থগিত থাকিবে, এবং মাস ত্রয়ের পর পুনরায় সভার অধিবেশন ও তাহাতে পুনরায় এই বিতর্কিত বিষয়ের আলোচনা হইবে। তাঁহার বিবেচনায় সভ্যাগণের এইরূপ আত্মকলহ একান্ত গর্হিত। (শ্রীবি) *

---

* আমরা ইহা বিশেষরূপে জানি, এবং জানি বলিয়া পাঠকবর্গকে দৃঢ়তার সহিত জানাইতেছি যে, আমরা যাঁহার নিকট হইতে উল্লিখিত বিবরণটি প্রাপ্ত হইয়াছি, তিনি নারীজাতির শিক্ষা, স্বাধীনতা এবং সামাজিক উন্নতির এক জন অকৃত্রিম সুহৃৎ। ইদানীং এদেশে পুরমহিলাদিগের দ্বারা যে সকল সভার শোভাবর্দ্ধন হয়, তাহা লইয়া পরিহাস করা, তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ, এবং সুতরাং অসম্ভব। পাঠকবর্গের নিকট এই নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা পরকীয় লেখার ভাষ্য করিতে গিয়া, শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্যকারের ন্যায় একে আর করিবেন না। (সং)

সংক্ষিপ্তসমালোচন

১। কল্পতরু। শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। আমাদিগের নিকট বঙ্গবিজেতা, চিত্তবিনোদিনী, কাননকুসুম এবং দীপনির্ব্বাণ প্রভৃতি কএকখানি উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা উপন্যাস সমালোচনার জন্য রহিয়াছে। আমরা সকল গুলি আদ্যোপান্ত পড়িতে পারি নাই বলিয়া মাক্ষিক সমালোচনাদ্বারা ঐ সকল গ্রন্থের বিড়ম্বনা করিতে সাহস পাই নাই। ইচ্ছা আছে, যে কয়খানি উপন্যাস বান্ধবের নিকট প্রেরিত হইয়াছে,তত্তাবতের পরস্পর তুলনা করিয়া শীঘ্রই একটি প্রবন্ধ লিখিব, এবং কল্পতরু সম্বন্ধেও আমাদিগের যাহা বিশেষ বক্তব্য আছে, ঐ তুলনায় তাহা প্রকাশ করিব। কিন্তু আমরা এখানিকে যখন ভূয়োভূয়ঃ পাঠ করিয়াছি, এবং পাঠ করিবার সময়ে প্রত্যেক বারই এক নূতন আমোদে আমোদিত, এবং নূতন আনন্দে আপ্লুত হইয়াছি, তখন পাঠকসমাজে ইহার পরিচয় দিতে বিলম্ব করা অনুচিত বোধ হইতেছে। আমাদিগের বিবেচনায় কল্পতরু বাঙ্গালাভাষার একখানি অদৃষ্টপুর্ব্ব আভরণ,এবং ইহার রচয়িতা বাঙ্গালি মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন। উপন্যাসলেখকদিগের মধ্যে কেহ সৌন্দর্য্যের অতুল ছবি আঁকিয়া, এবং সেই ছবি অতি কৌশলের সহিত জনসমাজে প্রদর্শন করিয়া সমাজের উন্নতি সাধন করেন; কেহ মানবচরিত্রের দোষনিচয়কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়া এবং বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে দগ্ধসূচীভেদের ন্যায় বিদ্রূপ করিয়া, মনুষ্যকে অকলঙ্ক ও উন্নত হইবার উপদেশ দেন। এদেশে পুর্ব্বোক্ত শ্রেণির আখ্যায়কদিগের মধ্যে স্বনামপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সর্ব্বাংশে সকলের শিরঃস্থানীয়, এবং শেষোক্ত শ্রেণির লেখকদিগের মধ্যে বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ই সর্ব্বাগ্রে অর্ঘ্য পাইবার যোগ্য এবং সকলের অগ্রগণ্য। ইন্দ্রনাথবাবুকে আমরা সাধারণ লেখকদিগের মধ্যে গণনা করি না। প্রকৃতি তাঁহাকে অতি উচ্চ শ্রেণির শক্তি দিয়াছেন, এবং এই কল্পতরু তাঁহার প্রথম সৃষ্টি হইলেও, ইহাতেই সেই শক্তির প্রচুর পরিচয় রহিয়াছে। কালে তাঁহার শক্তি কিরূপ বিকাশ লাভ করিবে, এবং বাঙ্গালা সাহিত্য তাঁহাদ্বারা কিরূপ অলঙ্কৃত হইবে,তাহা কল্পতরু পাঠ করিলেই ভাবগ্রাহী বিচক্ষণ ব্যক্তিরা অনুমান করিতে পারিবেন।

ভাষার পরিস্ফুটতা সাধন বিষয়েও ইন্দ্রনাথবাবুর অসামান্য ক্ষমতা আছে। তাঁহার বাঙ্গালা প্রগল্‌ভা রমণীর ন্যায় পরিহাসরসিকা, অথচ করুণার্দ্রহৃদয়া;—পণ্ডিতার ন্যায় সদালাপে প্রবীণা, অথচ সারল্যপূর্ণা,--এবং যারপরনাই শ্লেষচতুরা, অথচ সলজ্জমধুরা। যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকে বৈয়াকরণ ভট্টাচার্য্যের ভস্মলোচনা বৃদ্ধা গৃহিণীর ন্যায় সানুনাসিক স্বরে,কটমট শব্দ সহকারে কথা কহিতে দেখিলেই সুখী হন, তাঁহারা হয়ত কল্পতরুর অনেক স্থান প'ড়িয়া, নরেন্দ্রের পিসী ঠাকুরাণীর মত, হায় কি হইল বলিয়া কপালে করাঘাত করিবেন, এবং মনের দুঃখে ফোটা ফোটা চক্ষের জল ফেলিয়া বিলাপ করিতে রহিবেন। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই, এইরূপ স্বাদশক্তিশূন্য, উন্নতিবিমুখ অরসিকের সংখ্যা বঙ্গে ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে, এবং যাহাতে বাঙ্গালা ভাষা, কূপোদকের ন্যায় নিরুদ্ধ না রহিয়া, বর্ষাকালীন স্রোতস্বিনীর ন্যায় হর্ষ,ক্রোধ এবং আশা, উৎসাহ ও আনন্দের তরঙ্গ তুলিয়া তর তর বেগে প্রবাহিত হয়, ইহাই আধুনিক সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা অন্তরের সহিত কামনা করিতেছেন। কল্পতরুর ভাষায় তরঙ্গ না থাকিলেও তীব্র-বেগ আছে, এবং কোন কোন স্থলে আবর্ত্তের বৈচিত্র্য আছে।

২। রামায়ণ। মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত মূলসংস্কৃতহইতে শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় কর্ত্তৃক বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদিত। সটীক। কলিকাতা, ৩৭ নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, আলবার্ট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বাল্মীকির সপ্তকাণ্ড রামায়ণ অমৃতের সাতটি অক্ষয় প্রস্রবণ। এই রাম-রস-সুধাপ্রবাহে অবগাহন করিয়া কালিদাস কীর্ত্তিশৈলের অত্যুচ্চতম শিখরে আরূঢ় হইয়াছেন, ভবভূতি ভারতীয় সাহিত্যজগতে, দেবতার ন্যায় পূজা পাইয়াছেন এবং কৃত্তিবাস গুণে কবি-জন-বরেণ্য না হইয়াও বঙ্গের সর্ব্বত্র গৃহ-পিঞ্জরবদ্ধ কোকিলের ন্যায় আদরে রক্ষিয়াছেন। ফলতঃ রামায়ণের তুলনা নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, বাল্মীকি রামায়ণ যে কি পদার্থ,তাহা সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিরা অবগত নহেন। এদেশের কথক আর গায়কেরা রামায়ণের বিস্তর রূপান্তর করিয়াছেন, এবং কৃত্তিবাস পণ্ডিতও কথকদিগের কথার উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করিয়া, অনেক স্থলে একে আর করিয়া তুলিয়াছেন। আজি আমরা শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায়ের এই পদ্য রামায়ণ পড়িয়া আশা করিতেছি যে, বাঙ্গালির উল্লিখিত দুঃখ এত দিনে দূর হইতে চলিল। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মূল বাল্মীকীয়ের গদ্য অনুবাদ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় বাল্মীকীয় রামায়ণের পদ্যে অনুবাদ করিয়া অমর হইতে চলিলেন।

রাজকৃষ্ণ বাবু কিরূপ সুকবি ও সুলেখক, তাহা বান্ধবের পাঠকবর্গ অবগত

ছেন ; এবং যাঁহারা তাঁহার অবসর-সজিনী প্রভৃতি কাব্যনিচয় পাঠ করিছেন, তাঁহারা তাঁহার ললিতপদাবলী ও সরস ভাবলহরী দেখিয়াও, অনেক য়েই, যারপর নাই প্রীত হইয়াছেন। রাং, ইহা না বলিলেও চলে যে, তাঁহার ই অনুবাদ সর্ব্বথা কবি নামেরই উপযুক্ত বে। কিন্তু আক্ষরিক অনুবাদ বড় কন কার্য্য। রাজকৃষ্ণ বাবু অক্ষরে অরে অনুবাদ করিতে গিয়াও, যে, তাঁহার ই পদ্য রামায়ণে ছন্দের মাধুর্য্য, শদের প্রাঞ্জলতা এবং শব্দবিন্যাসের কবিনোচিত চাতুরী ও কৌশল রক্ষা করিতে রিতেছেন, ইহা সামান্য প্রশংসার বিষ নহে। আমরা অনেক স্থলে মূলগ্রন্থে কবিতা পড়িয়া, পরে তাহার অনুবা পড়িয়াছি ; এবং অনুবাদ যে এইরূপ শু অথচ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে, ইহা দেখিয়া, রাজকৃষ্ণ বাবুকে সত্য সত্যই মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ দিয়াছি।

এই পদ্য রামায়ণ প্রচলিত মাসিক পত্রিকাদির ন্যায় মাসে মাসে নানাবিধ টীকার অলঙ্কৃত হইয়া খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইতেছে। ইহার বার্ষিক মূল্য ডাক মাসুল সমেত ৩।৵ আনা। যাঁহারা স্বস্বগৃহে বাল্মীকির অমৃতরসাভিষিক্ত পবিত্র মূর্ত্তির প্রতিকৃতি স্থাপন করিয়া কৃতার্থ হইতে ইচ্ছা করেন, আমাদিগের ভরসা আছে, তাঁহারা অবশ্যই ইহার এক এক খণ্ড গ্রহণ করিবেন।

৩। শাস্ত্রপ্রকাশঃ। বেদান্ত শাস্ত্রম্। অদ্বৈতানুভূতিঃ।—শ্রীগোবিন্দ পাদাচার্য্য স্বামিবিরচিতা।—শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কারেণ ভাষান্তরিতা।—আমরা শাস্ত্রপ্রকাশের চতুর্থ ও পঞ্চম সংখ্যা দেখিতে পাইয়াছি। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় শাস্ত্রার্থ প্রকাশে যেরূপ যত্নশীল হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে আমরা ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। তাঁহার বাঙ্গালা অনুবাদ উৎকৃষ্ট।

৪। জ্ঞানাঙ্কুর। শ্রীঈশানচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত ইহাতে বালকদিগের পাঠোপযোগী কতকগুলি কবিতা বিনিবেশিত হইয়াছে। কবিতাগুলি নীতিগর্ভ ও সদুপদেশযুক্ত। আমাদিগের বিবেচনায় এই পুস্তকখানি বাঙ্গালা বিদ্যালয় সমূহে ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

৫। কবিতামালা। শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম এ,বি এল বিরচিত। আমরা রাজকৃষ্ণ বাবুর বাঙ্গালার ইতিহাস এবং কতিপয় পদ্য প্রবন্ধ পড়িয়া তাঁহার বিস্তর প্রশংসা করিয়াছিলাম। আজি দেখিলাম, তাঁহার কবিতামালাও একান্ত মনোহারিণী। বস্তুতঃ একাধারে এতগুণ সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয় না। এই কবিতামালার মধ্যে আমরা যেটি পড়িয়াছি, সেইটিই আমাদিগের নিকট প্রীতিপ্রদ বোধ হইয়াছে এবং কবির কল্পনাচাতুর্য্য ও শিল্প-নৈপুণ্য উভয়ই আমাদিগকে যুগপৎ আনন্দিত করিয়াছে। আমরা নিম্নে সৃষ্টি নামক কবিতার কএকটি

পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম। সুরুচিসম্পন্ন পাঠকবর্গ এই কয়টি পংক্তি পাঠ করিলেই, রাজকৃষ্ণ বাবুর শক্তি ও ক্ষমতার পরিচয় পাইবেন।

ধূ ধূ ধূ করিত অনন্ত আকাশ,
নাহি ছিল তাহে রবির প্রকাশ,
নাহি ছিল শশী, নাহি ছিল তারা,
নাহিক ছুটিত আলোকের ধারা,
পুলকে প্রকাশি রূপের রাশি।
না হাসিত দিবা কিম্বা বিভাবরী,
না খেলিত সন্ধ্যা-লাবণ্য-লহরী,
না আসিত উষা অদিতি নন্দিনী,
মুকুতা-জড়িত-কুসুম মালিনী,
প্রফুল্ল বদনে মধুর হাসি।

না ছিল বসন্ত, ফুল মালা গলে,
রসে ডগমগ নব ভাব বলে;
না ছিল নিদাঘ প্রতাপে প্রখর,
অথবা বরষা, জলদ-অম্বর,
কণ্ঠে ঝল মল বিজলী হার।
না ছিল শরৎ কাশ-বিকশিত,
বিমল-গগন-শশাঙ্ক-ভূষিত;
না ছিল হেমন্ত কুজ্ঝটিকা অঙ্গে,
অথবা শিশির, তুষার-তরঙ্গে,
স্খলিত-শরীর-সজ্জিত-ভার।

নাহি বিরাজিত সুখদা মেদিনী,
পুষ্প তরু লতা শৈল শৈবলিনী;
না ছিল মধুর বিহঙ্গম-রব,
এ মহীমণ্ডল-মুকুট মানব,
বিচিত্র জীবন-প্রবাহ-রঙ্গ।
না ছিল মরণ কিম্বা অমরতা,
নাহি প্রকাশিত দ্যুলোক দেবতা,
নাহি ছিল এই বিশ্বের আভাস,
ধূ ধূ ধূ করিত অনন্ত আকাশ,
অনন্ত কালের বিরাট অঙ্গ।

দশ দিক্ ব্যাপি আছিল তিমির,
অনাদি অনন্ত গাঢ় সুগম্ভীর,
অকূল অতল অলংঘ্য অপার,
আকৃতি বিহীন ভীম পারাবার,
ভাবিলে হৃদয়ে উপজে ভয়।
অজ্ঞাত অজ্ঞেয় জগত কারণ
সে তিমির মাঝে নিদ্রিত মতন
আছিলা অনন্ত আকাশে বিলীন,
অতরঙ্গ-কাল-সলিলে আসীন,
অনন্ত শয়নে শকতি ময়।

৬। জাতীয়-উদ্দীপনা। এই পু[illegible] খানিতে এদেশের কৃতিপন্ন উৎকৃষ্ট কবি[illegible] কএকটি অতি উৎকৃষ্ট কবিতা সংকলি[illegible] হইয়াছে। যাঁহারা বাঙ্গালা কবিতা [illegible]ড়িতে ভাল বাসেন, এখানি তাঁহাদে[র] প্রয়োজনে আসিবে। অল্পের মধ্যে একখানি উপাদেয় সংগ্রহ।